প্রকাশক :
শ্রীবিমলকুমার মুখোপাধ্যায়
জি. ভরদ্বাজ অ্যাণ্ড কোং
২২-এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
জন্মাষ্টমী—১৩৬৬

মুদ্রাকর :
পরাণ প্রেস
শ্রীপরাণচন্দ্র ঘোষ
[illegible]এ, তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে আশাপূর্ণা দেবীর আবির্ভাব কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। দীর্ঘকাল ধরেই এর প্রস্তুতি চলছিল।

কবিদের কথা বাদই দিই—বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য মহিলা কবি অনেক—স্বর্ণকুমারী (যদিও ইনি গল্পলেখিকা বলেই সমধিক জ্ঞাত), মানকুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনী, কামিনী রায় থেকে শুরু ক'রে এখনও পর্যন্ত বহু মহিলাই বাংলা কাব্যসাহিত্যে নিজ নিজ স্বাক্ষর রেখে গেছেন বা যাচ্ছেন। এমন কি আধুনিক কবিতা বলে যে বস্তুটি চলছে—তাতেও তাঁরা পিছনে পড়ে নেই।

তবে, কবিদের মতো সংখ্যায় অধিক না হ'লেও কথাসাহিত্য ক্ষেত্রে মহিলারা অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। প্রভাব ও প্রতিপত্তি—দুইয়েতেই তাঁরা চিরদিন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে গেছেন।

এমন কি স্বর্ণকুমারী দেবীকেও শুধু 'পাইওনীয়ার' বা পথপ্রদর্শকের সম্মান দিয়ে শিকেয় তুলে রাখা বোধ হয় যায় না। তাঁর 'দীপ-নির্বাণ' 'ছিন্ন মুকুল'—বঙ্কিম-রমেশ-রবি আলোকিত জগতেও এককালে যথেষ্ট বিস্ময় ও আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। আজ যে তাঁর বইগুলি অপ্রাপ্য—তার কারণ এ নয় যে, সেগুলো অপাঠ্য—কারণ এই যে-এসব রচনায় তিনি সাহিত্যে এমন কোন মোড় ফেরাতে পারেন নি, বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ বা বিভূতিভূষণের মতো, এমন নতুন অথচ স্থায়ী ধারার প্রবর্তন করতে পারেন নি—যাতে লোকে চিরদিন তাঁকে মনে করে রাখে। শরৎচন্দ্রের উদয়ের অব্যবহিত পূর্বে বা নবচন্দ্রিমার কালেও—তাই বা কেন, কল্লোল গোষ্ঠীর আবির্ভাবের কাল পর্যন্ত—ভারতী গোষ্ঠী বাজার জাগিয়ে রেখেছিলেন; চারুচন্দ্র, হেমেন্দ্রকুমার, সৌরীন্দ্রমোহন প্রভৃতি অবশ্যই অনেক সুখপাঠ্য বই লিখে গেছেন কিন্তু ঐ একই কারণে তাঁরা বিস্মৃতপ্রায়। এমন কি বিপুল শক্তিধর প্রভাতকুমারের কথাও বেশির ভাগ লোকে ভুলে গেছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী কোন স্থায়ী ছাপ রাখতে না পারলেও, অন্য কোন কোন পরবর্তী লেখিকা রেখেছেন। অনুরূপা, নিরুপমা ও ইন্দিরা (দেবী-চৌধুরাণী নন)—এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্যা। শরৎচন্দ্র যখন পূর্ণ আলোকে দেদীপ্যমান, মধ্যগগনস্থ—তখনও এঁরা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো দীপ্তিময়ী ছিলেন। ফলে বসুমতীর সতীশবাবু (শুনেছি উনি নিজেই বিজ্ঞাপন লিখতেন) শরৎচন্দ্রকে 'সাহিত্য সম্রাটে'র 'চাকরি'টা দিয়ে ফেলে—এক সময় এঁদের বিশেষণ বাছতে যথেষ্ট বিব্রতবোধ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত নিরুপমাকে 'উপন্যাস সম্রাজ্ঞী' ও অনুরূপাকে 'সাহিত্য অমরার ইন্দ্রাণী' বলে অভিহিত করে শেষ রক্ষা করেছিলেন। এখনকার দিনে অনেক পাঠক হয়ত শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে এঁদের মধ্যে এককালে—নিরুপমা দেবীই অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। বোধ করি 'দিদি'র অসাধারণ খ্যাতিই তার কারণ।

অবশ্য শুধু 'দিদি' কেন—'অন্নপূর্ণার মন্দির' 'শ্যামলী' 'বিধিলিপি' এমন কি পরবর্তী 'পরের ছেলে' 'অনুকর্ষ' বইতেও নিরুপমা এমন একটি বিশিষ্টতার ছাপ রেখে গেছেন—যা তখনকার দিনে দুর্লভ তো বটেই, বিস্ময়করও। 'দিদি'তে শরৎচন্দ্রের প্যাঁচ ছিল কিছু—শরৎবাবুর সুপরিকল্পিত চমক। সতীনে সতীনে ঝগড়াই শুনে এসেছে লোকে—নিরুপমা দেবী গাঢ় ও স্থায়ী ভালবাসা দেখিয়ে তাক্ লাগিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের এইগুলোই ছিল রঙের তাস। বস্তুত ভেবেচিন্তেই—মেসের ঝিকে শিক্ষিতা চরিত্রবতী ক'রে, জায়ের ছেলেকে নিজের ছেলের মতো ভালবাসিয়ে, জায়ে জায়ে ভাব দেখিয়ে, দেওরকে পুত্রাধিক করে, জায়ের বৈমাত্র ভাইকেও যে ছেলের মতো ভালবাসতে পারা যায় দেখিয়ে—তিনি এককালে বাজী-মাৎ করেছিলেন। অবশ্যই তা ছাড়াও অনেক কিছু ছিল। গল্প বলার অতিমানবিক দক্ষতা ও ভাষার জাদুতে—তাঁর রচনাগুলি আজও সমান সুখপাঠ্য, সমান আকর্ষক। কিন্তু প্রথম বাজীটা তিনি ঐ নতুনত্বের চমকেই জিতেছিলেন। তবে হ্যাঁ—প্রায় অবিশ্বাস্য অবাস্তব বস্তুকে বাস্তব ও বিশ্বাস্য ক'রে তুলতে পেরেছিলেন বলেই তা সম্ভব হয়েছে। তাঁর এই আশ্চর্য শক্তির কাছে মাথা নত না করে উপায় নেই।

নিরুপমা দেবীর 'দিদি'তেও সে জাদুর খেলা ছিল। সতীনে সতীনে ভাব অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় নি সেদিন তাঁর বই পড়ে—যদিচ জীবনে এর নজীর কেউ কোনদিন খুঁজে পাননি বোধ হয়। তার আগে তো নয়ই—পরেই কি কোনদিন খুঁজে পেয়েছে কেউ?…কিন্তু সে যাই হোক—আমার মনে হয় 'দিদি'র পরবর্তী বইগুলিতে অধিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন নিরুপমা। হয়ত 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে'র খ্যাতি রচনায় বাঙালীর মেয়ের তদানীন্তন বাস্তব দুর্দশা কিছু সাহায্য করেছে, কিন্তু 'শ্যামলী' বিশেষ করে 'বিধিলিপি'তে তেমন কোন অতি পরিচিত ব্যথার সহায়তা পান নি। 'বিধিলিপি'তে প্রৌঢ় একটি লোকের সঙ্গে তরুণীর প্রেম, 'অনুকর্ষে' সত্যকার সাধু প্রকৃতির গুরুদেবের প্রতি তরুণী শিষ্যার প্রেম—এগুলিকে চিত্তাকর্ষক ও বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তোলা সহজ কাজ নয়; বিশেষ তখনকার দিনের অলিখিত সামাজিক শাসন বাঁচিয়ে, লেখিকার ব্যক্তিগত জীবনের বাল্যবৈধব্যের শুচি শুভ্রতা রক্ষা ক'রে। 'পরের ছেলে'র বিষয়বস্তু আরও কঠিন—মানে ফুটিয়ে তোলা—একজন নিজের ছেলেকে দত্তক দিয়ে সেই এস্টেটেই চাকরি করছে, সেই পরের ছেলে আত্মজের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব নিয়ে। এর যন্ত্রণা আমাদের কাছে একেবারেই অপরিচিত কিন্তু লেখিকা নিজের শক্তি ও সহানুভূতিতে আমাদের সেই বেদনায় অংশভাগী করে নিয়েছেন।

অনুরূপা দেবীর কাহিনী বিস্তারে জনপ্রিয়তার দাবী সমধিক। ইন্দিরা দেবীর (আসল নাম সুরূপা—অনুরূপার সহোদরা) 'স্পর্শমণি' এককালে বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট আলোড়ন আনলেও, তাঁর অকালমৃত্যুর জন্যই সম্ভবতঃ তিনি কোন স্থায়ী আসন রাখতে পারেন নি জনগণমানস দরবারে। কিন্তু অনুরূপা দেবী অনেক লিখেছেন এবং ভাল লিখেছেন। তাঁর লেখনী দৃঢ়, শক্তিশালী। গল্প বয়নের ক্ষমতাও অনন্যসাধারণ। সেদিক দিয়ে তিনি সহজে

নিরুপমা দেবীর থেকে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। নিরুপমা দেবীর অন্তর্মুখী। অনুরূপার দৃষ্টি বহুদূর প্রসারিত, তাই বলে মানুষের মনের গভীরেও দৃষ্টি পড়েনি, তা নয়। তাছাড়াও আর একটি গুণ ছিল তাঁর, নাটকীয়তা। রঙ্গমঞ্চের ভোটটা পাঠক-মানস আসনের নির্বাচনে কম সহায়ক নয়। বঙ্কিম ও শরতের মতো সেদিক দিয়েও অনেকখানি সাহায্য পেয়েছেন অনুরূপা—'মা', 'মন্ত্রশক্তি', 'মহানিশা', 'পোষ্যপুত্র', 'বাগ্‌দত্তা'—বইগুলি বার বার সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চে অভিনীত হয়েছে, সার্থক চলচ্চিত্রও রচিত হয়েছে।

যারা ব্যক্তিগতভাবে অনুরূপার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাঁরাই জানেন—সাহিত্য জগতে তাঁর একটা দাপট ছিল। সে দাপট শরৎচন্দ্র ছাড়া সেকালে কেউ বজায় রাখতে পারেন নি। তার কারণ তিনি জানতেন যে বাংলাদেশের (সমগ্র বাংলার কথাই বলছি) অগণিত পাঠক তথা দর্শক-চিত্তের মুগ্ধতা তাঁর অজস্র খ্যাতির যে দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা ক'রে রেখেছে—বিস্মৃতি বা অবহেলার আক্রমণ তার ধারে কাছে পৌঁছতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে অবান্তর হ'লেও একটি গল্প বলার লোভ সামলাতে পারছি না। এ গল্প অনুরূপার নিজের মুখ থেকেই শোনা। ওঁর অভ্যাস ছিল, টুকরো টুকরো কাগজ সংগ্রহ ক'রে তার পিছনে লেখা। হ্যাণ্ডবিল, কোন প্রোগ্রাম বা স্যুভেনিরের মলাট—মায় সিনেমার টিকিটের পিছনে পর্যন্ত কপি লিখতেন (এ অভ্যাস সজনীকান্তেরও ছিল)। অসমান বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন ধরনের কাগজে লেখা কপি কম্পোজ করতে অসুবিধা হয় বলে সেকালের প্রবলপ্রতাপ প্রকাশক হরিদাসবাবু—ভারতবর্ষের 'ডি-ফ্যাক্টো' সম্পাদকও বটে—সবিনয়ে বলেছিলেন, 'আমি প্যাড করে পাঠিয়ে দেব—দয়া করে এ কুচো কাগজে আর লিখবেন না।' তাতে অনুরূপা সদম্ভে জবাব দিয়েছিলেন, 'আমার লেখা ছাপতে হলে ঐ কপিই ছাপতে হবে। নইলে লেখা পাবেন না।'

অনুরূপা দেবীর 'মা'কে একরকম 'দিদি'র জবাব বলা যায়। সতীনে সতীনে প্রেম দেখান নি তিনি, বরং অকারণ ঈর্ষাই দেখিয়েছেন—যা স্বাভাবিক। শেষ পর্যন্ত সে ঈর্ষাকে যে বন্ধ্যা নারীর বেদনার কাছে মাথা নত করতে হ'ল, তাও কোথাও অবাস্তব হয়ে ওঠেনি। মন্ত্রশক্তিতে অবশ্য কিছু চমকের সাহায্য নিয়েছেন। দুটি দম্পতির কাহিনী—এক স্ত্রীর স্বামী সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা ও অবজ্ঞা, আর এক স্বামীর স্ত্রী সম্বন্ধে অনাসক্তি—কী ভাবে দুই ক্ষেত্রেই গাঢ় প্রেমে পরিণত হ'ল—সেই প্রায়-অবাস্তব কাহিনীকে বাস্তব ক'রে তুলেছেন তিনি। অবাস্তব ঘটনার পরিণতি নয়—অবাস্তব তাঁর প্রতিপাদ্য। তিনি বলতে চেয়েছেন যে হিন্দু বিবাহের মন্ত্রেই সেই শক্তি সেই জাদু আছে। তাঁর বাহাদুরী—তিনি সে কথা লক্ষ লক্ষ পাঠককে বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছেন।

এঁদের কথা এত করে বলছি তার মানে এ নয় যে, আর কোন লেখিকা এর মধ্যে প্রসিদ্ধিলাভ করেন নি। প্রভাবতী দেবী এককালে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁর সে খ্যাতির স্থায়িত্ব লাভে বড় অসুবিধা ছিল—নিজস্ব কল্পনার অভাব। তাঁর অধিকাংশ

বইতেই আর কোন লেখক-লেখিকার পূর্ব সৃষ্টির ছাঁচটা থাকত। তাঁদের চিন্তা যদি কাণ্ড হয়—শাখা-প্রশাখাগুলো ওঁর। অর্থাৎ সেই মূল বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে নতুন ভাবে লিখতেন। গিরিবালা দেবী বা পরবর্তী কালের প্রবীণা লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রভৃতিরও একটা drawback ছিল। এঁরা দেখেছেন অনেক কিন্তু গল্প বুনতে পারেন নি। কাহিনীর যে জাদু পাঠক মনকে আকৃষ্ট আবিষ্ট করে—লেখক লেখিকাকে ভুলতে দেয় না—সে জাদু এঁদের ছিল না।

সীতাদেবী শান্তাদেবীর অসুবিধা, তাঁরা লিখতেন বেশির ভাগই 'প্রবাসী' পত্রিকায়। সম্পাদক রামানন্দবাবু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম, নৈতিকতা সম্বন্ধেও তাঁর আদর্শ ছিল অতিশয় উচ্চ। এই লেখিকারাও সেই সম্পাদক তথা পিতার দ্বারা প্রভাবিত—লেখকের দায়িত্ব সম্বন্ধেও তাঁদের ধারণা সেই আদর্শ ও প্রভাবের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। সুতরাং তাঁদের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা প্রেমে পড়লেও সেই নৈতিকতার মান বাঁচিয়ে চলত। সেইজন্যই, শরৎচন্দ্রের আলোয় যখন পাঠকদের চোখ ধেঁধে গেছে—পরবর্তীকালের কালি-কলম কল্লোল-প্রগতির লেখকরা আরও অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছেন পাঠকমনকে—তখন এ-শ্রেণীর নিরুত্তাপ পানসে লেখায় আদর পাওয়া কঠিন। তবু যে 'উদ্যানলতা', 'পরভৃতিকা', 'সোনার খাঁচা' প্রভৃতি বইয়ের কথা আমাদের আজও মনে আছে—তাতেই প্রমাণিত হয় যে তাঁদের খ্যাতি শূন্য বা বালুর ওপর গড়ে ওঠে নি।

এই সময়ের আর একজন শক্তিশালিনী লেখিকা ছিলেন—বিদ্রোহিনী শৈলবালা ঘোষ-জায়া। এঁর লেখায় চমক ছিল খুব। স্ত্রীলোক হয়েও, বিশেষ হিন্দুভদ্রঘরের বিধবা—প্রচলিত জীবনবোধ, ধারণা ও সংস্কারকে আঘাত হানতে ইনি দ্বিধা করেন নি। ইনিই প্রথম পুরোপুরি বাঙালী মুসলমান সমাজ নিয়ে উপন্যাস লেখেন (অনুরূপা দেবীর 'মা' বইতেও যতদূর মনে পড়ছে মনোরমার বর্ধমান বাসের সময় একটি মুসলমান পরিবারের দেখা পাওয়া গিয়েছিল, শৈলবালাও বর্ধমানের বাসিন্দা ছিলেন)। কিন্তু শৈলবালাকেও যে আজ বিস্মৃতির অতীতকাল থেকে টেনে বার করতে হ'ল—মনে হয় তার দুটি কারণ। প্রথমতঃ, উনি লেখা ছেড়ে দিলেন, দ্বিতীয়তঃ, চিন্তায় যতটা বিস্ময়কর বৈপ্লবিকতা ছিল ওঁর—রচনা-শৈলী বা কাহিনী-বিস্তারে ততটা পটুত্ব ছিল না। তবু এও সত্য, বঙ্গ-সাহিত্যে শৈলবালার আগমন না ঘটলে, আশাপূর্ণা জীবনপ্রশ্নে বা দৃষ্টি-ভঙ্গীতে এতটা এগিয়ে যেতে পারতেন কিনা সন্দেহ। সত্য কথা যে সকলেই নিঃসঙ্কোচে বলতে পারে শৈলবালাই সেই পথ দেখিয়ে দিলেন।

॥ ২ ॥

এই হ'ল মোটামুটি আশাপূর্ণার আবির্ভাবের আগের অবস্থা। তাঁর সাহিত্যিক প্রস্তুতির ভিত্তিভূমিও বলা চলে।

চমক আশাপূর্ণারও যথেষ্ট ছিল সেদিন, তবে এ অন্য চমক, অন্য বিস্ময়। প্রথম প্রথম ওঁর

গল্প পড়ে মনে হয়েছিল, এ কোন পুরুষের লেখা, মহিলার ছদ্ম নামে পুরুষই লিখছেন। এ ধারণা আমার মতো আরও অনেকেরই ছিল—অনেক দিন পর্যন্ত। পূজনীয় কালিদাস রায় মশাইও স্বীকার করেছিলেন যে, গোড়ার দিকে তাঁরও ঐ ধারণা হয়েছিল। অবশ্য পুরুষ হ'লেই যে বহু পুরনো জগৎটাকে এমন নতুন চোখে দেখতে বা দেখাতে পারবেন তার কোন মানে নেই—এ ধারণাটা হয়ত নিছক আমাদের, মানে পুরুষদের, ভ্যানিটি। অমলা দেবী ছদ্ম নামেও তো একজন পুরুষ লিখতেন—সে সব লেখার কোনটাই দাঁড়ায় নি, শনিবারের চিঠির সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও। অনুরূপা দেবী তাঁর আমলের নতুন জগৎটাকে দেখতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর পুরাতন সংস্কার, ধারণা ও মতবাদের মধ্য দিয়ে, আশাপূর্ণা দেবী হাল আমলের নতুন জগৎকে তার সত্যকার চেহারায় তুলে ধরলেন পাঠকদের চোখের সামনে।

তার আগে তাঁর নিজের দেখার কথাটাই মনে রাখা দরকার। সংসারকে মানুষকে তিনি দেখেছেন কোন ধারণা-সংস্কার মতবাদের মধ্য দিয়ে নয়—দেখেছেন পরিষ্কার স্বচ্ছ দৃষ্টিতে, ঠিক যেমনটি মানুষ, যেমন সংস্কার—তেমনিই। তাঁর এই একাধারে বহুদূরপ্রসারী অথচ অন্তঃপ্রেরিত দৃষ্টির মধ্যে কোন বিদ্বেষ কি কোন তিক্ততাও নেই, কোমর বেঁধে কোথাও ঝগড়া করতে বসেন নি—তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য এইখানেই। মানুষ যে রকম সেই রকম জেনেই তিনি তাদের ভালবাসেন, প্রশ্রয়ের চোখে দেখেন—তাদের দুর্বলতা দৈন্য সত্ত্বেও।

আশাপূর্ণা দেবীর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতা—সার্বিকতা একটা কথা উঠেছে আজকাল, প্রসারতা বললেও বুঝি ভাল করে বোঝানো যায় না—এক এক সময় ভয়াবহ হয়ে ওঠে বৈকি। এতটা আর কেউ বলতে বা দেখাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। দেওয়াল থেকে এক পুরুষের ছবি নামিয়ে দিয়ে আর এক পুরুষের ছবি টাঙানো হয়—এই সহজ সত্যটা কতটা মর্মান্তিক—তা ওঁর আগে কে এমন করে দেখিয়েছিলেন? ওঁর কোন কোন রচনা পড়ার পর ব্যক্তি আশাপূর্ণার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ভয় করেছে—সেটা সবিনয়েই স্বীকার করছি। মনে হয়েছে উনি এক নজরে আমাদের মনের সমস্ত মালিন্য দেখে ফেলবেন বুঝি!

আশাপূর্ণা দেবী কোনও স্কুলে কলেজে পড়েন নি—বিশ্ববিদ্যালয়ের তো প্রশ্নই ওঠে না—সম্ভবতঃ কিশোর বয়সেই বিয়ে হয়ে সাধারণ গৃহস্থ ঘরের বধূরূপে এসে উঠেছিলেন—'রাঁধার পর খাওয়া আর খাওয়ার পর রাঁধা'—এই ছিল নিত্যকার জীবন ব্যবস্থা। আত্মীয় সমাজ ছাড়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত কোন বৃহত্তর জনসমাজে মেশার সুযোগ ঘটে নি; এখন যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করার ফলে কিছু কিছু সভাসমিতি করতে হচ্ছে বটে কিন্তু তাকে ঠিক বৃহত্তর সমাজে মেশা বলা চলে না কোনমতেই—আধুনিক আধুনিকাদের জীবন দেখেছেন ছেলে-বৌ-নাতি-নাতনী বা ঐ ধরনের আত্মীয় ছেলেমেয়েদের মুখে শোনা গল্পের মধ্য দিয়ে—অথচ তিনিই যে ভাবে চিরে-চিরে বাঙ্গালী-সমাজের সত্যকার জীবনটা দেখিয়েছেন—যাকে ইংরেজীতে 'থ্রেডবেয়ার' বলে, সেই ভাবে জীবন-বস্ত্রের বুনুনির সুতোগুলো পর্যন্ত খুলে খুলে—আধুনিক

বোধ হয়। আরতির চরিত্রেও একটু অসঙ্গতি থেকে গেছে। যে নির্বিচারে দীর্ঘকাল স্বামীর অ-মানুষিক স্বার্থপরতা এবং পিসশাশুড়ির অকারণ জুলুম ও বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করে গেছে, বরং অপরে প্রতিবাদ কি কোন উত্তর দিতে গেলে আকুল হয়ে থামিয়ে দিয়েছে —নিজের ওপর দিয়ে সব ঝড়-ঝাপটা নিয়ে এই দুটি জীবের প্রাধান্য বজায় দিয়েছে সেই নিতান্তই সেকেলে বধূ আরতির এক কথায় (স্বামীর অবহেলায় ছেলের মৃত্যু আরও অনেক মায়েরই হয়েছে বা হয়) পরপুরুষের সঙ্গে জীবন যাপনে রাজী হওয়া একেবারে অসম্ভব না হ'লেও কিছুটা অবিশ্বাস্য বৈকি। এমন কি ট্রেনে হঠাৎ প্রবীর-ঠাকুরপোকে (খুব একটা ঘনিষ্ঠতার ইতিহাস ইতিপূর্বে দেখান নি লেখিকা) প্রবীর বলে সম্বোধন করাটাও কানে বাজে। পৃষ্ঠপট, কাল ও পাত্র হিসাবে অতটা আধুনিকতা খাপ খায় না। বিশেষ এ আধুনিকতা অকারণও। তখনও প্রবীরঠাকুরপো বলে সম্বোধন করলে গল্পের কোন হানি ঘটত না।

যে লেখিকা জীবনের অন্ধিসন্ধি পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখেছেন—দেখেছেন সেকাল একাল দুকালের মানুষই—তিনি এমন ভুল করলেন কেন? হয়তো প্রথম উপন্যাস বলেই। আর মনে হয় বিদ্রোহ ঘোষণার ব্যাকুলতা বা ব্যস্ততাই তাঁকে বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি রাখতে দেয় নি। নইলে এমন কোন প্রবল প্রণয় পূর্বরাগ বা আবেগের ইতিহাস আমরা পাই না যাতে প্রবীর সব ছেড়ে একটি সধবা পরস্ত্রী নিয়ে ঘর করলে—সেটা মানায়। আর জ্যোতির্ময়ীও গিয়ে তাকে ধরে আনবার চেষ্টা করলেন না—একমাত্র ছেলেকে—তাই বা কেমন কথা? অথচ যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তিনি সাহিত্যে নেমেছেন তার সুস্পষ্ট প্রকাশ এই প্রথম বইতেই তো যথেষ্ট দেখা যায়। কৃষ্ণবালা, তাঁর প্রতিবেশিনীর দল এবং বিশেষ করে মেনকা মেয়েটি—যে 'জ্যান্ত মাছে পোকা পড়াতে পারে'। এ মেনকাকে আমরা সবাই দেখেছি, অনেকেরই বাড়িতে দেখা পাওয়া যাবে।

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও বক্তব্যের স্পষ্টতাও—এই বই থেকেই শুরু হয়েছে :—

…"মানুষের পঙ্কিল নিঃশ্বাসে মানুষের জীবন দুর্বহ হইয়া উঠে। বঞ্চিত বলিয়াই ক্ষুধাতুর ঈর্ষায় পরস্পরকে আঘাত করে।

অন্ন লইয়া জীবন কাটাইতে হয় বলিয়াই অত্যন্নের জন্য হানাহানি করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অন্তরের ঐশ্বর্যের সন্ধান রাখে না বলিয়াই অন্তরের দৈন্য উলঙ্গ করিয়া দেখাইতে লজ্জা বোধ করে না।…"

"খোকা আসিলে অমরেশ একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে পারে। শিশু বড় মানুষদের অনেকটা অবলম্বন, চক্ষুলজ্জার আড়াল। একটা শিশুকে কেন্দ্র করিয়া আলাপ-আলোচনার পথ সরল হইয়া যায়।"

"বড় সাবধানে ঘর করিতে হয় আধুনিক ছেলেমেয়েদের লইয়া। যেটুকু মান বাঁচাইয়া

চলে, সে যেন নিতান্তই করুণা করিয়া। অনায়াসে অপমান করিয়া বসিতে ইহাদের বাধে না। বয়সের মর্যাদা, সম্বন্ধের মর্যাদা দূরে থাক—স্নেহের সম্মানটুকুও রাখিতে জানে না ইহারা।...

... ...

এই দীর্ঘ জীবন নির্বিরোধে কাটিয়া গেল কিসের অনুশাসনে? প্রতি মুহূর্তে যে বিদ্রোহ মাথা তুলিতে চাহিয়াছে—তাহাকে পিষিয়া মারিয়াছে কোন শাস্ত্র মন্ত্র?...

তবু এ অভিনয়ও নয়, ছদ্মবেশও নয়। রক্তের সঙ্গে মিশিয়া আছে যে নম্রতা, যে বাধ্যতা, অদৃষ্টকে মানিয়া চলিবার যে শিক্ষা, এ শুধু তাই।

আধুনিক ছেলেমেয়েরা চলে আপন আপন হৃদয়ের অনুশাসন মানিয়া। কিন্তু কোনটা ভাল? জিতিল কাহারা?"

বিদ্রোহিণী 'আর এক ঝড়'-এর নায়িকা অতসীও। এ আর এক বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ ভাগ্যের বিরুদ্ধে, আট বছরের নিজের ছেলের বিরুদ্ধে। এ ক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠতে পারে—এতটা বাস্তব কিনা। যে বইতে হরসুন্দরী বাড়িওয়ালীর দেখা পাওয়া যায়, সুরেশ্বরী, ছন্দার শাশুড়ির দেখা মেলে—এমন সত্য নিখুঁত চরিত্র যে বইতে এসেছে—সে বইতে অতসীর অতটা বিদ্রোহ—আগেও যা বলেছি, অসম্ভব হয়ত নয়, তবে তাকে ঠিক বিশ্বাস্য ক'রেও তোলা যায় নি। কোথায় যেন পাঠকের মন খুঁত খুঁত করে, মনে হয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। অথচ সীতুর বেলা তা ঠিক মনে হয় না। এ সীতু ঘরে ঘরে থাকে না, এর পৃষ্ঠপট অসাধারণ, আচরণ 'য়্যাবনর্মাল' (অস্বাভাবিক বললে ঠিক বোঝানো যায় না হয়ত)—তবু তাকে বিশ্বাস করতে বাধে না।

'অগ্নিপরীক্ষা'র সঙ্গে মন্ত্রশক্তির একটু মিল আছে, তবে সে সামান্যই। চিন্তার মিল, বইয়ের ছায়া এসে যে পড়েছে তা নয়। বিশেষ তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে, চরিত্রচিত্রণের আশ্চর্য নিপুণতায় এবং কাহিনী বয়নের শক্তিতে—এ বই সে মিলটুকুও মনে করতে দেয় না।

অগ্নিপরীক্ষার তাপসীও বিদ্রোহিণী। ঠাকুরমার প্রতি, বাবার প্রতি সহানুভূতিতে—তাঁদের প্রতি মা চিত্রলেখার হৃদয়হীন আচরণে—সে বিদ্রোহিণী। তাই মায়ের সমস্ত শিক্ষা ও 'উচ্চাশা' নিষ্ফল করে দিয়ে সে ঠাকুরমার সংস্কারে ফিরে গেছে, তার ঘটিয়ে দেওয়া বালিকা-বয়সের বিবাহকেই সত্য বলে, চিরন্তন বলে গ্রহণ করেছে। এই গ্রন্থে আধুনিকা হওয়ার জন্য প্রায় উন্মত্ত চিত্রলেখার প্রতি যে কঠিন বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেছেন লেখিকা তা কোথাও সত্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় নি, এ আধুনিকাকে অল্পবিস্তর আমরা সকলেই দেখেছি।

এই বিদ্রোহের সুর, লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ওঁর ছোট গল্পগুলিতেও—কোথাও প্রত্যক্ষ, কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে বেজেছে। তাঁর এখনও পর্যন্ত যা শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে স্বীকৃত—সেই ট্রিলজী 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' 'সুবর্ণলতা' ও 'বকুলকথা'—তার মধ্যেও এই বিদ্রোহই প্রধান। যুগে-যুগে কালে-কালে তার রূপ বদলেছে মাত্র। কুসংস্কার অবিচার ভুলবোঝা অবহেলা এসবেরও চেহারা পাল্‌টেছে—(চিত্রলেখার আধুনিকতা-প্রীতিও একটা কুসংস্কার) কিন্তু মূল সত্যে কোন তফাৎ ঘটেনি, চিরন্তন নারীকে যুগে যুগেই তাই বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হয়েছে, একা লড়তে হয়েছে এই আপাত-অদৃশ্য অথচ শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সঙ্গে।

আশাপূর্ণা বিদ্রোহিণী বর্তমান কালের উচ্ছ্বাস-উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধেও। তাঁর প্রথম উপন্যাস থেকে শুরু করে আধুনিকতম উপন্যাস 'বকুল-কথা' পর্যন্ত ধরে হিসেব করলে বুঝতে পারা যাবে, শুধু একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁর সমগ্র সাহিত্যের পরিচায়ক নয়। যেখানে নারীসত্তার প্রতি অবিচার, অত্যাচার সেখানে তিনি নিঃসন্দেহে বিদ্রোহিণী, আবার যেখানে নারীর উদগ্র আধুনিকতা সমাজকে—নিজেকে—নিজের সংসারকে বিনষ্ট করতে উদ্যত সেখানেও তিনি সমশক্তি নিয়েই তীক্ষ্ণ সমালোচক—হয়তো বা রক্ষণশীলই বেশী রকম। আসলে যা নারীর তথা মানুষের সমাজের পক্ষে কল্যাণকর মঙ্গলময় নয় বলে তিনি মনে করেছেন, তারই বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করেছেন—তা প্রাচীনই হোক্ আর নবীনই হোক্। তাঁর এই বিশ্বাসে বা মতবাদে তিনি অটল এবং এই বিশ্বাসই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মূলভিত্তি। মহাকবির ভাষায়—

> 'অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
> কুটিল কুৎসিত ক্রূর—তার 'পরে তব অভিশাপ
> বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণসম—''

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

নিবেদন

আশাপূর্ণাদেবীর পরিচয় বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের নিকট দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তিনি অর্ধ-শতাব্দীকাল বাংলা সাহিত্যে যে সোনার ফসল ফলিয়েছেন তাহা পুস্তকাকারে তো বটেই মাসিক, ত্রৈমাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে ও হচ্ছে। সেই অর্ধ-শতাব্দীকালের ফসল নানা পত্র-পত্রিকায় ও বইতে ছড়ান রয়েছে তাহা একত্রিত ক'রে পাঠক-পাঠিকাদের নিকট উপস্থিত করার মহৎ প্রচেষ্টা আমরা গ্রহণ করেছি। এর ফল স্বরূপ বের হচ্ছে আশাপূর্ণাদেবীর রচনা সম্ভার। খণ্ডে খণ্ডে রচনা সম্ভারগুলি বের করবার চেষ্টা করছি।

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হ'লো। ইহার প্রথম উপন্যাস ত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত 'প্রেম ও প্রয়োজন'ই লেখিকার প্রথম উপন্যাস। প্রথম সংস্করণে যে ভাষা ছিল তার কোন পরিবর্তন করা হ'লো না। কারণ পাঠক-পাঠিকারা বুঝতে পারবেন একজন সাহিত্যিক অর্ধশতাব্দী কাল ব্যাপী সময়ের সঙ্গে যোগ রেখে তাঁর ভাষা কতটা পরিবর্তন করেছেন। অন্যান্য উপন্যাস গল্পগুলিও পাঠক সমাজের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত এবং এখনও সমাদর লাভ করবে আশা করি।

গ্রন্থাবলীর কাগজ, ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি সর্বাঙ্গীন সুন্দর করবার চেষ্টা করেছি। তবে ত্রুটিও যে আছে সেটা অস্বীকার করি না। পরবর্তী খণ্ডগুলিতে সেই ত্রুটি দূর করবার বিশেষ চেষ্টা ক'রবো।

কলিকাতার পুস্তক প্রকাশকদের মধ্যে দেশী ও বিদেশী লেখকদের গ্রন্থাবলী প্রকাশের বিরাট প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। ফল স্বরূপ 'গ্রাহক করা' ও কিছু কমিশনের ব্যবস্থা। অনেক 'গ্রাহক' ও বাঙালী পাঠক-পাঠিকার মনে সন্দেহ জেগেছে শেষ পর্যন্ত গ্রন্থাবলী পাওয়া যাবে কিনা। আমাদের লক্ষ্য 'গ্রাহক' হবার বিড়ম্বনার হাত থেকে ও অনিশ্চয়তার হাত থেকে পাঠক-পাঠিকাদের রেহাই দিয়ে যথাসময়ে যাতে তাঁরা বইটি পান তাহার ব্যবস্থা করা।

দ্বিতীয় খণ্ড ছাপা আরম্ভ হয়েছে। এতে লেখিকার বিখ্যাত উপন্যাস 'সুবর্ণলতা' ও আরও অন্যান্য গল্প ও উপন্যাস থাকবে।

সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয় মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন এজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থাবলী প্রকাশনার জন্য শ্রদ্ধেয় শ্রীকালিদাস গুপ্ত মহাশয়ের কাছে যে অকৃপণ সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভ করেছি সেজন্য তাঁহাকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রকাশক

প্রেম ও প্রয়োজন

উত্তর কলিকাতার এক অপরিসর গলির এক প্রান্তে যে পতনোন্মুখ বাড়িখানি তাহার হাড়-পাঁজরা-সার দেহখানি লইয়া দীর্ঘকাল একই অবস্থায় টিঁকিয়া আছে, তাহারই রোয়াকের উপর বসিয়া সকালের রৌদ্রে পিঠ দিয়া কয়েকটি যুবক উদ্দাম তর্কের ঝড় তুলিয়াছিল।

তর্কের বিষয়বস্তু যাহাই হউক সাদা বাংলায় ইহাকে আড্ডা দেওয়াই বলে এবং দেখিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে—যুদ্ধের চাহিদায় বেকার-সমস্যার অনেকটা সমাধান ঘটিলেও ইহাদের কাছে সমস্যাটা সমস্যাই রহিয়া গিয়াছে।

সিমেণ্ট চটিয়া যাওয়া, থাপ্‌রি ওঠা, ভাঙ্গা রোয়াকে বসিয়া আধ-ময়লা র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া ইহারা কথা কয় বড় বড়, আদর্শ গড়ে বিরাট, আর স্বপ্ন দেখে অসম্ভবের।

ইহাদের মধ্যে প্রবীর বলিয়া ছেলেটিই শুধু অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে; তাহার বেশভূষার বৈশিষ্ট্য বাদ দিলেও, চেহারার লাবণ্য, মুখের সৌকুমার্য্য, সহজেই তাহার আভিজাত্যের প্রমাণ দেয়।

তাহারই দিকে লক্ষ্য করিয়া সমর কহিল—তোমার কথা বাদ দাও না, সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মেছ, দুনিয়ার হালচাল তো কিছু জানলে না; তোমাদের মত নাড়ুগোপালদেরই বিয়ে করা মানায়।...আমরা—যারা লোহা পিটবো, কুলি খাটবো, রিক্‌শা টানবো, তাদের জন্যে বিয়ে নয়।

প্রবীর মৃদু হাসিয়া কহিল—[illegible]নি বাসন মাজবে, সাবান কাচবে, বাটনা বাটবে, এমন মেয়েরও তো অভাব নেই।

—অভাব হয়তো নেই, কিন্তু আমি চাই না যে আমার স্ত্রী এসে বাসন মাজবে, সাবান কাচবে, বাটনা বাটবে।

—কিন্তু তুমি যদি লোহা পিটতে পারো, তোমার স্ত্রীই বা কেন বাসন মাজতে পারবে না শুনি?

কথাটা অপর কেহ বলিলে হয়তো সাধারণ তর্কের পর্য্যায়ে ফেলা হইত, কিন্তু প্রবীর ধনীর সন্তান বলিয়াই বোধ করি ইহার মধ্যে অহঙ্কারের গন্ধ আবিষ্কার করিয়া সমর ঝাঁজালো গলায় উত্তর দিল—ভালবাসার জিনিস সকলেরই সমান, বুঝলে প্রবীর? অবস্থার গতিকে আমাদের ছোট কাজ করতে হতে পারে, তাই বলে—ভালবেসে যাকে ঘরে আনবো তাকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে না পারলে, স্বাচ্ছন্দ্য দিতে না পারলে, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে এটা কি করে আশা করছো তুমি? স্ত্রীকে 'দাসী' বলবার যুগ চলে গেছে বলেই আমরা আজ বিয়ে করতে ভয় পাই, কুণ্ঠিত হই।

প্রবীর হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া কহিল—তোমার ভাষার ছটা আর কথার ঝাঁজ দেখে মনে হচ্ছে ভয় কেটে এসেছে।

—অর্থাৎ ?

চাপা কপাল আর উদ্ধত চোয়ালের জন্ম সমরের মুখটায় আনিয়াছে একটা পৌরুষের ছাপ, স্বভাবটাও তেমনি তাহার উদ্ধত। সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া যেন খাড়া দাঁড়াইয়াছে অস্ত্রে শান দিয়া।

পাড়ার ছেলে প্রবীর, ছেলেবেলা হইতেই একত্রে স্কুলে গিয়াছে, স্কুল পলাইয়াছে, লাট্টু ঘোরাইয়াছে, মার্কেল খেলিয়াছে, কিন্তু তবু—প্রবীরকে দেখিলে সমরের রাগে গা জ্বালা করে, কথা শুনিলে বিষ লাগে। সমরের ক্রুদ্ধমুখের "অর্থাৎ" শুনিয়া কিন্তু প্রবীরের হাসি বন্ধ হইল না, সে তেমনি হাসিমুখে কহিল—অর্থাৎ মনে হচ্ছে যাঁকে ভালবেসেছ তাঁকে ঘরে আনতে বিলম্ব সইছে না।

—তার মানে ভালবাসাটা তোমাদের মত বড়লোকের নাড়ুগোপালদের একচেটে, কি বল ?

মানেটা অবশ্য প্রাঞ্জল নয়, এবং কেবলমাত্র কলহ বাধাইবার জন্য "ধান ভানতে শিবের গীতের" মত একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা আনিয়া ফেলায় উপস্থিত সকলেই সমরের উপর বিরক্ত হইল।

আবহাওয়াটা হালকা করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে অমরেশ একটু আড়ামোড়া ভাঙিয়া কহিল —ভালবাসার রাইট নিয়ে যদি তর্কই ফাঁদতে হয় তো রোসো এক পেয়ালা করে চা খেয়ে নেওয়া যাক।

অমরেশ এই বাড়ীরই ছেলে, এবং ইহাদের রোয়াকে আড্ডাটা বসে বলিয়া মাঝে মাঝে চায়ের খরচটাও যোগাইতে হয় তাহাকেই। আবার ভাঙা রোয়াকে ছেঁড়া মাদুর বিছাইয়া যেদিন ব্রিজের আসর বসে, সেদিন ঘন ঘন চায়ের ফরমাসে [illegible] কর্ত্রী উত্যক্ত হইয়া উঠেন।

অমরেশ যে তাহা না জানে এমন নয়, তবু বাড়ীর ভিতরের অনেক রকম কথা হজম করিয়াও সে বন্ধু মহলে নিজের যথার্থ অবস্থাটা গোপন রাখিতে চেষ্টা করে।

শীতের সকালে সহনীয় রৌদ্রটা তখন ধীরে ধীরে মাত্রা ছাড়াইতে সুরু করিয়াছে, তাহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রবীর কহিল—থাক্‌না, আবার এখন চায়ের হাঙ্গামা কেন অমরেশ ? শুধু শুধু বৌদিকে জ্বালাতন করা। ভালবাসার তর্কটা না হয় মুলতুবী থাক এখনকার মত। সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে সভা ভঙ্গ হোক।

—না না, বৌদি মোটেই জ্বালাতন বোধ করেন না, খুব খুশি হ'ন—বলিয়া অমরেশ বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া গেল।

অমরেশের বৌদি আরতি কোলের ছেলের আহারপর্ব্ব সমাধা করাইয়া সর্ব্বাঙ্গে ভাতমাখা ছেলেটিকে টানিয়া কলতলায় লইয়া চলিয়াছিল, অমরেশকে দেখিয়া বিব্রতভাবে হাতের উল্টা-পিঠে মাথার কাপড়টা টানিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল—দেখেছ ঠাকুরপো, কি দুষ্টু ! খাওয়ার বেলায় বেশ ওস্তাদ, অথচ এখন শীতের ভয়ে আঁচাতে রাজী নয়।...এই গাধা, শীগগির চল্ নইলে কাকা মারবে।

ওস্তাদটি বাড়ীর মধ্যে সকলকেই অবজ্ঞার চোখে দেখেন, কিন্তু কোন্ অজ্ঞাত কারণে বলা শক্ত কাকাকে অপেক্ষাকৃত সমীহ করিয়া চলেন। কাজেই অনিচ্ছুক গতিটা মুহূর্তে পরিবর্তন করিয়া বাধ্য ছেলের মত তিনি গুটিগুটি মায়ের অনুসরণ করিলেন।

আরতি ফিরিয়া আসিতেই অমরেশ মিনতির সুরে কহিল—বৌদি লক্ষীটি, চুপি চুপি পেয়ালা চার-পাঁচ চা করে দিতে পার ?

—চা ? এখন ? অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে না ?

—আরে চায়ের আবার বেলা-অবেলা ! উনুনে আগুন নেই ?

—ও মা কী কাণ্ড, আগুন থাকবে না কেন ? কিন্তু—

এদিক ওদিক চাহিয়া আরতি গলা নামাইয়া কহিল—পিসীমা না দেখতে পান। এই খানিক আগেই বকাবকি কচ্ছিলেন।

—কি জন্যে শুনি ?

—অমরেশের রুক্ষ প্রশ্নে কুন্ঠিত হইয়া আরতি কহিল—কারণ সেই একই, 'খরচ আর খরচ', 'এরকম উড়নচণ্ডে বাড়ীতে মা লক্ষ্মী টিকতে পারেন না—' এই সব।

অমরেশের মুহূর্তের জন্য মনে হইল, থাক প্রয়োজন নাই, কিন্তু এইমাত্র বন্ধুমহলে বড়মুখ করিয়া বলিয়া আসিয়াছে—এখন কোন মুখে আবার বলিতে যাইবে সামান্য দু'চার পেয়ালা চায়ের ব্যবস্থা করিবার স্বাধীনতাও তাহার নাই, নিজের বাড়ীতে নিতান্ত পরের মতই থাকিতে হয় তাহাকে।

আরতি বোধ করি তাহার মুখের ভাবে মনের অবস্থা অনুমান করিয়া লইল, তাই আঁচলে ছেলের মুখ মুছাইয়া কোল থেকে নামাইয়া দিয়া কহিল—আচ্ছা আর ভাবতে হবে না, দিচ্ছি চুপি চুপি, একে একটু ধরো দেখি।

—তা ধরছি, কিন্তু পারবে তো ? না কি তোমায় আবার বকুনি খেতে হবে ?

—না না, ঠিক হয়ে যাবে।

লঘু ক্ষিপ্রপদে রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল আরতি।

ছেলেটিকে র‍্যাপারের মধ্যে জড়াইয়া লইয়া অমরেশ আবার বাহিরে আসিয়া বসিল। হাসিমুখে কহিল—হচ্ছে ব্যবস্থা, একটু বোস ভাই।

ভিতরবাড়ীর রৌদ্রলেশ-শূন্য দালানে, স্যাঁতসেঁতে ঘরে, ছোট্ট ছেলেটি যেন এতক্ষণ শীতে নীল হইয়া গিয়াছিল, রৌদ্রের আঁচে তাজা হইয়া কাকার কোল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টায় ঝুলোঝুলি সুরু করিল।

"কালো গৌরাঙ্গ" ঠিক পাশের বাড়ীতেই থাকে, খোকার সহিত তাহার যথেষ্ট সৌহার্দ্য আছে, তাহার ছটফটানি দেখিয়া কহিল—এই অমরেশ, ছেড়ে দেনা ওকে, আটকে রেখেছিস কেন ?

—তার কারণ এটি এখন বাবা আদমের সেকেণ্ড এডিশন্।...এই শয়তান, খবরদার নড়বি না।

কিন্তু শয়তান ততক্ষণে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

ছেলেটির রং খুব ফরসা নয়, কিন্তু নিখুঁত মুখশ্রী ও নিটোল গঠনভঙ্গী দেখিবার মত। তাছাড়া বয়স্কদের কাছে শিশুর মত লোভনীয় খেলনা আর কিছুই নাই, টানিয়া পিটিয়া নাচাইয়া দুরন্ত ছেলেকেও নাকাল করিয়া তুলিতে বিলম্ব হইল না।

অবশেষে কাঁদাইয়া ক্ষান্ত হইয়া বিজয় হাসিয়া কহিল—যাই বল অমরেশ, তোমার দাদার তুলনায় ছেলেটি যেন গোবরে পদ্মফুল।

—তার কারণ খোকা ঠিক ওর মার মত—ঈষৎ গর্বিতভাবেই অমরেশ কহিল—বৌদির চেহারা বাস্তবিকই দেখবার মত ছিল, খোকার রংটা তবু তার মায়ের মত নয়, কিন্তু সংসারের চাপে আর অযত্নে বৌদি বেচারার এখন আর কিছুই নেই।...ভালবাসার তর্ক তুলেছিলে সমর? আমাদের দাদা-বৌদির বিয়েও তো শুনেছিলে বোধ হয় 'লাভ ম্যারেজ'। জামালপুরে মেজ-পিসীর বাড়ী দাদা গিয়েছিলেন চেঞ্জে—আর বৌদি এসেছিলেন মামার বাড়ী বেড়াতে—তারপর প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। কিন্তু এখন? এখন, এই বছর সাতেকের মধ্যেই বৌদি একটি সংসারভার প্রপীড়িতা বৃদ্ধা, আর দাদা ইহলোকের অনিত্য সুখ ত্যাগ করে পরলোকের চিন্তায় মন দিয়েছেন, সারাদিনে দুটো গল্প করবারও সময় হয় না তার।

প্রবীর এতক্ষণ খোকার কান্না থামানোর চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল, পেন্সিল রুমাল প্রভৃতি পকেটস্থিত যাবতীয় বস্তু ঘুষ দিয়া যখন প্রায় বাগে আনিয়াছে তখন সহসা অমরেশের শেষ কথাটা কানে যাইতেই মুখ ফিরাইয়া সকৌতূহল প্রশ্ন করিল—পরকালের চিন্তাটা কি অমরেশ?

—শোননি বুঝি, দাদা এক গুরু করেছেন? ইয়া জটাজুটধারী অবধূত বাবা! তাঁর নির্দ্দেশে রাত তিনটে থেকে উঠে সাধনা করতে হয়, এবং এই সাধনার ফলে মনে হচ্ছে প্রায় আধ-সিদ্ধ হয়ে এসেছেন, আর কিছুদিন গেলেই পুরোপুরি সুসিদ্ধ হয়ে পড়বেন। ব্যাস্ তখন আর তাঁকে পায় কে? একেবারে শ্রীমৎ অখিলেশানন্দ স্বামী—স্ত্রী পুত্র পরিবার সব তখন তাঁর কাছে তুচ্ছ—জগৎটা স্রেফ্ ভুয়ো।

গলির ভিতর গায়ে গায়ে বাড়ী, মেয়ে মহলে যাতায়াত আছে, কাজেই তাঁদের মারফৎ বিজয় মল্লিক, কালো গৌরাঙ্গ, সমর প্রভৃতির এসব তথ্য জানা ছিল, ছিলনা শুধু প্রবীরের; কারণ তাহার মা-খুড়িমা নিজেদের প্রেষ্টিজ ভুলিয়া পাড়া বেড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে নারাজ এবং এ পক্ষও বড়লোকের ছায়া মাড়াইতে রাজী ছিলেন না।

কাজেই প্রবীর উৎসুক প্রশ্ন করিল—হঠাৎ এ রকম হবার মানে?

—মানে? দাদা বলেন—গুরু যখন যাকে কৃপা করেন—ও সব তোমার-আমার বুদ্ধির অগম্য প্রবীর!

—বৌদির তো তা'হলে খুবই কষ্ট?

—হিসেব মত তাই হওয়াই উচিত, কিন্তু এও আমার বুদ্ধির অগম্য প্রবীর, আজ পর্য্যন্ত কখনো দেখলাম না—মুখে তাঁর হাসির অভাব, কখনো দেখলাম না—দাদার ওপর এতটুকু

বিরক্তি। শেষ রাত্রে উঠে দাদার পূজোর গোছ করে দেন, মাঝ রাত্রি পর্য্যন্ত দাদার খাবার নিয়ে বসে থাকেন।

—অর্থাৎ একদা যে বিবাহকে 'লাভ ম্যারেজ' বলে উভয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন, আসলে সেটি মায়ামৃগ।—প্রবীর মন্তব্য প্রকাশ করিল।

সমর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল—কেন, তোমার তো মতে গরীবের স্ত্রীর কিছুতেই কষ্ট হওয়া উচিত নয়—বাসন মাজতে, ধান ভানতে—

—সে মত আমার বদলায়নি সমর, যদি ভালবাসা থাকে।

সমর ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে কহিল—এটা কি উল্টো কথা হ'ল না? কত বড় ভালবাসা থাকলে মানুষ এমন আত্মহারা হয়ে, নিজের সত্তা হারিয়ে আপনাকে বিলিয়ে দিতে পারে—সে আইডিয়া আছে?

—বল যে কতখানি 'ঘোড়ার ডিম থাকলে'--একটা তীক্ষ্ণ হাসির রেখা মুখে আনিয়া প্রবীর কহিল—নিঃস্বার্থ ভালবাসা হচ্ছে 'সোনার পাথরবাটি', বুঝলে সমর? যেখানে অভিমান নেই, সেখানে ভালবাসা আছে এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আজও নেই, কোনদিনও ছিল না।

আলোচনাটা নিতান্তই ব্যক্তিগত বলিয়া অমরেশ একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, উদ্ধার করিলেন আলোচ্য ব্যক্তি স্বয়ং—ভিতর বাড়ী হইতে দরজার শিকলটা নড়িয়া উঠিল।

চা প্রস্তুত হইয়াছে তাহারই সঙ্কেত।

ট্রের পরিবর্ত্তে একখানি কাঠের পীঁড়ির উপর গুটি পাঁচেক চায়ের কাপ লইয়া অমরেশ ফিরিয়া আসিল। অবশ্য সব কয়েকটিকে কাপের মর্য্যাদা দিলে সত্যের অপলাপ হয়, অমরেশের নিজের চা ছিল চটা-ওঠা একটি এনামেলের গ্লাসে, এবং কালো গৌরাঙ্গ ঘরের ছেলের মত বলিয়া তাহার জন্য একটি পিরিচ-বিহীন একাকিনী পেয়ালা।

তবু মহোৎসাহে চা খাওয়া সুরু হইল, বৌদির চায়ের হাতটা যে বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য সে বিষয়ে নতুন করিয়া আর একবার সার্টিফিকেট দেওয়া হইল।

বেলা রীতিমত বাড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া তর্কের ঝড় ঈষৎ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল, প্রবীরের ভৃত্য আসিয়া ডাক দিতেই সভা ভঙ্গ হইল।

সমর সবিদ্রূপ হাস্যে কহিল—যাও নাড়ুগোপাল, বেলা হলে পিত্তি প'ড়ে সোনার অঙ্গ কালি হয়ে যাবে, ননীর শরীর গলে পড়বে—সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে ঘুম দাওগে।

জামার আস্তিন গুটাইয়া—সত্যই সোনার মত রঙের সুপুষ্ট বাহুখানি সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিয়া মৃদু হাসিয়া প্রবীর কহিল—গলে পড়বে? এত সহজে নয়, তবে ডিসিপ্লিন ভাঙা আমি পছন্দ করি না।

খোকাকে আবার র‍্যাপারের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিতেই অমরেশ দেখিল পিসীমা বধূকে লইয়া পড়িয়াছেন।

অমরেশকে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন—ওই যে সোহাগের দেওর এসেছেন, যাও এখন চোখে নোনাপানি ঝরিয়ে লাগাও গে সাতখানা করে?

—কি হ'ল পিসীমা ?

—হ'ল আমার পিণ্ডি ছেরাদ্দ। বলি—এত কিসের আস্পর্দ্ধা ? পই পই করে বারণ করিনি—রান্নাঘরের কাপড়ে ভাঁড়ারে ঢুকোনা, হাঁড়ি কলসী নেড়ো না—কথা গেরাহ্যি হয় না ? থপ্ করে গিয়ে ভাঁড়ারে হাত দিয়ে চিনি নেওয়া ? কিসের জন্যে ? দফে দফে চা চাই—কেন ? এত নবাবি কি জন্যে ? দুধ-চিনি অমনি আসে ? পয়সা লাগে না ?

অমরেশ উত্যক্ত হইয়া কিছু বলিতে যাইতেছিল, আরতি অলক্ষিতে দুই হাত জোড় করিয়া ইঙ্গিতে মিনতি জানাইল। তাহার সপক্ষে কিছু বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র, লাঞ্ছনা বাড়িবে বই কমিবে না।

অমরেশও তাহা না জানে এমন নয়, তাই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল—চা আমি করতে বলেছিলাম পিসিমা।

—তা জানি বাছা, তুমি বলবে না তো কি আমি বলবো ? আমার 'সই' 'গঙ্গাজল' এলে দুটো পান দিয়েও মান রাখতে যাবে না তোমাদের বৌ তা জানি—কিন্তু তুমিই বা কোন আক্কেলে যখন-তখন চায়ের ফরমাস করে পাঠাও শুনি ? বয়েস তো কম হয়নি, বোঝ তো সব, জিনিস তো গাছে ফলে না—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আনতে হয়।

অবশ্য মনে করিবার হেতু নাই যে পিসীমাকেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করিতে হয়, কিন্তু পিসীমার বাক্য-রচনা প্রণালীই এইরূপ।

শৈশবে মাতৃহারা শিশুদের ভার লইতে তিনি যে দিন এ সংসারে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সে দিন অমরেশের পিতা অবিনাশ অশ্রুসজল কণ্ঠে কহিয়াছিলেন—আজ থেকে ছেলে দুটোর সঙ্গে এ সংসারের সব ভারই তোর ওপর পড়ল কেষ্ট, এর ভালোমন্দ দেখতেও তুই, খরচ-পত্তর দেখতেও তুই, তোর বৌদি তো নিজের বোঝা হালকা করে চলে গেলেন।

তদবধি কৃষ্ণবালা এই দুরূহ বোঝাটি মাথায় লইয়া দাদার উপদেশের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

সেকাল হইলে এবং স্ত্রীলোক না হইলে বোধ করি ইঁহার প্রবল দাপটে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খাইত, এবং এই ত্রুটিটুকুর জন্যই শুধু সেই প্রবল দাপটের ঝাপটটা খাইতে হয় সংসারের বেচারা কয়টি প্রাণীকে।

কিন্তু আরতিকে যতটা পোহাইতে হয় এমন আর কাহাকেও নহে।

অমরেশকে স্নানের তাগিদ দিবার ছুতায় তাহার ঘরে গিয়া আরতি ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল—আর একটু হলেই তুমি পিসীমার কথার জবাব দিয়ে বসেছিলে! কী কাণ্ডটা যে হ'ত তা'হলে—লক্ষ্মীটি ভাই একটু সয়ে যেও, অন্ততঃ আমার মুখ চেয়ে।

—ঠিক সেই জন্যেই সয়ে যাই বৌদি, কিন্তু বলতে পারো কেন ? কোন্‌কালে অজ্ঞানে কি উপকার করেছিলেন বলে—চিরকাল পদানত হয়ে থাকতে হবে ? এ কী 'কর্ত্তার ভূত' এ সংসারের ঘাড়ে চেপে বসে আছে বলতো ? কেন মানবো, কেন ভয় করবো, তার কারণ থাকবে না ?

পিসী মা যে নিঃশব্দে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন কে জানে, সহসা উভয়কে চমকাইয়া দিয়া তাঁহার কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল—

—ওগো নাই বা মানলে, নাই বা চিনলে, আমি তো তোমাদের গলগ্রহ হতে এ বাড়ীতে পা দিইনি ? পায়ে ধরে নিয়ে এসেছিল দাদা, তাই এসেছিলাম। এখন মানুষ হয়েছ, বৌদি চিনেছ, বৌদি 'ঠাকুরপো ঠাকুরপো' বলে গদগদ হয়ে কোলের গোড়ায় ভাতের থালা ধরে দিতে শিখেছে, এখন আমায় দরকার কি ? দাওনা, লাথি মেরে দূর করে দাও—মুড়ো খ্যাংরায় ঝেঁটিয়ে আপদ বিদেয় করো—একবেলা একমুঠো আলোচাল, তাও তোমাদের সংসারে অমনি খাইনে, বসে খাইনে, যেখানে গতর খাটাবো সেখানেই পাবো।

ব্যাকুলভাবে আরতি পিসীমার হাত ধরিয়া সানুনয়ে কহিল—দোহাই পিসীমা, আপনার পায়ে পড়ি আমার মাথা খান, চুপ করুন, ঠাকুরপো ছেলেমানুষ, কি বলতে কি বলেছে—

পিসীমা জিহ্বা ও তালু সংযোগে একটা অবজ্ঞাসূচক ধ্বনির সৃষ্টি করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন —মরে যাই লো, কি আমার ছেলেমানুষ, বয়সে বে হলে, সাতটা ছেলেমানুষের বাপ হতেন। এক পয়সার মুরোদ নেই, চব্বিশঘণ্টা গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াচ্ছেন, আর খোকার মতন 'বৌদি বৌদি' করে সাতবার রান্নাঘরে উঁকি দিচ্ছেন, তাই ছেলেমানুষ, কচি খোকা! তাও বলি বৌমা—তোমারই বা অতবড় দেওরের সঙ্গে হরঘড়ি এত ফুসফুস গুজগুজ কিসের? কথায় বলে—সোমত্ত ছেলে-মেয়ে আগুন আর ঘী, শাস্তর তো আর গায়ের জোরে মিথ্যে হয়ে যাবে না।

অমরেশ কথার প্রারম্ভেই চলিয়া গিয়াছিল, আরতিও ধীরে ধীরে সরিয়া আসিল।

—যাই, ওদের ছোট বৌটা আমার হাতের কৎবেলের আচার খেতে চেয়েছিল, দিয়ে আসি এক ফোঁটা—বলিয়া পিসীমা 'ওদের বাড়ীর' উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

প্রবীর বাড়ীর ভিতর পা দিতেই মন্দিরা অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল—বারে দাদাভাই, তুমি এত বেলা করলে যে বড়? আমার বুঝি খিদে পায় না?

—খিদে পেয়েছিল, খেয়ে নিলেই পারতিস, আমার সঙ্গে এক টেবিলে বসতেই হবে এমন কিছু মাথার দিব্যি দিয়ে যাইনি তো?

ত্রুটি স্বীকারের পরিবর্তে প্রবীরের মুখে এইরূপ হৃদয়হীনের মত নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া অভিমানিনী মন্দিরার দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সে আদরিণী, সর্ব্বদা সকলে তাহাকে আদর করিবে ইহাই এ বাড়ীর রীতি, তাহার এতটুকু ব্যতিক্রম হইলেই সর্ব্বনাশ।

প্রবীর একবার ভাবিল ক্ষমা প্রার্থনার ছুতা করিয়া একটু আদর করিয়া যায় কিন্তু মনটা কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল তাই সাবান-তোয়ালে লইয়া স্নানের ঘরে ঢুকিয়া গেল।

প্রবীরের মা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যতীন মুখুজ্যের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, বিবাহের বৎসরখানেক পরেই একটি সন্তান প্রসব করিয়া তিনি সেই যে ইস্তফা দিলেন, ষষ্ঠীদেবী আর তাঁহার পাত্তা পাইলেন না।

অনেকে তাঁহাকে নিঃসন্তান বলিয়াই মনে করে, প্রশ্ন করিলে তিনিও হাসিয়া বলেন—পাগল, আমার আবার ছেলে কই? ছেলেমেয়ে সবই ওপক্ষের।

তাছাড়া তাঁহার অপূর্ব্ব রূপ ও অটুট স্বাস্থ্য দেখিলে প্রবীরের পিঠোপিঠি দিদি বলিয়া ভ্রম হয়। অসময়ে যতীন মুখুয্যে যখন পাকাচুলের উপর টোপর চাপাইলেন, ঘরে-পরে সকলেই চোখ টেপাটেপি করিয়াছিল, কিন্তু বৌ দেখিয়া সকলের চোখের তারা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। এমন রূপ দেখিলে যে বুড়ারও মাথা ঘুরিয়া যাওয়া বিচিত্র নয়,একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

প্রথম পক্ষের বড় মেয়ে সতীরাণী জ্যোতির্ম্ময়ীর চাইতে বয়সে বেশ কিছু বড়, তাহারই দৌহিত্রী এই মন্দিরা। অনেকগুলি ভাইবোনদের ভিতর হইতে একটিকে শৈশবাবস্থাতেই জ্যোতির্ম্ময়ী চাহিয়া লইয়াছিলেন—মানুষ করিবার সখে, মন্দিরা অনেকদিন অবধি তাঁহাকে নিজের মা বলিয়াই বিশ্বাস করিত।

এ বাড়ীতে তাহার একচ্ছত্র আধিপত্য।

যতীন মুখুয্যে কারবারি লোক, স্নানাহারের নিয়ম যথাযথ মানিয়া চলা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। বৃদ্ধ হইলেও তাঁহাকে কাজকর্ম্ম দেখাশোনা করিতে হয়। ইদানীং ধুয়া তুলিয়াছেন বটে প্রবীর সব বুঝিয়া লউক, কিন্তু প্রবীর সভয়ে পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়ে। বাবা, বাবার অফিস, বাবার হিসাবের খাতা—এমন কি দোকানের কর্ম্মচারীদিগকে পর্য্যন্ত সে সমান ভয় করে।

ছোট অতীন মুখুয্যে উকিল মানুষ, তাহার সব নিয়ম বাঁধা। তস্য গৃহিণী অরুণপ্রভাও তাই। প্রায় আধ-কুড়ি সন্তান সন্ততির জননী হইয়াও তিনি ডিসিপ্লিন রক্ষা করিয়া চলেন। মেদ বাহুল্যে নীচে নামা কষ্টকর বলিয়া তাঁহাদের টেবিল পড়ে উপরেই। বয়সে ছোট অথচ মান্যে বড়, বড় জায়ের সহিত ঠিক কোন সম্পর্ক রাখিয়া চলা উচিত সেটা বুঝিতে না পারার জন্যই বোধ করি উক্ত গোলমেলে বস্তুটিকে সযত্নে আজও পরিহার করিয়া চলেন।

আহারের স্থানে মন্দিরাকে না দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী বিস্মিত হইলেন। ঢিলে পায়জামার উপর হাফ্‌সার্ট চাপাইয়া আঁচড়ানো চুলের উপর সাবধানে হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রবীর আসিয়া কহিল—কই, তৃতীয় ব্যক্তিটি কই?

—তাই তো দেখছি, আমি বলি দু'জনেই আসছিস বুঝি একসঙ্গে।…ও শ্রীপতি, দেখতো বাবা দিদিমণি কোথায় গেল?

প্রবীরের বুঝিতে বিলম্ব হইল না মন্দিরার রাগ ভাঙে নাই। হাসিয়া কহিল—রোসো মা, আমি ডেকে আনছি, খুকুমণি বিষম চটেছে।

পড়ার ঘরে একখানি ইতিহাসের বই খুলিয়া মন্দিরা গম্ভীর মুখে বসিয়াছিল, প্রবীর তাহার ধ্যাননিরত মূর্ত্তি দেখিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

মন্দিরা অবশ্য ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাই কিছুমাত্র না চমকাইয়া ধীরভাবে বইয়ের পাতা উল্টাইল।

হাতের বইখানা টানিয়া লইয়া প্রবীর কহিল—নাতনি, রাগটা কি খুব বেশী?

—আঃ! ভাল হবে না বলছি, বই দাও।

তাহারই অনুকরণ করিয়া প্রবীর কহিল—বারে তুমি এখন বই পড়বে, আর আমার বুঝি খিদে পায়না?

—খিদে পায় খেয়ে নাওগে না—আমার সঙ্গে এক টেবিলে খেতেই হবে এমন কিছু মাথার দিব্যি নেই।

—হয়েছে, আমার অস্ত্রে আমাকে সংহার। বেশ এখন কান মুলছি, মানভঞ্জন হোক।

হাসি চাপিয়া রাখা দুষ্কর। অতএব মুখটা আরো ভারী করিতে হয়।

—বাঃ চমৎকার হাঁড়িমুখ করতে পারোতো—ফার্ষ্ট প্রাইজ পাবার যোগ্য, কিন্তু চল্ এখন খেয়ে নিবি, মা অনেকক্ষণ বসে আছেন। শোন্ তোর সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে। একটা কাজ করতে হবে তোকে।

বিবাদ ভুলিয়া মন্দিরা সোৎসুকে কহিল, কি?

—বলছি পরে।

—না, এখনই বল।

—এখন বলব না।

—না, এখুনি শুনবো।

—আহ্লাদী! আচ্ছা অমরেশকে চিনিস তো?

—চিনি না আবার? আগে তো সে-ই কত আসতো ক্যারম্ খেলতে। বিশ্রী রকমের ভাল খ্যালে, সকলকে হারিয়ে দেয়, সেই জন্যেই তো আর খেলি না।

—ওদের বাড়ী বেড়াতে গেলে পারিস।

—কী দায় পড়েছে? যা ওর পিসী, বাব্‌বা! গঙ্গা নাইতে যায় আর রাস্তার ছেলেদের যা-তা গালাগাল দিতে দিতে যায়, কে যাবে ও বাড়ী?

—ওর বৌদি কিন্তু খুব ভালো মেয়ে, একটু গল্পটল্প করবি গিয়ে—কিংবা ডেকে এনে মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেও পারিস।

—হঠাৎ?

—এমনি, বেচারা বড় দুঃখী। সত্যি আমাদের বাঙালীর ঘরের মেয়েরা মুখ বুজে কত কষ্ট সহ্য করে কেই বা তার সন্ধান রাখে?

—খুব বুঝি কষ্ট, দাদাভাই?

—কষ্ট? তাই তো মনে হয়—কেমন অন্যমনস্ক ভাবে প্রবীর যেন নিজের উদ্দেশেই কথা কয়, মেয়েরা কষ্টকে হাসিমুখে সহ্য করে কেমন করে দেখতে ইচ্ছা করে তার।

—দিদিমণি, মা বলছেন আপনারা কি আজ খাবেন না?

শ্রীপতি আসিয়া তলব দিল।

—যাচ্ছি যাচ্ছি, চল।

ব্যাপক অর্থে 'ও বাড়ী' অর্থাৎ কালো গৌরাঙ্গ ও অমরেশদের বাড়ী।

পরিহাসের সম্পর্ক ছিল কিনা বলা যায় না—কিন্তু গৌরাঙ্গের নামকরণকালে যিনি উক্ত কাজের ভার লইয়াছিলেন পরিহাস প্রবৃত্তিটা তাঁহার তখন বোধ করি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

কাজেই সম্বোধন কালে কেমন করিয়া যেন গৌরাঙ্গ নামের পূর্ব্বে একটি উপসর্গ আসিয়া জুটিল। শিশুকাল হইতে গৌরাঙ্গ উক্ত উপসর্গটি অগ্রে লইয়া সংসারে চরিয়া বেড়াইতেছে।

অমরেশের বাড়ীর এক দেয়ালেই ইহাদের বাড়ী। এ বাড়ীও কম জীর্ণ নয়, কিন্তু একতলা বলিয়া অপেক্ষাকৃত কম ভয়ঙ্কর দেখায়। পুরুষানুক্রমে এই দুইটি পরিবার পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছে।

সদ্ভাব আছে বলিয়াই যে বিবাদের অভাব আছে এমন নয়। কখনো দুই পরিবারে কথা বন্ধ হইয়া যায়, মুখ দেখাদেখি থাকে না, দুই বাড়ীর যাতায়াতের সহজ পথটায় তালা-চাবি পড়ে, ছোট ছেলেদের ঠ্যাং ভাঙিবার ভয় দেখাইয়া অপর পক্ষের এলাকায় যাওয়া নিবারণ করিতে হয়, বাড়ীর মেয়েরা শ্রুতিগোচর স্থান হইতে শুনাইয়া শুনাইয়া ও পক্ষের নিন্দাবাদ করে, বাড়ীর পুরুষরা গলির মোড়ে দেখা হইলে না-দেখার ভান করিয়া ঘাড় গুঁজিয়া সরিয়া পড়ে।

আবার এক সময়—সুখে দুঃখে বিপদে আপদে মাঝের দরজার তালাচাবি খুলিয়া যায়, মেয়েরা অন্তরঙ্গ সখীত্বে গদগদ হইয়া আলাপ করে, ছোট ছেলেরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে, পুরুষরা ধীরে ধীরে এ বাড়ীর তাসের আড্ডায় আসিয়া উকি দেয়।

ছোটরা বড় হয়, বড়রা বুড়া হইয়া পড়ে, বধূরা গৃহিণীপদ পায় গৃহিণীদের শিথিল-মুষ্টি হইতে রাজ্যপাট খসিয়া পড়ে। সকলের শিক্ষা দীক্ষা আচার ব্যবহার সমান নয়, এক একজনের আমলে এক এক রকম ভাবের আদান প্রদান চলে।

বর্ত্তমানে উভয় পরিবারে বিশুদ্ধ বাংলায় যাহাকে বলে—গলায় গলায় ভাব।

মাঝের দরজাটা খুলিয়া কেষ্টবালা কণ্ঠে মধু ঢালিয়া কহিলেন—অ ছোট বৌ, কই গো কোথায়?

ছোট বৌ অর্থাৎ গৌরাঙ্গর মা ত্রস্তব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন—ঠাকুরঝি ডাকছো নাকি?

—এই যে একফোঁটা কৎবেলের আচার এনেছিলাম, বলি পোয়াতি মানুষ মুখ ফুটে সেদিন বললি।

ছোট বৌ লজ্জিত ভাবে হাত পাতিয়া পাথরবাটিটা লইয়া কহিল—তোমার যেমন বাতিক,

বলেছিলাম বলেই অমনি ছুটে দিতে এসেছ ? আর ভাই বুড়ো বয়সে এই সব কাণ্ড, লজ্জায় মরে যাচ্ছি, এখন আর—

—মরণ আর কি, তোরাও যদি বুড়ো হলি তা'হলে আমরা কোথায় আছি লো ? এই তো কাচ্চা বাচ্চা পাঁচটা হবার বয়েস।

সাতটি সন্তানের জননীর পক্ষে এতটা ভালবাসা বরদাস্ত করা শক্ত, তবু তোষামোদের মোহিনীশক্তিতে মুগ্ধ ছোট বৌ গলিয়া গিয়া কহিল—আশীর্ব্বাদ করো ঠাকুরঝি, আর না। আমার গোরা এই ষেঠের কোলে পঁচিশে পা দিলো, এখন ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ আনবো কবে তাই ভাবছি, মাঝখান থেকে আবার এই—

—তা হোক, এয়োস্ত্রী মানুষ ও কথা বলতে নেই। তা গোরার বিয়ের কি করছিস ?

—আর বিয়ে ! ছেলে তো একেবারে ঝাড়া জবাব দিচ্ছে বিয়ে করবে না বলে। কি যে এখনকার ফ্যাসান হ'ল !

—ও মা ! বিয়ে করবে না কি ? ছেলে বললেই শুনতে হবে ? জোর করে দিবি। উচকা বয়েস, বিয়ে না করে স্বভাব চরিত্তির ঠিক রাখতে না পারলে ? কোনদিন কি বদনাম শুনবি, তখন ঘেন্নায় মরে যাবি।

নিজের সন্তান সম্বন্ধে এ হেন আলোচনাটা শ্রুতিমধুরও নয়, গৌরবজনকও নয়। গৌরাঙ্গ-জননী নিস্পৃহভাবে উত্তর দিল—তোমরা সব বলে কয়ে দেখনা ঠাকুরঝি, আমায় তো ছাই মানে।

—বলবো, একেবারে মেয়ে নিয়েই বলবো—গঙ্গার ঘাটে একটি মেয়ে দেখেছি সেদিন, খাসা ছিরি ছাঁদ, সন্ধান নিয়ে দেখলাম তোদেরই পালটি ঘর। বড় বৌকে নিয়ে একদিন যাবো তাদের বাড়ী গঙ্গাচানের ছুতোয়।···কই কোথায় গেল বড় বৌ ?

—দিদি এই গেলেন ছাতে, চারটি বড়ি দিতে।

—বড়ির কথা আর বলিসনে ছোট বৌ, বারো আনা এক টাকা সের ডাল, চোদ্দ আনায় এমনি এতটুকু একটা ছাঁচি কুমড়ো—কোত্থেকে খাবি বড়ি ?

—তা যা বলেছ ঠাকুরঝি,—প্রসঙ্গের পরিবর্ত্তনে ছোট বৌ একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

—আর আমাদের বাড়ীর নবাব নন্দিনীটি হয়েছেন তেমনি—দুটো ডাল ভাত সেদ্ধ করতেই তাঁর দিন কেটে যায় তো বড়ি আচার করবে কখন ? আমি বুড়ো মাগী যদি করলাম তো হ'ল।

ছোট বৌ সোৎসাহে কহিল—হরি বল, ওইটুকু সংসারের রান্না, তাতেই বৌমা সময় পায় না ? আমাদের মতন হলে টের পেত। হ্যাঁ ঠাকুরঝি, অখিল নাকি সত্যিই সন্ন্যাসী হবে ?

—কি জানি ভাই। ছেলের ধরন ধারণ দেখলে তো গায়ে জ্বর আসে। ওই পুজো-আচ্চা জপতপ নিয়েই আছে, বলে নাকি চাকরীও ছেড়ে দেবে।

গোপন করিবার কারণ না থাকিলেও ছোট বৌ ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল—আচ্ছা ঠাকুরঝি, বৌমার সঙ্গে বুঝি তেমন 'ইয়ে' নেই ? নইলে—ব্যাটা ছেলে, সোমত্ত বয়েস, অমন সোনার প্রতিমা ঘরে থাকতে ধম্ম ধম্ম বাতিক কেন ?

তাচ্ছিল্য ও বিরক্তির সংমিশ্রণে উদ্ভূত একটি উৎকট মুখভঙ্গী করিয়া কৃষ্ণবালা কহিলেন —তবে আর বলছি কি? মেয়েমানুষ, একটু নেটিপেটি একটু গায়েপড়া ভাব দেখা—চব্বিশ ঘণ্টা কাছে কাছে থাক্, কান্নাকাটি কর—তা না ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে বেড়াচ্ছে। পোড়ার মুখে হাসিরও কামাই নেই এক দণ্ড।

ছোট বৌ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—কে জানে কেমন মন, আমরা তো এই বুড়ো হয়ে মরতে যাচ্ছি, তবু লজ্জার মাথা খেয়ে বলছি তোমার কাছে—একদিন এদিক উদিক হবার জো নেই।

—তবে? তোরাই বল্? ওই সর্ব্বনাশীর খিষ্টানী মেজাজের গুণেই বাছা আমার বৈরাগী হ'ল—বলিয়া কৃষ্ণবালা চোখের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিলেন।

—ওখানে কে?

—উঠানের ওপার হইতে সমরের বিধবা দিদি উষারাণী উত্তর করিল—আমি গো কেষ্টপিসী। তুমি কতক্ষণ?

কেষ্টবালা ইহাকে দেখিতে পারেন না—স্পষ্টবক্তা বলিয়া ইহার দুর্নাম আছে।

উত্তরে মুখটা ঘুরাইয়া অবহেলার ভঙ্গীতে কহিলেন—আমার আবার দিন ক্ষণ, সর্ব্বক্ষণই আসছি যাচ্ছি, তোমাদেরই সেজে গুজে বেড়াতে আসা।

উষারাণী গায়ের র‍্যাপারটা ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া কহিল—এই একাদশী নইলে তো সময় হয় না—ভাবলাম যাই একবার এ-বাড়ী ও-বাড়ী বেড়িয়ে আসি, বেলা ছোট হয়েছে তেমনি, এক মিনিট সময় পাবার জো নেই।

—কি জানি মা তোমাদের কিসে এত সময়ের অভাব। এই তো সকাল বেলা গঙ্গায় গেছি, আহ্নিক পূজো করেছি—

উষারাণী বাধা দিয়া কহিল—তোমার তো বাবু বৌটিই সংসারের সব কাজ করে—তুমি আর সময় পাবে না কেন?

কৃষ্ণবালা ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ লো হ্যাঁ, তোরা তো তাই দেখিস? কথায় বলে না—"ছুঁড়ির তরে সোনার বাটা বুড়ির তরে মুড়ো ঝাঁটা"—বৌ যদি হেঁটে যায় তো পাঁচ আবাগীর বুকে বাজে, আর আমি বুড়ো মাগী দিনরাত চাকরাণীর মত খাটছি চোখখাগীদের চোখে পড়ে না।

উষারাণী এ পাড়ার বৌ নয়, ঝিউড়ি মেয়ে, অতএব গায়ে-পড়া গালি-গালাজ সহ্য করিয়া যাইতে রাজী হইল না।

বিদ্রূপ হাস্যে মুখ রঞ্জিত করিয়া কহিল—দুগ্‌গা দুগ্‌গা, সকাল বেলা কার মুখ দেখে উঠেছিলাম—ভর দুপুরে চোখের মাথা খেয়ে মলাম।

ছোট বৌ খণ্ড প্রলয়ের আভাসে ভীত হইয়া কহিল—ও কি কথা উষা, ছি! ঠাকুরঝি তো তোমার নাম করে বলেন নি কিছু।

—নাই বা বললেন, ঘাসের বিচি তো খাই না, বুঝি সবই। বৌটাকে যা সুখে রেখেছেন তা তো আর কারুর জানতে বাকী নেই, বললেই দোষ।

অতঃপর কৃষ্ণবালাকে ঠেকাইয়া রাখা দায় হইল।

পাড়ার লোকের কুমন্ত্রণাতেই যে বৌ বিগড়াইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ মত প্রকাশ করিয়া সগর্জ্জনে কহিলেন—তাঁহার ছাগল তিনি ল্যাজের দিকে কাটিলেই বা কাহার কি আসিয়া যাইতেছে?—কথায় কথায় আরো কথা বাড়িল।

উষারাণীর একটি আধটি তীক্ষ্ণ মন্তব্য ও কৃষ্ণবালার প্রবল গালি-গালাজের শব্দে শীতের দুপুরের অখণ্ড শান্তি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙিয়া পড়িল।

বড় বৌ বড়ির ডালবাটা মাখা হাত লইয়া নামিয়া আসিলেন। বড়-বৌয়ের বিবাহিতা কন্যা মেনকা চিঠির প্যাড্ চাপা দিয়া রঙ্গস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল।

আশপাশের অনেক বাড়ীর ছাদে, বারান্দায়, জানলায়, সুন্দরীদের সকৌতূহল মুখপদ্ম ফুটিয়া উঠিল। একটা মুখরোচক আলোচনার সুযোগ পাইয়া সকলেই যে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু থাকে না, তাহাদের তৃপ্ত মুখচ্ছবি দেখিয়া।

এমনি করিয়াই ইহাদের দিন কাটে।

আনন্দ নাই, বৈচিত্র্য নাই, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশা নাই, দিনের পর দিন একই দিনের পুনরাবৃত্তি।

সরু গলির মধ্যে গায়ে গায়ে লাগা ঘিঞ্জিবাড়ীর জীর্ণ দেওয়াল ভেদ করিয়া বাতাস উদারতার বাণী বহিয়া আনেনা, আকাশ আলোর আমন্ত্রণ পাঠায় না। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত, দিনের হিসাবে আসা যাওয়া করে মাত্র।

মানুষের পঙ্কিল নিঃশ্বাসে মানুষের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে।

বঞ্চিত বলিয়াই ক্ষুধাতুর ঈর্ষায় পরস্পরকে আঘাত করে।

অল্প লইয়া জীবন কাটাইতে হয় বলিয়াই অত্যল্পের জন্য হানাহানি করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অন্তরের ঐশ্বর্য্যের সন্ধান রাখে না বলিয়াই অন্তরের দৈন্য উলঙ্গ করিয়া দেখাইতে লজ্জা বোধ করে না।

তবু ইহারই মধ্যে চলিতে থাকে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের চিরন্তন লীলা, যুবক-যুবতীর প্রেমের খেলা।

পতিগৃহ-বঞ্চিতা মেনকা প্রত্যহ অশুদ্ধ বানান আর অপূর্ব্ব হস্তাক্ষর সম্বলিত দীর্ঘ প্রেমপত্র রচনা করিয়া নিত্যনূতন লোক ধরিয়া স্বামীর ঠিকানা লিখাইয়া পাঠায়।

অখিলেশ মুক্তির স্বপ্ন দেখে।

বিজয় মল্লিক দেশোদ্ধার করে।

ঘড়িতে রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে

ব্ল্যাক-আউটের মহিমায় কলিকাতা নগরীকে আর চিনিবার উপায় নাই। বিমুখ রাজ্য-লক্ষ্মীই যেন প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া অন্যত্র পথ খুঁজিতে গিয়াছেন। রাত্রির কলিকাতা, ভাগ্য-দেবতার পাদপীঠে যে অজস্র দীপমালার অর্ঘ্য সাজাইয়া আরতি করিত, দেবতার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই সে মালা খসিয়া পড়িয়াছে।

তাই আজ ঘরে বাহিরে এত অন্ধকার।

মানুষ আর পথ দেখিতে পায় না।

শীতের রাত্রে সচরাচর এমন সময় পাড়া নিশুতি হইয়া পড়ে, অন্ধকারের জন্য আজকাল আরো তাড়াতাড়ি লোকে পথের কাজ সারিয়া আপন আপন আস্তানায় আশ্রয় লয়। যে অসংখ্য লোক ফুটপাথে প'ড়িয়া রাত্রি কাটাইত, তাহাদের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

কদাচিৎ এক-আধটা মানুষ আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে মুড়ি দিয়া. বেসুরা সুরে সিনেমার গানের এক-কলি গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—বোধকরি ভয় ভাঙিতে।

দৈবাৎ এক-আধটা গরুরগাড়ী কপি বেগুন বোঝাই দিয়া চলিয়াছে বাজারের অভিমুখে।

জানলা দিয়া শীতের কন্‌কনে হাওয়া আসিয়া হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত ছুঁচের মত বিঁধিতে-ছিল, তাই কপাটটা বন্ধ করিয়া দিয়া আরতি সরিয়া আসিয়া একটা ট্রাঙ্কের উপর বসিল।

বিছানায় বসিতে ভয় করে, সারাদিনের শ্রমক্লান্ত শরীর যদি বিছানার প্রলোভনে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া বসে। অখিলেশ এখনও গুরু-আশ্রম হইতে ফিরে নাই, কড়া নাড়িলে দুয়ার খুলিয়া দিতে হইবে। বই থাকিলে সময়টা জলের মত কাটিয়া যায়, আজ একখানিও বই নাই।

আরতি মনে মনে ভাবে আবার কাল ঠাকুরপোকে খোসামোদ করিয়া খানকয়েক বই আনাইতে হইবে। কোথায় বা পায় বেচারা! আগে লাইব্রেরী হইতে আনিয়া দিত, কিন্তু অখিলেশের নিষেধে লাইব্রেরীর বই বন্ধ হইয়া গিয়াছে! অসার উপন্যাস পড়িয়া উচ্ছন্ন যাইবার জন্য অর্থ নষ্ট করা নাকি অত্যন্ত গর্হিত ব্যাপার।

অমরেশ বই আনিয়া দেয় লুকাইয়া, আরতি লুকাইয়া পড়ে। এই একটি বিষয়ে সে বিবেকের বিরুদ্ধে আপনাকে ছাড়িয়া দেয়। দীর্ঘদিন কাটিয়া যায় সংসারের তুচ্ছ কাজে, কিন্তু দীর্ঘ রাত্রি কাটিবে কি লইয়া?

কৃষ্ণবালা এক ঘুম হইতে উঠিয়া আরতির ঘরে উঁকি মারিয়া ঘুম-ভাঙা ভারী গলায় কহিলেন—অখিল এখনও বাড়ী আসেনি?

আরতি মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

—হুঁ—বলিয়া একটিমাত্র শব্দে অখিলেশের অবিবেচনার সমস্ত অপরাধ নির্দ্দোষ আরতির স্কন্ধে চাপাইয়া তিনি সরিয়া গেলেন। অধিক কথা কহিলে ঘুমের আমেজ ভাঙিয়া যাওয়ার ভয়েই বোধ করি ফাঁড়াটা অল্পে কাটিল।

অখিলেশ আসিল সাড়ে বারোটায়।

বিদ্যুতের আলোর ব্যবহার নাই, হারিকেন ধরিয়া স্বামীকে সিঁড়ি পার করাইয়া দ্বিতলে উঠাইয়া দিয়া আরতি আবার নীচে নামিয়া আসিল।

অখিলেশের রাত্রের আহার্য্য ফল, দুধ ও মিষ্টান্ন নীচে গোছান আছে। আনিতে হইবে তসরের শাড়ী পরিয়া। আহার্য্যের শুচিতায় অখিলেশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

কাঠকয়লার আঁচে দুধ গরম করিয়া, আসন জল প্রভৃতি আনিয়া নামাইতেই অখিলেশ গম্ভীরভাবে কহিল—রাতের খাওয়াটা এবার থেকে ছেড়ে দেব মনে করছি।

আরতি শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিল।

—না না, তোমার কিছু দোষ হয়নি, আমার জন্যে যে কেউ অকারণ কষ্ট পায় এটা আমি পছন্দ করি না।

আরতি শান্তকণ্ঠে কহিল, কে বললো কষ্ট হয়?

তা কষ্ট হয় বৈকি। দেখেই বোঝা যায়।

আরতি মৃদু হাসিয়া কহে, এসব তুচ্ছ জিনিস বুঝতে পারো তুমি?

—এ ধরণের মান অভিমানের পালা না গাওয়াই ভালো। বলিয়া অখিলেশ খাবারের থালাটা টানিয়া লইল।

আরতি ধীরে ধীরে কহিল—শীত বেশী পড়েছে, পিসীমা বলছিলেন ঠাণ্ডা লাগে, একটু সকাল করে আসতে পারলে—

—এর চেয়ে আগে আসা সম্ভব নয়, গুরুদেব বলেন—সাধন-ভজনের শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে রাত্রি। গৃহস্থাশ্রমে থেকে অবশ্য কিছুই হয় না।

আরতির এবার ইচ্ছা হইল বলে—এ আশ্রমটা ছাড়িলেই তো পারো—কিন্তু প্রতিবাদ না করিয়া এমনই অনভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, কিছু বলিতে তাহার যেন মন ওঠে না।

আহারান্তে আরতির শয্যার প্রতি একবার দৃষ্টি পড়িতেই অখিলেশ কহিল—খোকা কই?

—সে আজ তার কাকার কাছে শুয়েছে।

সন্ন্যাসীর পক্ষে অধিক কথা কওয়া নিষেধ, তাই অখিলেশ আর দ্বিতীয় কথা না কহিয়া আপনার শয্যায় আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

আরতি আলো নিভাইবে, দুয়ার দিবে, আশ্রয় লইবে আপনার একক শয্যায়। শিশুর উষ্ণতা তবু বিছানাটাকে সহনীয় করিয়া রাখে, আজ মনে হইতেছে কে যেন জল ঢালিয়া রাখিয়াছে তাহার শয্যায়—এমনিই হিমেল ঠাণ্ডা।

উভয়ের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ক্রমশঃ ঘরের বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হইয়া ওঠে, একসময় ঘুম আসেই—হয়তো ঘুমাইয়া উভয়েই স্বপ্ন দেখে মুক্তির।

॥ তিন ॥

বিজয় মল্লিক রিলিফ কমিটি গঠন করিতেছে।

বোমায় যাহারা মারা গিয়াছে বা যাইবে তাহাদের দুঃস্থ পরিবারবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভার লইবে বিজয় মল্লিক।

তাই বিজয় মল্লিকের স্বাচ্ছন্দ্য ঘুচিয়াছে। বেচারা জন্মদুঃখী। বন্যায়, মহামারিতে, দুর্ভিক্ষে, ভূমিকম্পে, যত সমস্যার সৃষ্টি হয় বিজয় মল্লিকের মস্তিষ্ক সেই দুষ্পূরণীয় সমস্যার পূরণের চেষ্টায় খাটিয়া মরে। যত লোক মারা পড়ে, প্রত্যেকের জন্য শোকগ্রস্ত হয় তাহার মন।

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত বিজয় মল্লিকের নাওয়া খাওয়ার অবকাশ ছিল না। বাঁধ-ভাঙা নদীস্রোতের মত অকস্মাৎ যে নরদেহধারী প্রেতের দল একটি মাত্র 'মাটির হাঁড়ি'র ভরসায় কলিকাতার রাজপথে জীবনযুদ্ধে নামিয়াছিল, তাহাদের ভাল করিবার দুশ্চেষ্টায় বেচারার দিন-রাত্রের ঘুম ঘুচিতে বসিয়াছিল।

অকস্মাৎ যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল, অকস্মাৎই তাহার অবসান ঘটিল। যুদ্ধের জন্য নির্ব্বাচিত এমন প্রশস্ত ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া তাহারা সহসা ছায়াবাজির মত কোথায় মিলাইয়া গেল, কেন গেল, তাহার সম্যক্ রহস্যের সন্ধান অজ্ঞাত থাকিতে থাকিতেই পড়িল বোমা।

কলিকাতার লোকের স্নায়ু সবল হইয়া গিয়াছে। যাহারা একদা রেঙ্গুনে বোমা পড়ার গল্প শুনিয়া প্রাণভয়ে দিগ্বিদিকে জ্ঞান হারাইয়া ছুটাছুটি করিয়াছিল, তাহারাই এখন ফুলকপি আর ভেট্‌কী মাছের থলি দোলাইতে দোলাইতে বাজারের মোড়ে দাঁড়াইয়া পাশের বাড়ীতে বোমা পড়ার বিবরণ লইয়া খোশগল্প করে।

শুধু বিজয় মল্লিকের মত যাহারা জন্মদুঃখী তাহাদেরই আবার একটা নূতন অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে।

বোমাহত দুর্ভাগাদের দুঃস্থ স্ত্রীপুত্রের জন্য বিজয় মল্লিক রিলিফ কমিটি গড়িতেছে।

অমরেশ নিজের ইচ্ছায় যোগ দেয় না—দেয় বিজয় মল্লিকের তীক্ষ্ণ শ্লেষে, নিদারুণ ধিক্কারে। চাঁদার খাতা হাতে লোকের দরজায় দাঁড়াইতে তাহার মাথা কাটা যায়, তবু বিজয় তাহাকে টানিয়া লইয়া বেড়ায়।

এইখানে আছে অমরেশের দুর্ব্বলতা।

সেদিনও বৈকালে অমরেশ তাড়াতাড়ি বাহির হইতেছিল কমিটির মিটিঙের উদ্দেশ্যে, কিন্তু সহসা গলির মোড়ে ধাক্কা খাইতে-খাইতে বাঁচিয়া গেল মন্দিরার সঙ্গে।

মোড়ের মাথায় মন্দিরাদের বাড়ী বটে কিন্তু গলির ভিতরে কখনো পদার্পণ করিতে দেখা যায় না তাহাদের—তাই অমরেশ ঈষৎ বিস্মিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

ভারী অদ্ভুতভাবে হাসে মন্দিরা, অকারণ এমন ভঙ্গীতে হাসে, মনে হয় যেন কী এক গোপন রহস্য লুকানো আছে তার হাসির আড়ালে।

হয়তো টুকটুকে ঠোঁটের উপর চাপিয়া ধরা ঈষৎ উঁচু দাঁত দু'টির জন্যই এইরূপ দেখায়।

—অমরেশ দা, চিনতে পারছেন না বুঝি ?

—পারবো না কেন, বাঃ।

—বেরিয়ে যাচ্ছেন বুঝি ? আপনাদের বাড়ীই যাচ্ছি।

—আমাদের ভাগ্য। চল।

ছেলেবেলায় যাহাকে ফ্রক্ পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে তাহাকে আপনি বলিতে কেমন আড়ষ্ট লাগে।

—কই জিগ্যেস করলেন না তো কেন যাচ্ছি ?

—প্রশ্নের উত্তর তো আমি নিজেই দিলাম, আমাদের ভাগ্য।

—আপনি বড় বাজে কথা বলেন, যাচ্ছি বৌদির সঙ্গে ভাব করতে।

বৌদির কথা মনে পড়িতেই অমরেশ অস্বস্তি বোধ করে, হয়তো বেচারা একখানা-আধ-ময়লা মোটা শাড়ী পরা অবস্থায় রান্নাঘরে বন্ধ আছে, নয়তো পিসীমার কাছে বকুনি খাইতেছে, এমন ফিট্‌ফাট্ কেতাদুরস্ত তরুণীটিকে দেখিয়া আপনার দৈন্যে কতই বিব্রত বোধ করিবে হয়তো।

অমরেশকে বিমনা দেখিয়া মন্দিরা চলিতে চলিতে গতি মন্থর করিয়া কহিল—আপনি বুঝি রাগ করলেন ?

কেন ?

—আপনাদের বাড়ী যাচ্ছি বলে ?

—কী আশ্চর্য্য ! এ কি একটা কথা হ'ল ?

—তবে কথা কইছেন না যে ?

অমরেশ হাসিয়া ওঠে।—আমাদের বাড়ীই তো যাচ্ছো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা কয়ে দরকার ?

যাওয়াটা আপনি এপ্রিসিয়েট্ করেন কি-না সেটাও দেখা দরকার তো ?

—যাচ্ছো তো বৌদির সঙ্গে ভাব করতে ?

—আপনার সঙ্গে করবো না বলেছি ?

অমরেশের বুঝিতে বিলম্ব হয় না ফ্রক্ ছাড়িয়া শাড়ী ধরিলেও বড় হইতে ইহার এখনো বাকী আছে। গৃহস্থঘরের সুখ দুঃখে মানুষ হওয়া মেয়েরা অবশ্য এ বয়সেই যথেষ্ট পরিপক্ক হইয়া ওঠে, কিন্তু ধনীর ঘরের আদরের দুলালীদের বয়স বাড়ে অপেক্ষাকৃত বিলম্বে।

—আচ্ছা দেখা যাবে মতের পরিবর্ত্তন হতে কতক্ষণ লাগে।

—কেন, আপনি বুঝি কারুর সঙ্গে মিশতে ভালোবাসেন না ?

—বরং উল্টো।

—না না, আপনার সঙ্গে আমার অনেক দরকারি কথা আছে, আগে তো কত যেতেন, এখন আর যান না কেন ?

—কেন, বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়, কিন্তু দরকারি কথাটা কি শুনি ?

—আপনাদের রিলিফ কমিটির মেম্বার হবো আমি।

—তুমি !

—কেন আমি কি মানুষ নই ? পরোপকারটা বুঝি ছেলেদেরই একচেটে ? মেয়েদের শরীরে বুঝি দয়াধর্ম্ম থাকতে পারে না ?

—খুব পারে, কিন্তু বাড়ীতে এ্যালাউ করবেন ?

—ইস্‌!

এই একটিমাত্র সগর্ব্ব উক্তিতে নিজের প্রতিপত্তির প্রমাণ দিয়া মন্দিরা অমরেশের সন্দেহের নিরসন করিয়া দিল।

বাড়ীর দরজায় আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া আলোচনা স্থগিত থাকিল। পথ চলিতে চলিতে কৌতুক আলাপে যে পুলকের আমেজে ভারাক্রান্ত মনটা লঘু হইয়া আসিয়াছিল, বাড়ীর দরজায় আসিয়া তাহা লোপ পাইল অমরেশের।

সহসা মনে হইল বাড়ীটা বড় বেশী জীর্ণ, ভিতরে দৈন্যের ছবি বড় বেশী নগ্ন। নিজেদের এই শ্রীহীন সাজ-সজ্জা যে এতদিন চোখে পড়ে নাই কেন সেইটাই আশ্চর্য্য লাগে।

উঠানের দেওয়াল ভরিয়া পিসীমা গোবর কুড়াইয়া আনিয়া ঘুঁটে লাগাইয়াছেন। দালানের আধখানা জুড়িয়া কয়লার গুঁড়ার গুল, পোড়া কয়লা, নারিকেলের ছোবড়া আর ডাবের মালায় ভর্ত্তি। সিঁড়ির দেওয়ালে দড়ি টাঙাইয়া ভিজা কাপড় মেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, শোবার ঘরে বস্তাবন্দা করিয়া সংগ্রহ করা আছে চাল, ডাল, আটা—ভবিষ্যতের খোরাক।

এসব পিসীমার রাজ্য, কোন জিনিস এতটুকু এদিক-ওদিক করিবার জো নাই, ঘর বাড়ী সাজাইয়া গুছাইয়া রাখার চেষ্টাকে তিনি খৃষ্টানীপনা বলিয়া ঘৃণা করেন।

—আমাদের বাড়ী ঢুকলে বেশীক্ষণ বসবার ইচ্ছে হবে না।

সরল দৃষ্টি তুলিয়া মন্দিরা সাশ্চর্য্যে প্রশ্ন করিল—কেন ?

—এত অপরিচ্ছন্ন ! গরীবের ভাঙ্গা কুঁড়ে।

—আচ্ছা বেশ, জানলাম আপনি বিনয়ের অবতার, কিন্তু বৌদি কই ? ও বৌদি, আমি আপনার সঙ্গে ভাব করতে এলাম, আর আপনি বেরোচ্ছেন না ?

আরতি নূতন কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া রন্ধনশালা হইতে উঁকি মারিতেছিল, ডাক শুনিয়া বাহিরে আসিল। মন্দিরা যে তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত এমন নয়, ছাদে দাঁড়াইলে 'লাল বাড়ী'র অনেক কিছুই দেখা যায়, মানুষগুলিও প্রায় মুখ চেনা, কিন্তু নিজেদের বাড়ীতে তাহাদেরই এই মেয়েটিকে দেখিয়া সে একটু অবাক হইয়া গেল।

—কি আপনিও রেগে যাচ্ছেন বুঝি ? অমরেশ দা তো রাগ করে কথাই বন্ধ করে দিলেন।

আরতি মৃদুহাস্যে তাহার হাত ধরিয়া কহিল—এমন মুখ্যু কেউ আছে নাকি ? খুব আনন্দ হচ্ছে আমার, প্রবীর ঠাকুরপোর ভাগ্নী তো তুমি ?

—ভাগ্নী হতে যাবো কি দুঃখে? নাতনী—নাতনী। আমার মা হচ্ছেন গিয়ে ভাগ্না।

—ওঃ তা'হলে তো আমাদের সঙ্গেও সম্পর্কটা খুব মিষ্টি হ'ল।...যাও ঠাকুরপো, ওপরে নিয়ে গিয়ে বসাওগে।

—কেন আপনি?

আমিও যাচ্ছি ভাই, রান্না চাপিয়েছি—ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দেয় আরতি।

—তবে চলুন রান্নাঘরেই বসা যাক্, শীতকালে রান্নাঘর বেশ মজার জায়গা। আপনার ঠাকুরপোর সঙ্গে ওপরে গিয়ে বসে থাকতে দায় পড়েছে আমার।

অমরেশ ছদ্ম-গাম্ভীর্য্যের সুরে কহিল—একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে, "নদী পার হয়ে নৌকায় লাথি"—কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থটা হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে।

—আহা আপনি যেন কাণ্ডারী হয়ে আমায় নদী পার করে আনলেন। কোন দিন তো বলেনও নি বেড়াতে আসতে।

আরতি তাহার কোমল হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতে যাইতে কহিল—আমাদের কি অত সাহস হয়?

—আপনিও ওই 'টানে' কথা সুরু করেছেন? তা'হলে কিন্তু পালাবো। আমরা কি বাঘ-ভালুক? দাদাভাই তো কতদিন আসে, খেয়ে ফেলে বুঝি হালুম করে?

তাহার ছেলেমানুষি ধরনধারণে উভয়ে না হাসিয়া পারে না।

অমরেশ এদিক ওদিক চাহিয়া কহিল—খোকা কোথায় বৌদি?

—পিসীমা নিয়ে বেরিয়েছেন, আসবেন এখুনি।

খোকা আসিলে অমরেশ একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে পারে, শিশু বড় মানুষদের অনেকটা অবলম্বন, চক্ষুলজ্জার আড়াল। একটি শিশুকে কেন্দ্র করিয়া আলাপ আলোচনার পথ সরল হইয়া যায়।

তাছাড়া—দেখাইয়া গর্ব্ব করিবার মত বস্তু যে তাহাদের একটিও আছে তাহা জানাইতে ইচ্ছা হয় বৈকি।

পিসীমার গতিবিধি কোথায় কোথায় তাহা অনেকটা জানা আছে, খোঁজ নিতে দোষ কি?

—রান্নাঘরে বসলে তোমার কিন্তু ভালো শাড়ীখানা নষ্ট হয়ে যাবে—আরতি অনুযোগ করে।

একখানা ছোট পিঁড়ির উপর চাপিয়া বসিয়া মন্দিরা কহিল—

—ভারী শাড়ী! কিন্তু আপনার ঠাকুরপো চটে মটে গেলেন কোথা?

আরতি স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে কহিল--আমার ঠাকুরপো চটবার ছেলে নয়।

দেখা গেল ঠাকুরপো সম্বন্ধে মন্দিরার কৌতূহল কম নয়।

গল্পে গল্পে এতশীঘ্র দুইটি অসমবয়সী মেয়ের মধ্যে কেমন করিয়া একটা নিবিড় সৌহার্দ্দ্য গড়িয়া উঠিল বলা কঠিন। আরতি যেন দীর্ঘদিনের পর খোলা আকাশের মুখ দেখিয়াছে।

ইহার অভিসন্ধিলেশহীন সহজ কথা, প্রাণখোলা মুক্ত হাসি, সরল পরিহাসের ভঙ্গী, সর্ব্বোপরি মধুর প্রগল্‌ভ স্বভাব মুহূর্ত্তে আকৃষ্ট করিয়া তোলে।

এ বাড়ীতে সচরাচর আনাগোনা করেন—কৃষ্ণবালার সখীমণ্ডলী। তাঁহাদের দেখিলে আরতির প্রাণ শুকাইয়া আসে। তাঁহাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি হওয়াও যতটা নিন্দনীয় ব্যাপার, ততটাই নিন্দনীয় সহজভাবে আলাপ করা।

বৌ মানুষ লজ্জা সরমের মাথা খাইয়া গিন্নীদের কথায় যোগ দিবে—এটা কৃষ্ণবালার অত্যন্ত না-পছন্দ ব্যাপার। উষারাণী আসে মাঝে মাঝে, তাহাকে দেখিলেও হৃৎকম্প হয়, স্পষ্টবক্তার গৌরবরক্ষা করিতে সে বধূর দিক টানিয়া পিসীমার সহিত বচসা করিয়া যায়—তাহার তাল সামলাইতে হয় আরতিকে।

আর আসে মেনকা।

তাহার হাবভাব দৃষ্টিকটু, কথাবার্ত্তা অমার্জ্জিত, পরিহাসের ভঙ্গী অশ্লীল, মোটের মাথায় সমবয়সী হইলেও মেনকার সখীত্ব বাঞ্ছনীয়ও নয়, প্রীতিকরও নয়।

তাই মন্দিরার মত সরল কিশোরীর সঙ্গ আজ আরতির কাছে যেন কোন বিস্মৃত জগতের হাওয়া বহিয়া আনিয়াছে।

খবর পাইয়া খোকাকে লইয়া পিসীমাও যে আসিয়া হাজির হইতে পারেন এটা অমরেশের খেয়াল ছিল না। পিসীমাকে আসিতে দেখিয়া সে ক্ষুব্ধচিত্তে চলিয়া গেল বিজয় মল্লিকের রিলিফ কমিটীর মিটিঙের উদ্দেশে।

অনাত্মীয়া বয়স্থা মেয়ের সহিত হাস্য-পরিহাস পিসীমার সন্দিগ্ধ চোখে যে কোন্ পর্য্যায়ে পড়ে, সে জ্ঞান অমরেশের আছে বটে, কিন্তু মন্দিরার নাই। সে আপন স্বভাব-ধর্ম্মে সহজ হইতে পারিবে কিন্তু অমরেশের পক্ষে হইয়া উঠিবে কঠিন।

অতএব সরিয়া পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

ভাবিবে অভদ্র? ভাবুক, উপায় কি! আচ্ছা রিলিফ কমিটীর প্রস্তাব লইয়া একদিন যাইলে কেমন হয়?

হঠাৎ মন্দিরার চিন্তাটাই বা এত করিয়া মনে আসিতেছে কেন? কত মেয়েই তো আছে পাড়ায়, ছেলেবেলায় কতইতো দেখিয়াছে তাহাকে।

শাড়ী ধরিলে মেয়েরা যেন নূতন করিয়া জন্মগ্রহণ করে।

পিসীমার কোলে খোকাকে দেখিয়াই মন্দিরা ছুটিয়া আসিয়া টানাটানি সুরু করিল।

—ও মা কী সুন্দর, কী চমৎকার মিষ্টি খোকাটা! এসো আমার কাছে।

পিসীমা একটু সরিয়া গিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন—হ্যাঁ গা বৌমা, তুমি তো আর খ্রীষ্টানের মেয়ে নও? রান্নাঘরে জুতো পায়ে দিয়ে ঢুকতে নেই এটুকু শিক্ষে দিতে পারনি?

মন্দিরা অপ্রতিভভাবে তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

আরতি যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। কথাটা যে তাহার মনে উদয় হয় নাই এমন নয়,

কিন্তু এই সুদর্শনা সুসজ্জিতা তরুণীটির সম্মুখে ও-কথা উচ্চারণ করিতে তাহার বাধিয়াছে, কিন্তু পিসীমার যে ঘরে পা দিয়াই নজরে পড়িল ইহাই—আশ্চর্য্য !

—তুমি যতীন মুখুজ্যের মেয়ের দৌহিত্রী না ?

মন্দিরা মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

—গঙ্গাচান করতে যেতে রোজ গাড়ী চড়ে ইস্কুলে যাও দেখি কিনা। বে-থা হয়নি বুঝি এখনো?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন আছে কি না বুঝিতে না পারিয়া মন্দিরা নীরব রহিল।

—যতীন মুখুজ্যের এ পক্ষের বৌ তোমায় পুষ্যি নিয়েছে বুঝি ?

এই শ্রীহীন প্রশ্নে মন্দিরা অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল।

কৃষ্ণবালা আবার স্বগতঃ মন্তব্য করিলেন—সেই যে কথায় বলে না, "কান কাঁদে সোনা বিনে, সোনা কাঁদে কান বিনে—", ঘরে পয়সার অবধি নেই যতীন মুখুজ্যের, এ পক্ষে দু'দশটা ছেলেপুলে হলে তারা তো খেয়ে পরে বাঁচতো ? তা না আকালের ঘরে শূয়োরের পাল। তবে অতীন মুখুজ্যের গুচ্ছির আণ্ডাবাচ্চা হয়েছে, না ?

মন্দিরা বিস্মিত দুই চক্ষু মেলিয়া পিসীমার বাক্যনিরত রসনার পানে চাহিয়া রহিল।

—দুই ভায়ে এক অন্ন ? না ভেন্ন হাঁড়ি ?

পিসীমাকে যতই ভয় করুক, তবু এই অভদ্র প্রশ্নের বিরুদ্ধে আরতির সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

—ও ছেলেমানুষ অত কথা জানে না পিসীমা।

—কি জানি মা একটা কথারও তো উত্তুর পেলাম না, অথচ এতক্ষণ তো মুখে খই ফোটাচ্ছিলে দু'জনে, আমায় দেখে বাক্যি হ'রে গেল একেবারে।...যাই অবেলায় আবার চান করে মরি, জুতো পরে ছোঁয়া গেল।—বলিয়া দুইটি বাক্যহীনা তরুণীকে প্রস্তরে পরিণত করিয়া খোকাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন পিসীমা। খোকার—"মা'ল কাথে দাবো, মা'ল কাথে দাবো,—" শব্দের করুণ আবেদন গ্রাহ্যও করিলেন না তিনি।

বিজয় মল্লিক তীব্র ভৎর্সনা করিতেছে অমরেশকে। মিটিং বন্ধ হইয়া আছে, মেম্বাররা কেহই আসে নাই—বিজয় মল্লিক একা আর কতদিক সামলাইবে ?

চাঁদা যাহা উঠিয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে লজ্জা করে। উচিত হইতেছে পাড়ার ছেলেদের জড় করিয়া চাল, ডাল, পুরানো কাপড সংগ্রহ করিতে বাহির হওয়া। আবশ্যক খানিকটা লাল সালু, দু'খানা বাখারি আর ভাঙাচোরা একটা হারমোনিয়াম।

গান বাঁধিয়া দিবে বিজয় মল্লিক নিজে।

অমরেশ বাধা দিয়া কহিল - ক্ষেপে গেছিস, গান গেয়ে ভিক্ষে করতে বেরোলে গায়ে ধূলো দেবে লোকে। ও-সব কি ভদ্রলোকের কাজ ?

—তবে ভদ্রলোকের কাজটা কি শুনি ? শাড়ীর আঁচল দেখলেই মূর্চ্ছা যাওয়া ?

এইমাত্র বিলম্বের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া অসতর্ক অবস্থায় মন্দিরার নামোল্লেখ করিয়া ফেলিয়াছে অমরেশ। ভাবিয়াছিল মনগড়া একটা কারণ দর্শাইয়া দিবে, কিন্তু মিথ্যাকথা কেমন জিবে আটকায়।

বিজয় মল্লিক ঝাঁজালো গলায় কহিল—যদি বুদ্ধিমান্ হ'স্ তো মেয়েটার সঙ্গে ভাব করে ফেলে ফুস্‌লে-ফাস্‌লে মোটা কিছু আদায় করে নে। বড়লোকের ধিঙ্গি মেয়ে, চাই কি একখানা গয়নাই খুলে দিতে পারে গা থেকে।

—মতলব নিয়ে ভাব-টাব করতে পারবো না আমি।

—তা' পারবে কেন? ভাবুক চূড়ামণি, প্রেমে পড়গে যাও। কাল যেতে হবে প্রবীরের বাড়ী, বুড়োতো টাকার কুমীর, কিছু খসানো দরকার।

—যেতে হয় তুই একলা যা।

—কেন তোর কি হ'ল শুনি?

অমরেশ একটু চালাকী করিয়া বিজয় মল্লিকের সেন্টিমেন্টে আঘাত করে—কেন, বড়লোকের খোসামোদ করতে যাবো কেন? আমরা গরীব, গরীবের মত করেই আমাদের নিরন্ন ভাইবোনেদের সাহায্য করবো। করবো আমাদের প্রাণ দিয়ে, মুখের অন্ন দিয়ে পরিধেয় বস্ত্রের আধখানা ছিঁড়ে দিয়ে—ধনীর দরজায় ভিক্ষা নিয়ে নয়।

বিজয় সহসা চমকাইয়া ওঠে, নূতন আলোক চোখে পড়িয়াছে তাহার। অমরেশের পিঠে একটা মৃদু আঘাত দিয়া বলে—ঠিক বলেছিস অমরেশ, সত্যিই বটে, এ্যাঁ? আমরা আমাদের মুখের অন্ন দিয়ে, পরনের আধখানা দিয়ে গরীবকে বাঁচিয়ে তুলবো—কি বলিস?

—তাই তো বলছি, কিন্তু সাবধান চট্ করে ছিঁড়ে ফেলিস নি যেন ধুতিখানা। বারো টাকা জোড়া—মনে রাখিস সেটা।

—দূর, অত হিসেব করে কিচ্ছু হয় না।

পূর্ব্বের আইডিয়া বাতিল করিয়া নূতন আইডিয়া করিতে থাকে বিজয় মল্লিক।

—কিন্তু তুই বোধ হয় ইচ্ছে করলেই লেকচার দিতে পারিস অমরেশ?

—সকলেই পারে।

—পাগল! ভাব থাকলেও আমার তো ভাষাই যোগায় না মুখে। কিন্তু তোর—মনে হচ্ছে ভাব-ভাষা দুইই আছে। কবিতা টবিতা লিখিস না তো? মানে ওই এখনকার কটমটে ভাষায়? "লাল আকাশ", "লৌহ দানব", "মরা শকুন", আর "ভাগাড়ের গরু" নিয়ে?

- মাথা খারাপ!—বলিয়া সমস্ত আলোচনার উপর যবনিকা টানিয়া দেয় অমরেশ।

বিজয় কল্পনা করিতে থাকে···অমরেশ বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া বাক্যের ঝড় তুলিয়াছে—হাজার হাজার শ্রোতা বক্তার যুক্তির সারবত্তায় মুগ্ধ হইয়া পকেট উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিতেছে বিজয় মল্লিকের বৃহৎ বাক্সটির কর্ত্তিত গহ্বরে।···মেয়েরা দিতেছে গলার হার, হাতের চুড়ি, ব্রোচ, কানপাশা খুলিয়া। দুর্গতের ঘরে ঘরে দুই হাতে দান করিতেছে বিজয় মল্লিক অন্নবস্ত্র, ঔষধপত্র।

হায়, এই স্বপ্ন কি সফল হইবার নহে!

এতই অসম্ভব!

অমরেশ কি বক্তৃতা দিতে রাজী হইবে?

যাহার যতো সামর্থ্য, ব্যয় করিতে সে ততো কুণ্ঠিত হয় কেন?

প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যের সামান্যতম অংশটুকুও দান করিতে বিমুখ হয় মানুষ কোন্ লজ্জায়?

প্রবীর হীরার আংটি পরিয়া বেড়ায় কিসের সুখে?

বিজয় মল্লিকের দৃষ্টি দিয়া সকলে দেখিতে চায় না কেন?

মানুষের উপর মানুষের সহানুভূতির অভাব তাহাকে ক্লিষ্ট করিতে থাকে।

আর অমরেশ ভাবিতে থাকে অন্য কথা।...বোমা যদি পড়েই, এ পাড়ায় পড়িলে দোষ কি?...'বড় বাড়ী' 'ছোট বাড়ী'র বিবাদ ঘুচিয়া রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইতে হয় সকলকে। ক্ষীণ সুকুমার প্রাণগুলি রক্ষা করিতে বলিষ্ঠের সবল বাহু অগ্রসর হইবার সুযোগ পায়।... কত অসম্ভাব্য ঘটনা ঘটিতে পারে। বিপদের মুখে হৃদয়ের আদান-প্রদান সহজ হইয়া আসে।

সহসা খোকার মুখ মনে করিয়া শিহরিয়া ওঠে অমরেশ।

মেনকার চিঠির উত্তর আসে না।

কিন্তু উত্তর আসিবার আশা কি সত্যই আছে?

তবুও মেনকা প্রত্যহ রঙিন কাগজে 'প্রাণাধীকেষু' সম্বোধন করিয়া চিঠি লিখিবেই। মেনকার মা ক্রুদ্ধ হইয়া বলে—মরণ আর কি, তোর যেমন গলায় দেবার দড়ি জোটে না মেনি; তাই সেই চামারকে খোশামোদ করে মরিস। পেটে যদি ঠাঁই দিতে পেরে থাকি, হাঁড়িতেও ঠাঁই দিতে পারবো।

যেন পেটের ভাত জুটিলেই সকল প্রয়োজন মিটিয়া যাইবে মেনকার।

মেনকার মা আরও বলে—তোর ভাত-কাপড়ের যোগান দিতে পারবো মেনি, চিঠি লেখার খরচ যোগাতে পারবো না।

মেনকা তাই পাড়ার ছেলেদের ধরিয়া চিঠির ঠিকানা লেখায়, আর পোষ্টেজের খরচ দিতে ভুলিয়া গিয়া বলে—চিঠিটা অমনি ডাক বাক্সোয় ফেলে দিয়ো না ভাই।...আজও তাই জানলা হইতে অমরেশকে দেখিতে পাইয়া ডাক দেয়—ও অমরেশদা!

অমরেশ জানে মেনকার ডাকিবার কারণ কি। মেনকার এই ব্যর্থ চেষ্টায় দুঃখ হইলেও হাসি আসে অমরেশের। বলে—কি রে মেনি?

—বলছি এই চিঠিখানায় আপিসের ঠিকানা লিখে দেবে অমরেশ দা? ফিকে গোলাপী রঙের খামখানা হাতে লইয়া বাহিরের রোয়াকে আসিয়া দাঁড়ায় মেনকা।

লিখিয়া দিয়া অমরেশ প্রশ্ন করে—চিঠি দিলে উত্তর পাস না তো দিস কেন?

হঠাৎ মেনকা অমরেশের নিতান্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া ছলছল চোখে অকারণ মৃদুস্বরে বলে—প্রাণের ভেতর যে বড্ড হু-হু করে অমরেশ দা!

অমরেশ এই গায়েপড়া ভাবটায় অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে। জন্মাবধি দেখিয়া আসিতেছে মেনিকে, লজ্জা করিবার কিছুই নাই, আপনার বোনের মতই মনে করা চলে।

কিন্তু মেনকার ধরনধারণ কেমন বিশ্রী। কাছে আসিলেই, সাদা কথাও কয় ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া, নিঃশ্বাস ফেলে দ্রুত, চুলে-মাখা সস্তা কেশতৈলের উগ্র গন্ধটা নাকে আসিয়া গা ঘিনঘিন করে।

—কালো গৌরাঙ্গ গেল কোথায়?—বলিয়া তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গের পরিবর্ত্তন করে অমরেশ।

—ছোড়দা গেছে কয়লার চেষ্টায়—আবার তো দু'টাকা করে মণ হ'ল।

—তাই নাকি? আমাদেরও তো তা'হলে দেখতে হয়—বলিয়া যেন এইমাত্র কয়লাই দেখিতে যাইতেছে অমরেশ, এইভাবে মেনকাদের রোয়াক হইতে নামিয়া পড়ে।

মেনকা তাড়াতাড়ি বলে—চিঠিটা অমনি নিয়ে যাও না ভাই—ডাকে দিয়ে দিও।

উল্টাইয়া দেখিবার আবশ্যক করে না। অমরেশ ঠিক জানে, স্ট্যাম্প মারা নাই।

অমরেশ চলিয়া গেলে মেনকা ঘরে আসিয়া আরসির সামনে দাঁড়ায়। মাড়ি বার করা বড় বড় উঁচু দাঁতের পাটির উপর হাতটা চাপা দিয়া মুখের উপরের অংশটা ঘুরাইয়া দেখে।

কপালের টিপ্‌টা সাবধানে বাদ দিয়া আঁচলে মুখটা মুছিয়া লয়। জ্যালজেলে খোলের রঙিন ডুরেখানা আবার একবার গুছাইয়া পরে, বহুক্ষণ ধরিয়া আপনাকে নিরীক্ষণ করিতে থাকে।

সাজিতে এত ভালো লাগে কেন মেনকার? কেন ভালো লাগে ঠসক-ঠমক করিয়া বারবার আরসির সামনে তার যৌবনকে দেখিতে?

স্বামী নেয় না, তবু বিকাল হইলেই পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিতে ইচ্ছা হয় কেন? রঙিন শাড়ীখানি পরিতে না পাইলে মন ওঠে না কেন? পায়ে আলতা দিয়া কপালে টিপ আর মুখে পাউডার লাগাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালো লাগে কেন?

বাছিয়া বাছিয়া এই সময়টাই চিঠির ঠিকানা লিখিয়া দিবার জন্য একে-ওকে ডাকিতে ইচ্ছা হয় কেন? নিজের আচরণের অসামঞ্জস্য নিজের চোখে ধরা পড়ে না মেনকার।

বিবাহের পর মাত্র বৎসর খানেক শ্বশুরঘর করিয়াছিল মেনকা, কিন্তু তাহার পর আজ দেড় বৎসর বাপের বাড়ী পড়িয়া আছে, আর উদ্দেশ করে না তাহারা। মেনকার মা জামাই বাড়ীর প্রত্যেকের নামে কুৎসা রটাইয়া বেড়ায়, আর উদ্দেশে শাপ শাপান্ত করে।

॥ চার ॥

প্রবীরের লেখার টেবিলের উপর ঝাঁকিয়া বসিয়া মন্দিরা নিজের বিজয় অভিযানের আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা দিয়া, দুই হাত জোড় করিয়া বলে—দোহাই দাদাভাই আর যাচ্ছিনা। বৌদিকে খুব ভালো লাগলো সত্যি, কিন্তু শ্রীমতী পিসীমা? তাঁর শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম সে এক অদ্ভুত চিজ্‌!

—আহা বেচারা বৌদি সারাদিন ওই দুর্দ্দান্ত শাসনের তলায় থাকে!—প্রবীর বলে।

—তা সত্যি—মমতাপূর্ণ কণ্ঠে মন্দিরা সায় দেয়—প্রায় কেঁদেই ফেলেছিল বেচারা।

—পরের ওপর কোন হাত নেই, দেখেছিস মন্দিরা? একজন আর একজনের উপর শত অত্যাচার করছে দেখেও প্রতিকারের উপায় থাকে না।

—চারটি বই পাঠিয়ে দিলে কিন্তু বেশ হয় দাদাভাই! বলছিলেন বই পড়তে পেলে আমি পৃথিবীর কোন দুঃখই গায়ে মাখি না। খুব বই পড়তে ভালবাসেন। ছেলেবেলায় মা মারা গিয়েছিল, বাপের কাছে একলা কাণপুরে মানুষ হয়েছেন—শুধু বই আর গান নিয়েই থাকতেন।

—গান?

—হ্যাঁ ভাই, মনে হ'ল গান-বাজনা ভালই জানতেন, এখন অবশ্য একেবারেই ভুলে গেছেন বলছিলেন, সেতারের ওয়াড়ের ওপর দু'ইঞ্চি ধূলো জমেছে। আচ্ছা দাদাভাই, মানুষ কেন মানুষকে এত দুঃখ দেয় বলতো?

—সারা জগৎ তো ওই 'কেন'র উত্তরই খুঁজে বেড়াচ্ছে মন্দিরা।

রাধা ঝি আসিয়া হাঁক দেয়—দিদিমণি, মা বললেন আজকে আপনাকে খাবার তৈরি শেখাবেন, ওপরে চলে আসুন।

—কি খাবার?

রাধা দুই হাত উল্টাইয়া বলে—আমি কেমন করে জানবো গো? মা তো সেই এষ্টোভ জেলে নানানিধি নিয়ে বসেছেন। আমায় বললেন—রাধা, দিদিমণিকে ডেকে দে, আজ কলেজের ছুটি আছে, আমার কাছে বসে খাবার তৈর শিখুক।

চঞ্চলা মন্দিরা লাফাইয়া উঠিয়া বলে—দাদাভাই নেমন্তন্ন রইল।

—কি তুই অখাদ্য করে রাখবি, খেতে না পারলে?

—তাই বই কি? সেদিন মাংস রেঁধে খাওয়াই নি? বড় যে প্রশংসা করা হয়েছিল?

—সেদিন? ওঃ চামচটা একবার ডুবিয়েছিলি বটে—নইলে ঠাকুরই তো—

—ইস্, ঠাকুর তো শুধু নুন আর আদা-টাদা গোছের হিজিবিজি কতকগুলোর মাপ দেখিয়ে দিয়েছিল আর ডেক্‌চিটা নামিয়েছিল—গরম ডেক্‌চি নামাতে পারি আমি?

—ডেক্‌চিটা ঠাকুর নামিয়ে দিয়েছিল আর চাপিয়ে দিয়েছিল, কেমন?

—হুঁ।

—বাকীটা সবই তুই রান্না করেছিলি ? বাঃ বাঃ বেশ বেশ, খাবারটাও ওই ভাবে সমস্ত তৈরি করে রাখিস, কেমন ?

—তুমি আমায় ঠাট্টা করছো—হ্যাঁ ?

—ঠাট্টা ! বলিস্ কি রে ?—দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া প্রবীর বলে—তোর সঙ্গে কি আমার ঠাট্টার সম্পর্ক ? করলেই হ'ল ! পাগল আর কি !

মন্দিরা একটা কীল দেখাইয়া ছুটিয়া পালায়।

উপরের দালানে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ক্ষীরমোহন আর কড়াইসুঁটির কচুরীর মাংস মসলা লইয়া গুছাইয়া বসিয়াছেন। মন্দিরা পিছন হইতে দুই হাতে গলা জড়াইয়া পিঠের উপর মুখ ঘষিয়া কহিল—মাগো মা-মণি, কি বলছো মা !

জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া বলেন—রকম দেখ মেয়ের, বলছি দু'একটা খাবার তৈরি শেখ্‌না।

—কেন মা তুমি তো সব জানো।

—আমি জানলেই তোর কাজ চলবে ? বড় হচ্ছিস্, শিখবি না ?

—বা-রে কেবল তুমি আমায় বড় করে দিচ্ছ মা,—বড় হচ্ছিস্ সেলাই শেখ্, বড় হচ্ছিস্ রান্না শেখ্—বড় হয়ে কী চোর দায়ে ধরা পড়েছি বলতো ?

—আচ্ছা পাগল মেয়ে, কাজকর্ম্ম না শিখলে তোর দাদামশাই দিদিমা বলবে—মেয়েটিকে আদর দিয়ে ধিঙ্গি করেছে।

ওদের উল্লেখে ভারী দমিয়া যায় মন্দিরা। জ্যোতির্ম্ময়ী যে তাহার সত্যকার মা, ছেলেবেলাকার এ ধারণাটা অবশ্য আর নাই, জ্যোতির্ম্ময়ীর নির্দ্দেশমত তাহার চির অপরিচিত দাদু-দিদা, পিতা মাতাকে চিঠি পত্রও দেয় মাঝে মাঝে, কিন্তু সেটা নিতান্তই বাধ্য হইয়া।

জ্যোতির্ম্ময়ী জানেন পূর্ণশশী এবার মেঘে ঢাকা পড়িল, তাই সস্নেহে বলেন—তোর বাবা যে আসছে শীগগিরি। তা' হাতের রান্না টান্না খাবার-দাবার খাইয়ে দিবি না দু'চারখানা ? সার্টিফিকেট আদায় হবে।

—সার্টিফিকেট—আমার কি দরকার ? নিরুৎসাহভাবে প্রশ্ন করিয়া মন্দিরা বলে—হ্যাঁ মা, সত্যি না কি ?

—কি সত্যি ?

—ওই যে কার আসবার কথা বললে।

—ওমা, কার কি রে, তোর বাবা-মার আসবার কথা বলছি যে ! মাঝে মাঝে তো আসে কলকাতায়, কিন্তু কখনো এখানে উঠতে চায় না। সেই কোথায় পিসীর বাড়ী গিয়ে ওঠে। আর এবারে তো প্রায় ছ'সাত বছর পরেই আসছে, কি ভাগ্যি যে চিঠি দিয়েছে এসে দু'চার দিন থাকবে বলে।

অপরিচিত পিতামাতা সম্বন্ধে লেশমাত্র কৌতূহল ছিল না মন্দিরার, বরং একটা অকারণ বিদ্বেষ ভাবই ছিল, তাই আগমন সংবাদে উল্লসিত না হইয়া মনমরা ভাবে জ্যোতির্ম্ময়ীর নির্দ্দেশমত কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী অবশ্য প্রবীরের অপেক্ষা কিছু কম দেখেন না মন্দিরাকে, নিজের কন্যা থাকিলে যে আরো অধিক ভালো বাসিতেন এমন কথা নিজের কাছেও স্বীকার করেন না, তবু 'নিজের নয়' এই বোধটুকু ভিতরে পীড়া দেয় বৈকি।

তাই দৌহিত্রী-জামাতার আসার সংকল্পে ঈষৎ চিন্তিত হইয়াছিলেন জ্যোতির্ম্ময়ী। কলিকাতায় আসিলে অমিয়া অথবা আনন্দময় যে তাঁহার বাড়ী না উঠিয়া দূর সম্পর্কের পিসীর বাড়ী উঠে, এতে তিনি অস্বস্তি বোধ করিলেও খুব বেশী দুঃখিত হ'ন না। তত্ত্বতাবাসের কাপড় জামা প্রভৃতি পাঠাইয়াই এ পক্ষের কর্ত্তব্যের ভার লাঘব করেন।

লোকে হয়তো বলিতে পারে সতীনের নাতনী নাত-জামাইয়ের উপর কতই আর টান হইবে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে জ্যোতির্ম্ময়ীর সে বিদ্বেষবোধ ছিল না। যেমন 'বড়' হইয়া এ বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তেমনি স্বামীর আত্মীয়-কুটুম্ব প্রিয়-পরিজন সকলের সঙ্গেই বড়র মত ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। বয়সে বড় অরুণপ্রভা অনেক বেশী দিন আগে আসিয়াও অর্দ্ধেক আত্মীয়-কুটুম্বের নাম পর্য্যন্ত জানেন না।

শুধু মন্দিরাকে লওয়ার পর হইতেই জ্যোতির্ম্ময়ীর মনে জন্মিয়াছিল ভয়। এই বুঝি চাহিয়া লয়, এই বুঝি কাড়িয়া লয়। বিধিবদ্ধ ভাবে পোষ্য লইতে ইচ্ছা হয়না—তাঁহার প্রবীর বাঁচিয়া থাক্। তাছাড়া ওটা কেমন যেন সেকেলেপনা বলিয়া মনে হয়। তবু আজ আনন্দময় আসার নামে ভিতরে ভিতরে একটা বিষাদের সুর বাজিতেছিল, এখন ভাবিতেছিলেন আইনসঙ্গত ভাবে পোষ্য লইলে হয়তো এমন হারাই-হারাই ভাব হইত না। ভাবিলেন, মন্দিরার শিক্ষায় সভ্যতায় আচারে আচরণে এতটুকু খুঁৎ বাহির করিতে দিবেন না তাহার পিতার কাছে। তাহারা যেন ভাবিতে পারে মেয়েকে বিলাইয়া দিয়া ক্ষতি হয় নাই তাহাদের।

পয়সা থাকিলে যে উগ্র আত্মম্ভরিতা থাকা স্বাভাবিক, সেইটির অভাব ছিল বলিয়াই জ্যোতির্ম্ময়ীর এত উদ্বেগ।

নতমুখে কিছুক্ষণ কাজ করিয়া মন্দিরা সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—আর ভাল লাগছে না মা!

—সে কিরে, এই 'পাক'টা শেষ পর্য্যন্ত দেখ্। রসটা গাঢ় হয়ে ক্ষীরমোহনগুলো ক্রমে লালচে হয়ে আসবে—

—ছাই ক্ষীরমোহন—বলিয়া মন্দিরা দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল।

নীচে প্রবীর তখনো মন্দিরার পরিত্যক্ত সোফাখানায় বসিয়াছিল। মন্দিরা ছুটিয়া আসিয়া তাহারই একাংশে বসিয়া পড়িয়া কহিল—দাদাভাই চলনা কোথাও বেড়িয়ে আসি।

—কই আমার নেমন্তন্ন? কি সব রান্না করতে গেলি—

—ছাই নেমন্তন্ন। চল বাইরে কোথাও ঘুরে আসি, ভাল লাগছে না বাড়ীটা।

বাহিরে যাইবার ইচ্ছা প্রবীরেরও হইতেছিল, কিন্তু শীতের মধ্যাহ্নের সংকল্পটা কার্য্যে পরিণত হইতে না হইতে বেলা পড়িয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাটাও শিথিল হইয়া গেল।

মন্দিরার তাড়ায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—আমারও তো বাড়ী বসে থাকতে ভাল লাগছে না, লম্বা কোথাও বেড়িয়ে আসলে মন্দ হ'ত না, কিন্তু বেলা পড়ে এল যে, ফিরতে রাত হয়ে যাবে না?

—হোক্‌গে, ভূতে ধরবে না তো। চলো বেলুড় মঠে যাওয়া যাক্‌।

—বেলুড়ে? এখন?

—কেন নয়? সন্ধ্যারতি দেখতে বেশ চমৎকার লাগে!

—বলেছিস মন্দ নয়—আচ্ছা মাকে জিজ্ঞেস করে আয় না যদি যেতে রাজী হ'ন।

—না না, মার এখন কুটুম্ব আসবে, ভীষণ ব্যস্ত। তুমি নিয়ে যাবে কি না তাই বলো?

—চল্‌ যাওয়াই যাক্‌।

বলিয়া আলস্য ঝাড়িয়া উঠিয়া পড়ে প্রবীর।

জ্যোতির্ম্ময়ী বিস্মিত স্বরে কহিলেন—সে কিরে মণি, তোর বাবা আসছে, গাড়ী গেছে ষ্টেশনে, আর এখন বেরোবি?

—এসেই আমাকে কি দরকার পড়বে শুনি?—সিল্কের শাড়ীখানা গুছাইয়া পরিতে পরিতে দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলে—তোমার সঙ্গে তো সম্বন্ধ ভালোই, কোরো না গল্প টল্প—বলিয়া ছুটিয়া পলায়।

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিবার সময় গলির মুখ হইতে বাহির হইল অমরেশ ও বিজয় মল্লিক। বলা বাহুল্য চাঁদা চাহিতে বাহির হইয়াছে। কাঁচপোকার সহিত তেলাপোকার মত নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উভয়ের মধ্যে—অমরেশকে টানিয়া বেড়ায় বিজয় মল্লিক, কিন্তু কাজ যে খুব বেশী অগ্রসর হইতেছে তাহা নয়। তাছাড়া যাহাদের উপকারের চেষ্টায় বিজয় মল্লিকের আহার নিদ্রা নাই, তাহারা যে উপকারের প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া আছে এমন মনে করিবারও হেতু নাই।

তাহারা অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়, কিন্তু মানিয়া লয়। মানাইয়া লয় আপনাদেরকে অদৃষ্টপূর্ব্ব দুঃখ দুর্দ্দশার সঙ্গে। যে অবিচারের মৃত্যু আসিয়াছে মানুষের হাত হইতে, তাহার জন্য মানুষকে তাহারা দায়ী করে না, করে নিয়তিকে।

মানুষের কাছে তাহারা আশা করে না, করে জুলুম। তাহাদের ভালো করিবার, মঙ্গল করিবার জন্য কাহারও মাথাব্যথা পড়িয়াছে এ বিশ্বাস নাই বলিয়াই ক্ষুধার অন্ন, লজ্জার আবরণ ও মাথার আচ্ছাদনের জন্য লোকের দয়ার উপর জুলুম করিয়া বেড়ায়।

তাই বিজয় মল্লিকের মত আত্মহারা প্রেমিকের কোন মূল্য নাই উহাদের কাছে, বরং অকারণ মাথাব্যথাকে সন্দেহের চোখেই দেখে তারা।

তবু বিজয় মল্লিকের ছুটাছুটির কামাই নাই।

গাড়ীর ভিতর হইতে মন্দিরা ডাকিল—ও অমরেশ দা, কোথায় চলেছেন?

অমরেশ ইতস্ততঃ করে, বিজয় মল্লিক পিছন হইতে ঠেলা মারে—অর্থাৎ চল চল নিজের কাজে চল।

অমরেশকে নিরুত্তর দেখিয়া মন্দিরা আবার বলে—কোন দরকারি কাজে না কি? না হয় তো আসুন না আমাদের সঙ্গে, বেড়িয়ে আসা যাক্।

দুই জনের মধ্যে বিশেষ করিয়া এক জনকে আহ্বান করার মধ্যে যেটুকু ভদ্রতার অভাব আছে তাহার জন্য বিব্রত বোধ করে প্রবীর, তাড়াতাড়ি বলে—ওকি মন্দিরা, ওর হাতে কাজ র'য়েছে।

—আহা বলছিই তো যদি কাজ না থাকে।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অমরেশকে ঠেলিয়া দিয়া বিজয় মল্লিক উপরপড়া হইয়া বলে—হ্যাঁ কাজ আছে বইকি, গরীবের সর্ব্বদাই কাজ। আপনাদের মত গাড়ী চড়ে, হাওয়া খেয়ে বেড়াবার অবস্থা তো সকলের নয়!

অমরেশ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, ঈষৎ বিরক্তভাবে বলে—সব সময় ফাইট্ করিসনে বিজয়, থাম্...তোমরা কোন্ দিকে প্রবীর?

—যেদিকে দু'চক্ষু যায়—প্রবীরের হইয়া উত্তর দেয় মন্দিরা—আচ্ছা থাক, আপনার কাজের ক্ষতি হয়ে যাবে কথা কইলে—আমরা নিষ্কর্ম্মা মানুষ ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

মন্দিরা কি সকলের কাছেই মান-অভিমান করিবে নাকি! আচ্ছা এক মেয়ে হইয়াছে, ভারি হাসি পায় প্রবীরের। ঈষৎ হাস্যে ঠোঁট বাঁকাইয়া বলে—ইনি সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করে মঠে আশ্রয় নিতে যাচ্ছেন, বুঝলে অমরেশ? আমি শুধু রথের সারথী।

—আঃ দাদাভাই, আবার লাগছ আমার সঙ্গে?

—লেগেই তো আছি—প্রবীর হাসিয়া ওঠে। বরং তুই-ই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিস।

—তার মানে?

—মানে, মান-অভিমানের পালা সুরু হয়েছে আর একজনের সঙ্গে।

দুষ্টহাসি হাসিয়া মৃদুস্বরে কথা কয়টা উচ্চারণ করে প্রবীর।

সহসা মুখরা মন্দিরা লজ্জায় রাঙা হইয়া চুপ করিয়া যায়, কিছু একটা উত্তর না দেওয়া যে অধিকতর লজ্জার বিষয় এ জ্ঞানটুকু থাকা সত্ত্বেও চট করিয়া উত্তর দিতে পারে না।

ইহার অবসরে—"তোমরা তা'হলে দরকারী কথাগুলো সেরে নাও অমরেশ—আমার কাজ আছে" বলিয়া বিজয় হন হন করিয়া আগাইয়া যায়।

বিজয়ের রূঢ় মন্তব্যকে অমরেশ ভয় করে—কিন্তু সুন্দরী তরুণীর অভিমানস্ফুরিত দৃষ্টির আহ্বান কি জগতের সমস্ত ভয়কে তুচ্ছ করিতে শেখায় না? তাছাড়া অভদ্রের মত কথার মাঝখানে চলিয়া যাওয়াই বা কেমন দেখায়?

মন্দিরা গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলে—যান আপনার বন্ধু রাগ করে চলে গেলেন—

—রাগ কিসের? পাগল না কি, ও অমনি ব্যস্তবাগীশ, জগতের লোকের অশান্তির চিন্তায় নিজের শান্তি হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—ও উনিই বুঝি সেই রিলিফ কমিটীর!

—হ্যাঁ তারই একটা কাজে যাচ্ছিলাম একটু।

—তাই নাকি?—অনুতপ্তভাবে মন্দিরা বলে—তা'হলে তো যথার্থই কাজের ক্ষতি করলাম, যান যান।...কিন্তু কই আমাকে তো আপনাদের মেম্বার করে নিলেন না? চলুন কোথায় আপনাদের কি হচ্ছে দেখে আসি।

প্রবীর ষ্টিয়ারিং হুইলে আঙুলের টোকায় তাল দিয়া গুনগুন করিয়া গান গাইতেছিল, আর মাঝে মাঝে মৃদু হাসিতেছিল। মন্দিরা পিছন হইতে তাহার মাথায় ঠেলা দিয়া কহিল—দাদাভাই, শুনছো আজ আর বেলুড় মঠ হ'ল না বোধ হয়।

—জানতাম হবে না!

—জানতে? কি করে শুনি?

—ঈশ্বর আমার বাড়তি দুটো চোখ দিয়ে ফেলেছিলেন কি না—ভবিষ্যৎটা পরিষ্কার দেখতে পাই।

—পাও তো বেশ করো। চলোনা দাদাভাই, আমরাও অমরেশ দা'দের...কি নাম আপনাদের সমিতির?

—নাম? 'আর্ত্তত্রাণ সমিতি' গোছের কি একটা লম্বা চওড়া আছে যেন।

—ঠাট্টা করবার কি আছে? চল দাদাভাই, আমরাও দলে নাম লেখাই গে, তবু কাজ করবার সুযোগ পাবো। সত্যি, শুধু বেড়ানো আর ঘুমানো ছাড়া কি বা করছি আমরা?

—যার যেটুকু ক্ষমতা তার বেশী সে কি করবে? —প্রবীর অভিমত ব্যক্ত করে।

—বলতে চাও কিছু কাজ করবার ক্ষমতা নেই আমাদের?

—আমার তো তাই ধারণা।

—তোমার ধারণা নিয়ে তুমি থাকো।...অমরেশদা, আমি আপনাদের দলে।—বলিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়ে মন্দিরা।

—যাক এতদিনে দেশের দুর্দ্দশা ঘুচলো আশা হচ্ছে।—বলিয়া প্রবীর গাড়ীখানা গ্যারেজে তুলিতে যায়।

'আর্ত্তত্রাণ সমিতি'র কার্য্যালয় বলিতে বিজয় মল্লিকের একতলার ঘরখানা, আর ছারপোকা বহুল একখানা বড় চৌকি। সে ঘর অবশ্য প্রবীর চেনে, যাইতে গাড়ীর প্রয়োজন হয় না। মন্দিরাকে নিবৃত্ত করিতে চাহিলে ফল ফলিবে উল্টা জানা কথা—কারণ তাহার জেদি স্বভাবের পরিচয় প্রবীরের চাইতে বেশী কে জানে? অতএব সে ভাবিল—আস্তানাটা দেখাইয়া আনি, সখ মিটুক।

বিজয় মল্লিক রাগ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছিল, সহসা উহাদের এই অভূতপূর্ব্ব আবির্ভাবে অবাক হইয়া গেল।

কিন্তু মন্দিরার সদা-সপ্রতিভ রসনা কাহাকেও চুপ থাকিতে দেয় না।

—খুব রাগ করে চলে এলেন তো? আমি কিন্তু আপনার—'আর্ত্তত্রাণ সমিতি'র একজন সভ্য হতে এলাম। আজ থেকে আমাকেও আপনাদের কাজের অংশ বহন করতে দেবেন।

—যথা, ভয়ার্ত্তকে ভরসা দান, ক্ষুধার্ত্তকে খাদ্য দান, তৃষ্ণার্ত্তকে জল দান, কি বলিস? শেষেরটা থেকেই বুঝি সুরু?

প্রবীরের টিপ্পনীতে জ্বলিয়া উঠিয়া মন্দিরা কহিল—দেখ দাদাভাই, সব কিছুই হেসে উড়িয়ে দেবার কোন মানে হয় না। তোমার যদি নষ্ট করবার মত সময় হাতে না থাকে, তুমি বাড়ী চলে যেতে পারো, এটুকু পথ আমি অনায়াসে যেতে পারবো।

—অর্থাৎ নষ্ট করবার মত সময় তোমার অজস্র আছে?

—হ্যাঁ আছে, একশোবার আছে।…কই অমরেশ দা, আপনাদের খাতাপত্র বার করুন। পরে দেখবেন মেয়েদের আপনারা যত বাজে ভাবেন, ততো বাজে তারা নয়।

—আমি কখনো বাজে মনে করি না।—অমরেশ উত্তর করে।

—কিন্তু আমি করি, মেয়েদের দ্বারা কিছু হয় এ বিশ্বাস আমার নেই।

বিজয় মল্লিকের এই রূঢ় মন্তব্যে যুগপৎ সকলেই বিস্মিত হইল, শুধু প্রবীর স্বাভাবিক পরিহাস প্রিয়তার গুণে কথার রূঢ়তা উড়াইয়া দিয়া কহিল—যাক্ আমার দলে তা'হলে একজনও আছে? ঠিক আমারও তাই মত।

মন্দিরা তীক্ষ্ণস্বরে কহিল—কেন মেয়েরা কিছু বড় কাজ করতে পারেনি, না করেনি?

প্রবীর গম্ভীরস্বরে মাথা নাড়িয়া কহিল—কেউ পারেনি এটা বলতে চাইনে—কিন্তু পার্সেণ্টেজ কষলে তার সংখ্যা এতই নগণ্য যে সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

—সেটা মেয়েদের সুযোগের অভাব।

মন্দিরাকে উত্তেজিত হইতে দেখিলেই যে প্রবীরের হাসি চাপা দায় হইয়া ওঠে, এও এক বিপদ। তবু কষ্টে সে হাসি চাপিয়া বলে—ওরে একটা প্রবাদ আছে জানিস—প্রতিভা কখনো সুযোগের মুখ চেয়ে বসে থাকে না।

—প্রবাদের কথা ছেড়ে দাও—সুযোগের দাম আছে বইকি! রবি বাবু যদি ঠাকুর বাড়ীর মত ঘরে না জন্মাতেন—

প্রবীর বাধা দিয়া বলে—থাক্ ও তুলনা ঢের শুনেছি, কিন্তু আর একটা জিনিস ভেবে দেখেছ কখনো যে, ঠাকুর বাড়ীতেও মেয়েদের অভাব ছিল না? কম্প্যারেটিভ্লি তাঁরা হয়তো তোমার-আমার ঘরের মেয়েদের চাইতেও অনেকটা এগিয়ে গেছেন—তবু নক্ষত্র নক্ষত্রই, সূর্য্য নয়।

মন্দিরা চট্পট্ একটা লাগসই উত্তর না পাইয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ভাবে বলে—আচ্ছা সেকালেও তো অনেক মেয়ে—

—যথা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, এই তো? ও সব শুনতে শুনতে কান ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, তবু বিচার বিবেচনা করে দেখলেই বুঝতে পারি, অভাব আছে বলেই মেয়েদের গুণপনার পরিচয় দিতে দু'হাজার বছর আগের নজীর হাতড়াতে হয়। মেয়েদের হাত পা-গুলো না হয় পুরুষরা বেঁধে রেখে দিয়েছে, কিন্তু মগজটা তো আর কেউ আয়রণ চেষ্টে তুলে রাখেনি? মেয়েদের মধ্যে একটা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির আবির্ভাব ঘটেছে কোনোদিন?

মন্দিরা আর কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই অমরেশ হাসিয়া কহিল—তোরা সারাদিন এক বাড়ীতে বাস করিস প্রবীর ?

মন্দিরা দীপ্ত দুইটি চোখ অমরেশের দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া কহিল—সারাদিন ঝগড়া করি এই বলছেন তো ?

—বলিনি কিছু, শুধু অনুমান করছি।

—ঝগড়া না হলে বুঝতে হবে—সেদিন শ্রীমতীর স্বাস্থ্য ভাল নেই, বুঝলে অমরেশ।—প্রবীর হাসিতে হাসিতে বলিল।

—সর্ব্বনাশ!—মন্দিরার কান বাঁচাইয়া অমরেশ মৃদুস্বরে কহিল—অভ্যাসটি তো সাংঘাতিক খারাপ করে রাখছ হে, ভবিষ্যতে যিনি ভুগবেন, তাঁর অবস্থাটা ভেবে দেখেছ ?

—ভেবে আর কি করবো, যার যা ভাগ্য! কিন্তু কই তোমাদের সমিতির খাতাপত্তর কিছু আছে, না কি তাও নেই ?

বিজয় মল্লিক গম্ভীর ভাবে বলে—কাগজে কলমে কাজ আমরা করি না, যা করি হাতে-কলমেই করি। চাঁদার খাতা অবশ্য আছে একটা, কিন্তু বড়লোকের দয়ার দান আমরা নিতে ইচ্ছুক নই।

কথা বলে বিজয়, কিন্তু বিব্রত হইয়া উঠে অমরেশ। কথা চাপা দিবার জন্য বলে—কিন্তু শুধু তোমার-আমার দয়ার দানে তো গরীবের পেট ভরবে না বিজয়, তাছাড়া ইনি তোমার সমিতির মেম্বার হতে চান, ভেবে দেখ এতে সুবিধেও কত। ধর গরীবের ঘরে ঘরে ঢুকে, তাদের মেয়েদের সঙ্গে কথা কয়ে, তাদের সুখ-দুঃখের ইতিহাস সংগ্রহ করে আনা মেয়েদের দ্বারা যত সহজে হতে পারবে, তেমনি আমাদের দিয়ে হবে কি ?

মন্দিরা অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল—থাক অমরেশ দা, আপনাকে আর আমার হয়ে সুপারিশ করতে হবে না। উনি সমিতির কর্ত্তা, ওঁর যখন ধারণা বাজে লোক ঢুকিয়ে কাজ হবে না, তখন আর বলবার কি আছে! আমরা অকর্ম্মা, আমরা রাবিশ, আমরা ঢেঁকি, সেই ভাল।

এবার বিজয়ও হাসিয়া উঠে। অপ্রতিভ ভাবে বলে—এই দেখুন আপনি রেগে যাচ্ছেন! মানে আমি বলতে চাচ্ছি—অর্থাৎ আমার বক্তব্য—আমরা যতটা কষ্টসহিষ্ণু আপনারা ততটা—

—নাই বা হ'ল, কিন্তু কাজেরও তো ডিভিশান আছে ? তাছাড়া 'আহা উহু' 'বেচারা অবলা' শুনে শুনেই আমাদের হাত-পা বুদ্ধিবৃত্তি সব পঙ্গু হয়ে গেছে জানেন ?

ইতিমধ্যে আরো জনকয়েকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। সাধারণতঃ এ সময়টা সমিতির ঘরে তালা দেওয়া থাকে, অসময়ে আলো ও মনুষ্য কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া উঁকি দিতে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে গুটি গুটি।

সমরও আসিয়াছিল, তবে সাধারণতঃ সে বসিতে চাহে না, দাঁড়াইয়া কথা কহিতেই ভালবাসে, তাই দরজার বাহিরে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল। মন্দিরার কথাটা শেষ

হইতেই ভিতরে ঢুকিয়া কহিল—আশা করি আপনার কথার উত্তরে দু'একটা কথা বললে আপত্তি করবেন না।

—না।

মন্দিরা একটু আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া থাকে।

—বললেন তো বড় বড় কথা, কিন্তু আজকের দিনে শিক্ষা দীক্ষার সুযোগ সুবিধে কোনোটাই তো পুরুষের চেয়ে কম পাচ্ছে না মেয়েরা, তার প্রতিদান কই? লম্বা লম্বা ডিগ্রিই নিচ্ছে অথচ দিচ্ছে কি দেশকে? দু'জন মেয়ে একত্র হলেই কি আলোচনা করবে জানেন? লেস আর ফিতে, জরি আর জর্জেট—তা সে রান্নাঘরেই হোক, আর ড্রইংরুমেই হোক। ডক্টরেট পেয়েছেন এমন এক ভদ্রমহিলা লেকচার দিচ্ছেন—ভারতের ঐতিহ্য আর কৃষ্টির ইতিহাসের, তাঁর পরিধানে অর্গ্যাণ্ডি শাড়ী আর নেটের ব্লাউজ, হাতে ঢুকিয়েছেন ডজন দুই কাঁচের চুড়ি আর মুখের সজ্জায় কাজল এবং লিপষ্টিকের শ্রাদ্ধ! কি বলেন একে? —একটা মেয়েকে যদি সারা পৃথিবী ঘুরিয়ে আনেন, সে শিখে আসবে কি—না কোন দেশের মেয়েরা কি ভাবে নিজেদেরকে পুরুষের চোখে অধিকতর এট্রাক্টিভ করে তুলছে তারই কৌশল। অস্বীকার করুন, বলুন সত্যি নয়?

অমরেশ বিরক্ত ভাবে বলে—কি বাজে বক্‌ছিস সমর, স্থান-কাল-পাত্র বলে একটা জিনিস আছে, সে জ্ঞানটা হারিয়েছিস?

মন্দিরা আরক্ত মুখে বলে—বলেছেন হয়তো ঠিকই, কিন্তু এটা হচ্ছে অনেক যুগের অলসতার ফল। একদিন হয়ত পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে বাস্তবের রূঢ় ক্ষেত্রে খাটতে খাটতে তার নিজের চোখের কাজল আর পুরুষের চোখের মোহ দুইই মুছে যাবে।

প্রবীর ছদ্ম গাম্ভীর্য্যে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া ধীরে ধীরে বলে—ঈশ্বর করুন সে একদিনটা আমার জীবদ্দশায় না আসে। উঃ কী ভয়াবহ সেই দিন!…কিন্তু তুমি এক কাজ কর সমর, লড়াইয়ে যাও, সেটাই তোমার উপযুক্ত বিচরণক্ষেত্র। এতখানি স্পিরিট নষ্ট হতে দেওয়া ঠিক নয়।

—লড়াইয়ে যেতাম, যদি এই হতভাগা দেশটাকে উচ্ছেদ করবার সুযোগ পেতাম। এই বিজয়ের 'আর্ত্তত্রাণ'! শুনলে হাসি পায়! সারা দেশটা মরে পচে গন্ধ বেরুচ্ছে—এক মুঠো খুদ নিয়ে ত্রাণ করতে এসেছিস কা'কে? দুটো দুটো ভাত খাইয়ে কোন রকমে দেহ পিঞ্জরের প্রাণপাখীটাকে আটকে রেখে লাভটা কি? একে কি বাঁচা বলে? ফুটপাতে পড়ে মরছে?—মরুক না! যাদের মরবার সময়ে ফুটপাত ছাড়া আর কিছু জোটেনি, তাদের মরাই উচিত। তোমার বাড়ীর আঁস্তাকুড়ে একটু ঠাঁই দিয়ে, আর তোমার নর্দ্দমায় ফেলে দেওয়া একটু ফ্যান খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে কেন তুমি? কি রাইট আছে তোমার খোদার ওপর খোদকারী করার? দুটো আতস বাজীর আগুনে ক'টা হতভাগার লীলাখেলা শেষ হয়েছে, তা'তেই একেবারে বিগলিত দরদে গদ গদ হয়ে উঠেছ? লজ্জা করে না? সমস্ত দেশটা যেদিন দাউ দাউ করে জ্বলবে, সেই দিনই আমার শান্তি হবে, তার আগে নয়!

সমরের কথার ছটায় মন্দিরা নীরব হইয়া গিয়াছিল, প্রবীর কণ্ঠস্বরে চিন্তার সুর আনিয়া কহিল—সমর, তুমি মাথায় মাখতে কি তেল ব্যবহার কর ?

—কেন ? যা পাই। হঠাৎ ?

—মানে—আমি বলছিলাম কাঁচা তিলের তেলটা ভালো জিনিস, নিয়মিত ব্যবহার করে দেখতে পারো। অর্থাৎ দেশের সেই চরম সুখের দিনটা আসা পর্য্যন্ত মাথাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো ? ওটাই আবার কোন দিন না দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে তাই ভাবছি।

—তোমার মত নাড়ুগোপালের উপযুক্ত কথাই হয়েছে—বলিয়া কপাটটা সশব্দে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া পথে নামিয়া পড়ে সমর।

পরিহাস এবং উপহাসের মধ্যকার সূক্ষ্ম প্রভেদটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি সকলের থাকে না। সমর ইহাদেরই দলে।

অবশ্য বিনা প্রতিবাদে দাদাভাইয়ের এমন অপমান সহিয়া যাওয়া মন্দিরার পক্ষে কষ্টকর। সমরের অভাবে সমরের বন্ধুবর্গকেই সে দেখিয়া লয়।

ক্রমশঃ তর্ক পূর্ব্ব খাতে ফিরিয়া আসে, মন্দিরার সারালো এবং ধারালো যুক্তির মুখে বিজয় মল্লিকের পূর্ব্ব কথা ভাসিয়া যায়, ভাবুক বিজয় আবার নূতন আলোক দেখে, নারীই পুরুষের কর্ম্মের প্রেরণা, শক্তির উৎস, শ্রান্তির ঔষধ, এই সহজ কথাটা এতদিন উপলব্ধি করে নাই কেন এই ভাবিয়া আপশোষ আর উৎসাহে হাঁফাইয়া উঠে একেবারে।

তর্কে তর্কে যথেষ্ট রাত্রি হইয়া গিয়াছিল, প্রবীর এইবার উঠিয়া পড়িয়া বলে—আচ্ছা আজ তা'হলে ওঠা যাক, ঈশ্বরের ইচ্ছেয় কাছে পিঠে দু'চারটা বোমা পড়ে রাতারাতি, তা'হলে মেয়েদের 'অফুরন্ত কর্ম্মশক্তি আর কোমল হৃদয়বৃত্তির' আসল নমুনাটা চট করে দেখে ফেলা যায়।

বলা বাহুল্য মন্দিরারই ভাষার নমুনা এটা।

অমরেশও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িতেছিল, বিজয় তাহাকে টানিয়া বসাইল, আরো অনেক কিছু আলোচনা করিবার আছে তাহার। অগত্যা বাধ্য হইয়া অমরেশকে বসিয়া পড়িতেই হয়।

মন্দিরা দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া কহিল—বিজয় বাবু চললাম, কিছু মনে করবেন না।...অমরেশ দা, বৌদিকে আমার প্রণাম দেবেন—আর আপনি নেবেন নমস্কার।

তাহারা দু'জনে পথে নামিতেই পিছন হইতে বিজয় একটা টর্চ্চ ধরিয়া আলো দেখাইল। রাত্রি সত্যই বেশী হইয়া গিয়াছিল।

পথে বাহির হইয়া প্রবীর বলিল—কি গো মহাশয়া, ভক্তি যে একেবারে উথলে উঠলো দেখছি ?

—অভক্তি হবারও কোনো কারণ নেই। ছোট থেকেই বড় হয় জিনিস, হঠাৎ একটা বড় কিছু গজিয়ে ওঠে না।

—ওঠে বৈ কি।

—কি ?

—হাতীর ডিম এবং তোমার মগজ।

ইহার পর মন্দিরাকে কথা বলানো দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে, এবং যদি বা এতক্ষণ সংকল্প শিথিল ছিল, এখন মনে মনে প্রতিজ্ঞাই করিয়া বসে, সমিতির উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য সে করিবেই।

বলা বাহুল্য, বাড়ীর কথা—পিতার আসিবার কথা, কিছুই মনে ছিল না তাহার।

কিন্তু বাড়ীতে তখন বিপরীত আবহাওয়া বহিতেছিল।

আনন্দময়ী আসিয়াছেন, যতীন মুখুজ্যে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অন্দরে আসিয়াছেন। উপস্থিত আপ্যায়ন, সময়োচিত ভোজন, কুশল প্রশ্নের বিনিময় ইত্যাদি যথারীতি শেষ হইয়াছে—ভদ্রলোক এখন কন্যাকে দেখিবার আশায় উৎসুক, আগ্রহান্বিত, ব্যস্ত, ইত্যাদির অবস্থা অতিক্রম করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বিরক্তির পর্য্যায়ে আসিয়াছেন।

কিন্তু কন্যার দেখা নাই।

না প্রবীর, না মন্দিরা। কাহারও চুলের টিকিটি পর্য্যন্ত না দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীও স্থির নাই। বেড়াইতে যাইব বলিয়া বাহির হইয়াছে অথচ গাড়ী পড়িয়া আছে নাকি গ্যারেজে। কি প্রয়োজনে গেল, কোথায় গেল, কখনইবা আসিবে, এই সহজ ও সরল প্রশ্ন তিনটির সদুত্তর দিতে রীতিমত বেগ পাইতে হইতেছে তাঁহাকে। এবং তাহারই ঝাল ঝাড়িতে স্বামীর দরবারে আসিয়া হাজির হন তিনি।

যতীন মুখুজ্যে আলবোলার নলটা মুখ হইতে সরাইয়া কহিলেন—বললে তুমি রেগে যাবে ছোটরাণী, কিন্তু শাসন একটু থাকা দরকার বই কি,—শাসন থাকা দরকার। তোমারি যে ছেলেমেয়ের ওপর দাব নেই একেবারে।

অভিমান ভরা কণ্ঠে জ্যোতির্ম্ময়ী কহিলেন—শাসনটা তুমি করলেই পারো। আমি এটা করতেও পারি না, সইতেও পারি না।

যতীন মুখুজ্যে বাঁধানো দাঁতে হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন—সে কথা একশো-বার, ওই তো চোখে জল এসে গেছে। ছি ছি, আচ্ছা পাগল তো! এসো এসো, কাছে এসো।

—কেন, বেশ আছি।

অদূরে একখানা চেয়ার দখল করিয়া বসিয়াছিলেন জ্যোতির্ম্ময়ী।

—না বেশ নেই, এসো। কেন বুড়ো মানুষকে ওঠাবে?

—কে বলেছে উঠতে।

—বলেছে? বলেছে—ওই দুটি ছল ছল চাউনি, ওই রাঙা রাঙা মুখটি।

—হয়েছে, বুড়ো বয়সে আর বাজে বোকো না বেশী।

—বুড়ো আর হতে দিলে কই ছোটরাণী! তোমায় দেখলেই তো আমার পঁচিশ বছর বয়স কমে যায়।

—দেখো যেন বার বার দেখোনা, কমতে কমতে শেষে কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে—বলিয়া ঘরের বাহির হইয়া যান জ্যোতির্ম্ময়ী।

—বুড়োকে ভাসিয়ে দিয়ে কোথায় চললে?

—যুবোর কাছে, বলিয়া মুচকি হাসিয়া প্রস্থান করেন জ্যোতির্ম্ময়ী।

নাতজামাই একাকী বসিয়া আছে ভাবিয়া তাঁহার স্বস্তি ছিল না।

কিন্তু আনন্দময় একা ছিলেন না, কাছে ছিলেন অরুণপ্রভা। বিরাট দেহভার বহিয়া তিনি এ অঞ্চলে বড় একটা আসেন না, কোন সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির প্রেরণায় মেদবহুল শরীরটাকে এতটা নাড়া চাড়া করিয়াছেন সেটা প্রণিধান যোগ্য।

সেইমাত্র পূর্ব্বকথার জের টানিয়া বক্তব্য শেষ করিলেন—তোমরা ভাই পল্লীগ্রামের মানুষ, তোমাদের কথা বাদই দাও, আমাদের চোখেই এসব বেল্লাড়াপনা কটু ঠেকে! হ্যাঁ শিক্ষা দেখতে চাও তো দেখগে আমার ঘরে! নিজের মুখে বললে গৌরব করা হয়, ছেলে মেয়েদের সায়েস্তা করতে হয় কেমন করে আমার কাছে শিখে যাওয়া উচিত লোকের।

আনন্দময় গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া সায় দিতেছিলেন।

বস্তুতঃ আনন্দময়কে দেখিয়া আনন্দের উদয় হইবার কোনই কারণ নাই, কিন্তু নামের সার্থকতা কয়জনেরই বা থাকে! সমান করিয়া ছাঁটা ছোট ছোট চুলের নীচে পেশীবহুল নীরস মুখ, চোখের দৃষ্টি রুক্ষ রূঢ়। আঁটসাঁট বেঁটেখাটো গড়ন, শুধু রংটা ধবধবে ফরসা বলিয়াই বিশ্রী বলা চলে না। কিন্তু দেখিলে কাছে ঘেঁষিবার সখ বড় একটা হয় না।

জ্যোতির্ম্ময়ী অবশ্য ইহাকে সঙ্গী হিসাবে বাঞ্ছনীয় বলিয়া আসেন নাই, আসিয়াছিলেন নিতান্তই কর্ত্তব্যের তাগিদে। তবে অরুণপ্রভাকে আসর জমাইয়া রাখিতে দেখিয়া বুঝিলেন, না আসিলেও ক্ষতি ছিল না। এখন অবশ্য চলিয়া যাওয়া যায় না, কাজেই মৌখিক, হাসি টানিয়া কহিলেন—ছোড়দি যে আগে থেকেই নাতজামাইকে দখল করে বসে আছো দেখছি!

—দখল করা-করি আর কি বল? দেখলাম একলা বসে রয়েছে বেচারা- পল্লীগ্রামের লোক এ-অঞ্চলের ধরন-ধারণ দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছে, তাই দুটো কথা কইছিলাম। যাক যাচ্ছি—নষ্ট কররার মত সময় আমারও বেশী নেই।

টানাস্বরে কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া অরুণপ্রভা চক্ষুলজ্জার মাথায় পদাঘাত করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখের সামনেই উঠিয়া যান বিপুল দেহখানি টানিয়া!

—আশ্চর্য্য হবার বিষয় কি দেখলে বলতো ভাই?

সোৎসুকে প্রশ্ন করেন জ্যোতির্ম্ময়ী।

—আমরা গরীব মানুষ, আমাদের চোখে আপনাদের বড়মানুষী কায়দা—বুঝলেন কিনা, সবই আশ্চর্য্য ঠেকে। এই যে আপনারা আপ-টু-ডেট ছেলে-মেয়ে তৈরী করছেন, আমাদের অঞ্চলে—বুঝলেন কিনা, বয়স্থা মেয়েকে সহোদর ভাইয়ের সঙ্গেও এক প্রহর রাত অবধি বাইরে হাওয়া খেতে ছেড়ে দেবার রেওয়াজ নেই।

কথাটার অপমানকর ইঙ্গিতে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেলেও জ্যোতির্ম্ময়ী ঠোঁটের হাসি বজায় রাখিয়া কহিলেন—ওইখানেই তো মজা, কেউ বা কুয়োর ভেতরটাই সারা জগৎ মনে করে সুখে কাল কাটায়, কারোর বা পৃথিবীখানাতেও কুলোয় না, আকাশে উড়তে চায়।

জ্যোতির্ম্ময়ীর শ্লেষাত্মক বাক্যের প্রচ্ছন্ন মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া আনন্দময়ও জ্বলিলেন, এবং তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—তা যা বলেছেন, আমাদের হচ্ছে সেই কূপমণ্ডুকের দশা, উড়তে শিখলে বোধহয় ভালই হ'ত, শহরে এসে সমাজে কল্কে পেতাম।···আচ্ছা প্রণাম হই।

জ্যোতির্ম্ময়ী ঈষৎ শঙ্কিত ভাবে কহিলেন—সে কি প্রণাম কিসের, চলে যাচ্ছো না কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—না না, তাই কখনো হয় নাকি? বললে যে থাকবে দু'দিন?

—ভেবে দেখলাম না থাকাই যুক্তিসঙ্গত। দাদামশাইকে নমস্কার দেবেন।

বলিয়া গটগট করিয়া বাহির হইয়া যান আনন্দ সান্যাল—প্রত্যেকটি পদক্ষেপে অভিযোগের সুর ফুটাইয়া।

ক্রোধে, ক্ষোভে, লজ্জায় সিঁদুরের মত রাঙা হইয়া উঠে জ্যোতির্ম্ময়ীর সারা মুখ। উদ্যত বজ্রের মত সমস্ত ক্ষোভ, সমস্ত লজ্জা, সমস্ত ক্রোধ, স্থির হইয়া থাকে অনুপস্থিত অপরাধী-যুগলের উদ্দেশে।

এতখানি অপমানিত তিনি জীবনে হন নাই।

আজ প্রথম অনুভব করিলেন মন্দিরা তাঁহার আপন সন্তান নয়, প্রথম বিবেচনা করিলেন পরের সন্তানকে আপন করায় গৌরব নাই।

অপরাধীরা অবশ্য স্বপ্নেও ভাবে নাই তাহাদের আচরণে বাড়ীতে এত অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। নূতন ভাবের উদ্দীপনায় প্রবল তর্কের ঝড় তুলিয়া আসিতেছে তাহারা। শেষ মীমাংসার ভার অবশ্য জ্যোতির্ম্ময়ীর।

বরাবর উভয়ের তর্কযুদ্ধে জ্যোতির্ম্ময়ী যুক্তির বালাইহীন কাঁচা তার্কিকটির পক্ষই গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধির জোরে তাহার কাঁচা মতটিকে দাঁড় করাইয়া দিয়া প্রবীরকে জব্দ করেন।

কাজেই মন্দিরা—'মা, ও মা-মণি গো" শব্দে বাড়ী সচকিত করিয়া লাফাইতে লাফাইতে উপরে উঠিয়া আসিল।

বলা বাহুল্য পিতার কথা তাহার মনেও ছিল না।

স্তব্ধ গম্ভীর মুখে তেমনি বসিয়াছিলেন জ্যোতির্ম্ময়ী, মেয়ের ডাকে সাড়া দিলেন না।

সারাবাড়ী ঘুরিয়া অবশেষে এ-ঘরে আসিয়া উভয়েই বিস্মিত ভাবে কহিল—কি হয়েছে মা তোমার?

জ্যোতির্ম্ময়ীর নীরবতায় আরো আশ্চর্য্য হইয়া মন্দিরা পিঠের উপর পড়িয়া দুই হাতে গলা জড়াইয়া কহিল—বল না মা, কি হ'ল?

হাত দুইখানা ছাড়াইয়া দিয়া জ্যোতির্ময়ী কঠিন কণ্ঠে কহিলেন—কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?

—একটা নতুন জায়গায় মা, রাগ করেছ?

ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে উত্তর করে প্রবীর।

—আমার রাগে কি এসে যাচ্ছে তোমাদের?…মন্দির', আজ তোমার বাবা এসেছিলেন জানো?

রৌদ্রে ঝলসাইলে ফুটন্ত ফুলের যেমন অবস্থা হয়, তেমনি অবস্থা ঘটে মন্দিরার হাস্যোজ্জ্বল মুখের।

—তোমাদের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে চলে গেছেন, আমার অনুরোধ ঠেলে।

মার অনুরোধ ঠেলিয়া যাওয়ার মত অভদ্র কাজ করা যাহার পক্ষে সম্ভব তাহার জন্য সমীহ-বোধ থাকা অনাবশ্যক জ্ঞানে মন্দিরা সহসা জলিয়া উঠিয়া বলে—কেন, কী এমন দুর্ব্যবহার করেছি আমরা!

—তিনি আসছেন জেনেও রাত নটা পর্য্যন্ত বাইরে থাকা উচিত হয়েছে তোমার?

অনুচিত হইয়াছে স্বীকার করিতে গর্ব্বে আঘাত লাগে, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলভাবে মন্দিরা বলে—তা'তে কি হয়েছে বাপু, আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না? দিব্যি জামাই-আদরে খেয়ে দেয়ে সাটিনের বিছানায় লম্বা হলেই পারতেন—আমার জন্যে এত মাথা ব্যথা কেন বাবা?

—তার কারণ তুমি তাঁরই মেয়ে, আমার নও। সত্যিকার দাবি আমার নেই বলেই অনায়াসে অপমান করে যেতে বাধল না তাঁর। প্রবীরের কাজের কৈফিয়ৎ চাইবার সাহস কি জগতে কারুর আছে? এখন দেখছি তোমাকে এভাবে আদর দেওয়া আমার ভুলই হয়েছে।

এ রকম মর্ম্মান্তিক নিষ্ঠুর উক্তিতে মন্দিরার সমস্ত শরীর আলোড়িত করিয়া একটা চাপা কান্নার বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

—দিও তা'হলে আমাকে বিদেয় করে।—বলিয়া কান্না চাপিতেই বোধ করি দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায় মন্দিরা।

প্রবীর ব্যথিতভাবে তাহার গমনপথের পানে চাহিয়া ম্লান স্বরে বলে—তুমি কি পাগল হলে মা? ওটার কি সত্যিই কোন বোধ আছে?

—ওর নেই, তোমার তো ছিল?

—আমি কোন অন্যায় করেছি বলে মনে করি না।—বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া বাহির হইয়া যায় প্রবীর। অবহেলার সুর স্পষ্ট হইয়া উঠে তাহার কণ্ঠস্বরে।

স্তব্ধ অনড় হইয়া বসিয়া থাকেন জ্যোতির্ম্ময়ী।

শিশুর মত আদর করা যায়, কিন্তু শিশুর মত শাসন করা চলে না। হাসে লাফায় ছুটাছুটি করে, আবদারে খুনসুড়িতে অকারণ আনন্দে পাখা মেলিয়া উড়িয়া বেড়ায়, দেখিলে

মনে হয় ভার নাই, ওজন নাই। কিন্তু এতটুকু অভিযোগের স্বর, একতিল শাসনের দৃষ্টি দেখিলেই মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়ে সাবানের ফানুসের মত, রঙচঙে আবরণখানা। ভিতর হইতে উঁকি দেয় কঠিন লৌহপিণ্ড।

বড় সাবধানে ঘর করিতে হয় আধুনিক ছেলে-মেয়েদের লইয়া। যেটুকু মান বাঁচাইয়া চলে, সে যেন নিতান্তই করুণা করিয়া—অনায়াসে অপমান করিয়া বসিতে ইহাদের বাধে না। বয়সের মর্য্যাদা, সম্বন্ধের মর্য্যাদা দূরে থাক, স্নেহের সম্মানটুকুও রাখিতে জানে না ইহারা।

সত্য বটে—এমন কিছুই বলে নাই প্রবীর, কিন্তু তাহার গলার স্বর, চোখের চাহনি, প্রতিটি পদক্ষেপ জানাইয়া দিয়া গিয়াছে প্রয়োজন হইলে অনেক কিছুও বলা অসম্ভব নয়।

সহসা নিজের পানে চাহিয়া দেখেন জ্যোতির্ম্ময়ী।

এই দীর্ঘ জীবন নির্ব্বিরোধ শান্তিতে কাটিয়া গেল কিসের অনুশাসনে? প্রতি মুহূর্ত্তে যে বিদ্রোহ মাথা তুলিতে চাহিয়াছে—তাহাকে পিষিয়া মারিয়াছে কোন শাস্ত্র-মন্ত্র?

যে নতুন বৌ বৃদ্ধ যতীন মুখুজ্যের শয্যাপার্শ্বে ধরা দিয়াছে সে কি জ্যোতির্ম্ময়ী?

তবু এ অভিনয়ও নয়, ছদ্মবেশও নয়। রক্তের সঙ্গে মিশিয়া আছে যে নম্রতা, যে বাধ্যতা, অদৃষ্টকে মানিয়া লইবার যে শিক্ষা, এ শুধু তাই।

আধুনিক ছেলে-মেয়েরা চলে আপন আপন হৃদয়ের অনুশাসন মানিয়া। কিন্তু কোনটা ভাল? জিতিল কাহারা?

দিন কয়েক পরের কথা। অমরেশ আসিয়াছিল মন্দিরা ও প্রবীরের খোঁজে। প্রবীর তাহাদের সমিতিতে দুই-তিন দিন গিয়াছিল মাত্র, কিন্তু মন্দিরা মহোৎসাহে দুই বেলা যাতায়াত করিয়াছিল। হঠাৎ দুই দিন একেবারে চুপচাপ। কাজ কতটা অগ্রসর হইয়াছে সেটা সমিতিই জানে, কিন্তু হৃদয়টা কি বড় বেশী অগ্রসর হইতেছে না? নিত্য দুই বেলা সমিতির অফিসে যাইবার যে প্রেরণা তাহাকে ঠেলা মারিয়া বাহিরে পাঠায়, সেটা যথার্থই পরোপকার স্পৃহা কিনা, সেটা যাচাই করিতেই বোধহয় মন্দিরা দুই দিন আপনাকে দমন করিয়াছিল। অমরেশ আসিয়া হাসিয়া কহিল—'মেয়েদের অফুরন্ত কর্ম্মপিপাসা' কি মিটে গেল নাকি?

মন্দিরা কুণ্ঠিত হাস্যে কহিল—খুব নিন্দে কচ্ছেন!

—কেন করব না?

—বেশ করুন, যত খুসী। আমি এদিকে অসুখে মরে যাচ্ছিলাম, একবার খোঁজও তো নিলেন না?

—অসুখ করেছিল?—অনুতপ্ত হইয়া উঠে অমরেশ। কি আশ্চর্য্য, প্রবীর তো বললে না একদিনও!

অবশ্য ও-অনুযোগের কোন কারণ ছিল না, প্রবীর বাড়ীর কোন কথা কখনো আলোচনা করে না।

তবু মন্দিরার অসুস্থতার-সংবাদ না জানা যেন কেমন অন্যায় অপরাধ বলিয়া মনে হয় অমরেশের। কি সূত্রে কখন যে এই আত্মীয়তা স্থাপন হইল সেটুকু ভাবিয়া দেখিবার ধৈর্য্য হয়তো ছিল না। শুধু অমরেশের মনে হয়—মন্দিরার মুখখানি শুকনো, হাসি ম্লান, আগের চাইতে যেন অনেক রোগা হইয়া গিয়াছে সে।

ব্যথিত স্বরে বলে—কই, কি হয়েছিল বললে না তো ?

অসুখের ছলনাটুকু অবশ্য মন্দিরার বানানো, কিন্তু এই সামান্য মিথ্যাটুকু যদি এমন কাজে লাগানো যায়, ক্ষতি কি ?

—সে জেনে আপনার লাভ ? শুনলে কি দেখতে আসতেন ?

—দেখতে ? হয়তো আসতাম না মন্দিরা, কিন্তু দেখতে আসাই কি সব ? দেখতে না আসার মধ্যে কি কিছুই থাকতে পারে না ?

এই স্থির অকম্পিত দৃষ্টির সামনে চোখ তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না মন্দিরা। খেলাচ্ছলে কথার জাল বুনিয়া দীর্ঘপথ চোখ বুজিয়া পার হওয়া সহজ, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোই কঠিন।

তাই সহসা কাঁপিয়া ওঠে সে।

অমরেশ উত্তরের প্রতীক্ষায় চাহিয়া থাকিয়া ম্লানস্বরে বলে—রাগ করলে মন্দিরা ?

—বাঃ কেন ?

—ভাবছো লোকটার কী স্পর্দ্ধা ? কিন্তু বলবার সাহস যদি দাও তাহলে বলবো— হয়ত দেখতে আসতাম না, কিন্তু আমার সমস্ত দিন-রাত্ত ভরে থাকতো সেই মধুর বঞ্চনায়। অন্য কোন অধিকার না থাক, কল্পনা করার অধিকার তো কেউ বন্ধ করতে পারে না ?

—বা-রে, অসুখ করলে দেখতে আসবেন—তা'র আবার অধিকার অনধিকার কি ? কি যে মাথামুণ্ডু বকেন আপনি।

অমরেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে মন্দিরার মুখের পানে। সত্যই কি এত ছেলেমানুষ সে, না আপনাকে লুকাইবার এ সকল ছল মাত্র। অমরেশ কি বড বেশী বোকামি করিয়া ফেলিয়াছে ?

এত অল্প পরিচয়ে এত কাছাকাছি আসিবার চেষ্টা পাগলামি নয় তো ?

কিন্তু এই সামান্য পরিচয়ে হৃদয়াবেগে এমন অসামান্য হইয়া উঠিল কেন অমরেশ ? গরীবের এ কি আকাশকুসুম কল্পনা ?

তাড়াতাড়ি আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া অমরেশ বলে—আচ্ছা তোমার যখন শরীর ভাল নয় তখন তো যাওয়া হতেই পারে না। প্রবীর এলে বোলো।

—চলে যাচ্ছেন বুঝি ? বসুন না আর একটু—দাদাভাই আসবেন এখুনি।

আপনাকে আড়াল করিতে একখানা খবরের কাগজ মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বসিয়া থাকে অমরেশ যেন প্রবীরের প্রতীক্ষায়। আর মন্দিরা অকারণ টেবিলের এটা-ওটা নাড়া-চাড়া করিতে থাকে। কথাও যোগায় না, চলিয়া যাইতেও পারে না।

হঠাৎ চমক ভাঙে কুমুদ ঝির ব্যস্ত ডাকে—

—দিদিমণি তুমি হেথা? সেই থেকে খুঁজতেছি—দাদাবাবু কম্‌নে গেল?

—দাদাভাই নেই তো, কেনরে কুমুদ?

—তুমি একবার এস দিকিন যদি ডাক্তারবাবুকে টিলিফোন করতি পারো—বড়বাবু কেমন যেন করতেছে!

—সে কি?...কেনরে?...কখন?

কুমুদের ভয়ার্ত্তভাব মন্দিরার মুখ পাংশু করিয়া তোলে।

—এই খানিক আগে ছোটমার কাছে বুঝি জল চায়লো, জল এনে দেখে ঘাড় গুঁজে ঢুলতেছে, সাড়াও দেয় না, চোখও খোলে না—

রুদ্ধকণ্ঠে অমরেশকে চলিয়া যাইতে নিষেধ করিয়া মন্দিরা ছুটিয়া উপরে উঠিয়া যায়।

তখন চাকররা ধরাধরি করিয়া চেয়ার হইতে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়াছে যতীন মুখুজ্যেকে।

জ্যোতির্ময়ী তখনো অসহায় স্বরে ডাকিতেছেন—শুনছো ওগো, কি, কষ্ট হচ্ছে? শুনছো?

কিন্তু যতীন মুখুজ্যে আর শুনিলেন না। সাধের ছোটরাণীকে ফেলিয়া সুদীর্ঘকাল পরে বোধকরি পলাতক বড়রাণীর অভিমান ভাঙ্গাইবার উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন তখন।

শ্মশান হইতে ফিরিয়া ভিজা কাপড়ে বাড়ী ঢুকিতেই কৃষ্ণবালা স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—তুই আবার কি করতে মরতে ওদের মড়ায় কাঁধ দিতে গেলি অমরেশ? বড় মানুষের সেথোর অভাব কি?

—অভাব না থাকলে যেতে নেই?—বলিয়া আরতি প্রদত্ত শুকনো কাপড়খানা হাত বাড়াইয়া ধরিয়া ফেলে অমরেশ।

—যেতে থাকবে না কেন, ভাব-ভালবাসা থাকলে সবই আছে।...ভাব ভালবাসার উপর একটি বিশেষ সুর বসাইয়া কৃষ্ণবালা কথাটার উপসংহার করেন অন্য প্রশ্নে।...মিনসের কি হ'ল হঠাৎ?

—হার্টফেল করলেন।

—তা বুড়োর বয়েস কম হয়নি—এ পক্ষের বৌ নিয়েই বিশ-পঁচিশ বছর ঘর করলো। টাকার কুমীর ছিল মিনসে, ওই ছোটগিন্নীর ছেলেটাই বোধ হয় সব গ্রাস করবে? নাকি ও পক্ষের মেয়ের যে নাতনী ছুঁড়িটাকে মানুষ করেছে সেটাকেও দেবে-থোবে কিছু?

—আমি অত কথা জানবো কি করে?—বিরক্তভাবে উত্তর করে অমরেশ।

—কেন, ছুঁড়ির সঙ্গে তো তোর খুব ভাব শুনতে পাই, আমাদের মেনি বলছিল 'বুড়োর মরণকালে—'অমরেশদা অমরেশদা' করে ছুঁড়ির কী ঢলাঢলি!" মেনির সই পদ্ম বুঝি গেছল রগড় দেখতে।

—মানুষের মরণকালে যারা রগড় দেখতে যায়, তাদের গলায় দেবার দড়ি যদি না জোটে

পিসীমা, বোলো আমি নিজের পয়সায় কিনে পাঠিয়ে দেব। আর তোমারও একগাছা—বলিয়া কৃষ্ণবালাকে মূক করিয়া দিয়া সশব্দ পদক্ষেপে উপরে উঠিয়া যায় অমরেশ।

পিসীমার বিদ্রূপকুঞ্চিত কদাকার মুখের পানে চাহিতেও ঘৃণা বোধ হয় তাহার। এই অভদ্র ইতর নির্লজ্জ মানুষটাকে এতকাল ধরিয়া ভয় সমীহ তো দূরের কথা, সহ্য করিয়া আসিয়াছে কেমন করিয়া এই ভাবিয়া আশ্চর্য্য লাগে অমরেশের।

কৃষ্ণবালা রুদ্ধ আক্রোশে কিছুক্ষণ দাপাদাপি করিয়া পাড়ায় বাহির হইয়া যান বিষ উদগীরণ করিতে।

ইহারই কিছুক্ষণ পরে ও বাড়ী হইতে মেনকা আসিল বেড়াইতে।

—অমরেশদা বুঝি বাড়ী নেই, বৌদি?

আরতি তাড়াতাড়ি একখানা পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া কহিল—বোসো ঠাকুরঝি।

—না আর বোসব না, আজ আবার তোমার ননদাইয়ের আসবার কথা আছে (সংবাদটা অবশ্য কাল্পনিক), দাদা একটা কথা বলতে বলেছিল তাই—তা' অমরেশদা বুঝি বাড়ী নেই?

—হ্যাঁ, আছেন তো—এই এলেন শ্মশান থেকে, ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছেন বোধ হয়—লাল বাড়ীর বড়কর্ত্তা মারা গেলেন কিনা।

—হ্যাঁ, পদ্ম তাই বলছিল—ধন্যি বাড়ী বাবা! মানুষটা মরে গেল একটু টু-শব্দ নেই, বেহ্ম নাকি? বড়-মানুষের শোকও কম, কি বল বৌদি?

আরতি বিব্রত ভাবে বলে—আস্তে আস্তে কেঁদেছেন বোধ হয়। সবাই কি আর—

—ওমা, তোমারও যে বেহ্মজ্ঞানীর মতন কথা হ'ল বৌদি। কথায় বলে মড়াকান্না! কেউ না কাঁদুক, মাগী তো কাঁদবে মাথা-মুড় খুঁড়ে? দোজপক্ষের বৌয়ের আদর তো ছিল খুব শুনতে পাই। বুড়ো-হাবড়া যাই হোক স্বামী তো! মাছ খাওয়া, সিঁদুর পরা উঠে গেল তো জন্মের মতন? তবে? বাবা মরতে—আমার মার কাণ্ডখানা মনে করো দিকিনি? সাতটা মানুষে ধরে রাখতে পারে না, হিমসিম খেয়ে গেল এমন অবস্থা! কপাল ফেটে রক্ত-গঙ্গা, বুক চাপড়ে ছড়া-ছড়া কালসিটে, মাথার চুলগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে তিন ভাগ শেষ। কান্নার শব্দে বোধহয় তিন পাড়ার লোক জড় হ'ল। তাঁকেই বলি শোক!

যথার্থ শোকের আসল নমুনার বৃত্তান্তে আরতির অত্যন্ত হাসি পাইতেছিল, তাড়াতাড়ি কহিল—ঠাকুরপোকে কি বলবে বলছিলে?

—বলবো তো বলছিলুম, তুমি আবার বলছো শুয়ে আছে!

—শুয়েছেন, ঘুমোন নি বোধহয়। যাওনা ওপরে।

—কি জানি ভাই, আমার কেমন পুরুষ মানুষের শোবার ঘরে একলা যেতে গা ছম্‌ছম্ করে।

বলিয়া বিড়ালীর মত লঘু সতর্কপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া যায় মেনকা।

আপাদমস্তক একখানা র‍্যাপার ঢাকা দিয়া বিছানায় পড়িয়াছিল অমরেশ, সহসা গায়ের উপর মানুষের স্পর্শ পাইয়া চমকিয়া মুখ খুলিতেই চোখে পড়িল মেনকার পাতা কাটিয়া চুল বাঁধা কুশ্রী মুখখানা।

এইমাত্র না কি মেনকার সখা পদ্মর নির্লজ্জ মন্তব্যটা মনের মধ্যে বিষ ছড়াইতেছিল, তাই মেনকাকে দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। বিরক্তিপূর্ণ কটুকণ্ঠ মোলায়েম করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া অমরেশ কহিল—কি দরকার ?

—দাদা বলতে বলেছিল—

দাদার বক্তব্যটাও অবশ্য মেনকার নিজস্ব কল্পনা, কাজেই চুপ করিয়া যাইতে হয়। গুছাইয়া মিথ্যা বলিবার জন্যও যেটুকু বুদ্ধির আবশ্যক, সেইটুকুর অভাব ছিল তাহার মধ্যে।

—কি বলেছে দাদা ?—রুক্ষস্বরেই প্রশ্ন করে অমরেশ।

মেনকা বোধকরি এরূপ অভ্যর্থনার আশা করে নাই, তাই কোটরগত ক্ষুদ্র চোখ দুইটিতে অভিমানের ছায়া ফুটাইয়া তুলিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া বাষ্পগদগদ কণ্ঠে উত্তর করে—কিচ্ছু বলেনি দাদা, শুধু শুধু বকছো কেন আমায়, বাঃ রে !

এই ন্যাকামী, এই আদিখ্যেতা মেনকার স্বভাবধর্ম্ম, সুযোগ পাইলেই ন্যাকামি করিবে সে। করিবে ওই যুবক বয়সের ছেলেদের কাছেই।

ঠাস্ ঠাস্ করিয়া দুই গালে দুই চড় বসাইয়া দিবার প্রবল ইচ্ছাকে কষ্টে দমন করিয়া, "দরকার না থাকে তো নীচে যা"—বলিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শোয় অমরেশ।

মেনকা কিন্তু বসিয়াই থাকে।

পাউডার লেপা হাড়উঁচু গালের উপর ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়ে।

অবস্থাটা যন্ত্রণাদায়ক। হাজার হইলেও পায়ের কাছে বসিয়া একটা মেয়েমানুষ অশ্রুপাত করিতেছে, এটা পুরুষমানুষের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। অস্বস্তিও কম নয়, পিসীমার চোখে ছবিখানা পড়িলে ?

অমরেশ উঠিয়া বসিয়া ঈষৎ নরম সুরে বলে,—খামোকা কান্না জুড়ে দিলি যে ? কি বলেছে দাদা—আমায় কেটে রক্ত দর্শন করতে ?

—তাই বুঝি, বা !

ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে মেনকা।

অবাক হইয়া যায় অমরেশ, মেনকা কি পাগল ? উহার আচরণে সঙ্গতি-অসঙ্গতির বালাই নাই কেন !

—আমাকে কেউ দেখতে পারে না অমরেশদা, সবাই আমায় ঘেন্না করে, কপালটাই মন্দ আমার, বড় দুঃখিনী আমি।

—শচীনের চিঠি পাসনি বুঝি এখনো ? যা দিকিনি, গুছিয়ে গাছিয়ে পাতা আষ্টেক চিঠি লিখে ফেলগে যা, মন ভালো হয়ে যাবে।—অমরেশ হাসিয়া ফেলে।

—সে আর আমাকে নেবে না অমরেশদা, আমায় ত্যাগ দিয়েছে—আমার কি হবে ভাই ?—বলিয়া সহসা দুইহাতে অমরেশের পা চাপিয়া ধরে মেনকা।

—পাগলামি করিসনে মেনি, বাড়ী যা—

বলিয়া নিজেই উঠিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া যায় অমরেশ।

শুধু মেনকাকে ঘেন্না করা নয়, সমস্ত মেয়েমানুষ জাতটার উপরই অদ্ভুত বিতৃষ্ণা-বোধ আসে তার। বসিয়া থাকিতে পারে না অমরেশ, পায়চারি করিয়া বেড়ায়। সীমাবদ্ধ চারখানা দেওয়ালের ভিতর সে নিজেও যেমন পাক খাইতে থাকে, মনের মধ্যেও তেমনি সহস্র চিন্তার জট ওই একটা বস্তুকেই কেন্দ্র করিয়া পাক খাইয়া মরিতে থাকে।

পিসীমা, উষা, মেনকা ও-বাড়ীর বড়জ্যেঠি, ছোটখুড়ি, আরতি, জ্যোতির্ম্ময়ী, মন্দিরা, সব এক ছাঁচে ঢালা, এক মাল-মসলায় গড়া সব। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার গুণে বাহিরের খোলসটার প্রভেদ ঘটিয়াছে মাত্র। সমর ঠিক কথাই বলে।

—ওয়ার্থলেস !

চিন্তার সশব্দ অভিব্যক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে। এক কথায—এই একটিমাত্র সংজ্ঞা আছে মেয়ে মানুষের।

সতীত্ব গর্ব্বে গরবিণী কৃষ্ণবালার সর্ব্বত্র সন্দেহ দৃষ্টি, বড়জ্যেঠির অহরহ মালা জপা, উষাবতীর পান-দোক্তা গালে ঠেসিয়া ধর্ম্মকথার আলোচনা, বেয়াল্লিশ বছর বয়সে নূতন সন্তানের জননী ছোটখুড়ির জোয়ান ছেলের বিবাহে অনাসক্তি লইয়া ক্ষোভ প্রকাশ, আরতির সন্ন্যাসী স্বামীর ধ্যানের আয়েসের জন্য পশমের আসন বোনা, আর মেনকার যখন-তখন অকারণ ভাবালুতার মধ্যে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই।

ন্যাকামি !

সাদা বাংলায় এ ছাড়া আর কোনো নাম নাই ইহার—এমন থাপ্‌ খাওয়া লাগ্‌সই নাম।

রূপসী জ্যোতির্ম্ময়ীর বৃদ্ধ স্বামীর পায়ের উপর পড়িয়া থাকায় যে নিঃশব্দ শোকের মূর্ত্তি কিছু পূর্ব্বে তাহাকে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই দৃশ্য কল্পনা করিয়া অকস্মাৎ ভারী হাসি পায় অমরেশের। আরো হাসি পায়—মাত্র ঘণ্টাকয়েক আগে সে নিজেই মন্দিরার মত রাবিশ মেয়ের কাছে গদগদ ভাষায় প্রেম নিবেদন করিতে বসিয়াছিল ভাবিয়া।

পদার্থ বলিয়া কিছু আছে নাকি মন্দিরার ভিতর ?

পদ্মার বলিবার ভঙ্গীটা হয়তো শ্রুতিসুখকর নয়, কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার করিয়া দেখিলে অমরেশ নিজেই কি মন্দিরার অধৈর্য্য আচরণের ওই একই ব্যাখ্যা করিবে না ?

তখনকার বিসদৃশ দৃশ্যটা স্মরণ করিয়া এখন লজ্জায় কান রাঙা হইয়া উঠে।

নীচে তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় আরতির সামনে বিস্ফারিতচক্ষু মেনকা ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কহিতেছিল—হাতখানা চেপে ধরে মুখের দিকে এমন হাঁ করে চেয়ে রইল অমরেশ দা,

লজ্জায় যেন মরে গেলাম! বলে কিনা—'পা দুটো একটু টিপে দিবি মেনি'—ভয়ে বুক দুর-দুরিয়ে পালিয়ে আসতে পথ পাইনা, মাগো!

প্রতিবাদকল্পে আরতি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সহসা পিসীমা পিছন হইতে কঠোর কণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—বটে নাকি লা মেনি? বলি যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমার ঘরের ছেলে গিয়েছে তোর সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে? রূপের ছটায় সোয়ামীতে ভয় পায়—তোকে রুচি যে যমেও করবে না লো! তুই তাই এখনও ভাবন কেটে, টিপ-কাজল পরে লোকের কাছে মুখ দেখাস, অন্যে হলে গলায় দড়ি দিত!

কৃষ্ণবালা নিজে অবশ্য কোনো ছেলে-মেয়েকেই বিশ্বাস করেন না, ঘরের হইলেও না, তাই বলিয়া অন্যে বলিলে সহিয়া যাইবেন?

মেনকা পাংশু মুখে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

সহসা উপর হইতে নামিয়া আসিল অমরেশ, পিসীমা তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—

—এই শোনগো বাছা তোমার ভালমানুষ বৌদির গুণ, ফিস্ ফিস্ করে দুটিতে মিলে তোমার কুচ্ছো করা হচ্ছে—আমি যত বজ্জাত, আর সব সগ্গের দেবী! বলি এখন বিশ্বাস হ'ল তো?

—অসম্ভব নয়, মেয়েমানুষ তো—বলিয়া যুগপৎ সকলের উপর একটা তীব্র দৃষ্টি হানিয়া চটি জুতাটা পায়ে গলাইয়া বাহির হইয়া যায় অমরেশ।

॥ পাঁচ ॥

সমরের কিছুই ভালো লাগে না।

সমস্ত জগৎটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিলে যেন তাহার শান্তি হয়। ভাঙিয়া গুঁড়া করিতে পারিলে আক্রোশ মেটে।

কিন্তু এত অশান্তি কেন? এত আক্রোশ কাহার উপর? কেন তাহার সমস্ত চেতনা উদগ্র হইয়া থাকে অপরকে আঘাত করিতে?

সৃষ্টিকর্ত্তাকে ধরাছোঁয়ার উপায় নাই বলিয়াই কি তাঁর সৃষ্টবস্তুর উপর দিয়া গায়ের ঝাল মিটাইতে চায়?

সমর নিজেই জানে না যন্ত্রণার মূল উৎস কোথায়।

মোটের উপর কিছুই ভাল লাগে না তাহার।

ছোট কথা, ছোট কাজ, ছোট সুখ, ছোট আশা, ছোট আবেষ্টন, আর ছোট মানুষগুলার মাঝখানে তার বিরাট প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছে।

কেবলমাত্র একটা বিধবা দিদির মুখ চাহিতে সংসারে আটকাইয়া থাকার কোন অর্থ হয়?

যুদ্ধে যাইবার চেষ্টা করিয়া বেড়ায় সমর।

ভাতের থালাটা সামনে ধরিয়া দিয়া সেই কথাই উত্থাপন করিল উষা।

—হ্যাঁরে সমর, তুই নাকি যুদ্ধে যাবি বলেছিস?

—বলেইছি তো—তোমায় কে বললে ?

—ওদের গোরা বলছিল—খবরদার ওসব কুমতলব করিসনে বাপু, সর্বনেশে কথা শুনলেও গা কাঁপে !

—তোমার তো আরশোলা দেখলেও গা কাঁপে। যুদ্ধে আমি যাবোই, সব ঠিক করে ফেলেছি।

—ভালই করেছিস, যাবার আগে আমায় একতাল আফিং কিনে দিয়ে যাস, একটি কথাও কইতে আসব না।—বলিয়া ভারী মুখে উঠিয়া যায় উষা।

এই উষাকে লইয়াই এক জ্বালা সমরের।

মা-বাপ-ভাই-ভগ্নীপতি সকলে মিলিয়া একযোগে শত্রুতা সাধিতে এই বিরাট বোঝাটি সমরের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন, তাই মাথা তুলিবার উপায় খুঁজিয়া পায় না বেচারা।

এত বড় পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে সমরের ঘাড়ের বোঝা হালকা করিয়া দিতে পারে।

অথচ বসিয়া বসিয়া উষার হাতের পরিপাটি করিয়া রাঁধা শাকের ঘন্ট, মোচার ঘন্ট, সুক্ত, চচ্চড়ি খাইয়া শুধু দিনের পর দিন কাটাইয়া দেওয়া দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে তাহার পক্ষে।

অহরহ অশান্তি তাহার।

বিজয় মল্লিক বলে—কাজে নেমে পড সমর, সব ঠিক হয়ে যাবে। দুঃখীর দুঃখে সান্ত্বনা দিতে পারলেই নিজে শান্তি পাওয়া যায় !

—কাঁচকলা পাওয়া যায়, তোমার মাথা পাওয়া যায়।

এত ছোট স্কীমে এই সব ছোট ছোট কাজ দেখিলে হাসি পায় সমরের, বলে—এ হতভাগা দেশের দুঃখ ঘোচাবার সাধ্য স্বয়ং ভগবানেরও নেই, বুঝলি ? তুই যা নিয়ে অগাধ আত্মপ্রসাদ লাভ করছিস, আসলে সে একটি অশ্ব ডিম্ব ! লোকের দোরে দোরে দু'মুটো চাল ভিক্ষে করে যদি এই বুভুক্ষিত দেশের পেট ভরতো তা'হলে ভাবনা ছিল না। তাছাড়া শুধু পেট ভরাতে পারলেই বুঝি সব হ'ল ? কোন প্রকারে দুটো অন্ন জোটা—শুধু এই ! এতেই সকল দুঃখ মোচন হয়ে যাবে এই তোর ধারণা ? আর কোন অভাব নেই মানুষের ?

বিজয় মল্লিক মূঢ়ের মত বলিয়া ফেলে—কেন, শুধুই পেটের ভাত কেন, পরণের কাপড়, শীতের কম্বল, মাথা গোঁজবার আস্তানা, সবই যোগাবো আমরা আস্তে আস্তে।

—কেন, শুধু শীতের কম্বল কেন ? 'রাতের সম্বল' চাইনা একটা করে ? একটা বৌ ? সেটাই বা বাকী থাকবে কেন ?

রূঢ় ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে হাসিয়া ওঠে সমর।

—ঠাট্টা করছিস ?—আহত হয় বিজয় মল্লিক।

—ঠাট্টা ! মোটেই না, বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ। তোমাদের এই 'আর্ত্তত্রাণ সমিতি' আর 'অনাথবন্ধু ভাণ্ডার' গোছের ব্যাপারগুলো দেখলে হাসি পায় না বিজয়, ঘেন্না করে। তাছাড়া এই যে দয়া, এই যে করুণা, এটা দিনে দিনে মানুষকে কত নীচের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তা ভাবতে পারো ? নিজের অক্ষমতার ফল নিজে ভোগ করবে না কেন মানুষ ? কেন আশা করবে অপরের ওপর ? কেন চাইবে দয়া ?

—বাঃ, মানুষ মানুষের কাছে দয়ামায়ার আশা করবে না ?

—না, করবে না। বোমা আমাদের ততটা সর্ব্বনাশ করতে পারবে না বিজয়, যতটা করেছে এই দয়া। তারাও ডুবছে, তোমাকেও পাঁকে পুঁতছে !

বিধবা হইবার পর হইতে জ্যোতির্ম্ময়ীর আশ্চর্য্য রকম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বারব্রত পূজা-অর্চ্চনা দানধ্যানের তালিকা উত্তরোত্তর বাড়িতেছে, যেখানে এক বেলা উপবাস দিলে চলে, সেখানে তিন বেলা উপবাসের ব্যবস্থা।

কৃচ্ছ্র সাধনের এ এক অদ্ভুত মোহ !

ছেলেমেয়েরা রাগ-দুঃখ করিলে শুধু মৃদু হাসি হাসিয়া তাহাদের চুপ করাইয়া দেন।

অরুণপ্রভাও অনুযোগ করিতে ছাড়েন না, আজকাল প্রায়ই তিনি এ অঞ্চলে যাতায়াত করেন। ঐদিনও, ভাসুরের শ্রাদ্ধে পাঁচজন আসিবে বলিয়া যে হাতাপাড়ের ফরাসডাঙার শাড়ী জোড়া কিনিয়াছিলেন, তাহারই একখানা পরিয়া হেলিতে দুলিতে এধারে আসিয়া কহিলেন—নতুনদির আজও উপোস নাকি ?

জ্যোতির্ম্ময়ী স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

—আশ্চর্য্য ! বিধবা আর কোন মেয়ে মানুষটা না হচ্ছে বল ? সিঁদুর তো কেউ লোহা দিয়ে বাঁধিয়ে আসেনি—কিন্তু তোমার যে অনাসৃষ্টি বাড়াবাড়ি !

কিছু বলা আবশ্যক বোধে জ্যোতির্ম্ময়ী কহিলেন—উপোস দিলে শরীর ভালো থাকে ছোড়দি !

—সে তো চেহারা দেখলেই মালুম পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু প্রবীরের এ বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত।

—প্রবীর কি করবে ?

—বারণ করবে। উপযুক্ত ছেলে, তার মতামতটা তো তোমায় মেনে চলতে হবে ? না না, এ হাসির কথা নয়, অবশ্য তুমি যদি না মানো সে আলাদা কথা। এই বড়ঠাকুর যখন আবার বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপলেন, কারুর মানা শুনলেন কি ? সতীরাণীর কত কান্নাকাটি। কিছুই মানলেন না। মরে গেছেন স্বর্গে গেছেন, তাঁর নিন্দে করা ঠিক নয়, তবে ভয়ানক একজেদি ছিলেন তিনি। সেইটি এখন দেখছি তোমায় বর্ত্তেছে। তা এই যে মাসে পাঁচ-সাতশো টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে, বাজে খরচে বামুন পুরুতের পেটে, সেটা কি ঠিক হচ্ছে ?

মমতার আসল উৎস কোথায় সেইটি অনুমান করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ঈষৎ দৃঢ়স্বরে কহিলেন—এতে আর মানা করবার কথা ওঠে কেন ছোড়দি ? তিনি কিছু কম রেখে যান নি যে, আমি দু'পাঁচশো খরচ করলে প্রবীরের ভাগে টান পড়বে।

—তা অবশ্য বলছি না আমি, তাছাড়া কত রেখে গেছেন সে খবর আমরা কি করে জানবো বলো ? কারবার তো তিনিই সমস্ত দেখতেন, ইনি তো কোর্ট-কাছারী নিয়েই ব্যস্ত, কারুর সাতে পাঁচে নেই, তবে বলছিলেন সেদিন কথাচ্ছলে, আইনে নাকি বলে—এক ভিটেয় এক অন্নে যতক্ষণ থাকা যায়, যে যা আয় করুক সকলেরই সমান ভাগ থাকে। জয়েন্ট

ফ্যামিলির এই বুঝি আইন। যাক, তার জন্যে আমি কিছু ইয়ে করি না, আইনে যদি থাকে অবশ্যই তা রদ হবে না। কিন্তু এমনভাবে কাঁচা পয়সাগুলো এরকম বাজে খেয়ালে নষ্ট হতে দেওয়াও আর উচিত মনে করছি না।

এসব কথার জন্যে জ্যোতির্ম্ময়ী একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না।

সত্যই যে তিনি স্বামী হারাইয়া শূন্য হৃদয়ের হাহাকার লইয়া ব্যাকুলচিত্তে ঈশ্বরের উদ্দেশে ছুটিতেছিলেন এমন নয়। বিধবা হইলে ধর্ম্মকর্ম্ম করা উচিত এই এক সংস্কার।

তাছাড়া অবসর প্রচুর, কাজ অল্প। অর্থের অগাধ স্বাধীনতা, এ এক নতুন খেলার আস্বাদ দিয়াছে। হয়তো আরও গোপনে, নিজের অজ্ঞাতসারে লুকানো আছে, চিত্তদৈন্যের ত্রুটিপূরণ।

স্বামীর বিরহে যতটা কাতর হওয়া উচিত সে কাতরতা মনের মধ্যে খুঁজিয়া পান কই? নূতন করিয়া কোন শূন্যতা আসিল জীবনে?

শুধু অবসর! দিনরাত্রির অনেকখানি সময় যাহার জন্য উৎসর্গ করা ছিল, তাহার অভাবে হঠাৎ অবসর বাড়িয়া গিয়াছে প্রচুর।

অরুণপ্রভা জ্যোতির্ম্ময়ীর অসহায় আত্মবিস্মৃত মুখচ্ছবি দেখিয়া আর কথা বাড়াইলেন না। প্রথম নম্বর হোমিওপ্যাথি ডোজ দেওয়াই ভালো।

আহারের সময় জ্যোতির্ম্ময়ী প্রবীরকে সোজাসুজিই প্রশ্ন করিলেন—হ্যাঁরে প্রবীর, আমি যে এই আমার বাজে খেয়ালই বলি, পুজোপাঠে কিছু খরচপত্র করি এটা কি অন্যায় হচ্ছে?

—সে কি, একথা বলছ কেন মা?

আশ্চর্য্যভাবে প্রশ্ন করে প্রবীর।

—এতে তো তোর কমে যাচ্ছে?—ঈষৎ হাসেন জ্যোতির্ম্ময়ী।

প্রবীর স্থিরদৃষ্টিতে মুহূর্ত্তকাল মায়ের মুখের পানে তাকাইয়া কহিল—এটি তোমার মাথায় কে ঢুকিয়েছে বলতে পারো? ছোটখুড়ি বোধ হয়?

—কেনরে আমার মাথায় কি বুদ্ধি একেবারেই নেই?

—আছে, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি নয়। আমার কমে যাওয়ার কথা বলছো—ঠিক যদি বিশ্বাস করো মা, আমি কোন দিনই মনে করতে পারি না যে এ সব আমার। বাবাকেও যেন মনে হ'ত বড় বেশী দূর, প্রায় পরের মতন, তাই বাবার টাকাতেও কোন অধিকার-বোধ জন্মায় নি।

এ-তথ্যের সন্ধান কিছু কিছু রাখিতেন জ্যোতির্ম্ময়ী। ছেলের এই এড়াইয়া যাওয়া ভাবটা স্বামীকে যে পীড়া দিত, সেটা অনেক সময়ই লক্ষ্য করিয়াছেন তিনি। তাহার জন্য লজ্জাও করিত সময় সময়।

ব্যথিত করুণার সুরে কহিলেন—এটায় কিন্তু 'উনি' বরাবরই মনঃক্ষুণ্ণ হতেন প্রবীর।

—হ্যাঁ, এখন মাঝে মাঝে মনে হয় সে কথা। যাক্ গে, কিন্তু তোমায় অভয় দিয়ে রাখছি মা, টাকা নিয়ে তোমার সঙ্গে মামলা করতে বসব না। যত খুসী টাকা তোমার ওই ভট্চায মশাইয়ের গোদা পায়ে ঢেলো, কিন্তু দোহাই তোমার, এই উপোসটা একটু

কম করো। পিতৃহীন হওয়াটা সয়েছে, মাতৃহীন হওয়াটা চট করে বরদাস্ত করতে পারব না।

জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন—সবই সয়ে যায় রে প্রবীর, কিছুই অসহ্য হয় না মানুষের।

প্রবীর গম্ভীর হইয়া গিয়া বলে—তা ঠিক, আর একটা কষ্টকর জিনিসও হয়তো শীগগির সইতে হবে, কাল থেকে তোমায় 'বলবো বলবো' করে বলা হচ্ছে না—বলিয়া বাম হাতে পকেট হইতে একখানা খামের চিঠি বাহির করিয়া দিল।

পত্র লিখিয়াছেন আনন্দময়। লিখিয়াছেন অবশ্য প্রবীরকেই। তবে হিসাব মত জ্যোতির্ম্ময়ীর উদ্দেশেই লেখা। তিনি সবিনয়ে জানাইয়াছেন—অতঃপর মন্দিরাকে পাঠাইয়া দেওয়া হউক, কারণ এতদিন যাঁহার ভরসায় মেয়েকে চোখের আড়ালে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনিই যখন নাই, তখন আর—তা'ছাড়া, যাঁহারা মেয়েকে এতদিন প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, মেয়ের বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহারা অবহিত হইয়া উঠিবেন এইরূপ ধারণা তাঁহার ছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যখন দেখা যাইতেছে 'ধিঙ্গি' করিয়া তুলিয়া পরের মেয়েটির মাথা খাওয়া ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য তিনি উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না, তখন মানে মানে মেয়ে লইয়া সরিয়া পড়াই ভালো। দাদামহাশয়ের অবর্ত্তমানে আরো কত বেচাল বা চাল বাড়িতে সুরু করিয়াছে এই আশঙ্কায় দিশাহারা হইয়া পত্রখানি লিখিয়া ফেলিয়াছেন তিনি।

বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করিতে ভাষা যতদূর প্রাঞ্জল ও যুক্তি যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ হওয়া উচিত তাহার ত্রুটি করেন নাই ভদ্রলোক, পরিশেষে জানাইয়াছেন—অবিলম্বে পাঠাইয়া দেওয়া না হইলে তিনি নিজেই আসিয়া লইয়া যাইবেন। কারণ আইন তাঁহার পক্ষে।

পড়া সাঙ্গ করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী নীরবে চিঠিখানা আবার খামের ভিতর ভরিয়া ফিরাইয়া দিতেই প্রবীর কহিল—কই বললে না কিছু ?

—কিছু তো বলবার নেই বাবা!

—কি উত্তর দেওয়া যাবে ?

—লিখে দিও রেখে আসবার সময় কারো হবে না, তিনি যেদিন ইচ্ছে এসে নিয়ে যেতে পারেন।

—বল কি মা! আইন দেখালেই হ'ল অমনি ? প্রতিপালনের দাবি নেই একটা ? নিয়ে যেতে বলছো, মানে ?

—ঠিকই বলছি রে, উনি যেতে যেতেই কি ঘরে-বাইরে আইনের মারপ্যাচ্ নিয়ে লড়তে বসবো ? তোর কাকার যদি সত্যিই দাবি থাকে তো তিনি যেন চুল চিরে ভাগ করে নেন, মন্দিরাকেও নিয়ে যাক আনন্দ, আমি নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে তীর্থধর্ম্ম করে বেড়াই।

—চমৎকার! আদর্শ ভারত নারী! বাস্তবিক কতটা আত্মজ্ঞান লাভ হলে এত সহজে মায়ার বন্ধন ছিন্ন করা যায় তাই শুধু ভাবছি মা!

প্রবীরের রাগে হাসিয়া ফেলিলেও পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী কহিলেন—তা

হোক, ওছাড়া আর কিছু উত্তর দেওয়া যাবে না প্রবীর, আনন্দময় লোক ভাল নয়, বাধা পেলে রাগের মাথায় নিজের মেয়ের নামে বদনাম দিয়ে বসতেও ওর বাধবে না।

—পাঠিয়ে দিয়ে থাকতে পারবে ?

—পারবনা বললে চলবে কেন বাবা ? মেয়েকে তো শ্বশুরবাড়ীও পাঠাতে হয়। সে তো নিতান্তই পরের বাড়ী, আর এতো তবু ওর নিজের ঘর।

—ছাই নিজের। ওই লক্ষ্মীছাড়াটা ওর বাপ, মনে করলে আমার হাড় জ্বলে যায় মা। কিন্তু সে যাক, মন্দিরাকে এ কথা বলবে কে ? সেটাও বোধ করি আমার ঘাড়ে ?

—না বাবা, আমিই বুঝিয়ে বলবো ওকে, তুই চিঠিখানা রেখে যা।

—বেশ, যা খুসী করো, আমিও একদিন অমরেশের মত কেটে পড়বো দেখো।

॥ ছয় ॥

গৃহত্যাগ করিবার কথা অখিলেশের, করিল অমরেশ।

ছেঁড়া চটিটা পায়ে গলাইয়া সেই যে সে বাহির হইয়া গিয়াছিল, আর ফিরিয়া আসিল না। খোঁজখবর যা হইল যৎসামান্য, আরতির ব্যাকুল অনুরোধে কালোগৌরাঙ্গ কিছুদিন কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছিল, তা'ও বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ব্যস।

হারাইয়া যাইব বলিয়া যে পণ করিয়াছে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর বৈ কি! পৃথিবীর এই বিশাল জনারণ্যে অগণ্য ছেঁড়া চটির ভিড়ে তাহার পদচিহ্ন কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে কে বলিবে ?

শুধু খোকা মাঝে মাঝে অবুঝ প্রশ্ন করে—কাকা কবে আসবে মা ?

ছেলেকে বুকে চাপিয়া আরতি আপনাকেই সান্ত্বনা দেয় হয়তো—আসবে বাবা, কাল-পরশু দু'চারদিন পরে আসবে। এতবড় গাড়ী চড়ে, ভালো ভালো পোষাক পরে, এই এ-তো খেলনা নিয়ে এসে বলবে, 'খোকন কই, খোকন ?'

এসব সান্ত্বনা পুরাতন, হঠাৎ বীররসের অবতারণা করিয়া খোকন বলে—পিসীকে মেরে ফেলবো।

পিসী অবশ্য কৃষ্ণবালা, সহসা তাঁহার উচ্ছেদ সাধনের স্পৃহা খোকনের মনে জাগিয়া উঠে কেন কে জানে, কিন্তু কাকার গৃহত্যাগের ব্যাপারে পিসীর কোথায় যেন হাত আছে এই ধারণা অতটুকু ছেলের ভিতরও বদ্ধমূল হইয়া গেল কেমন করিয়া সেইটুকু বলা কঠিন।

ভাবা গিয়াছিল ভ্রাতার গৃহত্যাগে অখিলেশের দায়িত্ববোধ কিছুটাও ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু দেখা গেল আরো নিস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছে সে। আজকাল আহার-নিদ্রার ব্যাপারটাও এত সংক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে যে কদাচিৎ তাহার দর্শন মেলে।

আর লোকের মধ্যে তো পিসীমা, আরতি ও খোকন।

পিসীমা সে হতভাগার মুখ দেখিতে চান না, খোকনও তথৈবচ, শুধু আরতি।

আরতির কথা অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন।

তবু সংসার চলিয়া যায়। কাহারও জন্য কিছুই আটকায় না। কালোগৌরাঙ্গ স্বেচ্ছায় এই হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া নৌকাখানার ভার লইয়াছে—তরতর করিয়া না চলুক, কাদায় ঠেক খাইতে খাইতেও চলে।

প্রবীরও অবশ্য প্রায়ই আসিয়া খোঁজখবর লয়, বিপদের সময় আরতি তাহার সহিত পরিচয় করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। তবু সম-অবস্থাপন্ন গৌরাঙ্গের নিকট যত সহজে সাহায্য লওয়া চলে, প্রবীরের কাছে তেমন সহজে চলে না।

কিন্তু সম্প্রতি অবস্থা আসিয়াছে নূতন।

অখিলেশ যাহা উপার্জ্জন করিত—গুরুপ্রণামী বাদেও সংসার খরচটা আটকাইত না। এইটুকু কর্ত্তব্যবোধের সূক্ষ্মসূত্রে সংসারের সঙ্গে যোগ ছিল তাহার, কিন্তু সম্প্রতি নাকি সাধন ভজনের বিঘ্নস্বরূপ এই চাকরিটা সে ত্যাগ করিয়াছে।

ইহার পরে অপরের কাছে অর্থ সাহায্য লওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকিবে না।

আটার ঠোঙাটা নামাইয়া দিয়া গৌরাঙ্গ বলে—অখিলেশদার আপিসে খোঁজ নিয়েছিলাম পিসীমা, খবরটা সত্যিই বটে।

পিসীমা মুখখানা কালো করিয়া বলেন—সে আমি আগেই বুঝেছিলাম, এইবার ঝুলি কাঁধে নিয়ে বেরোতে হবে আর কি! একজন বিবাগী হ'লেন, একজন বৈরাগী হ'লেন, এখন মর মাগী তুই!

গৌরাঙ্গ চড়াগলায় বলে—আমার যদি পয়সা থাকতো পিসীমা, তা'হলে অখিলেশদার চাকরি ছাড়ায় থোড়াই কেয়ার করতাম! খোকার আর বৌদির ভার—

—পয়সা থাকলেও তুমিই বা পরের বৌ-ছেলের ভার নিতে যাবে কেন, আর আমরাই বা নেবো কোন্ সুবাদে বাছা?—বলিয়া গৌরাঙ্গের প্রদীপ্ত উৎসাহে বরফজল ঢালিয়া দিয়া বিরস মুখে উঠিয়া যান কৃষ্ণবালা।

গভীর রাত্রে 'আসন' 'প্রাণায়াম' 'ধ্যানজপ' ইত্যাদির পালা সাঙ্গ করিয়া অখিলেশ কম্বল বিছাইয়া শয়নের আয়োজন করিতেছে, এমন সময় ও-ঘর হইতে আরতি আসিয়া দুয়ার ভেজাইয়া কপাটে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল।

ইদানিং কাজকর্ম্মের সুবিধার ছুতায় কোণের দিকের এই ছোট ঘরখানি অখিলেশ বাছিয়া লইয়াছে। আরতি এ ঘরের ছায়াও মাড়ায় না। স্বামীর অনুপস্থিতির অবসরে ঝাড়ামোছা করিবারও সুবিধা নাই, তালা লাগাইয়া যায় অখিলেশ।

হঠাৎ অসময়ে আরতিকে দেখিয়া অখিলেশ বিস্ময়ের সঙ্গে একটু কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। চাকরি ছাড়ার খবর যে আরতির কানে গিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাজটা করিয়া পর্য্যন্ত খুব বেশী স্বস্তিবোধ ছিল না তাহার। কিন্তু গুরুদেব বলিয়াছেন—'দাসত্ব

মোচন না হলে আত্মার উন্নতি হবে কোথা থেকে? ভেতর-বার দুই-ই স্বাধীন করতে হবে।'

অকারণে কম্বলের কল্পিত ধূলাগুলো হাত দিয়া ঝাড়িতে ঝাড়িতে অখিলেশ নিজের সপক্ষে নানা যুক্তি গুছাইতে থাকে।

মিনিট কয়েক মৌন থাকিয়া আরতি মৃদুস্বরে কহিল—এখন কি দু'একটা কথা শোনবার সময় হবে?

—বেশী কিছু?—অখিলেশও মৃদুগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে।

—না, বেশী কিছু বলবার ধৈর্য্য আমার নেই। শুধু জানতে চাইছি খোকার ভার কি তুমি নিতে চাও?

—খোকার?

—হ্যাঁ খোকার।—দৃঢ়স্বরে উত্তর করে আরতি—পিসীমার যা সম্বল আছে একলার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু খোকার জন্যে হয়তো বাধ্য হয়ে তাঁকে নিজের সম্বল খোয়াতে হবে। তাই জানতে চাইছি ওর ভার তুমি রাখতে চাও কি না।

—শুধু খোকা? আর তুমি?—মুখ ফস্কাইয়া বাহির হইয়া যায় অখিলেশের।

—আমি?—হঠাৎ হাসিয়া ওঠে আরতি, দীর্ঘদিন আগে গভীর রাত্রে স্বামীর আদরে-পরিহাসে যেমন করিয়া হাসিয়া উঠিত, যে অবাধ হাসির জন্য পিসীমার ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিত অখিলেশ।

কতদিন যে হাসি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে আরতির!

হাসি থামাইয়া স্থির গলায় সে বলে—আমার জন্যে নাই বা ভাবলে? রূপ আর বয়স, মেয়েমানুষের ওজন হাল্কা করে দেয়, সকলের কাছে ভার লাগেনা। এইটুকুই শুধু স্মরণ করিয়ে দিলাম তোমায়।

অখিলেশ অবাক হইয়া চাহিয়া দেখে। আরতির নির্ব্বাক সহিষ্ণু-মূর্ত্তিই দেখা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, এমন রূঢ় তীক্ষ্ণভাষা সে শিখিল কখন?

কিন্তু আপনার ওজনও হাল্কা করিতে না দিয়া ধীর স্বরেই বলে অখিলেশ—তুমি কি আমায় অপমান করতে এলে?

—অপমান? না না, শুধু তোমার অনুমতি চাইতে এল্যম—খোকাকেও কি আমার সঙ্গে দুর্গতির পথে টেনে নিয়ে যাবো?

—দুর্গতির পথটাই কি শেষ পর্য্যন্ত বেছে নিলে আরতি?

বহুকাল পরে স্বামীর মুখে নিজের নাম শুনিয়া চকিতের জন্য কাঁপিয়া ওঠে আরতি, কিন্তু পরক্ষণেই সহজ গলায় উত্তর দেয়—অগত্যা। তবু তো গতি? তিলে তিলে পাঁকে পুঁতে যাওয়ার চেয়ে হয়তো ভালো। কিন্তু তুমি আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছো।

—কি, খোকা? ওকে ভগবান দেখবেন, তার নেবার কর্ত্তা তুমি-আমি নয়, অহঙ্কার ত্যাগ করে এইটুকুই শুধু বিশ্বাস কোরো।

—তাই চেষ্টা করবো।

বলিয়া দুয়ার ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়ায়—অখিলেশকে উঠিয়া আসিতে দেখিয়া।

বাহির হইয়া যাইবার জন্য উঠিয়া আসে নাই অখিলেশ, সরিয়া আসিয়াছে আরতিরই কাছে।

কাছাকাছি দাঁড়াইয়া বদ্ধগম্ভীর দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকে। অভিমানে অন্ধ হইয়া সত্যই কি নরকের অন্ধকারে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায় আরতি! সতই কি কোন অস্বাভাবিক পথ ধরিয়া বসিবে!

কিন্তু সন্ন্যাসী অখিলেশের তাহাতে কি ক্ষতি? আরতি তাহার কে? বাহিরের বন্ধন মাত্র। বরং সেই বন্ধন হইতে যদি সে স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়া যায়, মন্দ কি? হয়তো এই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা।

—তুমি তা'হলে সত্যই থাকতে চাও না?

—না।

—গৃহত্যাগের সঙ্কল্প স্থির করে ফেলেছ?

—হ্যাঁ।

—হু। সেই নরকের সঙ্গীটি কে জানতে পারি কি?

—সে কথা বলতে বাধ্য নই আমি।

যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল আরতি, তেমনিই নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। শুধু চলিয়া যাইবার সময় আধময়লা শাড়ীখানার পিঠের উপরকার প্রকাণ্ড সেলাইটা যেন নির্লজ্জ ব্যঙ্গ করিয়া গেল অখিলেশকে।

...আরতির জন্য শেষ কবে শাড়ী কিনিয়াছে অখিলেশ?...অমরেশ নিরুদ্দেশ হইয়াছে কতদিন?...এ সংসারের নিত্য প্রয়োজনের বাহানা মিটায় কে?

ভগবান?

সমরের দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নাই! এ, আর, পি,র কাজ পাওয়া সহজ, 'ফ্রন্টে' যাওয়া অত সোজা নয়। কিন্তু বোমা পড়িলে মড়া বহিবার প্রবৃত্তি সমরের নাই, সে চায় রীতিমত যুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ প্রাণ, কোটি কোটি টাকা যেখানে মুহূর্তে ধ্বংস হইয়া যায়, জীবন আর মৃত্যুর যেখানে আলাদা কোন অর্থ নাই, তেমন জায়গায় যাইতে চায় সমর। তাই না-মঞ্জুর পত্রখানা ছিঁড়িয়া চট্‌কাইয়া চিবাইতে চিবাইতে পায়চারি করিয়া বেড়ায়, ঘর হইতে দালানে, দালান হইতে ঘরে।

মেনকা আসিয়া উঁকি মারিল উষার খোঁজে।

—উষা দি কোথায় সমর দা?

—বাড়ী নেই।

ছ্যাবলা মেনকাকে এর বেশী সম্মান কেহ করে না। কিন্তু মেনকা নিজেই চাপিয়া বসে—কোথায় গেছে?

—কে জানে, ননদের শ্যালার বাড়ী না কোন্ চুলোয়।

—ননদের শ্যালা? সে আবার কি জন্তু সমর দা?—বলিয়া মুখে কাপড় দিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে থাকে মেনকা।

—ওই রকম কি একটা বললে। তাসের আড্ডা আজ আর বসবে না, যাও।

—তাই যাই—একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া টানা সুরে কয় মেনকা—ফাল্গুনে হাওয়ায় প্রাণটা কেমন হুহু করছিল, বাড়ী বসে থাকতে ভালো লাগল না, কোথায় বা যাই। তুমি না কি যুদ্ধে যাবে সমর দা?

—যমের বাড়ী যাবো।

—বাঃ বেশ জায়গা তো?—ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে মেনকা—শুনে লোভ হচ্ছে।

—লোভ হচ্ছে? বটে? রুক্ষদৃষ্টিতে এই নির্লজ্জ মেয়েটার পানে তাকাইয়া তীক্ষ্নস্বরে সমর বলে—যমের বাড়ী যাবার ইচ্ছে হচ্ছে? কিন্তু খবরদার টুঁশব্দ করলে টুঁটি টিপে ছিঁড়ে দেব।

—বা-রে! শুধু শুধু বকছো কেন?

—চুপ।

সহসা দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতেই মেনকা কাঁদিয়া ওঠে—ও সমর দা, তোমার পায়ে পড়ি দোর খুলে দাও, লক্ষ্মীটি, বড্ড ভয় করছে!

—খবরদার, বলেছি না টুঁ শব্দ করলে খুন করবো?

—সমর দা, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি! দোর খুলে দাও ভাই!

—কেন? যমের বাড়ী যাবার বড্ড যে সখ হচ্ছিল?

—মাপ করো সমর দা, ছেড়ে দাও আমায়।

—ধরলাম কোথায় যে ছেড়ে দেব? তোর মত মেয়েকে শয়তানেও ছোঁয়না, বুঝলি? যা—বেরো। রাবিশ! মাটির পুতুল! রাস্তার কুকুর!

দরজা খুলিয়া দিতেই কান্নায় ভাঙিয়া পড়ে মেনকা—আমায় একটু বিষ এনে দাও সমর দা, সব দুঃখের শান্তি হোক। বড় কষ্ট আমার।

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ মেনকার এই অসহায় পশুর মত আর্ত্ত ক্রন্দন দেখিতে দেখিতে একটু নরম সুরে প্রশ্ন করে সমর—শ্বশুরবাড়ী যাবি মেনকা?

—ওরা আমায় নেবে না সমর দা!

—কেন? কি করেছিস তুই?

—কিছু করিনি, এই তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি—আমি কালো-কুচ্ছিৎ, বোকা তাই।

—আচ্ছা, নেয়-কি না দেখে নেবো। বিশ্বাস করে যেতে পারবি আমার সঙ্গে?

—তুমি নিয়ে যাবে!

অবাক হইয়া তাকায় মেনকা।

—হ্যাঁ যাবো। কিন্তু এই একবস্ত্রে এখুনি। উত্তরপাড়ায় তোর শ্বশুরবাড়ী না? বাড়ী চিনতে পারবি?

—কিন্তু লোকে কি বলবে সমর দা?

—লোকে? লোকে যদি বলে—'আমি তোকে নিয়ে পালিয়েছি', সে অপবাদে স্বর্গে যাবি বুঝলি?...দাঁড়া, হাণ্টারটা নিয়ে আসি, সঙ্গে থাকা ভালো।

—চাবুক নিয়ে—ওঁকে মারবে না কি?—আর একপালা কাঁদিবার যোগাড় করে মেনকা।

—প্যান প্যান করিসনে মেনি, দরকার হলে মারতে হবে বৈ কি! পাগলা কুকুর রাস্তায় ছেড়ে রাখলে কুকুরের মালিকের ফাইন হয়, সেটা বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে রাস্কেলকে।

॥ সাত ॥

খুলনা জেলার এক অখ্যাত গ্রাম হইতে চিঠি লিখিয়াছে মন্দিরা।—'দাদাভাই, কেমন আছি আর কেমন লাগছে জানতে চেয়েছ? যদি রাগ না করো বলি—খুব খারাপ লাগছে না। এখানের যিনি মা, দেখলে দয়া হয় বেচারাকে। রোগা ছোট্ট এতটুকু মানুষ, আর অগাধ ছেলে মেয়ে। তাদের বায়না আর বাড়ীর কর্ত্তার শাসন এই দুটো জিনিস দু'দিক থেকে অহরহ পিষছে বেচারাকে। আমার মত একটি কাজের মেয়েকে পেয়ে—(হাসছ যে? কাজের নই ভাবছ? দেখো এসে—সেই এক ডজন শিশুর পালকে কি রকম সায়েস্তা করে রেখেছি) হাতে চাঁদ পেয়েছেন প্রায়।

সত্যি এতদিন এই দুঃখের সংসার থেকে ছিটকে গিয়ে আমি একলা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করেছি মনে করে লজ্জা হচ্ছে। তাই অহরহ ভুলতে চেষ্টা করছি, আমি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর প্রধানা ছাত্রী, সকল গুণের আধার, সঙ্গীত শাস্ত্রে অদ্বিতীয়া, বাদ্যযন্ত্রে সুনিপুণা, চিত্রবিদ্যায় অনুরাগিনী, আর দাদা ভাইয়ের আদরিণী শ্রীমতী মন্দিরা দেবী।

মনে রাখছি, আমি হচ্ছি—মঞ্জু, অঞ্জু, বেলা, বাসু, লাটু, নাটু, হাসু, সোনার পূজনীয়া দিদি। গ্রাম্য হাইস্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের বয়স্থা অনূঢ়া কন্যা, সৎপাত্রের অভাবে এতদিন পাত্রস্থ হতে পারিনি।

এর জন্যে পাড়াসুদ্ধ সকলে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। শোনা যাচ্ছে, 'পল্লী-মঙ্গল সমিতি' থেকে চেষ্টা চলেছে আমার হিল্লে করতে।

সব তো শুনলে? শুধু দোহাই তোমার, একটি অনুরোধ—'হাত খরচের' ছুতো করে অনর্থক কতকগুলো অর্থ নষ্ট করতে পাঠিও না তুমি। দরিদ্রের ঘরে লোভের সৃষ্টি করো না। আমি যা, তাই থাকতে দাও আমায়।

অমরেশ বাবু ফিরে এসেছেন কি?

—তোমাদের মন্দিরা।'

মন্দিরা চলিয়া গিয়াছে, বিষয় ভাগ করিয়া লইয়া অতীন মুখুজ্যে পৃথক্ হইয়াছেন। উঠানের মাঝখানে 'ব্যাফল্ ওয়ালের' মত প্রকাণ্ড এক পার্টিশন উঠিয়াছে।

জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রত নিয়ম দানধ্যানের এলোমেলো পথ ছাড়িয়া গুরুমন্ত্র লইয়াছেন, আর পাত্রী খুঁজিতেছেন প্রবীরের জন্য।

বিজয় মল্লিকের আর্ত্তত্রাণ সমিতি অনেক দিন লোপ পাইয়াছে, ত্রাণকর্ত্তারা সকলেই সরিয়া পড়িয়াছে, 'আর্ত্ত' খুঁজিয়া পাওয়াও দুষ্কর।

নিজের বৈঠকখানায় একটি নাইট্-ইস্কুল খুলিয়াছে বিজয়, পাড়ার বস্তির ছেলেদের 'কাঠি-বরফ' ও 'শোন্ পাপড়ির' লোভ দেখাইয়া পড়াইতে হয়।

সেখানেই মাঝে মাঝে ঢুঁ-মারিতে যায় প্রবীর।

এমনি একদিন পড়ানোর মাঝখানে শ্রীপতি হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া খবর দিল—অমরেশ বাবুর বাড়ী থেকে আপনাকে ডাকতে এসেছে দাদাবাবু!

—ডাকতে এসেছে? কে রে?

—সেই বজ্জাত বুড়িটা।

—কেন বল দেখি?

—বলছে—বলছে যে ওদের বাড়ীর সেই ছোট্ট ছেলেটা না কি মারা গেছে।

—মারা গেছে!

সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন স্তব্ধ হইয়া যায় একটি কথার আঘাতে।

বিজয় মল্লিক যখন অনেক খোঁজাখুঁজির পর অখিলেশকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী ঢুকিল, তখনো পিসীমা পাড়ার মেয়েদের কাছে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া উন্মাদ ভঙ্গীতে চীৎকার করিতেছেন—ওরে আমার সোনার যাদু, একফোঁটা ওষুধ তোমার পেটে পড়ল না মানিক! রাক্ষুসী ডাকাত মা, সামনে বসে থেকে তোমায় হত্যে হতে দিলে বাবা! হে বাবা নকুলেশ্বর, কি অপরাধ হ'ল বাবা!

ঘরের ভিতর পাথরের পুতুলের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে আরতি।

ঘটনা অত্যন্ত মামুলি—গতরাত্রি হইতে ভেদবমি সুরু হইয়াছিল, আজ সন্ধ্যায় সেটা বড় হইয়া গিয়াছে। নূতনের মধ্যে এই—সকাল বেলা অখিলেশ গুরুর চরণামৃত দিবার উপদেশ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, আর আসে নাই। আর পিসীমা গিয়াছিলেন কালীঘাটে, মায়ের হাতের 'খাঁড়া ধোওয়া' জল আনিতে। এই মাত্র ফিরিয়াছেন।

সারাদিন আরতি কাহাকেও খবর দেয় নাই, ডাকে নাই—ঘুমন্ত ছেলেকে আগলাইয়া থাকার মত নিঃশব্দে বসিয়া আছে।

পিসীমা আসিয়া দেখেন এই কাণ্ড।

সন্ন্যাসী অখিলেশের 'মায়াবাদ' ঘুচিয়া গেল না কি?. সিঁড়িতে উঠিতে পা কাঁপিতেছে কেন? সারা রাস্তা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছে কেন সে।

কিন্তু দুয়ারের নিকট আসিতেই পাথরের পুতুল উন্মাদিনীর মতো বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া আসিয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল।

—না, ভেতরে যেতে পাবে না তুমি, কিছুতেই না।

—দেখতে দেবে না খোকাকে?

—না না না! কি দেখতে চাও? নিজের কীর্ত্তি? সাধু তুমি—তোমার হুকুম ভগবান শুনবেন না? শুনেছেন বৈ কি? খোকার ভার নিজেই নিয়েছেন। আর কেন? যাও যাও—

মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যায় অখিলেশ।

এইমাত্র গুরু উপদেশ দিতেছিলেন—স্ত্রী, পুত্র কেউ কারো নয় রে ব্যাটা, জন্মমৃত্যু সব সমান—

গুরু উপদেশের ভিত আলগা হইয়া আসিতেছে কেন?

নিজের ঘরের কাজকর্ম্ম ফেলিয়া পরের সংসারের তামাসা দেখিবার সময় কার আর কতক্ষণ থাকে? রাত্রিও হইতে থাকে। সমর, বিজয়, প্রবীর আর গৌরাঙ্গ চারজনে মৃতদেহটার সদগতির উদ্দেশে বাহির হইয়া যাইতেই যে-যার আপন আপন ঘরে ফিরিলেন।…রাত্রি হইলেও কৃষ্ণবালা বাহির হইলেন গঙ্গাস্নানের চেষ্টায়। তাঁহার গুরু মন্ত্রের শরীর, সারারাত তো আর অশুচি হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না।

মেনকার মা কৃষ্ণবালাকে পথে বাহির হইতে দেখিয়া তাঁহার পিছু লইতে লইতে ছোট জাকে ডাকিয়া বলেন—ঝোলটা চাপানো থাকলো ছোট বৌ দেখো, আমি একবার যাই ঠাকুরঝির সঙ্গে।

ছোট বৌ শঙ্কিত ভাবে বলে—এই রাত্তিরে?

—তা রাত বলে আর করছি কি! মানুষের বিপদ-আপদে কি তার দিনক্ষণ দেখলে চলে?…কি জানি—গঙ্গা জায়গা, শোকে তাপে মানুষটা যদি আত্মঘাতী হয়?…ভালো কথা, গঙ্গা জলের বড়ো ঘটিটা দাওতো বার করে—অমনি জল আসুক একঘটি, এক ফোঁটা গঙ্গা জল নেই ঘরে।

আরতির জন্য মাথা ঘামাইবার প্রবৃত্তি কাহারও হয় না। একে তো সদ্যমৃত সন্তানের জননীর মুখ দেখাই অকল্যাণকর, তাহার উপর আবার যে মেয়েমানুষ একমাত্র সন্তানকে যমের হাতে ধরিয়া দিয়া নির্জ্জলা চক্ষে বসিয়া থাকে তাহার মুখ দেখা!

সে যে মহাপাতক!

কোটি জন্মের নরকবাস নির্দ্দিষ্ট হওয়াও বিচিত্র নয়।

অখিলেশ কোথায় গেল কে জানে! হয়তো বা পরম সান্ত্বনার আশায় আবার ফিরিয়া গিয়াছে সাধের গুরু আশ্রমে। কৃষ্ণবালা গঙ্গাস্নানের ফেরৎ পূজার ঘরে ঢুকিবার আগে অখিলেশের আশায় সদর দরজাটার খিল বন্ধ করার বদলে স্বধু কপাট ভেজাইয়া দিয়া, দালানের একধারে স্তিমিত শিখা হ্যারিকেন লণ্ঠনটা বসাইয়া রাখিয়া উঠিয়া যান উপরে।

সারাদিনে পরিশ্রমও তো কম হয় নাই তাঁহার। কালীঘাট, গঙ্গারঘাট, নকুলেশ্বর তলা, ছুটোছুটি কাণ্ড! আহ্নিক পূজার শেষে ঠাকুরের প্রসাদী বাতাসা দুইখানা গালে দিয়া একঘটি জলপানান্তে অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িলেও সত্যি দোষ দেওয়া যায় না তাঁকে।

ঝড়ের ঝাপটে ভারী কপাট দুইখানা থাকিয়া থাকিয়া 'ঝনাৎ ঝনাৎ' শব্দে আছাড় খাইতে থাকে…সে শব্দ যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহার কানে যায় না, যে জাগিয়া আছে তাহাকে যেন থাকিয়া থাকিয়া আছাড় মারে।

… … …

অনেক রাত্রে কে একজন উঠানে আসিয়া ধীরে ধীরে—"পিসীমা পিসীমা" বলিয়া ডাকে, কিন্তু কে কোথায়? কিছুক্ষণ ইতস্ততের পর সে বেচারা নিতান্ত নিরুপায়ের ভঙ্গীতে লণ্ঠনের শিখাটা সতেজ করিয়া দিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া যায় উপরে।…বিপদ মন্দ নয়! সমর আর বিজয় তো দিব্য কাটিয়া পড়িল পথ হইতে, গৌরাঙ্গ শশ্মান ঘাটে একবার বমি করিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ী ঢুকিয়াছে, আর এই রাত্রি একটার সময় এই ভয়াবহ প্রেত পুরীতে আসিবার ভার পড়িল প্রবীরের ঘাড়ে।…

কিন্তু প্রবীরই বা আসিল কেন?

না আসিলে কে বা তাহাকে ফাঁসি দিত?

খোকনের গলার স্থতার মতো সরু সোনার হারটুকু একরাত্রি প্রবীরের পকেটে পড়িয়া থাকিলেও এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত না। তবে? গোপন অন্তরের গভীর তলায় নিজেরই কি একবার আগ্রহ জাগে নাই প্রবীরের? সেই পাষাণ প্রতিমাকে আর একবার দেখিবার আগ্রহ?

তেমনি করিয়াই বসিয়া আছে, না আপনাকে বিদীর্ণ করিয়া লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিয়া মায়া মমতাহীন রুক্ষ নিষ্ঠুর পৃথিবীর মাটিতেও চেতনা জাগাইয়া তুলিতেছে? কে দেখিবে তাহাকে?…

অখিলেশ?

কৃষ্ণবালা?

… … …

উপরের দালানে আসিয়া আর একবার মৃদু ভীরু কণ্ঠে—'পিসীমা' বলিয়া ডাকিতেই আরতি ঘরের বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রশ্ন করিল না—'কে'? শুধু চুপচাপ দাঁড়াইয়া রহিল। যেন চোর ডাকাত হইলেও ক্ষতি নাই তার। যেন ভয় করিবার উপযুক্ত কারণ আর কিছুই নাই পৃথিবীতে।

—পিসীমা কোথায় ?—মৃদু কণ্ঠ শোনা যায় প্রবীরের।

—কি জানি। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।

মানুষের কণ্ঠস্বরে যেন রাত্রির গভীরতা কিছুটা হালকা হইয়া আসে, নিশ্বাস প্রশ্বাস সহজে বয়।

—খোকার গলার এই হারটা—

কুণ্ঠিত অপরাধীর ভঙ্গীতে হার সমেত হাতটা বাড়াইয়া দিতেই, চিরশান্ত সুস্থির মানুষটা হঠাৎ একটা কাণ্ড করিয়া বসে।...সোনার হার সমেত হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলে—প্রবীর ঠাকুরপো! আপনি! আপনি আমাকে একটু দয়া করতে পারেন ?...আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারেন ?

সংস্কারের বশেই হাতখানা খসিয়া পড়ে হাতের উপর হইতে, মুহূর্ত্তের সুযোগকে দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিবার সাহস সহসা হয় না।

—কোথায় যেতে চান, বলুন ?

—যেখানে হোক !...শুধু এ বাড়ীর চৌকাঠের বাইরে।

এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া প্রবীর আর একবার প্রশ্ন করে—কিন্তু একটা কোথাও ঠিক না করে—দেশে-বিদেশে যেখানেই আপনার কোনো আত্মীয় থাকুন, পৌঁছে দেবো আমি কথা দিচ্ছি।

—বিদেশে ? জামালপুরে পৌঁছে দিতে পারবেন ?

—নিশ্চয়ই। এ বাড়ীতে—এ অবস্থায় আপনাকে ফেলে রেখে গিয়ে নিশ্চিন্ত থাকাও সহজ নয়।...অখিলেশদা ফেরেন নি তো ?

—না।

দালানের আলোর উজ্জ্বল শিখা, অথবা মনুষ্যকণ্ঠের মৃদু রেশ—কারণটা যাই হোক—কৃষ্ণবালার এতক্ষণে ঘুম ভাঙে——'অখিল এলি বাবা ?' বলিয়া আলুথালু বেশে বাহির হইয়া আসিয়াই যেন বিদ্যুতাহতের মতো আড়ষ্ট হইয়া যান। সম্বিত পাইয়া যখন ফিরিয়া যান, মনে হয় লজ্জায় ঘৃণায় মাটির সঙ্গে মিশাইয়া গেলেই যেন বাঁচেন তিনি।

—আ আমার কপাল! তাই বলি—অখিল আমার এই বয়সে—

শ্লেষ, বেদনা, হতাশা, ধিক্কার অনেক কিছুর সংমিশ্রিত তীক্ষ্ণ এই মন্তব্যটুকু শোনা যায় কৃষ্ণবালার ঘরের ভিতর হইতে।

সেই ঘরের দিকে একমিনিট তাকাইয়া থাকিয়া প্রবীর দৃঢ় স্বরে বলে—আপনি তৈরী হয়ে থাকবেন বৌদি, কালই নিয়ে যাবো।

॥ আট ॥

ট্রেন জামালপুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইতেই প্রবীর বাঙ্কের উপর হইতে আপনার ভারী স্থটকেশটা নামাইয়া রাখিয়া কহিল—বৌদি এসে গেল।

আরতি উঠিয়া বসিয়া এতক্ষণে প্রথম কথা কহিল—তুমি কোথায় যাবে ঠাকুরপো?

—এই তো আপনার সঙ্গেই এলাম।

—আমায় পৌঁছে দিয়েই চলে যাবে?

—তবে? কেন বলুন তো?

—এত বড় স্থটকেশ সঙ্গে নিয়েছ দেখে ভাবছি বুঝি আরো অনেক দূরে যাবে।

—এতে আপনার কাজে লাগবার মত কতকগুলো মাল আছে, সত্যি তো আর একবস্ত্রে ভদ্রলোকের বাড়ী ওঠা চলে না? অবশ্য জামা-টামাগুলো মাপে ঠিক হবে কি না জানি না, আন্দাজি নেওয়া।

আরতি মুহূর্ত্তের জন্য প্রবীরের চোখের উপর চোখ রাখিয়া মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—তুমি সব কিনেছ?

আসল প্রশ্নটা এড়াইয়া প্রবীর খোলা কোটটা গায়ে চড়াইতে চড়াইতে তাড়াতাড়ি কহিল—কেন রাগ করলেন না কি?

—রাগ? না রাগ করিনি, এখনো আমার জন্যে কেউ ভাবে দেখে আশ্চর্য্য লাগছে।

—ভাববে না কি রকম? কি মুস্কিল! নিন উঠুন, বাড়ীর ঠিকানাটা বলতে পারবেন তো? ষ্টেশন থেকে খুব দূর না কি?

—কি জানি, এখানের কোনো ঠিকানাই তো আমি জানি না ঠাকুরপো।

—বলেন কি!

উদ্‌ভ্রান্ত আরতি যখন এই জায়গাটার নাম করিয়াছিল তখন প্রবীরের ধারণা জন্মিয়াছিল খুব সম্ভব আরতির পিত্রালয় এখানে।

কিন্তু এখন এ বলে কি!

—তা'হলে হঠাৎ এখানে আসতে চাইলেন যে?

—কি জানি ছেলেবেলায় একবার এসেছিলাম—খুব ভালো লেগেছিল জায়গাটা, তাই হয়তো—

ছেলেবেলায় কাদের বাড়ী এসেছিলেন তা'হলে?

—মামীর বাপের বাড়ী এসেছিলাম মামীমার সঙ্গে, কিন্তু তারা তো আর নেই।

ট্রেন প্লাটফরমে আসিয়া পৌঁছাইয়া গেল, এখন আর নামিবার তাড়াহুড়া নাই, তাছাড়া এটা গাড়ীর বিশ্রামস্থল, কাজেই খুব ব্যস্ত হইবারই বা কি প্রয়োজন থাকিতে পারে!

কিংকর্তব্যবিমূঢ় প্রবীর প্রশ্ন করিল—আপনার বাপের বাড়ী কোথায়? কেউ নেই সেখানে?

—না।

অসহায় নারীর ক্লিষ্ট মুখচ্ছবি বলিষ্ঠ পুরুষচিত্তকেও সহজে আর্দ্র করিয়া তোলে, সকরুণ মমতায় সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া আসে।

এই বাষ্পভারাবনত দীর্ঘ আঁখিপল্লব, এই কম্পিত অধর, এই করুণ কোমল মুখশ্রী, কোন দিন কি সন্ন্যাসী অখিলেশের চোখে পড়ে নাই? মুহূর্ত্তের জন্যও কি ব্রত ভঙ্গ করিয়া এই ক্ষীণ সুকুমার তনুখানি সবল বাহুবেষ্টনে চাপিয়া ধরিতে সাধ জাগে নাই?

পুঁথির অন্তরালে স্নেহমমতা প্রীতিপ্রেম সমস্ত বিসর্জ্জন দিল কেমন করিয়া? যে লোক দয়াময়ের ভজনা করে, মানুষকে অবহেলা কি তাহার গায়ে লাগে না?

—আচ্ছা জামালপুর ছেড়ে দিন, ভালো করে ভেবে বলুন তো আর কোথায় যেতে চান—অর্থাৎ যত্নের সঙ্গে গ্রহণ করবে এমন কেউ আছে কি না।—কোমল সুরে প্রশ্ন করে প্রবীর।

ঈষৎ হাসির ছাপ কম্পিত ওষ্ঠাধরে ফুটিয়া ওঠে আরতির—স্বামীর বাড়ী থেকে পালিয়ে আসা মেয়েকে কেউ আদর করে নেয় না ভাই, নিজের বাপ-মাও না। তাড়িয়ে দিতে যদি নিতান্ত না পারে, লাঞ্ছনার সঙ্গে নেয়।

স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আরতির নত মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ঈষৎ গম্ভীর স্বরে প্রবীর কহিল—কিন্তু যদি কেউ আদরের সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে নিতে চায়—তা'কে সে অধিকার দিতে পার না কি আরতি? নাম ধরলাম বলে রাগ কোরো না, অসহায় দেখে অপমান করছি মনে করে ভুল বুঝোনা—বড্ড ছোট, ভারী ছেলেমানুষ মনে হয় তোমাকে, তাই নাম ধরে ডাকতে ইচ্ছা করে।

আরতি কথার উত্তর দিবে কি, এই স্নেহ-সহানুভূতির স্পর্শে তাহার বঞ্চিত হৃদয়ের রুদ্ধ-বেদনা দুই চোখে অশ্রুর প্লাবন বহাইয়া দেয়।

চাহিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেয় প্রবীর। অবস্থাটা বড় কষ্টকর!

সস্নেহে সান্ত্বনা দিবার অধিকার নাই, অশ্রুলাঞ্ছিত মুখখানি কাছে টানিয়া মুছাইয়া দিবার উপায় নাই, দিবার কথা ভাবিতেও নাই। নিরুপায় ক্ষোভে শুধু বসিয়া বসিয়া দেখা।

চোখের জলকে অনেকক্ষণ ঝরিতে দিয়া কিছু পরে আরতি নিজেই বলে—না রাগ করবো না—কিন্তু সাহস কি তোমার সত্যিই হয়? এতবড় বোঝা বইতে পারবে? এক-দিনের দয়ামায়া নয়—চিরকাল—চিরদিন?

—বিশ্বাস করে দিয়েই দেখ আরতি! আজ আর স্বীকার করতে লজ্জা করব না—এ শুধু একদিনের দয়ামায়া নয়, যখন তোমার সঙ্গে না ছিল পরিচয়, না ছিল চোখের দেখা, তখন থেকে প্রতিনিয়ত তোমার বঞ্চিত জীবনের গ্লানি আমাকে পীড়া দিয়াছে, তোমার ক্ষোভের বেদনা অহরহ করেছে আকর্ষণ। অমরেশ যখন পালালো তখন—

কি ইচ্ছে হয়েছিল জানো আরতি? ইচ্ছে হয়েছিল—সেই নিষ্ঠুর দৈত্যপুরীর কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসি তোমাকে। নিজের মনকে সব সময়ে বিশ্বাস করতে পারতাম না বলেই এড়িয়ে যেতাম তোমার সঙ্গ। আজ দৈব বা দুর্দ্দৈব যাই বল—দুজনকে সংসারের গণ্ডির বাইরে এত কাছাকাছি এনে ফেলেছে বলেই হয়তো এতো বড় অসম্ভব কথা শোনাবার দুঃসাহস হ'ল। তাই বলছি—তোমার সব ভার বইবার সৌভাগ্য আমাকে দাও আরতি!

আপনার উত্তপ্ত মুষ্টির ভিতর আরতির হিমশীতল কম্পিত আঙুল কয়টি চাপিয়া ধরে প্রবীর।

আরতি হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করে না, তেমনি ভাবে বসিয়া সরল দুই চোখ প্রবীরের মুখপানে তুলিয়া ধরে। বাষ্পলেশহীন স্থিরকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলে—আমারও আজ স্বীকার করতে বাধা নেই—স্বামী যখন নিজের দায় এড়িয়ে, গেলেন মুক্তির পথ খুঁজতে, ধিক্কারে অভিমানে নিজেকে নষ্ট করবার এক দুর্দ্দান্ত সখ জেগেছিল। ভেবে-ছিলাম—ওকে দেখিয়ে দেব অবহেলায় ফেলে রাখলেই সব জিনিস পড়ে থাকে না। মানুষ তো জড় নয়—তার রক্তমাংসের শরীরের সমস্ত প্রয়োজনকে চোখ বুজে অস্বীকার করে গেলেও অন্নবস্ত্রের প্রয়োজনকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। অহঙ্কার করে বলেছিলাম—ভার যদি কাউকে দিতেই হয় তার দাম দেব, হাত পেতে ভিক্ষার ভাত খাবো না। কিন্তু খোকা সে সাহস নষ্ট করে দিয়ে গেছে। দেখলাম প্রতিশোধ নেওয়াও সহজ নয়। তারও বড় বেশী দাম দিতে হয়।

—কিন্তু এতো প্রতিশোধ নেওয়া নয় আরতি? এ শুধু বাঁচবার চেষ্টা। একজনের খেয়ালের খেলায় আর একজনের জীবন মিথ্যে হয়ে যাবে এর কোনো অর্থ হয়? এত বড় জীবনটা তোমার কাটবে কি নিয়ে বলতে পারো?

—বিধবারও তো দিন কাটে প্রবীর?

—না, কাটে না। সংসার-সমাজের শাসন, আর লোকনিন্দার বেড়া-আগুনের ভয় তাকে কাটাতে বাধ্য করে। নইলে কাটত না।

—আচ্ছা আমার কথা থাক, তোমারও তো সমাজ, সংসার, লোকনিন্দের ভয়, সবই আছে?

—আমি ওসব গ্রাহ্য করি না। তা'ছাড়া ভুলে যাচ্ছো কেন, আরো একটা জিনিস আমার ভগবানের দয়ায় প্রচুর আছে, যা সকলের মুখ বন্ধ করে রাখতে পারে। আমার কথা ভেবো না, শুধু তোমার নিজের কথা বল—জীবনটাকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করে দেখবার চেষ্টা কি অসম্ভব চেষ্টা?

—বুঝতে পারছি না প্রবীর—আগে ভাবতাম—পথে বেরোতে পারলেই বুঝি অনেক পথ খোলা পাওয়া যায়। কিন্তু কই সে পথ? কোন পথে সত্যিকার মঙ্গল? নিজের ভুলে অপরকে দুর্গতির পথে টেনে নিয়ে যাবো কোন ধর্ম্মে? একটা সামান্য মেয়েমানুষের দায় যে এত বড়, আগে সে খেয়াল ছিল না। ভার চাইতে হয়তো ফিরে যাওয়াই ভালো।

—কোথায় ফিরবে?

—যেখান থেকে পালিয়ে এলাম।

—কখনো না, কিছুতেই না—তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করিয়া ওঠে প্রবীর—ভিখিরীর দরজায় হাত পাতার অপমান থেকে তোমায় বাঁচাবো আমি।

॥ নয় ॥

আনন্দময় যে চাল চালিতে জিদ করিয়া মন্দিরাকে আনিলেন, সে চাল ব্যর্থ হইল মন্দিরার জিদে। জ্যোতির্ময়ী প্রদত্ত অর্থের কানাকড়িও আনন্দময়ের ক্যাশবাক্সে উঠিল না।

মন্দিরার কাছে আনন্দময়কে হার মানিতে হইল। বার বার—'লইতে অনিচ্ছুক' ছাপ মারিয়া প্রেরিত অর্থ আবার দাতার ভাঁড়ারেই ফিরিয়া গেল।

দরিদ্রের ঘরে দরিদ্রের মত থাকিতে চায় মন্দিরা।

এখন এই ধাড়ি আইবুড় মেয়ে লইয়া আনন্দময় করেন কি? মুস্কিল এই—ধমক দিয়া 'ঠাণ্ডা' করিয়া দিবার সাহসও হয় না। নিজের দুর্ব্বলতা দেখিয়া নিজেরই আশ্চর্য্য লাগে আনন্দময়ের।

কিন্তু মেয়ের কাছে হারিয়া যাওয়ার লজ্জা মেয়েকে জব্দ করিবার ফিকির খুঁজিয়া বেড়ায়। এবং ইহারই সহজ উপায় হইতেছে—কন্যাকে অনভিপ্রেত এবং অরুচিকর বিবাহে বাধ্য করা।

মন্দিরাও ভাবিয়া আশ্চর্য্য হয়, সকলের সঙ্গেই বেশ মানাইয়া চলা যায়—মাকে, ভাইবোনগুলিকে তো বেশ ভালবাসিতেই ইচ্ছা করে, কিন্তু শুধু পিতার উপরই বা এমন বিজাতীয় বিদ্বেষ আসে কেন তাহার?

পিতা ও কন্যার অন্তরে অন্তরে এই এক রেষারেষির লড়াই চলে।

আজও সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াই আনন্দময় বাসুকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—নবাবকন্যাটি গেলেন কোথা?

'নবাব কন্যাটি'র অর্থ হৃদয়ঙ্গম না হইলেও—শুনিয়া শুনিয়া বাসুর মুখস্থ হইয়া গিয়াছে, তাই সহজেই প্রশ্নের উত্তর দিল—দিদি সেই রাত্তির থেকে পড়া করছে। জানো বাবা, দিদি নাকি শাস্তিকাকার চাইতে অনেক অনেক বেশী পড়া জানে?

—তবে আর কি চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে গেল আমার! একে কেরোসিনের এই দুরবস্থা, আর রাত্তির থেকে পড়া হচ্ছে? যার যা খুসী তাই করছে যে দেখি।

বলাবাহুল্য মন্দিরার কর্ণগোচর করাইবার উদ্দেশ্যেই কথাগুলি উচ্চারিত হইল। এবং

উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবার পক্ষে কোন বাধাও ছিল না। কিন্তু গায়ে পড়িয়া কথা বাড়াইবার বা মতামত ব্যক্ত করিবার মেয়ে মন্দিরা নয়।

যদিও সকালের আলো ফুটিয়াছিল, তথাপি কেরোসিনের শিখাটা আরো উজ্জ্বল করিয়া দিয়া মন্দিরা "নবাব কন্যা" কথাটা লক্ষ্য করিয়া হাসুকে উদ্দেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলে—বাবার নবাব হবার সখটি ষোলো আনা, না রে হাসু? লোকে না মানুক নিজেই বলে বলে যতটা পারেন—কি বলিস?

মেয়েকে সমীহ অমিয়াও করে না তা নয়, তবু মেয়ে আসায় ছোট ছেলে মেয়ে-গুলির দায় হইতে কতকটা অব্যাহতি পাইয়া সে যেন বাঁচিয়াছে। স্বামীর আচার-আচরণ অবশ্য কখনোই সে ভাল চক্ষে দেখে না, জ্যোতির্ময়ীর কাছ হইতে অর্থসাহায্য লইতে আপত্তি করার পর হইতে মেয়ের উপর আনন্দময়ের ব্যবহারটাও তার নিতান্তই দৃষ্টিকটু ঠেকে, তবু সাহস করিয়া প্রতিবাদ করিতে পারে না। কিন্তু আজ যখন আনন্দময় বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া গায়ের ফতুয়াটা খুলিতে খুলিতেই উচ্চ চীৎকারে কহিলেন—সম্বন্ধটা পাকা করে এলাম বুঝলে?—তখন প্রতিবাদ না করা অসম্ভব হইল বেচারার পক্ষে।

ঈষৎ জোর গলায় কহিল—পাকা করে এলে মানে? সে আবার কি?

—অবাক হয়ে গেলে যে? মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না?

—দিতে হবে বলে যা তা দিতে হবে? তাছাড়া ওর বিয়ের জন্যে আমাদের এত ভাবনা কেন? নতুন দিদিমা—

আনন্দময় বিকৃত মুখে কহিলেন—হ্যাঁ, তোমার নতুন দিদিমা তো সবই করলেন! কুড়ি বছরের মেয়ে পুষে ধাড়ি করলেন, অথচ বিয়ের নাম গন্ধ নেই। ওসব বড়মানুষের ধার আমি ধারি না। আমার মেয়ে, আমি যেখানে খুসী— যার সঙ্গে খুসী বিয়ে দেব, ব্যস। এর ওপর আর কথা নেই।

জজসাহেবের শেষ রায় দিবার ভঙ্গীতে শেষের কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া কর্ত্তাজনোচিত ভাবে তেলের বাটি লইয়া জলচৌকীতে বসিলেন আনন্দময়।

অমিয়া বোধকরি মরিয়া হইয়া আরো কিছু বলিতে যাইতেছিল, মন্দিরা পিছন হইতে মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—ও মা, বেশী পাকা কথা কইতে বারণ করো বাপু, পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আইনকানুন অতশত জানেন না তো, জোর করে বিয়ে দেবার অনেক ফ্যাসাদ আছে কি না! শেষটায় মুস্কিলে না পড়েন।

—বাঃ চমৎকার—বাপকে আইন দেখানো! কলকাতার শিক্ষা বটে!—বলিয়া আনন্দময় ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে মাতা কন্যা উভয়কে বিদ্ধ করিয়া হন হন করিয়া পাতকুয়ার ধারে প্রস্থান করিলেন।

নাঃ, মেয়েকে তিনি দেখিয়া লইবেন।

জবরদস্তি করিয়া বিবাহ দেওয়ার কল্পনাটা এমনই হাস্যকর ছেলেমানুষি লাগে যে, সেটা লইয়া বেশী মাথা ঘামায় না মন্দিরা।

মাথা ঘামায় অমরেশের চিন্তায়।...

কেন গেল! কোথায় গেল! এসব ভাবনা পুরনো হইয়া গিয়াছে, কিন্তু জলজ্যান্ত একটা মানুষ সত্য সত্যই হারাইয়া গেল, এই চিন্তাটাকে কিছুতেই বরদাস্ত করা চলে না। এটাই নূতন হইয়া উঠে।

প্রথম প্রথম ভাবতে চেষ্টা করিত, দূর হোক ছাই—যাহারা তাহার পরমাত্মীয় তাহারাই যখন মনকে মানাইয়া লইতে পারিল, মন্দিরার এত মাথাব্যথা কিসের?

চেষ্টা করিলে কি হয়, মাথা আপন হিসাবেই ব্যথাগ্রস্থ থাকিয়া যায়। অবশেষে মন্দিরা চিন্তার অন্য ধারা বাছিয়া লয়।...আচ্ছা, একথাও তো ভাবিবার মত, অহরহ অমরেশের চিন্তাই বা তাহার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে কেন? এত পরিচিত, অর্দ্ধ পরিচিত, স্বল্প পরিচিত লোকের মাঝখানে অমরেশই বা এমন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিল কোন অধিকারে? ইহাকেই প্রেম বলে না তো? কিন্তু যখন অমরেশ হারাইয়া গিয়াছিল, তখন তো এতো অধৈর্য্যভাব আসে নাই। যতীন মুখুজ্যের সদ্য মৃত্যুর আঘাতটা বোধহয় তখন অন্য অনুভূতির তীব্রতা কমাইয়া আনিয়াছিল।...তারপরই তো এখানে চলিয়া আসা! কি জানি বিরহের আগুনের আলোতেই বুঝি মনের ভিতরটা এতো স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে।

প্রেমের লক্ষণ বিচার করিয়া অবশেষে সন্দেহের আর কিছু থাকে না, এবং বেহায়া মেয়েটা একদিন জোর কলমে লিখিয়া বসে—'দাদাভাই গো, তোমার নিরুদ্দেশ বন্ধুর উদ্দেশ করছনা কেন? দেখছো না তার জন্যে ভেবে ভেবে মরে যাচ্ছি?"

দুইবার রিডাইরেক্ট হইয়া সে চিঠি এলাহাবাদে প্রবীরের হাতে পৌছিয়া উত্তর আসিতে দেরী হইল অনেক। উৎসাহী আনন্দময় ইতিমধ্যে কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা রীতিমত ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছেন।

কিন্তু প্রবীরই বা করিবে কি, সে তো আর অমরেশকে ধরিয়া আনিয়া মন্দিরার আঁচলে বাঁধিয়া দিবে না? আপনার জীবনের নূতন সমস্যা লইয়া তখন সে ব্যস্ত।

শুধু লেখার ভিতর ব্যক্ত করিয়াছে তার বলিষ্ঠ হৃদয়ের স্পষ্ট মতামত। লিখিয়াছে—"মন্দিরা, আমার বন্ধুর ভাবনায় তুই মরতে বসেছিস, এটা সত্যি আমায় অবাক করে দিয়েছে। এটা আবিষ্কার করলি কখন? 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে' প্রবাদটা মিলে যাচ্ছে যে। কিন্তু মরতে যদি সত্যি বসে থাকিস—বসে বসে মৃত্যুর দিন গুনিস নি। শুধু মনে রাখিস বাঁচতে হলে বাঁচবার চেষ্টা চাই। তোর জীবনের জটিল সমস্যার জট তোকেই খুলতে হবে। এটুকু চেষ্টার জন্যে যে ধৈর্য্য যে বল থাকা আবশ্যক তা যদি নাই থাকে—মরা আর বাঁচার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। হয়তো কাছে থাক্‌লে তোর কিছু সাহায্য করতে পারতাম—কিন্তু আমার জীবনের সমস্যা আরো অনেক বেশী জটিল হয়ে উঠেছে। তার সত্যিকার সমাধান যে দিন সহজ হয়ে দেখা দেবে, সেই দিন ফিরব তোদের কাছে, তার আগে নয়।"

কলিকাতায় থাকিলে হয়তো অমরেশের সন্ধান করা অসম্ভব হইত না, কিন্তু অমরেশের

উপর অভিমানে, জ্যোতির্ম্ময়ীর উপর অভিমানে যেন সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপরেই অভিমান করিয়া মন্দিরা এই অপরিচিত পিতৃগৃহে আপনাকে নির্ব্বাসন দিয়াছে।

কিন্তু জীবনটা কি মিথ্যা অভিমানে নষ্ট করিয়া ফেলার মত তুচ্ছ বস্তু? অমরেশকে যদি সত্যই তাহার প্রয়োজন থাকে, সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়াও কি বাহির করিতে হইবে না তাহাকে?

আপনার নিভৃত হৃদয়ের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া প্রয়োজনের ওজন অনুমান করিবার চেষ্টা করে মন্দিরা।

বিনিদ্র রাত্রির অনেকটা অংশ কাটিয়া যায় সম্ভব অসম্ভব কত কিছুর কল্পনায়।

কখনো সেকালের রাজকন্যার মত 'ময়ূরপঙ্খী নায়ে' চড়িয়া বাহির হয় নিরুদ্দেশ রাজপুত্রের উদ্দেশে—বাহির হয় পুরুষের সাজে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চাপিয়া তেপান্তরের মাঠে। কখনো এ-কালের লর্ড দুহিতার মত নিজস্ব 'প্লেনে' চড়িয়া আকাশের গায়ে, অথবা টু-সিটার খানায় চাপিয়া অজানা শহরের পীচঢালা রাস্তায়।

হয়তো কাছে থাকিলে প্রয়োজন এত তীব্র হইয়া দেখা দিত না। দূরে সরিয়া গিয়াছে বলিয়াই তার জায়গায় শূন্যতাটা এত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। হয়তো অমরেশ উপলক্ষ্য মাত্র, সদ্য জাগ্রত যৌবনের দুর্নিবার আবেগ আপনাকে প্রকাশ করিবার একটা পথ চায়।

নিজেকে বাঁচাইবার কি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, মন্দিরাই জানে। ইতিমধ্যে আনন্দময় নিশ্চেষ্ট নাই। স্কুল হইতে ফিরিয়া অমিয়ার উদ্দেশে কহিলেন—মেয়েটাকে চট্ করে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে দাও দিকিনি, ঝিঁকরগাছার তারা আজকে দেখতে আসছে।

অমিয়া কহিল, কেন? আসছে রবিবারে আসবার কথা ছিল না?

—ছিল তো হয়েছে কি? আজই আসবে তারা, তাদের খুসী। তোমার ওই ধিঙ্গি মেয়ের কলকাতাই চালের সাজগোজ খুলে ভদ্রলোকের মেয়ের মত যা হয় একটা পরিয়ে দাও।

অমিয়া বিপন্নভাবে কহিল—আমি আবার ওর কি করে দেব? তাছাড়া ওর চেহারায় কিছু না সাজলেও চলবে।

—ওই গুমোরেই গেলে, লম্বায় যে আমার মাথা ছাড়িয়েছে সে হুঁস আছে? আর রং তো হাসু বাসুর চেয়ে ময়লা বই ফরসা নয়।

বাহিরের লোকের কাছে অবশ্য অন্য কথা বলেন আনন্দময়।

পাত্রী দেখিতে যাহারা আসিয়াছে, তাহাদের কাছে সালঙ্কারে মেয়ের গুণবর্ণনা করিয়া অবশেষে বলেন—চেহারার কথা আর নিজে কি বলবো আপনারা দেখে নেবেন—কইরে লাট্টু তোর বড় দিদিকে নিয়ে আয় না।

লাট্টু আসিয়া সভয়ে নিবেদন করিল—বড়দি বললেন, মাথা ধরছে, আসতে পারবেন না।

—মাথা ধরেছে? অ্যাঁ বলিস কি! আঃ সারা সকালটা হেঁসেলঘরে থাকবে, মানা

শুনবে না তো! অত করে বললাম আজকের দিনটা অন্ততঃ বন্ধ দে, তা মা লক্ষ্মীর মন উঠলো না। নিজে হাতে করে সকলকে না খাওয়ালে তার আর—যাই দেখে আসি! পারবেনা বললে কি চলে? ভদ্রলোকেরা এসেছেন—বলিয়া আনন্দময় ব্যস্তভাবে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া যান।

অমিয়া ভয়ে কাঠ হইয়া দাওয়ায় বসিয়াছিল, আজ যে কি মহাপ্রলয় ঘটিবে তাই ভাবিয়া তাহার সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল। মন্দিরাকে অবশ্য সাধ্যমত বুঝাইয়াছে সে, কিন্তু মন্দিরাও আনন্দময়েরই কন্যা।

তবে মাকে সে জ্বালাতন করে নাই, শুধু হাসিয়াছে আর বলিয়াছে—আচ্ছা মা, তুমি অত ভয় পাও কেন বলতো? বড্ড বাপু বোকা মেয়ে তুমি! যত ভয় করবে ততই ঠকে যাবে। চোখ রাঙাতে শেখ, দেখবে আনন্দ সান্যাল 'স্পিক্‌টি নট্'।

হতাশ অমিয়া অবশেষে বাহিরে আসিয়া বসিয়া আছে।

আনন্দময় ভিতরে ঢুকিয়াই চাপা গর্জ্জনে 'মা লক্ষ্মী'র উদ্দেশে কহিলেন—সে হারামজাদী লক্ষ্মীছাড়ি গেল কোথায়?

অমিয়া চোখের ইঙ্গিতে একখানা ঘর দেখাইয়া দিল।

দুই কোমরে দুই হাত রাখিয়া আনন্দময় বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গীতে দুয়ারের চৌকাঠে দাঁড়াইয়া কহিলেন—তুমি কি ভেবেছো বল্‌তে পারো?

মন্দিরা নিবিষ্টচিত্তে নাটুর অঙ্কর খাতা পরিদর্শন করিতেছিল, পিতার কথায় চম্‌কানোর ভঙ্গীতে পিছনের দিকে তাকাইয়া কহিল - ভাবছি, নাটু এবার প্রমোশন পেলে হয়, আঁকে যে রকম কাঁচা!

—রেখে দাও তোমার আঁক, আর তোমার গুষ্টির মাথা। বলি, বাইরে যেতে পারবেনা বলেছ কেন শুনি?

ছদ্ম সরলতা ত্যাগ করিয়া মন্দিরা ঈষৎ গম্ভীর ভাবে কহিল—তা'র কারণ, এখানে যখন বিয়ে হতেই পারে না, তখন শুধু শুধু কেন কষ্ট করে বাইরের লোকের সামনে বেরবো?

—যথেষ্ট জ্যাঠামী হয়েছে, হতে পারে না মানে কি? আলবাৎ হবে।

—না অসম্ভব।—বলিয়া মন্দিরা আবার খাতার পাতায় মন দিবার চেষ্টা করে।

—আমি এইখানেই বিয়ে দেব তোমার। শীগগির চলো, যদি ভালো চাও।

—আচ্ছা যাচ্ছি।—বলিয়া খাতা মুড়িয়া দাঁড়ায় মন্দিরা।

সাজগোজের কথা বলিবার ভরসা বা স্পৃহা হয় না আনন্দময়ের। তবে সর্ব্বদাই এতো ভালো ভালো শাড়ী ব্লাউজ পরিয়া থাকে মন্দিরা যে, এ অঞ্চলে তাহাকে নিমন্ত্রণ-বাড়ীর সাজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সব চাইতে কম ভালো শাড়ীগুলাই তাহার এইরূপ।

তবু বিশেষ করিয়া আজ সে চুল বাঁধিয়াছে চাঁচিয়া ছুলিয়া কপাল বাহির করিয়া।

বিষদৃষ্টিতে একবার মেয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দময় তাহাকে সেই অবস্থাতেই একরকম টানিয়া বাহিরের ঘরে লইয়া যান।

মেয়ের এরূপ রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখিবার জন্য অবশ্য পাত্রপক্ষ প্রস্তুত ছিলেন না, তবু ভদ্রতা বজায় রাখিয়া তাঁহারা 'মা লক্ষ্মী এসো মা' বলিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন।

পাত্র দ্বিতীয়পক্ষ, দলের মধ্যে তিনিও ছিলেন, কিন্তু আত্মগোপন করিয়া। কারণ বিবাহ করার উদ্দেশ্য তাঁহার কয়েকটি মাতৃহারা শিশু-সন্তানের লালনপালনের জন্য। মেয়েটি তদুপযুক্ত হইবে কি না সেইটি শুধু দেখিয়া লওয়া—এই আর কি।

অবস্থাপন্ন লোক। জোত-জমা বিস্তর আছে, এবং এ বাজারে যে ধানজমি ক্ষেত-খামার অপাঙ্‌ক্তেয় নহে সে জ্ঞানটুকুও বিলক্ষণ আছে। মেয়েটি সুন্দরী বয়স্থা এবং কলিকাতায় শিক্ষিতা শুনিয়াই তিনি এতটা ঝুঁকিয়াছেন।

মন্দিরা শান্তভাবে আসিয়া বসিল, প্রণাম করিল এবং পুরোহিতের প্রশ্নোত্তরে যখন নির্ব্বিবাদে নিজের নামও বলিল, তখন আশ্বস্তচিত্ত আনন্দময় মনে মনে উচ্চারণ করিলেন—এই তো তড়্‌পানি বন্ধ হয়ে গেছে। হুঁ বাবা, যা ধমক দিয়েছি—মেয়েমানুষ চোখ রাঙালেই জব্দ। সাধে কি আর বলে কুকুরের জাত।

সহসা একটি শব্দ বজ্রপতনের মত সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করিয়া বাজিয়া উঠিল।

—আচ্ছা, বিবাহিতা মেয়ের দ্বিতীয়বার বিবাহ আপনারা ভাল বলেন?

পাত্রের মাতুল সচকিত প্রশ্নে কহিলেন—বিবাহিতা কন্যার বিবাহ? হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন মা লক্ষ্মী?

—দেখুন, আপনাদের জানিয়ে রাখা ভালো, বাবা আমাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দিতে চান জোর করে—পাত্র শুনেছি বিপত্নীক, সধবা বিধবা কিছুতেই তাঁর আপত্তি না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আপত্তি আছে যথেষ্ট। এখন আপনারা—

আনন্দময় এতটা কথা মন্দিরাকে বলিতে দিলেন বোধ করি বাক্‌শক্তির অভাবে, কিন্তু আর সহ্য করিতে না পারিয়া হঠাৎ গর্জ্জন করিয়া ওঠেন—থাম্‌ সর্ব্বনাশী, যা মুখে আসছে তাই বলছিস যে?

মাতুল হাত ধরিয়া ধীরস্বরে কহিলেন—আপনি থামুন সাণ্ডেল মশাই, ব্যাপারটা পরিষ্কার হোক।...সবটা খুলে বলতো মা লক্ষ্মী!

'মরিয়া' নামক যে অবস্থা আছে একটা, তাহারই চরম সীমায় উঠিয়া মন্দিরা মুখ তুলিয়া পরিষ্কার কণ্ঠে কহে—খুলে বলবার বেশী কিছু নেই—স্বামী নিরুদ্দেশ, বাবা বোধ করি আর খেতে পরতে দিতে অক্ষম, কাজেই এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

মাতুল ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন—সাণ্ডেল মশাই!

সাণ্ডেল মশাই মেয়ের দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে বাহির হইয়া গেলেন।

সেকাল হইলে বোধ করি মন্দিরার ভস্ম হইতে বিলম্ব হইত না, কলির ব্রাহ্মণ 'ঢোঁড়া সাপের' সামিল বলিয়াই অক্ষত দেহ লইয়া সে বসিয়া রহিল।

পাত্রপক্ষ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

'পাড়াগেঁয়ে' হইলেই যে বোকাসোকা হইবে, মন্দিরার এ ধারণাটা অবশ্য সম্পূর্ণ ভুল।

ব্যাপারটা রহস্যময় হইলেও মন্দিরার কথাটা যে তাঁহারা যথার্থই বিশ্বাস করিয়াছেন এমন মনে করিবার হেতু নাই।

স্বয়ং পাত্র আশাভঙ্গের দারুণ মর্ম্মবেদনায় সক্ষোভ হাস্যে কহিলেন—আচ্ছা এক রগড় দেখতে আসা গিয়েছিল, কি বল মামা? আশ্চয্যি কাণ্ড!

মন্দিরাও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। টুকটুকে ঠোঁটের উপর চাপিয়া ধরা ঝিকঝিকে দুইটি দাঁতে ঈষৎ হাসির আভাস আনিয়া কহিল—আশ্চর্য্য কাণ্ডের অভাব কি বলুন? আপনার স্ত্রী তো শুনেছি বাইশ বছর ঘর করে মারা গেছেন—নাতি নাতনীর অভাব নেই, তবু অনায়াসেই নতুন করে আবার বিয়ে করবার সখ হ'ল—আশ্চর্য্য নয়?

বলিয়া সুস্পষ্ট অবহেলার ভঙ্গীতে দুই হাত জোড করিয়া একটা নমস্কার করিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। ইহাকেই যে পাত্র বলিয়া চিনিল কেমন করিয়া সেটাও কম আশ্চর্য্যের কথা নয়।

ক্রোধ প্রকাশের প্রধান পথ রসনা। যাঁহারা অপমানিত হইয়া চলিয়া গেলেন তাঁহারা যে রসনার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়া যাইবেন না এটা আশা করা অন্যায়।

'চল হে চল, খুব শিক্ষা হ'ল', 'সাণ্ডেলকে দেখে নেব, আমিও রতন মুখুজ্যে', 'মিলিটারি মেয়ে', 'স্বামী কি সাধে নিরুদ্দেশ হয়েছে, মনের ঘেন্নায়—'প্রভৃতি নানাবিধ মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে আর একবার আনন্দ সান্যালকে শাসাইয়া বাহির হইয়া গেলেন তাঁহারা।

এদিকে অমিয়া পাঁচখানি রেকাবিতে গোকুলপিঠে, নারিকেল লাড়ু ও জিবেগজা সাজাইয়া বসিয়া আছে।

মন্দিরা বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াই কহিল—যাক বাঁচা গেল, খাবারগুলোয় আর বাজে লোক ভাগ বসাবে না—আয় হাসু নাটু লাটু আমরা সদ্ব্যবহার করি জিনিসগুলোর।...বেলা কোথায় গেলি, তুই তো খুব ভালবাসিস গোকুলপিঠে। ...আচ্ছা মা, এর নাম গোকুলপিঠে হ'ল কেন বলতো? গোকুলের লোকে বুঝি শুধু এই খেয়েই থাকত?

অমিয়া মেয়ের উচ্ছ্বাসের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে অক্ষম হইয়া ব্যস্তভাবে বলে—এই দেখ পাগল মেয়ের কাণ্ড, ভদ্রলোকেরা খাবে যে রে!

—আর তোমার ভদ্রলোক! তাঁরা এতক্ষণে হাটতলা ছাড়িয়ে গেলেন।

আনন্দময় প্রথমটা ভাবিলেন—মেয়ের মাথায় একখানা থানইট ছুঁড়িয়া মারেন, কিয়ৎকাল পরে মনে হইল কাঁচা বেত লইয়া আগাপাশতলা বিতাইয়া দেন, অবশেষে স্থির করিলেন—দূর করিয়া দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ব্যবস্থা।

সেই সাধু সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া বাড়ীর ভিতর আসিয়া দেখিলেন, মন্দিরা মহোৎসাহে ভাইবোনেদের সহিত মিষ্টান্নপর্ব্ব সমাধা করিতে সুরু করিয়াছে।

ধারালো আর সারালো যে ভাষাটি মক্স করিয়া আসিতেছিলেন, কেমন যেন গোলমাল হইয়া গেল। মন্দিরাকে ছাড়িয়া অমিয়াকে উদ্দেশ করিয়া আনন্দময় কহিলেন—গলায় দড়ি দাওগে, গলায় দড়ি দাওগে—দড়ি যদি না জোটে আঁচলে ফাঁস দিয়ে আড়ায় ঝোলো গে। ছি ছি ধিক্!

হঠাৎ প্রেমময় স্বামীর এইরূপ এলাহি হুকুমে গ্রীষ্মের দিনেও অমিয়ার হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসে। শঙ্কিতদৃষ্টিতে একবার মেয়ের ও একবার স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া ব্যাপারটা আন্দাজ করিবার চেষ্টা করে।

মেয়ে অবশ্য নির্ব্বিকার।

আনন্দময় এবার ধাতস্থ হইয়া মেয়েকে লইয়া সুরু করেন—তোমার মতন কুলাঙ্গার মেয়েকে বেশী কিছু বলবার দরকার নেই, শুধু আমার নয়—সাণ্ডেল বাড়ীর—এ বংশের কলঙ্ক তুমি। তুমি আমার মেয়ে, একথা মনে করে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমার।

—আমারও বাবা!—আস্তে আস্তে কথাটা উচ্চারণ করে মন্দিরা।

বোধ করি 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন এই প্রথম।

আনন্দময় যেন রাগ করিবারও দিশা খুঁজিয়া পান না। জিবেগজায় কামড় দিতে দিতে অবলীলাক্রমে এতবড় কঠিন কথাটা বলিয়া বসিস? আনন্দময়ের কন্যা বলিয়া লজ্জায় তাহারও মাথা কাটা যাইতেছে? কতটা গর্জ্জন করিলে এতবড় ধৃষ্টতার উপযুক্ত হয় তাহা বুঝিয়া উঠিতে অক্ষম হইয়াই যেন হঠাৎ গুম্ হইয়া যান আনন্দময়।

কিন্তু দেখিয়া লইবেন তিনি যতীন মুখুজ্যের দ্বিতীয় পক্ষের পরিবারকে। শেষোক্ত সঙ্কল্পটি সশব্দে স্বগতোক্তি করিয়া যান আনন্দময়। অগত্যা অমিয়াকেও পিছন পিছন যাইতে হয়, ভাবনায় যে পেটের ভাত চাল হইয়া গেল তাহার।

সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া অমিয়া রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া কহিল—এ সব কী কাণ্ড মন্দিরা?

—কাণ্ড কিছুই না মা। বাবার অমন নাদুসনুদুস জামাইটি হাতছাড়া হয়ে গেল, তাই খেদ হয়েছে। তা' অঞ্জুর সঙ্গে দিলেও মন্দ হ'ত না, কি বলিস বেলা? বয়সেও বেশ মানিয়ে যেত—বলিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে মন্দিরা।

—'বিয়ে হয়ে গেছে,' 'স্বামী নিরুদ্দেশ', এসব কী কথা? বানিয়ে বলবার আর কথা খুঁজে পেলে না?

—সত্যি কথাই মা!

—কী সত্যি?

—ওই যা বললাম। তোমরা আর আমাকে লজ্জাসরম রাখতে দিলে না বাবু, এমনিতেই তো বলো আমি নাকি ভারী বেহায়া।...মা, রাগ করলে? কর, আমার দুর্ভাগ্য! যদি কখনো খুঁজে পাই, যদি তোমার কাছে এনে দেখাতে পারি, সেদিন কিন্তু রাগ করে থেকোনা যেন।

সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া হঠাৎ বড বড় দুই ফোঁটা অশ্রু গালের উপর গড়াইয়া

পড়ে। মন্দিরার মত মেয়েও তাহা হইলে 'সিরিয়াস্' হইতে পারে? কিন্তু হারানো মানুষকে খুঁজিয়া বাহির করিবে এ কি সর্ব্বনাশা পণ করিয়া বসিল মন্দিরা?

রাত্রে আনন্দময় ও অমিয়া কোলের ছেলেটিকে লইয়া পাশের ঘরে শুইতে গেলে মন্দিরা আপনার ছোট স্যুটকেসটিতে খানকয়েক শাড়ী ব্লাউস ভরিয়া গুছাইয়া লইয়া বড় ট্রাঙ্ক ও স্যুটকেসটা খুলিয়া রাশিকৃত শাড়ী বাহির করিয়া কহিল—বেলা, হাসু, মঞ্জু, কোন কোন শাড়ীটা কার পছন্দ হয় বল?

এক মাত্র বেলা ছাড়া শাড়ী পরিবার উপযুক্ত বয়স কাহারও হয় নাই, তথাপি হাসু মঞ্জু আগেই দুইখানা শাড়ী তুলিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। শুধু বেলাই বিস্মিতস্বরে কহিল—কেন বড়দি?

—এমনি। এই সব তোকে দিয়ে দিলাম। ট্রাঙ্কটা সুদ্ধ।

—বাঃ! পরিহাস ভাবিয়া হাসিয়া ওঠে বেলা। বড়দি আসিয়া পর্য্যন্ত অবশ্য সাজিবার সখ তাহার ষোলআনা মিটিয়াছে, তাই বলিয়া যথাসর্ব্বস্ব দান? ট্রাঙ্ক স্যুটকেশ সমেত!

—সত্যিরে বেলামণি, ওসব আমার আর দরকার নেই। সব নিস তুই।

—হেজলিন পাউডার, সাবান-টাবান, চিরুনি-টিরুনি, বই-খাতা সব?

—সব রে সব। মন্দিরা হাসিয়া উঠে—বিশ্বাস হচ্ছেনা বুঝি? আর শোন্, লাটু নাটু বাসুকে যা চাইবে কিনে দিস, টাকা থাকলো ট্রাঙ্কে, বুঝলি?

—কেন বড়দি তুমি কোথায় যাবে?

শঙ্কিত দুই চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকে বেলা।

—কোথায় যাবো? তা তো জানিনা রে—কতকটা আপনার মনেই বলিতে থাকে মন্দিরা—কে জানে কতো দূরে, কোন্ দেশে—

—বাবা বকেছে বলে রাগ করে চলে যাবে বড়দি?

—দূর পাগলী!

ছোট ভাইবোনগুলির গাল ধরিয়া আদর করে মন্দিরা, কাছে টানিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দেয়, ঘুমন্তগুলিও বাদ যায় না।

—আর তোর বিয়ের সময় যদি না থাকি, এইটা প'রে বড়দিকে মনে করিস—বলিয়া গলার হারটা খুলিয়া বেলার গলায় পরাইয়া দিতেই বেলা কাঁদিয়া ফেলিয়া দিদিকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া ওঠে—হার চাই না বড়দি, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, যেয়োনা ভাই।

চকিতের জন্য একবার মনে হয়, থাক্ দরকার নাই। অসম্ভবের আশায় কোন পথে পাড়ি দিবে সে? তার চেয়ে এই বা মন্দ কি? ইহাদের লইয়াই কি হাসিয়া-খেলিয়া দিন কাটাইয়া দেওয়া যায় না? ইহাদের কাছে থাকিলে নিজেকে কত বড় লাগে!

কিন্তু তাই কি হয়? কোন দুঃখ অমরেশের এমন গভীর হইল, যা ঘর ছাড়া করিয়া ছাড়িল তাহাকে, সেই হিসাবটা লইবে কে? চোখ বুজিয়া নিজের প্রয়োজনকে অস্বীকার করিয়াই বা ক'দিন চলিবে মন্দিরার? কেবলমাত্র নিজেকে 'বড়' ভাবিবার মধ্যে গৌরব যতোই থাক, খোরাক কই? দুধ জিনিসটা ভালো, কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজন হয় ডাল ভাতের।

চোখ মুছাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলে—না গিয়ে আমার উপায় নেই বেলু, যেতেই হবে।

—কোথায় যাবে বল না বড়দি?

—যাবো? যাবো আমার নিরুদ্দেশ বরের সন্ধানে। বুঝলি রে বোকা মেয়ে!

॥ দশ ॥

বিজয় মল্লিক এতদিনে উপযুক্ত বিচরণ ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইয়াছে।

নাইটস্কুল অবশ্য যথানিয়মে উঠিয়া গিয়াছে। বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণের উদ্দেশ্যে যে 'দি বান্ধব হোমিও হল' খুলিয়াছিল, তাহারও অস্তিত্ব এখন আর নাই।

এখন বিজয় মল্লিক 'জ্যোতির্ম্ময়ী বিধবাশ্রমের' সেক্রেটারী।

বিজয় মল্লিকের ভরসা করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী এই আশ্রম খুলিয়াছেন, অথবা জ্যোতির্ম্ময়ীকে কেন্দ্র করিয়া বিজয় মল্লিকই খুলিয়াছে, আলাদা করিয়া বলা কঠিন। আপাততঃ একজনের অর্থে ও অপরজনের সামর্থ্যে এই নাতিক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি সতেজে চলিতেছে।

তিনতলায় খানদুই ঘর ব্যতীত বিরাট বাসভবনের সমস্ত অংশই জ্যোতির্ম্ময়ী আশ্রমে দান করিয়াছেন! নানা বয়সের বিধবা মেয়ের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। নীচের তলায় 'তাঁত ঘর', 'চরকা ঘর', 'সেলাই ঘর' প্রভৃতি অনেক কিছু কাণ্ডকারখানা।

অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া বেড়ায় বিজয় মল্লিক এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির চেষ্টায়। পৃথিবীর আরো অসংখ্য লোকের অভাব অশান্তির চিন্তা করিতে অবসর নাই বলিয়াই বোধ করি এতদিনে শান্তি পাইয়াছে বিজয়।

তাই বা শান্তি পাওয়া বলা যায় কেমন করিয়া? এই আশ্রমের জন্যই তো তাহার অশান্তির শেষ নাই। এই প্রতিষ্ঠান আরো বড় আরো বিরাট হয় না? পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে, প্রত্যেক জেলায় ছড়ানো থাকিবে ইহার শাখা-প্রশাখা!

বাংলা দেশের সমস্ত বিধবাকে আশ্রয় দিতে পারিলেই যেন যথার্থ শান্তি হয় বিজয়ের। গাধার মত খাটিয়া মরিতে হয়, তাই রাত্রির গাঢ় নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিবার ফাঁক থাকে না। দিবা দ্বিপ্রহরে জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখে বিজয় মল্লিক।...

দুই পাঁচ হাজার চরকা ঘুরিতেছে একতালে...এক ছন্দে ওঠা-নামা করিতেছে শত শত মাকু...সারা বাংলা ছাইয়া গিয়াছে আশ্রমবালাদের হাতেকাটা সুতার খদ্দরে...ঘরে ঘরে ছেলে বুড়ো সকলের গায়ে সার্ট, প্যান্ট, ফ্রক, পাঞ্জাবী—সেলাইঘরের অপূর্ব্বকীর্ত্তি!

বিধবারা আর অপরের গলগ্রহ নয়, সংসারের আবর্জ্জনা নয়, স্বাধীন স্বাবলম্বী উপার্জ্জনশীল স্বপ্ন দেখা নিবারণ করিবার উপায় নাই।

গড়েরমাঠের গরু কি অড়রক্ষেতের স্বপ্ন দেখে না? পেট ভরিলেও দেখে।

জ্যোতির্ম্ময়ীর দিন আর কাটিতে চাহে না।

প্রবীর নাই, মন্দিরা নাই।

একজনকে জ্যোতির্ম্ময়ী স্বেচ্ছায় বিদায় দিয়াছেন, আর একজন জ্যোতির্ম্ময়ীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ত্যাগ ছাড়া আর কি? যখনই জ্যোতির্ম্ময়ী প্রবীরের কীর্ত্তির কথা মনে করিবার চেষ্টা করেন, ঘৃণায় লজ্জায় শিহরিয়া স্তব্ধ হইয়া যান।

জ্যোতির্ম্ময়ীর জীবনের অবলম্বন, হৃদয়ের আশ্রয়, একমাত্র গৌরব প্রবীর, কোন্ তুচ্ছবস্তুর লোভে আপনাকে নষ্ট করিয়া বসিল?

জ্যোতির্ম্ময়ীর উঁচু মাথা চিরদিনের জন্য হেঁট হইয়া গেল না কি?

বাধ্য বিনীত মার্জ্জিতরুচি ভদ্র ছেলে জ্যোতির্ম্ময়ীর, উচ্ছন্ন যাইবার জন্যও মায়ের কাছে মত চাহিতে আসিয়াছিল। বলিয়াছিল—মা, তোমার কাছে আমি অনেক বড় উত্তরের প্রত্যাশা করে এসেছিলাম—তুমি তো শুধু আমার মা নয়, আমার বন্ধু। আমার দুর্দ্দিনে তোমার সাহায্য পাবো এ আশাটুকু কি অন্যায়?

কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী প্রবীরের আকাঙ্ক্ষিত 'বড়' উত্তর দিতে পারেন নাই।

জগতে কোন মা কবে পারিয়াছে? সন্তানের মমতা যতই গভীর হোক, তবু সন্তানের হৃদয়ের পানে চাহিয়া আপন স্বার্থ খর্ব্ব করিবার ক্ষমতা আর যাহার থাক মায়ের থাকে না।

সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া যে গুরুমন্ত্র আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন তাহারও নূতনত্ব হ্রাস হইয়াছে, ধ্যানের মন্ত্রে ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি স্পষ্ট হইয়া উঠে না। লক্ষ জপ করিবার সংকল্প লইয়া যে মালা হাতে জপের আসনে বসেন, সে মালা কখন হাত হইতে খসিয়া পড়ে তাহার হিসাব থাকে না।

স্বামীর এনলার্জ করা প্রমাণ সাইজের ছবি, রূপার ফ্রেম, গুরুদেবের খড়ম, আর সোনার সিংহাসন, বালগোপালের মূর্ত্তি ও তাঁহার সেবার অসংখ্য উপকরণ, একে একে অনেক কিছু আসিয়া জড় হইয়াছে পূজার ঘরে।

প্রথমে উৎসাহের অবধি ছিল না, এখন ধূলার পুরু স্তর জমিয়াছে রূপার ফ্রেমে আর সোনার সিংহাসনে।

চন্দনকাঠের পালঙ্কে নেটের মশারি ফেলিয়া বালগোপাল তাঁহার ছোট্ট বালিশটিতে মাথা রাখিয়া দিনের পর দিন ঘুমাইয়া আছেন। তাঁহাকে ঘুম ভাঙাইয়া টিপ কাজল পরাইয়া, চূড়া-বাঁশীতে সাজাইয়া, ক্ষীর ননী খাওয়াইয়া গোষ্ঠে পাঠাইবার খেলা আর ভাল লাগে না।

বিস্বাদ বিবর্ণ দিনগুলি যেন বাঁধিয়া মারিতেছিল জ্যোতির্ম্ময়ীকে। কাহারও জন্ম কিছুই করিবার নাই, কী ভয়ঙ্কর এই অবস্থা!

মন্দিরা হাতখরচ ফিরাইয়া দেয়, প্রবীর অর্থ সাহায্য লইবে না পণ করিয়াছে, এত অর্থ লইয়া তবে করিবেন কি জ্যোতির্ম্ময়ী? দীর্ঘ জীবনভোর যতীন মুখুজ্যে যে ভিতরে ভিতরে কত সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, এতদিনে তাহা ধরা পড়িয়াছে।

এমনি দুর্দ্দিনে বিজয় মল্লিক আসিয়া ধরা দিল বিধবাশ্রমের আইডিয়া লইয়া। এখন দিনগুলা তবু কতকটা সহনীয় হইয়াছে। কথায় কাজে, আলাপে আলোচনায়, নূতন নূতন দুঃখের কাহিনী শুনিয়া সহজে কাটিয়া যায় দিন।

জীবনেই কি আসে নাই কিছু সরসতা? খ্যাতির আর তোষামোদের মিষ্টিরস কম সারালো সার নহে। নির্ব্বিচারে সকল বয়সের বিধবারা 'মা' বলে। শুধু মা নয়, 'দেবী মা'!

বিজয় শিখাইয়াছে।

ছাঁটা কোঁকড়ান চুলের উপর সাদা গরদের থান বেড়িয়া প্রশান্তমুখে যখন আশ্রমের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়ান জ্যোতির্ম্ময়ী, সত্য সত্যই দেবীর মত দেখিতে লাগে। তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে।

জ্বলিয়া নিঃশেষ হইয়া যাওয়া মোমবাতির মত যাহা নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছিল, বিজয় মল্লিক তাহাতে নূতন পলিতা সংযোগ করিয়া কাজে লাগাইয়াছে।

এসব কাজের অবশ্য দায়িত্ব সোজা নয়, তবে মানুষ যখন দেবীর প্রাপ্য সম্মান পাইতে থাকে, তখন দেবীর মত কঠিনও হইতে হয় বৈ কি। আশ্রমের কড়া আইনের ফাঁকে কে কখন কি বে-আইনি কাণ্ড করিয়া বসিল সে দিকে দৃষ্টি সজাগ রাখিতে হয় অহরহ। এতটুকু অসতর্ক হইবার জো নাই।

রাত্রে গেটের চাবি পড়িলে চাবি গচ্ছিত থাকিবে জ্যোতির্ম্ময়ীর নিজের কাছে। চিঠি যদি কাহারও আসে, পাশ হইয়া আসিবে জ্যোতির্ম্ময়ার হাত দিয়া। চিঠি লিখিতে গেলেও সেই এক হুকুম।

তাছাড়া কে উপাসনায় সময় দিয়াছে কম, আর স্নানের ঘরে সময় লাগাইয়াছে বেশী, কাহার ঘুম ভাঙিতে বেলা হয়, আর কাহার ঘুমাইতে যাইতে দেরী হয়, এসব তত্ত্বাবধান না করিলেই বা আশ্রম চলিবে কোন্ শৃঙ্খলায়?

তবু ইহার ভিতরও মাঝে মাঝে বেখাপ্পা ব্যাপারের অবতারণা হয় না এমন নয়। আট ফিট উঁচু প্রাচীরের অবরোধের মধ্যেও বেহায়া বসন্তবাতাস দৈবাৎ ঝাপটা মারিয়া যায়। মুণ্ডিতমস্তক ব্রহ্মচারিণীর মনেও হঠাৎ একছোপ সবুজের আভাস লাগে। তাই জ্যোতির্ম্ময়ীর নিশ্চিন্ত শান্তি ঘুচিয়াছে। এসব অনাচারের প্রশ্রয় দিলে চলে না, শাসন কড়া না হইলে বাঁধ-ভাঙা নদীর স্রোতের মত বিশৃঙ্খলার ঢেউ আসিয়া বিধবা-আশ্রমকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে কিনা তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?

তাই সেদিন সকালবেলা তিনতলার পূজার ঘর হইতে নামিয়াই কমলা নামের যে মেয়েটি কিছুদিন হইল ভর্ত্তি হইয়াছে, তাহাকে লইয়া পড়িলেন।

কমলার বিরুদ্ধে বর্ত্তমান অভিযোগ সাবান মাখা লইয়া। আশ্রমের নিয়মানুসারে সে আসিয়া মাথা মুড়াইয়াছে, নরুণপাড়ের ধুতিখানা ছাড়িয়া সাদা থান ধরিয়াছে, আহারাদিতেও তাহার সম্বন্ধে কোন অভিযোগ আসে নাই, কিন্তু ওই—সাবান সে মাখিবেই।

কেমন করিয়া জোগাড় করে সে কথা বলা শক্ত, কিন্তু দেখা যায় সুযোগ পাইলেই সে উক্ত অপকর্ম্ম করিতে ছাড়ে না।

জ্যোতির্ম্ময়ী তীব্র তিরস্কারের ভঙ্গীতে কহিলেন—কমলা, আবার তুমি সাবান মেখেছ?

রোগা শ্যামবর্ণা পাতলা ছিপছিপে মেয়েটি, বছর বাইশ বয়স হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু দেখিতে ছোট লাগে।

দেবী মা'র সামনে মুখ তুলিয়া কথা কওয়ার রেওয়াজ নাই, তাই মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। থাকিল বটে, তবে ভয়ে কাতর হইয়াছে দেখিলে মনে হয় না। বার বার তিরস্কারেও 'আর করিব না' এমন কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির করিতে না পারিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী অন্য পয়েন্টটা ধরিলেন,বলিলেন—সাবান তোমায় কে জোগায় বলতে পারো?

ইহারই উত্তরে ফস্ করিয়া আর একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল—বাগানের দরজা দিয়ে রোজ যে দেখা করতে আসে, সেই বোধ হয়।

বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যান জ্যোতির্ম্ময়ী। কিছু প্রকৃতিস্থ হইলে বলেন—কমলা এসব কি শুনছি? কে দেখা করতে আসে?

—একটি ছেলে।

অস্ফুটস্বরে এইটুকুই শুধু বলিতে পারে কমলা।

—ছেলে, সেটুকু কষ্ট করে না বললেও চলতো—কে সে তাই জানতে চাচ্ছি।

—আগে আমাদের পাড়ায় থাকতো।

—ওঃ। তা বেশ, কিন্তু কি বলতে চায় সে? কি জন্যে আসে তোমার কাছে?

হঠাৎ মরিয়া হইয়াই যেন কমলা স্পষ্ট গলায় বলিয়া ফেলে—বলে যে ওর সঙ্গে চলে যেতে। আমি যাবো।

—কোথায় যেতে বলে?

—তা জানিনা।

তোমায় নিয়ে গিয়ে খেতে পরতে দেবার সামর্থ্য ওর আছে?

—তা জানিনা।

—তাও জানো না? চমৎকার! কি করে, কি নাম, তাও জানো না বোধ হয়?

—নাম অরুণ, কিছু করে না।

—শেষ পর্য্যন্ত না খেয়ে মরতে হবে সেটা জানো?

—ও বলে এখানে থাকলেও মরে যাবো।…আর—আর—দুটি ভাত খেয়ে সুধু বেঁচে থেকে লাভ কি? আমায় ছেড়ে দিন।

—তা'হলে এলে কেন?

—আমি ইচ্ছে করে আসিনি, বিজয়বাবু রোজ রোজ আমার কাকাকে বলে বলে রাজী করিয়েছিলেন। কাকারা দশ বছর ধরে পুষছেন, তাই রাজী হয়ে গেলেন।…ও তখন থেকেই আমাকে—কমলা চুপ করিয়া যায়।

নন্দরাণী একজন পাকা বিধবা। সাতচল্লিশ বৎসর যাবৎ বৈধব্য পালন করিয়া আসিতেছেন তিনি। আশ্রমে ভর্ত্তি হইবার মত অনাথা তিনি নন। শুধু এখন আতপ চাউলের দর সাতচল্লিশে উঠিয়াছে বলিয়াই চেষ্টা চরিত্র করিয়া অনাথার দলে নাম লিখাইয়াছেন।

মিথ্যা কথাও হয় না বটে—প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী যিনি নাথ-হারা হইয়া কাটাইয়াছেন, অনাথা ছাড়া কি আর বলা যায় তাঁহাকে? নন্দরাণী হাতের মালাটা কপালে ঠেকাইয়া খন্ খন্ করিয়া বলিয়া উঠিল, তখন থেকেই যদি এত পিরীত তো বেরিয়ে গেলেই পারতিস? আশ্রমে এসে ঢলাঢলি কেন?

ক্রুদ্ধ কমলা ফোঁস করিয়া বলিয়া উঠিল—তুমি আর মুখ নেড়ো না নন্দদি! তুমি চুরি করে খাওনা? একাদশীর দিন গোপালকে ঘুষ দিয়ে বেগুনী ফুলুরি আনালে না সেদিন? দেবী মা'র আংটিটা তোমার বাক্স খুঁজলে বেরোবে না? তবে? এসব বুঝি দোষ নয়?

জ্যোতির্ম্ময়ী অবাক হইয়া বলেন—ছিঃ কমলা, কাকে কি বলছো? থাকতে না চাও চলে যেও, তাই বলে—

নন্দরাণী নাচিয়া উঠিয়া কহিল—চলে গেলেই হ'ল? খাতায় নাম সই করেনি? বেরিয়ে গেলে আশ্রমের কেলেঙ্কারী নয়? ওর জন্যে কি নতুন আইন ছিষ্টি হবে নাকি? বলি কমলি, ইহকাল তো গেছে, পরকালের চিন্তেও কি এককড়া নেই।

কমলি বুনো ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকাইয়া স্বচ্ছন্দে জানাইল—না। পরকালের চিন্তায় ঘুমের ব্যাঘাত হয় নাই তাহার।

মার্জ্জিত রুচিসম্পন্না বাসন্তী কমলার চাইতে সামান্য কিছু জ্যেষ্ঠত্বের দাবীতে উপদেশের সুরে মিহিগলায় কহিল—ছিঃ কমলা, এসব কথা উচ্চারণ করতে লজ্জা করে না তোমার?

কমলা বোধ করি এতগুলি রসনা আর দৃষ্টির সম্মুখে তোপের মুখে সৈনিকের মত মরিয়া হইয়াই উঠিয়াছিল, তাছাড়া সাবানের অপমান তখনো মর্ম্মান্তিক জ্বলিতেছিল, তাই তীক্ষ্ণস্বরে কহিল—সবাই মিলে আমার সঙ্গে লাগতে এসনা বলছি—সকলের সব কথা বলে দেব।

বাসন্তী চাপাগলায় কহিল—কি কথা শুনি? বলবার আছেই বা কি?

—কেন থাকবে না? তোমার মাসতুতো ননদের দেওর—বিশু না কে—নিত্যি চিঠি দেয় না তোমায়? জানলায় ঢিল বেঁধে নাওনা তুমি? বিধুদিরা পান-দোক্তা খায়না চুপি চুপি? সুধারাণী খালি শুয়ে থাকে, কিছু খেতে পারে না, আর দেবী মা'র সামনে বেরোয় না কেন, জানি না বুঝি? তবে?

দেখা গেল যত ভালমানুষ ভাবা গিয়াছিল মেয়েটিকে তেমন নয়।

জ্যোতির্ম্ময়ীর দুই কান ঝাঁ ঝাঁ করিয়া সমস্ত মুখ আগুনের মত রাঙা হইয়া আসে। দীর্ঘকাল দেবীগিরিতে পোক্ত না হইলে এত কথা হজম করিবার মত স্নায়ু সবল হয় না।

ব্রহ্মচর্যের যে অপূর্ব্ব আদর্শ দেখাইয়া এতগুলি অসহায়া নারীকে স্বর্গের কাছাকাছি লইয়া গিয়াছেন ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহারা সহসা যেন নিজেদের সঙ্গে তাঁহাকেও আছাড় মারিয়া ধূলায় ফেলিয়া দিল।

বিজয় মল্লিককে ডাকিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী আশ্রম ভাঙ্গিয়া দেবার সংকল্প ব্যক্ত করেন।

আজ না ভাঙিলেও—ভাঙিতই একদিন।

বিজয় মল্লিকের বুকটাও ভাঙিয়া গেল।

যাক হয়তো কোনদিন দেখা যাইবে—ভাঙা প্রাণে পলস্তারা লাগাইয়া আবার কোন নূতন স্বপ্ন গড়িয়া তুলিতেছে বিজয় মল্লিক।

॥ এগারো ॥

দীর্ঘকাল পরে আবার মন্দিরাকে দেখিলাম।

পশ্চিমের এক অখ্যাত সহরে ধূলি-ধূসরিত ক্ষুদ্র একটি ধর্ম্মশালায়। বেশভূষার অবস্থাও ধর্ম্মশালার চাইতে খুব বেশী উচ্চাঙ্গের নয়, কিন্তু সে বিষয়ে বোধ করি সে নিতান্তই নির্ব্বিকার!

বসিয়াছে—'বাগান' নামধারি একটি আগাছার জঙ্গলের ধারে, চটাওঠা ইটভাঙা সিঁড়িতে পা ঝুলাইয়া, আর ছোট ছেলেদের গল্পবলার ভঙ্গীতে পাশের ভদ্রলোকটিকে রূপকথা শোনাইতে সুরু করিয়াছে।

ভদ্রলোকটি যদিও মন্দ চকচকে ঝক্‌ঝকে নয়, কিন্তু ধূলায় বসিতে তাহারও আপত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না।

—হ্যাঁ কি বলছিলাম? তারপর কি না—ভোরের পাখী বাসা ছাড়বার আগে শুক-তারাকে সামনে রেখে দুঃখিনী রাজকন্যা নিষ্ঠুর রাজপুরী ছেড়ে চললেন তেপান্তরের মাঠ-ভেঙ্গে নিরুদ্দেশ রাজপুত্রের উদ্দেশে। কত মাঠ কত পথ পার হয়ে, কত নৌকো ইষ্টিমার রেলের গাড়ী গরুর গাড়ী চড়ে, অবশেষে এক সহরে এসে হাজির হলেন রাজকন্যা!

হলেন তো, কিন্তু কোথায় রাজপুত্র? মুস্কিল এই—এটা আবার কলিকাল। চোখের কাজল দিয়ে পদ্মপাতায় পত্ররচনা করে হংসদূতের মারফৎ, রাজপুত্তুরের সন্ধান নেবেন তার জোটি নেই।

কাজেই—অন্য বুদ্ধি খাটাতে হয়। তারপর—চোখের কাজলের বদলে ছাপার কালি, আর হংসদূতের বদলে সংবাদপত্রের স্তম্ভে বার্ত্তা পাঠিয়ে বসে বসে রাজপুত্তুরের আশায় দিন গোণে। দিন যায় রাত্রি আসে, রাত্রি যায় দিন আসে—ভেবে ভেবে রাজকন্যার চক্ষে

ঘুম নেই। এদিকে—রং হ'ল ময়লা, দেহ হ'ল ক্ষীণ, মুখ হ'ল শুকনো আর, চুল হ'ল রুক্ষ, সাজ-গোজের কথা বলেই কাজ নেই—মোটের মাথায় রাজকুমারীর যখন একটি কাঠ-কুড়ুনীর মত অবস্থা, তখন নিষ্ঠুর রাজকুমার এসে দিলেন দেখা।

বললেন—রাজকন্যা, কি বার্ত্তা?

রাজকন্যা বলেন—সাধনার সিদ্ধি হ'ল এই বার্ত্তা।

রাজপুত্তুর বলেন—সিদ্ধি তো হ'ল, এখন চাও কি?

—কিচ্ছু না, শুধু তোমাকে।

শ্রোতা ভদ্রলোকটি হঠাৎ ভারী যেন রেগে উঠে—'কিছু না শুধু তোমাকে'—মানে? আমি বুঝি 'কিছু না'র সামিল?

—তুমি? তোমাকে আবার কে কি বললো? গায়ে পেতে নিচ্ছ কেন? আমি তো শুধু গল্প বলছি।

—হোক গল্প, আমিও অল্পে ছাড়ছি না।

'অল্পে' তো দূরের কথা, অনেক কষ্টেও রেহাই পায় না বেচারা।

—কি হচ্ছে? জানো এটা ধর্ম্মশালা?

—হয়েছে কি? অধর্ম্ম কিছু করছি নাকি?

—হয়েছে, হয়েছে, এত ভালবাসা কোথায় ছিল শুনি?

—ভালবাসা যেখানে থাকবার ঠিক সেইখানেই ছিল মন্দিরা, শুধু ভালবাসার লোকটিই ছিল দূরে।

—মিথ্যে কথা বোলো না বেশী,—মন্দিরা স্বভাবগত শাসনের সুরে প্রায় ধমকই দেয়—নিরুদ্দেশ হয়েছিলাম বুঝি আমি? জানো এতে আমার কত অপমান হয়েছে?

—অপমান কিছু হয়নি মন্দিরা, কাছে থাকলে তোমার এ মনকে তুমি সহজে খুঁজে পেতে না। অভাবেই অভাব বোধটা এত তীব্র হয়ে ধরা পড়ে।

—হয়তো তাই, কিন্তু সত্যি বলছি, এতদিন ধরে শুধু এই একটি মাত্র প্রশ্নই তোমার কাছে ছিল আমার—ভালবাসলে যদি তো কেন চলে গেলে?

—একটিমাত্র উত্তরে ও কৌতূহল মিটবে না মন্দিরা, ওর পিছনে জমানো আছে অনেক গ্লানির ইতিহাস। ভালবেসে ধিক্কার এসেছিল, ভেবেছিলাম ভালবাসার যথার্থ অধিকার আমাদের নেই, এত ছোট এত হীন এত তুচ্ছ আমরা!

—কিন্তু ভালবাসাই কি আমাদের বড় করে তোলে না? সমস্ত গ্লানির উপর এনে দেয় না গভীর মর্য্যাদা? সত্যি করে ভালবাসলে নিজেকে আর ছোট মনে হয় না, হীন মনে হয় না, তুচ্ছ মনে হয় না। কিন্তু থাক ওসব কথা, এ সব সাধু ভাষায় কথা কইলেই বেজায় হাসি পেয়ে যায় আমার। তার চেয়ে তুমি বল তোমার অজ্ঞাতবাসের কাহিনী।

—তার আগে তুমি বদলে এসো তোমার কাঠকুড়ুনির বেশ। এখান থেকে ষ্টেশন পর্য্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলে ভেবে অবাক লাগছে আমার, আগে গাড়ী নইলে যে—আচ্ছা থাক্, পরে হবে

সব কথা। এখন যাও লক্ষ্মীটি গায়ের ধুলো ধুয়ে ফেলো গে।

টুকটুকে ঠোঁটের উপর উদ্ধত দু'টি দাঁত ঝিলিক মারিয়া ওঠে, প্রিয় পরিচিত ভঙ্গীতে।

—ধুলো শুধু শাড়ীতে, গায়ে ধুলো লাগে না আমার।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে অমরেশ মন্দিরার খোঁজ করিতে আসিয়া অবাক। অমরেশের খোলা স্যুটকেসের সামনে গম্ভীর মুখে বসিয়া আছে মন্দিরা, বেশভূষার পরিবর্ত্তন কিছুই করে নাই।

—এ কি, কি হ'ল তোমার?

—তোমার স্যুটকেসে এত শাড়ী কেন শুনি!

—ও হো হো, এখুনি চোখে পড়েছে? কিন্তু যদি না বলি?

—বলতে বাধ্য।

—এখন থেকেই শাসন সুরু?

—নিশ্চয়।

—সত্যি কথা বিশ্বাস করবে মন্দিরা? হেসোনা কিন্তু? কোম্পানীর এজেন্সি নিয়ে কত দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে—বম্বে, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ। শাড়ীর দোকানের কাছাকাছি গেলেই তোমার গায়ে মানায় এমন শাড়ী একখানা কেনবার দুর্দ্দান্ত সখ হ'ত।

—অর্থাৎ সর্ব্বদা আমি তোমার অন্তরে বিরাজ করছিলাম—এই তো তোমার বক্তব্য? মন্দিরা ছদ্ম গাম্ভীর্য্যে বলে—আমার বিশ্বাস এ কৈফিয়ৎ সম্পূর্ণ কাল্পনিক। যাক পরে এর বিচার হবে। আপাততঃ এই প্রিণ্টেড্ শাড়ীখানি দয়া করে গ্রহণ করলাম।

—এ অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ।

—উঁহু, বলতে হয়, আমি ধন্য।

—সেটা কি মুখে বলবার দরকার হবে মন্দিরা?

স্টেশনে আসিয়া মন্দিরা প্রশ্ন করিল—এখন কোথায় যাবে?

—এই গরীবের কুটিরে।

—একেবারে সোজাসুজি?

—লক্ষ্মী যখন নিজে এসে ধরা দিয়েছেন, তখন আর ছাড়বো কেন বল?

ঈষৎ চিন্তিত ভাবে মন্দিরা বলে—কিন্তু সংসারের চোখে, সমাজের চোখে, আমি হারিয়ে যেতে রাজী নই। তাছাড়া আমার মার কাছে আমার নিজের মার কাছে প্রতিশ্রুত আছি তোমায় নিয়ে গিয়ে দেখাবো বলে।

—কি বলে দেখাবে?

—বলবো? বলবো—মা দেখ তো, জামাই পছন্দ হয়?

—কি সর্ব্বনাশ! পারবে বলতে?

—অনায়াসে। এত তপস্যার পর বর মিললো—পারবো না? সেখান থেকে বিধিবদ্ধ ভাবে তোমার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হয়ে—ভাবছি যাবো এলাহাবাদে দাদাভায়ের কাছে।

সহসা স্তব্ধ হইয়া যায় অমরেশ, একটু চুপ করিয়া ধীরে ধীরে বলে—সে হয় না মন্দিরা!

—কেন?

—সত্যি কথাই স্বীকার করবো মন্দিরা, মন থেকে সায় দেবার ক্ষমতা নেই। একথা ঠিক যে, দাদার ব্যবহার আমায় সর্ব্বদা পীড়ন করেছে, বৌদির নিরীহ বাধ্যতা, তাঁর বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, উত্তেজিত করে তুলেছে—অহরহ চেয়েছি তাঁর বন্দী জীবনের মুক্তি, কিন্তু তবু এ আমি সইতে পারবো না। হয়তো দূরে থেকে প্রার্থনা করবো তাঁদের কল্যাণ, কিন্তু বৌদিকে বৌদির মতন ভিন্ন অন্য ভাবে দেখবার সাহস আমার সত্যিই নেই। খোকন নেই, বৌদি আছেন, এ কি দেখা যায় মন্দিরা?

প্রফুল্ল দুইখানি মুখে নামিয়া আসে দুইটি মেঘছায়া।

হয়তো এই নিয়ম, সাংসারিক বিধি ইহাকেই বলে। পরিপূর্ণতার মাঝখানে দেখা দেয় শূন্যতা, আনন্দের উপর পড়ে বিষাদের ছায়া, জীবনের কোলাহলের ভিতর ধরা দেয় মৃত্যুর স্তব্ধতা।

॥ বারো ॥

উত্তর কলিকাতার এক অপরিসর গলির একপ্রান্তে হাড়-পাঁজরা সার সেই জীর্ণ বাড়ীখানি তার দীর্ঘ দেহখানি লইয়া এখনো একই অবস্থায় টিঁকিয়া আছে।

ঋতুর পর ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটে। বর্ষার জল বৈশাখের ঝড়, বারে বারে আসিয়া পুরানো বনেদের শিকড়ে ঘা মারিয়া কাঁপন ধরায়, ভাঙিতে পারে না।

বোমা যদি সত্যই কখনো বজ্রের বেশে নামিয়া আসে, তখনই হয়তো একদিন জরাজীর্ণ দেহটা লইয়া হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িবে, তার আগে নয়।

শুধু দেওয়ালের দাঁতগুলি হইয়া উঠিয়াছে আরো প্রখর স্পষ্ট, আরো নির্লজ্জ হইয়া উঠিয়াছে খাপরি ওঠা মেঝের নিরাভরণ নগ্নতা।

আজকাল চটা ওঠা রোয়াকের উপর শীতের রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিবার লোভে যাহারা আসে, তাহারা বড় কথা লইয়া তর্ক করে না, বড় চিন্তা লইয়া মাথা ঘামায় না, সুদূরপ্রসারি দৃষ্টি মেলিয়া উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া থাকে না।

ছোট কথা লইয়াই তাহাদের কারবার।

সিঁড়ি ভাঙিতে কষ্ট হয় বলিয়া মেনকার মা আসেন বড়ির টিন লইয়া, বড়ি দিতে সদ্যবিধবা ছোটবৌ ম্লানমুখে আসে শিশুপুত্রের ভিজা বিছানা রৌদ্রে দিতে। উষাবতী তাসের

জোড়া কোল আঁচলে বাঁধিয়া গীতাখানা খুলিয়া বসে, তাস জোড়াটা বাহির করিতে লজ্জা পায়। আনিয়াছে, একথা টের পাইতে দেয় না কাহাকেও, তবু আনিতে ছাড়ে না।

ভাই যাওয়ার পর হইতে এই এক উপসর্গ জুটিয়াছে—চক্ষুলজ্জা। সহজ ভাবে হাসিতে, গল্প করিতে, তাস খেলিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। অথচ ওসব না করিলেও যে প্রাণ হাঁফাইয়া আসে।

আর আসেন কৃষ্ণবালা।

হরিনামের ঝুলিগাছটা লইয়া বিরসমুখে বসিয়া থাকেন এক পাশে। ঝড় বৃষ্টির প্রলেপ কিছুটা লাগিয়াছে তাঁহার দেহে। সামনের কয়টা দাঁত পড়িয়া গিয়া মুখের ভাবে আসিয়াছে উগ্র নিষ্ঠুরতার পরিবর্ত্তে অসহায় কুশ্রীতা।

ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আলোর আভাস ইহাদের চোখে ধরা দেয় না—প্রত্যহ দেখা সংসারের, ঘটিনা সাধেরা পুরাণো কাহিনীর পুনরাবৃত্তিই ইহাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

নূতন যদি কেহ আসে, সোৎসাহে শুনাইতে বসে—পুরাণো দিনের গল্প।

আজ এ আসরে নূতন শ্রোতা আসিয়াছে মেনকা।

খোল বোয়াকে এতগুলো চোখের সামনে বসিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে কোলের ছেলেকে স্তন্য পান করাইতে করাইতে শ্বশুরবাড়ীর সুখ ঐশ্বর্য্যের গল্প ফাঁদিয়াছে।

বড় গিন্নী বড়ির ডালমাখা হাতখানা উষাবতীর প্রায় মুখের সামনে নাড়িয়া বলিয়া ওঠেন—এই শুনলি তো? তখন আমার মেনিকে কানাঘুষো কতলোকে কত নিন্দেই করেছে, আর এখন? এনে দেখ্—মেনির আমার গোছাভর্ত্তি সোনার চুড়ি, পঞ্চাশখানা পঞ্চাশ রকমের শাড়ী সেমিজ, কোলে সোনারচাঁদ ছেলে, দেখছিস্ তো? বাবা ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। যাঁরা ভালোমানুষী দেখিয়ে ভিজে বেড়ালের মতন থাকতেন তাঁদের কীর্ত্তির কথাও ভাবো!

মেনকা মহোৎসাহে প্রশ্ন করে—হ্যাঁগা অখিলেশদার বৌর কথা যা শুনি তা কি সত্যি?

—কপাল আমার, সত্যি না তো কি মিথ্যে? শুনতে পাই এলাহাবাদে না কোথায় আছে। ছোঁড়া তো মায়ের ত্যাজ্যপুত্তুর, খেতে দেবার মুরোদ নেই—নিজে ইস্কুলে মাষ্টারী করে, ছুঁড়িকেও মেয়ে ইস্কুলে গানের মাষ্টারী করে পেটের ভাতের যোগাড় করতে হয়। অমন পিরিতের কাঁথায় আগুন! শুনতে পাই একটা মেয়ে না ছেলে কি হয়েছে! ছি ছি ছি—অমন সোনার পুতুল ছেলে হারিয়ে—

নূতন করিয়া আর একবার সকলের ঘৃণায় ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া আসে।

কৌতূহলী মেনকা বলে—অমরেশদা'র খোঁজ খবর কিছু পাওয়া যায় নি?

—ও মা তা জানিস না বুঝি, সে তো 'ইনসোর আপিসে' দিব্যি মোটা মাইনের চাকরী করছে—যতীন মুখুজ্যের দৌহিত্রীর মেয়েটাকে বিয়ে করেছে। সেও এক কেলেঙ্কার কাণ্ড!

মেয়ে নাকি একলা হিল্লি-দিল্লী ঘুরে পাকড়াও করে এনে বিয়ে করেছে। কালে কালে কতই শুনবো, কতই দেখবো! বামুন কায়েতের বিয়েও তা'হলে 'চল' হ'ল! . .

মেনকা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে—অখিলেশ দা'র কি হ'ল শেষটা? হঠাৎ গলায় দড়ি দিয়ে—

—গলায় দড়ি আর দেবে না? বেম্মচারীই হোক্ আর নাগা ফকিরই হোক—ব্যাটাছেলে তো? বিয়ে করা পরিবার—নাকের সামনে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে পর-পুরুষের হাত ধরে বেরিয়ে গেল, কোন ঘেন্নায় মুখ দেখাবে পাঁচজনকে?

বিষদন্তহীন কেউটের মত নিস্তেজ কৃষ্ণবালাকে বেশী সমীহ করিবার আবশ্যকতা কেহ আর অনুভব করে না। আলোচনার স্রোত যথেচ্ছ বহিতে থাকে।

শুধু সমরের কথা উঠিতেই কয়েকটা করুণ নিঃশ্বাস চাপা-গলির রুদ্ধ বাতাসকে ভারী করিয়া তোলে। যুদ্ধে যাওয়ার পর হইতে আর কোন সংবাদ নাই তাহার।

হয়তো মারা গিয়াছে—হয়তো মারা যাইবে—একই কথা।

সুস্থ আর স্বাভাবিক মানুষ কালো গৌরাঙ্গ মোটাসোটা কালোকালো একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়া সুখে সংসার পাতিয়াছে। বোধকরি বংশের ধারা, আর জীর্ণ-গলির চিরন্তন জীবন-লীলার ধারা অব্যাহত রাখিবার ভার তাহারই।

আর এক ঝড়

কোথায়? সেটা কোথায়?

চেতনার প্রারম্ভ থেকে অনবরত এই একই প্রশ্ন ক্ষত বিক্ষত করে চলেছে সীতুকে। কোথায়? সেটা কোথায়?

এ প্রশ্ন তাকে মা-বাপের কাছে স্বস্তিতে তিষ্ঠোতে দেয় না, দেয় না সুস্থ থাকতে। থেকে থেকে মন একেবারে বিকল করে দেয়। তখন আর খেলাধূলো ভাল লাগে না সীতুর, ভাল লাগে না কারুর সঙ্গ। খাওয়ার জন্যে মায়ের পীড়াপীড়ি আর বাপের বকুনি অসহ্য লাগে।

এ প্রশ্নকে মন থেকে তাড়াতে অনেক চেষ্টা করেছে সীতু, যত বড় হচ্ছে তত চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। কিছুতেই এই অদ্ভুত প্রশ্নের জটিল জালকে ছিঁড়ে খুঁড়ে উচ্ছেদ করতে পারছে না।

সব কিছুর মাঝখানে একটা অদেখা জায়গার ছবি চোখের উপর ভেসে উঠে মনটাকে উন্মনা করে দেয়, আশপাশের কোন কিছু ভাল লাগে না।

সীতুর এই সাড়ে আট বছরের জীবনে কত কত বারই তো মাকে এ প্রশ্ন করেছে সীতু, আর প্রত্যেক বারই তো একই উত্তর পেয়েছে, তবু কেন সংশয় ঘোচে না, তবু কেন আবার ও বলে বসে, 'অনেক দিন আগে আমরা অন্য আর কোথায় ছিলাম মা?'

অতসী কখনো স্নেহে, কখনো বিরক্তিতে, কখনো শান্ত মুখে, কখনো ক্রুদ্ধ মূর্তিতে একই উত্তর দেয়, 'কোথাও নয়, কোথাও নয়। কখনো কোনদিন আর কোথাও ছিলে না তুমি। এখানেই জন্মেছ, এখানেই আছ। কেন অনবরত ওই এক বিশ্রী চিন্তা নিয়ে মাথা ঘুলোও?'

'কেন'! সে কথা কি সীতু নিজেই জানে? সীতু কি ইচ্ছে করে এ চিন্তা মাথায় আনে? এ ছবি কি সীতু নিজে এঁকেছে?

······একটুকরো রোয়াক, কি রকম যেন একটা নল দিয়ে জলপড়া চৌবাচ্চা, ছোট ছোট জানলা বসানো ক'টা যেন ঘর, ঘরের দেওয়াল ভরতি ছবি টাঙানো, আর পাশের কোনদিকে যেন একটা গলি। সরু গলি, মাঝে মাঝে জঞ্জাল জড়ো করা।

আর একটা ছোট ছেলে কোন একটা জানলায় বসে বসে দেখছে সেই গলিতে লোকের আনাগোনা।···

পথ চলতি লোক চলে যায়, ফেরিওলা সুর করে করে ঢোকে আবার বেরিয়ে আসে, রাস্তায় ঝাড়ুদার এসে সেই জমানো জঞ্জালগুলো তুলে নিয়ে যায়, ছেলেটা বসে বসে দেখে।

সে ছেলেটা কে?

সে বাড়িটা কোথায়? ঝাপসা ঝাপসা এই ছবিটা আবছা একটা রহস্যলোকের সৃষ্টি করে অনবরত যেন সীতুকে এখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায়, সীতুদের এই ঝকঝকে বকবকে সাজানো গোছানো প্রকাণ্ড সুন্দর বাড়িটা থেকে। এ বাড়িটাকে কিছুতেই যেন নিজেদের বাড়ি বলে মনে হয় না সীতুর, কিছুতেই এর সঙ্গে শিকড়ের বন্ধন অনুভব করতে পারে না।

সীতুদের বাড়ির বেঁটে নেপালী চাকরটা একটুকরো স্থাকড়া নিয়ে যেমন করে শার্সির কাঁচগুলো ঘসে ঘসে চক্‌চকে করে, চক্‌চকে করে আলমারির গায়ে লাগানো আর মার চুলবাঁধার লম্বা আয়নাগুলোকে, তেমনি একটা কিছু দিয়ে ঘসে ঘসে চক্‌চকে করে ফেলতে ইচ্ছে করে সীতুর এই ভুলে ভুলে যাওয়া ঝাপসা ঝাপসা ছবিটা। পরিষ্কার আয়নায় মুখ দেখার মত করে দেখতে ইচ্ছে করে সেই ছেলেটাকে। দেখতে ইচ্ছে করে ছেলেটাকে সেই জানলা থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যেতো যে মানুষটা, সে কে?

কী ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে হাতটা তার!

... ...

বাড়ির সমস্ত কোলাহল আর সকলের সঙ্গ থেকে সরে এসে আপ্রাণ চেষ্টায় তলিয়ে যায় সীতু, বসে থাকে মস্ত জানলাটার ধারে, যে জানলাটা এ পাশের ছোট্ট একটা ঘরের, যাতে অন্য অন্য জানলার মত লেসের পর্দা ঝোলানো নেই।

জলখাবার খাবার সময় যে উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, চাকরটা যে দু'বার ডেকে গেছে, এইবার যে হাল ধরতে মা আসবেন, এ সবের কোন কিছু খেয়াল নেই সীতুর।

অবশেষে তাই হল।

অতসী নিজেই উঠে এল বিরক্ত হয়ে। হয়তো বই পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে, হয়তো বা আরামের দুপুর-ঘুমটুকু ছেড়ে। বিরক্ত মুখে বলে উঠল, 'সীতু! ফের তুমি গোঁজ হয়ে বসে আছ, খাওয়ার সময় খাচ্ছ না? তোমার জন্যে কী করবো আমি? বল, কী করবো? বাড়ি থেকে চলে যাব?'

'মা'! সীতু অসহায় মুখে বলে, 'সেই বাড়িটা কাদের একবারটি বল না!'

অতসী খুব চীৎকার করে বকে উঠতে গিয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। বসে পড়ল জানলার ধাপটায় সীতুর পাশে, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'সে বাড়িটা নিশ্চয় তোর পূর্বজন্মের বাড়ি, সীতু! আগের জন্মের স্মৃতি তোর মনে পড়ে নিশ্চয়। ও-সব কথা আর ভাবিসনে বাবা!'

'আমি তো ইচ্ছে করে ভাবিনা মা!' সীতু ম্লানমুখে বলে 'আমার যে খালি খালি মনে হয়—'

কি মনে হয়, সে-কথা আর নতুন করে তো বলতে হয় না, অতসী জানে। তাই কোমলতার সঙ্গে ঈষৎ কঠোরতা মিশিয়ে বলে, 'কেন মনে হয়? বাড়ির ছেলেমেয়ে বাড়িতেই জন্মায়, বাড়িতেই থাকে, এই তো জানা কথা। এই যে খুকু, ও কি আগে আর কোথাও

ছিল? এ বাড়িতেই জন্মেছে, এ বাড়িতেই আছে। বল, খুকু কি তোমার বোন নয়? দাদা নও তুমি ওর?'

সীতুর চোখ ছলছলিয়ে জলে ভরে আসে, তবু বলে চলে অতসী, 'বাড়ির ছেলেমেয়ে বাড়িতেই জন্মায়, বাড়িতেই থাকে, বুঝলে? আর কোনদিন ও কথা ভাববে না। আমি বলেছি, অদ্ভুত কোন একটা বাড়ির স্বপ্ন তুমি দেখেছ বোধ হয় কোনদিন, তাই বারেবারে মনে পড়ে। স্বপ্নের কথা মনে রাখতে নেই। চল, খাবে চল।'

ছেলের হাত ধরে নিয়ে যায় অতসী বিষণ্ণমুখে। মুখে যতই বকাবকি করুক, বুকটা কি দমে যায় না তার? কেন সীতুর পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে? কিছুতেই কেন ভুলিয়ে দেওয়া যায় না তাকে তার স্মৃতি?

আপেলের টুকরোগুলো মুখে পুরে মার কথাটা ভাবতে সুরু করে সীতু।

স্বপ্ন!

তাই হয়তো!

স্বপ্ন তো ঝাপসা-ঝাপসাই হয়।

কিন্তু স্বপ্ন কি সব সময় এমন করে টানে?

'দাদ্দা দাদ্দা'! টলতে টলতে খুকু এল মোটা-মোটা গোল-গোল পা ফেলে। ওর ওই পা ফেলাটা যেন ঠিক হাতীর ছানার মত। দেখলেই মনটা আহ্লাদে ভরে যায়। ওর পা ফেলা, ওর থ্যাদা-থ্যাদা লাল-লাল মুখটা, উড়ু-উড়ু সোনালী চুলগুলো, আর ওর ওই সম্প্রতি নতুন শেখা 'দাদ্দা' ডাক, এটা যেন সব মনখারাপ মুছে দেয়। ওর সঙ্গে খেলায় মেতে উঠতে ইচ্ছে করে।

'দাদ্দা দাদ্দা'! দাদার পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খুকু।

'ওরে সোনা মেয়ে, ওরে সোনা মেয়ে!' একটা হাত বাড়িয়ে খুকুকে ধরে নেয় সীতু, বলে—'আপেল খাবে? আপেল? ফল ফল?'

খুকু অদ্ভুত উচ্চারণে দাদার কথার পুনরাবৃত্তির চেষ্টা করে, 'পঃ পঃ!' তারপর বিনা বাক্য-ব্যয়ে দাদার হাতের খাদ্যটা খপ্ করে কেড়ে নিয়ে মুখে ফেলে।

সীতু বিগলিত স্নেহে মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, 'ডাকাত মেয়ে, ডাকাত মেয়ে, খন্দেত খাবে? খন্দেত? খুব মিষ্টি।'

খুকু বলে, 'মিত্তি।'

দুই ভাই-বোনের কণ্ঠ-নিঃসৃত হাসির শব্দে ঝলসে ওঠে বারান্দাটা। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই হাসির উপর কে যেন বড় একটা থাপ্পড় বসিয়ে দেয়।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বাবা। লোকে যাঁকে 'মৃগাঙ্ক ডাক্তার' বলে। কোঁচকানো ভুরু, বিরক্ত গম্ভীর কণ্ঠ।

'সীতু!'

সীতু মুখটা নীচু করলো।

'কতদিন বারণ করেছি!'

মুখটা আরও নীচু করলো সীতু।

হ্যাঁ, অনেক দিনই বারণ করেছেন বটে। বাচ্চারা বড়দের এঁটো খায়, এ তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। খুকুকে সীতু নিজের পাত থেকে কিছু খাওয়াচ্ছে দেখলেই এমনি রেগে জ্বলে যান। আজও তাই আস্তে আস্তে স্বর চড়াতে থাকেন, 'একটা ব্যাপারেও কি সভ্য হতে নেই? সব সময় অসভ্যতা, অবাধ্যতা?'

সীতুর মুখটা বুকের কাছে ঝুলে পড়েছে। বাবার মুখের ওপর কথা বলতে পারে না সে, বাবার সঙ্গে কথাই বলতে পারে না। বাবাকে দেখলেই শুধু ভয় নয়, কেমন একটা রাগ আসে, ভয়ানক একটা রাগ।

আর তিনিও।

তিনিও যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সীতুর সঙ্গে সহজ হয়ে, সহজ গলায় কথা বলবেন না। তাই যখনি কথা বলেন কপাল কুঁচকে বিরক্ত-বিরক্ত গলায়। ছেলেকে শুধু শাসনই করতে হয় এইটাই বোধকরি জানেন সীতুর বাবা। তাই তাঁর সীতুর প্রতি সর্ববিধ ব্যবহার তো বটেই, চোখের চাহনিতে পর্যন্ত শাসন-শাসন ভাব।

'আর কোনদিন খাওয়াবে? বল—জবাব দাও।'

কিন্তু জবাবটা দেবে কে?

সীতুর মাথাটা তো একভাবে নীচু থাকতে থাকতে আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

তাই বোধ করি জবাব দিতে ছুটে এল অতসী। কিন্তু জবাব না দিয়ে প্রশ্নই করলো, 'কি হল? এখুনি উঠলে যে? বলছিলে যে খুব টায়ার্ড ফিল করছো—'

'টায়ার্ড ফিল্ আমি তোমাদের ব্যবহারে যতটা করি অতসী, ততটা দৈনিক পঁচিশ ঘণ্টা কাজ করলেও নয়'—মৃগাঙ্ক ডাক্তারের গলার স্বরটা থমথমে শোনায়। 'খুব বেশী চাহিদা আমার নয়, সে তুমি জানো। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে তোমার, ছেলেমেয়েকে নিয়ে যা খুশি করবার। শুধু হাত জোড় করে অনুরোধ করি, তোমার আদরের ছেলেটি যেন ওকে ওর পাত থেকে কিছু না খাওয়ায়। সে অনুরোধ রক্ষিত হবে, এটুকু কি আমি আশা করতে পারি না?'

সীতুর চোখটা মাটির দিকে, তবু সীতু বুঝতে পারছে বাবার সেই রুক্ষ মুখটা আরও শক্ত হয়ে পাথুরে পাথুরে হয়ে গেছে, আর মায়ের মুখটা বেচারী বেচারী! মায়ের জন্য এখন কষ্ট হচ্ছে সীতুর, মনে হচ্ছে বেশীর ভাগ সময় তার দোষেই মাকে এই পাথুরে মুখের আগুন-ঝরা চোখের সামনে দাঁড়াতে হয়।

কিন্তু সীতু কি করবে?

খুকুটা যে 'দাদা' বলে ছুটে এসে ওর কাছ থেকে কেড়ে খায়।

কিন্তু শুধুই কি খাওয়া?

সীতু খুকুর গায়ে একটু হাত ঠেকালেই কি অমনি রুক্ষ হয়ে ওঠেন না বাবা? বলেন না—'বড়দের হাত লোনা, ছোটদের গায়ে দিলে তাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়?'

সীতু কত বড়?

মার চাইতে? বাবার চাইতে? নেপ্‌বাহাদুরের চাইতে?

অনেকবার ইচ্ছে করে সীতুর, বাবাকে জিজ্ঞেস করবে তাঁর ডাক্তারি বইতে ঠিক পষ্ট কি লেখা আছে? লেখা আছে কি শুধু সাত-আট বছরের ছেলেদের হাতই লোনা হয়?

ইচ্ছে করে, কিন্তু পারে না জিজ্ঞেস করতে অদ্ভুত একটা আক্রোশে। বাপের উপর ভয়ানক একটা আক্রোশ আছে সীতুর। সর্বদা শাসনের ফল, না আরও কোন কারণ আছে? কে জানে কি, তবে এইটুকুই দেখা যায়, বাপের সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলে না সে। নিজে থেকে ডেকে তো নয়ই, প্রশ্ন করলে উত্তরও দেয় না। অতসীর ভাষাতে 'গোঁজ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

যেমন আজও।

'কথা কয়ে তো উত্তর পাওয়া যাবে না ওনার সঙ্গে, কাজেই বোঝা যাবে না বারণ করলেও কেন শোনে না'—মৃগাঙ্ক ডাক্তার বিদ্রূপকঠিন কণ্ঠে বলেন, 'তোমাকেই হাত জোড় করে অনুরোধ করছি, দয়া করে ছেলের এই বদ অভ্যাসটি ছাড়াও।'

অত আদরের খুকু সোনা, তবু তার উপর রাগ এসে যায় সীতুর, মনে মনে তাই বাপের কথার উত্তর দেয়। 'ছেলের বদ অভ্যাসটি তো ছাড়াবেন মা, আর মেয়ের বদ অভ্যাসটি? সামনে খাবার জিনিস দেখলেই খপ্‌ করে মুখে পুরে দেবার অভ্যাসটি? নেপ্‌বাহাদুরের কাছ থেকে ভুট্টা খায় না সে? বামুন ঠাকুরের কাছ থেকে আলুভাজা, বড়াভাজা?'

মনে মনে বলা উত্তর শোনা যায় না।

অতসীকে তাই আলাদা উত্তর দিতে হয়, 'বারণ কি করি না? শুনছে কে? খুকুটাও তো হচ্ছে তেমনি!'

'বাজে ওজর কোরো না,' মৃগাঙ্ক ডাক্তার বলে ওঠেন, 'বাজে ওজরের মত বিরক্তিকর জিনিস পৃথিবীতে অল্পই আছে, বুঝলে? কাল থেকে যখন ওকে খেতে দেবে, খুকুকে আটকে রাখবার ব্যবস্থা করবে। এই হচ্ছে আমার শেষ কথা। এটুকু যদি তোমার পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে আইন আমাকে নিজের হাতেই নিতে হবে।'

শেষ রায় দিয়ে ফের ঘরের মধ্যে ঢুকে যান মৃগাঙ্ক।

কিন্তু ইত্যবসরে আপ্রাণ চেষ্টায় মার কোল থেকে নেমে পড়েছে খুকু। আর আবার গিয়ে থাবা বসিয়েছে দাদা প্রস্তাবিত সেই ওর 'থন্দেতে'।

ঠাস করে মেয়েকে একটা চড় কসিয়ে আবার তাকে কোলে তুলে নিল অতসী, চাপা কড়া গলায় বলে উঠল, 'তোর শরীরে কি লজ্জা নেই হতভাগা ছেলে? তোর জন্যে যে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করে আমার। কেন তুই খাবার দিস ওকে? জানিস উনি বাচ্চাদের কারুর এঁটো খাওয়া ভালবাসেন না। তবু কেন? বল কেন?'

কেন ?

মার এই প্রশ্নের উত্তর দেবে না সীতু, ইচ্ছে করেই দেবে না। উত্তর এর পরে দেবে কাজের মধ্য দিয়ে। যেই না খুকু পাজীটা সীতুর খাবারের উপর হাত বসাবে, মার চাইতেও বেশী জোরে ঠাস করে চড় বসিয়ে দেবে ওকে।

হ্যাঁ, দেবেই তো! নিশ্চয় দেবে।

সীতুকে যদি কেউ মায়া না করে, সীতুই বা করতে যাবে কেন ?

মায়া করতে যাবে কেন, ভাবতে গিয়েও মাটির উপর ঝরঝরিয়ে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ে, মাটির দিকে তাকানো চোখ দুটো থেকে।

খুকুর খ্যাঁদা নাকওলা লাল-লাল মুখটা আপাততঃ দেখতে না পেলেও তার মার খাওয়া মুখটা কল্পনা করে চোখের জল আটকাতে পারে না সীতু।

অতসী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'কিছুই তো খাওয়া হ'ল না। আমারই অন্যায়, ঠিক কথাই বটে, আমার অন্যায়। কিন্তু তুই-ই বা এমনি করিস কেন ? কেন আগে আগে খেয়ে নিতে পারিস না ঠাকুরের কাছে, মাধবের কাছে ? সেই আমাকে তুলে তবে ছাড়বি। আমি উঠে পড়লেই খুকু উঠে পড়ে দেখতে পাস না ?'

'না পাই না। আমি কিছু দেখতে পাই না।' বলে ছুটে পালিয়ে যায় সীতু। অতসী হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেই দিকে। হতাশ ? তাই কি ? আরও অন্য কেমন একরকম না ?

কিন্তু কেমন করে তাকিয়ে রইল অতসী ?

কি ছিল তার চোখের দৃষ্টিতে ? ছেলের উপর রাগ ? স্বামীর উপর বিরক্তি ? না, নিজের উপর ধিক্কার ? স্বামীকে হাতের মুঠোয় পুরতে পারে নি, পারেনি তার সমস্ত তীক্ষ্ণতা ক্ষইয়ে ভোঁতা করে ফেলতে, এই ধিক্কারেই কি মরমে মরে যাচ্ছে অতসী ?

কিন্তু তা কেন ?

সংসারের রাশভারী কর্তারা তো এমন অনেক বাড়াবাড়ি শাসন করেই থাকে, গৃহিণীরা হয় সেটা সভয়ে মেনে নিয়ে সাবধান হয়, নয়তো বিদ্রোহ করে চোট-পাট প্রতিবাদ জানায়। অতসীর মত এমন মর্মাহত কে হয় ?

ছেলেও তেমনি অদ্ভুত !

বাপের দিক মাড়ায় না। বাপের দিকে তাকায় যেন শত্রুর দৃষ্টিতে। বয়স্ক ছেলে নয়, মাত্র একটা আট বছরের ছেলে, তাকে নিয়ে অতসীর একি দুঃসহ সমস্যা !

সংসারে ভোগ্যবস্তু বলতে যা-কিছু বোঝায়, তার কোন কিছুরই অভাব নেই অতসীর। না, তা' বললেও বুঝি ঠিক হয় না। অভাব তো নেইই, বরং আছে অগাধ প্রাচুর্য।

বাড়ি-গাড়ি চাকর-বাকর আসবাব-উপকরণ সব কিছুই প্রয়োজনের অতিরিক্ত। স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ স্বামী, সুকান্তি পুত্র, সোনার পুতুলের মত মেয়ে।

স্বামী মগ্যপ নয়, চরিত্রহীন নয়, অন্যাসক্ত নয়, স্ত্রীর প্রতি স্নেহহীন নয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার তো সীমা নেই অতসীর। অগুনতি উপার্জন করেন মৃগাঙ্ক, অনায়াসে অবহেলায় এনে ফেলে দেন স্ত্রীর হাতে। কোনদিন প্রশ্ন করেন না—টাকাটা কোন্ খাতে খরচ করলে ?

আর কী চাইবার থাকে মেয়েমানুষের ?

স্বামীর স্বভাব রুক্ষ কঠোর—এ কথাই বা কি করে বল্‌বে অতসী ? কত কোমল মন ছিল মৃগাঙ্কর। মৃগাঙ্কর মন কোমল না হলে অতসী কোন্ টিকিটের জোরে এই ঐশ্বর্যের সিংহাসনে এসে বসতো ?

কি আছে অতসীর ?

অগাধ রূপ ? অনেক বিগ্গা ? অসাধারণ বংশমর্যাদা ?

কিছু না, কিছু না।

অতসী অতি তুচ্ছ, অতি সাধারণ। মৃগাঙ্কর প্রেমই অতসীকে মূল্যবান করেছে।

আশ্চর্য ! তবু অতসী দুঃখী।

অতসীর আপন আত্মজ নষ্ট করে দিচ্ছে অতসীর সমস্ত সুখশান্তি।

কেন সীতুর পূর্বজন্মের স্মৃতি বিলুপ্ত হল না ? ডাক্তার মৃগাঙ্ক এত রোগের চিকিৎসা করতে পারে, পারে না এ রোগের চিকিৎসা করতে ?

কতদিন ভাবে অতসী, জিজ্ঞেস করবে মৃগাঙ্ককে। এমন কোন একটা ওষুধ-টষুধ খাইয়ে দেওয়া যায় না ওকে, যাতে ওই ঝাপসা-ঝাপসা স্মৃতির ছায়াটা একেবারে মুছে যায়।

বলতে পারে না।

মৃগাঙ্ক কি ভাববে ?

যদি এই অদ্ভুত প্রস্তাবে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, 'কিন্তু অতসী তোমার ? তোমার ব্যাপারটার কি হবে ?'

তখন অতসী কি বলবে ?

ছেলে আর ছেলের মাকে শাসন করে মৃগাঙ্ক ডাক্তার ফের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। সত্যি আজ তিনি বড় বেশী ক্লান্ত।

কিন্তু এও ঠিক—শুধু পরিশ্রমেই ক্লান্ত হচ্ছেন না ডাক্তার। সাংসারিক জীবনটাই দিনের পর দিন ক্লান্ত করে তুলেছে তাঁকে।

বেশ বেশী খানিকটা বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতই ছিলেন মৃগাঙ্ক। প্রচুর উপার্জন করেছেন, প্রচুর খরচ করেছেন, বন্ধু পোষণ করেছেন, আত্মীয়-কুটুম্বকে সাহায্য করেছেন, আর করেছেন বাড়ি, গাড়ি, আসবাবপত্র।

তারপর কোথা দিয়ে কি হ'ল, অতসী এল জীবনে। পালা বদলালো। অ'' বিয়ের পর প্রথম দু' একটা বছর তো এক অপূর্ব সুখের ঘোরে কেটেছে, কিন্তু সেই ঘোরের সুর কেটে দিল সীতু। মা, আর বাপের মধ্যে একটা ব্যবধানের প্রাচীর হয়ে উঠল সে. দু'জনের মনের সহজ আদান-প্রদানের দরজা বুঝি রুদ্ধ হয়ে গেল!

মৃগাঙ্কর মধ্যে বাড়তে লাগলো বিদ্বেষ, বিরক্তি, অশান্তি। অতসীর মধ্যে কাজ করতে লাগলো—হতাশা, অভিমান আর অপরাধবোধ!

তারপর এল খুকু।

আর খুকু আসার সঙ্গে সঙ্গেই মৃগাঙ্ক সীতুকে একেবারে দূরে ঠেললেন।

সীতুর প্রতি বিদ্বেষ আর বিরক্তি তাঁর বেড়েই চলতে লাগলো, কারণে-অকারণে তার প্রকাশ্য অভিব্যক্তি অতসীকে মরমে মারতে লাগলো।

খানিকক্ষণ শুয়ে থেকে, উঠে পড়লেন মৃগাঙ্ক। ভাবলেন এ অবস্থার একটা প্রতিকার হওয়া দরকার। নেপ্‌বাহাদুরকে ডেকে বললেন, 'খোকাবাবুকো বোলাও।'

প্রমাদ গণলো নেপ্‌বাহাদুর।

'ডাক্তার সাহাব বোলিয়েছে' বললেই তো খোকাবাবু বেঁকে বসবে। তবু সেকথা তো আর ডাক্তার সাহাবের মুখের উপর বলা যায় না। অগত্যাই ভারাক্রান্তচিত্তে গিয়ে খোকাবাবুর কাছে বক্তব্য পেশ করলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে তার আশঙ্কা অনুযায়ী উত্তর মিললো 'যাব না!'

তারপর চললো দু'জনের বাক্‌যুদ্ধ।

নেপ্‌বাহাদুরের বহু যুক্তিপূর্ণ বাছাই বাছাই বাণ, আর সীতুর সংক্ষিপ্ত এক-একটি তীক্ষ্ণ বাণ।

শেষ পর্যন্ত নেপ্‌বাহাদুরেরই জয় হলো, অবশ্য গায়ের জোরের জয়। যতই হোক আট বছরের ছেলে তো। ওর সঙ্গে পারবে কেন? পাঁজাকোলা করে নিয়ে এল সে।

'শোনো', গম্ভীরভাবে বললেন মৃগাঙ্ক ডাক্তার, 'আমার প্রথম কথা হচ্ছে, কথার উত্তর দেবে। যা বলবো শুধু আমিই বলে যাব, আর তুমি বুনো ঘোড়ার মত ঘাড় গুঁজে বসে থাকবে, তা চলবে না। শুনবে একথা?'

বলাবাহুল্য সীতু বুনো ঘোড়ার নীতিই অনুসরণ করে।

মৃগাঙ্ক একটু অপেক্ষা করে আরও গম্ভীরভাবে বলেন, 'খুকুকে এঁটো জিনিস খেতে দিতে বারণ করি, দাও কেন?'

হঠাৎ সীতুর নিজেকে আলাদা একটা লোক আর খুকুটাকে বাবার মেয়ে মনে হয়। তাই বুনো ঘাড়টা ঝট্ করে তুলে রুক্ষভাবে বলে, 'আমি সেধে সেধে দিতে যাই না, ও-ই হ্যাংলার মতন চাইতে আসে।'

মৃগাঙ্ক বিদ্রূপে মুখ কুঁচকে বলেন, 'ওর অনেক বুদ্ধি, ও একটা মাতব্বর, তাই ওর কথা ধরতে হবে, কেমন? হাজার বার বলিনি তোমায়, বড়দের এঁটো খেলে অসুখ করে ছোটদের?'

'আর যখন নেপ্‌বাহাদুরের খাওয়া ভুট্টার দানা খায়? তার বেলায় দোষ হয় না? যত দোষ নন্দ ঘোষ!'

মাথাটা ঝাঁকিয়ে অন্য দিকে তাকায় সীতু। বাপের ভয়ে নয়, বাপের দিকে তাকাবে না বলে।

মৃগাঙ্ক অসহ্য ক্রোধে মিনিট খানেক চুপ করে থেকে তিক্তস্বরে বলেন, 'হুঁ, অনেক কথা শেখা হয়েছে যে দেখছি। কেন, নেপ্‌বাহাদুরের কাছেই বা খায় কেন? তুমি যদি দেখতে পাও তো তুমি বারণ কর না কেন?'

বলা বাহুল্য সীতু নীরব।

মৃগাঙ্ক বুঝি ভুলে যান তাঁর সম্মুখবর্তী প্রতিপক্ষ একটা বালকমাত্র, ভুলে যান ওর সঙ্গে সমান সমান হয়ে কথা কইলে তাঁরই মর্যাদার হানি হবে, ওর কিছুই না। তাই সেই সমান সমান ভাবেই কথা বলেন, 'না, তুমি বারণ কর না। তার মানে হচ্ছে, তুমি চাও খুকুর ওই সব নোংরা খেয়ে অসুখ করুক। বল, তাই চাও কি না?'

'হ্যাঁ চাই-ই তো, খুব চাই।'

সহসা বিদ্যুতের বেগে উত্তর দেয় সীতু, বোধ করি কথার মানে না বুঝেই। বোধ করি শুধু বাবার মুখের উপর কথা বলার সুখে।

'তাই চাও? তাই চাও তুমি?' মৃগাঙ্কর গলা পর্দায় পর্দায় চড়ে, 'তা বলবে বৈ কি। তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। আমড়াগাছে আমড়া না ফলে কি আর ল্যাংড়া ফলবে? কিন্তু মনে রেখো, তোমার ওই সব বদমাইশী সহ্য করবো না আমি। ফের যদি ওরকম দেখি, উচিত শাস্তি দেব।'

'বেশ, খুকুও যেন আমার দিকে না আসে।'

কষ্টে চোখের জল চেপে উচ্চারণ করে সীতু এই ভয়ঙ্কর শর্তের বাক্য।

'ও বটে নাকি?' মৃগাঙ্ক সেই রকম ব্যঙ্গের হাসি হেসে ওঠেন। সে হাসিটা যেন সীতুর কানের পর্দাটা পুড়িয়ে দিয়ে, গায়ের চামড়াটা জ্বলিয়ে দিতে দিতে বাতাসে বিলীন হয়। 'বটে! এই সমস্ত বাড়িটা তা হলে একা তোমারই? তোমার এলাকায় ওর প্রবেশ নিষেধ?'

'হ্যাঁ তো। হ্যাংলা বেহায়াটা তো কাছে এলেই খেতে চাইবে।'

'কী! কী বললি?'

মৃগাঙ্ক গর্জন করে ওঠেন, 'বেয়াদপ অসভ্য ছেলে! দিন দিন গুণ প্রকাশ হচ্ছে। আর যদি কোনদিন এভাবে মুখে মুখে জবাব দিতে দেখি, চাবকে লাল করবো তোমায় আমি।'

এ গর্জন অতসীর কাছে পর্যন্ত পৌঁছয়।

উঠে এ ঘরে ছুটে আসতে যায়। আবার কি ভেবে থেমে পড়ে। দাঁতে ঠোঁট চেপে বসে থাকে নিজের ঘরে।

কিন্তু একটা বলবান স্বাস্থ্যবান কর্তা পুরুষের ক্রোধের গর্জন কি দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে বিলীন হয়ে যায়? দেয়াল ভেদ করে ফেলে না?

ক্ষীণ-কণ্ঠ একটা শিশুর বুকের পাটাটা যতই বেশী হোক, আর তার বিদ্বেষের তীব্রতাটা যতই প্রখর হোক, কণ্ঠস্বরটা ক্ষীণই থাকে। পর্দায় চড়ে শুধু একটা স্বরই, দুটো দেয়াল ভেদ করে এ ঘরে এসে আছড়ে আছড়ে পড়তে থাকে সে স্বর।

'এই জন্যেই বলে, কুকুরকে লাই দিতে নেই। তোমার এই আস্‌পদ্দার ওষুধ কি জানো? জলবিছুটি। আর এবার থেকে সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। ছোঁবে না তুমি ওকে, বুঝলে? আঙুল দিয়েও ছোঁবে না। কী হল! আবার মুখের ওপর চোপা? হ্যাঁ তাই, শুধু তোমার হাতই লোনা। তোমার হাত গায়ে পড়লেই রোগা হয়ে যাবে খুকু। তাই ঠিক। উঃ! এক ফোঁটা ছেলে, আমার জীবন বিষ করে ফেলেছে একেবারে। এই জন্যেই শাস্ত্রে বলে বটে—আগুনের শেষ, ঋণের শেষ, আর শত্রুর শেষ—'

না, ঘরে বসে থাকতে পারে না অতসী। ধীরে ধীরে ও ঘরে গিয়ে মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'শাস্ত্রে কী বলে সেটা আর পাড়া জানিয়ে নাই বা বললে?'

মৃগাঙ্ক চট করে উত্তর দিতে পারেন না, কেমন যেন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন অতসীর দিকে। বুঝি এতক্ষণ যা-কিছু বলছিলেন উগ্র এক নেশার ঘোরে। এখন অতসীর এই মৃদু কণ্ঠের দৃঢ়তায় ফিরে পেলেন চৈতন্য। নিজের ব্যবহারের কদর্যতার দিকে তাকিয়ে অশ্রদ্ধা এল নিজের উপর, আর আরও রাগ বাড়লো ওই হতভাগা ছেলেটার উপর, যে নাকি এই সব কিছুর হেতু।

কিন্তু কটুকথা বলারও বুঝি একটা নেশা আছে। তাই মৃগাঙ্ক মনে মনে অপ্রতিভ হলেও মুখে বলে ওঠেন, 'ছেলের হয়ে ওকালতি করতে আসা হলো?'

'না, তোমার জন্যে এলাম। তোমাকে বাঁচাতে। এমন করে নিজেকে আর মেরোনা তুমি।' সীতুর দিকে তাকিয়ে আরও দৃঢ়কণ্ঠে বলে অতসী, 'যা, তুই ওঘরে যা। পড়গে যা।'

সীতু অবশ্য নড়ে না, তেমনি ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে।

'যা।' তীব্র চীৎকার করে অতসী।

তথাপি সীতু অনড়।

'যা বলছি। শুনতে পাচ্ছিস না?'

সীতু যথাপূর্বং।

'নিজে থেকে নড়বি না তা'হলে?'

আর ধৈর্য থাকে না। একটা কান ধরে টেনে ঘরের বার করে দেয় অতসী। দিয়ে এসে রাগে হাঁপাতে থাকে।

মৃগাঙ্ক একটুক্ষণ চেয়ে থেকে গম্ভীর হাস্যে বলেন, 'বলতে পারতাম, তোমাকে কে বাঁচাতে আসবে অতসী ? কিন্তু বললাম না।'

অতসীর চোখ দুটো জ্বালা করে আসে, তবু কষ্টে কঠিন হয়ে বলে, 'তুমি মহানুভব, তাই বললে না।'

মৃগাঙ্করও কি চোখ জ্বালা করছে ?

তাই অন্য দিকে, খোলা জানলার দিকে তাকাচ্ছেন খোলা হাওয়ার আশায়।

সেই দিকে তাকিয়েই বলেন মৃগাঙ্ক, 'আমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ক্রমশঃ এতেই দাঁড়াচ্ছে, না অতসী ? আঘাত আর প্রতিঘাত !'

অতসী উত্তর দেয় না।

হয়তো দেবার ক্ষমতা থাকে না বলেই দেয় না। মৃগাঙ্কই আবার কথা বলেন, 'যদি আমার উপর এখনো একটু বিশ্বাস তোমার থাকে অতসী তো, বলছি বিশ্বাস কর, ওকে ধমক দেবার জন্যে ডাকিনি আমি, মিষ্টি কথায় বোঝাবার জন্যেই ডেকেছিলাম। কিন্তু—'

আবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে মৃগাঙ্কর।

'কিন্তু কি, তা কি জানে না অতসী ? সীতুর ঔদ্ধত্য, সীতুর একগুঁয়েমি বরফকেও তাতিয়ে তুলতে পারে, সে তো অতসীর হাড়ে হাড়ে জানা। তবু মৃগাঙ্ক যখন বিষতিক্ত স্বরে কটূকাটব্য করে সীতুকে, সীতুর দিকে তাকিয়ে যখন মৃগাঙ্কর চোখ দিয়ে শুধু ঘৃণা আর আগুন ঝরে, তখন আর মেজাজের ঠিক রাখতে পারে না অতসী। তখন তুচ্ছ সীতুর একগুঁয়েমি, ঔদ্ধত্য, অবাধ্যতাগুলো তুচ্ছতার কোঠায় গিয়ে পড়ে, প্রকট হয়ে ওঠে মৃগাঙ্কর অভিব্যক্তিটাই।

'আমাদের ভালোবাসার মধ্যে ও যে এতবড় একটা ভীষণ প্রাচীর হয়ে উঠবে, এতো আমরা কখনো ভাবিনি অতসী ?'

'ভাবলে কি করতে ?' অতসী তীক্ষ্ণস্বরে বলে ওঠে, 'ওকে মুছে ফেলতে ?'

'অতসী !'

বজ্রগম্ভীর দৃষ্টিতে অতসীর দিকে তাকান মৃগাঙ্ক, 'ওই দুর্মতি ছেলেটা তোমার মতিবুদ্ধি সব নষ্ট করে দিচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি, তোমার প্রভাব ওকে সুস্থ করে তুললো না, ওর প্রভাব তোমাকে নষ্ট করে ফেলতে বসলো।'

'আমি যা ছিলাম তাই-ই আছি,' সহসা ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে এতক্ষণকার রুদ্ধ আবেগ, 'তুমিই বদলাচ্ছো। দিন দিন বদলে যাচ্ছো।'

মৃগাঙ্ক আস্তে ওর কাঁধের উপর একটা হাত রাখেন, 'আমিও বদলাইনি অতসী! শুধু মাঝে মাঝে কেমন ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। হয়তো বেশী পরিশ্রমের ফল এটা, হয়তো বা বয়সের দোষ।'

অতসী মুখটা চেপে ধরে সেই বলিষ্ঠ হাতখানার আশ্রয়ের মধ্যে।

তখনকার মত সমস্যা মেটে।

কিন্তু সে মীমাংসা তো সাময়িক।

বড় একটা আলুর মত ফুলে উঠল ছোট্ট কপালের কোলটুকু। পড়ে গিয়ে ককিয়ে উঠে সেই যে থেমে গিয়েছিল খুকু, আবার স্বর ফুটলো অনেক কাণ্ড করে। ঠাণ্ডাজল, গরমজল, বাতাস, ধরে ঝাঁকানি, যত রকম প্রক্রিয়া আছে, সবগুলো করে দেখার পর আবার কেঁদে উঠল সে।

কিন্তু এমন করে পড়ল কি করে খুকু? এতগুলো চাকর-বাকরের চোখ এড়িয়ে?

না, চোখ এড়িয়ে কে বললো?

চোখের সামনে দিয়েই তো।

খুকুর নিজের দাদা যদি খুকুকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেয়, ওরা কি করবে? মাইনে-খেগো চাকররা?

সেই কথাই বলে ওঠে বামুন-মেয়ে—স্পষ্টবাদিতার গুণে যে সকলের চক্ষুশূল আবার ভীতিস্থল।

সারা সংসার মাথায় করে রাখে বলেই অতসীকেও বাধ্য হয়ে হজম করতে হয় বামুন-মেয়ের এই স্পষ্টবাদিতা। কাজেই বামুন-মেয়ে যখন খর খর করে বলে, 'তা ওরা কি করবে? এদের না-হক্ বকুনি দিচ্ছ কেন মা, ওরা মাইনে-খেগো চাকর, শুধু এই অপরাধে? তোমার নিজের ছেলেটি যে একটি খুনে, সে হিসেব তো শুনতে চাইছ না? এই তো আমার চোখের সামনেই তো—কচি বাচ্চাটা 'দাদ্দা দাদ্দা' করে গিয়ে যেই না হাঁটুটা জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়েছে,—ওমা, ধরে তুমি আমায় জেলেই দাও আর ফাঁসীই দাও, সত্যি কথাই কইব,—বললে বিশ্বাস করবে না, ঝনাৎ করে হাঁটু আছড়ে ফেলে দিল বোনটাকে। আর লাগবি তো লাগ, ধাক্কা খেলো একেবারে টেবিলের পায়ার কোণে। ওমা, না বুঝে ঠেলেছিস, তাই নয় তুলে ধর? তা নয়, যেই না মেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো, সেই তোমার ছেলে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে হাওয়া! যাই বল মা, ছেলে তোমার হয় পাগল নয় সর্বনেশে ডাকাত!'

এ মন্তব্যের বিরুদ্ধে কি বলবে অতসী?

কি বলবার মুখ আছে?

খুকুটা যে মরে যায়নি এই ভগবানের অশেষ দয়া। ভাবতে গিয়ে প্রাণটা আনচান করে চোখে জল এসে পড়ে। মেয়েকে বুকে চেপে ধরে মনে মনে বলে, 'কত দয়া তোমার ঠাকুর, কত দয়া!'

খুকুর কোন বিপদ হলে অতসীর প্রাণটা যে ফেটে শতখান হয়ে যেত, একথা তত মনে পড়ছে না অতসীর, যতটা মনে পড়ছে, তাহলে অতসী মুখ দেখাত কি করে?

হে ভগবান! অতসীকে উদ্ধার করো, দয়া করো।

কিন্তু অপরাধীর আর পাত্তা নেই কেন? এদিক ওদিক খুঁজে এসে শেষ পর্যন্ত সেই চাকরবাকরদেরই প্রশ্ন করতে হয় 'খোকাবাবু কাঁহা হ্যায়?'

খোকাবাবু!

না, খোকাবাবুর খবর কেউ জানে না। খুকুর পড়ে যাওয়ার মত ভয়ঙ্কর মারাত্মক দৃশ্যটা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কে আর খোকাবাবুর গতিবিধি দেখতে গেছে?

পাথরের মত মুখ করে মেয়ের কপালের পরিচর্যা করলেন মৃগাঙ্ক, নিঃশব্দে হাত ধুতে চলে গেলেন। অতসীও দাঁড়িয়ে রইল তেমনি নিঃশব্দে। বোঝা যাচ্ছে না, তার মুখে যে অন্ধকার ছায়াটা জমাট হয়ে আছে, সেটা অপরাধ-বোধের, না অভিমানের।

মৃগাঙ্ক ঘরে এসে বসতেই অতসী কাছে এসে দাঁড়াল। বললো, 'তুমি ওকে যা খুসি শাসন করো, আমি কিচ্ছু বলবো না।'

'শাসন করে কি হবে? একদিন শাসন করে কি হবে?'

অতসী বলে, 'এমন ভয়ঙ্কর একটা কিছু করো, যাতে চিরদিনের মত ভয় জন্মে যায়।'

'আমি তো পাগল নই!' মৃগাঙ্ক থমথমে গলায় বলেন।

'কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, ও পাগল হয়ে যাচ্ছে কিনা।'

'ওই ভেবেই মনকে সান্ত্বনা দাও।'

'তবে আমি কি করবো বলে দাও।'

'করবার কিছু নেই। ধরে নিতে হবে এই আমাদের জীবন।'

অতসী কি একটা বলতে যায়, ঠোঁটটা কেঁপে ওঠে, বলা হয় না। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সীতুকে পাঁজাকোলা করে চেপে ধরে নিয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়ায় বাড়ীর দরোয়ান শিউশরণ।

সীতু অবশ্য যথাসাধ্য হাত-পা ছুঁড়ছে, কিন্তু শিউশরণের সঙ্গে পারবে কেন? তাছাড়া তার একখানা হাত তো জোড়া আছে নিজের ভাঙাকপাল সংক্রান্ত ব্যাপারে।

হ্যাঁ, বাঁ হাতের চেটোটা কপালে চেপে ধরে বাকি তিনখানা হাত-পা এলোপাথাড়ি চালাচ্ছে সীতু।

সীতুর কপালে আবার কি হলো?

শিউশরণের বহুবিধ কথার মধ্যে থেকে আবিষ্কার করা যায়, কি হল।

নীচের তলায় নেমে গিয়ে বাড়ির পিছনের দেয়ালের গায়ে ঠাঁই-ঠাঁই করে নিজের কপালটা ঠুকছিল সীতু। নেহাত নাকি জমাদারটা এসে শিউশরণকে এই অস্বাভাবিক কাণ্ডের খবরটা দেয়, তাই কোন প্রকারে এই ক্ষ্যাপাকে ধরে আনতে সক্ষম হয়েছে সে।

শিউশরণ নামিয়ে দিতেই একেবারে স্থির হয়ে গেল সীতু। হাত-পা ছোঁড়া বন্ধ করে দাঁড়াল দুখানা হাত দুদিকে ঝুলিয়ে, মুখ নীচু করে। তবু দেখা যাচ্ছে, সীতুর কপালটাও ফুলে

উঠেছে বড় একটা আলুর মত। বাড়তি আরও কিছু হয়েছে, সমস্ত কপালটা ছ্যাচা-ছ্যাচা কালশিরে কালশিরে।

হ্যাঁ, সীতুর কপালের পরিচর্যাও মৃগাঙ্ককেই করতে হল বৈ কি!

অতসী মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেলেও, এ ছাড়া আর কী সম্ভব?

কিন্তু মৃগাঙ্কর পাথুরে মুখটা একটু যেন শিথিল হয়ে গেছে, মুখের রেখাগুলো একটু যেন ঝুলে পড়েছে। বড় বেশী চিন্তিত দেখাচ্ছে যেন সে মুখ।

'এ রকম করলে কেন?'

সীতু যথারীতি গোঁজ হয়েই রইল।

মৃগাঙ্কর স্বরটা কোমল কোমল শোনায়, 'তোমার কপাল ফুলে উঠল বলে কি খুকুর কষ্টটা কমলো?'

'সেজন্যে নয়।' হঠাৎ একটা দৃপ্তস্বর ঝিলিক দিয়ে উঠল।

'সে জন্যে নয়?' কোঁচকানো ভুরুর নীচে চোখ দুটো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে মৃগাঙ্কর, 'তবে কি জন্যে?'

'ঠুকলে কি রকম লাগে তাই দেখতে।'

'তা' ভাল। বেশ ভালই লাগল—কেমন?' ক্ষুব্ধ একটু হেসে চলে গেলেন মৃগাঙ্ক।

সীতুকে কখনো তুমি ছাড়া তুই বলেন না মৃগাঙ্ক। এ এক আশ্চর্য রহস্য! অন্তত চাকর-মহলের কাছে।

দু'দুটো এত বড় অপরাধ করেও এমনি বা কি শাস্তি পেল সীতু?

রহস্য এখানেও।

শিউশরণের কাছে নেপ্‌বাহাদুর গিয়ে গল্প করে—কপালে ব্যাণ্ডেজবাঁধা ছেলে একা শুয়ে আছে—না মা; না বাপ। ওকে কেউ দেখতে পারে না।

শিউশরণ মন্তব্য করে, ও রকম ছেলেকে যে আছড়ে মেরে ফেলেন না সাহেব, এই ঢের। তাদের দেশে হলে ও ছেলেকে বাপ আস্ত রাখত না। সমালোচনা চলতেই থাকে নীচের তলায়। রোজই চলে।

অমন মা-বাপের ওই ছেলে!

মামাদের মতন হয়েছে বোধ হয়।

কিন্তু মামাই বা কোথা? এই চার-পাঁচ বছর রয়েছে তারা, কোনদিন দেখেনি সীতুর মামা বা মাতুলালয় বলে কিছু আছে।

হ্যাঁ, সাহেবের আত্মীয়-স্বজন এক-আধটা বরং কালে-কস্মিনে দেখেছে। কিন্তু মাইজীর? না।

অবশেষে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছয় ওরা—খুব গরীবের মেয়ে বোধ হয় অতসী। তিনকুলে কেউ নেই ওর।

ওদের অনুমান ভুলও নয়।

সত্যিই কেউ কোথাও নেই অতসীর। শুধু মানুষের জোর নয়, ভিতরের জোরও বুঝি তেমন করে কোথাও কিছু নেই। তাই সে গৃহিণী হয়েও যেন আশ্রিতা। নিজের ক্ষেত্রটাকে যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করে নিঃশব্দে থাকতে চায় সে এখানে। সংসারে বামুন-মেয়ের একাধিপত্য মেনে নেয় নীরবে। চাকর-বাকরকে বকতে পারে না।

মৃগাঙ্ক যতই তাকে অধিকারের সিংহাসনে বসাতে চান, সে অধিকার খাটাবার সাহস হয় না অতসীর।

কিন্তু সীতু যদি এমন না হতো?

তা'হলে কি সহজ হতে পারতো অতসী? সহজ অধিকারে গৃহিণীপণা আর স্বামী-সন্তানের সেবায় সম্পূর্ণ করে তুলতে পারতো নিজেকে?

সীতু যেমন অহরহ নিজেকে প্রশ্ন করে, 'সেটা কোথায়? সেটা কোথায়?' অতসীও তেমনি সহস্রবার নিজেকে ওই প্রশ্ন করেছে 'তাহলে কি সহজ হতে পারতাম? তাহলে কি স্বচ্ছন্দ হতে পারতাম? পারতাম স্বামীকে সুখী করতে, আর নিজে সুখী হতে? শুধু—সীতু যদি অমন না হতো?'

ঝাপসা ঝাপসা ছায়া ছায়া যে ছবিটা সীতুকে যখন তখন উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে, সে ছবিটা কি সত্যিই সীতুর পূর্বজন্মের? সীতু কি জাতিস্মর?

কিন্তু সীতু জাতিস্মর হলে অতসীকেও তো তাই-ই বলতে হয়। অতসীর মনের মধ্যেও যে সেই একটা পূর্বজন্মের ছবি আঁকা আছে। ঝাপসা হয়ে নয়, স্পষ্ট প্রখর হয়ে। সীতুর সেই পূর্বজন্মেও অতসীর ভূমিকা ছিল সীতুর মায়ের।

সংসারের অসংখ্য কাজের চাপে ছেলে সামলাবার সময় ছিল না অতসীর, তাই তাকে একটা উঁচু জানলার ধাপে বসিয়ে রেখে যেত, হয়তো বা হাতে একখানা বিস্কুট দিয়ে, কি কাছে চারটি মুড়কি ছড়িয়ে দিয়ে।

জানলা থেকে নামতে পারতো না সীতু, বসে থাকতো গলির পথটার দিকে চেয়ে, হয়তো বা এক সময় ঘুমে ঢুলতো।

খাটতে খাটতে এক একবার উঁকি মেরে দেখতে আসতো অতসী, ছেলেটা কোন অবস্থায় আছে। ঢুলছে দেখে ভিজে স্যাঁৎসেঁতে হাতে টেনে নামিয়ে চৌকিতে শুইয়ে দিত।

মমতায় মন ভরে গেলেই বা ছেলে নিয়ে দু'দণ্ড বসে থাকবার সময় কোথা? পাশের ঘরে আর একটা লোক পড়ে আছে আরো অসহায় শিশুর মত। সীতু তবু দাঁড়াতে পারে, 'হাঁটি হাঁটি পা পা' করতেও শিখছে। আর সে লোকটা পৃথিবীর মাটিতে পা ফেলে হাঁটার পালা চুকিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার দিন গুনছে।

কিন্তু শিশুর মত অসহায় বলে তো আর সে শিশুর মত নিরুপায় নয়? তার মেজাজ আছে, গলার জোর আছে, অধিকারের তেজ আছে, আর আছে কটূক্তির অক্ষয় তূণ। তাই তার কাছেই বসে থাকতে হয় অতসীকে অবসরকালটুকু, তার জন্যেই খাটতে হয় উদয়াস্ত।

কিন্তু সে খাটুনির শেষ হলো কেমন করে?

সীতুর আর অতসীর সেই পূর্বজন্মটা কবে শেষ হলো? কোন্ অনন্ত পথ পার হয়ে আর এক জন্মে এসে পৌঁছল তারা?

জন্মান্তরের মাঝখানে একটা মৃত্যুর ব্যবধান থাকে না? থাক্‌তেই হয় যে!

তা' ছিলও তো!

যাদের জন্মান্তর ঘটলো তাদের? না আর একটা মানুষের মৃত্যুর মূল্যে নতুন জীবনটাকে কিনল তারা?

জন্মান্তর! তা সত্যিই বৈকি।

নতুন জীবন! গলিত কীটদষ্ট জীর্ণ একটা জীবনের খোলস ছেড়ে হৃদয়-উত্তাপের তাপে ভরা তাজা একটা জীবন!

তবু কেন সীতু জাতিস্মর হলো?

কেন সে পূর্বজন্মের স্মৃতির ধূসর ছায়াখানাকে টেনে এনে এনে এই নতুন জীবনটাকে ছায়াচ্ছন্ন করে তুললো?

কেন সে ছায়ায় তিনটে মানুষের জীবনের সমস্ত আলো ঢেকে দিতে সুরু করলো?

আচ্ছা, ওদের সেই পূর্বজীবনে মৃগাঙ্ক ডাক্তারও ছিলেন না?

কী ওঁর ভূমিকা ছিল? শুধু ডাক্তারের?

ভাবতে গিয়ে ভাবতে ভুলে যায় অতসী।

মনে পড়ে না, ডাক্তারের ভূমিকাটা গৌণ হয়ে গিয়ে হৃদয়বান বন্ধুর ভূমিকাটায় কবে উত্তীর্ণ হলো মৃগাঙ্ক।

তবু!

সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে অতসীর, ওই তবুটা ভাবতে গেলেই। কিছুতেই শেষ পর্যন্ত ভাবতে পারে না। ভেবে ঠিক করতে পারে না, যে লোকটা মারা গেল, সে বিনা পয়সার চিকিৎসা উপভোগ করতে করতে শুধু পরমায়ু ফুরোলো বলেই মারা গেল, না পরমায়ু থাকতেও বিনা চিকিৎসায় মারা গেল?

অদ্ভুত এই চিন্তাটার জন্যে নিজের কাছেই নিজে লজ্জায় মাথা হেঁট করে অতসী। বারবার বলতে থাকে 'আমি মহাপাপী।' তবু চিন্তাটা থেকে যায়।

কিন্তু শুধু আত্মনিন্দা করলেই কি জগতের সব সমস্যার মীমাংসা হয়? সমগ্র মানব সমাজ কি আত্মনিন্দায় পশ্চাৎপদ? সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তো মানুষ আত্মনিন্দায় পঞ্চমুখ হতে শিখেছে।

তবু মীমাংসা হয়নি।

তবু সংশোধন হয়নি মানুষের।

সংশোধনের হাতই বা কোথায়?

নিজেই তো মানুষ নিজের কাছে বেহাত। জন্মের আগে না কি তার বুদ্ধি আর চিন্তার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে থাকে পূর্বজীবনের সংস্কার। আর জন্মের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে দেহের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হতে থাকে নতুন জীবনের পূর্বপুরুষদের সংস্কার। অস্থিতে মজ্জাতে, শিরায় শোনিতে, স্তরে স্তরে সঞ্চিত হতে থাকে শুধু মা-বাপের নয়, তিন কুলের দোষ গুণ, মেজাজ, প্রবৃত্তি।

আকৃতি প্রকৃতি দুটোই মানুষের হাতের বাইরে। কেউ যদি ভাবে আপন প্রকৃতিকে আপনি গড়া যায়, সে সেটা ভুল ভাবে। ইচ্ছে থাকলেও গড়া যায় না। বড় জোর কুশ্রীতাকে কিঞ্চিৎ চাপা দেওয়া যায়, রুক্ষতাকে কিঞ্চিৎ মসৃণ করা যায়।

এর বেশী কিছু না।

শিক্ষাদীক্ষা সবই এখানে পরাজিত। শিক্ষাদীক্ষা বড় জোর একটু পালিশ লাগাতে পারে মানুষের আদিমতার উপর। যার জোরে চালিয়ে যায় মানুষ।

শিশুরা সত্য, শিশুরা অশিক্ষিত, অদীক্ষিত। তাই শিশুরা বন্য, বর্বর, আদিম।

কিন্তু সীতুর কি এখনো সে শৈশব কাটেনি? সামান্যতম পালিশ পড়বার বয়স কি তার হয়নি।

সে কেন এমন বর্বরতা করে?

অতসী যদি তাকে সুশিক্ষা দিতে যায়, অতসীর চোখের সামনে দুই কানে আঙুল ঢুকিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে সীতু নির্ভয়ে বুকটান করে।

অতসী যদি গায়ের জোরে শাসন করতে যায়, সীতু তাকে আঁচড়ে কামড়ে মেরে বিধ্বস্ত করে দেয়।

অতসী যদি অভিমান করে কথা বন্ধ করে, সীতু অক্লেশে সাতদিন মার সঙ্গে কথা না কয়ে থাকে, নিতান্ত প্রয়োজনেও 'মা' বলে ডাকে না।

কোন্ উপায়ে তবে ছেলেকে শোধরাবে অতসী

অথচ নিরুপায়ের ভূমিকা নিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে যেতেও তো পারে না। মৃগাঙ্কর যন্ত্রণাটা কি উপেক্ষা করবার?

তাই আবারও ছেলের কাছে গিয়ে বসে। আবারও সহজ স্বরে বলতে চেষ্টা করে—'আচ্ছা সীতু, মাঝে মাঝে তোকে কিসে পায় বল্‌তো? ভূতে না ব্রহ্মদৈত্যে?'

'খুকুকে কেন ফেলে দিয়েছিলি?'

জিজ্ঞেস করেছিল অতসী, খুকুর ফুলো কপাল সমতল হয়ে যাবার পর। সীতুর তখনো প্রখর হয়ে রয়েছে ললাট লেখা।

একবারে উত্তর দেওয়া সীতুর কোষ্ঠিতে নেই, তাই আবারও ওই একই প্রশ্ন করে অতসী। বলে, 'বকবো না, মারবো না, কিছু শাসন করবো না, শুধু বল ফেলে দিলি কেন? তুই তো ওকে কত ভালবাসিস!'

খুকু প্রসঙ্গে চোখে জল এসে গেল সীতুর, তবু জোর করে বললো, 'পাজীটা আমার কাছে আসে কেন? আমার গায়ে হাত দেয় কেন?'

'ওমা, তা দিলেই বা—' অবোধ অজ্ঞান অকপট সরল অতসী, বিস্ময়ের গুঁড়ো মুখে-চোখে মেখে বলে, 'তুই দাদা হ'স তোকে ভালবাসবে না?'

'না, বাসবে না। আমার হাত তো লোনা। আমি গায়ে হাত দিলেই তো রোগা হয়ে যাবে ও, অসুখ করবে!'

'ছি ছি সীতু, এই তুই ভেবে বসে আছিস? ওমা, কি বোকারে তুই! সব বড়দেরই হাত ওই রকম। বাচ্চারা তো ফুলের মতন, একটুতেই ওদের অসুখ করে, তাই তো সাবধান হন তোর বাবা।'

'আমিও তো সাবধান হয়েছি। ঠেলে দিয়েছি।'

'আর তারপর নিজের কপাল দেয়ালে ঠুকে ঠুকে ছেঁচেছিস! তোকে নিয়ে যে আমি কি করবো! ওঁকে তুই অমন করিস কেন? উনি কি অন্যায় কিছু বলেন?' অতসী দম নেয়, 'কত বাড়ির কর্তারা কত রাগী হয়, কত চেঁচামেচি বকাবকি করে, দেখিসনি তুই, তাই একটুতেই অমন করিস। তুই যদি ওঁকে একটু মেনে চলিস, তাহলে তো কিছুই হয় না। বল, এবার থেকে ওঁর কথা শুনবি? যা বলবেন তাতেই বিশ্রীপনা করবি না? উনি তোর কি করেছেন? এই যে খুকুকে নিয়ে কাণ্ডটা করলি, কিচ্ছু বকলেন উনি তোকে? বল, বল সত্যি কথাটা।'

সীতু মাথা ঝাঁকিয়ে সত্যি কথাটাই বলে, 'না বকলেও ওঁকে আমার ছাই লাগে।'

'বেশ, তাহলে এবার থেকে খুব কসে বকতেই বলবো!'

আট বছরের একটা ছেলের কাছে নীচুর চরম হয় অতসী, হেসে ওঠে কথার সঙ্গে। হেসে হেসে বলে, 'বলবো সীতুবাবু বকুনি খেতেই ভালবাসে, ওকে খুব বকো এবার থেকে।'

আর সীতু? সীতু কঠিন গলায় বলে ওঠে, 'তোমার কথা আমার বিচ্ছিরি লাগছে।'

তবু হাল ছাড়ে না অতসী। তবু বলে, 'সীতুরে, তোর কি উপায় হবে? নরকেও যে জায়গা হবে না তোর! যে ছেলে মা-বাপকে এরকম করে, তাকে কি বলে জানিস? মহাপাপী! শেষটায় কিনা মহাপাপী হতে ইচ্ছে তোর?'

একটু বুঝি সঙ্কুচিত হয় ছেলে, পাপের ভয়ে, নরকের ভয়ে। অতসী সুযোগ বুঝে বলে, 'দেখছিস তো ওঁর চব্বিশ ঘণ্টা কত খাটুনি! দিনরাত খাটছেন। কেন? টাকা রোজগারের জন্যেই তো? কিন্তু সে টাকা কাদের জন্যে খরচ করছেন উনি? এই আমাদের জন্যে কি না? সেই মানুষকে যদি তুমি কষ্ট দাও, গুরুজন বলে একটুও না মানো, তা হলে মহাপাপী ছাড়া আর কি বলবে তোমাকে লোকে?'

না, সঙ্কুচিত হবার ছেলে নয় সীতু।

কথাগুলো যেন বেনা বনে মুক্তো ছড়ানোর মতই হয়। যার উদ্দেশে এত কথা, সে কথাটি পর্যন্ত কয় না, মুখখানা কাঠ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

তথাপি অতসী ভাবে একটু বোধ হয় নরম হচ্ছে। যে মনটা মাত্র সাড়ে আটটা বছর পৃথিবীর রোদ জল আলো অন্ধকারের উপসত্ব ভোগ করে সবে শক্ত হতে সুরু করেছে, তাকে আর অতগুলো শক্ত কথায় নরম করতে পারা যাবে না? অতএব আরও এক চাল চালে সে। বলে, 'ভেবে দেখ দিকিন, তোর জন্যে আমি সুদ্ধ কত বকুনি খাই! এবার প্রতিজ্ঞা কর, আর কখনো ওঁর অবাধ্য হবি না। উনি যা বলবেন—'

'না প্রতিজ্ঞা করবো না।'

'না প্রতিজ্ঞা করবি না? এত বড় সাহস তোর?' অতসী ক্ষেপে ওঠে হঠাৎ। ক্ষেপে গিয়ে কোনদিন যা না করে, তাই করে বসে। ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় ছেলের গালে।

দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'অসভ্য জানোয়ার বেইমান!'

সমস্ত মুখটা লাল হয়ে ওঠে সীতুর, এ গালের রক্তিমাভা ও গালে ছড়িয়ে পড়ে। তবু উত্তর দেয় না সে। গালে হাতটাও বুলোয় না। এক ঝটকায় মার কাছ থেকে সরে গিয়ে বুনো জানোয়ারের মতই ঘাড় গুঁজে গোঁ গোঁ করে চলে যায়।

অতসী চুপ্ করে চেয়ে থাকে।

মনের মধ্যে মৃগাঙ্কর একদিনের একটা কথা বাজে, 'একটা বাচ্চা ছেলের কাছে আমরা হেরে গেলাম!' আক্ষেপ করে বলেছিলেন মৃগাঙ্ক ডাক্তার।

হার মানবে না প্রতিজ্ঞা করেছিল অতসী, ভেবেছিল সমস্ত চেষ্টা দিয়ে, সমস্ত বুদ্ধি প্রয়োগ করে, সীতুকে নরম করবে। মানুষের আদিম কৌশল 'পাপের ভয়' দেখানো, তাও করে দেখবে। ছোট ছেলের মন, নিশ্চয়ই বিচলিত হবে মানুষের চিরকালীন নিয়ন্তা 'নরকের ভয়ের' কাছে।

কিন্তু প্রথম চেষ্টাতেই ব্যর্থতা ক্ষেপিয়ে তুললো অতসীকে। তাই মেরে বসলো সীতুকে। এবার কি তবে মারের পথই ধরতে হবে? নইলে মৃগাঙ্ককে কি করে মুখ দেখাবে অতসী?

মৃগাঙ্ক ডাক্তারের বাড়িতে ফালতু কোনও আত্মীয় নেই, সবই মাইনে করা লোক। 'বামুন-মেয়ে'কে তো অতসীই এনে রেখেছে। তবু অতসীর উপর টেক্কা মারে ওরা— কাজে, কথায়।

বিশেষ করে বামুন-মেয়ে।

সে ছুটে আসে অতসীর এই নীরবতার মাঝখানে। বলে, 'ঠিক করেছেন মা, মারধোর না করে কি ছেলে মানুষ করা যায়? যে দেবতার যে মন্তর। আমি তো কেবলই ভাবি এমন একবগ্‌গা জেদি গোঁয়ার ছেলেকে কি করে বৌমা না মেরে থাকে? আপনি রাগই করুন আর ঝালই করুন মা, পষ্ট কথা বলবো, এমন ছেলে আমি জন্মে দেখিনি। বাপ বলে কথা, জন্মদাতা পিতা, তাকে কি অগ্যেরাহ্যি! সেদিনকে দেখি বারান্দায় টবে একটা গাছ পুঁতছে ছেলে, কে জানে কি এতটুকু গাছ। বাবু এসে বললেন 'কি হচ্ছে? বাগান?' বকে নয়, ধমকে নয়, বরং একটু হেসে, ওমা বলবো কি, বাপের কথার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে গাছটাকে উপড়ে তুলে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিল। আমি তো অবাক! ধন্যি বলি বাবুর সহ্যশক্তি, একটি কথা বললেন না, চলে গেলেন। আমাদের ঘরে হলে বাপ অমন ছেলেকে ধরে আছাড় মারতো। শুধু কি ওই একটা? উঠতে বসতে তো বাপকে তুচ্ছ তাচ্ছীল্যি। শাস্তরে বলেছে, পিতা সগ্‌গো পিতা ধম্মো, সেই পিতাকে এত অমান্যি?'

'বামুন-মেয়ে, তুমি তোমার কাজে যাও।'

গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দেয় অতসী। অসহ্য লাগছে ওর স্পর্ধা।

বামুন-মেয়ে হঠাৎ আদেশে থতমত খেয়ে চলে যায়। কিন্তু অতসী নড়তে পারে না, স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে ওর চলে যাওয়া পথের দিকে।

ওর এসব কথার অর্থ কি?

এত কথা কেন?

একি শুধুই বেশী কথা বলার অভ্যাস? না আর কিছু?

গ্যাল্লাটা জ্বালা করলেও গালে হাত দেবে না সীতু, কাঠ হয়ে বসে থাকবে সেই ওর জানলার ধারে, সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে।

এতো শুধু একটা চড় নয়, এ বুঝি সীতুর ভবিষ্যতের চেহারার আভাস।

তাহলে অতসীও এবার শাসনের পথ ধরবে। মৃগাঙ্ক ডাক্তারের মন রাখতে তার অনুকরণ করবে। বাপের উপর রাগ ছিল, মায়ের উপর আসছে ঘৃণা। ঘৃণা আসছে ওই বিশ্রী লোকটাকে মা ভয় করে বলে, ভালবাসে বলে।

সীতুর বয়েস কি মাত্র সাড়ে আট?

এত কথা তবে শিখলো কি করে সীতু? কে শেখালো এত প্রখর পাকামি?

এই প্যাঁচালো পাকা বুদ্ধিটা কি তা'হলে সীতুর পূর্বজন্মার্জিত?

কে জানে কি!

সীতু তার ছোট্ট দেহের মধ্যে একটা পরিণত মনকে পুষতে যন্ত্রণাও তো কম পায় না?

আচ্ছা, তবে কি এবার থেকে বাবাকে ভয় করবে সীতু? করবে ভক্তি? মার মত ভালও বাসবে—ভাববে বাবা কত কষ্ট করছেন তাদের জন্যে?

চিন্তার মধ্যেই মন বিদ্রোহ করে ওঠে।

বাবাকে সীতু কিছুতেই ভালবাসতে পারবে না, ক্‌ক্‌খনো না। তার জন্যে মায়ের কাছে মার খেতে হলেও না।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর বোধকরি জলতেষ্টা পাওয়ায় উঠল সীতু। উঠে দেখল, সামনেই বারান্দার রেলিঙের তারে বাবার রুমাল দুটো শুকোচ্ছে ক্লীপ আঁটা। বোধহয় মাধব তাড়াতাড়ির দরকারে এখানে শুকোতে দিয়ে গেছে, এইখানটায় একটু রোদ এসে পড়েছে।

রুমাল দুটো ঝুলছে, বাতাসে উড়ছে ফরফর করে, সীতু সেদিকে একটু তাকিয়েই দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে পা উঁচু করে হাত বাড়িয়ে আটাকানো ক্লীপ্‌টা টেনে খুলে নেয়, আর মুহূর্তের মধ্যেই রুমাল দুটো কোথায় ছুটে চলে যায় রাস্তার ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে।

ওটা সম্পূর্ণ চোখ ছাড়া হয়ে গেলে সীতুর মুখে ফুটে ওঠে একটা ক্রূর হাসি। দরকারের সময় রুমাল না পেলে বাবা কি রকম রাগ করে সীতুর জানা। লোকসানটা যতই তুচ্ছ হোক, বাবার অসুবিধে তো হবে!

অতসী দূর থেকে তাকিয়ে দেখে আড়ষ্ট হয়ে চেয়ে থাকে, ছুটে এসে বকবে এমন সামর্থ্য খুঁজে পায় না মনের মধ্যে।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে গিয়ে আলমারি থেকে দু'খানা ফরসা রুমাল বার করে রেখে দেয় মৃগাঙ্কর দরকারী জায়গায়।

গালের জ্বালাটা যেন একটুখানি জুড়োল। আবার যেন চারিদিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে সীতুর। ঠিক হয়েছে, এই একটা উপায় আবিষ্কার করতে পেরেছে সীতু বাবাকে জব্দ করবার। সব সময় সীতুর দিকে কড়া কড়া করে তাকানো, আর ভারি ভারি গলায় বকার শোধ তুলবে সে এবার বাবাকে উৎখাত করে।

আর খুকুটাকে কেবল পাতের খাওয়াবে।

বাবা জব্দ হচ্ছেন এটা ভেবে ভারি মজা লাগে সীতুর। উপায় উদ্ভাবন করতে হবে জব্দ করার।

মোজার তলাটা রক্তে ভেসে গেল।

মোজা ভেদ করে কাঁচের কুচিটা পায়ের চামড়ায় বিঁধে বসেছে। হীরের মত ঝকঝকে ছোট্ট কোনাচে একটা কুচি।

'বাড়ীতে কী হচ্ছে কি আজকাল ?' মৃগাঙ্ক ডাক্তার চেঁচিয়ে ওঠেন, রুগী দেখতে বেরোবার মুখে নিজেই রুগী হয়ে। 'মাধো ! নেপ্‌বাহাদুর !'

ছুটে এল ওরা, আর সাহেবের দুরবস্থা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। পা থেকে কাঁচের কুচিটা টেনে বার করছেন মৃগাঙ্ক মোজা খুলে, রক্তে ছড়াছড়ি যাচ্ছে জায়গাটা।

এইমাত্র জুতো পালিশ করে ঠিক জায়গায় রেখে গেছে মাধব, এর মধ্যে জুতোর মধ্যে কাঁচের টুকরো এল কি করে ?

অতসীও এসে অবাক হয়ে যায়, 'কি করে ? কি করে ?'

'কি করে আর !' মৃগাঙ্ক তীব্র চীৎকার করে ওঠেন, জুতোর পালিশের বাহার করা হয়েছে, ঠুকে একটু ঝাড়া হয় নি। তুমি শীগগির একটু বোরিক কটন আর ডেটল দাও দিকি। আর এই মেধোটার এমাসে কদিন কাজ হয়েছে হিসেব করে মিটিয়ে বিদেয় করে দাও।'

মেধো অবশ্য কাঁচুমাচু মুখে প্রতিবাদ করে বোঝাতে থাকে, অন্তত চারবার সে জুতো ঠুকে ঠুকে ঝেড়েছে, কাঁচের কুচি তো দূরের কথা একদানা বালিও থাকার কথা নয়। কিন্তু মেধোর প্রতিবাদে কে কান দেয় ?

মৃগাঙ্ক ডাক্তারের সহ্যশক্তি অগাধ হলেও, এত অগাধ নয় যে, চাকরের এতটা অসাবধানতার উপর এতখানি ধৃষ্টতা সহ্য করবেন। তাঁর শেষ কথা 'আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাক্ ও !'

ডাক্তারের নিজের চিকিৎসা করার সময় নেই। তখুনি উপযুক্ত ব্যবস্থা করে ফের জুতোয় পা গলাতে হয় তাঁকে, মেধো সিঁড়ির কোণে বসে কাঁদছে দেখেও মন নরম হয় না তাঁর।

'ফিরে এসে যেন তোমাকে দেখি না' বলে চলে যান।

বলনে যতটা জোর ফুটলো মৃগাঙ্কর, চলনে ততটা নয়, পাটা রীতিমত জখম হয়েছে।

কিন্তু কোথা থেকে এল এই তীক্ষ্ণ কোনাচে কাঁচ কুচি ? মাধবের চোখে 'অন্নওঠা'র অশ্রুধারা, অন্যান্যদের চোখে বিস্ময়ের ভীতি, অতসীর চোখে শঙ্কার ধূসর মেঘ।

শুধু অন্তরাল থেকে ছোট একজোড়া চোখ সাফল্যের আনন্দে জ্বলজ্বল করে। ছোট চোখ, ছোট বুদ্ধি, সামান্য অভিজ্ঞতা, তবু ডাক্তারের বাড়ির বাতাসে বুঝি এসব অভিজ্ঞতার বীজ ছড়ানো থাকে।

কাঁচের কুচি ফুটে থাকলে যে বিষাক্ত হয়ে পা ফুলে উঠে বিপদ ডেকে আনতে পারে, একথা এ বাড়ির বাচ্চা ছেলেটাও জানে।

'টেবিলের ওপর একখানা জার্নাল ছিল, কোথায় গেল অতসী ?'

রাত্রে অনেক রাত অবধি পড়াশোনা করেন ডাক্তার, করেন শোবার ঘরেই, টেবিল ল্যাম্পের আলোয়। আগে নীচতলায় লাইব্রেরী ঘরে পড়তেন, খুকুটা হওয়ার পর থেকে উঠে আসেন উপরে। খুকুর জন্যে নয়, খুকুর মার জন্যেই।

মেয়ে জন্মাবার পর অনেকদিন ধরে নানা জটিল অসুখের মধ্যে কাটাতে হয়েছে অতসীকে। তখন মৃগাঙ্ক অনেকটা সময় কাছে না থাকলে চলত না।

সেই থেকে রয়ে গেছে অভ্যাসটা।

শুতে এসে তাই এই প্রশ্ন।

অতসী বিমূঢ়ের মত এদিক ওদিক তাকায়, ঘরের টেবিল থেকে কোন কিছুই তো নড়ানো হয়নি।

'কি হলো সেটা ? তাতে যে ভীষণ দরকারী একটা আর্টিকেল রয়েছে, আজ রাত্রেই পড়ে রাখবো ঠিক করেছি। খোঁজ খোঁজ !'

কিন্তু কোথায় খুঁজবে অতসী ?

অতসীর ঘরটা তো ঘুঁটে-কয়লার ঘর নয ! চাল-ডাল-মশলার ভাঁড়ার নয় যে, কিসের তলায় ঢুকে গেছে, হারিয়ে গেছে। বেশ মনোরম ছিম্‌ছাম্ ফিটফাট ঘর, সুতোটি এদিক ওদিক হয় না।

খুঁজে পাওয়া গেল না। কোথাও না।

স্বামীর বিশেষ বিরক্ত হয়ে শুয়ে পড়ার পরও খুঁজতে থাকে অতসী। কিছু পড়াশোনা না করে মৃগাঙ্কর এরকম শুয়ে পড়াটা অস্বাভাবিক।

অবশেষে মৃগাঙ্করই দয়া হল। কাছে ডাকলেন অতসীকে। কোমল স্বরে বললেন, 'আর বৃথা কষ্ট কোরো না, এসো শুয়ে পড়ো। এখুনি তো আবার খুকু জেগে উঠে জ্বালাতন করবে !'

মা-বাপে বিয়ে দেওয়া, অবলীলায় পাওয়া স্বামী নয়, মৃগাঙ্ক অতসীর ভালবেসে পাওয়া স্বামী। বয়সে অনেকটা তফাৎ হওয়া সত্ত্বেও প্রাণভরে ভালবেসেছিল অতসী মৃগাঙ্ককে, শ্রদ্ধা করেছিল ত্রাণকর্তার মত, ভক্তি করেছিল দেবতার মত।

আর মৃগাঙ্ক ?

মৃগাঙ্কও তো কম ভালবাসেননি, কম করুণা করেননি, কম স্নেহ-সমাদর করেননি।

তবু কেন ভয় ঘোচে না অতসীর ? তবু কেন মৃগাঙ্ক একটু কাছে টেনে কোমল স্বরে কথা বললেই চোখে জল আসে তার ?

মা-বাপে বিয়ে দেওয়া, অবলীলায় পাওয়া স্বামীর জন্যে বুঝি মনের মধ্যে এমন দায় থাকে না, থাকে না এমন 'হারাই হারাই' ভাব। সেখানে অনেক পেলেও পাওয়ার মধ্যে কৃতজ্ঞতা-বোধ রাখতে হয় না, মনকে দিয়ে বলাতে হয় না, 'তুমি কত দিচ্ছ! তুমি কত মহৎ !'

প্রাপ্য পাওনায় আবার কৃতজ্ঞতা কিসের? অনায়াসলব্ধ জমার খাতায় টিঁকিয়ে রাখবার জন্যে আবার আয়াস কিসের?

যেখানে আমিই দাতা, 'আমি দান করছি আমাকে, সমর্পণ করছি আমাকে, উপহার দিচ্ছি আমার 'আমি'টাকে'—সেখানে অনন্ত দায়!

যে আমিকে উপহার দিচ্ছি, সমর্পণ করছি, দান করছি সে 'আমি'কে তো উপহারের যোগ্য সুন্দর করে তুলতে হবে? সমর্পণের যোগ্য নিখুঁত করে সম্পূর্ণতা দিতে হবে? দানের উপযুক্ত মূল্যবান করে গড়তে হবে?

তাই বুঝি সদাই ভয়! তাই বুঝি সব সময় কৃতজ্ঞতা!

'কি হল? কাঁদছ নাকি? কি আশ্চর্য!'

অতসী তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলে, 'তোমার কত অসুবিধে হল! আমার অসাবধানেই তো—'

'আমার অসাবধানেও হতে পারে। আমিই হয়তো আর কোথাও রেখেছি। মিছে নিজেকে দোষী ভাবছো কেন? এটা তোমার একটা মানসিক রোগের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখছি।'

অতসী কি উত্তর দেবে?

'ঘুমিয়ে পড, মন খারাপ কোরো না। তোমার মুখে হাসি দেখবার জন্যেই আমি—কিন্তু রাহুমুক্ত পূর্ণশশী ক'দিনই বা দেখতে পেলাম!'

নিশ্বাস ফেলেন ডাক্তার।

অতসীও নিশ্বাস ফেলে ভাবে, সত্যি ক'দিনই বা? প্রথমটায় তো অদ্ভুত একটা ভয়, অপরিসীম একটা লজ্জা, আর অনেকখানি আড়ষ্টতা।

মৃগাঙ্কর আত্মীয় সমাজ আছে. নিজের পরিত্যক্ত জীবনেতিহাসের গ্লানিকর স্মৃতি আছে, চির অসন্তুষ্টচিত্ত বেয়াড়া আবদেরে সীতু আছে। এ আড়ষ্টতা ঘুচতে সময় লেগেছে। তারপর এল খুকুর সম্ভাবনা। এল আনন্দের জোয়ার, নতুন করে নব মাতৃত্বের সূচনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল অতসী, উঠলো উচ্ছল হয়ে। কৃতজ্ঞতাবোধের দৈন্যটাও বুঝি গিয়েছিল, মূল্যবোধ এসেছিল নিজের উপর।

তাই বুঝি নারী মাতৃত্বে মনোহর!

সেই গৌরবে রমণী আর শুধু রমণী নয়, রমণীয়। তার প্রতি অণুপরমাণুতে ফুটে ওঠে সেই গৌরবের দীপ্তি। যে দীপ্তি বলে 'শুধু তুমিই আমায় অন্ন আর আশ্রয় দাওনি, আমিও তোমায় দিলাম সন্তান আর সার্থকতা!'

হয়তো সেই গৌরবের আনন্দে ক্রমশঃ সহজ হয়ে উঠতে পারত অতসী। কিন্তু সীতু বুঝি

পণ করেছে অতসীকে সহজ হতে দেবে না, সুখী হতে দেবে না। ওদের বংশধারাতেই বুঝি আছে এই হিংসুটেমি।

হ্যাঁ আছেই তো। তিন পুরুষ ধরে এই হিংসুটেপনা করে ওরা জ্বালাচ্ছে অতসীকে।

সেবার তো অতসীর নিজের ভূমিকা ছিল না কোথাও কোনখানে।

সে তো অনায়াসলব্ধ। মা-বাপের ঘটিয়ে দেওয়া বিয়ে। ছাঁদনাতলায় প্রথম শুভদৃষ্টি।

শুভদৃষ্টি!

তা তখন তো তাই ভেবেছিল অতসী। সেই দৃষ্টির সময় সমস্তখানি মন একটি শুভলগ্নের আশায় কম্পিত আবেগে থরথর করে উঠেছিল।

কিন্তু সে শুভলগ্ন তেমন করে প্রত্যাশার মুহূর্তে এসে দেখা দিল না। দিতে দিলেন না শ্বশুর। স্বার্থপর বৃদ্ধ, আপন সন্তানের আনন্দ আহ্লাদ সহ্য করবার ক্ষমতাও নেই তাঁর।

নইলে সত্যিই কি সে রাতে হার্টের যন্ত্রণায় মরমর হয়ে পড়েছিলেন তিনি? যে রাতে অতসীর জন্যে এ ঘরে ফুলের বিছানা পাতা হয়েছিল?

অতসী বিশ্বাস করেনি।

করেনি বাড়ির আর সকলের মুখের চেহারা দেখে। বিয়ে বাড়িতে ছিল তো কতজনা। সকলের মুখে যেন অবিশ্বাসের ছাপ।

তবু সকলেই লোক দেখানো আহা উঁহু হায় হায় করেছিল। সকলেই হুমড়ে পড়ে তাঁর ঘরে গিয়ে বসেছিল। তার সঙ্গে বসেছিল নতুন বিয়ের বরও। সমস্ত রাত ঠায় বসেছিল।

হাতে তার তখনও হলুদ মাখানো সুতো বাঁধা, রূপোর জাঁতিখানা সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে তখনও। যেমন ফিরছিল অতসীর হাতে কাজললতা।

স্বামীর মনের ভাব সেদিন বুঝতে পারেনি অতসী। বুঝতে পারেনি সেও তার বাপকে অবিশ্বাস করেছে কিনা।

কিন্তু শুধু সেদিন কেন?

কোন দিনই কি? কোন দিনই কি বুঝতে পেরেছে তাকে অতসী? শুধু তাঁকে দেখেছে ভেবেছে মানুষে কেন অকারণে রুক্ষ হয়, কেন নিষ্ঠুরতায় আমোদ পায়।

সবাই ওঘরে। শুধু একা অতসী ব্যর্থ ফুলশয্যার ঘরে খালি মাটিতে পড়ে থেকে কাটিয়ে দিয়েছিল।

একবার কি কাজে যেন সে ঘরে এসেছিল বিয়ের বরটা। এসেছিল কি একটা ওষুধ নিতে ব্যস্তভঙ্গীতে। তবু থমকে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল "এভাবে মাটিতে কেন? বিছানায় উঠে শুলে ভাল হত।"

বিছানা মানে সেই বিছানা।

যার উপর শিশি খানেক এসেন্স ঢেলে দিয়েছিল কে বা কারা, আর ফুল ছিল অনেক।

তারা হয়তো পাড়ার লোক, নিপর।

ভয়ানক একটা বিস্ময় এসেছিল সেদিন অতসীর।

ভেবেছিল ও কি সত্যিই মনে করেছিল অতসী মাটি থেকে উঠে একা শুই সুরভিসিক্ত রাজকীয় শয্যায় গিয়ে শোবে? এত নীরেট ও, এত ভাবলেশ শূন্য!

আর তা যদি না হয়, শুধু মৌখিক একটু ভদ্রতা মাত্র করতে এল ফুলশয্যার রাতে নব পরিণীতার সঙ্গে?

হৃদয়াবেগশূন্য এই সম্ভাষণে?

তবু তখনি মনকে সামলে নিল অতসী। ছি ছি একী ভাবছে সে? বাপের বাড়াবাড়ি অসুখ, এখন কি ও আসবে প্রিয়া সম্ভাষণে? তাহলেই তো বরং ঘৃণা আসতো অতসীর।

অতএব ধড়মড় করে উঠে বসে খুব আস্তে বলল, "আমি ওঘরে যাবো?"

"তুমি? না, তুমি আর গিয়ে কি করবে? তোমার যাবার কি দরকার? তুমি ঘুমোতে পার।"

বলে নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করে চলে গেল সে।

কী নীরস সংক্ষিপ্ত নির্দেশ! একটু মিষ্টি করে বলা যেত না?

তাড়াতাড়ি ভাবল অতসী, ছি ছি ওর বাবার অসুখ! যায় যায় অবস্থা!

আবার ভাবল, আচ্ছা, হঠাৎ যদি তাঁর কিছু হয়ে যায়! শিউরে উঠল ভাবতে গিয়ে।

তাহলে কী বলবে লোকে অতসীকে?

কত অপয়া!

কিন্তু বেশীক্ষণ ভাবতে হলনা, ঝি এসে ডাকল "নতুন বৌদিদি, পিসীমা বলছে ওঘরে গিয়ে বসতে। যাও শ্বশুরের পায়ে হাত বুলোও গে যাও। এখন কি হয় কে জানে! ছেলে-অন্ত প্রাণ তো! যত আবদার ছেলের ওপর। সেই ছেলে হাতছাড়া হয়ে গেল, শোকটা সামলাতে পারছে না মানুষটা।"

হাতছাড়া!

অতসীর মনে হল, জীবনে এত দিন যে ভাষায় কথা কয়ে এসেছে সে, শুনেছে যে ভাষায় কথা, শুধু সেইটুকু মাত্রই বাংলা ভাষার পরিধি নয়। এ ভাষা তার কাছে ভয়ঙ্কর রকমের নতুন।

তবু উঠে গেল সেবায় তৎপর হতে।

আর গিয়েই প্রথম ধরা পড়ল সেই সন্দেহটা।

না, কিছু হয়নি ভদ্রলোকের। অকারণ কাতরতা দেখিয়ে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছেন বড় ছেলের হাত দুখানা। স্বাভাবিক মুখ, স্বাভাবিক নিশ্বাস। যেটা অস্বাভাবিক সেটা চেষ্টাকৃত।

কিন্তু শুধুই কি সেই একদিন?

দিনের পর দিন নয়?

মিথ্যা সন্দেহ নয়। সত্যিই রোগের ভান করে রাতের পর রাত ছেলেকে আঁকড়ে বসে রইলেন বৃদ্ধ। ছেলের চোখের আড়াল হলেই না কি মারা যাবেন তিনি।

যতবারই পিসশাশুড়ী বলেছেন, "ক'রাত জাগছে ছেলেটা, এইবার একটু শুতে যাক দাদা?" ততবারই বৃদ্ধ ঠিক তন্মুহূর্তেই চেহারায় নাভিশ্বাসের প্রাক্-চেহারা ফুটিয়ে তুলে মুখে ফেনা তুলে মাথা চেলে গোঁ গোঁ করে একাকার করেছেন। 'গেল গেল' রব উঠে গেছে, মুখে গঙ্গাজল, কানে তারকব্রহ্ম নাম! কতক্ষণে একটু সামলানো।

বিয়ের অষ্টাহ এই ভাবেই কেটেছিল।

তা অষ্টাহই বা কেন, যতদিন বেঁচেছিলেন সেই অভিনেতা বৃদ্ধ, ততদিনই প্রায় একই অবস্থায় কেটেছে অতসীর। অনবরত হার্টফেলের ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে দীর্ঘ চারটি বছর কাটিয়ে অবশেষে সত্যই একদিন হার্টফেল করলেন তিনি! কিন্তু ততদিনে জীবনের রঙ বিবর্ণ হয়ে এসেছে অতসীর, দিন রাত্রির আবর্তন যেন একটা যন্ত্রের মত হয়ে উঠেছে।

তারপর সীতু কোলে এল।

নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক জীবনের মাঝখানে নিরুত্তাপ অভ্যর্থনা-হীন সেই আবির্ভাব!

দোষও দেওয়া যায় না কাউকে।

অভ্যর্থনার পরিবেশও নেই তখন। আচমকা ওপরওলার সঙ্গে খিটিমিটি করে চাকরী ছেড়ে দিয়েছে তখন সেই কাঠগোবিন্দ ধরনের মানুষটা। ছেলের জন্ম সংবাদে শুধু মুখটা একটু কুঁচকে বলল, "মেয়ে হয়ে এলে নুন খেয়ে খুন হতে হতো, সেই ভয়েই বোধকরি ছেলের মূর্তিতে এসেছে।"

পিসি সেই সেবার বিয়েতে এসেছিলেন, আবার এসেছেন এই উপলক্ষে। তিনি বললেন, "দেখ্ ছেলের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখ্ যেন সত্য দাদার মুখ! দাদাই আবার ফিরে এসেছেন রে, বড্ড আকর্ষণ ছিল তো তোর ওপর!"

ঘরের মধ্যে থেকে ভয়ে বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল অতসীর। এ কী ভয়ঙ্কর কথা! এ কী সর্বনেশে কথা! যে মানুষটা তার জীবনের রাহু ছিল আবার সে ফিরে এল!

অতসীর ধারণা হয়েছিল প্রথম মিলনের পরম শুভলগ্নটা ব্যর্থ হতেই জীবনটা এমন অভিশপ্ত হয়ে গেছে তার। মন্ত্রের ধ্বনি বাতাসে মিশিয়ে গেছে শক্তিহারা হয়ে, প্রেমের দেবতা প্রতীক্ষা করে হতাশ হয়েই বোধকরি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে যে শর ছুঁড়ে চলে গিয়েছেন, সে শর পঞ্চশরের একটাও নয়। আলাদা কিছু।

আলাদা কোন বিষবাণ!

আর এ সমস্তর কারণ একজন নিষ্ঠুর লোকের স্বার্থপরতা!

জীবনের দল ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পেল না, অবকাশ হল না পরস্পরের মধ্যে কোমল লাবণ্য মণ্ডিত একখানি পরিচয় গড়ে ওঠবার।

তার আগেই রেঁধেবেড়ে স্বামীকে ভাত বেড়ে দিতে হল অতসীকে, কাচতে হল তার ছাড়া ধুতি, জুতোয় কালি লাগাতে হল, হল ভাঁড়ারে কি ফুরিয়েছে তার হিসাব জানাতে।

কিন্তু সুযোগ আর অবকাশ পেলেই কি সেই নিতান্ত বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন নীরস আর বিরস ধরনের মনটা কোমল লাবণ্যে মণ্ডিত হয়ে উঠতে পারতো ?

কে জানে পারতো কিনা। কিন্তু এটা দেখা গেল স্বার্থপরতায় আর ফিচলেমিতে সে তার বাপের ওপরে যায়। নিজের ছেলের প্রতিই হিংসেয় কুটিল হয়ে উঠছে সে মুহুর্মুহু। ছেলে কাঁদলেই রুক্ষ গলায় ঘোষণা করবে সে, "দাও দাও গলাটা টিপে শেষ করে দাও, জন্মের শোধ চীৎকার বন্ধ হোক।" ছেলে রাতে জেগে উঠে জ্বালাতন করলে বলতো, "ভালো এক জ্বালা হয়েছে, সারাদিন খাটবো খুটবো আর রাতে তোমার সোহাগের ছেলের সানাই বাঁশি শুনবো। বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও আপদটাকে নিয়ে। দেব, এবার ঢাকী সুদ্ধুই বিসর্জন দেব।"

ছেলে নিয়ে ছাতে চলে যেত অতসী, শীতের দিনে হয়তো বা ভাঁড়ারের কোণে।

তা সারাদিনের 'খাটা খোটার' গৌরব বেশীদিন ব্যাখ্যানা করতে হল না সেই লোকটাকে, এক দুরারোগ্য ব্যাধি এসে বিছানায় পেড়ে ফেলল তাকে। আর তার এই দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী করলো সে শিশুটাকে। 'অপয়া লক্ষ্মীছাড়া' শিশুটাকে।

ছেলের সঙ্গে রেষারেষি।

অতসীর সাধ্য সামর্থ্য সময় সব নিয়োজিত হোক তার নিজের জন্যে। ওই লক্ষ্মীছাড়াটার কিসের দাবী ? বাসনমাজা ঝিটার কাছে পড়ে থাক্‌না ওটা! নয়তো বিলিয়েই দিকগে না ওকে অতসী!

এরপর তো ওই ছেলের হাত ধরে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে ? তা আগে থেকেই ভার মুক্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

নিজে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে ছেলের মরণ কামনা করেছে লোকটা।

"মরে না! আপদটা সরেও না! দেখছি কাঠবেড়ালীর প্রাণ!"

রোগবিকৃত মুখটা কুটিল হিংসেয় আরও বিকৃত হয়ে উঠতো।

দুরারোগ্য রোগ, এ ঘরে ছেলে নিয়ে শোওয়া চলেনা, আর সেই নিতান্ত শিশুটাকে সত্যিই রাতে একা ঘরে ফেলে রেখে দেওয়া যায় না। কিন্তু যে মন কোনদিনই যুক্তিসহ নয়, সে মন ভাগ্যের এইমার খেয়ে কি যুক্তিসহ হবে ? বরং আরও অবুঝ গোঁয়ার হয়ে ওঠে। ভাবে, ওই ছেলেটার ছুতো করে অতসী তার হাত থেকে পিছলে পালিয়ে যাচ্ছে।

জীবন তো গোণাদিনে পড়েছে, ফুরিয়ে আসছে জীবনের ভোগ, হাহাকার করা বুভুক্ষু চিত্ত নিংড়ে নিতে চায় শেষ ভোগরস।

যে মানুষগুলো আস্ত দেহ নিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ছিঁড়ে কুটে ফেলতে পারলে যেন তার আক্রোশ মেটে।

সেই হতভাগা লোকটার মনস্তত্ত্ব তবু বুঝতে পারতো অতসী, কিন্তু সীতু কেন এমন ? কোন কিছু না বুঝেই, ও কেন এমন হিংস্র ?

অন্তকে সুখী আর স্বচ্ছন্দ দেখলেই কি ওদের ভিতরের রক্তধারা শয়তানীর বিষবাষ্পে নীল হয়ে ওঠে ?

সকালবেলা জেগে উঠে দেখলো মৃগাঙ্ক ঘুমোচ্ছে, মুখে নির্মল একটা প্রশান্তি। দিনের বেলায় যেটা প্রায় দুর্লভ হয়ে উঠেছে। বদলে গেল মন, ভারি একটা আনন্দে ছলছল করতে করতে স্নান করতে গিয়েছিল অতসী, অনেক উপকরণে সমৃদ্ধ স্নানের ঘর।

কিন্তু স্নানের ঘর থেকে বেরিয়েই চমকে কাঁটা হয়ে গেল মৃগাঙ্কর প্রচণ্ড চীৎকারে।

ঘুম থেকে উঠেই কাকে এমন বকাবকি করছেন রাশভারী মৃগাঙ্ক ডাক্তার ? কেনই বা করছেন ? আবার কি সেদিনের মত জুতোর মধ্যে কাঁচের কুচি পেয়েছেন ?

না কাঁচের কুচি নয়, কাগজের কুচি।

কাগজের কুচি পেয়েছেন মৃগাঙ্ক। জুতোর মধ্যে নয়, জুতোর তলায়। যে কাগজের গোছাখানা কাল খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছিলেন মৃগাঙ্ক, হয়রান হয়েছিল অতসী। সকালবেলা বাড়ির সামনের ছোট্ট বাগানটুকুতে একপাক ঘুরে গাছ গাছালিগুলোর তদারক করা মৃগাঙ্কর বরাবরের অভ্যাস। আজও এসেছিলেন নেমে, এসে দেখলেন সারা জমিটায় কাগজের কুচি ছড়ানো।

সেই কালকের জার্নালখানা।

কে যেন দুরন্ত রাগে কুটি কুটি করে দাঁতে ছিঁড়ে ছড়িয়েছে !

কে ? কে ? কে করেছে এ কাজ ?

রাগে পাগলের মত হয়ে চেঁচামেচি করেছেন মৃগাঙ্ক, বাড়ির সবকটা চাকর বাকরকে ডেকে জড় করেছেন, তারপর হয়েছে রহস্য ভেদ।

আসামীকে এনে হাজিরও করেছে নেপ্‌বাহাদুর পাঁজাকোলা করে। কারণ অপরাধটা তার নিজের চক্ষে দেখা।

এখন অপরাধীর কানটা ধরে প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন মৃগাঙ্ক, আর প্রচণ্ড ধমক দিচ্ছেন, 'কেন করেছ এ কাজ ? বল কেন করেছ ? না বললে ছাড়বো না আমি।'

সকালবেলার ঘুমভাঙা মনে কোন অন্যায় দেখলে রাগটা বুঝি বেশীই হয়ে পড়ে। ঝাঁকুনির চোটে কানটা ছিঁড়ে যাবে মনে হচ্ছে।

অতসী নেমে এসেছে কোন রকমে একখানা শাড়িজামা জড়িয়ে, খুকুকে কোলে করে তার ঝিটাও।

'দাদা মাত্তে বাবা।'

হাঁ করে কেঁদে ওঠে খুকু।

আর অতসীর আর্তনাদটাও খুকুর মতই শোনায়।

'মরে যাবে যে ! কি করছ ?'

'অমন ছেলের মরাই উচিত।' বলে পরিস্থিতিটার দিকে একবার তাকিয়ে ধীরে ধীরে চলে যান মৃগাঙ্ক।

আস্তে আস্তে সকলেই চলে যায় আপন কাজে, সময় মত খায়-দায়। শুধু বাগানের এককোণে ঘাড় গুঁজে অভুক্ত বসে থাকে একটা দুর্মতি শিশু, আর নিজের ঘরের এককোণে তেমনি বসে থাকে অতসী। আজ বুঝি খুকুর কথাও মনে নেই তার।

মৃগাঙ্ককে দোষ দেবার তো মুখ নেই অতসীর, তবু তার প্রতিই অভিমানে ক্ষোভে মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। বারবার মনে হয়, সে একটা অবোধ শিশু বৈ তো নয়, তার প্রতি এত নিষ্ঠুরতা সম্ভব হল এ শুধু অতসীর একার সন্তান বলেই তো?

খিদের, গরমে ঘাড় গুঁজে বসে থাকার কষ্টে, আর কানের জ্বালায় দুঃখের অবধি নেই, তবু আজ মনে ভারি আনন্দ সীতুর।

বাবার খুব একটা অনিষ্ট করতে পারা গিয়েছে ভেবে খুব আনন্দ হচ্ছে তার। বোঝাই যাচ্ছে জিনিসটা খুব দরকারী।

হোক মার খেতে, হোক বকুনি খেতে, তবু সীতু এমনি করে জ্বালাতন করবে বাবাকে। দরকারি জিনিস নষ্ট করে দিয়ে, জুতোর মধ্যে কাঁচের কুচি পুরে, আর প্যাণ্টের পকেটে ধারালো ব্লেড্ ভরে রেখে।

ধারালো ব্লেড্। সীতুর মনের মতই ধারালো।

সেটা এখনো বাকি আছে।

প্যাণ্টের যে পকেটে টাকার ব্যাগ আর গাড়ির চাবি থাকে মৃগাঙ্কর, সেই পকেটের মধ্যে লুকিয়ে রাখবে সীতু সেই সংগ্রহ করে রাখা ব্লেড্খানা। পকেটে হাত ভরে জিনিস নিতে গেলেই, হি হি চমৎকার! আরো অনেক জ্বালাতনের চিন্তা করতে থাকে সীতু। জ্বালাতন করে করে বাবাকে মরিয়ে দিতে ইচ্ছে হয় তার।

হঠাৎ কোথা থেকে কাদের কথা কানে আসে। ফিস ফিস কথা।

কি কথা এসব?

কার কথা? কার গলা?

'য্যাতোই হোক, কাঁচা ছেলে বৈ তো নয়, করে ফেলেছে একটা অকম্ম, তা বলে কি আর অমন মারটা মারে? আপনার ছেলে হলে কি আর পারতো?'

এ গলা বাসন মাজা ঝি সুখদার।

উত্তর শোনা যায় বামুন-মেয়ের গলায়, 'তুই থাম্ সুখী, নিজের বাপে শাসন করে না? মেরে পাট করে দেয় না অমন ছেলেকে? ছেলের গুণ জানিস তুই? আমার বিশ্বাস পুঁটকে ছোঁড়া জানে সব। তা নইলে কর্তার ওপর অত আক্রোশ কিসের?'

বিহ্বল হয়ে এদিক ওদিক তাকায় সীতু।

কার কথা বলছে ওরা ?

কোন ছেলে সে ? কে তাকে শাসন করেছে ? 'নিজের বাপ' 'আপনার ছেলে' এ সব কী কথা ? কী জানে সীতু ?

ভয় ! ভয় !

হঠাৎ সমস্ত শরীরে কাঁপুনি দিয়ে ভয়ানক একটা ভয় করে আসে সীতুর। বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে যায়, আর ওর সেই আবছা আবছা ছবিটা কি রকম যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মনে পড়েছে, ঠিক মনে পড়েছে।

জানলায় বসা সেই ছেলেটা আর কেউ নয়, সীতু।

সীতু সে বাড়ির ! নল দিয়ে জলপড়া চৌবাচ্চাওলা ভাঙা ভাঙা সেই বাড়িটার। সীতু এখানের কেউ নয়, এদের কেউ নয়।

ভয়, ভয়, ভয়ানক ভয় !

কী কাঁপুনি !

কী কষ্ট ! ভয়ে এত কষ্ট হয় ?

আজ আর কিছুতেই কাজে মন বসে না মৃগাঙ্কর। নিজের সকালের সেই মাত্রাহীন অসহিষ্ণুতার কথা মনে পড়ে লজ্জায় কুণ্ঠায় বিচলিত হতে থাকেন।

ছি ছি, ক্রোধের এমন উন্মত্ত প্রকাশ মৃগাঙ্কর মধ্যে এল কি করে ? অত গুলো চোখের সামনে অমন নির্লজ্জ অসভ্যতা করলেন কি করে তিনি ? কানটা কি যথাস্থানে আছে ছেলেটার ? না ছিঁড়ে পড়ে গেছে ?

অতসী কি আজ কথা বলেছে ? খেয়েছে ? খুকুকে খাইয়েছে ?

বাড়ী গিয়ে কি অতসীকে দেখতে পাবে মৃগাঙ্ক ? না কি সে তার ছেলে নিয়ে কোথাও চলে গেছে ?

দু'লাইন চিঠির মারফতে নিষেধ করে গেছে খুঁজতে ?

বড় বেশী হয়ে গিয়েছিল !

কিন্তু ছেলেটা যে কিছুতেই কাঁদে না, দোষ স্বীকার করে না, 'আর করব না' বলে না ! মানুষের তো রক্তমাংসের শরীর ! কত সহ্য করা যায় ?

মনে করলেন, যদি ঈশ্বর অনুগ্রহে যথাযথ সব দেখতে পান, তাহলে নিজেকে আশ্চর্য্য রকম বদলে ফেলবেন তিনি।

অবহেলা করবেন ওই ছোট ছেলেটার সমস্ত দৌরাত্ম্য। শান্ত হবেন, সহিষ্ণু হবেন, উদার ক্ষমাশীল হবেন। আর কিছুতেই বিচলিত হবেন না।

ভাবলেন, ছি ছি, ও কি আমার রাগের যোগ্য, ও কি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ? ওর বাচ্চা বুদ্ধির শয়তানী কতটুকু ক্ষতি করতে পারবে ডাক্তার মৃগাঙ্ক মোহনের ?

অতসীর জন্যে মমতায় মনটা ভরে ওঠে। তার প্রতিও বড্ড অবিচার করা হয়ে যাচ্ছে। সত্যিই তো তার কি দোষ?

এতদিনের অসাবধানতা আর ত্রুটির পূরণ করে নেওয়ার মত জোরালো .কী নিয়ে গিয়ে দাঁড়ানো যায় অতসীর সামনে? কতটা স্নেহ সমাদর আদর?

ভাবতে ভাবতে আবার চিন্তার ধারা অন্য খাতে বইতে থাকে।

সীতু অত ওরকম করেই বা কেন?

এই বিকৃত বুদ্ধির কারণ কি শুধুই বংশগত? না কি ও মৃগাঙ্কর সঙ্গে নিজের সম্বন্ধটা বোঝে?

কেউ কি ওকে কিছু বলেছে?

কিন্তু কে বলে দেবে?

কার এত সাহস?

মৃগাঙ্কর আদেশ অমান্য করতে পারে এতবড় দুর্জয় সাহসধারী কে আছে? অতসীই বলেনি তো?

কিন্তু অতসীর তাতে স্বার্থ কি?

তবে কি ওর সব মনে আছে?

তাই কি সম্ভব?

কত বয়েস ছিল ওর তখন? বড় জোর দুই! কিন্তু তখন থেকেই কি ছেলেটা অমনি বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন নয়?

সেই প্রথম দিনকার স্মৃতি থেকে তন্ন তন্ন করে মনে করতে থাকেন, কে কাকে প্রথম বিরুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছিল। তিনি সীতুকে, না সীতু তাঁকে?

একেবারে প্রথম কবে দেখেছিলেন ওকে?

সুরেশ রায়ের সেই বাড়াবাড়ি অসুখের দিন না? চোখ উল্টে মুখে ফেনা ভেঙে একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছিল বললেই হয়।

অতসী পাংশুমুখে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল, বেতপাতার মত, আর রোগা কাঠিসার ছেলেটা অবিরত তাঁর আঁচল ধরে টানছিল আর কাঁদছিল—'মা তলে আয়, মা ওখান থেকে তলে আয়।'

দেখেই কেন কে জানে রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গিয়েছিল মৃগাঙ্কর। সহসা ইচ্ছে হয়েছিল ওটাকে টিকটিকি আরশোলার মত ধরে ছুঁড়ে ফেলে দেন ঘরের বাইরে।

সেই প্রথম দেখা!

সেই বিরূপতার সুরু।

তারপর অনেক ঝড়ের পর যখন অতসীকে নিয়ে এলেন ঘরে, বিবাহের দাবির মধ্য দিয়ে, তখন তার ছেলের যত্ন আদরের ত্রুটি রাখেননি ঠিক কথা, কিন্তু সেটা কি আন্তরিক?

আপন অন্তর হাতড়ে আজ সেই ছ'বছর আগের দিনগুলোকে বিছিয়ে ধরে নিরীক্ষণ করছেন মৃগাঙ্ক। দেখছেন যা কিছু করেছেন সীতুর জন্তে, তার সবটাই অতসীর মন প্রসন্ন রাখার তাগিদে, না কিছুটাও সত্যবস্তু ছিল?

হতাশ হচ্ছেন মৃগাঙ্ক, নিজের মনের চেহারা দেখে হতাশ হচ্ছেন। এমন করে তলিয়ে নিজেকে দেখা বুঝি কখনো হয়নি।

নইলে অনেক আগেই বুঝতে পারতেন, সেই রোগা হ্যাংলা কাঠিসার ছেলেটাকে কোন দিনই সহ্য করতে পারেননি তিনি। অবিরতই তাকে প্রতিদ্বন্দ্বীর মত মনে হয়েছে।

হোক সে অতসীর সন্তান, তবু তা'কে মৃগাঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বী বললে' ভুল হবে না। সে যে সুরেশ রায়েরও সন্তান, সে কথা বিস্মৃত হওয়া যাবে কি করে? সুরেশের সন্তান বলে কি অতসী ওকে এতটুকু কম ভালবেসেছে কোনদিন? বুঝি বা—মৃগাঙ্ক একটু থামলেন, তারপর আবার ভাবনাটাকে এগিয়ে দিলেন—বুঝি বা মৃগাঙ্কর সন্তানের চাইতে বেশীই ভালবাসে। হ্যাঁ বেশীই। মুখে যতই ঔদাসীন্য অবহেলা দেখাক, সীতুর দিকে তাকিয়ে দেখতে চোখে সুধা ঝরে ওর।

সেই, সেটাই অসহ্য মৃগাঙ্কর। সেই সুধাঝরা দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিস্নাত জীবটাও তাই অসহ্য ওকে অতসীর কাছাকাছি দেখলেই মনে পড়ে যায়, সেই কদর্য কুৎসিত রোগগ্রস্ত লোকটাকে মনে হয় তাকে কিছুতেই মুছে ফেলা যাবে না অতসীর জীবন থেকে।

তবু এখন আর এক দিক থেকে ভাবছেন মৃগাঙ্ক। তিনি যদি সেই শীর্ণ অপুষ্ট নিতান্ত অসহায় শিশুটাকে বিদ্বেষের মনোভাব নিয়ে না দেখতেন, যদি অতসীর সামনে সস্নেহ ব্যবহার করে, আর অতসীর আড়ালে জলন্ত দৃষ্টিতে না তাকাতেন ওর দিকে, তা' হলে হয়তো ছেলেটাও এত হিংস্র হয়ে উঠত না।

এত জাতক্রোধের ভাব থাকত না তার উপর।

কিম্বা কে জানে থাকত হয়তো। তার সহজাত সংস্কারই জাতক্রোধের মূর্তিতে ভিতর থেকে ঠেলা মারতো তাকে। সেই সংস্কারই তাকেও শেখাতো মৃগাঙ্ক ডাক্তারকে প্রতিদ্বন্দ্বীর চোখে দেখতে। ইতর প্রাণীরা তো আপন জন্মদাতাকেও তাই দেখে।

তবু আজ সত্যই অনুতপ্ত মৃগাঙ্ক ডাক্তার। সত্যই তাঁর ভাবতে লজ্জা হচ্ছে যে ভিতরের সমস্ত গলদ প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

অতসীকে কি তিনি আর সম্পূর্ণ করে পাবেন? তার মনের দরজা কি চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল না?

কিন্তু অতসীর সম্পূর্ণ মনটা কি তিনি কোনদিনই পেয়েছেন? পাওয়া যায় কি? কুমারী মেয়ের মন কোথায় পাবে, সংসারে পোড় খাওয়া একখানা পুরনো মন?

পুরনো জীবনের ওপর বিতৃষ্ণা ছিল অতসীর, কিন্তু সেই আগেকার আত্মীয় স্বজনের উপর তো কই বিতৃষ্ণা নেই!

ওই যে একটা মেয়ে মাঝে মাঝে আসে, অতসীকে 'কাকীমা কাকীমা' বলে বিগলিত হয় ও কি মৃগাঙ্কর ভাইঝি?

তাতো নয়। ওকে মৃগাঙ্ক চেনেনও না। ও সেই সুরেশ রায়ের ভাইঝি। সে এলে অতসীর মুখে যেন একটা নতুন লাবণ্যের আলো ফুটে ওঠে, তাকে আদর যত্ন করে খাওয়াবার চেষ্টায় তৎপর হয়ে ওঠে।

দেখে অবশ্য খুব ভাল লাগে না মৃগাঙ্কর, তবু বলেনও না কিছু। হঠাৎ একদিন, এই সেদিন, মেয়েটা না বলা না কওয়া দুম্ করে মৃগাঙ্ক ডাক্তারের ঘরে ঢুকে 'কাকাবাবু' বলে ঢিপ করে এক প্রণাম।

শিউরে উঠেছিলেন মৃগাঙ্ক।

মেয়েটা কিন্তু বেজায় সপ্রতিভ। তবে হৈ চৈ করে যতই সে মৃগাঙ্ককে 'কাকাবাবু' কাকাবাবু' করুক, মৃগাঙ্ক তো কিছুতেই পারলেন না তাকে সস্নেহে স্বচ্ছন্দে আত্মীয় বলে মেনে নিতে! বাচ্চা একটা ছেলের চিকিৎসার জন্যে অনুরোধ করলো সে মৃগাঙ্ককে, আড়ষ্টভাবে দেখে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন মৃগাঙ্ক, এই পর্যন্ত।

কেন আড়ষ্ট হলেন তিনি?

ভাবলেন মৃগাঙ্ক। অতসীর যে একটা অতীত ছিল এটা তো স্বীকার করে নিয়েই অতসীকে ঘরে এনেছিলেন, তবে কেন সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিতে পারেন না?

মেয়েরা ঈর্ষাপরায়ণ, মেয়েরা সপত্নী-অসহিষ্ণু, মেয়েরা কৈকেয়ীর জাত, কিন্তু পুরুষের উদারতার সোনাটুকু কি কোনদিন বাস্তব আঘাতের কষ্টিপাথরে ফেলে যাচাই করে দেখা হয়েছে?

এই তো। যাচাই করতে বসলে তো সব সোনাই রাং। মন থেকে প্রসন্ন হয়ে যদি সুরেশ রায়ের ভাইঝিকে গ্রহণ করতে পারতেন মৃগাঙ্ক, যদি পারতেন সুরেশ রায়ের সন্তানকে একেবারে নিতান্ত স্নেহের পাত্র বলে গ্রহণ করতে, তবেই না বলা যেত—পুরুষ মহৎ, পুরুষ উদার, পুরুষ স্ত্রীলোকের মত ঈর্ষাপরায়ণ ক্ষুদ্র চিত্ত নয়!

মৃগাঙ্ক ভাবলেন, সপত্ন সম্পর্ক সম্বন্ধে পুরুষ বোধকরি মেয়েদের চাইতে অনেক বেশী কুটিল ক্ষুদ্রচেতা ঈর্ষাপরায়ণ।

ভাবলেন, আরো অনেক আগে এভাবে আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত ছিল তাঁর।

"কে বলেছে এ কথা?"

তীক্ষ্ণ প্রশ্ন নয়, যেন হতাশ নিশ্বাস। সেই হতাশ নিশ্বাস থেকেই আবার প্রশ্ন হয়, "বলেছে বলেই তাই বিশ্বাস করেছ তুমি? তুমি কি পাগল?"

কিন্তু প্রশ্ন করবারই বা কি আছে? সীতু যে পাগল নয় এ প্রমাণ তো দিচ্ছে না। পাগলের মতই তো করছে সীতু। বিছানায় মাথা ঘসড়াচ্ছে, আর বলছে, "না, তুমি মিথ্যে কথা বলছো। আমার বাবা মরে গেছে। আমি এখানে থাকব না, আমি চলে যাব, আমি মরে যাব।"

"আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাকে থাকতে হবে না এখানে", অতসী তেমনি হতাশ কণ্ঠে বলে, "তোমার অন্য ব্যবস্থা করবো। শুধু যে কটা দিন তা না হচ্ছে, একটু শান্তিতে থাকতে দাও আমায়।"

"না না" পাগলের মতই গোঁ গোঁ করছে সীতু, 'আমি এক্ষুনি চলে যাব। আমি এক্ষুনি চলে যাব।"

"চলে যাবি! আমার জন্যে তোর মন কেমন করবে না?"

"না না না। তুমি খুকুর মা, তুমি এদের বাড়ীর লোক।"

অতসী এবার দপ্ করে জ্বলে উঠে দৃঢ়কণ্ঠে বলে, "রোসো, সত্যিই তোমাকে বোর্ডিংএ রাখবার ব্যবস্থা করছি আমি।"

"বলছি তো আমি এক্ষুনি চলে যাব।"

'যা তবে। কোন চুলোয় তোর সেই পূর্বজন্মের বাড়ি আছে, যা সেখানে। হবেই তো, এর চাইতে ভাল বুদ্ধি আর হবে কোথা থেকে? কৃতজ্ঞতা কি তোদের হাড়ে আছে? বলছি যত শীগগির পারি তোমায় বোর্ডিংএ দেব, আজ এক্ষুনি সেটা শুধু সম্ভব নয়। একটা দিন আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।'

"তুমি কেন মিথ্যে কথা বলেছিলে? কেন বলেছিলে ওটা আমার বাবা?"

'বেশ করেছি বলেছি।' একফোঁটা একটা ছেলের কাছে আর হারতে পারে না অতসী। নিষ্ঠুরতার চরম করবে সে। তাই ঝাঁজালো গলায় তেতো স্বরে বলে ওঠে, 'কি করবি তুই আমার? এখানে যদি না আসতিস, খেতে পেতিস না, পরতে পেতিস না, বাড়িওলা দূর দূর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতো, রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করতে হতো বুঝলি? যে মানুষটা এত যত্ন করে মাথায় করে নিয়ে এল, তাকে তুই—উঃ এই জন্যেই বলে দুধকলা দিয়ে সাপ পুষতে নেই!'

'মেরে ফেল, মেরে ফেল আমাকে।'

'মেরে তোকে ফেলব কেন, নিজেকেই ফেলবো।' অতসী গম্ভীর ভাবে বলে, 'সেইটাই হবে তোর উপযুক্ত শাস্তি।'

"কাকীমা!"

দরজার বাইরে থেকে ধ্বনিত হ'ল এই পরিচিত কণ্ঠটি। হ'ল বেশ শান্তকোমল স্বরেই,

কিন্তু সে স্বর অতসীর শুধু কানেই নয়, বুকের মধ্যে পর্যন্ত ঝনাৎ করে গিয়ে লাগল। লাগার সঙ্গে সঙ্গে হাত পা শিথিল হয়ে এল তার।

এ কী!

এ কী বিপদ! বেড়াতে আসার আর সময় পেল না শ্যামলী? এই যে ছেলেটা খাটের ওপর মুখগুঁজে গড়াগড়ি খাচ্ছে, এ দৃশ্য তো শ্যামলী এখনি এসে দেখে ফেলবে। কী কৈফিয়ৎ দেবে অতসী তার? শ্যামলী কি সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাবে না? ভাববে না কি কোথাও কোন ঘাটতি ঘটেছে? তাছাড়া সীতু ওকে দেখে আরও গোঁয়ার্তুমি, আরও বুনোমি করবে কি না, কে বলতে পারে? হয়তো ইচ্ছে করে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করবে যে অবস্থাকে কিছুতেই আয়ত্তে এনে সভ্য চেহারা দেওয়া যাবে না।

"কাকীমা আসছি।" পর্দায় হাত লাগিয়েছে শ্যামলী। মুহূর্তে সমস্ত ঝড় সংহত করে নিয়ে সহজ স্বাভাবিক গলায় কথা বলে ওঠে অতসী, "আয় আয়, বাইরে থেকে ডেকে পারমিশান নিয়ে—এত ফ্যাসান শিখলি কবে থেকে?"

শ্যামলী একমুখ হাসি আর বড় একবাক্স সন্দেশ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

নিজের খুসির ছটায় পারিপার্শ্বিকের দিকে দৃষ্টি পড়ে না শ্যামলীর, এগিয়ে এসে সন্দেশটা অতসীর দিকে বাড়িয়ে ধরে, "নিন! বাট্টুর সেরে ওঠার মিষ্টি খান!"

"কি আশ্চর্য! এসব কি শ্যামলী? না না এ ভারী অন্যায়!"

"অন্যায় মানে? অতদিন ধরে ভুগছিল ছেলেটা, আমরা তো হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। কোনও ডাক্তার রোগ ধরতে পারছিল না। ডাক্তার কাকাবাবুর দু'দিনের দেখায় সেরে উঠল, এ আহ্লাদের কি শেষ আছে? নেহাৎ না কি ফুল চন্দন দিয়ে পুজো করা চলেনা, তাই কাকাবাবুকে একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে—"

ভারী বাক্যবাগীশ মেয়েটা।

কিন্তু দ্বিধা চিন্তা কিছু নেই, সাদাসিধে সরল। কথা যখন বলে, তাকিয়ে দেখে না তার প্রতিক্রিয়া কি হচ্ছে। এই জন্যেই তো সুরেশ রায়ের বংশের মধ্যে এই মেয়েটাকেই বিশেষ একটু স্নেহের চক্ষে দেখতো অতসী। সুরেশ রায়ের জ্যেঠতুতো দাদার মেয়ে। শ্যামলা রং, হাসিখুসি মুখ, গোলগাল গড়ন, বছর আষ্টেকের মেয়েটা, বিয়ের কনে অতসীর সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্রই অতসীর মন হরণ করে নিয়েছিল। শ্যামলীও কাকীমার মধ্যে যেন বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছিল।

তারপর তো অতসীর দিকে কত ঝড়, কত বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, আরও কত কি! আর শ্যামলীর দিকে প্রকৃতির অকৃপণ করুণা। স্কুলের পড়া সাঙ্গ হতে না হতেই ভাগ্যে জুটে গেছে দিব্যি খাসা বর, সংসার করছে মনের সুখে স্বাধীনতার আরাম নিয়ে। বড়লোক না হলেও অবস্থা ভাল, আর স্বামীটির প্রকৃতি অতীব ভাল। সরল, হাস্য মুখ। দুটো ছেলেমানুষে মিলে যেন খেলার সংসার পেতেছে!

বিধাতার আশ্চর্য নির্বন্ধ, সে সংসার পেতেছে অতসীরই বাড়ীর কখানা বাড়ী পরে। আগে জানত না দু'জনের একজনও, দেখা হয়ে গেল দৈবাৎ।

পাড়ার বইয়ের দোকানে সীতুকে নিয়ে তার নতুন ক্লাশের বই কিনতে গিয়েছিল অতসী, আর শ্যামলীও এসেছে ছোট ছেলের জন্যে রঙিন ছবির বই কিনতে। অসুস্থ ছেলে রেখে এসেছে ঘরে, তার মন ভোলাতে বাছাই করছে নানা রঙবেরঙের ছবি-ছড়া। ছেলে নিয়ে দোকানে উঠেই অতসী যেন পাথর হয়ে গেল!

এ কী অভাবিত বিপদ!

এই দণ্ডে কি সীতুকে টেনে নিয়ে দোকান থেকে নেমে যাবে অতসী? না কি না দেখার ভান করবে?

দুটোর কোনটাই হ'লনা, চোখোচোখি হয়ে গেছে। আর চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামলী লাফিয়ে উঠেছে, "কাকীমা!"

এরপর আর কি করে না দেখার ভান করবে অতসী? কি করে চট করে নেমে যাবে দোকান থেকে?

ফিকে হাসি হাসতেই হয়, মুখে কথা জোগাবার আগে। কিন্তু শ্যামলী ওসব ফিকে ঘোরালোর ধার ধারে না। পূর্বাপর ইতিহাস, বর্তমান পরিস্থিতি, কোন কিছুই তার উল্লাসকে রোধ করতে পারে না। দোকানের মাঝখানেই একে ওকে পাশ কাটিয়ে অতসীর গায়ে হাত ঠেকিয়ে বলে ওঠে, "ওঃ কাকীমা, কতদিন পরে! বাবাঃ!"

অতসীর প্রবল শক্তি আছে ঝড়কে মনের মধ্যে বহন করে বাইরে সহজ হবার, তবু বুঝি অবিচলিত থাকা সম্ভব হয় না। তবু বুঝি কথা কইতে ঠোঁট কাঁপে, "তুমি এখানে?"

"ওরে বাবা, আমাকে আবার তুমি! এই দুষ্টু মেয়েটাকে বুঝি ভুলেই গেছেন কাকীমা? ওসব চলবে না, 'তুই' বলুন!"

এবার অতসী সত্যিকার একটু হাসে, "বলছি। এখানে আর কি কথা হবে?"

"এখানে মানে? ছাড়বো না কি? ধরে নিয়ে যাব না? বইটই কেনা এখন থাক, চলুন চলুন। বাবাঃ, কত দিন পরে! আপনার কার জন্যে বই? ওমা সীতু না? কত বড়টি হয়ে গেছে ইস! কিন্তু সেই রকম রোগা আছে।"

কথা, কথা, কথার স্রোত একেবারে! দোকানের লোকেরা যে হাঁ করে শুনছে তাও খেয়াল নেই মেয়েটার।

শুধু ওই জন্যেই দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ে অতসী। কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলে, "তুমি এখানের দোকান থেকে কেনা কাটা কর বুঝি?"

"আবার 'তুমি!" অভ্যাস বদলান। এই দোকান থেকে কেনা কাটা করব না! এই তো পাড়া আমাদের। ওই মোড়ের মাথায় প্রকাণ্ড লালরঙা বাড়ীটা? ওখানেই একটা ফ্ল্যাটে থাকি। দোতলার ফ্ল্যাট। অত কথায় কাজ কি, চলুন।"

অতসী অনুভব করছে তার হাতের মধ্যে ধরা সীতুর হাতটা কাঠের মত শক্ত হয়ে উঠেছে, চকিত দৃষ্টি ফেলে দেখছে, যাকে বলে বিস্ময় বিস্ফারিত, তেমনি দৃষ্টি ফেলে নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে আছে সীতু এই বাক্যচ্ছটাময়ীর হাসিতে উচ্ছল খুসিতে টলমল মুখটার দিকে।

অমন করে দেখছে কেন?

শুধুই অপরিচিতার প্রতি শিশু মনের কৌতূহল? না কি এমন হাসিতে উচ্ছল খুসিতে টলমল মুখ সে জীবনে কখনো দেখেনি বলে অবাক হয়ে গেছে?

নয় তো কী! নয় তো কী! মনে মনে শিউরে উঠছে অতসী, এই আকস্মিকতার সূত্র ধরে এক বিস্মৃত অতীতকে মনে পড়ে যাচ্ছে সীতুর? পরতে পরতে খুলে পড়ছে চেতনার কোনও স্তর?

এ কী বিপদ, এ কী বিপদ!

অন্যমনস্ক মেয়েটা কি শুধুই অন্যমনস্ক? ভেবেছিল সেদিন অতসী। না কি এই অজস্র কথার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভয়ঙ্কর একটা ভারী জিনিসকে ঠেলে পার করে নিয়ে যেতে চায় সে? তাই অন্যমনস্কতার ভান করে এই ঢেউ দেওয়া, ঢেউয়ে ভাসিয়ে দেওয়া।

শুধু কথা নয়, রাস্তার মাঝখানে প্রায় হাত ধরেই টানাটানি করেছিল সেদিন শ্যামলী অতসীকে, তবু হেসে মিনতি করে সে অনুরোধ কাটিয়ে পালিয়ে এসেছিল অতসী, আর নিতান্ত ভদ্রতার দায়ে নিতান্ত মৌখিক ভাবেই বলতে বাধ্য হয়েছিল, "বেশ তো, তুইও তো চলে আসতে পারিস!"

"ও বাবা! সে আবার বলার অপেক্ষা?" শ্যামলী হেসে উঠেছিল, "সে তো আমি না বলতেই যাবো। গিয়ে গিয়ে পাগল করে তুলবো। একবার যখন সন্ধান পেয়ে গিয়েছি।"

তা কথা রেখেছে শ্যামলী। কেবলই এসেছে। অতসী অস্বস্তি পাচ্ছে কি বিব্রত হচ্ছে, সে চিন্তা মাথায় আসেনি তার। ওকে দেখলে অতসীর মনটা স্নেহে কোমল হয়ে আসে—কেবলমাত্র নিজস্ব এই একটা অদ্ভুত সুখানুভূতির রোমাঞ্চে, যেন নিষিদ্ধ ভালবাসার স্বাদ পায় তবু অতসীর পূর্বজীবনের একটা টুকরো যে বারবার এসে মৃগাঙ্কর চোখকে আর মনকে ধাক্কা মেরে যাবে, এটাতেও স্বস্তি পায় না।

কিন্তু এই অবুঝ ভালবাসাকে ঠেকাবেই বা সে কি করে? কি করে বলবে "তুই আর আসিস না শ্যামলী!"

তার উপর আর এক ঝামেলা।

শ্যামলী তার ছেলেকে দেখাতে চায় মৃগাঙ্ক ডাক্তারকে। শুনে মনটা বোদা বিস্বাদ হয়ে

গিয়েছিল অতসীর। বেশ একটা বিরক্তি এসে গিয়েছিল তার উপর। এ তো বড় ঝঞ্ঝাট! এ আবার কী উপদ্রব! মনে হয়েছিল, নাঃ এ সবে দরকার নেই, স্পষ্টাস্পষ্টিই বলে দেবে শ্যামলীকে, এতে অতসী অস্বস্তি বোধ করে।

কিন্তু বলতে গিয়েও বলা যায় না। তাই ছেলের কী এমন হয়েছে সেটাই জিজ্ঞেস করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

কী হয়েছে!

সেইটাই তো রহস্য!

কী যে হয়েছে বুঝতে পারছে না কোনও ডাক্তার বদ্যি। লক্ষণের মধ্যে, শুধু পায়ের হাড়ে ব্যথা, শুধু দুর্বলতা। অথচ বারবার 'এক্সরে' করেও ব্যথার কোনও উৎস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যথেষ্ট পরিমাণে যথোপযুক্ত খাইয়েও দুর্বলতা ঘোচানো যাচ্ছে না।

মৃগাঙ্ক যে 'বোন্' স্পেশালিষ্ট এটা যেন শ্যামলীরই গ্রহমুক্তির একটা নিদর্শন!

"মনে আশা হচ্ছে কাকীমা, এতদিনে হয়তো ফাঁড়া কাটল। নইলে খোকার যা অসুখ করেছে, ডাক্তার কাকাবাবু ঠিক তারই স্পেশালিষ্ট হলেন কেন!" বলেছিল শ্যামলী।

অতসী অবাক হয়ে চেয়ে দেখেছিল ওর মুখের দিকে। কী সুখী এই নির্বোধ মানুষগুলো! এরা কত সহজেই সহজ হতে পারে!

বোঝা গেল না শ্যামলীকে।

কি করে যাবে? কোন অমানবিকতায়? একটা শিশুর দুরারোগ্য ব্যাধির কাছে কি অতসীর তুচ্ছ মানসিক বাধার প্রশ্ন?

বিবেককে কী জবাব দেবে, যদি শ্যামলীকে ফিরিয়ে দেয়?

বলতে হ'ল মৃগাঙ্ককে।

মৃগাঙ্ক রাগ করল না, বিদ্রূপ করল না, আপত্তিও করল না, শুধু অতসীর মুখের দিকে একবার স্পষ্ট পরিষ্কার চোখে চেয়ে বললো, "নিয়ে এস।"

তা নিজে নিয়ে আসেনি অতসী। শ্যামলীকেই পাঠিয়ে দিয়েছিল ছেলে সঙ্গে দিয়ে, এবং গম্ভীরমূর্তি মৃগাঙ্কমোহন গভীর যত্নের সঙ্গেই দেখেছিলেন রোগীকে। আর জানিয়েছিলেন, হাড়ে কিছুই হয়নি, ব্যথার উৎস পেশীতে।

দুর্বলতা?

সেটা ভুল চিকিৎসার প্রতিক্রিয়া।

বার দুই দেখা আর ওষুধ দেওয়াতেই অদ্ভুতভাবে কাজ হ'ল। অতসী এতটা আশা করেনি।

ওদিকে শ্যামলী আর তার স্বামী বিগলিত।

তারপর থেকে দ্রুত উন্নতি হয়েছে। বেড়েছে ওজন। সেই ওজন বাড়ার সূত্র ধরেই আজ শ্যামলীর এত দুঃসাহস।

হ্যাঁ, সেই কথাটাই মনে হল অতসীর। মৃগাঙ্ককে সন্দেশ খাওয়াতে চায়! কী দুঃসাহস, কী ধৃষ্টতা!

অথচ শ্যামলীকে বলা চলে না সে কথা। তাই হাত পেতে নিতে হয় সেই সন্দেশ সম্ভার। যেটা বিপদের ডালির মত!

"ছেলেকে এবার আনিস একদিন।" বললো অতসী, "এখন তো হাঁটতে পারবে।"

"ও বাবা নিশ্চয়!"

শ্যামলী কেন সাধারণ ভদ্রতা বা সাধারণ সৌজন্যটুকুর মানে বোঝে না? কেন সেই মুখের কথাটাই বড় করে ধরে?

আজ যেন ফেরার তাড়া মাত্রও নেই শ্যামলীর, জাঁকিয়ে বসে কথা কইছে তো কইছেই।

"বুঝলেন কাকীমা, আপনার জামাই বলেন, 'ডাক্তার কাকাবাবু শুধু ডাক্তারই নয়, যাদুকরও। নইলে দেখালামও তো এ পর্যন্ত কমজনকে নয়, কেউ বুঝতে পারল না, আর উনি দেখলেন আর—"

"মোটেই ভাল ডাক্তার নয়!"

হঠাৎ একটা তীব্র তীক্ষ্ণ রূঢ় মন্তব্যে শিউরে চমকে উঠল ঘরের আর দুজন।

বিছানার কোণ থেকে চেঁচিয়ে উঠেছে সীতু।

"ওমা, ও কিরে সীতু, ও কথা বলতে আছে?" শ্যামলী অবাক হয়ে বলে, 'খুব ভাল ডাক্তার তো!"

"ছাই ভাল।" বিদ্বেষে তিক্ত শিশুর কণ্ঠ কি কুৎসিত! ভাবল অতসী।

আর শ্যামলী ভাবল ছেলেমানুষের ছেলেমানুষী। নিশ্চয় কোন কারণে বাপের ওপর রাগ হয়েছে ছেলের। পরক্ষণেই ভাবল—তা' বাপ ছাড়া আর কি? উপকারী আর স্নেহশীল মানুষকে পিতৃতুল্যই বলা হয় বৈ কি। ইনি যদি এমন উদারচিত্ত না হতেন, কোথায় আজ দাঁড়াত অতসী? কে জানে কোথায় ভেসে যেত সীতু!

ওবাড়ীর ছোটকাকার কী না কী অবস্থা ছিল, শ্যামলী তো আর ভুলে যায়নি? কী হালে কাটিয়েছে অতসী আর সীতু, তাও দেখেছে সে।

আর এখন?

এই রাজপুরীর কুমার হয়ে সুখের সাগরে গা ভাসিয়ে থাকা! কম ভাগ্য! এ বাড়ীর সাজসজ্জা আরাম আয়োজন ঔজ্জ্বল্য চাকচিক্য শ্যামলীকে মুগ্ধ করে।

বাড়ীতে বরের সঙ্গে আলোচনাও করে খুব।

মৃগাঙ্ক যদি এমন মহৎ না হতেন, মৃগাঙ্ক যদি এমন ধর্মনিষ্ঠ না হতেন, কী হতো অতসীর দশা?

সুরেশের মৃত্যুর পর অতসীর প্রতি মৃগাঙ্কর যে ভাব জেগেছিল, সে শুধু নারীরূপের মোহ? শুধুই বেওয়ারিশ একটা মানুষের প্রতি উচ্ছৃঙ্খল লুব্ধতা?

তা যদি হত, বিবাহের সম্মান দিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে আসতেন? কী দরকার ছিল? তা না দিয়েও, ঘরে ঢোকবার অধিকার না দিয়েও, সেই মালিকহীন রূপবতীকে উপভোগ করবার বাধাটা কোথায় ছিল, যদি অভাবগ্রস্ত এবং মোহগ্রস্ত অতসী আত্মসমর্পণ করে বসতো?

বাধা সমাজও দিত না, আইনও দিত না। পুরুষের এ দুর্বলতা গ্রাহ্যের চক্ষেই আনত না কেউ।

অতসীকে? তা হয়তো সবাই ছিছিক্কার করতো, কিন্তু তাছাড়া আর তো কিছু করতো না!

মৃগাঙ্ক না দেখলে সুরেশ রায়ের আত্মীয় সমাজ ডেকে শুধোতো কি তাকে, "হ্যাঁ গো এখন তোমার কি ভাবে চলবে?" বলতো কি, "সীতুকে মানুষ করে তুলবে কি করে?"

ভাড়া দিতে না পারলে বাড়ীওলা যদি তাড়িয়ে দিত? সীতুর হাত ধরে অতসী কারও বাড়ীর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে সে কি দরজা খুলে ধরতো?

না, মানবিকতার প্রশ্ন নিয়ে কেউ এগিয়ে আসতো না। নেহাৎ যদি অতসী মান অপমানের মাথা খেয়ে কারুর পায়ে গিয়ে কেঁদে পড়তো, চক্ষুলজ্জার দায়ে সে হয়তো দিত এতটুকু ঠাঁই, একমুঠো ভাত, কিন্তু প্রতিদিন দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জলে সে অন্নের ঋণ শোধ করতে হতো।

নিম্পরের বাড়ীর দাসত্বে মাইনে আছে, মর্যাদা আছে। আত্মীয়জনের বাড়ীর দাসত্বে দুটোর একটাও নেই। উল্টে আছে গঞ্জনা, লাঞ্ছনা, অবমাননা।

দুঃখে পড়ে আত্মীয়ের কাছে আশ্রয় নেওয়ার চাইতে বড় দুঃখ বোধকরি জগতে দ্বিতীয় নেই।

বেশ করেছে অতসী, ঠিক করেছে।

দুজনেই বলেছিল ওরা—শ্যামলী আর শ্যামলীর বর, "ঠিক করেছেন কাকীমা।"

বলেছিল, "ছেলেটাকে পথের ভিখিরি হবার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন উনি।"

"তাছাড়া ভালবাসারও একটা মর্যাদা দিতে হয় বৈ কি", বলেছিল শ্যামলী। "ইনি, মানে ডাক্তারবাবু, কাকীমাকে সত্যিকার স্নেহের চক্ষে, ভালবাসার চক্ষে দেখেছিলেন।"

"তাতো সত্যি", বলেছিল তার বর, "নইলে আর বিবাহের মর্যাদা দেন?" আরও বলেছিল সে সীতুকে লক্ষ্য করে "লাকী বয়! ধর, তোমার কাকীমার যদি শুধু ওই মেয়েই থাকে, আর ছেলে না হয়, ওই অত সম্পত্তি, সব কিছুর মালিক তোমাদের সীতু। আর হয়ও যদি, বেশ কিছু তো পাবেই।"

কাজেই বাকী বয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত-চিত্ত শ্যামলী সীতুর এই সহসা উগ্র হয়ে ওঠা রূঢ়তায় বিস্মিত না হয়ে, হেসে উঠে বলে, "কি হল? হঠাৎ এত রাগ কিসের সীতুবাবুর?"

আশ্চর্য! আশ্চর্য!

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে সীতু, অতসীর অবিচলিত অম্লান মুখ থেকে সহসা উত্তর উচ্চারিত হচ্ছে, "আরে দেখনা, ওর পেটব্যথা করছে, ওষুধ খেয়ে কমেনি, তাই অত মেজাজ! সেই থেকে পড়ে পড়ে ছটফট করছিল—"

"ওমা তাই বুঝি!" হি হি করে হেসে ওঠে শ্যামলা, "সত্যিই তো বাপু, মেজাজ তো হতেই পারে। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!"

মায়ের ওই অবিচলিত মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় বলেই কি সীতু আর কথা বলতে পারে না?

"মেয়েটি কে গো বৌদিদি?"

বামুন-মেয়ের উগ্র কৌতূহল আর বাঁধ মানে না, মনিবানীর ভ্রূভঙ্গীর ভয়েও না। সে কৌতূহল উক্ত প্রশ্নের আকারে এসে আছড়ে পড়ে অতসীর কাছে।

অতসী ভ্রূভঙ্গী করে।

বলে, "কোন মেয়েটি?"

"ওই যে কেবলই আসে যায়, দাদাবাবুকে অসুখ ছেলে এনে দেখায়, এইতো আজও এসেছিল—"

"আমার ভাইঝি।"

গম্ভীর কণ্ঠে বলে অতসী।

"ভাইঝি!" বামুন-মেয়ের বিস্ময় যেন আকাশে ওঠে। "ভাইঝি যদি তো, তোমায় কাকীমা বলে কেন গো?"

"বলে, ওর বলতে ভাল লাগে।" অতসী কঠিন মুখে বলে, "কে কাকে কি বলে ডাকে, তা নিয়ে তোমার এত মাথা ঘামানোর কি আছে?"

"ওমা শোন কথা! মাথা ঘামানো আবার কি? ডাকটা কানে বাজলো তাই বলেছি। দেখিনি তো ওকে কখনো এর আগে। আমি তো আজকের নই, কত কালের। তোমার শাশুড়ীর আমল থেকে আছি। এদের যে যেখানে আছে সবাইকে জানি চিনি।" সগর্বে ঘোষণা করে বামুন-মেয়ে।

"ভালই তো!" বলে চলে যায় অতসী, আর মনে ভাবে ঠিক এই কারণেই তোমাকে আগে বিদায় করা দরকার। আমার সমস্ত নিশ্চিন্ততার ওপর কাঁটার প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে তোমায় দেব না আমি।

কিন্তু 'দেব না' বললেই তো চলেনা। পুরনো হয়ে দাঁড়ালে কাঁটাগাছেরও মাটির ওপর একটা স্বত্ব জন্মায়, শিকড়ের বন্ধন জোরালো হয়। তাকে উৎপাটিত করতে অনেক শক্তি লাগে।

কারণ তো একটা থাকা চাই? অনেক দিনের শিকড়কে উৎপাটিত করবার উপযুক্ত কারণ সুরেশ রায়ের ভাইঝির পরিচয় চেয়েছিল সে, এই অপরাধে বরখাস্ত করা যায়?

নিতান্ত বুদ্ধিসম্পন্নরাও মাঝে মাঝে বোকা হয়ে যায়, এ দৃষ্টান্ত আছে। অতসীর আজকের কাজটা সেই দৃষ্টান্তে একটা নতুন সংযোজন। নইলে কি দরকার ছিল ওর মৃগাঙ্কর সামনে শ্যামলীর আনা সেই প্রকাণ্ড মিষ্টির বাক্সটা নিয়ে আসা? খেতে বসেছিল মৃগাঙ্ক, অতসী বাক্সটা টেবিলে নামিয়ে চামচ করে সন্দেশ তুলে পাতে দিতেই মৃগাঙ্ক বলে ওঠেন, "এত সন্দেশ! কেউ তত্ত্ব টত্ত্ব পাঠিয়েছে না কি?"

"তত্ত্ব নয়," অতসী মৃদুস্বরে বলে, "শ্যামলীর ছেলের অসুখ সেরে গেছে বলে আহ্লাদ করে"—

"শ্যামলী কে?" ভুরু কুঁচকে বলে ওঠেন মৃগাঙ্ক।

"শ্যামলী!" অতসী থতমত খেয়ে বলে "শ্যামলী, মানে সেই মেয়েটি যার ছেলের অসুখে তুমি—"

থেমে গেল অতসী। দেখল মৃগাঙ্কর ভুরুটা আরো বেশী কুঁচকে উঠেছে, হাতের আঙুল কটা উঠেছে কঠিন হয়ে, সেই কঠিন আঙুলের ডগা দিয়ে সন্দেশ দুটো ঠেলে রাখছে থালার কোণে। মুহূর্তে সহসা কঠিন হয়ে উঠল অতসীও। যে স্বরে কখনো কথা বলে না সেই স্বরে বলল, "খাবে না?"

মৃগাঙ্ক গম্ভীর স্বরে বলেন, "না।"

অতসীরও বুঝি সীতুর হাওয়া লেগেছে, জেগেছে বুনো গোঁ, তা নয়তো অমন জিদের স্বরে বলে কেন, "না খাবার কারণ?"

"ইচ্ছে নেই।"

"কেন ইচ্ছে নেই বলতে হবে।"

"বলতেই হবে?"

বিদ্রূপে তিক্ত শোনাল মৃগাঙ্কর কণ্ঠ।

আশ্চর্য! এই সেদিন না মৃগাঙ্ক ডাক্তার মনকে উদার করার দীক্ষা নিচ্ছিলেন? মন্ত্রপাঠ করেছিলেন সহনশীলতার? ভাবছিলেন, অতসীর যে একটা অতীত আছে, সেটা ভুলে গেলে চলবে কেন? অথচ কিছুতেই তো সামান্য ওই বাটাছানার মিহি সন্দেশ দুটো গলাধঃকরণ করতে পারলেন না। তিক্তকণ্ঠে বললেন, "বলতেই হবে?"

"হ্যাঁ বলতেই হবে।" স্বভাব-বহির্ভূত জেদি স্বরে রুক্ষ নির্দেশ দেয় অতসী, "বলতেই হবে, বাধা কিসের? প্রতিবেশীর ঘর থেকে মিষ্টি দিলে লোকে খায় না?"

"প্রতিবেশী! ও হ্যাঁ, নতুন একটা পয়েন্ট আবিষ্কার করেছ দেখছি। কিন্তু প্রতিবেশীর পরিচয় বহন করেই কি সে এখানে এসেছিল?"

"ঠিক কথা, তা সে আসেনি। কিন্তু যে পরিচয়েই আসুক, তার অপরাধটা কোথায় জানতে পারি কি?"

মৃগাঙ্ক মোহনের কি সামলে যাওয়া উচিত ছিল না? ভাবা উচিত ছিল না, অতসী তো কই কখনো এমন করে না? সত্যি স্ত্রীর অধিকারে তর্কাতর্কি জেদাজেদি, অথবা ঔদ্ধত্যপ্রকাশ, এ কবে করেছে অতসী? হয় নিজেকে লুকিয়ে রাখা কুণ্ঠিত মৃদু ভাব, নয়তো বিগলিত অভিভূত কৃতজ্ঞতা। অতসীর আজকের এ রূপ নতুন, অপরিচিত। তবু তো কই নিজেকে সামলালেন না মৃগাঙ্ক, বরং যেন আগুনে ইন্ধন দিলেন। বলে উঠলেন, "অপরাধ কারুর কোথাও নেই অতসী, অপরাধী আমিই। সুরেশ রায়ের আত্মীয়ের হাতের সন্দেশ খাবার রুচি আমার নেই।"

স্পষ্ট স্বীকারোক্তি!

বোধকরি এতটা স্পষ্টতা আশা করে নি অতসী, তাই স্তব্ধ হয়ে গেল সে, সাদা হয়ে গেল মুখ। তারপর আস্তে আস্তে আরক্ত হয়ে উঠল সে মুখ। তারপর কথা কইল আস্তে আস্তে। বলল "এক সময় আমিও ওই নামের লোকেরই আত্মীয় ছিলাম।"

মৃগাঙ্ক এবার বোধকরি একটু সামলে নিলেন নিজেকে। বললেন, "বৃথা উত্তেজিত হচ্ছো কেন? কারণটা যখন সামান্য। এই সন্দেশটা খেলাম কি না খেলাম, কি এসে গেল তাতে?"

"প্রশ্নটা সন্দেশ খাওয়ার নয়", স্থির স্বরে বলে অতসী, "প্রশ্নটা হচ্ছে রুচি না হওয়ার। প্রশ্ন হচ্ছে সহ্য করতে পারা না পারার। সাদাসিধে হাসিখুসি কমবয়সী একটা মেয়ে এক আধবার তোমার বাড়ীতে বেড়াতে আসে, সেটুকু সহ্য করবার মত উদারতা তুমি খুঁজে পাচ্ছনা দেখতে পাচ্ছি।"

মৃগাঙ্ক আবার যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠেন, "সেটা দেখতে পাচ্ছ অতসী, কারণ মন তোমার আচ্ছন্ন হয়ে আছে সন্দেহে আর অভিমানে। তবু জিজ্ঞেস করি, যদিই হয়ে থাকে, এই সঙ্কীর্ণতা কি খুব অস্বাভাবিক?"

"অন্ততঃ যে কোন বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিকও নয়। তুমি কি জানতে না আমার একটা অতীত আছে, আর জীবনের ছাব্বিশ সাতাশটা বছর ধরে আমি সমাজ সংসারের বাইরেও কাটাইনি? আমার সেই জীবনে কারুর ওপর একটু স্নেহ জন্মাবে না এটাই বা হবে কেন?"

মৃগাঙ্কর খাওয়া শেষ হয়েছিল, তিনি চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "আমি তো

বলিনি অতসী.· 'হবে না,' 'হওয়া উচিত নয়,' 'হওয়া অস্বাভাবিক' ? তুমি যাকে খুসি এবং যত খুসি স্নেহ করে বেড়াওনা, আমি তো আপত্তি করতে যাচ্ছি না। শুধু এইটুকু চাইছি, আমাকে তার মধ্যে জড়াবার চেষ্টা না কর।"

অতসী কী আজ ক্ষেপে গেছে ?

ও কি মস্তবড় একটা বোঝাপড়া করতে চায়—শুধু মৃগাঙ্কর সঙ্গে নয়, নিজের সঙ্গেও ? নইলে এমন করে কথা কাটাকাটি করছে সে কি করে ? এতগুলো বছরের মধ্যে অতসী মৃগাঙ্কর মুখের উপর একটি উঁচু কথা কয় নি।

আজ শুধু কথাই উঁচু নয়, গলাও উঁচু অতসীর।

"তাই বা চেষ্টা করব না কেন ? আমি যদি তোমার পরিচিত সমাজ থেকে নির্লিপ্ত থাকতে চাই ? তোমার প্রীতিকর হবে সেই অবস্থাটা ?"

মৃগাঙ্ক একটু ভুরু কোঁচকালেন, তারপর ঈষৎ ব্যঙ্গে বললেন, "হয়তো হবে না। তবু এটাই স্বীকার করে নেব, জীবনে সব কিছুই প্রীতিকর জোটে না।"

'ও: তাই !" অতসী সহসা খুব শান্ত গলায় বলে, "তাই এই নীতিতেই তাহলে সীতুকে মেনে নিয়েছিলে তুমি ? তোমার অগাধ অসীম উদারতায় নয় ?"

এবার বুঝি স্তব্ধ হবার পালা মৃগাঙ্ক মোহনের।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বলেন, "নিজেকে আমি মস্ত এক উদার ব্যক্তি বলে কোনদিনই প্রচার করে বেড়াইনি অতসী !"

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যান মৃগাঙ্ক ডাক্তার।

আর অতসী কাঠের মত বসে থাকে সেই খাবার টেবিলেরই ধারের একটা চেয়ারে। এখানে যে এখুনি চাকর বাকর এসে পড়বে, সে খেয়াল থাকে না তার।

এ কী করলো সে ?

এ কী করলো ?

কেঁচো খুঁড়তে, সাপ তুলে বসলো ?

মৃগাঙ্ককে ছোট করতে গিয়েছিল সে ? ছি ছি ছি ! তা করতে গিয়ে কত ছোট হয়ে গেল নিজে !

মৃগাঙ্ক স্তব্ধ হয়ে গেল !

যাবেই তো।

সীমাহীন স্পর্দ্ধা আর সীমাহীন অকৃতজ্ঞতা, মানুষকে মূক করে দেওয়া ছাড়া আর কি করতে পারে ?

ডাক্তার মৃগাঙ্ক মোহনের সময় নেই অতসীর মত মন রোমন্থন করবার। তবু আজ

আর গাড়ীর ষ্টিয়ারিঙ্ নিজের হাতে নিলেন না তিনি, ড্রাইভারের হাতে ছেড়ে দিয়ে পিছনে বসলেন হেলান দিয়ে, ভাবতে লাগলেন অতসীর অভিযোগ কি ভিত্তিহীন ?

সত্যি বটে, সীতুর অসভ্যতা তাঁকে এত পীড়িত করে যে, কিছুতেই তার প্রতি মনকে প্রসন্ন করে তুলতে পারেন না, কিন্তু ওই মেয়েটা ? ওর প্রতি অপ্রসন্নতা আসতে পারে এমন কোন ব্যবহার তো ও করেনি ? খুব একটা কুৎসিত কুরূপ, অমার্জিত কি অভব্য, এমনও নয়। সত্যিই অতসী যা বলেছে, সাদাসিধে সরল হাসি খুসি মেয়ে !

তবু—

তবু ওকে দেখলে বিরক্তিতে মন বিষিয়ে ওঠে কেন মৃগাঙ্কর ?

কেবলমাত্র সুরেশ রায়ের সম্পর্কিত বলেই তো ? অতসীর দেওয়া অপবাদ কি তাহলে মিথ্যা ?

অনেকবার চেষ্টা করলেন মৃগাঙ্ক সেই মেয়েটার প্রতি মনকে সহজ করেছেন এই অবস্থাটা কল্পনা করতে। ভাবলেন সহাস্যে তাকে বলছেন, "খুব তো সন্দেশ খেলাম, ছেলে কেমন আছে ? আর কোন অসুবিধা নেই তো ?" পারলেন না, কল্পনা করতেই মনটা বিস্বাদ বোদা হয়ে উঠল !

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ নিজের কাছে স্বীকার করলেন মৃগাঙ্ক, জীবনের এই জটিলতার জাল থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না। হতে গেলে—অতসীর ভাষায় যে 'অসীম অগাধ উদারতা' থাকা প্রয়োজন, তা অন্ততঃ মৃগাঙ্কর নেই।

কিন্তু কারোরই কি থাকে ?

এ রকম ক্ষেত্রে ?

যে বস্তু অসহনীয় তাকে মন থেকে সহ্য করতে কে পারে ?

সপত্নী সম্পর্কটা সহ্য করবার বস্তু নয়।

অনেকদিন পরে এক বন্ধুর বাড়ী গেলেন মৃগাঙ্ক।

কলেজের বন্ধু সতীনাথ।

বিশেষ করে এই বন্ধুর বাড়ী যাবার একটু তাৎপর্য্য আছে। বন্ধুটি কিছু বছর হলো বিপত্নীকের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন, ছিলেন কিছুদিন সে খাতায়। কিন্তু বছর দুই হ'ল আবার সেখান থেকে নাম খারিজ করে নিয়েছেন, আবার সগৌরবে 'সস্ত্রীক' বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, আত্মীয়জনের বাড়ীর কাজকর্মে 'স-পরিবারে' নেমন্তন্ন খেয়ে আসছেন।

দ্বিতীয়বার মস্তক মুণ্ডনের সময়ও বন্ধুবান্ধবদের নেমন্তন্ন করেছিল সতীনাথ, মৃগাঙ্ক ইচ্ছে করেই যান নি। অথবা যেতে ইচ্ছে হয় নি।

এতদিন বিপত্নীক অবস্থায় কাটিয়ে, বছর আড়াইয়ের মেয়েটাকে আট দশ বছরের করে

তুলে, তারপর আবার বিয়ে করা, খুব খেলোমি ঠেকেছিল মৃগাঙ্কর। তদবধি বড় একটা দেখা সাক্ষাৎও হয়নি। সময় হয়নি, কর্মব্যস্ত পৃথিবীতে সভ্য শহুরে লোকগুলোর যে মরবারও সময় থাকে না।

বন্ধুর বাড়ী গিয়ে আড্ডা দেওয়া?

স্বাদ ভুলে গেছে লোকে সেই পরম রমণীয়তার।

বিনা উদ্দেশ্যে বন্ধুর বাড়ীতেও আর যায় না কেউ। যায় না মানে যেতে পারে না। সময় হয় না।

মৃগাঙ্ক ডাক্তার আজ বার করলেন সময়।

কাজের থেকে চুরি করে নিলেন খানিকটা সময়।

কিন্তু মৃগাঙ্কই কি বন্ধুর বাড়ী গেলেন বিনা উদ্দেশ্যে?

যদিও বন্ধুর জীবনটা মৃগাঙ্কর নিজের জীবনের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত, তবু ইচ্ছে হল মৃগাঙ্কর একবার বন্ধুর ওই বিড়ম্বনাময় জীবনটা দেখে আসেন। দেখেন তারা নিজেদেরকে কোন অবস্থায় রাখতে পেরেছে?

না, বিড়ম্বনাময় ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারলেন না মৃগাঙ্ক।

সতীনাথ হৈ হৈ করে ওঠেন, "আরে, আরে, এসো এসো! ব্যাপারটা কি? তোমার দর্শন?"

মৃগাঙ্ক ধীরে সুস্থে আসন গ্রহণ করে বললেন, 'দর্শনটা নিতান্তই যখন দুর্লভ হয়ে ওঠে, তখন এক পক্ষকে এগিয়ে আসতেই হয়।"

"খুব যা হোক নিলে এক হাত!" বললেন সতীনাথ, "অবিশ্যি নেবার অধিকার তোমার আছে। বাস্তবিকই ভারী কুড়ে হয়ে গেছি, কোথাও আর যেয়ে উঠতে পারি না।'

"বৃদ্ধস্য তরুণী হলে যা হয়!" বললেন মৃগাঙ্ক মৃদু হেসে।

"যা বল ভাই। বলে নাও যত পারো। তারপর তোমার খবর কি?'

"ভালই!" বললেন মৃগাঙ্ক।

এই নিরুত্তাপ 'ভালই'য়ের পর কথাটা যেন স্রোত হারিয়ে থেমে গেল। থেমে যে গেল তার প্রমাণ পাওয়া গেল সতীনাথের পরবর্তী কথায়—"কি রকম গরম পড়েছে দেখেছ?"

"দেখছি, খুব পড়েছে।"

গরম হয়তো সত্যিই বেশী পড়েছে। কিন্তু সেটা কখনই দুই বন্ধুর আলোচ্য বিষয় হতে পারে না, যদি না তাদের কথায় ভাঁড়ার ফাঁকা থাকে।

"বোসো একটু চায়ের কথা বলি," বলে সতীনাথ উঠলেন, দরজার কাছে গিয়ে হাঁক পাড়লেন, "ঠাকুর!"

মৃগাঙ্ক বাধা দিলেন, "এই শোন, মিথ্যে কেন চেঁচামেচি করছো, জানোই তো আমি রোগীর বাড়ীর পোষাকে কিছু খাই না"

"ও হো হো তাও তো বটে! তা' এখনও সে অভ্যাসটি বজায় রেখেছ? এ যুগে তো কেউই ওসব শুদ্ধাচারের বিধি নিষেধ মানে না হে!"

"শুদ্ধাচার বলতে কি বোঝায় জানি না সতী, আচার যদি বল তো বলতে পারি ডাক্তারের ছুঁৎমার্গ হচ্ছে বুদ্ধিমানের আচার। স্বাস্থ্যবিধির বিধি নিষেধ কোন যুগেই অচল হয়ে যায় না, ওটা চিরযুগের।"

"তোমার এ কথাটি মানতে পারলাম না ভাই" বললেন সতীনাথ, "বিধি নিষেধেরও ধারা পাল্টায়। সমাজরক্ষার মতই স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিও নিত্য বদলাচ্ছে। পুরোপুরি কাঠামোটাই বদলাচ্ছে। দেখ, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন দেখেছি জ্বরবিকারের রুগীকে এক ফোঁটা জল খেতে দেওয়া হ'ত না, ঘরের জানলা খোলবার জো নেই, গায়ে কম্বল চাপা, আর এখন? তেমন রুগীকে জল খাইয়েই রেখে দিচ্ছ তোমরা, গায়ে ঢাকা দেবার দরকার বোধ কর না, আর জানলা খোলা ছেড়ে খোলা বারান্দায় শুইয়ে রাখতেও বোধ হয় আপত্তি নেই। এ তো একটা মাত্র উদাহরণ, কি জ্বরে, কি শূল বেদনায়, কি শিশু পালনে, কি প্রসূতি পরিচর্যায়, আগের থিয়োরি তো কিছুই নেই। বল, আছে?"

"তা নেই বটে?" হাসলেন মৃগাঙ্ক, "তবে আক্ষেপেরও কিছু নেই।"

"আক্ষেপের কথা হচ্ছে না। আমি বলছি, একসময় ভাল ভাল পাশ করা ডাক্তাররাও তো সেই পদ্ধতিতে চলে এসেছে, আজ যে পদ্ধতিকে তোমরা সেকেলে বলছ। সেই পদ্ধতিতেই চলে 'হাত যশ' দেখিয়েছে, বিখ্যাত হয়েছে, অথচ আজ তোমরা তাদের অজ্ঞতার কথা ভেবে কৃপা করছ তাদের। পরবর্তীকাল আবার তোমাদের অজ্ঞতায় হাসবে।"

মৃগাঙ্ক মোহন হেসে উঠে বলেন, "তা' এসব তো জানা কথা, এখন আসলে তোমার বক্তব্যটা কি?'

"বক্তব্য কিছুই নয়, শুধু বলছি আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাও ওইভাবে দ্রুত বদলাচ্ছে, কিন্তু এর শেষ কোথায় জানো?"

"না তা' জানি না।" আবার হাসেন মৃগাঙ্ক।

"শেষ হচ্ছে—সতীনাথ প্রায় উত্তেজিত ভাবে বলেন, "আবার সেই আদিমকালের মাতৃতন্ত্র। আমি বলছি মৃগাঙ্ক, সেদিনের খুব বেশী দিন নেই, যেদিন আবার ফিরে আসবে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ।"

"হঠাৎ এত বড় ভবিষ্যৎ বাণী?"

"যা দেখছি ভাই! কেন তুমি দেখতে পাচ্ছ না, 'বাড়ীর কর্ত্তা' বলে শব্দটা স্রেফ্ উঠে

গেছে। গিন্নীরাই সব, গিন্নীদেরই সমস্ত, গিন্নীর অঙ্গুলি নির্দেশে সারা সংসার চলছে। গিন্নীর কাজের প্রতিবাদ করেছ কি আগুন জ্বলেছে! দেখছ না? টের পাচ্ছ না?"

এতক্ষণে বুঝতে পারেন মৃগাঙ্ক আসল ব্যথাটা সতীনাথের কোথায়। মৃদু হেসে বলেন, "তোমার মতন অতটা টের বোধহয় পাচ্ছি না"

"তা হলে বুঝতে হবে তুমি ভাগ্যবান ব্যক্তি! তোমার গৃহিনী এ যুগের ব্যতিক্রম। আমার অবস্থা বুঝতেই পারছ, বন্ধু এসেছে, বামুনঠাকুরকে ডাকছি চা বানাতে। গৃহিনী হাওয়া! কখন বেরোন কখন ফেরেন, কতক্ষণ বাড়ীতে থাকেন কিছু জানি না। অনুগ্রহ করে যখন দেখা দেন কৃতার্থ হয়ে যাই। জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না—গিছলে কোথায়? আমার পোষ্ট হচ্ছে ব্যাঙ্কের। টাকা দরকার হলেই শুধু আমি।"

মৃগাঙ্ক বলেন, "তবে আবার কি, ওই তো যথেষ্ট। অর্থনৈতিক পরাধীনতা না আসা পর্যন্ত পুরুষসমাজ টিকে থাকবেই কোন রকমে। তাছাড়া—"

"আরে ভাই তাও তো যেতে বসেছে। আমার না হোক, পাড়ার অনেকের স্ত্রীই তো চাকরি-বাকরী করছে। আর দু'দিন বাদে বলবে তোমার ভাত আর খাব না।"

বন্ধুর সামনে গম্ভীর মৃগাঙ্ক সহসা বুঝি একটু তরল হয়ে ওঠেন, হেসে বলেন, "তাতেও চিন্তার কিছু নেই সতীনাথ, এমন দিন যদি আসে মেয়েরা একযোগে বলছে 'তোমাদের ঘরে আর শোবনা,' তবেই বুঝবে পুরুষের যথার্থ দুর্দিন এল। কিন্তু সে কথা আর ক'জন বলবে বল, ক'দিনই বা বলতে পারবে? আমাদের দেহবিজ্ঞান বলছে দেহাতীত হবার শক্তিতে মেয়ে পুরুষ দু'জনেই সমান কাঁচা। অবশ্য ব্যক্তিবিশেষ ব্যতিক্রম আছেই। কিন্তু সংসার যদি কর্তাপ্রধান না হয়ে গৃহিনীপ্রধানই হয়—ক্ষতি কি? তাঁরাই তো সংসার। তাঁদের জন্যেই তো সংসার।"

"ওহে বাপু, নিজে ভুক্তভোগী নয় বলেই বলতে পারছ এ কথা। যখন জুলজুল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হয় তোমার সংসারে তোমার কোন অধিকার নেই, তখন—"

"এক সময় আমাদের সমাজে মেয়েদের তো এই অবস্থাই ছিল সতীনাথ, আজ না হয় পুরুষের হ'ল।"

"বলা সোজা মৃগাঙ্ক"—সতীনাথ উত্তেজিত ভাবে বলেন, 'তোমার স্ত্রী যদি তোমার বিনা অনুমতিতে, তোমার সঙ্গে পরামর্শ মাত্র না করে, তোমার ছেলেটাকে বোর্ডিঙে দিয়ে আসে, আর কেবলমাত্র পাড়ায় চেঁচামেচি লোক জানাজানির ভয়ে তোমাকে সেই অত্যাচার সহ্য করতে হয়, বলতে পারবে এ কথা?"

মৃগাঙ্ক আর একবার বুঝলেন সতীনাথের যন্ত্রণাটা কোথায়। লোকটা চিরকালই হাসি খুসি স্ফূর্তিবাজ, তাই চট করে বোঝা যায় নি।

আর হাসলেন না, মৃদুস্বরে বললেন—"আমার পক্ষে ঠিক এ রকমটা বোঝার একটু অসুবিধে আছে সতী, কারণ আমার বাড়ীর ছেলেটা আমার ছেলে নয়। তুমি যে

অবস্থাটার বর্ণনা করলে, আমি হয়তো তেমন অবস্থায় পড়লে বেঁচেই যাই কিন্তু তা হবার আশা নেই। আমার স্ত্রী সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। স্বাধীন ভাবে কিছু করা যায়, এ তিনি যেন ভাবতেই পারেন না।"

"আবার বলব ভাই তুমি ভাগ্যবান! স্বাধীনা স্ত্রী নিয়ে আমার—" হঠাৎ গলাটা বুজে এল সতীনাথের, একটু পরে গলা ঝেড়ে মৃদুস্বরে বললেন, "বিশ্বাস করতে পারো, আমাকে না বলা না কওয়া, আমার মেয়েটাকে, আমার একলার মেয়েটাকে—বোর্ডিংএ ভর্তি করে দিয়েছে!"

মৃগাঙ্ক তীব্র বিদ্রূপে বলে ওঠেন, 'দিয়েছেন, খুব ভালই করেছেন, কিন্তু তুমি সেটা মেনেও তো নিয়েছ দেখতে পাচ্ছি।"

"কী করবো বল ভাই, করবার আছে কি? যা খুসি তাই করে ও, আর ওর বান্ধবীদের সঙ্গে আড্ডা দিতে—নিজের কানে শুনেছি আমি, বাহাদুরী করে বলে বেড়ায় "পুরুষমানুষ কোথায় জব্দ জানিস, কেলেঙ্কারীর ভয়ের কাছে। তাই কেয়ার করি না আমি ওকে, মারতে তো পারবে না, আমাদের পিতামহী প্রপিতামহীদের আমলের মত? তবে আর ভয়টা কি?" বোঝ ভাই, যে মেয়েমানুষ এমন কথা বলতে পারে, তাকে কী করা যায়?"

"মারাই যায়!" আরও তীব্রস্বরে বলে ওঠেন মৃগাঙ্ক, "আমাদের সেই চলতি কথাটা ভুলে গেছ সতীনাথ? 'হাতে না মেরে ভাতে মারা'! তুমি ওঁর সঙ্গে সমস্ত সহযোগিতা ত্যাগ করে অপরিচিতের মত থাকতে পারো। দেখ কাকে কার আগে প্রয়োজন হয়।'

'সে কি আর হয়?" সতীনাথ ক্ষুণ্ণভাবে বলেন, "সমাজে সংসারে বাস করে তা চলে না!"

"না চলবার কী আছে? এ তো ঠাণ্ডা লড়াই।"

"ঠাণ্ডাই তাণ্ডা হয়ে ওঠেরে ভাই! আত্মবন্ধুকে জবাবদিহি করতে হবে না? আমার পারিবারিক জীবনের ওপর সমাজের সহস্র চক্ষু তীব্র হয়ে নেই?"

"বেশ তো, তেমন প্রশ্ন ওঠে, স্পষ্টই বলবে স্ত্রীর সঙ্গে আমার বনে না।" রায় দেওয়ার ভঙ্গীতে—কথা শেষ করে একটা সিগারেট ধরান মৃগাঙ্ক। সতীনাথ ধূমপায়ী নয়, তাই একাই ধরান।

সতীনাথ মিনিট খানেক সেই অলস ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, "ওইখানেই তো মেরে রেখেছে ভাই! 'স্ত্রীর সঙ্গে আমার বনে না' এতবড় লজ্জার কথা কি উচ্চারণ করা সহজ? ওর থেকে অগৌরব আর কি আছে? লোকের কাছে ওই মাথা হেঁট হবার ভয়ই এত সহ্য করতে বাধ্য করাচ্ছে। সুখ নেই, শান্তি নেই, অন্তরঙ্গতা নেই, ষ্টেজের থিয়েটারের মত প্রতিনিয়ত শুধু প্লে করে চলেছি!"

সতীনাথের ভাষা সাদা-মাটা, কিন্তু ভাবটা মৃগাঙ্কর হৃদয়কে স্পর্শ করে। না, একেবারে উড়িয়ে দিতে তিনি পারেন না বন্ধুর মর্মকথা। এ তো একা সতীনাথের জীবনের অভিশাপ নয়, এ হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার অভিশাপ।

কিন্তু প্রশ্ন করবারই বা কি আছে? সীতু যে পাগল নয় এ প্রমাণ তো দিচ্ছে না। পাগলের মতই তো করছে সীতু। বিছানায় মাথা ঘষড়াচ্ছে, আর বলছে, "না তুমি মিথ্যে কথা বলছো। আমার বাবা মরে গেছে। আমি এখানে থাকব না, আমি চলে যাব, আমি মরে যাব।"

"আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাকে থাকতে হবে না এখানে", অতসী তেমনি হতাশ কণ্ঠে বলে, "তোমার অন্য ব্যবস্থা করবো। শুধু যে কটা দিন তা না হচ্ছে, একটু শান্তিতে থাকতে দাও আমায়!"

"না না" পাগলের মতই গোঁ গোঁ করছে সীতু, 'আমি এক্ষুনি চলে যাব। আমি এক্ষুনি চলে যাব।"

"চলে যাবি! আমার জন্যে তোর মন কেমন করবে না?"

"না না না। তুমি খুকুর মা, তুমি এদের বাড়ীর লোক।"

অতসী এবার দপ্ করে জ্বলে উঠে দৃঢ়কণ্ঠে বলে, "রোসো, সত্যিই তোমাকে বোর্ডিংএ রাখবার ব্যবস্থা করছি আমি।"

"বলছি তো আমি এক্ষুনি চলে যাব।"

'যা তবে। কোন চুলোয় তোর সেই পূর্বজন্মের বাড়ি আছে, যা সেখানে। হবেই তো, এর চাইতে ভাল বুদ্ধি আর হবে কোথা থেকে? কৃতজ্ঞতা কি তোদের হাড়ে আছে? যদিও যত শীগগির পারি তোমায় বোর্ডিংএ দেব, আজ এক্ষুনি সেটা শুধু সম্ভব নয়। একটা দিন আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।'

"তুমি কেন মিথ্যে কথা বলেছিলে? কেন বলেছিলে ওটা আমার বাবা?"

'বেশ করেছি বলেছি।' একফোঁটা একটা ছেলের কাছে আর হারতে পারে না অতসী। নিষ্ঠুরতার চরম করবে সে। তাই ঝাঁজালো গলায় তেতো স্বরে বলে ওঠে, 'কি করবি তুই আমার? এখানে যদি না আসতিস, খেতে পেতিস না, পরতে পেতিস না, বাড়িওলা দূর দূর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতো, রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করতে হতো বুঝলি? যে মানুষটা এত যত্ন করে মাথায় করে নিয়ে এল, তাকে তুই—উঃ এই জন্যেই বলে দুধকলা দিয়ে সাপ পুষতে নেই!'

'মেরে ফেল, মেরে ফেল আমাকে।'

'মেরে তোকে ফেলব কেন, নিজেকেই ফেলবো।' অতসী গম্ভীর ভাবে বলে, 'সেইটাই হবে তোর উপযুক্ত শাস্তি।'

"কাকীমা!"

দরজার বাইরে থেকে ধ্বনিত হ'ল এই পরিচিত কণ্ঠটি। হ'ল বেশ শান্তকোমল স্বরেই,

কিন্তু সে স্বর অতসীর শুধু কানেই নয়, বুকের মধ্যে পর্যন্ত ঝনাৎ করে গিয়ে লাগল। লাগার সঙ্গে সঙ্গে হাত পা শিথিল হয়ে এল তার।

এ কী!

এ কী বিপদ! বেড়াতে আসার আর সময় পেল না শ্যামলী? এই যে ছেলেটা খাটের ওপর মুখগুঁজে গড়াগড়ি খাচ্ছে, এ দৃশ্য তো শ্যামলী এখনি এসে দেখে ফেলবে। কী কৈফিয়ৎ দেবে অতসী তার? শ্যামলী কি সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাবে না? ভাববে না কি কোথাও কোন ঘাটতি ঘটেছে? তাছাড়া সীতু ওকে দেখে আরও গোঁয়ার্তুমি, আরও বুনোমি করবে কি না, কে বলতে পারে? হয়তো ইচ্ছে করে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করবে যে অবস্থাকে কিছুতেই আয়ত্তে এনে সভ্য চেহারা দেওয়া যাবে না।

"কাকীমা আসছি।" পর্দায় হাত লাগিয়েছে শ্যামলী। মুহূর্তে সমস্ত ঝড় সংহত করে নিয়ে সহজ স্বাভাবিক গলায় কথা বলে ওঠে অতসী, "আয় আয়, বাইরে থেকে ডেকে পারমিশান নিয়ে—এত ফ্যাসান শিখলি কবে থেকে?"

শ্যামলী একমুখ হাসি আর বড় একবাক্স সন্দেশ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

নিজের খুসির ছটায় পারিপার্শ্বিকের দিকে দৃষ্টি পড়ে না শ্যামলীর, এগিয়ে এসে সন্দেশটা অতসীর দিকে বাড়িয়ে ধরে, "নিন! বাট্টুর সেরে ওঠার মিষ্টি খান!"

"কি আশ্চর্য! এসব কি শ্যামলী? না না এ ভারী অন্যায়!"

"অন্যায় মানে? অতদিন ধরে ভুগছিল ছেলেটা, আমরা তো হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। কোনও ডাক্তার রোগ ধরতে পারছিল না। ডাক্তার কাকাবাবুর দু'দিনের দেখায় সেরে উঠল, এ আহ্লাদের কি শেষ আছে? নেহাৎ না কি ফুল চন্দন দিয়ে পুজো করা চলে না, তাই কাকাবাবুকে একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে—"

ভারী বাক্যবাগীশ মেয়েটা।

কিন্তু দ্বিধা চিন্তা কিছু নেই, সাদাসিধে সরল। কথা যখন বলে, তাকিয়ে দেখে না তার প্রতিক্রিয়া কি হচ্ছে। এই জন্যেই তো সুরেশ রায়ের বংশের মধ্যে এই মেয়েটাকেই বিশেষ একটু স্নেহের চক্ষে দেখতো অতসী। সুরেশ রায়ের জ্যেঠতুতো দাদার মেয়ে। শ্যামলা রং, হাসিখুসি মুখ, গোলগাল গড়ন, বছর আষ্টেকের মেয়েটা, বিয়ের কনে অতসীর সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্রই অতসীর মন হরণ করে নিয়েছিল। শ্যামলীও কাকীমার মধ্যে যেন বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছিল।

তারপর তো অতসীর দিকে কত ঝড়, কত বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, আরও কত কি! আর শ্যামলীর দিকে প্রকৃতির অকৃপণ করুণা। স্কুলের পড়া সাঙ্গ হতে না হতেই ভাগ্যে জুটে গেছে দিব্যি খাসা বর, সংসার করছে মনের সুখে স্বাধীনতার আরাম নিয়ে। বড়লোক না হলেও অবস্থা ভাল, আর স্বামীটির প্রকৃতি অতীব ভাল। সরল, হাস্য মুখ। দুটো ছেলেমানুষে মিলে যেন খেলার সংসার পেতেছে!

বিধাতার আশ্চর্য নির্বন্ধ, সে সংসার পেতেছে অতসীরই বাড়ীর কখানা বাড়ী পরে। আগে জানত না দু'জনের একজনও, দেখা হয়ে গেল দৈবাৎ।

পাড়ার বইয়ের দোকানে সীতুকে নিয়ে তার নতুন ক্লাশের বই কিনতে গিয়েছিল অতসী, আর শ্যামলীও এসেছে ছোট ছেলের জন্যে রঙিন ছবির বই কিনতে। অসুস্থ ছেলে রেখে এসেছে ঘরে, তার মন ভোলাতে বাছাই করছে নানা রঙবেরঙের ছবি-ছড়া। ছেলে নিয়ে দোকানে উঠেই অতসী যেন পাথর হয়ে গেল!

এ কী অভাবিত বিপদ!

এই দণ্ডে কি সীতুকে টেনে নিয়ে দোকান থেকে নেমে যাবে অতসী? না কি না দেখার ভান করবে?

দুটোর কোনটাই হ'লনা, চোখোচোখি হয়ে গেছে। আর চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামলী লাফিয়ে উঠেছে, "কাকীমা!"

এরপর আর কি করে না দেখার ভান করবে অতসী? কি করে চট করে নেমে যাবে দোকান থেকে?

ফিকে হাসি হাসতেই হয়, মুখে কথা জোগাবার আগে। কিন্তু শ্যামলী ওসব ফিকে ঘোরাপ্যাঁচের ধার ধারে না। পূর্বাপর ইতিহাস, বর্তমান পরিস্থিতি, কোন কিছুই তার উল্লাসকে রোধ করতে পারে না। দোকানের মাঝখানেই একে ওকে পাশ কাটিয়ে অতসীর গায়ে হাত ঠেকিয়ে বলে ওঠে, "ওঃ কাকীমা, কতদিন পরে! বাবাঃ!"

অতসীর প্রবল শক্তি আছে ঝড়কে মনের মধ্যে বহন করে বাইরে সহজ হবার, তবু বুঝি অবিচলিত থাকাসম্ভব হয় না। তবু বুঝি কথা কইতে ঠোঁট কাঁপে, "তুমি এখানে?"

"ওরে বাবা, আমাকে আবার তুমি! এই দুষ্টু মেয়েটাকে বুঝি ভুলেই গেছেন কাকীমা? ওসব চলবে না, 'তুই' বলুন!"

এবার অতসী সত্যিকার একটু হাসে, "বলছি। এখানে আর কি কথা হবে?"

"এখানে মানে? ছাড়বো না কি? ধরে নিয়ে যাব না? বইটই কেনা এখন থাক, চলুন চলুন। বাবাঃ, কত দিন পরে! আপনার কার জন্যে বই? ওমা সীতু না? কত বড়টি হয়ে গেছে ইস! কিন্তু সেই রকম রোগা আছে।"

কথা, কথা, কথার স্রোত একেবারে! দোকানের লোকেরা যে হাঁ করে শুনছে তাও খেয়াল নেই মেয়েটার।

শুধু ওই জন্যেই দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ে অতসী। কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলে, "তুমি এখানের দোকান থেকে কেনা কাটা কর বুঝি?"

"আবার 'তুমি!" অভ্যাস বদলান। এই দোকান থেকে কেনা কাটা করব না! এই তো পাড়া আমাদের। ওই মোড়ের মাথায় প্রকাণ্ড লালরঙা বাড়ীটা? ওখানেই একটা ফ্ল্যাটে থাকি। দোতলার ফ্ল্যাট। অত কথায় কাজ কি, চলুন।"

অতসী অনুভব করছে তার হাতের মধ্যে ধরা সীতুর হাতটা কাঠের মত শক্ত হয়ে উঠেছে, চকিত দৃষ্টি ফেলে দেখছে, যাকে বলে বিস্ময় বিস্ফারিত, তেমনি দৃষ্টি ফেলে নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে আছে সীতু এই বাক্যচ্ছটাময়ীর হাসিতে উচ্ছল খুসিতে টলমল মুখটার দিকে!

অমন করে দেখছে কেন?

শুধুই অপরিচিতার প্রতি শিশু মনের কৌতূহল? না কি এমন হাসিতে উচ্ছল খুসিতে টলমল মুখ সে জীবনে কখনো দেখেনি বলে অবাক হয়ে গেছে?

নয় তো কী! নয় তো কী! মনে মনে শিউরে উঠছে অতসী, এই আকস্মিকতার সূত্র ধরে এক বিস্মৃত অতীতকে মনে পড়ে যাচ্ছে সীতুর? পরতে পরতে খুলে পড়ছে চেতনার কোনও স্তর?

এ কী বিপদ, এ কী বিপদ!

অন্যমনস্ক মেয়েটা কি শুধুই অন্যমনস্ক? ভেবেছিল সেদিন অতসী। না কি এই অজস্র কথার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভয়ঙ্কর একটা ভারী জিনিসকে ঠেলে পার করে নিয়ে যেতে চায় সে? তাই অন্যমনস্কতার ভান করে এই ঢেউ দেওয়া, ঢেউয়ে ভাসিয়ে দেওয়া।

শুধু কথা নয়, রাস্তার মাঝখানে প্রায় হাত ধরেই টানাটানি করেছিল সেদিন শ্যামলী অতসীকে, তবু হেসে মিনতি করে সে অনুরোধ কাটিয়ে পালিয়ে এসেছিল অতসী, আর নিতান্ত ভদ্রতার দায়ে নিতান্ত মৌখিক ভাবেই বলতে বাধ্য হয়েছিল, "বেশ তো, তুইও তো চলে আসতে পারিস!"

"ও বাবা! সে আবার বলার অপেক্ষা?" শ্যামলী হেসে উঠেছিল, "সে তো আমি না বলতেই যাবো। গিয়ে গিয়ে পাগল করে তুলবো। একবার যখন সন্ধান পেয়ে গিয়েছি।"

তা কথা রেখেছে শ্যামলী। কেবলই এসেছে। অতসী অস্বস্তি পাচ্ছে কি বিব্রত হচ্ছে, সে চিন্তা মাথায় আসেনি তার। ওকে দেখলে অতসীর মনটা স্নেহে কোমল হয়ে আসে— কেবলমাত্র নিজস্ব এই একটা অদ্ভুত সুখানুভূতির রোমাঞ্চে, যেন নিষিদ্ধ ভালবাসার স্বাদ পায়, তবু অতসীর পূর্বজীবনের একটা টুকরো যে বারবার এসে মৃগাঙ্কর চোখকে আর মনকে ধাক্কা মেরে যাবে, এটাতেও স্বস্তি পায় না।

কিন্তু এই অবুঝ ভালবাসাকে ঠেকাবেই বা সে কি করে? কি করে বলবে "তুই আর আসিস না শ্যামলী!"

তার উপর আর এক ঝামেলা।

শ্যামলী তার ছেলেকে দেখাতে চায় মৃগাঙ্ক ডাক্তারকে। শুনে মনটা বোদা বিস্বাদ হয়ে

গিয়েছিল অতসীর। বেশ একটা বিরক্তি এসে গিয়েছিল তার উপর। এ তো বড় ঝঞ্ঝাট! এ আবার কী উপদ্রব! মনে হয়েছিল, নাঃ এ সবে দরকার নেই, স্পষ্টাস্পষ্টিই বলে দেবে শ্যামলীকে, এতে অতসী অস্বস্তি বোধ করে।

কিন্তু বলতে গিয়েও বলা যায় না। তাই ছেলের কী এমন হয়েছে সেটাই জিজ্ঞেস করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

কী হয়েছে!

সেইটাই তো রহস্য!

কী যে হয়েছে বুঝতে পারছে না কোনও ডাক্তার বদ্যি। লক্ষণের মধ্যে, শুধু পায়ের হাড়ে ব্যথা, শুধু দুর্বলতা। অথচ বারবার 'এক্সরে' করেও ব্যথার কোনও উৎস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যথেষ্ট পরিমাণে যথোপযুক্ত খাইয়েও দুর্বলতা ঘোচানো যাচ্ছে না।

মৃগাঙ্ক যে 'বোন্' স্পেশালিষ্ট এটা যেন শ্যামলীরই গ্রহমুক্তির একটা নিদর্শন!

"মনে আশা হচ্ছে কাকীমা, এতদিনে হয়তো ফাঁড়া কাটল। নইলে খোকার যা অসুখ করেছে, ডাক্তার কাকাবাবু ঠিক তারই স্পেশালিষ্ট হলেন কেন!" বলেছিল শ্যামলী।

অতসী অবাক হয়ে চেয়ে দেখেছিল ওর মুখের দিকে। কী সুখী এই নির্বোধ মানুষগুলো! এরা কত সহজেই সহজ হতে পারে!

বোঝা গেল না শ্যামলীকে।

কি করে যাবে? কোন অমানবিকতায়? একটা শিশুর দুরারোগ্য ব্যাধির কাছে কি অতসীর তুচ্ছ মানসিক বাধার প্রশ্ন?

বিবেককে কী জবাব দেবে, যদি শ্যামলীকে ফিরিয়ে দেয়?

বলতে হ'ল মৃগাঙ্ককে।

মৃগাঙ্ক রাগ করল না, বিদ্রূপ করল না, আপত্তিও করল না, শুধু অতসীর মুখের দিকে একবার স্পষ্ট পরিষ্কার চোখে চেয়ে বললো, "নিয়ে এস।"

তা নিজে নিয়ে আসেনি অতসী। শ্যামলীকেই পাঠিয়ে দিয়েছিল ছেলে সঙ্গে দিয়ে, এবং গম্ভীরমূর্তি মৃগাঙ্কমোহন গভীর যত্নের সঙ্গেই দেখেছিলেন রোগীকে। আর জানিয়েছিলেন, হাড়ে কিছুই হয়নি, ব্যথার উৎস পেশীতে।

দুর্বলতা?

সেটা ভুল চিকিৎসার প্রতিক্রিয়া।

বার দুই দেখা আর ওষুধ দেওয়াতেই অদ্ভুতভাবে কাজ হ'ল। অতসী এতটা আশা করেনি।

ওদিকে শ্যামলী আর তার স্বামী বিগলিত।

তারপর থেকে দ্রুত উন্নতি হয়েছে। বেড়েছে ওজন। সেই ওজন বাড়ার সূত্র ধরেই আজ শ্যামলীর এত দুঃসাহস।

হ্যাঁ, সেই কথাটাই মনে হল অতসীর। মৃগাঙ্ককে সন্দেশ খাওয়াতে চায়! কী দুঃসাহস, কী ধৃষ্টতা!

অথচ শ্যামলীকে বলা চলে না সে কথা। তাই হাত পেতে নিতে হয় সেই সন্দেশ সম্ভার। যেটা বিপদের ডালির মত!

"ছেলেকে এবার আনিস একদিন।" বললো অতসী, "এখন তো হাঁটতে পারবে।"

"ও বাবা নিশ্চয়!"

শ্যামলী কেন সাধারণ ভদ্রতা বা সাধারণ সৌজন্যটুকুর মানে বোঝে না? কেন সেই মুখের কথাটাই বড় করে ধরে?

আজ যেন ফেরার তাড়া মাত্রও নেই শ্যামলীর, জাঁকিয়ে বসে কথা কইছে তো কইছেই।

"বুঝলেন কাকীমা, আপনার জামাই বলেন, 'ডাক্তার কাকাবাবু শুধু ডাক্তারই নয়, যাদুকরও। নইলে দেখালামও তো এ পর্যন্ত কমজনকে নয়, কেউ বুঝতে পারল না, আর উনি দেখলেন আর—"

"মোটেই ভাল ডাক্তার নয়!"

হঠাৎ একটা তীব্র তীক্ষ্ণ রূঢ় মন্তব্যে শিউরে চমকে উঠল ঘরের আর দুজন।

বিছানার কোণ থেকে চেঁচিয়ে উঠেছে সীতু।

"ওমা, ও কিরে সীতু, ও কথা বলতে আছে?" শ্যামলী অবাক হয়ে বলে, 'খুব ভাল ডাক্তার তো!"

"ছাই ভাল।" বিদ্বেষে তিক্ত শিশুর কণ্ঠ কি কুৎসিত! ভাবল অতসী।

আর শ্যামলী ভাবল ছেলেমানুষের ছেলেমানুষী। নিশ্চয় কোন কারণে বাপের ওপর রাগ হয়েছে ছেলের। পরক্ষণেই ভাবল—তা' বাপ ছাড়া আর কি? উপকারী আর স্নেহশীল মানুষকে পিতৃতুল্যই বলা হয় বৈ কি। ইনি যদি এমন উদারচিত্ত না হতেন, কোথায় আজ দাঁড়াত অতসী? কে জানে কোথায় ভেসে যেত সীতু!

ওবাড়ীর ছোটকাকার কী না কী অবস্থা ছিল, শ্যামলী তো আর ভুলে যায়নি? কী হালে কাটিয়েছে অতসী আর সীতু, তাও দেখেছে সে।

আর এখন?

এই রাজপুরীর কুমার হয়ে সুখের সাগরে গা ভাসিয়ে থাকা! কম ভাগ্য! এ বাড়ীর সাজসজ্জা আরাম আয়োজন ঔজ্জ্বল্য চাকচিক্য শ্যামলীকে মুগ্ধ করে।

বাড়ীতে বরের সঙ্গে আলোচনাও করে খুব।

মৃগাঙ্ক যদি এমন মহৎ না হতেন, মৃগাঙ্ক যদি এমন ধর্ম্মনিষ্ঠ না হতেন, কী হতো অতসীর দশা?

সুরেশের মৃত্যুর পর অতসীর প্রতি মৃগাঙ্কর যে ভাব জেগেছিল, সে শুধু নারীরূপের মোহ? শুধুই বেওয়ারিশ একটা মানুষের প্রতি উচ্ছৃঙ্খল লুব্ধতা?

তা যদি হত, বিবাহের সম্মান দিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে আসতেন? কী দরকার ছিল? তা না দিয়েও, ঘরে ঢোকবার অধিকার না দিয়েও, সেই মালিকহীন রূপবতীকে উপভোগ করবার বাধাটা কোথায় ছিল, যদি অভাবগ্রস্ত এবং মোহগ্রস্ত অতসী আত্মসমর্পণ করে বসতো?

বাধা সমাজও দিত না, আইনও দিত না। পুরুষের এ দুর্বলতা গ্রাহের চক্ষেই আনত না কেউ।

অতসীকে? তা হয়তো সবাই ছিছিক্কার করতো, কিন্তু তাছাড়া আর তো কিছু করতো না!

মৃগাঙ্ক না দেখলে সুরেশ রায়ের আত্মীয় সমাজ ডেকে শুধোতো কি তাকে, "হ্যাঁ গো এখন তোমার কি ভাবে চলবে?" বলতো কি, "সীতুকে মানুষ করে তুলবে কি করে?"

ভাড়া দিতে না পারলে বাড়ীওলা যদি তাড়িয়ে দিত? সীতুর হাত ধরে অতসী কারও বাড়ীর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে সে কি দরজা খুলে ধরতো?

না, মানবিকতার প্রশ্ন নিয়ে কেউ এগিয়ে আসতো না। নেহাৎ যদি অতসী মান অপমানের মাথা খেয়ে কারুর পায়ে গিয়ে কেঁদে পড়তো, চক্ষুলজ্জার দায়ে সে হয়তো দিত এতটুকু ঠাঁই, একমুঠো ভাত, কিন্তু প্রতিদিন দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জলে সে অন্নের ঋণ শোধ করতে হতো।

নিস্পরের বাড়ীর দাসত্বে মাইনে আছে, মর্যাদা আছে। আত্মীয়জনের বাড়ীর দাসত্বে দুটোর একটাও নেই। উল্টে আছে গঞ্জনা, লাঞ্ছনা, অবমাননা।

দুঃখে পড়ে আত্মীয়ের কাছে আশ্রয় নেওয়ার চাইতে বড় দুঃখ বোধকরি জগতে দ্বিতীয় নেই।

বেশ করেছে অতসী, ঠিক করেছে।

দুজনেই বলেছিল ওরা—শ্যামলী আর শ্যামলীর বর, "ঠিক করেছেন কাকীমা।"

বলেছিল, "ছেলেটাকে পথের ভিখিরি হবার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন উনি।"

"তাছাড়া ভালবাসারও একটা মর্যাদা দিতে হয় বৈ কি", বলেছিল শ্যামলী। "ইনি, মানে ডাক্তারবাবু, কাকীমাকে সত্যিকার স্নেহের চক্ষে, ভালবাসার চক্ষে দেখেছিলেন।"

"তাতো সত্যি", বলেছিল তার বর, "নইলে আর বিবাহের মর্যাদা দেন?" আরও বলেছিল সে সীতুকে লক্ষ্য করে "লাকী বয়! ধর, তোমার কাকীমার যদি শুধু ওই মেয়েই থাকে, আর ছেলে না হয়, ওই অত সম্পত্তি, সব কিছুর মালিক তোমাদের সীতু। আর হয়ও যদি, বেশ কিছু তো পাবেই।"

কাজেই লাকী বয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত-চিত্ত শ্যামলী সীতুর এই সহসা উগ্র হয়ে ওঠা রূঢ়তায় বিস্মিত না হয়ে, হেসে উঠে বলে, "কি হল? হঠাৎ এত রাগ কিসের সীতুবাবুর?"

আশ্চর্য! আশ্চর্য!

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে সীতু, অতসীর অবিচলিত অম্লান মুখ থেকে সহসা উত্তর উচ্চারিত হচ্ছে, "আরে দেখনা, ওর পেটব্যথা করছে, ওষুধ খেয়ে কমেনি, তাই অত মেজাজ! সেই থেকে পড়ে পড়ে ছটফট করছিল—"

"ওমা তাই বুঝি!" হি হি করে হেসে ওঠে শ্যামলা, "সত্যিই তো বাপু, মেজাজ তো হতেই পারে। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!"

মায়ের ওই অবিচলিত মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় বলেই কি সীতু আর কথা বলতে পারে না?

"মেয়েটি কে গো বৌদিদি?"

বামুন-মেয়ের উগ্র কৌতূহল আর বাঁধ মানে না, মনিবানীর ভ্রূভঙ্গীর ভয়েও না। সে কৌতূহল উক্ত প্রশ্নের আকারে এসে আছড়ে পড়ে অতসীর কাছে।

অতসী ভ্রূভঙ্গী করে।

বলে, "কোন মেয়েটি?"

"ওই যে কেবলই আসে যায়, দাদাবাবুকে অসুখ ছেলে এনে দেখায়, এইতো আজও এসেছিল—"

"আমার ভাইঝি।"

গম্ভীর কণ্ঠে বলে অতসী।

"ভাইঝি!" বামুন-মেয়ের বিস্ময় যেন আকাশে ওঠে। "ভাইঝি যদি তো, তোমায় কাকীমা বলে কেন গো?"

"বলে, ওর বলতে ভাল লাগে।" অতসী কঠিন মুখে বলে, "কে কাকে কি বলে ডাকে, তা নিয়ে তোমার এত মাথা ঘামানোর কি আছে?"

"ওমা শোন কথা! মাথা ঘামানো আবার কি? ডাকটা কানে বাজলো তাই বলেছি। দেখিনি তো ওকে কখনো এর আগে। আমি তো আজকের নই, কত কালের। তোমার শাশুড়ীর আমল থেকে আছি। এদের যে যেখানে আছে সবাইকে জানি চিনি।" সগর্বে ঘোষণা করে বামুন-মেয়ে।

"ভালই তো!" বলে চলে যায় অতসী, আর মনে ভাবে ঠিক এই কারণেই তোমাকে আগে বিদায় করা দরকার। আমার সমস্ত নিশ্চিন্ততার ওপর কাঁটার প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে তোমায় দেব না আমি।

"এত কথা তুমি জানলে কি করে ?"

"বাঃ পাড়ায় পড়ে থাকি, আর এটুকু তথ্য রাখব না ? ডাক্তার খুবই ভাল।"

"খোকনের ব্যাপারে দেখলামও তো। কিন্তু কাকীমার সঙ্গে রিলেশান খুব ভাল বলে মনে হয় না। অবশ্য এ ধরনের বিয়েয় হওয়া শক্ত।"

'তা কেন ? এতেই তো হবে। ইচ্ছে করে ভালবেসে যখন বিধবা জেনেও বিয়ে করেছেন'—

'তা' করেছেন সত্যি। তবু যে মেয়ের একটা অতীত ইতিহাস রয়েছে, নিজে সে সম্পূর্ণ সুখী হবে কি করে ? এ জীবনের মাঝখানে সেই অতীত ছায়া ফেলবেই।'

'আহা গোপন কিছু তো নয় ?'

'নাই বা হল। তবু উচ্ছ্বসিত হয়ে একটা পুরানো দিনের গল্প করতে বাধবে, সে জীবনের সুখ দুঃখ আশা হতাশার কাহিনী বলতে বাধবে, হঠাৎ কোন ছলে প্রথম প্রেমের অনুভূতির কথা উঠে পড়লে, সুর যাবে কেটে, অতএব জীবনের সেই কয়েকটা বছরকে একেবারে 'সীল' করে সিন্দুকে তুলে রাখতে হবে। স্বচ্ছন্দতাই যদি না থাকল, সুখটা অব্যাহত রইল কোথায় ?'

'হুঁ। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্রই তো চলেও আসছে এ প্রথা।'

শ্যামলী মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'প্রথা জিনিসটা হচ্ছে প্রয়োজনের বাহন, ওর সঙ্গে প্রকৃত সুখের সম্পর্ক কি ? নিঃসন্তান লোকদের তো দত্তক নেওয়ার প্রথা আছে। তাই বলে কি নিজের সন্তানের মত হয় সে ?'

'এ তুলনাটা কি রকম হ'ল ?'

'যে রকমই হোক, আমি বলতে চাইছি প্রয়োজনের খাতিরে অনেক প্রথাই চলে আসছে সমাজে, তার মধ্যে প্রাণের স্পর্শ থাকে না।'

'তা পুরুষেরা তো দিব্যি দ্বিতীয়পক্ষ, তৃতীয়পক্ষ নিয়ে আনন্দের সাগরে ভাসে।'

শ্যামলী মুখ টিপে হেসে বলে, 'হবে হয় তো। সে সাগরের খবর তো আমি রাখি না। তুমি ভাল করে জানতে পারবে আমার জীবনান্তের পর যখন নতুন পক্ষ মেলে উড়বে।'

হেসে ওঠে দু'জনে।

কেটে যায় কিছুক্ষণ খুনসুড়িতে। অকারণ হাসি অকারণ কথায়।

এক সময় আবার বলে, "আচ্ছা তোমার কাকার সঙ্গে ওঁর রিলেশানটা কি রকম ছিল ?"

'আমার কাকার কথা আর তুলো না।' শ্যামলী বলে, 'গুরুজন মরেছেন স্বর্গে গেছেন, তবে না বলে পারছি না, তিনি মানুষ নামের অযোগ্য ছিলেন। নেহাৎ তো ছোটই ছিলাম, তবু কি বলবো কেবলই ইচ্ছে হতো ওঁর কাছ থেকে কাকীমাকে চুরি করে নিয়ে পালাই।'

'সাধু ইচ্ছে। যাক, ভদ্রলোক আর যাই হোন একটা বিষয়ে অন্তত: বুদ্ধির কাজ করেছিলেন, সময় থাকতে মারা গিয়েছিলেন।'

শ্যামলী হেসে ফেলে বলে, "মারা যাবার পর এমন একটা ব্যাপার ঘটবে জানলে, খুব সম্ভব মারা যেতেন না।"

"আচ্ছা ধর, তোমার কাকা যদি ওরকম হৃদয়হীন প্যাটার্ণের না হতেন, ধর খুব প্রেমিক মহৎ স্নেহশীল স্বামীই হতেন, মারা গেলে তোমার কাকীমার প্রয়োজনের সমস্যাটা তো সমানই থাকতো সে ক্ষেত্রে? মানে কেবলমাত্র এঁদের সম্বন্ধে বলছি না, জেনারেল ভাবেই বলছি, তেমন হলে কিংকর্তব্য?"

"কর্তব্য নির্দ্ধারণ করা অপরের কর্ম নয়" বলে শ্যামলী, "এই হচ্ছে সাদা কথা। কে যে কোন অবস্থায় কি করতে বাধ্য হয় বলা শক্ত। কারণ হৃদয়ের চাইতে পেটের দাবী বেশী প্রত্যক্ষ। তাছাড়া প্রশ্ন তো কেবল নিজেকে নিয়েই নয়, প্রধান প্রশ্ন আরও মেম্বারদের নিয়ে। নিজে 'না খেয়ে পড়ে থাকব' বলে জোর করা যায়, 'ওরা না খেয়ে পড়ে থাক' বলা যায় না। সে ক্ষেত্রে অপরের কর্তব্য হচ্ছে সমালোচনা না করা। আমি তো এই বুঝি।"

"হায় অবোধ বালিকা! জগতে যদি সমালোচনা বস্তুটাই না থাকল, তাহলে রইল কি?"

"রইল মানুষ।"

"সমালোচনা আছে তাই মানুষ মানুষ-পদবাচ্য। অন্যের সমালোচনার মুখে পড়বার ভয় না থাকলে, কি দায় থাকতো মানুষের শৃঙ্খলা মেনে চলবার, নিয়ম মেনে চলবার?"

"যাকগে বাবু এসব বাজে কথায়। তুমি একদিন চলনা ওখানে।"

"আমি? ক্ষেপেছ!"

"কেন, এতে ক্ষ্যাপার কি হ'ল?"

"বাবা, ডাক্তারকে দেখলে দূরে থেকেই আমার হৃৎকম্প হয়, যা গম্ভীর মুখ! কি করে যে তোমার কাকীমা—"

"ও একটা কথাই নয়। নারকেলের মধ্যে মজুত থাকে চিনির সরবৎ। কাকীমাও তো গম্ভীর।"

"তা যাই বল, এই গম্ভীর গম্ভীর মানুষগুলোর মধ্যে প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি বস্তুগুলো যে কোন কোটরে থাকে, তাই ভাবি।"

তা সে কথা কি শুধু অপরেই ভাবে?

অতসীও যে আজকাল ভাবতে সুরু করেছে সেই কথা। মৃগাঙ্কর হালকা হওয়ার ইচ্ছেটা টিঁকল আর কই? হ'ল না। হয় না। তাই অতসী ভাবে, কোথায় ছিল মৃগাঙ্কর মধ্যে অত স্নেহ, অত স্নিগ্ধতা? আজকের এই গম্ভীর রুক্ষ ক্লিষ্ট মৌন মূর্তি মানুষটাকে দেখে কি চেনবার উপায় আছে—মানুষটা একদিন গভীরভাবে প্রেমে পড়েছিল?

কিন্তু এতবেশী মৌনতা সহ্য করা যায় কি করে ?

অতসীর যে কী হয়েছে আজকাল, যখন তখন ইচ্ছে করে মৃগাঙ্কর সঙ্গে ভয়ানক রকম একটা ঝগড়া বাধায়, রাগে ফেটে পড়ে চেঁচামেচি করে, অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটিয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করে।

কেন যে এমন ইচ্ছে হয় ?

সুরেশ রায়ের সংসারে, সুরেশ রায়ের নিষ্ঠুরতার মধ্যেও যে-মেয়ের কখনো মুখ ফোটেনি, তার এমন উগ্র উন্মাদ ইচ্ছা কেন ?

তা' সবের কারণই বুঝি সীতু।

সীতুকে বাদ দিয়ে দুজনের জীবন কল্পনা করলে বোঝা যায়—

কিন্তু তাও হয় না।

সীতুকে বাদ দেওয়ার মত ভয়ানক অলক্ষণে চিন্তা এক ধাপের বেশী এগোতে পারে না।

খুকু আছে সত্যি।

খুকু অতসীর চোখের আনন্দ, প্রাণের পুতুল, কিন্তু সীতু যেন বুকের ভিতরকার হাড়।

অথচ সীতুরও কী এক দুর্দান্ত নেশা, মাকেই যন্ত্রণা দেবে। নখে ছিঁড়ে ফেলবে মার সমস্ত সুখ, সমস্ত শান্তি।

তাই আবার একদিন তোলপাড় হয়ে ওঠে সংসার সীতুর হিংস্র দুর্বুদ্ধিতে।

খাওয়ার পর জল খাওয়া অভ্যাস মৃগাঙ্কর। বড় এক গ্লাস জল ঢাকা দেওয়া থাকে ঘরের টেবিলে। রুপোর গ্লাস, রুপোর রেকাবী চাপা। মৃগাঙ্কর মায়ের আমল থেকে এই ব্যবস্থা।

খাওয়ার পর কিঞ্চিৎ বিশ্রামের শেষে বেরোবার আগে এক চুমুকে জলের গ্লাসটা খালি করে তবে পোষাক পরতে সুরু করেন মৃগাঙ্ক, আজও তাই করেছিলেন, কিন্তু না শেষ পর্যন্ত নয়।

নিয়ম পালন হয়েছিল জলটা চুমুক দেওয়া পর্যন্তই। পরক্ষণেই ভীষণ একটা আলোড়নের বেগে ছুটে যেতে হল মৃগাঙ্ককে বমি করতে।

খাবার জলটা লবণাক্ত!

সন্দেহ নেই যে খুব ধীর হাতে জলের গ্লাসের মধ্যে একটি নুনের ডেলা ছাড়া হয়েছিল, তাই প্রথমটা টের পাননি মৃগাঙ্ক। ঢকঢক করে খেয়ে নিয়েছেন। টের পেলেন গ্লাস খালি করার সময়, জলের তলাটা নুনে ভর্তি।

কোথা থেকে এল!

যেমন ঢাকা দেওয়া তেমনিই রয়েছে!

কোন ফাঁকে কে ওই সৈন্ধবের ডেলাটি দিয়ে রেখে ফের চাপা দিয়ে গেছে।

এ ঘটনা দৈবের হতে পারে না, কোন সূত্র ধরেই বলা চলে না অসাবধানে কিছু একটা হয়ে গেছে। অবশ্য ভৌতিকও নয়।

তবে ?

'তবে'র আর আছে কি ?

এহেন ঘটনা তো যখন তখনই ঘটেছে, কিছুদিন একটু থামা পড়েছিল।

হ্যাঁ, কিছুদিন একটু থামা পড়েছিল।

একটু নিশ্চেষ্ট ছিল সীতু। যবে থেকে সন্দেহ ঢুকেছিল।

হয়তো বা নিজের মধ্যে পরিবর্তন সাধনের সাধনাই করছিল, কিন্তু কি থেকে যে কি হয় !

সকালে আজ বাগানে নেমে এসেছিল সীতু। অন্ততঃ সীতু যাকে 'বাগান' বলে। গেটের ভিতর কম্পাউণ্ডের মধ্যে কেয়ারী করা গাছের সারিতে ফুল ফোটে দৈবাৎ, পাতারই বাহার।

আজ দু'একটা গাছ আলো হয়ে উঠেছিল সীজন ফ্লাওয়ারে।

জানলা দিয়ে দেখতে দেখতে নেমে এল সীতু। একগোছা ফুল নিয়ে খুকুটার ওই থোকা থোকা চুলের খাঁজে গুঁজে দেবে। গতকাল পার্কে দেখেছে একটা কোঁকড়া-চুল মেয়ের চুলে ফুলসজ্জা।

অবশ্য যা কিছু করবে সবই অপরের চোখ থেকে লুকিয়ে। কারুর সামনে কোন কিছু করতে চায় না সে।

কেন ?

সেই এক রহস্য।

খুকুর জন্যে প্রাণ ফেটে যায়, কিন্তু কারও সামনে তাকিয়ে দেখে না পর্যন্ত।

আজ দেখল মৃগাঙ্ক তখনও নিদ্রিত, চাকররা এদিক ওদিকে। নেমে এল চুপিচুপি, চারিদিক তাকিয়ে পটপট করে ছিঁড়ে নিল কয়েক গোছা ফুল, আর আশ্চর্য, এই মাত্র যাকে ঘুমন্ত দেখে এসেছে, সেই মানুষ দোতলার বারান্দা থেকে দিব্যি খোলা গলায় বলে উঠল, "বাঃ চমৎকার !"

চমকে চোখ তুলেই চোখটা নামিয়ে নিয়ে হাতের ফুলগুলো তক্ষুনি ফেলে দিয়েছিল সীতু, কিন্তু সেই "বাঃ চমৎকার" শব্দটিকে কোথাও ফেলে দিতে পারল না সে। সে শব্দ অনবরত কানের মধ্যে হাতুড়ীর ঘা ফেলতে লাগল, "বাঃ চমৎকার !"

তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা, কিন্তু ওই ব্যঙ্গোক্তিটা তুচ্ছ করবার নয়।

দাহে ছটফট করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে উপরে আসতে গিয়ে ধাক্কা। মৃগাঙ্ক নামছেন। তাঁরও যে বরাবরের অভ্যাস সকালে ওই বাগান তদারক।

যদি মৃগাঙ্ক ধমকে উঠতেন, তাহলে এতটা দাহ হ'তনা, কিন্তু জ্বলিয়ে দিয়েছিল ক্ষুদ্র ওই ব্যঙ্গটুকু।

"বাঃ চমৎকার"—শুধু এই কথাটুকুর মধ্যেই ছিল অনেক কথা!

পরক্ষণেই আবার সিঁড়িতে দেখা।

কিন্তু সেখানে তো ব্যঙ্গের ভাষা ব্যবহার করেন নি মৃগাঙ্ক। শুধু মৃদুগম্ভীর একটি প্রশ্ন করেছিলেন, "ফুল চাইলে কি পাওনা? অমন চোরের মত চুপিচুপি নেবার দরকার কি?"

আর কিছু নয়।

নেমে গিয়েছিলেন মৃগাঙ্ক, সীতুও উঠে এসেছিল। কিন্তু সেই থেকে আবার সীতুর 'কাঠত্ব' প্রাপ্তি।

সীতু আর সীতুর পরম শত্রুটাকে থাকতেই হবে এক বাড়ীতে? আর কোন উপায় নেই? মা যে বলেছিল অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে—দেখা যাচ্ছে সেটা নেহাতই স্তোক-বাক্য। সেই আশায় কত ভাল হবার চেষ্টা করেছিল সীতু, কিন্তু মা'টা মিথ্যাবাদী।

মা'র বিশ্বাসঘাতকতায় সেদিন তো সীতু নিরুদ্দেশ হয়েই যাচ্ছিল, পার্কে বেড়াতে গিয়ে আর আসবে না বলে চলেও গিয়েছিল অনেক দূর। কিন্তু একটু রাত্তির হয়ে যেতেই কি রকম ভয় ভয় করল। ফিরে এসে আবার বসে রইল পার্কের বেঞ্চে। অনেক রাতে বীর বাহাদুর এসে ধরে নিয়ে গেল।

তা' সেদিন কেউ কিছু বলেনি সীতুকে।

অতসীও না।

শুধু কেমন এক রকম করে যেন তাকিয়ে খুব বড় করে নি.শ্বাস ফেলেছিলেন।

মায়ের ওই নিঃশ্বাসফিশ্বাসগুলো তেমন ভাল লাগে না। তাই না সীতু ক'দিন ধরে চেষ্টা করছিল ভাল হবার!

কিন্তু ওই, কি থেকে যে কি হয়!

এক বাড়ীতে দু'জনের থাকা চলবে না।

দৃঢ় সংকল্প করে ফেলেছিল সীতু। সীতুর মরে গেলেই হয়। মরার অনেক উপায় ঠাওরাল সীতু। কিন্তু কোনটাই তার ক্ষমতার মধ্যে নয়।

তাছাড়া—

সেই কথাটা না ভেবে পারল না সীতু—মা? মার সেই কেমন এক রকম করে চাওয়া আর নিঃশ্বাস ফেলা! সীতু মরে গেলে, মার প্রাণে লাগবে।

তার থেকে ওই লোকটাকে সরিয়ে দিলেই সব শান্তি।

কিন্তু মরে কই ?

লোকটা যেন 'প্রহ্লাদের' মতন।

কতবার কত চেষ্টা করল সীতু, কিছুই হ'ল না।

বামুনমেয়েরা সেদিন বলাবলি করছিল ওদের পাড়ায় কে যেন ভেদবমি হয়ে মারা গেছে। বলছিল, "কী দিনকাল পড়েছে! দু'বার ভেদ দু'বার বমি, ব্যস! জলজ্যান্ত মানুষটা মরে গেল।"

'ভেদ' কথাটার মানে ঠিক জানে না সীতু। কিন্তু পরবর্তী কথাটার মানে জানে।

অতএব 'দিনকালে'র প্রতি পরম আস্থা নিয়ে চুপি চুপি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করা। বেগ পেতে হ'ল না, সহজেই হল। কাঠের একটা বড় গামলায় উঁচু করে ঢালা ছিল সৈন্ধবের টুকরো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হল ?

শুধু খুব খানিকটা হৈ চৈ চেঁচামেচি, কে করেছে, কি করে হল বলে বিস্ময় প্রকাশ, তারপর প্রত্যেকবার যা হয় তাই। মস মস করে জুতোর শব্দ তুলে চলে গেল শত্রুপক্ষ। সীতু দাঁড়িয়ে রইল অনেকগুলো জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে।

সাধে কি আর প্রহ্লাদের সঙ্গে ওকে তুলনা করে সীতু ?

মারলে মরে না, কাটলে কাটা পড়ে না, বমি করেও মরে না।

শুধু সীতুকে অপদস্থ করতে, তাকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে চলে যায়।

কেন, ও পারে না সীতুকে খুব ভয়ঙ্কর শাস্তি দিতে ?

তাতেও বুঝি সীতুর দাহ কিছু কমতো !

কিন্তু সীতু হাল ছাড়বে না, ঠিক একদিন মেরে ফেলবে ওকে।

আচ্ছা, মটর গাড়ীর পেট্রল অনেকখানিটা নিয়ে আসা যায় না লুকিয়ে ?

সেদিন বীরবাহাদুর কোথা থেকে যেন এনেছিল। প্রকাণ্ড একটা কাঁকড়াবিছে বেরিয়েছিল রান্নাঘরের পিছনে, বীরবাহাদুর ঝপ্ করে তার গায়ে পেট্রল ঢেলে দিয়ে দেশলাই দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

কেউ যখন ঘুমোয়, তখন—

পেট্রল কোথায় থাকে, আদৌ বাড়ীতে থাকে কি না এ সব তথ্য জেনে নিতে হবে।

দেশলাই ?

দেশলাই একটা জোগাড় করা কিছু এমন শক্ত নয়।

'আমি বলি কি, ওকে কোন একটা বোর্ডিঙে ভর্তি করে দেওয়া হোক।'

অতসী এসে প্রস্তাব করে।

মৃগাঙ্ক অতসীর জলভারাক্রান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু গম্ভীর স্বরে বলেন, 'মিথ্যে অভিমান করছ কেন অতসী? আমি কি ওর প্রতি ভয়ানক একটা কিছু দুর্ব্যবহার করছি? কেউ কি ছেলে শাসন করতে এটুকু কঠোরতা করে না?'

অতসী বিষণ্ণ দৃঢ়স্বরে বলে, 'না, এ আমার মান অভিমানের কথা নয়। ভেবে চিন্তেই বলছি। এতদিন নেহাৎ শিশু ছিল, কিছু উপায় ছিল না। এখন বড় হয়েছে, বোর্ডিঙে রাখা শক্ত নয়। ছেলের শিক্ষার জন্যে অনেকেই তো রাখে এমন। খরচ হয়তো অনেক হবে, কিন্তু তোমার তো টাকার অভাব নেই?'

টাকা!

'টাকা! তা' বটে!' মৃগাঙ্ক ডাক্তার হাসেন, 'মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় অতসী, ওটাই আমার একমাত্র কোয়ালিফিকেশন ছিল কি না।'

'কী বললে?'

চেঁচিয়ে উঠল অতসী। তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

'সত্যি করে কিছু বলিনি অতসী, শুধু মাঝে মাঝে সন্দেহ হওয়ার কথাটা বলছি। জগতে এ রকম তো কতই হয়।'

'জগতে কত রকম হয়, তার একটা দৃষ্টান্ত যে আমি, এটা স্বীকার করছি। সন্দেহ করবে, এর আর আশ্চর্য কি?' অতসী ম্লান হেসে বলে, 'ও তর্ক করে কোন লাভ নেই, আমি যা বলতে এসেছি সেই কথাটাই শেষ হোক। ওকে বোর্ডিঙে ভর্তি করে দিলে ওরও লাভ, আমারও লাভ।'

'তোমার কি ধরনের লাভ সেটা তুমিই বোঝ, তবে তাতে আমার একটা মস্ত লোকসান ঘটবে সন্দেহ নেই। ওকে বাড়ি ছাড়া করলে তোমার মনটাই কি বাড়িতে থাকবে?'

অতসী এবার জোর করে হাসবার চেষ্টা করে। আদুরে আদুরে মিষ্টি হাসি। 'আহা, আমি যেন তেমনি অবুঝ? ছেলেমেয়ের শিক্ষাদীক্ষার জন্যে কত বাচ্চা বাচ্চা বয়সে কত দূর দূর বিদেশের বোর্ডিঙে পাঠিয়ে দিচ্ছে লোকে, দেখিনি বুঝি আমি?'

মৃগাঙ্ক ডাক্তারও হাসেন। মিষ্টি হাসি নয়, ক্ষুব্ধ হাসি।

'সকলের মতো তো নই আমরা অতসী!'

'হতেই তো চাই আমি।'

'চাইলেই হয় না। আমিই কি চাইনি? বল অতসী,' মৃগাঙ্কর গলার স্বরটা ভরাট ভারি ভারি হয়ে ওঠে, 'আমি কি সাধ্যমত ওকে আপনার করবার চেষ্টা করি নি? আমি ওর প্রতি পিতৃকর্তব্যের কোন ত্রুটি করেছি? ওকে নিয়ে তোমার খুব বেশী ক্ষুব্ধ হবার কোন কারণ ঘটেছে? কিন্তু সেই এতটুকু শিশু থেকে ও আমাকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখে, আমাকে এড়িয়ে চলতে চাওয়া ভিন্ন কাছে আসতে চায়নি কখনো।'

মাথা হেঁট হয়ে যায় অতসীর।

না গিয়ে উপায় নেই বলে। মৃগাঙ্কর কথা তো মিথ্যা নয়। প্রথম প্রথম সীতুর মনোরঞ্জনের জন্যে বহু চেষ্টা করেছে মৃগাঙ্ক। হয়তো সে চেষ্টা অতসীরই মনোরঞ্জনের চেষ্টা। হয়তো মনের বিরক্তি, চোখের রুক্ষতা চাপা দিয়ে স্নেহের অভিনয় করেছে। হয় তো অনেক সাধনালব্ধ প্রেয়সীর মনে শুধু প্রেমিকেরই নয়, শুধু স্বামীরই নয়, দেবতার আসনের জন্যও একটু লোভ ছিল মৃগাঙ্কর। যে কারণেই হোক, চূড়ান্ত উদারতা দেখিয়েছিল মৃগাঙ্ক, সীতুকে চূড়ান্ত আদর করেছিল। কিন্তু সীতুর দোষেই সব গেল।

সীতুই অতসীর মাথা হেঁট করেছে।

সেই একটুখানি শিশু অত যত্ন সমাদরের কোন মূল্য দেয় নি। মৃগাঙ্ক আহত হয়েছে, ক্ষুব্ধ হয়েছে, হয়তো বা অপমান বোধ করেছে। অতসী পারে নি তার প্রতিকার করতে, পারে নি সেই একফোঁটা ছেলেকে বাগে আনতে।

কিন্তু কেন?

ভেবে ভেবে কোনদিন কুল কিনারা পায় নি অতসী, কেন এমন? ছোট বাচ্চারা সর্বদা কাছাকাছি থাকতে থাকতে তুচ্ছ একটা ঝি চাকরেরও [illegible] অনুরক্ত হয়, অনুগত হয় পাড়াপড়শী মামা কাকার, অথচ যে মৃগাঙ্ক সীতুকে দু'হাত ভরে দিয়েছে, দিয়েই চলেছে, রাজপুত্তুরের যত্নে রেখেছে, তাকেই সীতু দু'চক্ষের বিষ দেখে আসছে বরাবর। তাও বা ছোটতে যাহোক মানিয়ে নেওয়া যেত অবোধ বলে, শিশুর খেয়াল বলে। এত মাথা কাটা যেত না তখন। কিন্তু সীতু বড় হয়ে পর্যন্ত প্রতিনিয়ত একী লজ্জা, একী অশান্তি অতসীর!

কোন দৈন্যের ঘর থেকে মৃগাঙ্ক অতসীকে তুলে এনেছে এই রাজ-ঐশ্বর্যের মধ্যে, প্রেমের সিংহাসন আর সোনার সিংহাসন দুই দিয়েছে পেতে! অতসীর সুখের জন্যে কত করেছে, কত ছেড়েছে, অথচ অতসী কিছুই পারল না। সামান্য একটা ক্ষুদে ছেলের মন ঘোরাতে পারল না মৃগাঙ্কর দিকে।

হয়তো মৃগাঙ্ক ভাবে অতসীর চেষ্টা নেই, চেষ্টা থাকলে কি আর মায়ে পারে না ছেলের মন বদলাতে? কোলের ছেলের? শিশু ছেলের?

কতদিন ভেবেছে অতসী, মৃগাঙ্ক তো এমন সন্দেহও করতে পারে, অতসী ইচ্ছে করেই ছেলের মন ধরে রাখতে চায়, একেবারে সংরক্ষিত রাখতে চায় নিজের জন্যে। যে ছেলে অতসীর একার। সম্পূর্ণ একার!

মৃগাঙ্ক নতনয়না অতসীর দিকে তাকিয়ে কোমল স্বরে বলে, চাইলেই সব হয় না অতসী! যা হবার নয় তা হয় না! তুমি আর মন খারাপ করে কি করবে?'

অতসী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'তা যদি না হবার হয় তো হওয়ানোর চেষ্টা করেই বা লাভ কি? যত বড় হচ্ছে ততই তো আরও একগুঁয়ে আরও অবাধ্য হচ্ছে।

বোর্ডিংএ পাঁচটা ছেলের সঙ্গে থাকলে হয়তো একটু সভ্য হবে, বাধ্য হবে,—ভালই হবে ওর।'

'তুমি থাকতে পারবে না অতসী!'

'কে বললে পারবো না?' অতসী জোর দিয়ে বলে, 'ঠিক পারবো। এইতো খুকুর হৈ চৈতে কোথা দিয়ে দিন কেটে যায়। মন কেমনের সময়ই থাকবে না।'

'অত চট করে সর্বস্ব দানের দানপত্রে সই করে বোস না অতসী!'

অতসীর চোখে সহসা জল এসে পড়ে। উত্তর দিতে দেরি হয়, তবু সামলে নিয়ে বলে, 'কিন্তু এভাবে কি করে চলবে? তুমিও তো আর ওর ওপর স্নেহ রাখতে পারছ না? তুমিও তো খুকু হয়ে পর্যন্ত—'

এবার আর সামলাতে পারে না অতসী। সব বাঁধ ভেঙে নামে বন্যা।

কথাটা মিথ্যা নয়।

খুকু জন্মে পর্যন্তই মেজাজটা বড্ড যেন বদলে গেছে মৃগাঙ্কর। আগে বিরূপতা করতো সীতুই, মৃগাঙ্ক চেষ্টা করতো সহজ হতে। এখন যেন দু'জনের হাতেই ধারালো অস্ত্র!

কিন্তু মৃগাঙ্করই বা দোষ কি?

কি করে সে নিজের ওই ফুলের মত মেয়েটিকে নিশ্চিন্ত হয়ে ছেড়ে দেবে তার সংস্পর্শে, যার রক্তে রয়েছে সংক্রামক রোগের সন্দেহ!

প্রথম প্রথম যখন মৃগাঙ্ক খুকু সম্পর্কে অস্বস্তি করেছে, খুকুকে কেড়ে নিয়েছে সীতুর কাছ থেকে, তখন হঠাৎ একদিন ফেটে পড়েছিল অতসী, স্বভাব ছাড়া তীব্রতায় বলেছিল, 'অত অমন কর কেন? ও কি তোমার মেয়েকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে? দেখতে পাও না কত ভালবাসে ওকে?'

সেদিন প্রকাশ করেছিল মৃগাঙ্ক নিজের অসহিষ্ণুতার কারণ। বলেছিল, 'হাতে করে বিষ খাইয়ে মারবে, এমন কথা কেউ বলেনি অতসী, কিন্তু পরোক্ষ বলেও তো একটা কথা আছে? এমনও তো হ'তে পারে ওর রক্তের মধ্যে বিষ লুকিয়ে আছে। যদি থাকে, সুযোগ পেলে বিষ নিজের ডিউটি পালন করবেই। আর কুষ্ঠর বিষ—'

শুনে চুপ করে গিয়েছিল অতসী।

বুঝতে পেরেছিল কোথায় মৃগাঙ্কর বাধা। তারপর একটু থেমে ম্লানস্বরে বলেছিল, 'ওর জন্মাবার পরে তো—'

'প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে হয়তো পরে, কিন্তু ওর জন্মের আগেই যে রোগটা জন্মায়নি, তা'ও জোর করে বলা যায় না অতসী! রোগ প্রকাশ হবার আগে অনেক দিন ধরে নিঃশব্দে লুকিয়ে থাকে রোগের বীজ, এ শুধু আমি ডাক্তার বলেই জানি তা' নয়, সবাই জানে।'

'তাহলে'—বলতে গলা কেঁপে গিয়েছিল অতসীর, 'তাহলে সীতুকে ভাল করে পরীক্ষা করছ না কেন একবার?'

'করেছি অতসী! তোমার মিথ্যা উৎকণ্ঠা বাড়ানোয় লাভ নেই বলে তোমাকে না জানিয়ে করেছি পরীক্ষা—'

'পরীক্ষার ফল?'

আরও কেঁপে গিয়েছিল অতসীর গলা।

'ফল এমন কিছু ভয়ঙ্কর নয়, কিন্তু তবুও সাবধান হবার প্রয়োজনীয়তা আছে। ছোট্ট বাচ্চারা একেবারে ফুলের মত, এতটুকুতেই ক্ষতি হতে পারে ওদের।'

শুনে আর একবার বুকটা কেঁপে উঠেছিল অতসীর, আর এক আশঙ্কায়। ছোট্ট ফুলের মতটির অনিষ্টের আশঙ্কায়। সেখানেও যে মাতৃহৃদয়! মা হওয়ার কী জ্বালা!

অতসীর ক্ষেত্রে বুঝি সে জ্বালা সৃষ্টিছাড়া রকমের বেশী, এই জ্বালাতেই সমস্ত পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় পেয়েও কিছুই পেল না অতসী।

কিন্তু এমন দুঃসহ যন্ত্রণার কিছুই হ'ত না, যদি সীতুর স্মৃতিশক্তিটা অত প্রখর না হতো! যদি বা সীতু তখন আরও একটু ছোট থাকতো!

ঠিক অতসীর এই চিন্তারই প্রতিধ্বনি করেন মৃগাঙ্ক ডাক্তার, 'হয়তো আমরা সত্যিকার সুখী হ'তে পারতাম অতসী, যদি সীতু তখন আরও ছোট থাকতো। বলেছি তো একটা বাচ্চা ছেলের কাছে হেরে গেছি আমরা।'

অতসী দৃঢ়স্বরে বলে, 'আর হেরে থাকতে চাই না। সুখী হতেই হবে আমাদের। আমি যা বলছি সেই ব্যবস্থাই কর তুমি।'

'বললাম তো—' মৃগাঙ্ক হাসেন, 'এত চট করে দানপত্রে সই করে বসতে নেই। যাক আরও কিছুদিন। হয়তো আর একটু বড় হলে ওর এই বন্য স্বভাবটা শোধরাবে।'

হয়তো অতসী আরও কিছু বলতো। হয়তো বলতো, শোধরাবার ভরসাই বা কি? রক্তের মধ্যে যে উত্তরাধিকারসূত্রে শুধু রোগের বিষই প্রবাহিত হয় তা তো নয়? স্বভাবের বিষ? মেজাজের বিষ? সেগুলোও তো কাজ করে? বলতো, আর শোধরাবার উপায় নেই। সব জেনে ফেলেছে সীতু।'

কিন্তু বলা হয়নি, টেলিফোনটা বেজে উঠেছিল, মৃগাঙ্কর ডাক পড়েছিল।

থম থম করে কাটে কয়েকটা দিন।

বাড়িটাও স্তব্ধ।

মৃগাঙ্ক ডাক্তার যেন নিঃশব্দ হয়ে গেছেন।

অতসী জিদ ধরেছে সীতুকে বোর্ডিঙে ভর্তি করে না দিলে অতসীই বাড়ি ছাড়বে। মৃগাঙ্ক এর অন্য অর্থ করেছেন। ভেবেছেন অভিমান।

আশ্চর্য! পৃথিবীটা কী অকৃতজ্ঞ! যাক্ থাকুক বোর্ডিঙে, হয় তো সেই ভাল।

ভারি গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন মৃগাঙ্ক। সীতুর দিকে আর তাকিয়ে দেখেন না, এমন কি স্পষ্ট একদিন দেখলেন নিজের খাওয়া দুধ থেকে খুকুকে দুধ খাওয়াচ্ছে সীতু, বোধ করি ইচ্ছে করেই মৃগাঙ্ককে দেখিয়ে দেখিয়ে, তবু একটি কথা বললেন না। মিনিট খানেক তাকিয়ে দেখে সরে গেলেন। গেলেন সীতুরই জামাজুতো কিনতে। ছেলেকে অন্যত্র রাখবার প্রস্তুতি। বড়লোকের ছেলেদের জায়গায়, বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গেই তো থাকতে হবে মৃগাঙ্ক ডাক্তারের ছেলেকে?

কিন্তু সীতু?

সীতু ক্রমশঃই ক্ষেপে যাচ্ছে।

মাকে যেমন করে সেদিন মেরে ধরে আঁচড়ে কামড়ে যা খুসী বলেছে, তেমনি করে মেরে আঁচড়ে কামড়ে যা খুসী বলতে ইচ্ছে হয় তার মৃগাঙ্ককে।

তাই চেষ্টা করে বেড়ায় কিসে ক্ষেপে যাবেন মৃগাঙ্ক।

সেই ক্ষেপে যাবার মুহূর্তে যখন সেদিনের মত কান ঝাঁকুনি দিতে আসবেন, তখন আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে না সীতু, ঝাঁকিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে এলোপাথাড়ি ধাক্কা দিয়ে দিয়ে বলবে, 'কেন কেন তুমি আমাকে মারতে এসেছ? কে তুমি আমার? তুমি কি আমার সত্যি বাবা? তুমি কেউ নও, একেবারে কেউ নও! তুমি মিথ্যুক! আমার বাবা মরে গেছে।'

কিন্তু সে সুযোগ আর আসে না।

খুকুকে এঁটো দুধ খাওয়ানোর মত ভয়ঙ্কর কারণ ঘটিয়েও না। মৃগাঙ্ক কেবল জিনিসের উপর জিনিস আনছেন।

অতসী হতাশ হয়ে বলে, 'কি করছো তুমি পাগলের মতন? কত এনে জড়ো করছো? আট বছরের একটা ছেলে আটটা সুটকেস নিয়ে বোর্ডিঙে যাবে, ক্লাস ফোরের পড়া পড়তে? এ কী অন্যায় টাকা নষ্ট!'

'নষ্ট করার মত অনেক টাকা যে আমার আছে অতসী!' মৃগাঙ্ক ম্লান হেসে বলেন, 'তাই করছি।'

'ওকে বাড়ি থেকে সরাতে আমার চাইতে তো দেখছি তোমার অনেক বেশী মন কেমন করছে।'

'কিছু না অতসী, কিছু না। টাকা আছে, টাকা ছড়াচ্ছি, এই পর্যন্ত।'

'ও কথা বলে আমায় ভোলাতে পারবে না।' অতসী হতাশার নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'বংশের গুণ কেউ মুছে ফেলতে পারে না। ওরা অকৃতজ্ঞের বংশ। উপকারীকে লাথি মারাই ওদের স্বভাবগত গুণ। নইলে আর সীতু তোমাকে—'

মৃগাঙ্ক ডাক্তার কেমন একরকম করে তাকান, তারপর আস্তে আস্তে বলেন, 'আমার ওপর ওর কৃতজ্ঞ থাকবার কথা নয় অতসী, কদিন ভেবে ভেবে আমি বুঝছি এইটাই আমার ঠিক পাওনা। আমার ওপর ওর ভালবাসা হবে কেন? পশু পাখী কীট পতঙ্গও শত্রু চিঁনতে পারে। সেটা সহজাত। তুমি জানো না, আমি তো জানি, আমি ওর বাপকে চিকিৎসা করার নামে খেলা করেছি, ইনজেকসনের সিরিঞ্জে শুধু ডিস্টিল্ড ওয়াটার ভরে নিয়ে গিয়েছি—'

'আমি জানি।' অকম্পিত স্বরে বলে অতসী।

'তুমি জানো? তুমি জানো? জানো আমার সেই ছলচাতুরি? অতসী! তবু তুমি—'

'হ্যাঁ, তবু আমি। আমি জানতাম আমার সেই মরণান্তকর দুরবস্থা তোমার আর সহ্য হচ্ছিল না, তাই সেই দুরবস্থার মেয়াদটাকে নিজের চেষ্টায় বাড়িয়ে তোলবার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারনি।'

'অতসী! এত দেখতে পেয়েছিলে তুমি? কি করে পেয়েছিলে?'

'তোমার ভালবাসাকে দেখতে পেয়েছিলাম, তাই হয়তো অতটা দেখতে শিখেছিলাম।'

'অতসী! ছেলেটা কাল চলে যাবে। এখন মনে হচ্ছে, হয়তো আর একটু সদ্ব্যবহার করতে পারতাম ওর ওপর! অতটুকু শিশুকে আর একটু ক্ষমা করা যেত!'

'কিন্তু ও…ও তো তোমাকে—'

'ও আমাকে? হ্যাঁ সত্যি, ও আমাকে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু আমি যে ওর সঙ্গে সমান হয়ে গেলাম, ওর সঙ্গে সমান হতে গিয়েই তো ওর কাছে হেরে গেলাম অতসী! এখন ভাবছি আর একবার যদি চান্স পেতাম, চেষ্টা দেখতাম জিতবার। কিন্তু অনেকটা এগিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'তা হোক, ওতে ওর ভাল হবে।'

এত জিনিস কেন? এত জিনিস কার? কে কাকে দিচ্ছে এসব? ভুরু কুঁচকে দেখে সীতু, কিন্তু কে দিয়েছে এই শিশুটাকে এমন নির্লোভের মন্ত্র?

সীতুর মন্ত্র শুধু 'চাই না'। 'এসব চাই না আমি। কেন দিচ্ছে ও?'

সীতু ভাবে, বোর্ডিঙে থাকতে থাকতে এমন হয় না, সেই স্বপ্নে দেখা ছবি থেকে কেউ এসে নিয়ে চলে যায় সীতুকে! যেখানে এত নিতে হয় না, আর শুনতে হয় না—'এত অকৃতজ্ঞ তুই, এত নেমকহারাম!'

এত জিনিস কেন নেবে সীতু?

কার কাছ থেকে ?

যে লোকটা সীতুর বাবা নয় তার কাছে থেকে ? সমস্ত মন বিদ্রোহ করে ওঠে। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না কি করা চলে। বোর্ডিঙেও যে যেতে হবে তাকে।

কে জানে বোর্ডিঙে হয়তো এত সব না থাকলে থাকতে দেয় না, কম কম জিনিস নিয়ে ঢুকতে চাইলে হয়তো বলে, 'চলে যাও, দূর হও !'

লেখাপড়া শিখে সীতু যখন বড় হবে তখন অনেক রোজগার করবে। ওই লোকটার চাইতে অনেক অনেক বেশী। আর সেই টাকাগুলো দিয়ে দেবে ওকে।

আজকাল যেন বড্ড বেশী চুপচাপ হয়ে গেছে লোকটা। সীতুর দিকে আর সে রকম কস্‌্রে তাকায় না।

কিন্তু চুপচাপ থাকবার কি দরকার ? খুব রাগারাগিই করুক না ও, অসভ্যর মত চেঁচামেচি করুক। তাই চায় সীতু। ও যত রাগ করবে, ততই না অগ্রাহ্য করার সুখ !

কেনই বা এত দমে যাচ্ছি আমি ? মৃগাঙ্ক ডাক্তার অবিরতই ভাবতে থাকেন, অতসী তো ঠিক কথাই বলেছে, ছেলের শিক্ষার জন্যে ছেলেকে কাছছাড়া না করছে কে ? এই যে 'ভাবী ভারত নাগরিক আবাস,' যেখানে ভর্তি করছেন সীতুকে, সেখানে তো সীট পাওয়াই দুষ্কর হচ্ছিল, নেহাৎ তাঁর এক ডাক্তার বন্ধু, যে নাকি আবার ওখানকার অধ্যক্ষরও বন্ধু, তার মাধ্যমেই এটা সম্ভব হয়েছে।

আবাস তো খোলা হয়েছে শোনা গেল মাত্র দু' বছর, এর মধ্যেই ছাত্র ধরে না। আর সবই রীতিমত অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। তাদের কি কারো মা নেই ? তারা কি সবাই সংসারের জঞ্জাল ? সেই জঞ্জাল সরাবার জন্যেই মাসে তিনশোখানি করে টাকা খরচা করতে রাজী হয়েছে তাদের সংসার ?

তা' তো আর নয়—!

সীতুর বোর্ডিংবাসের ব্যবস্থা একেবারে পাকা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত একটু যেন নরম হয়েছিল সে, একটু যেন সভ্য। অতসী যখন গম্ভীর বিষণ্ণমুখে ওর জিনিসপত্র গোছায়, সীতুও গম্ভীর গম্ভীর মুখে কাছে বসে থাকে।

বোর্ডিং সম্বন্ধে কি তার আতঙ্ক নেই ? যত প্রবীণ পাকাই হোক, বয়সটা তো আট-নয়।

মার ওপর একটা আক্রোশ ভাব থাকলেও মাকে ছেড়ে যেতে কি তার মন কেমন করছে না ? আর খুকু ? খুকুকে আর দেখতে পাবে না বলে মনের মধ্যে কি যেন একটা তোলপাড় হচ্ছে না কি ?

তাই বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে ভাবে, কত ছেলের বাবা তো বিলেত যায়, বিদেশে চাকরী করতে যায়, অসুখ করে মরে যায়, সীতুর এই বাবাটা কেন ওসবের কিছু করে না?

'বাবা নয়' বলে ঘোষণা করলেও মনে মনে মৃগাঙ্কর ব্যাপারে কিছু ভাবতে গেলে, আর কি ভাবা সম্ভব বুঝে উঠতে পারে না সীতু। তাই মনে মনে বলে, 'এ বাড়ীর বাবাটা যদি মরে যেত, কি নিরুদ্দেশ হয়ে যেত, ঠিক হতো।'

তাহলে হয়তো সীতু মাকে আবার ভালবাসতে পারতো।

সব প্রস্তুত, বিকেলে চলে যেতে হবে, গাড়ি করেই পৌঁছে দিয়ে আসবেন মৃগাঙ্ক। কতই বা দূর? কলকাতা থেকে মাত্র তো ষোলো মাইল।

মনোরম পরিবেশ, মনোহর ভবন। অতি আধুনিক উপকরণ, আর অতি পৌরাণিক আদর্শবাদ নিয়ে কাজে নেমেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। সেদিন কথাবার্তা কইতে এসে ভারি ভাল লেগেছিল মৃগাঙ্কর।

পৌঁছে দিয়ে আসবেন আনন্দের সঙ্গে।

আরও আনন্দের হয়, যদি ফিরে আসবার সময় নিঃসঙ্গতার দুঃখ ভোগ না করতে হয়। কাছে এসে বললেন, 'অতসী তুমিও চল না?'

'আমি'। অবাক হয় অতসী, 'আমি কোথা যাব?'

'কেন সীতুকে পৌঁছতে। ঠিক হয়ে থেকো তাহলে, চারটের সময় বেরোব।' মৃগাঙ্ক চলে গেলেন। চুকে যেত সব, যদি না চালে ভুল করে বসতো অতসী।

মনের তার যখন টনটনে হয়ে বাঁধা থাকে, তখন এতটুকু আঘাতেই ঝনঝনিয়ে ওঠে। এটুকু খেয়াল করা উচিত ছিল অতসীর, ঠিক এই মুহূর্তে কথা না কওয়াই বুদ্ধির কাজ হতো। কিন্তু অতসী কথা কইল। বলে ফেললো, 'দেখলি তো খোকা, কত ভাল লোক উনি? তোর জন্যে আমার মন কেমন করছে ভেবে বোর্ডিং পর্যন্ত পৌঁছাতে নিয়ে যেতে চাইছেন। এমন মানুষকে তুই বুঝতে পারলি না? একটু যদি তুই—', হয়তো ছেলের জন্যে মনের মধ্যেটায় হাহাকার হচ্ছে বলেই গলার স্বরটা অমন আবেগে থরথরিয়ে উঠল অতসীর, সেই থরথরে গলায় বলল, 'যদি তুই সভ্য হতিস, ভাল হতিস, এমন করে বাড়ি থেকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিতে হতো না। সেখানে একা পড়ে থাকতে হবে তো? আর ওঁকেও মাসে মাসে তিনশো করে টাকা দিতে হবে।'

'তিনশো!'

অস্ফুট বিস্ময়ে উচ্চারণ করে ফেলে সীতু। এতটা ধারণা করেনি সে কোনদিন।

কিন্তু থাকতো থাকতো শিশুমনের বিস্ময়। নাইবা বুঝতো সে মৃগাঙ্ক ডাক্তারের মহিমা, কি এসে যেত অতসীর? আবার কেন কথা বললো সে? বোকার মত, ওজন না বোঝা কথা?

'তবে না তো কি? প্রত্যেক মাসে মাসে দিতে হবে। খুব তো বাজে বাজে লোকের

কাছে যা তা কি একটা শুনে চেঁচাচ্ছিলি, 'ও আমার বাবা নয়, কেউ নয়'—নিজের বাবা না হলে কে করে এত ?'

মুহূর্তে কোথা থেকে কি হয়ে গেল, ছিটকে উঠল সীতু। ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'আমি চাই না, চাই না বোর্ডিঙে যেতে, দিতে হবে না কাউকে টাকা। সবসময় মিথ্যে কথা বল তুমি। আমি জানি অন্য বাবা ছিল আমার, মরে গেছে সে। আবার বিয়ে করেছ তুমি ওকে।'

না, এ কথার আর উত্তর দেওয়া হ'ল না অতসীর, সীতু ঘর থেকে চলে গেছে।

কিন্তু থাকলেই কি উত্তর দিতে পারতো অতসী ? দেবার কিছু ছিল ?

শুধু বার বার ধিক্কার দিল নিজেকে।

কি জন্যে বলা শক্ত। হয়তো মাত্র একটাই কারণে নয়।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল এল।

মৃগাঙ্ক সাড়া দিয়েছেন তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিতে।

কাঁটা হয়ে আছে অতসী, কি জানি শেষ মুহূর্তে কি না কি হয়! নিজে বলতে পারে না, মাধবকে দিয়ে বলায় খোকাবাবুকে পোশাক টোশাক পরে নিতে। আসন্ন বিচ্ছেদবেদনাখানিও বুঝি শুকিয়ে গেছে আতঙ্কের আশঙ্কায়।

কিন্তু না, অতসীর আশঙ্কা অমূলক।

কোন গোলমাল করলো না সীতু, প্রস্তুত হয়ে নিল নির্দেশমত।

মায়ের পিছু পিছু গাড়িতে গিয়ে উঠল।

শহর ছাড়িয়ে শহরতলির পথে গাড়ি ছুটছে দুরন্ত বেগে। অতসীর মনও ছুটছে সেই বেগের সঙ্গে তাল দিয়ে। অন্য পরিবেশে অন্য শিক্ষায় মানুষ হয়ে উঠবে সীতু—সভ্য হবে, মার্জিত হবে, বড় হবে। তখন হয়তো মায়ের প্রতি যা কিছু অবিচার করেছে, তার জন্য লজ্জিত হবে। হয়তো মার প্রতি দয়া আসবে ওর, আসবে মমতা।

পৃথিবীর হালচাল আর দুঃখ দুর্দশা দেখে দেখে নিশ্চয়ই বুঝবে মা তার কত হিতাকাঙ্ক্ষিণী, মা তার কত উপকার করেছে! তখন হয়তো যাকে আজ বাপ বলে স্বীকার করতে পারছে না, তাকেই শ্রদ্ধা করবে, ভালবাসবে।

কিন্তু অতসী কি অতদিন বাঁচবে ?

সেই সুখের দৃশ্য দেখা পর্যন্ত ?

'এসে গেলাম।' বললেন মৃগাঙ্ক।

সুন্দর কম্পাউণ্ড দেওয়া আবাসিক আশ্রমের গেটের সামনে গাড়ি থামল।

নতুন করে কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে অতসীর। কত ভাল মৃগাঙ্ক, কত মহৎ! নইলে

অতসীর ছেলের জন্যে, যে ছেলে মৃগাঙ্ককে বিষ নজরে দেখে, সেই ছেলের জন্যে, নির্বাচন করেছেন এমন সুন্দর সেরা স্থান!

অধ্যক্ষ এদের অভ্যর্থনা জানালেন। সব কিছু দেখে অতসী সন্তোষ প্রকাশ করছে জেনে ধন্যবাদ জানালেন, কোন ঘরে সীতুর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তা জানালেন। তারপর আফিস ঘরে এসে মৃগাঙ্কর সঙ্গে এটা ওটা লেখালিখি করিয়ে একখানা ছাপা ফরম এগিয়ে দিলেন সীতুর দিকে, 'আচ্ছা এবার তুমি নিজে এই ফরমটা 'ফিল্‌আপ্‌' করতো মাস্টার! এইখানে তোমার নামটা লেখো ইংরেজিতে।'

কলমটা টেনে নিয়ে খসখস করে লিখলো সীতু নিজের নাম।

'বাঃ বেশ হাতের লেখাটি তো তোমার?' অধ্যক্ষ ফরমের আর একটা জায়গায় আঙুল বসালেন, 'এবার এখানটায় বাবার নাম লেখো।'

বাবার!

সহসা পেনের মুখটা বন্ধ করে টেবিলে রেখে দিয়ে সীতু পরিষ্কার গলায় বলে উঠল, 'বাবার নাম জানি না।'

অধ্যক্ষ প্রথমটা একটু ধাক্কা খেলেন, তারপর কি বুঝে যেন মৃদু হেসে বললেন, 'ওঃ, আচ্ছা। আমি বলে যাচ্ছি, তুমি লেখো—'এম আর আই—'

'ও বানান বললে কি হবে? ও তো আমার কেউ নয়। আমার বাবা নেই। মরে গেছে।'

অতসী স্তব্ধ। মৃগাঙ্ক পাথর।

'আশ্চর্য!' ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করেন অধ্যক্ষ, 'তা'হলে ইনি তোমার কে হন?'

'বললাম তো, কেউ না।'

'সীতু! অতসী চাপা আর্তনাদের মত তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'কী অসভ্যতা হচ্ছে? এ রকম করছো কেন? বল সব ঠিক করে, নাম লেখো।'

'কতবার বলবো, আমার বাবার নাম আমি জানি না।'

অধ্যক্ষ ভারি থমথমে মুখে বলেন, 'ডক্টর ব্যানার্জি—'

ডক্টর ব্যানার্জি তাকিয়ে আছেন বাইরের আকাশে দুর্নিরীক্ষ্য দৃষ্টি মেলে।

অতসী উত্তর দেয় ব্যাকুলভাবে, 'দেখুন, কিছু মনে করবেন না। থেকে থেকে ওর এ রকম একটা খেয়াল চাপে, তখন—'

'থাক্‌।' অধ্যক্ষ প্রায় ভীষণ গলায় বলে ওঠেন, 'বুঝতে পেরেছি আপনি কি বলতে চাইছেন। কিন্তু এ ধরনের খেয়ালি ছেলেকে আমার এখানে রাখা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু আপনি বুঝছেন না'—মৃগাঙ্ক নিঃশব্দ, কথা চালাচ্ছে অতসী, 'ব্যাপার হচ্ছে—'

'দেখুন, আমি হয়তো বুঝি কম। সব রকম ব্যাপার হয়তো বোঝবার মত বুদ্ধি আমার

নেই, কিন্তু বললাম তো আপনাকে, কোনরকম অ্যাব্‌নর্ম্যাল ছেলেকে আমরা রাখতে পারি না। পরীক্ষায় রেজাল্ট ভাল করেছিল, চান্স দিয়েছিলাম। কিন্তু চোখে দেখে…না! মাপ করবেন আমাকে।'

তবু হাল ছাড়তে চায় না অতসী, তবু ধরে রাখতে চায়, তাই বলে, 'সীতু, একী দুষ্টুমি করলে তুমি? দেখতো ইনি কত বিরক্ত হচ্ছেন! কেন ঠিক ঠিক উত্তর দিলে না সব কথার?

'ঠিকই তো দিয়েছি।'

বুক টান টান করে বলে সীতু।

অধ্যক্ষ মৃদুহাসির সঙ্গে বলেন, 'এঁরা তা'হলে তোমার কে হন খোকা?'

'ইনি আমার মা, আর উনি আমার কেউ না।'

মাথা হেঁট করে ফিরে এসেছেন মৃগাঙ্ক ডাক্তার, নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছে অতসী। সীতুকে শাসন করবে, এ শক্তিও আর তার কোথাও অবশিষ্ট নেই। একটা কাতর আর্তনাদে যন্ত্রণা প্রকাশেরও শক্তি নেই বুঝি।

নিঃশব্দে আবার সেই শহরতলির পথে ফিরে আসে তিনজনে। পাথরের মূর্তির মত।

শুধু অতসীই বুঝি দূর আকাশের গায়ে দেখতে পেয়েছে আপন অদৃষ্টলিপি। যে আকাশ গোধূলিবেলার সব রং সমস্ত ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে সন্ধ্যার হাতে আত্মসমর্পণ করেছে।

অতসীর ভাগ্যলিপি লেখবার সময় সেই অদৃশ্য লিপিকারেব প্রাণটা কি লোহা দিয়ে বাঁধানো ছিল? আর সীতুর ভাগ্যলিপি লিখতে? শুধু হতভাগ্য নয়, শুধু দুঃখী নয়, শুধু নির্বোধ নয়—তার জন্মলগ্নস্থিত গ্রহ তাকে 'মাতৃহন্তা' হতে বলেছে!

অতসী কি শুধু ভালবাসার জন্যেই অকালবৈধব্যকে অস্বীকার করে নতুন জীবনের আলো দেখতে চেয়েছিল? চায়নি সীতুর জন্যেও অনেকখানি?

খাদ্যের অভাবে, যত্নের অভাবে, অস্থিচর্মসার হয়ে যাওয়া ছেলেটাকে বাঁচিয়ে তোলবার বাসনাটাও কি অনেকখানি সাহস জোগায়নি অতসীকে লোকলজ্জা ভুলতে?

কিন্তু আজ?

হ্যাঁ, মনের অগোচর চিন্তা নেই। আজ মনে হচ্ছে—অত দুর্দশার মধ্যেও সেই অস্থিচর্মসার দেহটুকুন টিকে থেকেছিল কি করে?

না টিকলেও তো পারতো।

সেটাই তো স্বাভাবিক ছিল।

এ কি শুধু অতসীর সমস্ত জীবনটা দুঃসহ করে দেবার ষড়যন্ত্রে বিধাতার নিষ্ঠুর কৌশল নয়?

ফেরার পথে গাড়ীতে এক অখণ্ড স্তব্ধতা! মৃগাঙ্কর হাতে ষ্টিয়ারিং কিন্তু সে যেন একটা কলের মানুষ। যে মানুষ অন্য কিছু জানে না, জানে শুধু ওই চাকাখানা ধরে গাড়ীটা এগিয়ে নিয়ে যেতে। ওর রক্ত নেই মাংস নেই। মন, মস্তিষ্ক, চিন্তা, ভাব, কোন কিছুই নেই।

অতসী জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। তার গালের ওপর একটা অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারা। সেটা বাইরের বাতাসে এক একবার শুকিয়ে উঠছে, আবার চোখ উপছে ঝরঝর করে নেমে আসছে নতুন জলের ধারা।

অতসী কখনো কাঁদে না।

সেই অকথ্য অত্যাচারী কুষ্ঠরোগগ্রস্ত সুরেশ রায়ের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়েও কাঁদে নি কখনো। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার সময় স্তব্ধ হয়ে গেছে, মৌন হয়ে গেছে, পাথর হয়ে গেছে।

ইদানীং সীতুকে নিয়ে নিরুপায়তার এক দুঃসহ জ্বালায় মাঝে মাঝে মাথার রক্ত চোখ দিয়ে নেমে এসেছে। কিন্তু হয়তো সেই শুধু এক ঝলক। তপ্ত ফুটন্ত এক ঝলক জল গালে পড়ে গালের চামড়া পুড়িয়ে দিয়ে মুহূর্তে শুকিয়ে গেছে।

এমন অবিরল অশ্রুধারায় নিজেকে কখনো উজাড় করে দেয় নি। নিঃশেষ করে দেয় নি। আজ বুঝি সংকল্প করেছে অতসী, যা তার প্রাপ্য নয়, তার জন্যে আর প্রত্যাশার পাত্র ধরে থাকবে না।

ভাগ্য তার জন্যে এককণাও বরাদ্দ করে নি। তার ললাটলিপি লেখা হয়েছে চিতাভস্মের কালি দিয়ে। অতসী বৃথাই সেখানে আশা রেখেছে, বৃথাই ভাগ্যের দরবারে আঁচল পেতে বসে থেকেছে এতদিন। আর থাকবে না।

গাড়ী এগিয়ে চলেছে। পরিচিত পথে এসে পড়েছে। এইবার বাড়ীর কাছে বাঁক নেবে। হঠাৎ অতসী গাড়ীর মধ্যে স্তব্ধতা ভেঙ্গে বলে ওঠে 'আমাদের একটু আগে নামিয়ে দেবে।'

একটু আগে নামিয়ে দেবে!

এ আবার কেমনধারা কথা!

কলের মানুষটা চমকে উঠে ঘাড় ফেরায়। ঘাড় ফেরায় জানলায় মুখ দিয়ে বসে থাকা ছোট মানুষটাও। সীতুও সেই থেকে বাইরে চোখ ফেলে বসে আছে।

তারও এবড়োখেবড়ো দীর্ণ বিদীর্ণ হৃদয়টা ভয়ঙ্কর উত্তাল এক অনুভূতিতে তোলপাড় করছে।

কী হয়ে গেল!

এটা সে কী করে বসল!

কাল থেকেই এই সংকল্প করে রেখেছে বটে সে, কিন্তু তার পরিণামটা তো পরিষ্কার করে ভাবেনি। ওদের সামনে, অন্যলোকের সামনে, মৃগাঙ্ক যে সীতুর কেউ নয় এই সত্যটা উদ্‌ঘাটন করে দিয়ে মৃগাঙ্ককে একেবারে অপদস্থর একশেষ করে দেবে সীতু, এইটুকু পর্যন্তই

ভাবা ছিল। কিন্তু সেই সংকল্প সাধনের মাশুল দিতে যে অনেক দিনের আশা আর আশ্বাসের বোর্ডিং-বাসটা হারাতে হবে এটা কি করে ভাববে সে ?

যতই দুর্মতি হোক তবু শিশু তো !

সীতু ভেবেছিল, ওই ভাবে বাবাকে অপদস্থ করে সে স্কুলের কর্তাকে বলবে, যেহেতু ওই ডাক্তারটা তার বাবা নয়, সেই হেতু সীতেশ তার দেওয়া টাকা নেবে না। ইস্কুল কর্তারা যেন সীতুকে অমনি অমনি না পয়সা নিয়েই এখানে রাখেন। সীতু বড় হলে টাকা রোজগার করে সব শোধ করে দেবে।

কিন্তু সে সব কথা বলবার তো সুবিধেই হ'ল না। আর সত্যি বলতে, সাহসও হল না। বোর্ডিঙের কর্তা যেন মৃগাঙ্কর চাইতেও ভয়ঙ্কর ! মুখের দিকে তাকানই যায় না।

বাবা গাড়ীতে উঠতে বললে, 'কিছুতেই তোমার সঙ্গে যাব না, এখানেই থাকবো' বলে মাটিতে শুয়ে পড়বার সংকল্পটাও কাজে পরিণত করা গেল না। আস্তে আস্তে গাড়ীতেই উঠে বসতে হল।

গাড়ী চলছে।

চলছে সীতুর চিন্তার স্রোত।

আচ্ছা, সীতু যদি এই খুকুর বাবাটাকে অপদস্থ করতে না চাইত ? যদি বাপের নাম লিখতে বললে ওর নামই লিখত ? তাহলে তো আর চলে আসতে হত না ?

মৃগাঙ্কর বাড়ী ছেড়ে, অন্য একটা জায়গায়, সুন্দর একটা জায়গায় থাকতে পেত সীতু। কিন্তু ? ওই কর্তাটা ? ওটা যে বাড়ীর বাবাটার চাইতেও বিচ্ছিরি। তাছাড়া সেই অতসীর সেদিনের কথা !

মাসে মাসে তিনশো টাকা করে পাঠাতে হবে মৃগাঙ্ককে। কেন নেবে সীতু সে টাকা ? সীতুর জন্যে অত কিছু চাই না।

এই যে বাড়ীতে ?

বেশী কিছু খায় সীতু ? মোটেই না। সীতুর জন্যে যাতে মোটেই বেশী খরচা না হয় তা দেখে সীতু। অথচ বোর্ডিঙে থাকলে মা সব সময় ভাববে, ওই বাবাটা সীতুকে কিনে রেখেছে।

কিন্তু আবার সেই বাড়ী !

সেই বামুনদি, নেপ বাহাদুর, কানাই, মোক্ষদা ! সীতু যদি গাড়ীর দরজাটা খুলে নেমে পড়ে ? অনেকে তো নাকি চলন্ত গাড়ী থেকে নামে। কিন্তু গাড়ী চলতেই থাকে। পেরে ওঠা যায় না।

ঠিক এই সময় হঠাৎ অতসীর গলা কানে এল। অতসী বলছে, 'আমাদের আগে নামিয়ে দেবে।'

ঠিক অনুরোধ নয়, যেন একটা ঠিক করে রাখা ব্যবস্থা, শুধু মনে করিয়ে দেওয়া।

আমাদের মানে কি ?

কাদের ?

মার কথাটা অনুধাবন করতে পারে না সীতু। কিন্তু কথাটা যেন ভয়ঙ্কর একটা আশাপ্রদ। একথা যেন বলছে সীতুকে—আর সেই বামুনদি, কানাই, নেপ বাহাদুরের বাড়ীতে ঢুকতে হবে না।

মৃগাঙ্ক কি বলেন শোনবার জন্যে কান খাড়া করে বসে থাকে সীতু। শুনতে পায়—শান্ত মার্জিত মৃদুগলায় মৃগাঙ্ক বলছেন, 'তোমাদের আগে নামিয়ে দেব! কোথায় নামিয়ে দেব ?'

'যেখানে হোক।' বলছে অতসী, 'দুঃখের মধ্যে, দৈন্যের মধ্যে, রিক্ততার মধ্যে।'

একি! মৃগাঙ্ক হেসে উঠলেন যে!

কি বলছেন ?

'অত ভাল ভাল জিনিসগুলো এখন চট্ করে কোথায় পাই বলতো ?'

কানকে আরও তীক্ষ্ণ করতে হচ্ছে সীতুকে, কারণ এ রাস্তাটা শহর ছাড়ানো ফাঁকা রাস্তা নয়। শব্দ হচ্ছে আশেপাশে। আর অতসীর কণ্ঠ মৃদু।

'উড়িয়ে দিলে চলবে না।' মৃদু তবু দৃঢ় কণ্ঠে বললে অতসী, 'সীতুকে নিয়ে আর আমি ওবাড়ীতে ঢুকবো না।'

মৃগাঙ্ক বলেন, 'ছেলেমানুষী করে লাভ কি অতসী ?'

'না, না, ছেলেমানুষী নয়', অতসীর মৃদুকণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। 'এ আমার স্থির সংকল্প। তুমি এখন আমাদের এখানে এই শ্যামলীর বাড়ীতে নামিয়ে দাও, তারপর যত শীগগির সম্ভব ছোট একখানা ঘর, যেমন ঘরে আমার থাকা উচিত ছিল, সীতুর থাকা উচিত ছিল, তেমনি একখানা দৈন্যের ঘর জোগাড় করে নেব আমি।'

তবুও মৃগাঙ্কর কণ্ঠে কি বিদ্রূপ ?

সেই বিদ্রূপের কণ্ঠই উচ্চারণ করছে, 'তার পর ?'

'তুমি ব্যঙ্গ কর, উড়িয়ে দিতে চেষ্টা কর, কিন্তু পারবে না। আমার ভবিষ্যৎ আমি স্থির করে নিয়েছি। তারপর—বাঙলা দেশের অসংখ্য নিঃসম্বল মেয়ে যেমন করে নাবালক ছেলে নিয়ে ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে এগিয়ে চলে, তেমনিই করতে চেষ্টা করব।'

'মৃগাঙ্কর গাড়ীর গতি মন্দীভূত হয়েছে, তবু মৃগাঙ্ক পিঠ ফিরিয়েই কথা বলছেন—'ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে এগিয়ে চলে না অতসী, যুদ্ধ করে হারে, যুদ্ধ করে মরে।'

'সেইটাই আমার অদৃষ্টলিপি মনে করব।' মৃত্যুর মত নিষ্ঠুর, মৃত্যুর মত অমোঘ ভঙ্গিতে বলে অতসী, 'মনে করবো তাদেরই একজন আমি। আমার জীবনে কোনদিন দেবতার দর্শন হয়নি, কোনদিন স্বর্গ থেকে আলোর আশীর্বাদ ঝরে পড়েনি। আমি কুষ্ঠব্যাধিতে গলে পচে মরে যাওয়া সুরেশ রায়ের নাবালক পুত্রের রক্ষয়িত্রী মাত্র।...এই যে এসে পড়েছে শ্যামলীর বাড়ী। নামতে দাও আমাদের।'

মৃগাঙ্ক স্থিরভাবে বলেন, 'কি বলবে ওদের ?'

'যা সত্যি তাই বলব। আর বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যার ছলনা দিয়ে খেলার স্বর্গ গড়ব না। গাড়ী থামাও।'

মৃগাঙ্ক গাড়ী থামালেন।

বললেন, 'তোমার হিসেবের খাতা থেকে একটা ছোট্ট হিসেব বোধহয় খসে পড়েছে অতসী! এ পৃথিবীতে খুকু বলে একটা জীব আছে সেটা বোধহয় ভুলে গেছ!'

'না ভুলিনি।' অতসী গাড়ীর জানলার ধারে মাথা রাখে, 'কত শিশুই তো শৈশবে মাতৃহীন হয়, খুকুর জীবনেও তাই ঘটেছে এইটাই ধরে নিতে হবে।'

মৃগাঙ্ক বলেন, 'অর্থাৎ তা'কেও ফেলে দিতে হবে দুঃখের মধ্যে, দৈন্যের মধ্যে, রিক্ততার মধ্যে'! কিন্তু একা আমার অপরাধে এত জনে মিলে কষ্ট পেয়ে লাভ কি? এ মঞ্চ থেকে যদি মৃগাঙ্ক ডাক্তারের অন্তর্ধান ঘটে, তাহলেই তো সব সোজা হয়ে যায়। সুরেশ রায়ের বিধবা স্ত্রীর পরিচয় বহন না করে, না হয় সেই হতভাগ্যের স্ত্রীর পরিচয়েই তার নাবালক সন্তানদের রক্ষয়িত্রী হয়ে থাকলে! অন্ততঃ দুটো শিশুহত্যার পাপ থেকে রক্ষা পাবে।'

অতসী ততক্ষণে নেমে পড়েছে। আঁচলটা মাথায় টেনে নিয়ে বলে, 'সে পাপ থেকে রক্ষা পাবার ভাগ্য নিয়ে সবাই পৃথিবীতে আসে না। খুকুর কোন অভাব হবে না। খুকুর তুমি আছ।'

মৃগাঙ্কও গাড়ী থেকে নেমেছিলেন, তাতে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে অতসীর চোখে চোখ রেখে বলেন, 'তুমি পারবে?'

'মানুষ কি না পারে? মেয়েমানুষ আরো বেশীই পারে।'

'আমার থেকে, খুকুর থেকে, একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকতে চাও তা'হলে?'

অতসী হতাশ গলায় বলে, 'এখন আমি হয়তো সব কিছু গুছিয়ে বলতে পারব না। তবু এইটুকুই বলছি, সীতুকে সীতুর যথার্থ অবস্থার মধ্যে রাখতে চাই। অহরহ আর বৃথা চেষ্টা, আর ব্যর্থ আশার বোঝা বইতে পারছি না আমি।…সীতু নেমে এস।'

'কোথায় যাবো?'

ক্ষীণস্বরে বলে সীতু।

'সে প্রশ্ন করবার দরকার তোমার নেই সীতু, অধিকারও নেই। ও বাড়ীতে ফিরে যাওয়া তোমার আর হবে না, এইটুকুই শুধু জেনে রাখ।' বলে মৃগাঙ্কর দিকে পূর্ণ গভীর একটি দৃষ্টি ফেলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শ্যামলীর বাড়ীর দিকে এগোয়। সীতুর হাতটা চেপে ধরে।

মৃগাঙ্ক ধীর স্বরে বলেন, 'সীতুর জিনিসপত্রগুলো গাড়ীতে থেকে যাচ্ছে।'

'ও জিনিস সীতুর জন্যে নয়।'

মৃগাঙ্ক এবার ক্ষুব্ধস্বরে বলেন, 'আজ তোমার মনের অবস্থা চঞ্চল, তাই এমন সব অদ্ভুত

কথা বলতে পারছ। বেশ, আজ রাতটা থাকতে ইচ্ছে হয় থাকো এখানে, খুকুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। রাতে তোমার কাছ ছাড়া হয়ে সে কখনো থাকতে পারে ?'

অতসী বোঝে, মৃগাঙ্ক আবার সমস্তটাই সহজ করে নিতে চাইছেন, লঘু করে নিতে চাইছেন। তাই দৃঢ়স্বরে বলে, 'খুকুর মা এইমাত্র মোটর এ্যাকসিডেণ্টে মারা গেছে।'

তবু মৃগাঙ্ক বলেন, 'অতসী, তোমার সিদ্ধান্ত দেখে মনে হচ্ছে, একমাত্র অপরাধী হয়তো আমিই। তাই যদি হয়, আমি হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছি।'

অতসী বলে, 'ও কথা বলে আর আমায় অপরাধী কোরনা। শাস্তি যার পাবার, তাকেই পেতে হবে। আর আজ থেকেই তার সুরু। সীতু চল।'

বড় রাস্তা থেকে হাত কয়েক ভিতরে শ্যামলীর বাড়ী। অতসী তার মধ্যে ঢুকে সীতুকে নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

মৃগাঙ্ক দাঁড়িয়ে থাকেন।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন।

তারপর গাড়ীতে ওঠেন।

চিরকালের মত একটা কিছু ঘটে গেলো এটা কিছুতেই ভাবা সম্ভব নয়। শুধু ভাবতে থাকেন, খুকুটাকে নিয়ে কি করবেন আজ রাত্রে।

অতসীর ভাগ্যলিপি রচিত হয়েছিল চিতাভস্মের কালি দিয়ে। এই ভয়ঙ্কর সত্যটা টের পেয়ে গেছে অতসী। টের পেয়ে গেছে বলেই নিজের জীবনের চিতা রচনা করল সে নিজেই। জীবনকে বিদায় দিল জীবন থেকে। জোর করে চলে এল ভালবাসার সংসার থেকে। যে সংসারে আরাম ছিল আশ্রয় ছিল, সমাজের পরিচয় ছিল, আর ছিল একান্ত ব্যাকুলতার আহ্বান।

সে সংসারকে ত্যাগ করে চলে এসেছে অতসী, সে ডাককে অবহেলা করেছে ভাগ্যের উপর প্রতিশোধ নিতে। ভাগ্য যদি তাকে সব দিয়েও সব কিছু থেকে বঞ্চিত করে কৌতুক করতে চায়, নেবে না অতসী সেই কৌতুকের দান।

তুমি কাড়ছ ?

তার আগেই আমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করছি। কি নিয়ে আত্মপ্রসাদ করবে তুমি কর।

কিন্তু অতসীর সব আক্রোশ কি শুধু ভাগ্যেরই উপর ? তার প্রতিশোধের লক্ষ্য কি আর কেউ নয় ? নয়-আট বছরের একটা নির্বোধ বালক ? তার উপরও কি একটা হিংস্র প্রতিশোধ উদগ্র হয়ে ওঠেনি অতসীর ?

হ্যাঁ, সীতুর উপরও হিংস্র হয়ে উঠেছিল অতসী।

তাই প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়েছে।

বুঝুক হতভাগা ছেলে পৃথিবী কাকে বলে, দারিদ্র্য কাকে বলে, অভাবের যন্ত্রণা কাকে বলে। সুরেশ রায়ের পরিচয় নিয়ে এই উদাসীন নির্মম পৃথিবীতে কতদিন টিঁকে থাকতে পারে সে দেখুক। সে দেখা তো শুধু চোখের দেখা নয়। প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে দেখা।

অতসী সেই দিনই মরতে পারতো। কিন্তু মরেনি। মরেনি সীতুর জন্যে।

না সীতুর মায়ায় নয়। সীতুকে রক্ষা করবার জন্যেও নয়, মরেনি সীতুর পরাজয় চোখ মেলে দেখবার জন্যে।

তিলে তিলে অনুভব করুক সীতু মৃগাঙ্ক তাকে কী দিয়েছিল, অনুভব করুক মৃগাঙ্ক তার কী ছিল!

সেই রাত্রে অদ্ভুত জিদ করে মৃগাঙ্কর গাড়ী থেকে নেমে পড়েছিল অতসী ছেলেকে নিয়ে। সুরেশ রায়ের ভাইঝির বাড়ীর দরজায়।

কী যেন ভেবে মৃগাঙ্ক আর বেশী বাধা দেননি। অথবা তাঁর ক্লান্ত পীড়িত বিপর্য্যস্ত মন বাধা দেবার শক্তি সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি। হয়তো ভেবেছিলেন 'থাকগে খানিকক্ষণ! হয়তো ছেলের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চায়। এই জায়গাটাই যদি অতসী বেশ প্রশস্ত মনে করে থাকে তো করুক।'

তারপর ঘণ্টা দুই পরে একবার গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন 'মাইজীকে' নিয়ে আসতে। সে গাড়ী ফিরে গিয়েছিল শূন্যহৃদয় নিয়ে।

'মাইজী আসলেন না।'

মৃগাঙ্ক একটা ভ্রুকুটি করে বলেছিলেন, 'ঠিক আছে। কাল সবেরমে ফিন্ যানে পড়ে গা। সাত বাজে।'

কিন্তু সকালের গাড়ীও ফিরে এল সেই একই বার্ত্তা নিয়ে।

'মাইজী আয়া নেই! ওহি কোঠিমে—'

মৃগাঙ্ক হাত নেড়ে থামিয়ে দিয়েছিলেন।

তারপর মৃগাঙ্ক ডাক্তার নিজেই গিয়েছিলেন সুরেশ রায়ের ভাইঝির বাড়ী। বসেছিলেন তার বসবার ঘরে। রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন, 'পাগলামী করো না অতসী, চল।'

অতসীর চোখের সব জল বুঝি কালকেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই অত শুকনো গলায় উত্তর দিয়েছিল, 'পাগলামী নয়, এটা আমার সিদ্ধান্ত।'

'বৃথা অভিমান করে লাভ কি অতসী? আর কার উপরই বা করছো? আমরা সকলেই ভাগ্যের হাতের খেলনা।'

'অভিমান নয়। কারো ওপর আমার অভিমান নেই, শুধু যে ভাগ্য আমাদের খেলনার মত খেলতে চায়, তার হাত থেকে ছিটকে সরে যেতে চাই। দেখতে চাই সর্বনাশের রূপ কী?'

'সে রূপ তো তোমার একেবারে অজানা নয় অতসী !'

ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন মৃগাঙ্ক।

অতসী বলেছিল, 'ভুল করছ। সুরেশ রায়ের সংসারে আমার শুধু অসুবিধে ছিল, যন্ত্রণা ছিল, জ্বালা ছিল, আর কিছু ছিল না। তাই সুরেশ রায়ের রোগ আর মৃত্যু আমাকে সর্বনাশের চেহারা দেখাতে পারেনি। যা দেখিয়েছিল সে হচ্ছে চিন্তার বিভীষিকা। আর কিছু না। যেখানে কিছু নেই সেখানে সর্বনাশেরও প্রশ্ন নেই।'

পরের বাড়ীতে আড়ষ্ট পরিবেশের মধ্যে আরও ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন মৃগাঙ্ক। বুঝি অতসীর স্থির সংকল্পের দৃষ্টির মধ্যে নিজের সর্বনাশের ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন। তাই বলে উঠেছিলেন, 'ইচ্ছে করে সবাই মিলে শাস্তি ভোগ করবার এমন ভয়ঙ্কর সাধ তোমায় পেয়ে বসল কেন অতসী ? সীতু কি তোমার রাগের যোগ্য ?'

'রাগের কথা নয়।'

'বল তবে কিসের কথা ?'

'সে তোমায় বোঝাতে পারব না।'

'বোঝাবার যে কিছু নেই অতসী, কী করে বোঝাবে ? হঠাৎ একটা আঘাতে তোমার বুদ্ধিবৃত্তি অসাড় হয়ে গেছে, তাই এমন একটা আজগুবি কল্পনা পেয়ে বসেছে। চলো বাড়ী চলো। সেখানে মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবো।'

'অদ্ভুত রকমের ঠাণ্ডা আছে মাথা। এই ঠাণ্ডা মাথাতেই ভেবে দেখেছি তোমার ঘরে ফিরে যাবার উপায় আমার আর নেই। সীতুর যা সত্যকার ভাগ্য, যে ভাগ্যকেই ও অহরহ চাইছে, সেই ভাগ্যের মধ্যেই সীতুকে নিয়ে বাস করতে হবে আমাকে।'

'আমি তোমায় কথা দিচ্ছি অতসী, সীতুর উপযুক্ত ব্যবস্থা আমি শীগগিরই করে দেব। এখন বুঝতে পারছি ভুলই করেছিলাম। অন্য কোথাও দূর বিদেশে কোনও বোর্ডিংএ ভর্তি করে দেব ওকে, ওর যথার্থ পরিচয় দিয়ে, পিতৃহীন সীতেশ রায় নাম দিয়ে। হয়তো তাতেই ও শান্তি পাবে।'

'না !'

'না ?'

'না। তোমার দেওয়া ব্যবস্থায় ওকে মানুষ হয়ে উঠতে দেব না আমি।'

'আমার দেওয়া ব্যবস্থায় ওকে মানুষ হতে দেবে না ? অতসী, আমাকে বুঝিয়ে দেবে কি, এ তোমার অহঙ্কার না অভিমান ?'

'বলেছি তো অহঙ্কারও নয় অভিমানও নয়। এ শুধু বিচার-বিবেচনার সিদ্ধান্ত। তোমার দেওয়া ব্যবস্থায় মানুষ হয়ে ওঠবার সুযোগ আমি দেব না সীতুকে। দুধ কলা আর কাল সাপের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে তোমায় সাপের বংশধর, এবার মুক্তি দাও আমায়। সেই একই দৃশ্য আর দেখবার শক্তি আমার নেই।'

'বেশ, আমি ওকে কোন দুঃস্থ ছেলেদের সংস্থায় ভর্তি করে দেব, যেখানে পয়সা লাগে না, ফ্রী সীট।'

অতসী অপলকে এক সেকেণ্ড তাকিয়ে নিয়ে বলেছিল, 'অনাথ আশ্রম?'

এবার মৃগাঙ্ক ডাক্তারের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। ভয়ঙ্কর একটা চাপা গলায় বলে উঠেছিলেন তিনি, 'যদি তাই-ই হয়। আমার কোন সাহায্যই যদি নিতে না দাও তোমার ছেলেকে, অনাথ আশ্রম ছাড়া আর কোথায় আশ্রয় জুটবে ওর?'

'সে আশ্রয় তো জুটিয়ে দিতে হয় না। অবস্থাই ওকে সে জায়গা জুটিয়ে দিতে পারবে।'

মৃগাঙ্ক এবার ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে ফেলেছিলেন, 'কুটিল বুদ্ধির মারপ্যাচ শুধু তোমার ছেলের মধ্যেই নেই অতসী, তোমাতেও তার ছোঁয়াচ লেগেছে। সহজ কথা, যুক্তির কথা, বুদ্ধির কথা, কিছুতেই বুঝবে না, এই যেন প্রতিজ্ঞা করে বসে আছ। যা বলছ তা যে কিছুতেই সম্ভব নয়, এটা যেন চোখ বুজে অস্বীকার করতে চাও। মায়ে ছেলেতে মিলে সব রকমে কেবল আমার মুখ হাসাবে, এমন ভয়ানক প্রতিজ্ঞাই বা কেন তোমাদের? বুঝতে পারছ না কতটা মাথা হেঁট করে এবাড়ীতে আসতে হয়েছে আমাকে! কতটা—'

অতসী বাধা দিয়ে বলেছিল, 'বুঝতে পেরেছি বলেই তো এইখানেই তার শেষ করে দিতে চাইছি। চাইছি মাথা হেঁটের পুনরাবৃত্তি আর যাতে না হয়।'

'চমৎকার! তুমি এইখানে পরের বাড়ীতে বাস করবে এতে আমার মুখ খুব উজ্জ্বল হবে?' বলেছিলেন মৃগাঙ্ক। অতসী হেসেছিল।

হ্যাঁ, হেসেই বলেছিল অতসী, 'তাই কখনো ভাবতে পারি আমি? না তাই থাকতে পারি? থাকবো এখানে নয়, হয়তো বা এদেশেও নয়। তোমার চোখ থেকে, তোমার জীবন থেকে নিজেকে একেবারে মুছে নিয়ে সরে যাবো।'

লোহাও গলে বৈকি!

তেমন তাপে গলে।

মৃগাঙ্ক ডাক্তারের চোখ দিয়েও জল পড়ে।

'আমার জীবন থেকে নিজেকে মুছে নিয়ে সরে যাবে, এ কথাটা উচ্চারণ করতে পারলে অতসী?'

'পারলাম তো!'

'হ্যাঁ পারলে তো! তাই দেখছি। আর কত সহজেই পারলে! কিন্তু অতসী, শুধু আমার চোখ থেকেই নিজেকে মুছে ফেলতে নয়, নিজের মন থেকেও নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলতে চাইছ যে, তুমি কেবলমাত্র মৃত সুরেশ রায়ের ছেলের মা নও, খুকুরও মা!'

'তার উত্তর তো কালই দিয়েছি। লোকের তো মা মরে। খুকুর মত অনেক বাচ্চারও মা থাকে না। খুকুরও মা থাকবে না। ধরে নাও খুকুর মা মরে গেছে।'

'চমৎকার। চমৎকার তোমার প্রব্‌লেম্ সল্‌ভ করার ক্ষমতা। কিন্তু তবুও প্রশ্নের জের থেকে যায় অতসী,' মৃগাঙ্ক ডাক্তার তিক্ত ব্যঙ্গের সুরে বলেন, 'শেষ হয় না। ভুলে যেও না তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী। সুরেশ রায়ের বিধবাকে প্রলোভিত করে এমনি নিয়ে এসে আটকে রাখিনি আমি। আইনতঃ তোমার ওপর আমার জোর আছে। যা খুসি করবার স্বাধীনতা তোমার নেই।'

অতসী আবার হেসে বলে. 'জোর খাটাবে?'

'যদি খাটাই?'

'তবে তাই দেখ।'

'অতসী, এত নিষ্ঠুর তুমি হলে কি করে? তোমার ওই নিষ্ঠুর নির্দ্দয় ছেলেটা কি তোমাকে এমনি করেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে? এখন কি মনে হচ্ছে জানো অতসী, সুরেশ রায়ের সেই রোগা পাকাটির মত ছেলেটাকে আমি বাঁচতে দিয়েছিলাম কেন? কেন কৌশলে শয়তানের জড়কে শেষ করে দিইনি।'

না অতসী রেগে যায়নি. কেঁদেও ফেলেনি, বরং হাসির মত মুখ করেই বলেছিল. 'এর চাইতে আরও অনেক বেশী কঠিন কথা বললেও আমি তোমায় দোষ দেব না।'

'অতসী, তোমায় হাত জোড় করে বলছি, পাগলামী ছাড়ো। রাগের মাথায় যা মুখে আসছে বলছি, ক্ষমা করতে পারো কোরো। না পারলে কোর না। দোহাই তোমার, এখন অন্ততঃ বাড়ী চলো। তারপর—'

'ও কথা তো আগেও বলেছ। কিন্তু আমায় মাপ করো।'

মৃগাঙ্ক ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন, 'না। কিছুতেই আমি তোমাকে মাপ করবো না। কিছুতেই তোমার পাগলামীর তালে চলবো না। জোরই খাটাবো। পুলিশের সাহায্যে নিয়ে যাবো তোমাকে। এদের নামে চার্জ আনবো, আমার স্ত্রী-পুত্রকে দুরভিসন্ধির বশে আটকে রেখেছে।'

অতসী তবুও হেসেছিল।

বলেছিল 'তা তুমি পারবে না আমি জানি।'

'জানো? জানো বলে এত সাহস তোমার? তুমি আমার কতটুকু জানো অতসী? ক'দিন তুমি দেখেছ আমায়?

'তবে ডাকো পুলিশ।'

বলে স্থির হয়ে বসে থেকেছিল অতসী।

তারপরেও অনেক কথা বলেছিলেন মৃগাঙ্ক, অনেক সাধ্য সাধনা করেছিলেন। এমন কি এও বলেছিলেন, অতসী যদি মৃগাঙ্কর সঙ্গে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চায়, তো সে ব্যবস্থাও করে দেবেন মৃগাঙ্ক। চেম্বারে থাকবেন তিনি, নয়তো অন্যত্র কোথাও থাকবার ব্যবস্থা করে নেবেন। অথবা অতসীকেই দেবেন আলাদা ফ্ল্যাটে থাকার সুযোগ। তবু

আজ এদের বাড়ী থেকে চলুক অতসী। সুরেশ রায়ের ভাইঝিকে একান্ত আত্মীয় বলে আঁকড়ে ধরে থেকে এমন করে মৃগাঙ্কর গালে কালি না মাখায় যেন।

কিন্তু অতসী টলেনি। শুধু কথা দিয়েছিল এবাড়ীতেও আর বেশীক্ষণ থাকবে না। ঘণ্টা কয়েক পরেই চলে যাবে।

'কোথায় যাবে? ছেলেকে গলায় বেঁধে গঙ্গায় ডুবতে?' বলেছিলেন মৃগাঙ্ক। অসহিষ্ণু হয়ে অস্থির হয়ে বলেছিলেন।

অতসী এত জোর সঞ্চয় করলো কখন?

কোথায় পেল এত সাহস, এত মনোবল? কী করে পারলো এর পরেও অটল থাকতে?

'তা' আত্মহত্যাও তো করে মানুষ। ধরে নাও এও তাই।'

'সীতুকে একবার ডেকে দেবে আমার কাছে? আমার ভাগ্য দেবতার সেই নিষ্ঠুর পরিহাসের কাছে, আমার জীবনের সেই শনির কাছে একবার হাত জোড় করি আমি!'

'ছি: একথা ভেবোনা। তুমি কি ভাবছ শুধু সীতুর জন্যেই আমার এই সংকল্প? তা ভাবলে ভুল হবে। এ আমার নিজের জন্যেও। দেখছি ভাগ্যের কাছে আমার যা প্রাপ্য পাওনা নয়, তাই জোর করে পেতে গিয়েই ভাগ্যের সঙ্গে এত সংঘর্ষ। আমি তো তোমার জীবনে বেশীদিন আসিনি, মনে করো সেই আগের জীবনেই আছো তুমি। আমি কোন দিনই—'

'খুহটাকে গোড়া থেকেই হিসেবের বাইরে রাখছ এইটাই এক অদ্ভুত রহস্য বলে মনে হচ্ছে অতসী! আশ্চর্য্য! তোমার মাতৃস্নেহধারা কি শুধু ওই একটা জায়গায় এসেই জমাট হয়ে থেমে গেছে, আর এগোতে পারে নি? খুকু কি তোমার সন্তান নয়? নাকি ওকে তুমি মনের বৈধ সন্তান বলে গ্রহণ করতে পার নি? অবৈধর পর্য্যায়ে রেখে দিয়েছ?'

অতসী কি সত্যিই ওর চোখ দুটোকে আর মনটাকে পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে ফেলেছিল, তাই একথার পরও একেবারে শুকনো খটখটে চোখে তাকিয়ে বলতে পেরেছিল, 'বলেছি তো যত কঠিন কথাই তুমি বল, দোষ তোমায় দেব না আমি।'

তারপর?

তারপর চলে এসেছে অতসী এইখানে।

শিবপুর লেনের একটা জরাজীর্ণ পচাবাড়ীর একতলার একখানা ঘরে। শ্যামলীর বর অনুরোধে পড়ে বাধ্য হয়ে এ জায়গা খুঁজে জোগাড় করে দিয়েছে।

সেদিন শ্যামলী অবাক বিস্ময়ে কথা খুঁজে পায়নি। বোবার মত তাকিয়ে ছিল ফ্যালফ্যাল করে। অতসীই আশ্বাস দিয়ে ওর সাড় এনেছিল। বলেছিল, 'জীবনের রহস্য অপার শ্যামলী! সে কারো কাছে আসে বন্ধুর বেশে, কারো কাছে আসে রুদ্রের বেশে। তার

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, পাথরে নিস্ফল মাথা কোটার সামিল। জীবনের পঙ্কিল রূপ দেখেছি, সুন্দর রূপও দেখেছি, এবার দেখবো ভয়াবহ রুদ্রের মূর্ত্তিটা কেমন।'

'তার মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নেই কাকীমা! হাজার হাজার মানুষ আমাদেরই আশেপাশে সেই রুদ্রের অভিশাপ মাথায় বয়ে বেড়াচ্ছে। রোগে ওষুধ নেই, পেটে ভাত নেই—'

'একটু ভুল করছিস শ্যামলী! ওটা তো হচ্ছে কেবলমাত্র অভাবের চেহারা, দারিদ্র্যের চেহারা। আমার সমস্যা আলাদা। আমার জন্যে খোলা পড়ে আছে আশ্রয় আরাম স্বাচ্ছন্দ্য, কিন্তু ভাগ্য আমাকে তা নিতে দেবে না—'

হঠাৎ রেগে উঠেছিল শ্যামলী। বলে উঠেছিল, 'ভাগ্য না হাতী! নিজের জেদেই আপনি—' রাগ রাখতে পারেনি, কেঁদে ফেলে বলেছিল, 'নইলে আট ন'বছরের একটা ছেলের দুষ্টুমীকে এত বড় করে দেখার কোন মানেই হয় না! ডাক্তার কাকাবাবুর মত মানুষকে আপনি ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, এ আমি ভাবতেই পারছি না—'

'ছিঃ শ্যামলী, ভুল করিস না!'

'ও আপনার ভুল-ঠিক বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই কাকীমা! কিছু নয়, এ আমারই ভাগ্য। হঠাৎ কাছাকাছির মধ্যে আপনাকে পেয়ে গিয়ে বর্ত্তে গিয়েছিলাম কি না, সেটা ভাগ্যে সইল না।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সীতুর আচরণে শ্যামলীকেও হার মানতে হয়েছিল। বোর্ডিং থেকে নেমে সেই যে সীতু শ্যামলীদের একটা বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল, পুরো দু'দিন তাকে সেখান থেকে মুখ তোলানো যায়নি। অস্নাত, অভুক্ত, এমন কি জল পর্যন্ত না খেয়ে পড়ে থাকা কাঠের মত শক্ত ছেলেটাকে বারবার খোসামোদ করে ওঠানর চেষ্টায় হার মেনে হতাশ শ্যামলী বলেছিল, 'এ তো দেখছি বদ্ধ পাগল! একে স্কুল বোর্ডিঙে ভর্ত্তি করবার চেষ্টা না করে পাগলা গারদে ভর্ত্তি করে দেওয়া উচিত ছিল আপনার।'

অতসী বলেছিল, 'এ রকম পাগল ওর বাপ ছিল, ঠাকুর্দ্দা ছিলেন, তারা তো জীবনের শেষ অবধি গারদের বাইরেই রয়ে গেলেন শ্যামলী! কেউ বলে নি ওদের পাগলা গারদে পাঠিয়ে দাও।'

'বলে নি, তাই আজ এই অবস্থা। শেষ অবধি হয়তো আপনাকেই সেখানে যেতে হবে।'

'তা' যদি হয় শ্যামলী, সমস্ত কর্ত্তব্যের বোঝা, সমস্ত বিচার বিবেচনার বোছা মাথা থেকে নামিয়ে হালকা হয়ে বেঁচে যাই। কিন্তু তা' হবে না। তোর কাকীমার স্নায়ু বড় বেশী জোরালো শ্যামলী!'

'তাই অমন ছেলে জন্মেছে।' বলে আর এক দফা কেঁদে ফেলেছিল শ্যামলী।

বোঝা যায় নি সীতু এসব কথা শুনতে পাচ্ছে কি না। মনে হচ্ছিল একটা পাথরের পুতুল শুয়ে আছে। দেড়দিনের অক্লান্ত চেষ্টায় যখন শ্যামলীর বর শিবপুরের এই ঘরখানা জোগাড় করে সে খবর নিয়ে এসে দাঁড়াল, আর অতসী বলল, 'সীতু ওঠ, আমাদের অন্য জায়গায় যেতে

হবে', তখন দেখা গেল সীতু বলে ওই ছেলেটার শ্রবণেন্দ্রিয় অবিকল বজায় আছে। ভাবলেশ শূন্য মুখে উঠে মায়ের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকল।

শিবপুর লেনের এই ঘরখানাতেও মায়ে ছেলের কাছাকাছি থাকা ছাড়া উপায় নেই, কারণ আটফুট বাই দশফুট এই ভাঙ্গা ঘরখানার মধ্যেই অতসীর এই নতুন জীবনের সমগ্র সংসার। এর মধ্যেই তার খাওয়া শোওয়া থাকার সমস্ত সরঞ্জাম।

হ্যাঁ, মৃগাঙ্ক ডাক্তারের কিছু সাহায্য অতসীকে নিতে হয়েছিল। গলার হারটা আর হাতের চুড়ি কটা তো মৃগাঙ্ক ডাক্তারেরই দেওয়া। ভারী কিছু নয়, ভারী গহনার স্থূলতা অতসীর রুচিতে সইত না, তবু নেহাৎই হালকা ওই আভরণটুকু অতসীর নতুন সংসারের মূলধন।

এখানে ওই নিরাভরণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতেই বুঝি অতসী তার শাড়ীখানাও সীমা-রেখাহীন সাদায় পরিণত করে নিয়েছে। এখানে তার পরিচয় নাবালক সীতেশ রায়ের মা বিধবা অতসী রায়।

তা' সন্দেহের দৃষ্টিতে কেউ তাকায় নি।

এযুগ আগের যুগের মত শ্যেনচক্ষু নয়। এযুগে বাংলা দেশের এমন হাজার হাজার বিধবা মেয়ে আত্মীয়ের আশ্রয় ছেড়ে নাবালক ছেলে নিয়ে জীবন যুদ্ধে নামে।

কিন্তু অতসীর হাতে যুদ্ধের অস্ত্র কই?

বাড়ীওয়ালা গিন্নী মাঝে মাঝে দোতলা থেকে নেমে এসে ভাড়াটের দরজায় দাঁড়ান, সমবেদনা জানান, আর প্রশ্ন করেন, 'ছেলে তোমার ইস্কুলে ভর্তি হয় নি?'

মানুষটা সাদাসিধে স্নেহ-প্রবণ, কৌতূহলের বশে প্রশ্ন করেন না, সহৃদয়তার বশেই করেন। বলেন, 'ওটুকুকে মানুষ করে তুলতে পারলেই তোমার দিন কেনা হয়ে গেল মা, ওকে যাহোক করে মানুষ করে তুলতেই হবে। একদিন এই দুঃখিনী তুমিই 'রাজার মা' হয়ে বসবে, তখন পাঁচটা কনের বাপ তোমার দোরে এসে সাধবে। ছেলের মত জিনিস আর আছে মা? এই যে আমি, তিন তিনটে তো বিইয়েছি, তিনটেই মাটির ঢিপি। এককাঁড়ি খরচ করে বিয়ে দিয়েছি, যে যার আপন সংসারে রাজত্ব করতে চলে গেছে, আমার কথা কত ভাবছে? যাই এই বাড়ীটুকু ছিল কর্তার, তাই 'ঘর ঘর' ভাড়াটে রেখে দিন চলছে। তোমার মেয়ে হয়নি বাঁচোয়া।'

মেয়ে হয় নি!

অতসী কি কেঁপে ওঠে?

অতসীর মুখটা কি পাঙাস হয়ে যায়?

বয়স্থা মহিলা অত বুঝতে পারেন না। তিনি কথা চালিয়ে যান, 'চেষ্টা বেষ্টা করে একটা স্ত্রী ইস্কুলে ওকে ভর্তি করে দাও বাছা, আখের ভাবো।'

অতসী একদিন সাহস করে বলে, 'দেবো তো মাসীমা, কিন্তু তার আগে আমাকে তো একটা কাজে কর্মে ভর্তি হতে হবে! হাতের পুঁজি তো সবই—' কথা শেষ করেছিল অতসী ভাববাচ্যে। একটু হাসি দিয়ে।

ঘরে সীতেশের উপস্থিতি কি ভুলে গেছে অতসী? না কি সীতেশের আড়ালে কোন জায়গা নেই বলেই নিরুপায় হয়ে সব কথাই তার সামনে উচ্চারণ করতে বাধ্য হচ্ছে?

ঘরকুনো সীতেশ ঘরেই আছে। ঘরেই থাকে।

হরসুন্দরী দেবীর এই পাঁচ ভাড়াটের বাড়ীতে তার সমবয়সী ছেলের অভাব নেই, কিন্তু সীতেশকে বোধকরি তারা চক্ষেও দেখেনি।

হরসুন্দরী দেবী বলেন, 'বললে যদি তো বলি বাছা, আমিও ক'দিন ভাবছি, নতুন মেয়ে তো কাজ কর্ম কিছু করে না, অথচ ছেলে নিয়ে একলা বাস করতে এসেছে। তো ওর চলবে কিসে? তা' ভাবি, বোধহয় স্বামীর দরুণ কিছু আছে হাতে। এযুগে তো আর ভাই-ভাজ, শ্বশুর-ভাসুর বিধবাকে দেখে না মা—'

অতসী শান্ত গলায় বলে, 'আমার ওসব কিছুই নেই মাসীমা। আর স্বামীর টাকাও নেই।' তেমনি নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে একটু হাসে অতসী। খেয়াল করে না জানলায় পিঠ ফিরিয়ে বসে থাকা ছেলেটার পিঠের চামড়াটা পুড়ে উঠছে কিনা অতসীর এই হাসিতে।

'তা' ভাল! তিন কুলের কেউ কোথাও নেই?'

'নাঃ।'

'হ্যাগা তা ওই যে ছেলেটি ঘর খুঁজতে এসেছিল?'

'ওটি আমার দূর সম্পর্কের ভাসুরঝি জামাই হয় মাসীমা।'

হরসুন্দরী বলেন, 'দূর আর নিকট! যার শরীরে মায়া মমতা আছে, সেই নিকট। ছেলেটির আকার প্রকার তো ভালই মনে হল, কিছু সাহায্য করে না?'

আরক্ত মুখে কোন মতে পাশ ফিরিয়ে অতসী বলে, 'করলেই বা আমি জামাইয়ের সাহায্য নেব কেন মাসীমা?'

'তা বটে, তা বটে।' কথাতেই আছে 'পরদুয়ারী জামাই জাতি, এ দুইয়ের নেই ঊর্দ্ধগতি—' তা মেয়ে! অপিসে চাকরী বাকরী করবে তা'হলে?'

অতসী মাথা নীচু করে বলে, 'অফিসে চাকরী করার মত বিদ্যে সাধ্যি নেই মাসীমা, ছেলেবেলায় বাপ ছিলেন না, মামার বাড়ী মানুষ, তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন, পড়া-লেখায় তেমন সুযোগ হয়নি।'

'আহা! চিরটা কালই তা'হলে দুঃখ! তোমায় দেখলে কিন্তু বাছা এখনকার পাশটাশ করা মেয়ের ধাঁচে লাগে।'

অতসী একথার আর কি উত্তর দেবে?

হরসুন্দরী বলেন, 'মুখ ফুটে তুমি বললে তাই বলতে সাহস করছি বাছা, কিছু মনে না করো তো বলি—কাজ একটা আছে। মানে আমাকেই একজন বলেছিল, লোক দেখে দেবার জন্যে। আমি তো এ পাড়ায় আজ নেই, চল্লিশ বছর আছি, সবাই চেনে।'

'লোক দেখে দেবার জন্যে—' অস্ফুট কণ্ঠে বলে অতসী, 'কি চান তাঁরা? ঝি?'

'আহা হা ঝি কেন, ঝি কেন।' হরসুন্দরী ব্যস্তভাবে বলেন, 'একটা ভালঘুড়ি বুড়িকে একটু দেখাশোনা করা। নার্সের হাতের সেবা নেবে না এই আর কি! বুড়ির নাকি সত্তর বছর পার হয়ে গেছে। তবে কিনা বড় মানুষের মা, তাই তারা মাসে একশোর বেশী টাকা দিয়েও লোক রাখতে প্রস্তুত। ছেলের বৌটা মহাপাজী মা, স্বামীকে মুখনাড়া দিয়ে বলবে 'তোমার মার সুবিধে করতে একটা বাইরের লোক এনে, প্রতিষ্ঠা করবে, আর আমি ভাবতে বসবো তার কখন কি চাই, সে কী খাবে, কোথায় থাকবে, কোথায় তার জিনিসপত্র রাখবে। পারবো না, রক্ষে করো। ঠিকে লোক রেখে মায়ের সেবা করাতে পারো, করাও। ব্যস!'

'তা বুড়ির ছেলে অশান্তির ভয়ে তাতেই রাজী, কিন্তু ঠিকে বড় কেউ থাকতে চায় না। বলে সারাদিন রুগীর ঘরে থাকবো তো রাঁধবো বাড়বো কখন? বুড়ির ছেলে তাই বলেছে 'দিন চার পাঁচ টাকা করেও যদি লোক পাই তো রাখবো।' ছেলেটা ভাল, বৌটা দজ্জাল। অবিশ্যি তার জন্যে ভাবনার কিছু নেই, সে বৌ শাশুড়ীর ঘরের ছায়াও মাড়ায় না। বুড়ি কত কাঁদে। এই তো মা, পয়সা থেকেও কত কষ্ট। তবে হ্যাঁ, এই যে লোক রাখতে চায়, পয়সা আছে বলেই তো? আমার মরণ কালে যে কী দুর্দশা হবে ভগবানই জানে।'

অতসী সান্ত্বনার্থে বলে, 'তখন কি আর আপনার মেয়েরা আসবেন না?'

'আসবে। মায়ের এই ইটকাঠ টুকুর ভাগ বুঝতে আসবে। আর এসে তিন বোনে ঝগড়া করবে 'আমি একা কেন করবো' বলে। মেয়ে সন্তান পরের মাটি দিয়ে গড়া মা! তোমার মেয়ে নেই রক্ষে।'

অতসী কষ্টে গলায় স্বর এনে বলে, 'ওদের সঙ্গে আপনি কথা বলুন মাসীমা, আমি করতে রাজী আছি।'

হরসুন্দরী ইতস্ততঃ করে বলেন, 'অবিশ্যি নার্সের কাজ বলতে যা বোঝায় তার সবই করতে হবে বাছা। তবে কি না জাতে বামুন—'

অতসী দৃঢ়স্বরে বলে, 'জাতে বামুন হোন কায়েত হোন, কিছু এসে যায় না মাসীমা, কাজ করবো বলে যখন প্রস্তুত হয়েছি, তখন সবই করবো।'

হরসুন্দরী সপুলকে বলেন, 'তবে তাদের তাই বলিগে?'

হঠাৎ জানলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে থাকা ছোট মানুষটা ছিটকে এদিকে মুখ ফিরিয়ে চীৎকার করে ওঠে, 'না করবে না।'

'বলবো না ?' হরসুন্দরী হকচকিয়ে যান।

'না না ! তোমার এখানে আসার এত কি দরকার ?'

'সীতু !'

তীক্ষ্ণ তীব্র গলায় একটি সম্বোধন করে অতসী। যেমন গলায় বোধকরি কোনদিনই সীতুকে ডাকেনি। মৃগাঙ্কর সংসারে সীতুকে নিয়ে অনেক যন্ত্রণা ছিল অতসীর, কিন্তু সীতুকে শাসনের বেলায় কোথায় যেন কাণায় কাণায় ভরা ছিল অভিমানের বাষ্প, তাই কখনো গলায় এমন নীরসতার সুর বাজেনি।

সীতু মাথা নীচু করে ফের জানলায় গিয়ে বসে। যে জানলার সঙ্গে তার অস্ফুট স্মৃতির কোথায় যেন একটা মিল আছে। জানলার ওপিঠটা একটা সরু পচা গলি, বছরে দু'দিন সাফ হয় কি না সন্দেহ, দুদিকের বাড়ীর আবর্জ্জনা পড়ে পড়ে জমা হতে থাকে।

এ বাড়ীতে উঠানের মাঝখানে চৌবাচ্চাও একটা আছে, আর কলের মুখে লাগানো নল বেয়ে জল পড়ে পড়ে সেটা ভরতে থাকে সারাদিনে। সীতুর স্মৃতির সঙ্গে অনেক কিছু মিল আছে এ বাড়ীর।

কিন্তু সীতু ?

সে কি তবে এতদিনে স্থির হয়েছে, সন্তুষ্ট হয়েছে ? তার বিদ্রোহী মন শান্ত হয়েছে ?

এসে পর্য্যন্ত তেমনি এক অবস্থাতেই ছিল সীতু। মা ডেকেছেন 'সীতু খাবে এসো', সীতু নিঃশব্দে উঠে এসে খেয়েছে।

মা বলেছে 'সীতু বেলা হয়ে যাচ্ছে ওঠ, এর পরে আর কলতলা খালি পাবে না', সীতু উঠে গিয়ে সেই পাঁচ শরীকের কলের থেকে মুখ ধুয়ে এসেছে। কোন প্রতিবাদ কোন দিন ধ্বনিত হয় নি তার কণ্ঠ থেকে।

আজ সীতুর গলায় সেই পুরনো তীব্রতা ঝলসে উঠল।

অতসী হরসুন্দরীর দিকে চোখ টিপে ইসারায় বলে 'ওর কথা ছেড়ে দিন, আপনি ব্যবস্থা করুন।'

হরসুন্দরী বোঝেন—বালক ছেলে, মাকে ছেড়ে থাকার কথায় বিচলিত হয়েছে। পরম আনন্দে তিনি চক্রবর্ত্তী গিন্নীর কাছে সুখবর দিতে ছুটলেন। বুড়ি এমনি একটি ভদ্র গৃহস্থ ঘরের মেয়ের জন্যেই হা পিত্যেশ করে বসে আছে। হরসুন্দরী জোগাড় করে দেওয়ার গৌরবটা নেবেন।

'সারাদিন নর্দ্দমার ধারে বসে বসে স্বাস্থ্যটা নষ্ট করে কোন লাভ আছে ?'

অতসীর এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই সীতু জানলা থেকে নেমে এসে ঘরের প্রায়ান্ধকার কোণে পাতা চৌকিটায় গিয়ে বসে।

অতসী বলে, 'কাল তোমায় স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে যাব। হেড্‌মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছি আমি; ওপরের মাসীমার তিনি চেনা লোক, কাজেই ভর্তি হতে বেশী অসুবিধে হবে না। তবে একটি কথা তোমাকে শিখিয়ে রাখছি—সত্যি কথা নয়, মিথ্যা কথা। হ্যাঁ, এখন অনেক মিথ্যা কথা তোমায় শেখাতে হবে আমাকে, বলতে হবে নিজেকে। নইলে কোথাও টিঁকতে পাব না। তুমি বলবে, এর আগে তুমি কোন স্কুলে পড়নি, বাড়ীতে মায়ের কাছে পড়েছ। মনে থাকবে? বলতে পারবে? স্কুলে পড়েছিলে জানতে পারলেই এ স্কুল তোমার পুরনো স্কুলের সার্টিফিকেট চাইবে। জিজ্ঞেস করবে, 'কেন ছেড়ে এসেছ? সেখানের রেজাল্ট দেখি।' তা হলে কি বিপদে পড়বে বুঝতে পারছ? সে স্কুলে তোমার নাম সীতেশ রায় নয়, সীতেশ মজুমদার, তা মনে আছে বোধ হয়? কি কাজের কি ফল তোমাকে বোঝাবার বয়স নয়, কিন্তু তুমি বুঝতে পার, বুঝতে চাও, তাই এত করে বুঝিয়ে শিখিয়ে রাখলাম। আর যা করো করো, দয়া করে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট কোর না।

আমিও ভুলে যেতে চেষ্টা করবো রায় ছাড়া আর কোনদিন কিছু ছিলাম আমি, ভুলেও যাবো আস্তে আস্তে। যাক আরও একটা কথা শোনো—পশু´ থেকে আমি মাসীমার দেওয়া সেই কাজে ভর্তি হবো। তোমাকে সকালবেলা স্কুলের ভাতটা মাসীমার কাছেই খেতে হবে। সেই ব্যবস্থাই করেছি।'

'আমি খাবো না।'

সীতেশের গলায় বিদ্রোহ। কিন্তু সে বিদ্রোহে কি আর্দ্রতার ছোঁয়া?

অতসী নরম গলায় বলে, 'খাবো না বললে তো রোজ চলবে না, একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে।'

'তুমি ওপরের বুড়ির কথা শুনলে কেন? ওই বিচ্ছিরি কাজ নিলে কেন?'

অতসী মৃদু হেসে বলে, 'বিচ্ছিরি ছাড়া সুচ্ছিরি কাজ কে আমায় দেবে বল? আমি কি বি, এ, এম, এ, পাশ করেছি? আর কাজ না করলে—'

'না না না তুমি কাজ করবে না। তুমি ঝি হতে পাবে না।'

বলে সহসা জীবনে যা না করে সীতু, তাই করে বসে। উপুড় হয়ে পড়ে উথলে কেঁদে ওঠে।

নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে অতসী, সান্ত্বনা দিতে ভুলে যায়। অমনি করে উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদে ভাসাবার জন্তে তার অন্তরাত্মাও যে আকুল হয়ে উঠেছে।

খুকু, খুকু! খুকুমণি! কতদিন তোকে দেখিনি আমি! কী করছিস তুই 'মা মরা' হয়ে গিয়ে! কে তোকে খাওয়াছে খুকু, কে তোকে ঘুম পাড়াচ্ছে? 'মা মা' করে খুঁজে বেড়ালে কী বলছে তোকে ওরা? 'মা নেই, মা মরে গেছে। মা চলে গেছে, আর আসবে না!' শুনে কেমন করে কেঁদে উঠছিস তুই খুকু সোনা! খুকু তুই কেমন আছিস? খুকু তুই কি আছিস?

হরসুন্দরী প্রতি কথায় বলেন, 'তোমার মেয়ে নেই মা বাঁচোয়া।' নিজের মেয়েদের প্রতি দুরন্ত অভিমানের বশেই হয়তো বলেন, কিন্তু তিনি কেমন করে বুঝবেন তাঁর এই সান্ত্বনাবাক্যে অতসীর বুকের ভিতরটা কী তোলপাড় করে ওঠে, জননী হৃদয়ের সমস্ত ব্যাকুলতা কেমন করে 'ঘাট ঘাট' করে ওঠে।

সারাদিনের বেঁধে রাখা মন রাতে আর বাঁধ মানে না। নিঃশব্দ ক্রন্দনে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলতে চায়।

আলাদা চৌকীতে সীতু।

ঘরে জায়গা কম, এ চৌকী যতটা স্বল্প পরিসর হওয়া সম্ভব ততটা স্বল্প, পাশ ফিরতে পড়ে যাবার ভয়। তবু রাত্রির অন্ধকারে অতসীর মনে হয় যেন তার কোলের কাছে একটা বিশাল শূন্যতা! সেই শূন্যতা অতসীকে গ্রাস করে ফেলতে চাইছে, অদৃশ্য দাঁত দিয়ে অতসীকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে চাইছে।

বুকের মধ্যেটা মুচড়ে মুচড়ে ওঠে। সর্ব্ব শরীরে সেই মোচড়ানির যন্ত্রণা অনুভব করে অতসী। যেন দেহের কোথাও ভয়ঙ্কর একটা আঘাত করতে পারলে কিছুটা উপশম হবে। চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে তার। চীৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে, 'খুকু খুকু, তোর মা নেই। তোর মা মরে গেছে বুঝলি?'

মৃগাঙ্ক কি খুকুকে নিজের কাছে নিয়ে শোন?

ঝাপসা করে এইটুকু শুধু ভাবতে পারে অতসী, এর বেশী নয়। মৃগাঙ্কর কথা ওর থেকে বেশী ভাববার ক্ষমতা অতসীর নেই।

ভয়ঙ্কর ক্ষতের দৃশ্যটা যেমন ঢাকা দিয়ে রাখতে চায় মানুষ, দেখতে পারে না, তেমনি সেই ভয়ঙ্কর চিন্তাটাকে সরিয়ে রাখে অতসী, ঢেকে রাখে আতঙ্ক দিয়ে।

শুধু রাত্রে যখন সীতু ঘুমিয়ে পড়ে, যখন আবছা অন্ধকারে ওর রোগা পাতলা ছোট্ট দেহটাকে একটা বালক মাত্র ছাড়া আর কিছু মনে হয় না, তখন তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতের মত একটা প্রশ্ন অতসীকে কুরে কুরে খায় 'আমি কি ভুল করলাম? আমার কি আরও ধৈর্য্য ধরা উচিত ছিল?'

কিন্তু ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করবার মত অবস্থা কি ঘটে নি?

সকাল হতে না হতেই সমস্ত চিন্তা আর সমস্ত প্রশ্নে যবনিকা টেনে দিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটতে হয় মনিব বাড়ী। ছটার মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে না পারলেই অনুযোগ শুরু করে বুড়ি, 'আজ তোমার এত দেরী যে আতুসী? কতক্ষণে মুখ ধোওয়াতে আসবে বলে রাত থেকে দুয়োরের পানে তাকাচ্ছি।' দেরী না হলেও অনুযোগটা তাঁর উদ্যত।

অনিদ্রা রোগীর রাত বড় দীর্ঘ।

সকালের আলোর আশায় পলক গোনে সে।

অতসী তর্ক করে না, প্রতিবাদ করে না, 'এই একটু দেরী হয়ে গেল দিদিমা। উঠুন, মুখ ধুয়ে নিন।' বলে তৎপরতা দেখায়।

তারপর কাজ আর কাজ।

মুখ ধোওয়ানো, বিশুদ্ধ কাপড় পরিয়ে তাঁকে জপ আহ্নিক করতে বসানো, নিজে স্নান করে এসে তবে তাঁকে খাওয়ানো, ওষুধ খাওয়ানো। ঠিক রোগী নয়, বলতে গেলে রোগটা জরা, তবু ওষুধ খেতে ভাল বাসেন চক্রবর্ত্তী গিন্নী। ভালবাসেন সেবা খেতে। তাই হাত খালি হলেই তেল মালিশ করতে হয় বসে বসে। আর বসে বসে শুনতে হয় তাঁর ছেলের প্রশংসা আর ছেলের বৌয়ের নিন্দে। এই শোনাটাও একটা বিশেষ কাজ।

. এই কাজ আর অকাজের অবিচ্ছিন্ন ধারার মধ্যে তলিয়ে থাকে চিন্তা ভাবনা। মনে করবার অবকাশ থাকে না অতসী কে, অতসী কি, অতসী এখানে কেন। যেন এই খামখেয়ালি বড়লোক বুড়ির খাস পরিচারিকা, এইটাই অতসীর একমাত্র পরিচয়।

মানুষটা খিটখিটে নয়, এইটুকুই পরম লাভ। মিষ্টিমুখে সারাক্ষণ খাটিয়ে নেন। মালিশ হলেই বলেন, 'অ আতুসী, মালিশের তেলের হাতটা ধুয়ে দুটো পান ছ্যাচ দিকি খাই।' পান ছ্যাচা হলেই বলবেন 'আতুসী দেখতো বিছানায় পিঁপড়ে হয়েছে না ছারপোকা? চব্বিশ ঘণ্টা কী যে কামড়ায়।'

সন্ধ্যাবেলা সব মিটে গেলে, চলে যাবার সময় পর্যন্ত ডাক দেন, 'আতুসী, মশারীটা ভাল করে গুঁজেছ তো? কাল যেন একটা মশা ঢুকেছিল মনে হচ্ছে।'

আসল কথা সারাক্ষণ একটা মানুষের স্পর্শ আর সান্নিধ্যের লোভ! সংসার যার পাওনা চুকিয়ে দিয়েছে, অবস্থা যাকে নিঃসঙ্গ করে দিয়েছে, তার হয়তো এমনিই হয়। মানুষের সঙ্গলালসা, এমনিই চক্ষুলজ্জাহীন করে তোলে তাকে। এই কাজের জগতে বার্দ্ধক্যকে সঙ্গ দেবে এমন দায় কার? তাই ওই সঙ্গ দেওয়াটাই যার ডিউটি, তাকে পুরো ভোগ করে নিতে চান চক্রবর্ত্তী গিন্নী সুরেশ্বরী।

আবার ভাল কথাও বলেন বৈ কি!

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অতসীর জীবন কাহিনী শুনতে চান তিনি, চান 'আহা' করতে। চান অতসীর আত্ম পরিজনকে কটু বাক্যে তিরস্কার করতে। বলেন, 'এই বয়সে, এই ছবির মতন চেহারা, কোন প্রাণে তারা একলা ছেড়ে দিয়েছে; এই যাই ভাল আশ্রয়ে এসে পড়েছ তাই রক্ষে। নইলে কার খর্পরে যে পড়তে!' আবার বলেন, 'ছেলেকে তো কই, একদিন আনলে না আতুসী। দেখতে চাইলাম!'

অতসী বলে, 'আসবে না দিদিমা। বড লাজুক।'

সুরেশ্বরী বলেন, 'আহা আসতে আসতেই লজ্জা ভাঙবে। আনলে চাইকি আমার আনন্দর নেক নজরে পড়ে যেতে পারে। তখন তোমার ওই ছেলের বই খাতা জুতো জামা

কোন কিছুর অভাব হবে না। আনন্দর যে আমার বড় মায়ার শরীর, গরীবের দুঃখ একেবারে দেখতে পারে না।'

অতসী কাঠের মত শক্ত হয়ে যাওয়া হাতে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে মালিশ চালিয়ে যায়, আর সহসা এক সময় বলে ওঠেন সুরেশ্বরী 'কাজ করতে করতে থেকে থেকে তোমার যে কী হয় আতুসী, যেন কোথায় আছে মন, কোথায় আছে দেহ। একটু মন দাও বাছা। মাস গেলে কম-গুলি করে তো গুণতে হয় না আমার আনন্দকে। শুধু এই বুড়িমার আরাম স্বস্তির জন্যে।'

হ্যাঁ, এটুকু স্পষ্ট কথা তিনি বলেন।

নিজের গৌরব গরিমা বাড়াতেই বলেন।

তা' এটুকু না সইলে চলবে কেন?

উদয়াস্ত খিটখিট করলেই কি সইতে হ'তনা? মনিব খিটখিটে বলে একশো পঁচিশ টাকার চাকরীটা ছেড়ে দিত? তাই কেউ দেয়? ঘরে যার ভাত নেই?

ওদিকে এদিক ওদিক থেকে সুরেশ্বরীর ছেলের বৌয়ের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেলেই তিনি হাতছানি দিয়ে ডেকে সহাস্যে বলেন, 'কেমন কাজ চলছে?'

অতসী মৃদু হেসে বলে 'ভাল'।

'তা ভাল না বলে আর উপায় কি। বলি এক মিনিট বসতে শুতে পাও কোন দিন? ইস তা আর নয়, ওই চীজটিকে আমার জানতে বাকী আছে কি না। চব্বিশ ঘণ্টা খালি ফরমাস আর ফরমাস। বাবাঃ! তা বাপু আমি মুখফোঁড় মানুষ বলে ফেলি। এমন চেহারাখানি তোমার, এমন মিষ্টি মিষ্টি গলা, তুমি মরতে এই অখদ্যে কাজ করতে এলে কেন? সিনেমায় নামলে লুফে নিত।'

অতসী উত্তর দেয় না, শুধু কান দুটো যে তার কত লাল হয়ে উঠেছে সেটা নিজেই অনুভব করে।

ভদ্রমহিলা আবার হেসে হেসে বলেন 'একটা তো ছেলেও আছে তোমার শুনেছি। তোমার মতনই সুন্দর হ'বে নিশ্চয়। মায়ে ছেলেয় নেমে পড়। আজকাল ছোট ছেলের চাহিদা ও লাইনে খুব। হাড়ির হাল থেকে রাজার হাল হবে। নইলে এই দাসীবৃত্তি করে ছেলেকে আর কতই মানুষ করে তুলতে পারবে? তার চাইতে ও লাইনে অগাধ পয়সা।

অতসী মৃদুস্বরে বলে, 'আপনারা হিতৈষী, আপনারা অবিশ্যি যা ভাল তাই বলবেন, দেখব ভেবে।'

হিহি করে হাসেন ভদ্রমহিলা আর বলেন, 'তোমার মতন অবস্থা আমার হলে, ওসব ভাবাভাবির ধার ধারতাম না, কবে গিয়ে হিরোইন হ'তাম। ভাল থেকে হবেটা কী? কেউ তোমায় ভাত দেবে, না সামাজিক মান মর্য্যাদা দেবে?'

ভদ্রমহিলার মতবাদকে অযৌক্তিক বলা যায় না।

না, 'তুমি' ছাড়া 'আপনি' এবাড়ীতে কেউ বলে না অতসীকে। বাসনমাজা ঝিটাও বলে, 'তুমি আবার এখন কলে পড়তে এলে? সরো বাপু, সরো, আমায় বাসন কখানা ধুয়ে নিতে দাও আগে।'

সুরেশ্বরীর চা দুধ খাওয়া পাথরের বাটি গেলাস অতসীকেই মেজে নিতে হয়, সুরেশ্বরীর নির্দ্দেশ। সেই দুটো হাতে করে অপেক্ষা করতে হবে অতসীকে যুগ যুগান্তর, কলের আশায়।

সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে কোনদিন দেখে সীতু আধময়লা বিছানাটায় গুটি সুটি হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, কোনদিন দেখে হ্যারিকেনের আলোর সামনে রক্তাভ চক্ষু মেলে পড়া করছে। বেশীক্ষণ পারে না তখুনি গুটিয়ে শুয়ে পড়ে। লাইট নেই।

বারো টাকা ভাড়া ঘরে লাইট থাকে না।

ওই দামে কোঠা ঘর পাওয়া গেছে এই ঢের।

অতসী এসে কাপড় ছাড়ে, হাত পা ধোয়, উনুনে আগুন দিয়ে রুটি তরকারি করে ডাক দেয় 'সীতু ওঠ, খাবার হয়েছে।'

সীতু আস্তে আস্তে উঠে খেতে বসে।

না বসে উপায়ই বা কি?

খিদেয় যে পাকযন্ত্র সুদ্ধ পরিপাক হয়ে থাকে। ইস্কুল থেকে এসে কে হাতের কাছে খাবার জুগিয়ে দেবে?

অতসী মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলে, 'কৌটায় মুড়ি থাকে, নাড়ু থাকে, পাউরুটি আনা থাকে, কিছু খাস না কেন সীতু?'

সীতু গম্ভীর ভাবে বলে 'খিদে পায় না।'

এমনি করে কাটে দিন আর রাত্রি।

কয়েকটা মাস গড়িয়ে যায়।

সুরেশ্বরী আর একটু অপটু হতে থাকেন। আর সুরেশ্বরীর ছেলের বৌ রোজ একবার করে অতসীকে প্ররোচনা দেন। 'ছেলেকে সিনেমায় না দিলে তোমার কাছে এখানেই নিয়ে এসে রাখ না। সারাদিন তোমার চোখে চোখে থাকবে।

অবশেষে একদিন অতসীকে সুরেশ্বরীর কাছ থেকে আড়ালে ডেকে আসল কথাটা পাড়ে সুরেশ্বরীর ছেলের বৌ, 'কই গো, তোমার ছেলেকে একদিন আনলে না?'

অতসী একবার ওই মদগর্ব্ব মণ্ডিত মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নীচু করে বলে, 'ছেলে লাজুক, আসতে বললে আসতে চাইবে না।'

'বাঃ দিব্যি তো কথা এড়াতে পারো তুমি ?' বৌ যেন ঝাঁজিয়ে ওঠে, 'আসতে বললে আসতে চাইবে, কি না চাইবে, আগে থেকেই বুঝছো কি করে ?'

অতসী চোখ তুলে মৃদু হেসে বলে, 'ছেলে কি চাইবে না চাইবে মায়ে বুঝতে পারে বৈকি।'

'হুঁ।' ভদ্রমহিলার মুখখানি থমথমে হয়ে ওঠে। বোধ করি তার সন্দেহ হয় শাশুড়ীর নার্সের এটি তার সন্তানহীনতার প্রতি কটাক্ষপাত। কিন্তু এখন একটি মতলব নিয়ে তার কথা সুরু করেছে সে, প্রথম নম্বরেই মেজাজ দেখিয়ে কাজ পণ্ড করলে লোকসান। তাই আবার কষ্টে মুখে হাসি টেনে বলে, 'আহা, বেড়াতে আসার নাম করে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আসবে একদিন। মানুষের বাড়ী মানুষ বেড়াতে আসে না ?'

অতসী কষ্টে মৃদু হেসে বলে, 'তা' একদিন নিয়ে এলেই বা লাভ কি ?'

যাক আলোচনাটা অনুকূলে আসছে, বৌ হৃষ্ট হয়ে ওঠে। মুচকি হেসে বলে, 'একদিন থেকেই চিরদিন হয়ে যেতে পারে, আশ্চর্য্য কি ?'

অতসী একথার অর্থ গ্রহণে অক্ষম হয়েই বোধকরি চুপ করে চেয়ে থাকে।

সুরেশ্বরীর ছেলের বৌ, যার নাম নাকি বিজলী, সে ঠোঁটের কোণে একটু বিজলীর চমক খেলিয়ে বলে ওঠে, 'তুমি বাপু বড় বেশী সরল, কোন কথা যদি ধরতে পারো। বলছিলাম তুমি তো ওই হরসুন্দরী বামনীর ভাড়াটে। যা বাহারের বাড়ী তার, দেখেছি তো! সেই ভাঙা ঘরেরও কোন না পাঁচ সাত টাকা ভাড়া নেয়, সেখানে ওই ভাড়া গুণে নাই বা থাকলে ? এখানে আমার এতবড় বাড়ী, নীচের তলায় কত ঘরদোর পড়ে, ছেলে নিয়ে অনায়াসে এখানে এসে থাকতে পারো।'

'তাই কি আর হয়!' বলে কথায় যবনিকা টেনে চলে যেতে উদ্যত হয় অতসী। কিন্তু বিজলী তাকে এখন ছাড়তে রাজী নয়, তাই ব্যগ্রভাবে বলে, 'দাঁড়াও না ছাই একটু। বুড়ি আর তোমাবিহনে এক্ষুনি গলা শুকিয়ে মরছে না। 'তাই কি আর হয়' বলছ কেন ? এতে তো তোমারই সুবিধে, আর—' গলা খাটো করে বিজলী আসল কথায় আসে, 'দুদিক থেকেই তোমার হাতে কিছু পয়সা হয়। ঘর ভাড়াটা বাঁচে, আর তোমার ছেলে যদি বাবুর ফাই-ফরমাসটা একটু খাটতে পারে তাতেও পাঁচ সাত টাকা—'

হঠাৎ যেন সমস্ত পৃথিবীটা প্রবল বেগে প্রচণ্ড একটা পাক খেয়ে অতসীকে ধরে আছাড় মারে। সেই আছাড়ের আকস্মিকতা কাটতে সময় লাগে। কথা বলবার শক্তি সংগ্রহ করতে দেরী হয়। ততক্ষণে বিজলী আর একটু বিদ্যুৎ হাসি হেসে বলে, 'বাবুর যা দিলদরিয়া মেজাজ, হাতে হাতে ঘুরে মন জুগিয়ে চলতে পারলে বখশীসেই—'

হ্যাঁ, এতক্ষণে শক্তি সঞ্চয় হয়েছে।

অতসী ঝাঁ ঝাঁ করা কান আর জ্বালা করা চোখ দুটো নিয়েও কথা বলতে

পেয়েছে। কিন্তু সে কথা শুনে মুহূর্তে বিজলী বজ্র হয়ে ওঠে। তীব্রস্বরে বলে, 'কী বললে? ভবিষ্যতে যেন আর কখনো এ ধরনের কথা না বলি? তেজটা তোমার একটু বেশী নার্স! বলি আমার বাড়ীতে থেকে ছেলে যদি তোমার ঘরের ছেলের মত একটু কাজ কর্ম করতো, মানের কানা খসে যেত তার? তবু তো তুমি পাশ করা নাস নও। মা যার দাস্যবৃত্তি করছে, তার ছেলের এত মান! বাবাঃ! কিন্তু এটি জেনো নার্স, এত মান নিয়ে পরের বাড়ী কাজ করা চলে না। মান একটু খাটো করতে হয়।'

অতসী এতক্ষণে স্থির হয়ে গেছে। স্বাভাবিক রং ফিরে পেয়েছে ওর চোখ আর কান।

সেই স্থির চেহারা নিয়ে ও বলে, 'আপনার আর কিছু বলবার আছে? যদি থাকে তো বলে নিন।'

বিজলী এবার বোধকরি একটু থতমত খায়, তবু থতমত খেয়ে চুপ হয়ে যাবার মেয়ে সে নয়। তাই ভুরু কুঁচকে বলে, 'আর যা বলবার আছে, সেটা বাবুকে বলবো, তোমাকে নয়। কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করে জলে বাস করা যায় না। এটা মনে রেখো।'

'মনে রাখবো।'

বলে চলে এসে অতসী যথারীতি সুরেশ্বরীকে ওষুধ খাওয়ায়। মালিশ করে দেয়। তারপর সহজ শান্তভাবে বলে, 'বিকেল থেকে আমি আর আসবো না দিদিমা!'

'তার মানে? আসবে না মানে?' নেহাৎ অপটু তাই, নইলে বোধকরি ছিটকেই উঠতেন সুরেশ্বরী, 'আসবে না বললেই হ'ল?'

'তা আসতে যখন পারবো না, তখন বলে যাওয়াই তো ভাল।'

'বলি পারবে না কেন বাছা সেইটাই শুধোই। বুঝেছি বুঝেছি, আমার ওই বৌটি নিশ্চয় ভাঙচি দিয়েছে। ডেকে নিয়ে গিয়ে ওই শলা-পরামর্শই দিল তা'হলে এতক্ষণ? বলি তুমি তো আর হাবার বেটি নও? শুনবে কেন ওর কথা? বুঝছো না আমার ওপর হিংসে করে তোমায় ভাঙচি দিচ্ছে? এই যে তুমি আমায় যত্ন আত্তি করছ, দেখে হিংসেয় বুক পুড়ছে ওর। মহা খল মেয়েমানুষ মা, মহা খল মেয়েমানুষ! কান দিও না ওর কথায়।'

অতসী গম্ভীর ভাবে বলে, 'বৃথা ওসব কথা বলবেন না দিদিমা, উনি আমায় যেতে বলেন নি। আমার অসুবিধে হচ্ছে।'

'তাই বল—' সুরেশ্বরী সহসা একগাল হেসে বলেন, 'বুঝেছি। চালাকের বেটির আরও কিছু বাড়ানোর তাল। তা' বলবো আমি, ছেলেকে বলবো। বলে করে সাড়ে চার টাকা রোজ করে দেব তোমার। তাতে হবে তো? হবে না কেন, মাস গেলে পনেরোটা টাকা তো বেড়ে গেল। তা হ্যাঁ মা আতুসী, একথা মুখ ফুটে একটু বললেই হতো। দেখছ যখন তোমাকে আমার মনে ধরেছে। না বাছা ছাড়ার

কথা মুখে এনো না। এই বুড়ি যেকটা দিন আছে, থেকো। আমি প্রাতর্বাক্যে আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার ভাল হবে।'

অতসী বুঝায় ওই উদ্বিগ্ন আটুপটু, আবার প্রায় নিশ্চিন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। মনে ভাবে 'একের অপরাধে আরের দণ্ড!' পৃথিবী জুড়ে তো এই লীলা! আমি আর কি করবো? বুড়ির জন্যে মায়া হচ্ছে, কিন্তু উপায় কি! এখানে আর থাকা যায় কি করে?

সুরেশ্বরী তাঁর ছানিপড়া চোখের দৃষ্টি যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ করে অতসীর মুখের দিকে তাকান এবং সে মুখে অনমনীয়তার ছাপ দেখে বিগলিত কণ্ঠে বলেন, 'তা' ওতেও যদি তোমার মন না ওঠে, পাঁচ টাকা রোজই করিয়ে দেব বাছা। আর তো মন খুঁত খুঁত করবে না? কিন্তু তাও বলি আতুসী, আমার ছেলে খুব মাতৃভক্ত, আর টাকার ছুখদরদ নেই বলেই এতটা কবুল করতে সাহস করলাম আমি। নইলে এ তল্লাটে এর অর্দ্ধেক দিয়েও কেউ বুড়ো মায়ের সেবার জন্যে লোক রাখতে চাইবে না। বৌটি হারামজাদা হয়েই হয়েছে আমার কাল। তুই ডাণ্ডা খাণ্ডা বাঁজা মানুষ, শাশুড়ীর সেবা করতে পারিস না? সোয়ামীর এতগুলো করে টাকা জলে যাচ্ছে, তাই দেখছিস বসে বসে? কী বলবো আতুসী, জ্বলে পুড়ে মলাম, জ্বলে পুড়ে মলাম।'

অতসী মৃদুস্বরে বলে, 'দুঃখ যন্ত্রণার বিষয় বেশী আলোচনা না করাই ভাল দিদিমা, ওতে কষ্ট বাড়ে ভিন্ন কমে না।'

সুরেশ্বরী সহসা বিগলিত স্নেহে অতসীর হাতটা চেপে ধরেন, বলেন, 'এই দেখতো মা, এই জন্যেই তোমায় ছাড়তে চাই না। কথা শুনলে বুক জুড়োয়। আর আমার বৌটি! কথা নয় তো, যেন এক একখানি চেলা কাঠ! যাকগে বাছা, তুমি মনকে প্রফুল্ল করো, দিন পাঁচ টাকা করেই পাবে।'

অতসী দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'পাঁচ টাকা দশ টাকার কথা নয় দিদিমা, দিন কুড়ি টাকা করে হলেও আমার পক্ষে আর এখানে থাকা সম্ভব হবে না।'

সুরেশ্বরী স্তম্ভিত বিস্ময়ে কিছুক্ষণ হাঁ করে থেকে বলেন, 'বুঝেছি, ওই হারামজাদী তোমায় কোনও অপমানের কথা বলেছে। আচ্ছা ডাকাচ্ছি ওকে আমি একবার। দেখি কী তোমায় বলেছে? যতই হোক তুমি হলে ভদ্দর ঘরের মেয়ে, তোমাকে একটা মান অপমানের কথা বললে তো গায়ে লাগবেই। কে যাচ্ছিস রে ওখানে? নন্দ? তোদের বৌদিদিকে একবার ডাক তো।'

অতসী ব্যাকুল ভাবে বলে, 'মিথ্যে কেন এসব মনে করছেন দিদিমা? আমি বলছি উনি কিছু বলেন নি। আমারই থাকা সম্ভব হচ্ছে না। এমনিই হচ্ছে না। আগে বুঝতে পারি নি—'

সুরেশ্বরী হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠে বলেন, 'আগে বুঝতে পারনি বলে আমার তুমি গাছে তুলে মই কেড়ে নেবে? এই যে আমার সেবার অভ্যেসটি ধরিয়ে দিলে, তার কি?'

সুরেশ্বরীর অভিযোগের ভাষা শুনে এত যন্ত্রণার মধ্যেও হাসি পেয়ে যায় অতসীর। প্রায় হেসে ফেলে বলে, 'ও আর কি, যে থাকবে, সেই করবে। এত এত টাকা দিলে এক্ষুনি লোক পেয়ে যাবেন।'

সুরেশ্বরী নিজের আগুনে নিজেই জল ঢালেন।

কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেন, 'লোক পাবো না তা বলছি না। লোক পাবো। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নেই। কিন্তু মা আতুসী, সব কাকই যে দাঁড়কাক। যারা আসবে, তারা হয় একেবারে ঝি চাকরাণীর মতই নোংরা ইল্লুতে ছোটলোক হবে, নয় হাসপাতালের নার্সদের মত গ্যাড্ ম্যাড্ ফ্যাড্ হবে। তোমার মতন এমন সভ্য ভব্য শান্ত ভদ্দর মেয়ে আমি আর কোথায় পাবো শুনি ?'

অতসী চুপ করে থাকে আর ভাবে, ভেবেছিলাম মনকে পাথর করে ফেলেছি, মমতাকে জয় করেছি। কিন্তু দেখছি বড্ড বেশী ভাবা হয়ে গিয়েছিল।

সুরেশ্বরী আবার ভাবেন, মৌনং সম্মতি লক্ষণম্। অতসীর বোধ হয় মন ভিজছে। তাই আকুলতার মাত্রা আর একটু বাড়ান তিনি। আবার হাত ধরেন, চোখের জল ফেলেন, অতসীকে কাজের শেষে সকাল সকাল ছেড়ে দেবেন বলে শপথবাক্য উচ্চারণ করেন, তার ফাঁকে ফাঁকে নিজেব বৌ সম্পর্কে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' করেন। কিন্তু অতসী অনমনীয়। মমতাকে সে জয় করতে পারে নি সত্যি, কিন্তু ওইটুকুই, তার বেশী নয়। মমতায় বিগলিত হয়ে সংকল্পচ্যুত হবে, সে এমন দুর্বল নয়।

অনুরোধ, উপরোধ ?

তাতে টলানো যাবে অতসীকে ? যদি তা যেত, অতসীর ইতিহাস অন্য হতো।

অতসী চলে এল।

শেষের দিকে সুরেশ্বরী রাগ করে গুম হয়ে রইলেন। অতসী নিঃশব্দে চলে এল। বিজলী দোতলার বারান্দা থেকে দেখল। আর একই সঙ্গে বিপরীত দুই মনোভাবে কেমন বিচলিত হলো।

অতসী এসে পর্যন্ত সুবিধা হয়েছিল তা'র অনেক, সুরেশ্বরী যতই গালমন্দ করুন এবং নিজে সে যতই বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে শোনাক শাশুড়ীকে, তবু শাশুড়ী সম্পর্কে একটা দায় তা'র ছিল, অতসী এসে পর্যন্ত সেই দায়টা ঘুচেছিল। আবার সেই দায়টা ঘাড়ে এসে পড়বে এই ভেবে মনটা বিরস হচ্ছিল, কিন্তু পরক্ষণেই একটা হিংস্র পুলকে ভাবছিল—ঠিক হয়েছে, বেশ হয়েছে, বুড়ি জব্দ হবে।

কিন্তু আশ্চর্য ! ভাল বলতে গিয়ে মন্দ হওয়া !

ছেলেকে চাকর রাখায় আপত্তি !

বেশ বাপু আপত্তি তো আপত্তি। তোমার ছেলে না হয় জজ ম্যাজিষ্ট্রেটই হবে, তুমি লোকের বাড়ী পা টিপে আর কোমরে তেল মালিশ করে ছেলেকে রূপোর খাটে বসিয়ে মানুষ করগে, কিন্তু দুম্ করে চাকরীটা ছেড়ে দেবার দরকার কি ছিল ?

এতই যদি তেজ, তো পরের বাড়ী খাটতে আসা কেন ?

এই ভাবে যুক্তি সাজিয়ে বিজলী নিজেকে দোষমুক্ত এবং অতসীকে দোষযুক্ত করে তুললো, কিন্তু তবু তেমন নিশ্চিন্ত হতে পারল না।

স্বামী এসে কী বলবেন ?

মায়ের আবার পুনর্মূষিক অবস্থা দেখে খুসি নিশ্চয় হবেন না এবং সন্দেহ নেই বিজলীকেই এ ঘটনার নায়িকা মনে করবেন।

তাই করে লোকটা। সব সময় করে।

বলে না কিছু, কিন্তু নীরব থেকেও শুধু চোখ মুখের ভাবে বুঝিয়ে ছাড়ে, সব দোষ বিজলীর।

আর সুরেশ্বরী ?

তিনি বিশ্ব সংসারের সকলকে শাপশাপান্ত করছেন, এমন কি হরসুন্দরীকেও রেহাই দিচ্ছেন না।

জেনে শুনে এরকম নিষ্ঠুরপ্রাণ মেয়ে মানুষকে সে কোন হিসেবে দিয়েছিল ?

হরসুন্দরীকে সামনে পেলে আরও যে কী বলতেন তিনি !

অতসী অবশ্য বাড়ী এসে কিছুই বলল না।

সামনের ঘরের পড়শীনি চোখোচোখি হ'তে বললেন, 'দিদি যে আজ এক্ষুনি।'

অতসী বলল, 'এমনি ! চলে এলাম।'

সীতু তখনও স্কুল থেকে আসে নি, ঘরের দরজায় একটা সস্তা দরের তালা ঝুলছে। এ ব্যবস্থা হরসুন্দরীর নিজের। ভাড়াটের ভালমন্দের দায়িত্ব তাঁরই, এই বোঝেন তিনি। কিছু যদি চুরি যায়, তাঁর বাড়ীরই বদনাম হবে।

কিন্তু অতসীর কি চুরি যাবে ?

কি আছে তার ?

তালার চাবিটা নিতে দোতলায় উঠতেই হ'ল তাকে। হরসুন্দরী অবাক হয়ে বললেন, 'এমন সময় যে ?'

অতসী একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'কাজ ছেড়ে দিয়ে এলাম।'

'কাজ ছেড়ে দিয়ে এলে ?' হরসুন্দরী আঁতকে ওঠেন, 'কেন গো ? বুড়ি হয়ে গেল নাকি ?'

'না না, কী আশ্চর্য্য, তা' কেন ? এমনিই।'

হরসুন্দরী হাঁ করে তাকিয়ে বলেন, 'এমনি ! ঘরে তো অন্নভক্ষ্য ধনুর্গুণ, এমনি তুমি কাজটা—ছেড়ে দিলে ? বুড়ি খুব খিটখিট করেছিল বুঝি ?'

'না না, কিছুই বলেন নি তিনি।'

'তবে ওই বৌ ছুঁড়ি ক্যাটকেঁটিয়ে কিছু বলেছে নিশ্চয় ! ওর কথাই অমনি। দেখনা শাশুড়ী পর্যন্ত জ্বলেপুড়ে মরে। তবু বলি, রাগের মাথায় ঝপ করে চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে আসা তোমার উচিত হয় নি মেয়ে ! এ জগৎ বড় কঠিন ঠাঁই।'

অতসী আস্তে চাবিটা কুড়িয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তর তর করে চলে আসতে পারে না।

হরসুন্দরী আবার বলেন, 'বুঝেছি, তোমার কপালে এখন অশেষ দুঃখ তোলা আছে। নইলে অমন কাজটা ছেড়ে দিলে! আর কোথাও কিছু জোগাড় করেছ নাকি?'

অতসী ক্ষুব্ধ হাসি হাসে, 'আমি আর কোথায় কি জোগাড় করবো?'

'তা'ও তো সত্যি। কিন্তু এও বলি অতসী, ঝোঁকের মাথায় কাজটা ছেড়ে না দিয়ে একবার বাড়ী এসে বিবেচনা করা উচিত ছিল। পরের দাসত্ব করতে গেলে গায়ে গণ্ডারের চামড়া পরতে হয় মা!'

'সেটা পরতে সময় লাগবে মাসীমা!'

বলে অতসী চলে আসতে যায়। হরসুন্দরী বাধা দিয়ে সন্দিগ্ধ ভাবে বলেন, 'শাশুড়ীও কিছু বলেনি বলছ, বৌও কিছু বলেনি, তবে ব্যাপারটা কী হল বলত? বুড়ির ছেলেকে তো ভাল বলেই জানতাম, সেই কোন রকম কিছু বেচাল দেখাল নাকি?'

'আঃ ছি ছি! কী বলছেন মাসীমা।'

অতসী রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'কী করে যে এই সব আজগুবি কথা মাথায় আসে আপনাদের!' বলেই চলে আসে, আর দাঁড়ায় না।

স্কুল থেকে ফিরে সীতু কোনদিন মাকে বাড়ীতে দেখতে পায় না। অতসী আসে সন্ধ্যার পর। আজ ঘরের দরজা খোলা দেখে ঈষৎ বিস্ময়ে দরজায় উঁকি দিয়েই পুলকে রোমাঞ্চিত হল সে। তার 'সীল' করা মনও এই পুলককে লুকিয়ে রাখতে পারল না।

বই রেখেই মার কাছাকাছি বসে পড়ে উজ্জ্বল মুখে বলে উঠল সীতু, 'মা এখন?'

অতসী কী এই উজ্জ্বল মুখে কালি ঢেলে দেবে? বলবে, 'ঘুচিয়ে এলাম চাকরী? এবার নেমে আসতে হবে দুর্দ্দশার চরমে?'

না, এই মুহূর্ত্তে তা পারল না অতসী। শুধু মৃদু হেসে বলল, 'দেখে বুঝি রাগ হচ্ছে?'

'ইস রাগ বৈ কি! রোজ তুমি থাকবে। ইস্কুল থেকে এসে তালা খুলতে বিচ্ছিরি লাগে।'

অতসী তেমনি ভাবেই বলে, 'বেশ, রোজ আমি থাকবো, তোকে আর দরজার তালা খুলতে হবে না। কিন্তু রোজগারের ভার তুই নিবি তো?'

না, কালি ঢেলে দেওয়া রদ করা গেল না। সুর কেটে গেল।

সীতু আস্তে আস্তে উঠে গেল মুখ হাত ধুতে।

কিন্তু নিজে ছাড়লেও 'কমলি' ছাড়ে না।

পরদিন হরসুন্দরী এসে জাঁকিয়ে বসলেন, 'শুনলাম বাছা তোমার কাজ ছাড়ার কারণ কাহিনী।'

অতসী অনুভব করল সীতু হেঁটমুণ্ডে অঙ্ক কসতে কসতেও উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি বলল, 'থাক্ মাসীমা ও কথা।'

কিন্তু হরসুন্দরী তো এসেছেন দূত হয়ে, কাজেই এক্ষুনি 'থাকলে' তাঁর চলবে কেন? তাই প্রবল স্বরে বলেন, 'তুমি তো বলছ বাছা থাক ও কথা। কিন্তু তারা যে আমায় আবার খোসামোদ করছে। বুড়ি তো মা আমার হাতে ধরে কেঁদে ভাসাল। শুনলাম সব। বৌটা না কি তোমার ছেলেকে বাবুর ফাইফরমাস খাটতে চাকর রাখতে চেয়েছিল? অহঙ্কার দেখ একবার! তুমি না হয় অভাবে পড়ে দাসীবিত্তি—'

মুখের কথা মুখেই থাকে হরসুন্দরীর, হঠাৎ সীতু খাতা ফেলে উঠে এসে তীব্র চীৎকারে বলে, 'তুমি চলে যাও।'

একে 'তুমি' তায় 'চলে যাও'।

হরসুন্দরীর আগুন হয়ে উঠতে পলক মাত্রও দেরী হয় না।

তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, 'তোমাদের মায়ে বেটার তেজটা একটু বেশী সীতুর মা! কপালে তোমার দুঃখু আছে। আচ্ছা চলে আমি যাচ্ছি। ঠিক ঠিক সময়ে ঘরভাড়াটা জুগিও বাছা, তোমার ছায়া মাড়াতেও আসবো না। আত্মজন ছেড়ে কেন যে তুমি ওই ছেলে নিয়ে অকূলে ভেসেছ, বুঝতে পারছি এবার।'

হরসুন্দরী বীরদর্পে চলে যান।

অতসীর অকূলের তৃণের ভেলা, অসময়ের একমাত্র হিতৈষী হরসুন্দরী বাড়ীওয়ালী।

অতসী কি ছুটে গিয়ে ওই ভেলাকে আঁকড়ে ধরবে? বলবে, 'জানেনই তো মাসীমা, ছেলে আমার পাগলা।'

না অতসীর সে শক্তি নেই। ছুটে যাওয়ার শক্তি। স্থাণু হয়ে গেছে সে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, নির্বাক দুটো প্রাণী বসে থাকে সেই অন্ধকারে। এমনি করেই কি লেখাপড়া চালাবে সীতু? মানুষ হবে, বড়লোক হবে? মৃগাঙ্ক ডাক্তারের অর্থঋণ শোধ করবে?

হঠাৎ এক সময় অতসী পিঠে একটা স্পর্শ অনুভব করে। একটা চুলে ভরা মাথা আর হাড় হাড় রোগা মুখের স্পর্শ।

'ও কেন ওকথা বলবে?' রুদ্ধ অস্ফুট স্বর।

অতসী নির্বাক।

আর একবার সেই রুদ্ধস্বর বলে ওঠে, 'আমার বুঝি বিচ্ছিরি লাগে না?' আপোসের স্বর, কৈফিয়তের স্বর।

অতসী স্থির স্বরে বলে, 'পৃথিবীর কোনটা তোমার বিচ্ছিরি লাগে না, সেটা আমার জানা নেই সীতু। নতুন করে আর কি বলবে?'

'চাকর বললে, দাসী বললে, চুপ করে থাকবো?'

'হ্যাঁ থাকবে।' অতসী দৃঢ় স্বরে বলে, 'তাই থাকতে হবে। আমারই ভুল হয়েছিল

কাজ ছেড়ে আসা। ঠিকই বলেছিল ওরা। আমাদের অবস্থার উপযুক্ত কথাই বলেছিল। অহঙ্কার আমাদের শোভা পাবে কিসে? জানো, একমাস যদি এ ঘরের ভাড়া দিতে না পারি, রাস্তায় বার করে দিতে পারেন উনি। জানো, জেনে রাখো! এসব জানতে হবে তোমায়। জেনে রাখো তোমার বিচ্ছিরি লাগা আর ভাল লাগার বশে, পৃথিবী চলবে না।' অতসী যেন হাঁফাতে থাকে, 'কাল থেকে আবার আমি ওখানে কাজ করতে যাবো। পায়ে ধরে বলবো, আমার ভুল হয়েছিল—'

'না না না!'

বাণ খাওয়া পশুর মত আর্তনাদ করে ওঠে বাক্যবাণ বিদ্ধ ছেলেটা।

আশ্চর্য, এত নিষ্ঠুর কি করে হল অতসী?

না কি ছেলেকে চৈতন্য করিয়ে দিতে ওর এই নিষ্ঠুরতার অভিনয়? অভিনয় কি এত তীব্র হয়? না কি অহরহ খুকুর মুখ তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে দিচ্ছে?

ওই আর্তনাদে একটু সামলায় অতসী। একটু চুপ করে থাকে। তারপর সহজ গলায় বলে, 'না, তো চলবে কিসে তাই বল?'

'নাই বা চলল?' সীতু তেমনি একগুঁয়ে স্বরে বলে, 'আমরা দু' জনেই মরে যাই না?'

অতসী উঠে দাঁড়ায়, যথাসম্ভব দৃঢ় স্বরে বলে, 'কেন? মরে যাব কেন? মরে যাওয়া মানেই হেরে যাওয়া তা' জানো? হারতে চাও তুমি? যদি হেরেই যাবো, তা হলে তো ও বাড়ীতেই মরতে পারতাম। এ খেয়ালকে মনে আসতে দিও না সীতু! মনে রেখো তোমায় বাঁচতে হবে, জিততে হবে। দেখাতে হবে, যে অহঙ্কার করে চলে এসেছ, সে অহঙ্কার বজায় রাখবার যোগ্যতা তোমার আছে।'

উঠে গিয়ে উনুন ধরাতে বসে অতসী।

কিন্তু ক'দিন উনুন ধরাবে?

কোথা থেকে আসবে রসদ?

কী করে কি করছে ওরা?

কী করে চালাচ্ছে?

কোথা থেকে আসছে ওদের রসদ?

এই কথাটাই আকাশপাতাল ভাবেন মৃগাঙ্ক ডাক্তার। ভাবেন সত্যিই কি এইভাবে ভেসে যেতে দেবেন ওদের?

না, অতসীর আস্তানা এখন আর তাঁর অজানা নেই। অনেকদিন ভেবে ভেবে অবশেষে মাথা হেঁট করে শ্যামলীর বাড়ী গিয়ে সে খোঁজ করে এসেছেন। যদিও অতসীর সহস্র নিষেধ ছিল, তবু শ্যামলী বলতে মুহূর্ত বিলম্ব করে নি। কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেছিল,

'লজ্জায় আমি আপনার কাছে মুখ দেখাতে পারি না কাকাবাবু, না হলে কবে গিয়ে বলে আসতাম! আমি বলি কি, আপনি আর ওঁদের জেদের প্রশ্রয় দেবেন না। এবার পুলিশের সাহায্য নিয়ে জোর করে ধরে এনে বাড়ীতে বন্ধ করে রেখে দিন। 'আবদার নাকি, ওই ভাবে একটা বস্তির বাড়ীর মত বাড়ীতে থেকে আপনার মুখ পোড়াবে?'

বোকাদের মুখরতা মৃগাঙ্কর অসহ্য, তবু সেদিন ওই বোকা মেয়েটার মুখরতা অসহ্য লাগে নি। সহসা মনে হয়েছিল, জগতে এই সরল সাদাসিধে অনেক-কথা-বলা লোক কিছু আছে বলেই বুঝি পৃথিবী আজও শুকিয়ে উঠে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায় নি। ভেবেছিলেন, আশ্চর্য, মেয়েটার ওপর এত বিরূপই বা ছিলাম কেন!

'তোমরা কোনদিন গিয়েছিলে?'

সসঙ্কোচে প্রশ্ন করেছিলেন মৃগাঙ্ক।

শ্যামলী মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, 'উপায় আছে? একেবারে কড়া দিব্যি। দেখা করব না, খোঁজ করব না, কোন সাহায্য করবো না—'

'সাহায্য' শব্দটা উচ্চারণ করে অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গিয়েছিল শ্যামলী। চলে এসেছিলেন মৃগাঙ্ক। চলে তো আসতেই হবে। নিতান্ত কাজ ব্যতীত বাইরে থাকার জো আছে কি? 'খুকু' নামক সেই ভয়ঙ্কর মায়ার পুতুলটা আছে না বাড়ীতে? সারাক্ষণ যাকে ঝি চাকরের কাছে পড়ে থাকতে হয়। মৃগাঙ্ক এলেই যে কোথা থেকে না কোথা থেকে ছুটে এসে 'বাব্‌বা বাব্‌বা' বলে ঝাঁপিয়ে কোলে ওঠে।

শুধু ওই 'বাবা' ডাকেই চিরদিন সন্তুষ্ট থাকতে হবে খুকুকে। 'মা' বলতে পাবে না। মা নেই ওর। হঠাৎ একদিন মোটর এ্যাকসিডেণ্টে মা মারা গেছে ওর।

বাবাই তাই বুকের ভেতরে চেপে ধরে খুকুকে।

কিন্তু থাকে না। বেশীদিন থাকে না এই অভিমান। থাকানো যায় না।

গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যান মৃগাঙ্ক।

শিবপুরের এক অখ্যাত গলির ধারে কাছে ঘুরে বেড়ান। একদিন নয়, অনেক দিন। কিন্তু কী যে হয়, কিছুতেই সাহস করে গাড়ী থেকে নেমে পায়ে হেঁটে সেই বাই-লেনের ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে যেতে পারেন না। বুকটা কেমন করে ওঠে। পা কাঁপে।

যদি অতসী পরিচয় অস্বীকার করে বসে।

যদি অন্য পাঁচজনের সামনে বলে ওঠে, 'আচ্ছা লোক তো আপনি? বলছি আপনাকে চিনি না আমি—'

চলে আসেন।

আবার যখন গভীর রাত্রে ঘুম থেকে জেগে ওঠা কান্নায় উদ্দাম খুকুকে কিছুতেই ভোলাতে না পেরে, কোলে নিয়ে পায়চারি করে বেড়ান, তখন মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করেন, 'কাল নিশ্চয়ই।' কিন্তু আবার পিছিয়ে যায় মন।

এই 'কাল কাল' করে কেটে যায় কত বিনিদ্র রাত, আর অশান্ত দিন।

তারপর সেদিন।

যেদিন খুকু—

কিন্তু এমন কি হয় না? ডাক্তার হয়েও এত বেশী নার্ভাস হলেন কি করে?

হয়তো অত বেশী নার্ভাস হয়ে উঠেছিলেন বলেই খুকু—

সেদিন অপদস্থ হয়ে ঘরে গিয়ে রাগে ফুঁসে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন হরসুন্দরী, 'রোসো! ঝেঁটিয়ে বিদেয় করছি। ও মা আমি গেলাম তোদের ভাল করতে, আর তোরা কি না! পুঁচকে ছোঁড়াটা যেন কেউটের বাচ্চা!'

আসল কথা দু'দিকে জ্বালা হল তাঁর।

হঠাৎ অতসী কাজটা ছেড়ে আসায় সন্দেহাকুল মনে গিয়েছিলেন তল্লাস নিতে, ভেবেছিলেন খুব একটা কিছু ঘটে গেছে বোধহয়।

কিন্তু, এমন আর কি!

হ্যাঁ, বুঝলাম ভাল ঘরের মেয়ে। ছেলেটাকে মানুষ করে তোলবার জন্যে শরীর পতন করতে বসেছে, চাকর রাখা কথাটা ভাল লাগেনি। তা' বলে ঝপ্ করে কাজটা ছেড়ে দিবি?

সুরেশ্বরী হাত ধরে কেঁদেছিলেন।

'তুমি যেমন করে পারো তাকে বুঝিয়ে বাঝিয়ে নিয়ে এসো বাপু। সেবার হাতটি তার বড় ভাল। এমনটি আর পাবো না। আর যে আসবে, সেই তো হবে কি না কি জাত। এমন ভাল জাতের মেয়ে—'

হরসুন্দরী ভেবেছিলেন, অনুরোধ উপরোধের জাল ফেলে মাছকে টেনে তুলবেন।

উপরোধে ঢেঁকি গেলান যায়, আর এতো ছানার মণ্ডা। অভাবের জ্বালায় মান অভিমান কতক্ষণ থাকে? নিজের ওপর আস্থা ছিল হরসুন্দরীর।

বলেই এসেছিলেন সুরেশ্বরীকে, 'আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে বাঝিয়ে নিয়ে আসবো আবার। উপরোধের মতন উপরোধ করতে জানলে ঢেঁকি গেলান যায় লোককে, আর এতো গিয়ে ছানার মণ্ডা। ভাল ঘরের মেয়ে তো, হঠাৎ মান অপমান বোধটা বেশী।'

কিন্তু এখন তাদের কী বলবেন? উপরোধ করার স্পৃহা তো আর নেই হরসুন্দরীর।

ওই ঢেঁটা ছেলেটা তার চিত্ত বিষ করে দিয়েছে। তাই একমনে দিন গুনছেন তিনি মাসকাবারটা কবে হয়। কবে ভাড়া না দিয়ে চুপচাপ বসে থাকার দায়ে ওই আঝাড়া বাঁশ দু'খানাকে ঘরছাড়া করেন।

গরীবের উপকার করতে বুক বাড়িয়ে দেওয়া যায়, যদি গরীব গরীবের মত নত থাকে। গরীবের অহঙ্কার অসহ্য!

হরসুন্দরী মাস কাবার পর্যন্ত অপেক্ষা করে বসে আছেন, কিন্তু অতসীর যে দিন কাটে না। তার স্বল্প সঞ্চয় ভাঁড়ারের সব কিছুই তো শেষ হয়ে গেছে। কাল পর্যন্ত চালটা ছিল, আজ তাও নেই।

চাল নেই!

মৃগাঙ্ক ডাক্তারের স্ত্রী চালের শূন্য কলসীটার সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে মৃগাঙ্ক ডাক্তারের স্ত্রী কাঁদবে? না হেসে লুটিয়ে পড়বে?

কলসীটা নেড়ে নাচাতে নাচাতে এসে বলবে, 'ওরে সীতু কী মজা! আজ আর বেশ রান্না করতে হবে না। বেশ কেমন যত ইচ্ছে ঘুমাবো মজা করে।'

হ্যাঁ, সেই কথাই বলতে গিয়েছিল অতসী।

সত্যিই কলসীটা হাতে করে গিয়েছিল।

নাচাতে নাচাতে বলেওছিল, 'ওরে সীতু আজ কী মজা! আজ আর রাঁধতে হবে না আমায়—'

কিন্তু এত হাসি যে কোথা থেকে এল অতসীর?

প্রগল্‌ভ প্রবল হাসি!

সেই হাসির ধমকে মাটির কলসীটা হাত থেকে ছিটকে গড়িয়ে ভেঙেই পড়ল একদিকে। আর অতসী লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

এক ঝাঁক স্কুলের মেয়ে একত্রে থাকলে যেমন করে তুচ্ছ কথায় হেসে লুটোপুটি খায়, একা অতসী তেমনি লুটোপুটি খাবে না কি?

এই হাসির দিকে তাকিয়ে আতঙ্কবিহ্বল একজোড়া দৃষ্টি যেন পাথর হয়ে তাকিয়ে থাকে।

আর ঠিক এই সময় হরসুন্দরী দরজায় এসে দাঁড়াল, তাঁর বড় মেয়েকে নিয়ে!

মহিলা দুটি ঘরের সম্পূর্ণ দৃশ্যটি একবার যাকে বলে অবলোকন করে গালে হাত দিয়ে বিস্ময় বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'হ্যাঁ গা ব্যাপার কি! ও খোকা, মা পড়ে গিয়ে কাৎরাচ্ছে না কি গো!'

'খোকা' অবশ্য এক ডাকে কথা কয় না, এখনো কইল না।

হরসুন্দরী এগিয়ে এসে বলেন, 'অ সীতুর মা, কাৎরাচ্ছো কেন? কলসীটাই বা ভেঙে গড়াগড়ি যাচ্ছে কেন, মায়ে ছেলের মুখে রা নেই যে।'

এবার ছেলে 'রা' কাড়ে।

স্বভাবগত তীব্র স্বরে বলে 'কাৎরাবেন কেন? হাঁসছেন।'

'হাঁসছেন!'

মা মেয়ে দু'জনে বোধকরি হাঁ করে হাঁ বন্ধ করতে ভুলে যান।

কিন্তু অতসী উঠে পড়ছে না কেন? কেন উঠে পড়ে বলছে না, 'বোকাটার কথা শুনছেন কেন মাসীমা! হঠাৎ পেটটা বড্ড ব্যথা করছে বলে!...ওই ব্যথার দাপটেই হাত থেকে কলসীটা পড়ে গিয়ে—'

না অতসী উঠছে না। মাটিতে মুখ গুঁজেই পড়ে আছে সে। শুধু দেহটা যে কেঁপে কেঁপে উঠছিল সেটা স্থির হয়ে গেছে।

হরসুন্দরী যদিও নিজের মেয়েদের সম্পর্কে সর্বদাই বিদ্বেষবাক্য উচ্চারণ করেন, কিন্তু আপাতত দেখা গেল মায়ে ঝিয়ে একতার অভাব নেই। মেয়েও অবিকল মায়ের ভঙ্গীতে গালে হাত দিয়ে বলে, 'হঠাৎ এত হাসির কি কারণ ঘটল যে গড়াগড়ি দিয়ে হাসতে হচ্ছে? সিদ্ধি খেয়েছ না কি গো অতসী?'

তোমরা সব্বাই এত অসভ্য কেন?' সীতু স্বর আরও তীব্র করে, 'কলসীতে চাল নেই, রাঁধতে হবে না বলে মা হাসছেন! সিদ্ধি! সিদ্ধি মানুষে খায়? শুধু তো দারোয়ানরা খায়।'

সহসা মাতা কন্যা চুপ করে যান এবং পরস্পর একটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হয়। আর মিনিট খানেক তাকিয়ে থেকে হরসুন্দরীর চোখে যে আলোটি ফুটে ওঠে, সেটি প্রেমেরও নয়, করুণারও নয়, স্রেফ্ জয়োল্লাসের।

সেই আলোঝরা চোখে বলে ওঠেন হরসুন্দরী, 'তোমাদের রঙ্গলীলা তোমরাই জানো। ঘরে চালের দানা নেই, মেজাজ চালে মট্‌মট! এই অবধি বুড়ি কী খোসামোদটাই করল আমাকে! তোমাদের মতিগতি দেখে আর বলে অপমান্যি হলাম না! এতদিনে তারা হতাশ হয়ে অন্য লোক রাখল। যাক গে মরুক গে! ভেতরের কথা তোমরাই মায়ে পোয়ে জানো। আমার কথা বলে যাই। ভাড়া না দিয়ে ভাড়াটে পুষি এমন সঙ্গতি আমার নেই। মাসের আর দু'দিন আছে, এর মধ্যে অন্য ব্যবস্থা করে ফেল, পয়লা থেকে আমার মেয়ের ভাগ্নী এসে থাকবে। এর যেন আর নড়চড় না হয়।'

দুম দুম করে চলে আসেন দু'জনে। কিন্তু দোষ হরসুন্দরীকে দেওয়া যায় না। অসহায়া বিধবাকে দেখে মায়া তাঁর পড়েছিল। ওদের যাতে ভাল হয় তার চেষ্টাও কম করেন নি। কিন্তু মায়া যে নেয় না, ভাল যে চায় না, তার ওপর কতক্ষণ আর কার চিত্ত প্রসন্ন থাকে?

তার উপর আজকের এই পরিস্থিতি।

বলতে এসেছিলেন অবিশ্যি বাড়ী ছাড়ারই কথা। কিন্তু রয়ে বসে আর একবার শেষ

চেষ্টা দেখে বলবেন ভেবেছিলেন। ওমা এ আবার কী ঢং! ঘরে চাল নেই, রান্নার ছুটি বলে আহ্লাদে গড়াগড়ি দিয়ে হাসছে! হয় পাগল, নয় তলে তলে অন্য ব্যাপার! হয়তো আসলে গরীব নয়, ঘর ভেঙে পালিয়ে টালিয়ে এসেছে। আবার হয়তো ফিরে যাবে। তবে আর মায়া করার কী দরকার?

মেয়ে বলে, 'তুমি মোটেই আশা কোর না মা, যাবে। ও দেখো, ঠিক ঘর কামড়ে পড়ে থাকবে।'

হরসুন্দরী থমথমে গলায় বলেন, 'নাঃ, সেদিকে তেজ টনটনে। ছেলের হাত ধরে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াবে, তবু মচকাবে না।'

হ্যাঁ, হরসুন্দরী বাড়ীওয়ালী চিনেছিলেন অতসীকে। মানুষ চেনবার ক্ষমতা তাঁর আছে।

'এই তালাচাবিটা রইল মাসীমা, ঘরটা ধুয়ে রেখে গেলাম।' বলে ভাঙা নড়বড়ে সেই তালাটা হরসুন্দরীর কাছে নামিয়ে দিয়ে একটা নমস্কারের মত করে অতসী।

হরসুন্দরী নীরস গলায় বলেন, 'আশ্রয় একটা জোগাড় করেছ, না তেজ করে ছেলের হাত ধরে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াচ্ছ?'

অতসী ঈষৎ হেসে বলে, 'আপনাদের আশীর্ব্বাদই আশ্রয় মাসীমা, উপায় হবেই যাহোক একটা কিছু।'

হরসুন্দরী নিশ্বাস ফেলে চাবিটা কুড়িয়ে নিয়ে বলেন, 'ধর্মে মতি থাক, ছেলেটা মানুষ হোক। তবে এও বলি অতসী, তোমার যত দুর্গতি ওই ছেলে থেকেই। ওর চেয়ে এক গণ্ডা মেয়ে থাকাও ভাল।'

মেয়ে সম্পর্কে বিরক্তি-পরায়ণা হরসুন্দরী আজ এই রায় দিয়ে বসেন।

আর কি শোনবার আছে?

আর কি বলবার আছে?

এখন শুধু দেখতে বেরোনো' পৃথিবীটা কত ছোট।

না, মাস পয়লায় হরসুন্দরীর মেয়ের ভাগ্নী এসে ভাড়াটে হল না তাঁর। ওটা ছল। ঘরটা শূন্য পড়ে রইলো আরও দশ বিশ দিন। এ ঘরের উপযুক্ত খদ্দের আবার জোটা চাইতো?

কিন্তু পয়লা তারিখে হরসুন্দরী বাড়ীওয়ালীর ওপর একটা মস্ত ধাক্কা এসে লাগলো। ওই সরু বাইলেনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল প্রকাণ্ড একখানা গাড়ী। আর সেই গাড়ী থেকে রাজার মত চেহারার একটা মানুষ নেমে এসে খুঁজেছিল হরসুন্দরী বাড়ীওয়ালীকে।

আচ্ছা, তাঁর সীমানা কি ওইটুকু পর্যন্তই ছিল? তা'হলে হরসুন্দরী অমন করে কপালে করাঘাত করেছিলেন কেন?

'এই ঘর বাবা! এই দুদিন আগেও ছিল। হঠাৎ কি মতি হল—'

নিজের দুর্মতির কথাটা আর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেন না হরসুন্দরী। সেটা মনের মধ্যে পরিপাক করে তুষের আগুনে জ্বলতে থাকেন।

কী কুকাজই করেছেন!

আর দুটো দিন যদি ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতেন! তা'হলে আজকের নাটকটা কতখানি জমে উঠত, একবার প্রাণভরে দেখে নিতেন।

তা' কি করেই বা জানবেন হরসুন্দরী যে, বলতে মাত্রই পরদিন সকাল বেলাই দন্ত দেখিয়ে চলে যাবে ছুঁড়ি! দুটো দিনও থাকবে না!

আহা-হা ইস!

এই রাজার মত মানুষটা তাকে খুঁজতে এসে ফিরে যাচ্ছে!

এবারে বোঝাই যাচ্ছে, বাড়ী ছেড়ে চলে আসা নিছক রাগের ব্যাপার। যা তেজ, যা রাগ! মানুষটা অতসীর কি রকম আত্মীয় সেটা জানবার দুরন্ত ইচ্ছেকে দমন করে থাকেন হরসুন্দরী। এই হোমরা-চোমরা দীর্ঘদেহ সাহেবী পোষাক পরা লোকটাকে জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না। তবু মনে মনে অনুভব করেন, হয় বড় ভাই, নয় ভাসুর। তা' ছাড়া আর কি হতে পারে? ভাসুর হওয়াই সম্ভব, ভাই হলে যতই হোক চেহারায় আদল থাকতো।

'কোনও ঠিকানা রেখে যায়নি?'

'নাঃ!' হরসুন্দরী ক্ষোভ প্রকাশ করেন, 'মানুষকে তো মনিষ্যি জ্ঞান করে না! কেমন যে একবগ্‌গা জেদী মেয়ে!'

এক বগ্‌গা জেদী!

সে কথা মৃগাঙ্কর চাইতে আর বেশী কে জানে!

ঘরটা এমন কিছু বিশাল বিস্তৃত নয় যে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সবটা দেখা যায় না, বলতে গেলে তো এ দেওয়ালে ও দেওয়ালে হাত ঠেকে। তবু মৃগাঙ্ক সহসা চৌকাঠের মধ্যে পা রাখলেন।

দেখতে চেষ্টা করছেন কি, দুদিন আগেও যারা এঘরে ছিল, তাদের উপস্থিতির রেশ এখনো এর মধ্যে সঞ্চরণ করে ফিরছে কিনা? না, তা নয়, মৃগাঙ্ক শুধু অস্ফুট একটা শব্দে শিউরে ওঠাটা দমন করলেন।

এই ঘরে বাস করে গেছে অতসী!

এই দুদিন আগে পর্যন্তও ছিল?

রাত্রে দরজা বন্ধ করলে তারের জাল ঘেরা ঘুলঘুলির মত ওই জানলাটা ছাড়া নিঃশ্বাস

ফেলার দ্বিতীয় আর পথ নেই। আর সেই পথ থেকে উঠে আসছে নীচের কাঁচা নর্দ্দমার দুর্গন্ধবাহী বাতাস।

কিন্তু এত বিচলিত হচ্ছেন কেন মৃগাঙ্ক, সুরেশ রায়ের বাড়ী কি তিনি দেখেন নি?

তবু ব্যাকুল মৃগাঙ্ক ব্যগ্র স্বরে বললেন, 'যদি কোন দিন আসে, যদি আপনার সঙ্গে দেখা হয়, বলবেন, তার যে ছোট্ট বাচ্চা একটা মেয়ে আছে, তার খুব বেশী অসুখ—'

মেয়ে!

কথা শেষ করতে দেন না হরসুন্দরী, চমকে উঠে গালে হাত দেন, 'মেয়ে! বলেন কি বাবা? মেয়ে আছে তার? আপনি যে তাজ্জব করলেন আমাকে! ছেলের থেকে ছোট মেয়ে? সেই মেয়ে ছেড়ে—'

মৃগাঙ্ক বোধ করি এবার সচেতন হন।

মৃদু গম্ভীর স্বরে শুধু বল্লেন, 'হ্যাঁ'। দুর্ভাগ্য শিশু! যাক্ যদি কোন রকম যোগাযোগ—আচ্ছা—একদম একা গেছে? না কোন—'

'না বাবা, কেউ না। একেবারে একা। মায়ে ছেলে দুজনে চলে গেল একটা রিকশা ডেকে। তাই সে রিকশার ভাড়াটাই যে কি করে দেবে ভগবান জানেন! ঘরে তো ভাঁড়ে মা ভবানী। আপনাদের মতন এমন সব আত্মীয় থাকতে—'

মৃগাঙ্ক ততক্ষণে উঠোনে নেমেছেন।

না, মৃগাঙ্কর পক্ষে সম্ভব নয় নিজেকে এর থেকে বেশী ব্যক্ত করা, যতই ব্যাকুল হয়ে উঠুক অন্তর।

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

দু'দিন আগে এলেন না মৃগাঙ্ক।

খুকুর টাইফয়েড্! খুকু প্রবল জ্বরের ঘোরে 'মা মা' করছে, এ শুনলেও হয়তো কাঠ হয়ে বসে থাকতো সেই পাষাণ মূর্ত্তি! বলতো, 'খুকুর মা তো অনেকদিন আগে মরে গেছে।'

হয়তো তাই বলতো!

জ্বরে আচ্ছন্ন খুকুকে নার্সের কাছে রেখে এসেছেন মৃগাঙ্ক। আর স্বেচ্ছায় এসে বসে আছে সেই মেয়েটা। যে মেয়েটা সুরেশ রায়ের ভাইঝি।

গতকাল খুকুর একটা 'টাল' গেল। শহরের সেরা সেরা ডাক্তারের ভীড় হয়ে উঠল বাড়ীতে, নার্সের উপর নার্স-এল। আর সহসাই সেই সময় ওই মেয়েটা খুকুর খবর নিতে এল। পথে এ বাড়ীর কোন ঝি চাকরের সঙ্গে দেখা হয়েছে, শুনেছে খুকুর অসুখ।

ভাবলে অবাক লাগে, সেই কাল থেকে মেয়েটা মৃগাঙ্কর বাড়ীতেই রয়ে গেল। নার্সের সঙ্গে মিলে মিশে দেখাশোনা করতে লাগল খুকুকে।

মৃগাঙ্ক অস্বস্তি বোধ করে বারবার অনুরোধ করেছেন বাড়ী ফিরে যেতে, তার যে একটা

ছোট ছেলে আছে—সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু শ্যামলী গ্রাহ্য করে নি ব্যাপারটা। বলেছে ছেলে তার যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে।

মৃগাঙ্ক অবাক হয়ে দেখলেন মেয়েটা কত সহজে সহজ হয়ে গেল। পরের বাড়ী থেকে গেল। সময় মত চান করে খেয়ে নিল, 'কাকাবাবু আপনি একটু বিশ্রাম করুন গে—' বলে জোর করে পাশের ঘরে ঘুমোতে পাঠিয়ে দিল মৃগাঙ্ককে। কোথাও ঠেক্ খেল না। সরল—মানে বোকা! আর বোকা বলেই হয়তো বা নিজের জীবনকে কোনদিন জটিল করে তুলবে না।

হয়তো মৃগাঙ্কর ভাবনাই ঠিক।

অতসী আর অতসীর ছেলের বুদ্ধি প্রখর, তাই ওরা জীবনকে ক্রমশঃ জটিল করে তুলছে।

নইলে খেটে খাওয়া ছাড়া যার জীবনে আর কোনও গতি রইল না, সে তুচ্ছ একটু অভিমানের বশে সুরেশ্বরীর কাজটা ছেড়ে দেয়।

সে তো তবুও মোটা মাইনের সম্ভ্রম ছিল।

এখন যে 'খাওয়া পরা রাঁধুনীর' কাজ।

হ্যাঁ তাই মেনে নিতে হয়েছে। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে আহার আর আশ্রয় জোগাড় করবার এছাড়া আর উপায় কি?

এই যে জোগাড় হয়েছে সেটাই আশ্চর্য্য। এমন হয় না। রিকশা করে অনেকটা দূর এগিয়ে অতসী হঠাৎ একটা গেটওয়ালা বড় বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে ছেলেকে বলেছিল, 'দাঁড়া তুই এই জিনিস পত্র আগলে, আমি আসছি।'

আর খানিকক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে ছেলেকে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিল 'আয়।'

'এখানে কি!' সীতু আড়ষ্ট হয়ে বলে উঠেছিল 'এরা তোমার চেনা?'

'না! চেনা করে নিতে হবে। করে নিলাম।'

অতসীর অনেক ভাগ্য যে, ঠিক যে সময় বাড়ীর গিন্নী রাঁধুনীহীন অবস্থায় 'কারে' পড়ে রয়েছেন, সেই সময় অতসী গিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করেছিল, 'রান্নার লোক রাখবেন?'

রান্নার লোক!

গিন্নী ভাবলেন, তাঁর আকুল প্রার্থনায় স্বয়ং ভগবান কি ছদ্মবেশিনী কোন দেবীকে পাঠিয়ে দিলেন। বিহ্বলতা কাটতে কিছুক্ষণ গেল। তারপর থতমত সুরেই বললেন, 'রাখবো তো, লোকের তো দরকার। কিন্তু তুমি কে কি বৃত্তান্ত না জেনে—'

অতসী মনকে দৃঢ় করে এনেছে, এনেছে স্নায়ুকে সবল করে। তাই স্পষ্ট গলায় বলে, 'আমাকে দেখে কি আপনার চোর ডাকাত অথবা খুব খারাপ কিছু মনে হচ্ছে?'

'না না খারাপ কেন? সরস্বতী প্রতিমা খানির মত তো চেহারা! তা বলছি না। মানে—'

'মানে ভাববার কিছু নেই। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আমার জন্যে কোন বিপদে পড়তে হবে না আপনাকে।'

'তা' তুমি হঠাৎ এমন ভাবে কোথা থেকে—'

'বুঝতেই পারছেন, খুব একটা অসুবিধেয় না পড়লে এভাবে মানুষ আসে না। সেইটা মনে করে আমার সম্পর্কে বিচার করবেন।'

আঘাত খেয়ে খেয়ে শক্ত হয়ে উঠেছে অতসী, শিখেছে কথা বলতে।

'তা' বেশ, থাকো তবে। আজ থেকেই থাকো। রান্নাটান্না জানো তো?'

অতসী মৃদু হেসে বলে, 'চালিয়ে নেব।'

'হুঁ, মনে হচ্ছে জানো। তা' মাইনে টাইনে—'

এবার অতসী আরও বুক শক্ত করে ফেলছে। তাই অবলীলায় ভানে বলে, 'মাইনে লাগবে না, তার বদলে আমার ছেলের ভার নিতে হবে।'

'ছেলে!'

গিন্নীর মুখটা পাংশু হয়ে যায়। 'ছেলে আছে?'

অতসী শান্ত দৃঢ় স্বরে বলে 'হ্যাঁ। ছেলে না থাকলে শুধু নিজের জন্যে কে অপরের দরজায় দাঁড়াতে আসে বলুন? পৃথিবীতে মৃত্যুর উপায়ের অভাব নেই।'

গিন্নী আরও থতমত খেয়ে বলেন, 'কিছু মনে কোর না বাছা, মানে কর্তাকে না জিজ্ঞেস করে ছেলের বিষয়—'

'তিনি বাড়ী নেই?'

'আছেন। ওপরে আছেন। বেশ তুমি বোসো, জিজ্ঞেস করে আসি। কত বড় ছেলে?'

'ক্লাস সিক্সে পড়ে।'

'ওমা তাহলে তো বড় ছেলে।'

গিন্নী অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন, 'দেখে তো তোমায় খুব ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে, এ অবস্থা কত দিন হয়েছে?'

অতসী মাথা নীচু করে বলে, 'ওকথা জিজ্ঞেস করবেন না।'

ভদ্রমহিলা আসলে ভদ্র-প্রকৃতি।

এবং অতসীর মধ্যে তিনি সাধারণ রাঁধুনীর ছাপ দেখতে পান নি বলেই আকর্ষিত হলেন। ভাবলেন, ঠাকুর মুখপোড়া যদি দেশ থেকে আসে তো একে ঘরের কাজের জন্যে রাখবো। বাড়ীর মেয়ের মত থাকবে। ছেলেটা? তা ওর মাইনের বদলে তো ছেলেটার ইস্কুলের মাইনে আর খাওয়া দাওয়া একটু বেশী পড়বে বটে। থাক্, ভদ্রঘরের মেয়ে বিপাকে পড়েছে।

মিনিট দুই তিন পরেই নেমে এলেন তিনি, বললেন, 'কর্তার অমত নেই। তা'হলে ছেলেকে নিয়ে এস। কখন আসবে?'

'এখনই।' বলে বেরিয়ে গেল অতসী।

কর্ত্তা গিন্নীর বয়েস হয়েছে। মেয়ে নেই, আছে দুটি বিবাহিত ছেলে। দুইটিই বিদেশে কাজ করে, স্ত্রী পুত্র নিয়ে বছরে একবার ছুটিতে আসে। বাকী সময় কর্ত্তা গিন্নী এত বড় বাড়ীটায় একাই থাকেন। চাকর বাকর নিয়েই সংসার।

অবস্থা ভাল, তাই সাধারণ নিয়মে গিন্নীর হার্টের অসুখ, বাতের কষ্ট। রান্নার লোক বিহনে দুদিনেই হাঁফিয়ে ওঠেন।

অতসীকে দেখে তাঁর মনটা আশায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। বৌরা চলে গিয়ে পর্যন্ত এমনি ঘরের মেয়ের মত একটি ভদ্র মেয়ে তাঁর কল্পনার জগতে ছিল।

কর্তাও এক কথায় রাজী হয়ে যান। বলেন 'নাতিপুতি কেউই তো থাকে না, একটা ছেলে থাকুক পড়ালেখা করুক, ভালই।'

আশ্রয় জুটলো।

নিরাপদ আশ্রয়। ভাল ঘর, সৎ পরিবেশ! আর তবে কিছু চাইবার নেই অতসীর?

গভীর রাত্রে যখন সীতু ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় অতসী। হ্যাঁ, দোতলাতেই ঠাঁই পেয়েছে সে। গিন্নী বলেছেন, নীচে চাকর বাকরের আড্ডা। ওখানে আমি তোমাকে থাকতে দিতে পারবো না বাছা, ওপরেই আমাদের ঘরের কাছাকাছি থাকো। সকল ঘর দোরই তো খালি পড়ে।

বারান্দার কোণের দিকের ছোট একটা ঘরে মা ছেলে আশ্রয় পেল।

রাত্রে যখন ঘুম আসে না বারান্দায় এসে দাঁড়ায় অতসী। নিজেকে যেন আর সেই হরসুন্দরী বাড়ীওয়ালীর ভাড়াটের মত দীন হীন মনে হয় না, আর সেই সময় ভাবতে থাকে অতসী। তাহলে আর কিছু চাইবার রইল না তার? এই পরম পাওয়ার ভেলায় চড়ে সমুদ্র পার হবার সাধনা করে চলবে? পৃথিবীর আরো অসংখ্য দুঃখী মেয়ের মত দাসীবৃত্তি করে ছেলেকে কোন রকমে বড় করে তুলবে, তারপর ছেলের উপার্জ্জনের ভাত খেয়ে মনে করবে জীবনের চরম সার্থকতার সন্ধান মিললো তবে? মিললো দীর্ঘ সংগ্রামের পুরস্কার?

জীবনে মৃগাঙ্ক বলে কোনদিন কোন এক দেবতার দর্শন মিলেছিল সে কথা নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলতে হবে সমস্ত চেতনা থেকে? আর তুলোর পুতুলের মত সেই একটা জীব সে কোন দিন পৃথিবীতে এসেছিল, একেবারে ভুলে যেতে হবে সে কথা?

আশ্চর্য্য! তবু বেঁচে থাকবে অতসী। বেঁচে আছে। সহজ সাধারণ মানুষের মত খাচ্ছে ঘুমুচ্ছে, নিশ্বাস নিচ্ছে, কথা বলছে, এমন কি হাসছেও।

সেই তুলোর পুতুলটার কোন বার্ত্তা আর কোনদিন জানতে পারবে না।

সে বার্ত্তা নিয়ে যে অতসীর দরজায় দাঁড়াতে এসেছিল একজন, জানতেও পারল না অতসী।

হরসুন্দরী বাড়ীওয়ালী অতসীদের 'খবর খবর' করে হাঁফিয়ে মরলেন, অথচ এ বুদ্ধিটুকু

মগজে আনতে পারলেন না, সীতুর স্কুলে একবার খোঁজ করে দেখলে হতো! অতসীর যে একটা মেয়ে আছে, তার বাড়াবাড়ি অসুখ শুনলে কী করতো অতসী সেটা আর দেখা হ'ল না হরসুন্দরী বাড়ীওয়ালীর।

'বেইমান! মহা বেইমান!'

ভাবলেন হরসুন্দরী। নইলে এত উপকার করলেন তিনি, সে সব ভস্মে গেল। এতটুকু কি একটু বললেন, বড় হয়ে উঠল সেটাই? একবার কি দেখা করতে আসতে পারত না?

অতসীও স্তব্ধ রাত্রে জনশূন্য রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে, সীতু অকৃতজ্ঞ, সীতুর মা-ই বা অকৃতজ্ঞতায় কী কম যায়! নইলে শ্যামলীর কাছ থেকেও নিজেকে লুপ্ত করে নিল কি করে? শ্যামলী হরসুন্দরীর বাড়ী জানতো, এ বাড়ীর সন্ধান পাবার কোন উপায় তার নেই।

কিন্তু চিঠি লিখে ঠিকানা জানাবে অতসী কোন পরিচয় বহন করে?

শিবনাথ গাঙ্গুলীর বাড়ীর রাঁধুনী?

কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি।

আকাশে নক্ষত্রের সভা অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে কেমন একটা ভয় ভয় আর মন ঝিম ঝিম করা অনুভূতি আসে। তেমনি অনুভূতিতে অনেকক্ষণ নিথর হয়ে থেকে অতসী ভাবে, এমন করে হারিয়ে গিয়ে, আবার কোনদিন কি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো যাবে?

ছেলেকে তো দৃঢ়চিত্তে শাসন করেছিল সে সেদিন, 'মরে যাবো কেন? মরে গেলেই তো হেরে যাওয়া হ'ল। তোমাকে মানুষ হতে হবে, মানুষের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর উপযুক্ত হতে হবে।'

কিন্তু কবে সেই উপযুক্ততা আসবে সীতুর? আর যখন আসবে, তখন কি তারা অবিকল থাকবে? যাদের সামনে উঁচু মাথা নিয়ে গিয়ে দাঁড়ানোর মূল্য?

যদি তা না হয়, যদি এই হারিয়ে যাওয়া দিন থেকে কূলে উঠে দেখে অতসী, যাদের দেখাবার জন্যে এই কাঁটাবনের সংগ্রাম, তারাই গেছে হারিয়ে? আর সেই পুতুলটা—

অসম্ভব একটা যন্ত্রণায় মাথাটা ঠুকতে ইচ্ছে করে অতসীর। ইচ্ছে করে 'খুকু খুকু' করে চীৎকার করে কাঁদে।

কিছুই বরতে পারে না।

শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে উর্দ্ধলোকের নক্ষত্র সভায়।

মৃগাঙ্ক কি কোন দিন রাত্রে জেগে থাকেন? তাকিয়ে থাকেন আকাশের দিকে?

কিন্তু যদিই থাকেন?

সে খবর জানবার দরকার কি—শিবনাথ গাঙ্গুলীর বাড়ীর রাঁধুনীর?

বর্ষা যায় শরৎ আসে, গাঙ্গুলীদের 'মেয়ের মতন' রাঁধুনীর দিন কাটে মৃদুমন্থরে। ভারাক্রান্ত, ক্লান্ত ছন্দ, 'রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধার' একটানা একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি।

কাজের চাপ বেশী থাকলেও বুঝি ছিল ভাল, তাতে তাল উঠত দ্রুত। কিন্তু এঁদের সংসার ছোট, চাহিদা কম, পুরনো চাকর আছে, সে প্রায় সবই করে, অতসীর অনেক অবসর।

কিন্তু সে অবসরকে কাজে লাগাবার সুবিধে কোথায়? অতসী ভাবে, আমি কি আবার লেখাপড়া করবো? আমি কি চেষ্টা করে কোথাও সেলাই শিখবো? আমি কি আমার আয়ত্তাধীন বিদ্যে পশম বোনাটাকে কাজে লাগিয়ে উপার্জ্জনের চেষ্টা করবো? একটা কিছু না করে কি করে কাটাবো আমি? আর কতদিন বহন করবো এই রাঁধুনীর পরিচয়?

ভাবে, ভেবে ভেবে উত্তাল হয়ে ওঠে তার দিনের অবসর, বিনিদ্র রাত্রি মর্মরিত হয়ে ওঠে সে ভাবনার দীর্ঘশ্বাসে। কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারে না। ভয়ঙ্কর এক ভয় গ্রাস করে থাকে তাকে, পথে পা বাড়াতে দেয় না।

এ তো হরসুন্দরীর পাড়ার সর্পিল গলি নয়, এটা বড় রাস্তা। আর জীবনের সম্ভ্রম খুঁজে নিতে পা বাড়াতে হ'লে তো বড় রাস্তার পথ ধরেই চলতে হবে।

কিন্তু বড় রাস্তায় পা ফেলতে যে সেই দুর্দ্দমনীয় ভয়। যদি কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!

দেখা হয়ে গেলে কী হয়!

অনেক দিন ভেবেছে অতসী, আর ভাবতে ভাবতে খেই হারিয়ে ফেলেছে। কী হয়, সেটা আর সম্পূর্ণ একটা ছবিতে পরিণত করতে পারে নি।

খেই হারাতে হারাতে ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে তার অতীত জীবন। শ্লেট পাথরের মত একটা বিবর্ণ ভারী ভারী অনুভূতি ছাড়া সবই যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। ভুলে যাচ্ছে এ বাড়ীর রাঁধুনী ছাড়া আর কোন পরিচয় অতসীর ছিল।

তা এমন অতীত হারানো বিস্মৃতির কুয়াসা অনেক মেয়ের জীবনেই তো ক্রমশঃ পাকা বনেদ নিয়ে বসে। বিদেশে বাসায় রাজার হালে কাটাতে কাটাতে হঠাৎ ওঠে কাল বৈশাখীর ঝড়, তছনছ করে উড়িয়ে নিয়ে যায় পাখীর বাসাটুকু, ভাগ্যহতের পরিচয় সর্ব্বাঙ্গে বহন করে এসে আশ্রয় নিতে হয় তাদের কাছে, যারা এ যাবৎ তার সুখসৌভাগ্যে আনন্দের থেকে ঈর্ষা অনুভব করেছে বেশী। সেখানে গৃহকর্মের সমস্ত দায় মাথায় নিয়ে সেই মেয়েকে টিঁকে থাকতে হয় সংসার নামক বৃক্ষের শাখায়। যদি তাকে টিঁকে থাকাই বলা হয়।

তখন, সেই দাস্যবৃত্তির অন্তরালে কোন দিন কি কখনো মনে পড়ে তার একদা অনেক সুখ তার হাতের মুঠোয় ছিল?

ভুলে যায়!

অতসীও ক্রমশঃ ভুলছে। ভুলছে বললে ঠিক বলা হয় না, মনে আনার চেষ্টাই করছে না। কেন করবে, অতসীকে তো তার ভাগ্য প্রত্যক্ষ আঘাত হানে নি। আপাতদৃষ্টিতে তো দেখলে মনে হয় অতসী নিজেই হাতের মুঠো আলগা করে ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছে তার সুখ, তার জীবন।

তাই অতসীর অনেক ভয়।

ভয়, যদি পথে বেরিয়ে হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে যেতে হয় সেই অনেক দিনের সুখের অতীত জীবনের সঙ্গে।

কিন্তু অতসী কি বুঝতে পারে সীতুও আজকাল ওই এক রোগে ভুগছে। ওই ভয় রোগে। 'যদি কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!' এই আতঙ্কে সীতু স্কুলে যায় আসে প্রায় চোখ বুজে।

না, অতসী জানে না।

সে দিনের সে কথা সীতু অতসীকে বলে নি। তা কবে আর কোন কথা মার কাছে বলে সীতু? তাই সেদিন বলবে পথে কী ভয়ানক ঘটনা ঘটেছিল? সেদিন সীতু শুধু আরক্ত মুখ আর ভয়ঙ্কর ওঠা পড়া বুক নিয়ে ছুটে এসেছিল। আর অতসীর ব্যাকুল প্রশ্নে বলেছিল, 'রাস্তায় পড়ে গেছি।'

অতসী কি করে জানবে সেদিন স্কুল থেকে বেরিয়ে মোড় পার হবার মুহূর্তে সীতুর পাশ দিয়ে ধাঁ করে বেরিয়ে গিয়েছিল একখানা ভয়ঙ্কর পরিচিত মোটরগাড়ী। আর তার চালকের আসনে যে বসেছিল সে সীতুর দিকে চোখ ফেলে নি বলেই এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছিল সীতু।

হ্যাঁ, সে লোকটার এদিক ওদিক কোনদিকেই যেন দৃষ্টি ছিল না।

গাড়ীটা চোখের সামনে দিয়ে চলে যাওয়া সত্ত্বেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত যেন বিশ্বাস হয় নি সীতুর, যা দেখল সত্যি কি না, অথচ ভেবে দেখলে সত্যি হওয়াটা কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

আশ্চর্য্য নয়, তবু বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল মিনিটের পর মিনিট।

ও যে কোথায় ছিল, কোথায় যাচ্ছিল, সবই যেন বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল সেই অদ্ভুত মুহূর্তগুলিতে।

চেতনার জগতে ফিরে এল ঘাড়ের ওপর একখানা ভারী হাতের থাবার চাপে আর একটা দুর্বোধ্য চীৎকারে—

চমকে পিছন ফিরে কাঠ হয়ে গেল সীতু।

হরসুন্দরী বাড়ীওয়ালী!

তীব্রস্বরে চেঁচাচ্ছেন, 'ও সর্বনেশে ছেলে, এখনো তোরা এ তল্লাটেই আছিস? আর আমি—'

'আঃ লাগছে ছেড়ে দিন—'

সীতু কাঁধটায় ঝাঁকুনি দিয়ে সেই ভারী থাবার কবলমুক্ত হতে চেষ্টা করে। কিন্তু থাবাটি বড় শক্ত ঘাঁটি। তাছাড়া হরসুন্দরী তখন রাগে দুঃখে আবেগে উত্তেজনায় মরীয়া। তিনি বরং আরও শক্ত করে চেপে ধরে বলেন, 'এইখানেই আছিস! এখনো এই ইস্কুলেই পড়িস! ও মা, আমার যে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে গো। অতবড় একটা মান্যিমান লোক রোজ আসছে আমার দরজায় তোদের তল্লাস নিতে, রোজ আমি লজ্জায় অধোমুখ হয়ে যাচ্ছি, দিতে পারছি না একটা খবর। বলি কী ব্যাপার তোদের? অতবড়

গাড়ী চড়ে অমন মানুষটা হ্যাং হ্যাং করতে করতে আসে তোদের মা বেটার খবর নিতে, আর তোরা ঘাপটি মেরে বসে আছিস এখানেই? হা আমার কপাল! বলি তোর মা'র এত তেজ কেন বলতো?'

'চুপ করুন। আপনাকে মার কথা বলতে হবে না।'

'না তা তো হবেই না। যেমন তুমি আর তেমনি তোমার মা! এদের জন্যে আবার মানুষ খবর খবর করে খুঁজে বেড়ায়! আমি হলে তো—'

সীতু হঠাৎ কেমন একটু শিথিল ভাবে বলে 'কে খুঁজতে আসে?'

'কে তা তোমরাই জানো। তোমার মামা-দাদা কি জ্যাঠা-খুড়ো। হোমরাচোমরা চেহারা, তাই দেখি। এই নিত্যদিন আসছে 'খবর আছে কি না।'

আমিও আজ শুনিয়ে দিয়েছি, 'তারা খবর দেবার লোক নয় মশাই, বেইমানের ঝাড়। মিথ্যে আপনি আশা করছেন। যে মেয়ে মানুষ কোলের কচি মেয়ে ফেলে তেজ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে—'

'ছেড়ে দিন।'

কাঁধ ছাড়িয়ে পথে নামে সীতু।

আর হরসুন্দরী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অনেক বিষাক্ত রস মিশিয়ে চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, 'এই শোন্ ছোঁড়া, শুনে যা। সেই আহাম্মুক লোকটা বলে গেছে যদি তোদের সঙ্গে দেখা হয় তো—যেন জানাই, তোর মার কোলের সেই কচিটার মরণবাঁচন অসুখ। বুঝলি? যায় যায় অবস্থা। বাড়ীতে দিন দশটা করে ডাক্তার আসছে।'

প্রতিহিংসা চরিতার্থের বিষাক্ত আনন্দে হাঁফাতে থাকেন হরসুন্দরী। আর সীতু? সে যেন হঠাৎ স্থানু হয়ে যায়। ভুলে যায় সে পুতুল নয়। কিছু না হোক নিশ্বাস ফেলাও তার একটা ডিউটি।

যখন চেতনা ফেরে, দেখে অনেক দূরে হরসুন্দরীর পিঠের চাদরটা শুধু দেখা যাচ্ছে।

সীতু কি ছুটে যাবে?

ছুটে গিয়ে চীৎকার করে বলবে, 'কী অসুখ হয়েছে সেই খুকুটার? বল শীগগির!'

না সীতু ছুটে যেতে পারে না।

বলতে পারে না।

শুধু তার সমস্ত প্রাণ আছাড়িপিছাড়ি খেতে থাকে সেই প্রশ্নটার ওপর।

'কী অসুখ হয়েছে সেই খুকুটার? বল শীগগির।'

তবু অতখানি যন্ত্রণার ভার নিজের মধ্যে সংহত রেখেছিল সে। বাড়ী এসে বলেছিল রাস্তায় পড়ে গেছি।

কিন্তু মাকে যা হোক বসে বোঝানো যত সহজ, নিজেকে বোঝানো কি তত সহজ? প্রত্যেকটি মুহূর্ত যে ছুঁচের মত ফুটিয়ে ফুটিয়ে একটা কথা উচ্চারণ করছে, 'সেটার মরণবাঁচন অসুখ!'

তুলোর পুতুলের মত গোলগাল থ্যাদা থ্যাদা সেই ছোট্ট মানুষটারও ওই রকম ভয়ানক বিচ্ছিরি অসুখ করতে পারে? হরসুন্দরী যাকে বলেন 'মরণ বাঁচন'।

আর যদি শেষের কথাটা আর না থাকে?

শুধু প্রথম কথাটাই—

শিউরে কেঁপে ওঠে সীতু, আর ভাবতে পারে না। সেই বিশেষ একটি রাস্তার উপরকার বিশেষ একখানি বাড়ী তীব্র একটা আকর্ষণে অহরহ টানতে থাকে চির-নির্মম চির-উদাসীন একটা বালক চিত্তকে। অথচ পথে বেরোতে তার ভয় করে পাছে দেখা হয়ে যায় কারো সঙ্গে। এ এক আশ্চর্য্য রহস্য!

সীতু কি স্বপ্নে এমন কোন মন্তর পেয়ে যেতে পারে না যাতে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যায়, আর উড়ে চলে যেতে পারা যায়—যেখানে ইচ্ছে?

রোজ রাত্রে ঘুমের আগে কাতর প্রার্থনা করে সীতু। যে ভগবানকে মানে না সেই ভগবানের কাছে। প্রার্থনা করে যেন সেই অলৌকিক স্বপ্ন দেখে, যাতে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী এসে মৃদু হেসে বলছেন, 'বর চাস? কী বর?'

হায়, প্রতিটি সকাল আসে ব্যর্থতা বহন করে। সীতুর জ্ঞানের জগতে যত কটূক্তি আছে, সমস্ত বর্ষণ করে সে অক্ষম ভগবানের উপর। অথচ আবার ঘুরে ফিরে সেই অলৌকিকের কথাই ভাবতে থাকে।

ধর, পথ চলতে চলতে পায়ের কাছে কুড়িয়ে পেল সীতু একটা শিকড়, সেটা কুড়িয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গেল সে, আর উড়তে আরম্ভ করল।

তারপর?

তারপর—

সেই একখানি ঘরের একটি বিশেষ জানলার বাইরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে এক অদৃশ্যদেহী বালক, বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে।

ঘরের মধ্যে 'দশটা ডাক্তার' ঘুরে বেড়ায়, ফিসফিসিয়ে কী যেন বলাবলি করে, বুকের মধ্যেটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে ওই ছেলেটার।

ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখে সেই পুতুলটা কোথায়?

ছোট্ট খাটের মধ্যে লেপ চাপা দিয়ে শুয়ে প্রবল জ্বরে ঘনঘন নিশ্বাস ফেলছে? না কি নিশ্বাস আর কোন দিন ফেলবে না সে?

হঠাৎ কেঁদে ওঠা ঘুমন্ত ছেলেকে 'ষাট ষাট' করে ভোলায় অতসী, বলে 'জল খাবি সীতু? গরম হচ্ছে সীতু? খারাপ স্বপ্ন দেখেছিস সীতু?'

সীতু আর সাড়া দেয় না।

শুধু মায়ের হাতটা আঁকড়ে ধরে।

অতসী স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। অস্বাভাবিক সীতুর মধ্যে কি তা'হলে তীব্র কোন মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হচ্ছে?

সকালবেলা মনিব গিন্নী প্রশ্ন করেন, 'রাত্তিরে ছেলে কেন কেঁদে উঠেছিল সীতুর মা?'

অতসী ম্লান ভাবে বলে 'স্বপ্ন দেখে মা!'

হ্যাঁ, আর মাসীমা নয়, মা।

শ্রদ্ধার ডাক, ভালবাসার ডাক, আবার প্রভুভৃত্যের চরম মামুলি ডাক। তবু 'মা' বলতেই হয়। মনিব গিন্নীর তাই বাসনা।

'মাসীমা' কেন গো? মা বলবে। আমার মেয়ে নেই।' বলেছিলেন তিনি।

মেয়ে নেই তাই তো 'মেয়ের মতন'।

তাই তো অতসীরও এ এক পরম বন্ধন।

'স্বপ্ন দেখে?' মনিবগিন্নী বলেন, 'পেট গরম হয়েছে। একটু মৌরী মিশ্রীর জল করে খাইয়ে দিও দিকি, ঠাণ্ডা হবে।'

সরল মানুষ এর চাইতে বেশী কিছু জানেন না, বোঝেনও না। সত্যিই ভারী সরল।

আজ সকালে কিন্তু তাঁর কথাতেও একটু অসারল্যের ছোঁয়াচ লাগলো। অতসীকে ডেকে বললেন, 'শুনেছ অতসী, আমার ব্যাটা, ব্যাটার বৌ যে দয়া করে গরীবের কুঁড়েয় পদার্পণ করতে আসছেন।'

অতসী ঈষৎ বিস্মিত হয়।

আনন্দের বদলে এমন সুর কেন?

তবে সে সহজ ভাবেই বলে, 'পূজোর ছুটি হয়েছে বুঝি?'

'হ্যাঁ, তাই লিখেছিলেন বাবু! পূজোর আগেই বেরোচ্ছি, দিন পনের ছুটি বাড়িয়ে নিয়েছি।' তা তোমায় মিথ্যে বলব না অতসী, বৌ আমার মন্দ নয়, মতি বুদ্ধি ভালই ছিল। কিন্তু কথায় আছে, সঙ্গদোষে শত গুণ নাশে। তোমার কাছে তো সব কথাই বলি—আমার ওই ছেলেটিই যেন বিলেতের সাহেব! যত ফ্যাসান, তত ফি কথায় নাক বাঁকানি! ওর সঙ্গে পড়ে বৌ ও—'

অতসী শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকায়।

কি জানি আবার কোন ঝড় ওঠে! কে জানে এই স্তিমিত নিস্তরঙ্গতার উপর সে ঝড় কোন তরঙ্গ তুলবে! যে ছেলে 'বিলেতের সাহেবটি', সে কি বরদাস্ত করবে রাঁধুনী আর রাঁধুনীর ছেলের উপর তার মায়ের এই স্নেহাতিশয্য?

আর সেই বৌ?

সঙ্গদোষে যার শত গুণ নাশ হয়েছে। বৌ জাতীয়াকে বড ভয় অতসীর। যদি সুরেশ্বরীর ছেলের বৌয়ের মত হয় ?

'কবে আসবেন ?'

'কবে কি গো, আজই।' মনিব গিন্নী স্বভাবছাড়া একটু ব্যঙ্গ হাসি হাসেন, 'ট্রাঙ্ককলের টেলিফোন জানো ? তাই করে খবর দিল যে এক্ষুনি। আমার ছেলের কোন কিছুতেই দিশিয়ানী নেই। দু'দিন আগে খবর দেবে না। পথে বেরিয়ে কোন ইষ্টিশন থেকে টেলিফোন করবে। বললে বলে, নিজের বাড়ীতে আসবো তার আবার খবর কি! কিন্তু শুনতেই ওই 'নিজের বাড়ী'। এক মাসের ছুটি তো কুড়ি দিন শ্বশুরবাড়ীতেই কাটাবে।

ছেলে বৌয়ের সম্পর্কে অনেকগুলি তথ্য পরিবেশন করে ফেলেন ভদ্রমহিলা।

অতসী আর কি করবে ?

সমস্ত রকম অবস্থার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত রাখা ছাড়া ? ওঁর বৌ ছেলে যদি রাঁধুনী আর রাঁধুনীর ছেলেকে নিজেদের পাশাপাশি সহ্য করতে না পারে, যদি নীচে নামিয়ে দেয়, তাও মেনে নিতে হবে বৈকি।

নীচের তলায় নামাটা তো কিছুই নয়, অন্য সব চাকরবাকরদের চোখে অনেক নেমে যাওয়া এই যা! তবু তাই যেতে হবে। সেইটাই তো প্রস্তুতির সাধনা।

শুধু সীতু ?

বিরাট একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন!

কিন্তু অতসীর আশঙ্কা অমূলক।

ওরা ও রকম নয়।

অতসী দোতলায় কেন আছে, বা একতলায় কেন থাকবে না, এ নিয়ে মাথা-ঘামাল না ওরা।

ট্রেন থেকে নেমেই স্নান সেরে বাপের বাড়ী যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে হতে বৌ বলল, 'মা, আপনার ঘরের পাশে ওই ছোট ঘরটায় কাকে যেন দেখলাম ? কেউ এসেছেন না কি ?'

'মা' বলে ওঠেন, 'ওটি আমার কুড়নো মেয়ে বৌমা! ঈশ্বর প্রেরিত। ঠাকুর দেশে চলে যাওয়ায় যখন অসুবিধেয় মরছি, তখন হঠাৎ একদিন—'

বৌ কথায় যবনিকাপাত করে বলে, 'ওঃ রান্নার লোক ? তা দেখতে তো বেশ পরিচ্ছন্ন, নেহাৎ 'লো' ক্লাশ বলে মনে হ'ল না।'

অতসী পাশের ঘর দিয়ে যাচ্ছিল।

দেয়ালটা ধরল।

শুনতে পেল না তারপর আর কি কথা হ'ল। সচেতন হ'ল তখন, যখন বৌ ব্যস্তভাবে এদিকে যেতে যেতে অতসীকে দেখে বলে উঠল, 'আচ্ছা ওই ছেলেটি তোমার তো ?'

অতসী মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

বৌ দালানে টাঙানো আর্শীটার সামনে তাকিয়ে বেশবাসে দ্রুত আর একটি 'সমাপ্তি স্পর্শ' দিতে দিতে বলল, 'ওকে আমার সঙ্গে আমার বাপের বাড়ীতে নিয়ে যাবো?'

'আপনার বাপের বাড়ীতে!' অতসী অবাক হয়। অতসী কারণ নির্ণয় করতে পারে না। অতসী দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলে, 'ছেলেটা বড্ড লাজুক, যেতে চাইবে কি?'

'চাইবে না?'

সভ্য তরুণী আর জোর করে না, বলে 'তবে থাক। গেলে একটু সুবিধে হতো। ওখান থেকে বেবিকে ধরার লোকটিকে আনতে পারি নি, বেচারার অসুখ করেছে। এই ঠিক তোমার ছেলের মতই ছেলে। তাই ভাবছিলাম ওকে পেলে হয়তো—যাকগে আমার বাপের বাড়ীতে তো লোকজনের অভাব নেই। তবে যেত, ভাল ভাল খেত, খেলত—'

হঠাৎ অতসী দৃঢ়স্বরে বলে, 'আচ্ছা দাঁড়ান, আমি বলছি।'

ঘরে গিয়ে তেমনি দৃঢ় স্বরেই বলে, 'সীতু, ওই যিনি এসেছেন, ওর সঙ্গে ওর বাপের বাড়ী যেতে হবে তোমায়।'

সীতু এ আদেশের মর্ম ঠিক ধরতে পারে না, থতমত খেয়ে বলে, 'কেন, আমি লোকেদের বাপের বাড়ী যেতে যাব কেন?'

অতসী আরও দৃঢ়স্বরে বলে, 'কেন যাবে শুনবে? ওর সঙ্গে ওর ওই বাচ্চাটিকে কোলে করে বেড়াতে।'

'ইস!' সীতু তীব্রকণ্ঠে বলে, 'টিকটিকির মত ওই মেয়েটাকে আমি কোলে নেব বৈকি। ছুঁতেই ঘেন্না করে।'

'চুপ। এসব কথা মুখে আনবে না। যাও ওই আলনা থেকে জামা পেড়ে পরে চলে যাও ওঁর সঙ্গে, সেখানে খেতে পাবে। খুব ভালো ভালো। বুঝলে। যাও ওঠ।'

মায়ের এই নিষ্ঠুরতায় কঠিন কঠোর সীতুর বুঝি চোখে জল এসে যায়। লাল লাল মুখে বলে, 'না যাব না। আমি কি চাকর?'

অতসী হঠাৎ ফেটে পড়ে।

চাপা গর্জ্জনে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ তাই। বুঝতে পার নি এতদিন? টের পাওনি চাকর হওয়াই তোমার বিধিলিপি। আমি হুকুম করছি চাকরই হওগে। যাও ওঁর সঙ্গে, 'সারাদিন ওঁর মেয়ে কোলে নিয়ে বেড়াওগে। ওরা যদি উঠোনের ধারে খেতে বসতে দেয় মাথা হেঁট করে তাই খাবে, একটি কথা বলবে না। যাও—যাও বলছি। অপেক্ষা করছেন উনি। কী, তবু বসে রইলে? পেড়ে আনো জামা—'

মাটিতে বসে পড়ে অতসী। হাঁফাতে থাকে।

আর সীতুর চোখের সামনে বুঝি সমস্ত পৃথিবী ঝাপ্সা হয়ে আসে। মার ওই বসে পড়া

চেহারাটার দিকে তাকাতে সাহস হয় না। উদভ্রান্তের মত আলনা থেকে শার্টটা পেড়ে গায়ে গলাতে গলাতে নীচে নেমে যায়।

গিয়ে দাঁড়ায় বাইরে গাড়ীর কাছে। যে গাড়ী বৌকে নিতে এসেছে তার পিতৃগৃহ থেকে।

বৌ বোধকরি হাতে চাঁদ পায়, হৃষ্টচিত্তে বলে, 'ও তুমি যাচ্ছ? এস, গাড়ীতে উঠে এস।'

সত্যিই গাড়ীতে উঠে বসে সীতু।

কিন্তু সে কি সত্যিই সীতু?

নাকি কোন যন্ত্রচালিত পুতুল?

বৌ ওর কোলে নাইলনের ফ্রক পরা সেই 'টিকটিকি' বিশেষণ প্রাপ্ত শিশুটিকে গুছিয়ে বসিয়ে দিয়ে বলে 'নাও বেশ ভাল করে ধরো। ফেলে দিও না যেন।'

না সীতু ফেলে দেবে না।

কিন্তু সেই 'কাঠির মুঠি' মেয়েটাই প্রবল আপত্তি তুলে সীতুকে তচনচ করে দেয়। অচেনা কোল বলে? না কি শিশু বোঝে অনাগ্রহের অনুত্তাপ?

'এই দেখ, তুমি যে সামলাতেই পারছ না? বৌ রেগে ওঠেনা, হেসে ওঠে। সহজ ভাবে বলে 'ভাল করে ধরতে পারছ না কিনা, তাই মহারাণীর মেজাজ গরম হয়ে উঠেছে। তোমার তো কোন ছোট ভাই বোন নেই, তাই অভ্যাস নেই। দাও আমায়, কী···রে··· তুষ্টু, বাহন পছন্দ হল না?'

মেয়েকে কোলে করে ভোলাতে ভোলাতে শান্ত করে বলে সে, 'চিনে যাবে। দু'দিনেই চিনে যাবে। দেখো তখন তোমাকে ছাড়তেই চাইবে না। তুমি যে আবার স্কুলে পড শুনলাম। তাছাড়া তোমর মার তুমি এক ছেলে, মা নিশ্চয় ছাড়তে রাজী হবে না। নইলে তোমায় আমার সঙ্গে আমার কাছে নিয়ে যেতাম। ঠিক এই রকম একটি কমবয়সী বাঙালীর ছেলেই খুঁজছি আমি।'

সীতু কি রূঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠল? তীব্র চীৎকারে প্রশ্ন করে উঠল, আমায় কী ভেবেছ তুমি? আমি চাকর?

না ওসব কিছু করল না সীতু।

ওসব কথা বোধকরি ওর কানেও ঢোকে নি। ও গাড়ীর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে আছে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে।

এ কী!

এ কোথায় আসছে সে?

এই শিবমন্দির কোন পাড়ার? ওই গম্বুজ দেওয়া লাল বাড়ীটা কোন রাস্তায়? নীল কাঁচের জানলা বসানো ওই ফোটো তোলার দোকানটা? আর ওই সিনেমা বাড়ীটা? গাড়ী দ্রুত পার হতে থাকে আর সীতুর সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করতে থাকে।

একবার দরদর' করে ঘাম ঝরেছিল, এখন একটা শুকনো দাহ।

বুঝতে পেরেছে সীতু, বুঝতে পেরেছে এবার।

এ সমস্তই ষড়যন্ত্র। ওই বৌটার বাপেরবাড়ী যাওয়াটাওয়া সব বাজে, সীতুকে ভুল বুঝিয়ে ফন্দী ফিকির করে সেইখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যেখানকার লোক রোজ 'এতবড় মোটর হাঁকিয়ে' হরসুন্দরী বাড়ীওলীর বাড়ী যায় সীতুকে খুঁজতে।

আগে থেকেই তা হলে তৈরি হয়ে আছে এই সব ব্যাপার। আর মা? সীতুর মা!

সন্দেহ নেই তিনিও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন।

আর সীতু এমন বোকা যে তাতেই ভুলে—

উঃ!

মা নিজে যেতে পারলেন না, বেচারী সীতুর ওপর দিয়েই—

ওঃ ওঃ এই তো এসে গেছে···পার্কের রেলিঙ্ দেখা যাচ্ছে। পার্কটা পার হলেই—

সীতু জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে তীব্র প্রশ্ন করে 'এটা কোন রাস্তা? আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

এ প্রশ্নে গাড়ীর চালক পর্যন্ত ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। বৌ অবাক হয়ে বলে, 'কেন আমার বাপের বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি। সব্যসাচী রোডে যাবো। কেন তোমার মা বলেনি?'

কিন্তু ততক্ষণে স্তিমিত হয়ে গেছে সীতু, ততক্ষণে সন্দেহ সরে গেছে তার।

গাড়ীটা পার হয়ে গেছে ভয়ঙ্কর একটা ভয়ের জায়গা।

আতঙ্কটা ঘুচল।

কিন্তু আশা? যে আশা শিশুমনের অজ্ঞাত অবচেতনে জন্ম নিচ্ছিল পরিচিত পথের ছলনায়?

'এ রাস্তা তুমি চেন?'

সীতু মাথা নেড়ে বলে 'না'

গাড়ী নির্দিষ্ট জায়গায় থামে। বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতেই অনেক ছোট বড় মাঝারি বয়সের মেয়ে-পুরুষ এসে কলকণ্ঠে সম্ভাষণ জানায়, একটি মধ্যবয়সী মহিলা সীতুর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে বলেই ফেলেন, 'এটি কে রে ছন্দা?'

এতক্ষণে সীতু জানতে পারে বৌটার নাম ছন্দা।

ছন্দা ওর দিকে একটি স্নেহদৃষ্টি ফেলে বলে, 'এ? এ হচ্ছে আমার শ্বশুরবাড়ীর নতুন বামুন দিদির ছেলে! বেবির চাকরটাকে নিয়ে আসিনি বলে ভাবলাম ওকেই বরং—'

গরম সীসে কানে ঢেলে দিলে কি কানে এর চাইতে দাহ হয়?

মধ্যবয়সী মহিলাটিও সস্মিত কণ্ঠে বলেন 'খাসা ছেলেটি! তোর শাশুড়ী জোটায়ও বেশ। বুড়োবুড়ি একা থাকে, এ বেশ নাতির মত—'

ছন্দা হেসে ওঠে, 'ও মা, সে আর বোলোনা! আমার শাশুড়ীর তো এমন ব্যবস্থা, নাতি কোথায় লাগে! দোতলার ঘর, খাট বিছানা, মশারি, টেবলফ্যান, পড়বার টেবিল চেয়ার—'

কথা শেষ হয় না, সমবেত হাস্যরোলে চাপা পড়ে যায়।

বামুনদি আর বামুনদির ছেলের জন্য এ হেন অভিনব ব্যবস্থা রীতিমত হাস্যকর বৈ কি। বামুনদির মনিব গিন্নীর পাগলামীর পরাকাষ্ঠা!

সীতু কি সকলের অলক্ষ্যে কোন এক সময় এই কুৎসিত কদর্য্য বাড়ীটা থেকে বেরিয়ে যাবে?

কিন্তু এরা কি খারাপ?

এরা কি হৃদয়হীন? তা তো নয়।

ছন্দার মার এবার মেয়ের দিক থেকে নাতনীর দিকে মন যায়, হাত বাড়িয়ে কোলে নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নাতনী তারস্বরে আপত্তি জানায়। অনেক ভুলিয়ে কোলে নিয়েই ভদ্রমহিলা যেন শিউরে ওঠেন, 'ও মা! মেয়ের সমস্ত শরীরটুকুই যে হাড়! কী মেয়ে, কী করে ফেলেছিস ছন্দা?'

ছন্দা মলিন ভাবে বলে, 'কত বড় অসুখে ভুগল তা বল? লিখেছিলাম তো সবই। একেবারে—যায় যায় অবস্থা হয়েছিল।'

যায় যায় অবস্থা!

যায় যায় অবস্থা!

সীতুর প্রত্যেকটি লোমকূপের মধ্যে থেকে কি ওই নতুন শেখা শব্দটা উঠছে?

যায় যায় অবস্থা!

ছন্দা তখনো বলে চলে, 'একদিন তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। পাড়ার সবাই আমায় বলতে লাগল, বেঁচে উঠেছে নেহাৎ তোমার কপাল জোরে।'

দিদিমা নাতনীর গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'বোশেখ মাসে স্বপ্না তোর ওখান থেকে বেড়িয়ে এসে তো আহ্লাদে কুটিকুটি, বলে, 'মা, দিদির মেয়েটা হয়েছে যেন মাখনের পুতুল! আর তেমনি হাসিখুসি—'

'হাসি-খুসি' ততক্ষণে সানাই বাঁশী বাজাতে সুরু করেছে।

দিদিমা বিরক্তচিত্তে বলেন, 'বাবা, আমার কাছে জন্মাল, মানুষ হল, এখন আমাকে একেবারে ভুল?'

ছন্দা মেয়ে কোলে নিয়ে অপ্রতিভ ভাবে বলে, 'অসুখ করে পর্যন্ত ওই রকম মেজাজী হয়ে উঠেছে। এই তো ছেলেটাকে আনলাম, তা গেলে তো ওর কাছে! কি যেন তোমার নাম খোকা? সীতু না কি? সীতানাথ না সীতারাম?'

বলাবাহুল্য উত্তর পাওয়া তার ভাগ্যে ঘটে না।

ছন্দার মা বলেন, 'বড্ড দেখছি মুখচোরা। যাও খোকা, ওদিকে বাইরের বারান্দায় বোসোগে।'

বাইরের বারান্দা!

মুক্তির আহ্বান বহে আনছে কথাটা।

ছন্দার অনেকখানি সময় কেটে যায় অনেক কথায়, অনেক হুল্লোড়ে। স্বপ্না এসেছে, এসেছে স্বপ্নার বর। খুসির স্রোত বইছে।

হঠাৎ এই স্বচ্ছন্দ স্রোতে টিল পড়ে। ছন্দার মা এসে উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করেন, 'তোর সঙ্গে যে ছেলেটি এসেছিল, কোথায় গেল বল দিকি? দেখতে পাচ্ছিনা তো। গণেশকে দিয়ে খেতে ডাকতে পাঠালাম, বলছে বাইরে দাওয়ায় নেই। রাস্তায়ও নেই—'

কিন্তু সত্যিই কি সীতু রাস্তায়ও নেই?

আছে। রাস্তাতেই আছে সীতু।

নেশাচ্ছন্নের মত পথ চলেছে।

তার চোখের সামনে শুধু বারেবারে ছায়া ফেলে ফেলে যাচ্ছে একটা তুলোর পুতুলের ধ্বংসাবশেষ! 'যায় যায়' অবস্থা হয়ে যে নাকি টিকটিকির মত হয়ে গেছে!

মূর্তিটা ঠিক গড়তে পারছে না সীতু, কি রকম যেন হারিয়ে যাচ্ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে। তার পিছনে একটা ভীষণদর্শন দাঁতাল জন্তু উঁকি মেরে মেরে বলছে, 'ওরকম হলে বেঁচে যায় শুধু মায়ের কপাল জোরে বুঝলি?'

কিন্তু যার মা নেই? অবহেলায় ফেলে চলে গেছে?

সীতু কি জমাদারের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠবে?

কিন্তু তারপর?

অদৃশ্য হয়ে যাবার শিকড় কই তার? কই আর কুড়িয়ে পেল সে বস্তু? তবে?

সীতু কি নীচু হবে? ছোট হবে? বলবে 'একবার শুধু খুকুকে—'

ওরা যদি সকলে মিলে হেসে ওঠে?

বামুনদি, নেপ্‌ বাহাদুর, বাসন মাজা সেই ঝিটা?

সীতু কি তাহলে সোজা মাথা তুলে সেই মানুষটার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? স্পষ্ট গলায় বলবে, 'তুমি আমাদের খুঁজতে গিয়েছিলে কেন?' বলবে, 'খুকুর কি এখনো যায় যায় অবস্থা?'

কিন্তু সেই মানুষটা যদি ভয়ঙ্কর লাল লাল চোখে তাকায়? যদি ভারী ভারী গলায় বলে, 'খুকু নেই।'

টেলিফোন ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠে শিবনাথ গাঙ্গুলীর বাড়ী।

গিন্নি যথারীতি বলে ওঠেন, 'অ অতসী, দেখতো মা কে ডাকে—'

কিন্তু ততক্ষণে গিন্নীর পুত্ররত্ন কর্মভার হাতে তুলে নিয়েছেন।. আর পরক্ষণ থেকেই তাঁর কণ্ঠযন্ত্র লহরে লহরে ঝঙ্কার তুলতে সুরু করেছে।

'অ্যাঁ! বল কি? কতক্ষণ?···আঃ কী মুস্কিল, তোমারও যেমন কাণ্ড! চেনো না জানো না, কী নেচারের ছেলে না খোঁজ করেই—'

ছেলে!

অতসী দরজার বাইরে আটকে যায়। তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি বুঝি শ্রবণেন্দ্রিয়ে এসে ভীড় করে। কে কোথা থেকে খবর দিচ্ছে! কার ছেলের কথা বলছে? কী হয়েছে তার?

এদিকে তারযন্ত্র আর কণ্ঠযন্ত্র পাল্লা চালিয়ে যাচ্ছে···'আচ্ছা আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। যাচ্ছিলামই—কি বলছ? বিপদ? তা ইচ্ছে করে বিপদকে ডেকে আনলে সে আসবে বৈ কি!···কী বললে? গাড়ী চাপা? না না অতদূর ভাববার দরকার নেই। তোমার কল্পনা শক্তি দূরপ্রসারি বটে। আমার মনে হচ্ছে এখানে পালিয়ে এসেছে।'

এখানে!

তাহলে আর সন্দেহের অবকাশ নেই অতসীর, কোন ছেলের কথা হচ্ছে।

'কী হল? বাসে ট্রামে চড়তে জানে না? হুঁঃ! কলকাতার এই সব বামুন চাকর ক্লাসের ছেলেদের তো চেনো না? ওরা সাত বছর বয়স থেকে পাকা হয়ে ওঠে। আমি বলছি অত উতলা হবার কিছু নেই। ঠিক শুনবে দিব্যি বিকশিত দন্তে বিড়ি খেতে খেতে এখানে এসে হাজির হয়েছেন···যাক আমি যাচ্ছি। তোমার যখন দায়িত্ব।'

অতসী কি ছুটে গিয়ে রিসিভারটা কেড়ে নেবে ওই হৃদয়হীন লোকটার হাত থেকে? না কি দুড়দুড়িয়ে নেমে গিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাবে রাস্তায়?

কিন্তু তারপর?

মনিব গিন্নীর বেহাই বাড়ী কোন রাস্তায় সে কথা কি জেনে নিয়েছে অতসী? ভাগ্যের নিষ্ঠুরতায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে চরম নিষ্ঠুরতার আঘাত হেনেছে সে সেই অবোধ অভিমানী বালক-চিত্তের উপর। আর কিছু করেনি। এখন অতসী 'ছেলে ছেলে' বলে উদ্‌ভ্রান্ত হলে ভগবান ভ্রূকুটি করবেন না?

'ফোন কে করছে রে খোকা?' অতসীর মনিবানী এগিয়ে আসেন, 'বৌমা বুঝি?'

'হ্যাঁ! যত সব ঝামেলা!' খোকা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'তোমাদের যেমন কাণ্ড! বুদ্ধি-সুদ্ধি যদি কোন কালে হবে। খামোকা তোমার রাঁধুনীর না কার ছেলেকে ওদের ওখানে পাঠাবার কি ছিল? সে ছেলে নাকি ওখান থেকে হাওয়া।'

'ও মা! সে কী!' চোখ কপালে তোলেন ভদ্রমহিলা, 'ওখানে অচেনা পাড়ায় একা একা সে আবার কোথায় যাবে?'

'কোথায় যাবে তোমরাই জানো। এখন ছুটতে হবে আমাকেও। ভেবেছিলাম সন্ধ্যের দিকে যাবো। এখন তোমার বৌমা অস্থির হচ্ছে। বলছে, 'পরের ছেলে নিজের দায়িত্বে নিয়ে এসেছি।'

শিবনাথ-গিন্নী কাতর বচনে বলেন, 'এত সব আমি কি করে জানবো বাছা? বৌমা বলল নিয়ে যাই, আমি বললাম যেতে চায় তো নিয়ে যাও। মুখচোরা ছেলে। তা' অনিচ্ছেয় জোর করে নিয়ে গেছে নাকি—হ্যাঁ অতসী, তোমার ছেলে···কই গো, তুমিই বা কোথায় গেলে? অতসী···অ সীতুর মা। ও মা এই তো এখানে ছিল, সে আবার কোথায় গেল!··· এ সব কী ভুতুড়ে কাণ্ড গো! অ খোকা, দেখ দেখ ছেলে হারানো শুনে সে আবার রাস্তায় বেরিয়ে গেল কি না! ছেলে অন্ত প্রাণ! কিন্তু একা মেয়েমানুষ বেরিয়ে কি করবে? অ খোকা—ও মা আমি কেন মরতে তার ছেলেকে যেতে দিতে রাজী হলাম।'

মৃগাঙ্ক চুপচাপ বসে ভাবছিলেন, টেবিলে কনুই রেখে, চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে। একটু আগে রোগী দেখে ফেরার সময় একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে গেছে। অথচ এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না ঘটনাটা সত্যি কি না।

আসলে কিন্তু কোনও ঘটনা কি? না, ঘটনা বলতে কিছুই নয়, শুধু একটা চকিত ছায়া, একটা অবিশ্বাস্য বিস্ময়।

তখন থেকে বার বার ভাবছেন মৃগাঙ্ক, তিনি কি ঠিক দেখেছেন? না কি তাঁর একাগ্র বাসনা ছায়ামূর্ত্তি ধরে তাঁকে ছলনা করছে? কিন্তু ছলনাটা বড় অবিকল।

গাড়ীতে আসতে আসতে হঠাৎ দেখতে পেলেন পাশ দিয়ে একটা গাড়ী সাঁ করে বেরিয়ে গেল, তার মধ্যে সীতু।

সীতু এতবড় একখানা গাড়ীর আরোহী হয়ে বসেছে এটাও যেমন অবিশ্বাস্য, মৃগাঙ্ক সীতুকে চিনতে পারবেন না সেটাও তেমনি অসম্ভব।

কিন্তু সে গাড়ীতে আর কে ছিল?

দেখতে পাননি মৃগাঙ্ক, আদৌ দেখতে পাননি, দেখবার চেষ্টা করবার অবকাশও পাননি, শুধু যা দেখেছিলেন তাতেই দিশেহারা হয়ে গিয়ে মুহূর্ত্তের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, আর সেই বিস্মৃতির মুহূর্ত্তে হঠাৎ গাড়ীটাকে আড়াল করে ফেলেছিল প্রকাণ্ড একটা লরী। আর ট্রাম চলছিল এপাশ দিয়ে।

লরীর শত্রুতাপাশ থেকে উদ্ধার হয়ে যখন কোন রকমে নিজের গাড়ীখানা উদ্ধার করলেন মৃগাঙ্ক, তখন সেই 'মায়ামৃগ' মিলিয়ে গেছে ধূসর শূন্যতায়।

গাড়ীর নম্বরটাও দেখে নেবার সুবিধে হয় নি। এখন মাথায় হাত দিয়ে ভাবছেন মৃগাঙ্ক—যা দেখেছেন তা কি সত্যি? সত্যি হওয়া সম্ভব?

না প্রখর সূর্য্যালোকের মাঝখানে দিবাস্বপ্ন ?

শিবপুরের হরসুন্দরী দেবীর বাড়ী আর যাওয়া হয়নি। অনবরত যেতে যেতে ভয়ানক একটা কুণ্ঠা আসছিল। আর শেষদিন তো ভদ্রমহিলা প্রায় ক্ষেপেই উঠেছিলেন। বলেছিলেন, 'মিথ্যে আপনি খোঁজাখুঁজি করছেন। যে মেয়েমানুষ কোলের কচি বাচ্চা ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে, সে আবার ঘরে ফেরে নাকি ? আপনার যে এখনো তার ওপর রুচি আছে, এই আশ্চর্য্যি। জানি না আপনার কে হয়, তবে মুখের ওপরই বলছি—তাদের নিয়ে ঘর করা সম্ভব নয়। নইলে আমি কি কম ইয়ে করেছিলাম বাবা—'

ভয়ানক একটা লজ্জা হয়েছিল সেদিন মৃগাঙ্কর।

আর ভেবেছিলেন সত্যিই তো ইচ্ছে করে যে হারিয়ে থাকতে চায়, তাকে খুঁজে বার করা কি সহজ ? আর খুঁজে বার করে লাভই আছে না কি কিছু ?

কিন্তু এতটা করবার কি সত্যিই দরকার ছিল অতসীর ? এই নিষ্ঠুরতা কি সম্পূর্ণ অর্থহীন নয় ? ছেলে নিয়ে আলাদাই যদি থাকতো, মৃগাঙ্কর ব্যবস্থা না নিতো, তাই হোতো। কিন্তু একটু ঠিকানা, একটু সন্ধান, বেঁচে আছে কি মরে গেছে তার একটু খবর, এটা জানাতে দোষ কি ছিল ?

খবরের আশায় শ্যামলীদের বাড়ী গিয়েও আর বিব্রত করতে ইচ্ছে হয় না, ইচ্ছে হয় না খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে। তবু নিজের নাম না দিয়ে একটা আবেদন করেছিলেন কয়েকটা সপ্তাহের কাগজে, 'অতসী, অন্ততঃ খবর দাও কোথায় আছো।' সাড়া এল না তার। অতসী যে খবরের কাগজের জগৎ থেকে অনেক দূরের গৃহে বাস করছে, সেটা ভাবেননি মৃগাঙ্ক। ভেবেছেন ইচ্ছাকৃত।

ক্রমশঃই শিথিল হয়ে যাচ্ছিলেন মৃগাঙ্ক, কঠিন করে তুলতে চেষ্টা করছিলেন মনকে, কিন্তু আজ আবার এ কী আলোড়ন !

মৃগাঙ্ক কি আবার শিবপুরে যাবেন ?

আবার নির্লজ্জের মত বলবেন, কোন ছলে কোন প্রয়োজনে তারা কি আবার এসেছিল ?

যদি সেই প্রৌঢ়া মহিলা ধিক্কারে ছিঃ ছিঃ করে ওঠেন। সইতেই হবে সেই ধিক্কার।

তবু জানতে চেষ্টা করতে হবে মৃগাঙ্ককে, সীতু কার সঙ্গে গাড়ী চড়ে চলে গেল, অতসী কোথায় রইল।

তখন সামনে আড়াল করে দাঁড়ান সেই লরিটাকে যদি মৃগাঙ্ক ইচ্ছা শক্তির সাহায্যে বিলুপ্ত করে দিতে পারতেন !

চলমান সেই গাড়ীখানার নম্বরটা টুকে নিতে পারলে মৃগাঙ্ক কি এখন এমন করে বসে থাকতেন যন্ত্রণায় থাক হয়ে ?

কিন্তু সত্যিই কি সীতু?

অস্নাত অভুক্ত মৃগাঙ্ক আবার গাড়ী বার করবার আদেশ দিলেন।

দিনের আলোয় সম্ভব নয়।

মনে হয় সমস্ত পৃথিবী ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। পার্কের কোণের দিকে গাছের আড়ালে ঢাকা একটা বেঞ্চে বসে থাকে সীতু সন্ধ্যার অন্ধকারের অপেক্ষায়। দুঃসহ হচ্ছে প্রতীক্ষার প্রহর, অথচ দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে ইচ্ছে।

সীতু এখন ভেবে পাচ্ছে না ছোট্ট সেই পুতুলটা, যে সীতুকে দেখলেই 'দাদ্‌দা দাদ্‌দা' বলে ছুটে আসতো, তাকে এতদিন একবারও না দেখে কি করে ছিল সীতু!

খুকুটা যদি পার্কে আসে!

সেই লাল সিল্কের নীচে থেকে নেমে আসা মোট্টা মোট্টা গোল গোল পা দু'খানা নিয়ে থপ্‌থপিয়ে হেঁটে ছুটে আসে সীতুর দিকে। সেই নরম ফুলের বস্তাটাকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নেবার দুরন্ত আকুলতাটাকে সীতুকে ভুলিয়ে দেয়, তার নাকি 'মরণ বাঁচন' অসুখ হয়েছিল, যায় যায় অবস্থা হয়েছিল।

আস্তে আস্তে দুপুরের রোদ ঢলে পড়ে। প্রায় ঢলে পড়ে সীতুও।

পেটের মধ্যে খিদেয় পাক দিচ্ছে। সামনে দিয়ে হেঁকে যাচ্ছে অবাক জলপান, ঘুগনিদানা' ঝালমুড়ি, আইসক্রীম।

ওদিকে সীতুর তাকাতে নেই।

কিন্তু যখন তাকাতে ছিল?

তখন কি তাকাতো সীতু?

না, সীতু শুধু মুখ বিষ করে বসে থাকতো বেঞ্চে। নেহাৎ চাকরদের সঙ্গে ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত তাকে পার্কে, তাই আসতো।

আজ পার্কের বেঞ্চে বসে থাকতে থাকতে সীতুর হঠাৎ মনে হয়, আচ্ছা সীতু সব সময় অমন বিশ্রী হয়ে থাকতো কেন? থাকে কেন?

জগতে এত ছেলে, আহ্লাদের সাগরে ভাসছে যেন—সীতু কেন পারে না সে সাগরে ভাসতে!

পারেনা মৃগাঙ্ক ডাক্তারের উপর আক্রোশে আর বিতৃষ্ণায়? কিন্তু মৃগাঙ্ক ডাক্তার কি সত্যিই অত খারাপ? যদি অত খারাপ, তাহলে কেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন সীতুকে আর সীতুর মাকে?

সীতুরা তো তাঁকে অপমানের চূড়ান্ত করেছে।

নিজের বাবা না হলে কি হয়? কি হয় তাকে 'বাবা' বলে ডাকলে!

অনেকক্ষণ ধরে ভাবল সীতু।

যে বাড়ীতে তারা থাকতো, সে বাড়ীর কর্তা বুড়োটা তো তার নিজের দাদু নয়। তবু তো সীতু তাদের বাড়ী থাকে, তাকে 'দাদু' বলে। অতসী বলে 'বাবা।' বুড়িটাকে বলে 'মা।'

কিন্তু কই তাতে তো রাগ হয় না সীতুর, অপমান বোধ করে না অতসী।

তবে কেন সীতু মৃগাঙ্কর বেলাতেই—?

সীতুই খারাপ, সীতুই যত নষ্টের মূল। সীতুর জন্যেই সীতুর মাকে রাজরাণী থেকে ঘুঁটে কুড়ুনি হতে হয়েছে! হরসুন্দরীর বাড়ীর মতন বিচ্ছিরি বাড়ীতে থাকতে হয়েছে, লোকেদের বাড়ীতে ঝি হতে হয়েছে।

এ বাড়ীটায় বিচ্ছিরি ঘর নয়, কিন্তু ভাল ঘরে রেখেও কী বলে ওরা সীতুর মাকে? রাঁধুনী! রাঁধুনী! বামুনদির মত ভাবে সীতুর মাকে।

নিজের মাকে ঝি করেছে সীতু, রাঁধুনী করেছে। মৃগাঙ্ক খুব খারাপ লোক নয় তবু তাঁকে কষ্ট দিয়েছে, অপমান করেছে।

আর খুকুকে?

খুকুকে সীতু?

খুকুকে সীতু মেরে ফেলেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ মেরেই ফেলেছে। খুকুর মাকে কেড়ে নিয়েছে সীতু, কেড়ে নিয়েছে মায়ের 'কপাল জোর।'

তবে মেরে ফেলা ছাড়া আর কি?

শার্টের ঝুলটা তুলে মুখে চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠাটা রোধ করে সীতু। তারপর, অনেকক্ষণের পর আস্তে আস্তে বেঞ্চ থেকে নামে।

খুকু পার্কে আসবে এ আশা আর নেই সীতুর। খুকু যেন একটা বিভীষিকার ছায়া নিয়ে ঝাপ্সা হয়ে আছে।

তবু—

তবু সীতু—

সন্ধ্যার অন্ধকারে জমাদারের সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেই সরু বারান্দাটা পার হয়ে জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে একবার দেখে নেবে খুকুর খাটটায় কেউ শুয়ে আছে কি না। টিকটিকির মত রোগা কাঠির মত রোগা যাহোক।

আর যদি সেখানে কিছু না থাকে?

যদি দেখে খাটটা খালি, খাটের পায়ের কাছের সেই ছোট্ট নীচু আনলাটা খালি! আনলার তলায় সাজানো নেই লাল নীল সবুজ ছোট্ট ছোট্ট জুতো, আর খাটের ধারে ঝোলানো নেই রঙিন রঙিন তোয়ালে!

কী করবে সীতু?

কী করবে তখন? কী করবে তা জানে না। আর বেশী ভাবতে পারছে না। শুধু জানে সীতুকে যেতেই হবে।

খুকুর সম্পর্কে ভয়ঙ্কর একটা দাঁতখিচোনো অন্ধকারের ভয় নিয়ে টিঁকতে পারবে না সীতু।

হরসুন্দরী কপালে করাঘাত করে বলেন, 'আগে কি করে জানবো বলুন এখনও এই চত্বরে আছে তারা! পাড়ার ইস্কুলেই পড়ছে। ইস্কুলের কথা আমার মাথায় আসেনি। সেদিন যেদিন শেষ এসেছিলেন, আপনিও গেলেন, আমিও ঘুরে দেখি সামনে মূর্তিমান। তা' দাঁড়ায় একদণ্ড? আপনার কথা বলতে গেলাম। কানেই নিলনা! ঠিকরে চলে—'

'স্কুলটা দেখিয়ে দিতে পারেন?'

'ইস্কুল তো ওই---ও রাস্তার মোড়ে। 'জগদীশ স্মৃতি বয়েজ ইস্কুল।' কিন্তু এখন তো ইস্কুল বন্ধ, পুজোর ছুটি পড়ে গেছে।'

পুজোর ছুটি পড়ে গেছে।

দারোয়ান সুদ্ধু দেশে চলে গেছে।

মাষ্টারদের ঠিকানা?

সে আবার আশপাশের কে জেনে মুখস্থ করে রেখেছে?

শূন্যগাড়ী নিয়ে ফিরে আসেন মৃগাঙ্ক। ফিরে আসেন শিবনাথ গাঙ্গুলীর বাড়ীর সামনে দিয়ে। যখন টেলিফোনে ওরা সীতুর অন্তর্ধান বার্ত্তা বলাবলি করছে। যার একমিনিট পরে গাঙ্গুলী গিন্নী অতসীকে খুঁজে পাননি।

কিন্তু মৃগাঙ্ক কি ক্রমশঃ পাগল হয়ে যাচ্ছেন?

জলাতঙ্ক রোগী যেমন জলের দিকে তাকালেই লক্ষ লক্ষ কুকুরের ছায়া দেখতে পায় মৃগাঙ্ক কি তেমনি, সর্ব্বত্র তাঁর পরম শত্রুর ছায়া দেখতে পাচ্ছেন?

নইলে এই ঘণ্টাকয়েক আগে কতটা দূরে যে মূর্ত্তি একখানা চলন্ত গাড়ীতে দেখেছিলেন সেই মূর্ত্তিতে কেন বসে থাকতে দেখবেন পার্কের মধ্যেকার একটা বেঞ্চে?

এও চকিত ছায়া?

দূর রাস্তা থেকে চলন্ত গাড়ীতে বসে দেখা!

গাড়ী পিছিয়ে আনলেন মৃগাঙ্ক, নামতে উদ্যত হলেন, তারপর সহসাই সামলে নিলেন নিজেকে। ভ্রান্ত দৃষ্টির বিভ্রান্তিতে ভুলবেন না আর মৃগাঙ্ক।

মৃগাঙ্ক বুদ্ধিমান।

কিন্তু আশ্চর্য্য, সর্বত্র অতসীর ছায়া দেখছেন না মৃগাঙ্ক, দেখছেন কিনা সীতুর!

এই জন্যই কি মহাপুরুষরা বলেন 'ঈশ্বরকে শত্রু রূপে ভজনা কর।'

কিন্তু সেই হতভগ্য বুদ্ধিভ্রংশ ছেলেটাকে কি আর এখন নিজের প্রতিপক্ষ বলে মনে হয় মৃগাঙ্কর। মনে হয় শত্রু বলে?

হরসুন্দরী বাড়ীওয়ালার ঘর দেখবার পরেও?

সেই বাড়ীরও ভাড়া জোগাতে পারেনি বলে চলে গেছে অতসী। কোথায় তবে গেছে? আরও কত সঙ্কীর্ণ গলিতে? আরও কত জঘন্য ঘরে?

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে অনেক পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ী ফিরে এলেন মৃগাঙ্ক।

আস্তে আস্তে উঠে গেলেন ওপরে। ভুলে গেলেন আজ অভুক্ত আছেন।

ঘরটা এখনও অন্ধকার।

অন্ধকারেই একবার শুয়ে পড়লে হয়। শুধু তার আগে একবার স্নানের দরকার।

বাইরের পোষাক ছেড়ে বাথরুমের দিকে এগিয়েই জমাদারের সিঁড়ির দিকে চোখ পড়ল। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সহসা একটা বিকৃত আর্ত্তনাদ করে পড়ে গেলেন মৃগাঙ্ক, ঘর থেকে বাথরুমে যাবার প্যাসেজটায়।

মৃগাঙ্ক এবার বুঝতে পেরেছেন পাগল হয়ে যাচ্ছেন তিনি। সেই বুঝতে পারার মুহূর্ত্তে এই আর্ত্তনাদ।

তারপর চলে গেল সেই বোধশক্তিটুকুও।

পড়ে গেলেন। মুখ গুঁজে পড়ে রইলেন সরু প্যাসেজটায়।

সারাদিন শ্যামলী কাছে রাখে মেয়েটাকে।

মেয়েটারও অসুখ থেকে উঠে পর্যন্ত শ্যামলীর ওপর ভয়ঙ্কর একটা ঝোঁক হয়েছে। তার কাছে ছাড়া নাইবে না, খাবে না, ঘুমোবে না।

শ্যামলীরও এ এক পরম আনন্দ। সারাদিনের পর সন্ধ্যাবেলায় এ বাড়ীতে নিয়ে আসে তাকে, তা'ও বেশীরভাগ দিনই ঘুম পাড়িয়ে রেখে তবে ফিরতে পায়।

আঁচল ধরে আগলায় খুকু। বলে, শ্যাম্মী যাবেনা। শ্যাম্মী থাকবে। খুকুকে গপ্পো বলবে।' নিজের ছেলেটার অযত্ন হয় তবু শ্যামলী পারেনা তাকে বিমুখ করতে।

আজও যথারীতি সন্ধ্যার পর খুকুকে নিয়ে পথে পা দিয়েছে শ্যামলী, আর যেন ভূত দেখে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

'কে? কে দাঁড়িয়ে? সীতু না? তুই এখানে? একা যে? মা কই?'

সীতু কাঁপছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। তা'র বুকের ওঠাপড়া বুঝি দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে।

'মা কই, বল লক্ষীছাড়া ছেলে? বল! মরে গেছে বুঝি? মাকে মেরে ফেলে—'

চেঁচিয়ে ওঠে শ্যামলী।

আর সীতু শার্টের ঝুলটা তুলে মুখে চেপে কেঁদে ওঠে 'মা আছে, বাবা মরে গেছে।'

'কে মরে গেছে?' চেঁচিয়ে ওঠে শ্যামলী।

'বাবা!' ক্লান্ত ভাঙা গলায় বলে সীতু। খুকু যে টিকটিকির মতন হয়ে গিয়েছে, কাঠের মতন হয়ে গিয়েছে এ বুঝি আর দেখতে পাচ্ছেনা সীতু।

তার সমস্ত চৈতন্যই আচ্ছন্ন করে রয়েছে একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

একদা অহরহ যে লোকটার মৃত্যু কামনা করেছে সীতু, তার মৃত্যু যে সীতুর কাছে এমন ভয়ানক যন্ত্রণাকর হতে পারে, এ সীতুর বোধের বাইরে, ধারণার বাইরে।

সীতুর সমস্ত শরীরটাকে চিরে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেললে যদি সেই মুখ গুজড়ে পড়ে থাকা মানুষটা উঠে বসে তো এক্ষুনি সীতু নিজেকে চিরে ফেঁড়ে শেষ করে ফলতে পারে।

এ বাড়ীতে তখন ভয়ঙ্কর একটা ছুটোছুটি চলছে। সারাদিনের অভুক্ত সাহেবকে এখন 'খানা' দেওয়া হবে কি না জিজ্ঞেস করতে এসে নেপ্‌বাহাদুর এমন একটা আর্ত্তনাদ করে উঠেছে যে, বাড়ীতে যতগুলো লোক ছিল সবাই ছুটে এসেছে মৃগাঙ্কর শোবার ঘরে।

কিন্তু 'লোক' মানে তো চাকর বাকর?

আর কে লোক আছে মৃগাঙ্কর বাড়ীতে? হয়তো বাড়ীর কাজের ব্যাপারে ওরা বুদ্ধিমান—নেপ্‌বাহাদুর, মাধব, বামুনদি, কানাই, সুখদা। কিন্তু এমন একটা আকস্মিক বিপদপাতে তারা বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে গেছে। সকলে মিলে জটলাই করছে, খেয়াল করছে না একজন ডাক্তার ডাকা প্রয়োজন।

বামুনদি আর সুখদা তারস্বরে মুখে চোখে জল দেবার নির্দ্দেশ দিচ্ছে আর ওরা এঘর ওঘর ছুটোছুটি করছে।

নাটকের এই জটিল দৃশ্যের মাঝখানে সহসা এসে দাঁড়াল শ্যামলী, যথারীতি খুকুকে নিয়ে। কিন্তু তার পিছনে ও কে?

ওই ছেলেটা!

আধ ময়লা নীল ডোরাকাটা সার্ট আর বিবর্ণ খাকি প্যাণ্ট পরা!

এতগুলো লোকের এত জোড়া চোখ যেন পাথর হয়ে গেছে। সাহেবের জ্ঞানশূন্যতার মত ভয়ঙ্কর বিপদটাও ভুলে গেছে ওরা। হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওই ছেলেটার দিকে।

কিন্তু ছেলেটা তো শুধু শ্যামলীর পিছন পিছন নীরবে এসে দাঁড়ায়নি, বসে পড়েছে ঘরের মেজেয়। মৃগাঙ্কর অচৈতন্য দীর্ঘ দেহখানাকে কোনরকমে টেনে এনে মাথার তলায় একটা বালিশ গুঁজে শুইয়ে রেখেছে ওরা।

খুকুকে সুখদার কোলে ছেড়ে দিয়ে শ্যামলীও বসে পড়ে রুদ্ধশ্বাসে বলে 'কী হয়েছে?'

সবগুলো লোক একসঙ্গে 'কী হয়েছে' বোঝাতে চেষ্টা করে সবটাই দুর্বোধ্য করে তোলে। আর সেই গোলমাল ছাপিয়ে একটা তীব্র বেদনার্ত্ত ভাঙা গলা গুমরে ওঠে, 'মরে গেছে, বাবা মরে গেছে।'

'আঃ সীতু থাম্! ওকি বিচ্ছিরী কথা? ছিঃ ছিঃ!' শ্যামলী বকে ওঠে, 'দেখতে পাচ্ছিস না অজ্ঞান হয়ে গেছেন।...এই তোমরা শুধু গোলমাল করছ কেন? একটা ডাক্তার ডাকতে পারনি?'

ডাক্তার!

তাই তো!

ডাক্তার সাহেবের বাড়ীর লোক তারা, বাইরের ডাক্তারের কথা মনে পড়েনি।

কাকে ডাকবে তা'হলে?

কোন ডাক্তারকে?

সাহেবের তো চিনা জানা অনেক ডাক্তার বন্ধু আছে। কিন্তু কে তাদের নাম জেনে রেখেছে?

শ্যামলী হঠাৎ মুখগুঁজে বসে থাকা সীতুকে একটা ঠেলা দিয়ে দৃঢ়স্বরে বলে' 'এই সীতু শোন্। তুই জানিস কাকাবাবুর কোথাও ডাক্তার বন্ধুর নাম?'

সীতু বিভ্রান্তের মত মুখ তুলে তাকায়। তার পর সমস্ত পরিস্থিতিটার উপর চোখ বুলোয়। এই তার সেই আশৈশবের পরিচিত জগৎ। ওই টেবলের উপর টেলিফোন যন্ত্রটা, ওই তার পাশে গাইড্ বুক।

যখন আরো ছোট ছিল, যখন সীতু ওই অসহায় ভাবে এলিয়ে পড়ে থাকা মানুষটাকে 'বাবা' বলেই জানতো, তখন একদিন অতসী বলেছিল, 'দাওনা একে ফোন করতে শিখিয়ে। ভারী কৌতূহল বেচারার।'

তখনো সম্পর্কে অত তিক্ততা আসে নি, তখনো মৃগাঙ্ক 'এই যে সীতুবাবু—' বলে ডেকে কথা বলতেন। তাই অতসীর অনুরোধ রেখেছিলেন, কাছে ডেকে বলেছিলেন, 'এই দেখ। এই ভাবে নম্বর ঘোরাতে হয়। আর এই বই দেখে দেখে লোকেদের নাম বার করতে হয়। এখন তুমি ইংরিজি পডতে পারনা, যখন পড়তে পারবে তখন সব বুঝতে পারবে। আচ্ছা এখন দেখ—'

নমুনা স্বরূপ নিজের একজন সহকারী ডাক্তারকে ডেকেছিলেন মৃগাঙ্ক। আর একটু হেসে সীতুর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'দেখ, শিখলে তো? এখন ধর যদি হঠাৎ আমার কোনদিন বেশী অসুখ করে গেল, আমি আর কথা বলতে পারছি না, তুমি এই ভাবে ডাকবে,—'ডাক্তার মিত্র আছেন? ডাক্তার মিত্র?...হ্যাঁ, আমি ডাক্তার মৃগাঙ্ক ব্যানার্জির বাড়ী থেকে বলছি—'

মানুষ কি কোনও একটা মুহূর্ত্তে হঠাৎ এক একটা বয়সের সীমা অতিক্রম করে? শৈশব থেকে বাল্যে, বাল্য থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে বার্দ্ধক্যে? সীতু সহসা এই মুহূর্ত্তে অতিক্রম করে গেল তার শৈশবকে? তাই শ্যামলীর একবারের ডাকেই উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে গেল

টেবিলের দিকে, 'গাইড্' দেখে বার করল প্রার্থিত নাম, আর ভাঙা গলায় আস্তে আস্তে থেমে বলতে থকেল—'ডাক্তার মিত্র আছেন? ডাক্তার মিত্র। আমি ডাক্তার মৃগাঙ্ক ব্যানার্জির বাড়ী থেকে বলছি···হ্যাঁ···বাবা। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন। এক্ষুনি আসতে হবে।'

হ্যাঁ, হঠাৎ একদিন বেশী অসুখ করে গেছে মৃগাঙ্কর, কথা বলতে পারছেন না, তাই সীতু—সীতু পারছে। সীতু এখন ইংরিজি শিখেছে।

কিন্তু সীতু কি শুধু ইংরিজিই শিখেছে?

আরও কিছু বুঝতে শেখেনি? বুঝতে শেখেনি নিজের হিংস্র নিষ্ঠুরতা? যে নিষ্ঠুরতায় এই রাজবাড়ীর রাণীকে ভিখিরির সাজ সেজে পরের বাড়ী দাসত্ব করতে হচ্ছে, ওই চির কঠিন শক্তিমান লোকটা জীর্ণ হতে হতে ক্ষয়ে যাচ্ছে, আর—আর খুকু—

খুকু!

এতক্ষণে বুঝি মনে পড়ে সীতুর খুকুর কথা। যখন জ্ঞান ফেরার পর ঔষধের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমোচ্ছেন মৃগাঙ্ক। তাঁর শান্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠাপড়া দেখা যাচ্ছে।

শ্যামলীর কাছে এসে দাঁড়ায় সীতু।

অস্ফুট দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলে, 'খুকু কোথায়?'

'খুকু!'

শ্যামলী এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও হঠাৎ হেসে ফেলে বলে, 'খুকু কোথায় কিরে? এই তো খুকু। চিনতে পাচ্ছিস না?'

নিজের কোলের দিকে চোখ ফেলে শ্যামলী বলে, 'কিছুতে ঘুমুতে চাইছে না। আসল কথা কাঁচা ঘুম থেকে উঠে পড়েছে তো? তাই দেরী হচ্ছে।'

কিন্তু এত কথা কে শোনে?

সীতু অবাক বিস্ময়ের বিস্ফারিত লোচনে তাকিয়ে থাকে শ্যামলীর ক্রোড়স্থিত জীবটার দিকে। ওইটা খুকু? ওই রোগা সিরসিরে ঢ্যাঙা ন্যাড়ামাথা, সত্যিই টিকটিকির মত মেয়েটা খুকু? ওকে তো এই এতক্ষণ ধরে শ্যামলীরই মেয়ে ভাবছিল সীতু।

সেই লাল লাল থ্যাঁদা থ্যাঁদা মুখ আর সোনালি চুলওয়ালা খুকুটা তা'হলে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে? আর তার হত্যাকারী সীতু!

'ও কার খুকু?'

তীক্ষ্ণ প্রশ্নে বিদীর্ণ করে ফেলতে চায় শ্যামলীকে সীতু। 'বল না কার খুকু?'

'কী মুস্কিল! কার আবার, তোদেরই। সত্যি চিনতে পাচ্ছিস না!'

সীতু আস্তে মাথা নাড়ে।

'তা' চিনতে আর পারবি কোথা থেকে।' শ্যামলী আপেক্ষ করে—'চেনবার কি জো আছে? এমনিই তো কতদিন দেখা নেই। তাছাড়া—যা হয়েছিল!'

শ্যামলী খুকুর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে সস্নেহে বলে—'সবচেয়ে শক্ত টাইফয়েড্। আর তার মধ্যে জরের ঘোরে অবিরত শুধু 'মা মা' বলে—হ্যাঁ, এইবার বল দিকি তোদের খবর? এতক্ষণ তো—তিনিই বা কোথায়? তুই বা কোথা থেকে—'

মৃগাঙ্ক যখন চোখ মেললেন তখন সকাল হয়ে গেছে। চোখ মেলেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি। তা'হলে কি ভুল নয়? সত্যিই পাগল হয়ে গেছেন তিনি?

যদি পাগল না হন, তা'হলে বিশ্বাস করতে হয় তাঁর ঘরে তাঁরই বিছানার কাছাকাছি অতসীর খাটটায় পড়ে যে ছেলেটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে, সে সীতু!

আর সীতুর গা ঘেঁসে, সীতুর গায়ে হাত পা বিছিয়ে অকাতরে পড়ে ঘুমোচ্ছে যে, সেটা খুকু।

চুপ করে এই দৃশ্যটির দিকে তাকিয়ে রইলেন মৃগাঙ্ক। ডাকলেন না। যেন ডাক দিলেই এই অপূর্ব্ব পবিত্রতার ছবিখানি অপবিত্র হয়ে যাবে।

তা'হলে কাল ছায়ামূর্ত্তি দেখেন নি মৃগাঙ্ক?

কিন্তু কোথা থেকে এল ও?

কে ওকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করে গেল?

কিন্তু একা কেন?

অতসী কোথায়?

তবে কি অতসী—তাই ছন্নছাড়া ছেলেটা পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে—কেঁপে উঠলেন মৃগাঙ্ক। ভুলে গেলেন, এই ছবিখানি নষ্ট করতে চাইছিলেন না।

ডেকে উঠলেন।

হয়তো আকস্মিকতায় একটু বেশী জোরালো হল সে ডাক।

চমকে চোখ মেলে চাইল সীতু। উঠে বসল।

চোখ নামাল।

মৃগাঙ্ক মিনিটখানেক তাকিয়ে থেকে গম্ভীর মৃদু স্বরে উচ্চারণ করলেন, 'তুমি একা এসেছ?'

সীতু চোখ তুললো, 'হ্যাঁ।'

'তোমার মা মারা গেছেন?'

'না না, ওকি!' শিউরে ওঠে সীতু।

'তবে?'

সীতু প্রতিজ্ঞা করেছে এবার থেকে সে সভ্য হবে, ভদ্র হবে, কেউ কথা বললে উত্তর দেবে। তাই ক্ষীণস্বরে বলে, 'আমি এমনি একা—খুকুকে দেখতে—'

'খুকুকে দেখতে। খুকুকে দেখতে এসেছ তুমি!'

'হ্যাঁ'।

এবার আর হরসুন্দরীর বাড়ীর দরজায় নয়।

শিবনাথ গাঙ্গুলীর দরজায় এসে থামে সেই মস্ত চকচকে গাড়ীখানা।

কাকে চাই?

এ বাড়ীর রাঁধুনীকে!

যেন রূপকথার গল্প! ঘুঁটে কুড়ুনির জন্যে চতুর্দ্দোলা!

কিন্তু এখানেও কপালে করাঘাত। 'এই দু'দিন আগেও ছিল বাবা! হঠাৎ 'ছেলে ছেলে' করে বিভ্রাট হয়ে—গোড়া থেকেই বুঝেছি আমি, সে যেমন তেমন নয়, শাপভ্রষ্ট দেবী আমাকে ছলনা করতে এসেছিস।...কিন্তু তুই দুষ্টু ছেলে হঠাৎ অমন করে কোথায় চলে গিয়েছিলি? ছেলে হারিয়েছে শুনেই তোর মা যে পাগলের মত—'

কিন্তু মৃগাঙ্ক আর পাগলের মত হ'ননা। হবেন না।

ফিরে এসে সীতুকে হাত ধরে গাড়ীতে তুলে দিয়ে নিজে উঠে স্টার্ট দিতে দিতে গম্ভীর মৃদুকণ্ঠে বলেন, 'কাঁদিসনে সীতু, কাঁদলে চলবে না। খুঁজে তাকে আমরা বার করবোই। খুঁজে না পেলে চলবে কেন আমাদের বল! কিন্তু আর আমার ভয় নেই। তখন একা ছিলাম, তাই হেরে গিয়েছিলাম, আর তো আমি একা নই? আর হারবো না। দেখবো আমাদের দু'জনকে হারিয়ে দিয়ে, কতদিন সে হারিয়ে বসে থাকতে পারে!'

ছোট গল্প

পত্নী ও প্রেয়সী

[আনন্দবাজার শারদীয় সংখ্যা]

২৮শে আশ্বিন ১৩৪৩—ইং ১৪ই অক্টোবর ১৯৩৬।

[শুধু প্রথম হাসির গল্পই নয়, প্রথম গল্পও বটে। এর আগে যা কিছু লেখা হয়েছে—সবই ছোটদের জন্য।]

*　　*　　*　　*

কলেজে ঢুকিয়া ইস্তক প্রেমে পড়িবার জন্য অমানুষিক চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, অথচ আজ পর্য্যন্ত পড়িতে পারিলাম না। পারিলাম না, অর্থাৎ পাইলাম না। মাত্র একটি তরুণীর অভাবে (কুমারী, বিধবা অথবা সধবা যাই হউক) 'হৃদয়-বৃক্ষে প্রণয়-কুসুম' ফোটে ফোটে হইয়াও ফুটিল না।

গলা না থাকিলেও গান গাওয়া চলিতে পারে, বৌ ব্যতিরেকে শ্বশুরবাড়ি যাওয়াও খুব বেশী অসম্ভব নয়, কিন্তু তরুণীর উপস্থিতি ব্যতীত প্রেমে পড়া? আজ পর্য্যন্ত কোথাও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তাই বলিতেছিলাম, আমার আ-যৌবন সাধনা, আপ্রাণ চেষ্টা, শরৎ, রবি, শেলি, কীটস, সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল একটি মাত্র তরুণীর অভাবে।

হায় নির্দ্দয় বিধাতা!

তাই বলিয়া আপনারা সিদ্ধান্ত করিবেন না নির্দ্দয় বিধাতা তাঁহার রাজ্য হইতে 'তরুণী' নামক একটি প্রয়োজনীয় জীবকে চিরদিনের মতো নির্বাসন দিয়াছেন।

তরুণী আছে! অফুরন্ত আছে!

কোথায় নয়?

পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, থিয়েটারে-সিনেমায়, স্কুলের দোরে, কলেজের ঘরে—তরুণীর হরির লুঠ! কিন্তু হাতের কাছে একটিকেও পাইলাম না। লক্ষ লক্ষর মধ্যেও অলক্ষ্য রহিয়া গেল।

এদিকে হতভাগ্য 'আমি'র বয়স বিনা বাক্যব্যয়ে বাড়িয়া চলিতেছে; একবারও ফেল করিতে পারি নাই বলিয়া কলেজের মেয়াদ শেষ হইয়া আসিতেছে, অর্থাৎ ডানা মেলিয়া খোলা আকাশে ওড়ার দিন সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে।

এহেন সময় জানিতে পারিলাম—পিতা-মাতা আমাকে 'স্ত্রী' নামক একটি উপসর্গ জুটাইয়া দিবার তালে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন!

হায়! স্ত্রীর ন্যায় প্রেমে পড়িবার এতোবড়ো প্রতিবন্ধক আর কী আছে?

বিবাহ—মানে মুক্ত আকাশ হইতে উদ্দাম পক্ষ যুগল গুটাইয়া আনিয়া, চিরদিনের মতো একটিমাত্র বৃক্ষের কোটরে কবরিত হওয়া। নীড় বাঁধিবার উপযুক্ত কিছু খড়কুটা সংগ্রহের নিমিত্তই বাঁচিয়া থাকা, খাইবার এবং খাওয়াইবার উপযুক্ত কিছু পাকা ফল জুটাইতে পারিলেই চরিতার্থ হওয়া!

এককথায় সমস্ত সম্ভাবনায় ইতি, সমস্ত কেরিয়ারটাই মাটি।

যাক যাহা মাটি হইবার, তাহা হইবেই, বিশ্বসুদ্ধ লোকের যাহা হইতেছে। আমার বেলাতেই তাহার ব্যতিক্রম হইবে এমন আশা করি না। আক্ষেপ শুধু এই—'মাটি' হইবার পূর্বে আশা মিটাইয়া খাঁটি প্রেমের আস্বাদ পাইলাম না।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাগসই লাইনগুলি মুখস্থ করিয়া করিয়া অবশেষে ভুলিতে বসিয়াছি, গম্ভীর রাত্রে জানলার ধারে মোমবাতি জ্বালাইয়া শেলি পড়ার অভ্যাস ক্রমশঃ ছাড়িতেছি, বাড়ির লোকেরা ঘুমাইয়া পড়িলে, চন্দ্রালোকিত নির্জন ছাদে বেড়াইবার স্পৃহা এখন ক্ষীণ, শুধু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ হিসাবে বৈষ্ণব করিতেছি, দুধ খাওয়া ত্যাগ করিয়াছি, পেট ভরিয়া ভাত খাওয়া বন্ধ করিয়াছি, রাত্রে গব্ গব্ করিয়া ডাল-ভাত গিলিবার বদলে খানবয়েক 'ফুলকা লুচি' খাইতেছি।

আরো নানাবিধ কসরৎ এখনো ধরিয়া আছি। যদি সহসা ভাগ্য-গগনে চন্দ্রোদয় হয়, কিন্তু কই? ঈশ্বরের অবিবেচনায় আস্ত একটি তরুণী তো দূরের কথা, তাহার একটু চুলের ডগা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না।

প্রেমে পড়া! প্রেম করা!

একখানা অতি সাধারণ, অতি সস্তা, অতি তুচ্ছ ব্যাপার! যাহা যদু করিতেছে, মধু করিতেছে, রাম শ্যাম গোপাল গোবিন্দ, চটকলের কুলি, সাঁওতালি মজুর, কয়লাকাটা ভূত, পদ্মাপারের মাঝি, মুখ্যু গাধা উজবুকেরা পর্য্যন্ত বিনা চেষ্টায় অনায়াসে করিয়া চলিয়াছে, তাহা আমি—এই শ্রীযুক্ত 'অমুক'...এম. এ. একবারের জন্যও করিবার সুযোগ পাইলাম না, এ যন্ত্রণার সান্ত্বনা কোথায়?

এদিকে বিবাহের 'দিন' নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে।

হায়! এই বিদ্যাবুদ্ধি, কাব্য অনুভূতি, এই অগাধ অসীম অনন্ত হাহাকার, এই যৌবন বেদনারসে উচ্ছল দিনগুলি লইয়া অবশেষে কিনা স্ত্রীর কাছে আত্মসমর্পণ করিব। স্রেফ স্ত্রী, ছিঃ! ছিঃ!

সেই নারী!

যাহার সহিত ফার্ষ্টক্লাশ ট্রেনের নির্জন কামরায়, স্বপ্নময় ড্রইংরুমে, সিমলা-শিলং পারো পাহাড়ে, অথবা কলিকাতার প্রকাশ্য রাজপথে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় 'সহসা দেখা' নয়! দেখা সেই ঘটক-ঘটকী দেনা-পাওনা, দরদস্তুর নাপিত-পুরুত ইত্যাদি বহু ঘাটের লোনাজল খাইয়া চিরাচরিত প্রথায় ছাঁদনাতলায়!

মানে আমার পিতা পিতামহ প্রপিতামহ এবং তস্য তস্যরাও যাহা করিয়া আসিয়াছেন, আমিও তাহাই করিব ?

তবে রবীন্দ্রনাথ জন্মাইলেন কেন ?

জয়দেব কলম ধরিলেন কেন ?

শেলি, বায়রণ, কীটস এবং আরো আরো অন্যরা ('সিলেবাসে' না থাকায় যাঁহাদের নাম জানি না) তাঁহারা জন্মিয়াই মরিলেন না কেন ?

প্রেমে পড়িবার চেষ্টা কি আজ করিতেছি ?

সেই কৈশোরকাল হইতেই তো ওই একটিই বাসনা। তখন ছাদে উঠিয়া ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে চোখ খারাপ হইয়াছে, লাটাই লাটাই সুতা খরচ হইয়াছে, কিন্তু কোন রূপসী কিশোরী সেই সুতার জালে আটক পড়ে নাই।

আশ পাশের বাড়ির জানলায় আর বারান্দায় তাকাইয়া তাকাইয়া পাড়ার সমস্ত মেয়ে-গুলোর শাড়ীর পাড় মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একটা মেয়েরও মুখ মুখস্থ করিবার অবকাশ পাই নাই।

তাছাড়া চিরকালের বসতবাড়ির এই পাড়ায় জন্মিয়া অবধি যে মেয়েগুলোকে পেনি পরা মূর্তিতে রাস্তায় দাগ টানিয়া এক্কা দোক্কা খেলিতে দেখিয়াছি, তাহাদের তো—এখন তাহারা বেণী দুলাইয়া এবং আঁচল দুলাইয়া স্কুলে গেলেও টেপি খেঁদি ভুতি মেনি ছাড়া ভাবিতেই পারি না। অতএব আমার মনের দরদালানে দাগ পাড়িবার ক্ষমতা হয় নাই তাহাদের।

একদিন পাশের জগৎবাবুদের ছাদে হঠাৎ একটি অপরিচিতা তরুণীর দেখা পাইয়া-ছিলাম। রূপসী না হইলেও তরুণী তো বটেই, অতএব সঙ্গে সঙ্গে প্রেমে পড়িবার জন্য 'আলগোছ' হইয়া উঠিয়াছিলাম—অর্থাৎ অনিমেষ নয়নে তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিতে ছিলাম, যদি তাহার দৃষ্টিপথে পড়ি।

তা পড়িয়াও ছিলাম!

কিন্তু পরের ইতিহাস যৎপরোনাস্তি করুণ। স্বকর্ণে শুনিলাম তরুণীর কলকণ্ঠ 'দেখ দিদি দেখ, ওই বড়-লাল বাড়িটার ছাতে একটা ল্যাগবেগে ছোঁড়া কি রকম অসভ্যের মতো হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে!'

শিহরিয়া স্তম্ভিত হইলাম!

জগৎবাবুর স্ত্রী নিম্নকণ্ঠে কহিলেন, 'আরে চুপ। ও তো ভাদুড়ীদের!'—' থাক—ডাক নামটা প্রকাশ করিতে চাহি না, তবে এটা বলিতে পারি পিতামাতারা ছেলেমেয়ের ডাক-নাম করণের সময় বোধকরি স্বপ্নেও ভাবেন না, ইহারা ভবিষ্যতে একদিন তরুণ তরুণী হইবে।

জগৎ বাবুর স্ত্রীর বাক্যের শেষাংশ শুনিতে পাইলাম, 'ওটা তো নেহাৎ বাচ্চা রে! ঘুড়ি উড়িয়ে বেড়ায় দেখিসনা? ছেলে মানুষ!'

অপরকণ্ঠ—'ছেলেমানুষের মতো ভাবভঙ্গী তো নয়। টেরির বাহার দেখে তো তাক লেগে যাচ্ছে। পাড়ায় থাকো, এইসব হতচ্ছাড়া ডেঁপো ছোঁড়াদের সায়েস্তা করতে পারো না?'

কখনো কোনো কাব্যে-নাটকে নায়ক সম্পর্কে নায়িকার এরূপ জোরালো উক্তি শুনি নাই। 'বেত্রাহত' কিসের মতো যেন ঘাড় নিচু করিয়া ছুটিয়া নামিয়া আসিলাম।

ব্যস, বাড়ি বসিয়া প্রেমে পড়িবার স্বপ্ন ওই খানেই—ইতি।

অতএব পথে।

সর্বদাই বাসে চড়িবার সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত পয়সা লইয়া উঠিয়াছি, কথনো কোন মেয়েকে মাণিব্যাগ হারাইয়া কি বলে—'ভীতচকিত নেত্রে' ইতস্তত: চাহিতে দেখি নাই। রাস্তার পাশ ছাড়িয়া মাঝখান দিয়া চলিতে চলিতে অপেক্ষা করিয়া করিয়া হাল ছাড়িয়াছি, কেহই 'রোলস্‌রয়' কি 'মিনার্ভা' খানা চাপা দিতে দিতে সাদরে গাড়িতে তুলিয়া লয় নাই, একদিন একটা ড্রাইভার 'কালা' বলিয়া গালি দিল, তদবধি আবার ফুটপাথ দিয়া হাঁটিতেছি।

শুধুই কি কলিকাতায়?

সিমলা শিলং পুরী রমনা গারোহিল কালিংপঙ্‌ কোথায় না গিয়াছি? হাতের কাছের গিরিডি মধুপুর দেওঘর দার্জিলিঙের নাম আর নাই করিলাম।

বেড়াইতে নয়, বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য নয়, কেবল মাত্র একটি 'তরুণী'র জন্য। কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই। বুঝিয়াছি ওরা শুধু গল্পে-উপন্যাসেই থাকে।

বাস্তবে কি আদৌ থাকে না?

থাকে। আছে। কিন্তু যেমন তরুণী আছে, তেমনি তাহার আশে পাশে গোঁফ আছে দাড়ি আছে, বর্ষিয়সী জননীর শ্যেন্‌ দৃষ্টি আছে। (অথচ গল্পে-উপন্যাসে এ সব কিছুই থাকে না।)

নাই! নাই।

নাই—জঙ্গলাকীর্ণ 'টিলা'র উপর ক্রন্দন-নিরতা উদাসিনী, নাই—জ্যোৎস্না-প্লাবিত বালুবেলায় রহস্যময়ী একাকিনী। নাই—বেওয়ারিশ সমাজ সংস্কারিকা, নাই—বোহেমিয়ান দুঃসাহসিকা। অতএব কিছুই নাই।

জীবনের রস নাই, যৌবনের রং নাই।

সাধে বলিতেছি—পৃথিবীট একটা ঘসা পয়সার মতো লাগিতেছে। (কথাটা কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম।)

মনের অবস্থা যখন এইরূপ শোচনীয় ঠিক সেই সময় বিবাহ হইল। পাঠক লক্ষ্য রাখিবেন বিবাহ 'করিলাম না', 'বিবাহ হইল।'

ভাদুড়ি বাড়ির আর পাঁচটা ছেলের যেমন করিয়া বিবাহ 'হয়', ঠিক তেমনি করিয়া। সেই ঘটক-ঘটকী, দেনা-পাওয়া অধিবাসের তত্ত্ব, ফুলশয্যার তত্ত্ব, লুচি ছোলার ডাল মাছের কালিয়া, পান্তুয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। লোকজন ভোজ খাইয়া অনেক সুখ্যাতি করিল। কোনোখানে ত্রুটির নামমাত্র রহিল না।

কেহ একবার আমার ব্যথাহত হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিল না। আমিও অগত্যা যথারীতি সাজ-সজ্জা করিয়া রওনা হইলাম।

সত্যের অপলাপ না করিলে বলিতে হয়, স্ত্রীকে দেখিবামাত্র মুগ্ধ হইলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসিয়া ফেলিলাম।···না না ভুল করিবেন না, ভালবাসিয়াছি, তাই বলিয়া প্রেমে পড়ি নাই। ভালবাসা এক, প্রেমে পড়া আর এক। স্ত্রীকে কে না ভাল-বাসে? আপনারাই কি বাসেন না? তাই বলিয়া তাদের সহিত প্রেমে পড়িতে গিয়াছেন কি?

সময়ে চা না পাইলে, অথবা—হাতের কাছে গামছা না পাইলে স্ত্রীর উপর অনায়াসেই এক-আধটু বিরক্ত হওয়া যায়, অথবা বাজার খরচ বেশী করিলে, বা নিশীথরাত্রে ছেলে ঠেঙাইলে তিরস্কার করা যায়, ছাদে দাঁড়াইয়া চুল শুকানো অথবা বারান্দা হইতে ফেরিওয়ালা ডাকা সম্বন্ধে শাসন করাও চলিতে পারে, কিন্তু পারিবেন আপনার রহস্যময়ী প্রেমিকার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতে?

তখন ছাদে চুল শুকাইতে দেখিলে ভোরের শুকতারার সহিত তুলনা করিয়া ধন্য হইবেন, বাজে খরচ করার মধ্যে একটি অলৌকিক সারল্য দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন এবং এক পেয়ালা চা, (তা সে যতো দেরীতেই হোক) পাইলেই কৃতার্থ হইবেন।

অবশ্য ঠেঙাইবার মতো ছেলে তাঁহার না থাকাই উচিত। থাকিলেও এটা ঠিক তিনি আপনার সম্মুখে রণচণ্ডীর ভূমিকায় না নামিয়া বড়োজোর বলিবেন, 'দুষ্টু ছেলে চকোলেট পাবেনা।' নায়িকার পক্ষে যাহা বলা শোভন।

যাইহোক স্ত্রীর সহিত যে প্রেম হয় না এ বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। তিনি সাঁঝের তারকাও নয়, ভোরের যুথিকাও নয়, স্বপ্নও নয়, মায়াও নয়, দস্তুর মতো একটা জলজ্যান্ত জীব। আজীবন ভাত-কাপড়ের দায় লইয়া যাহার সহিত ঘর-কন্না করিতে হয় তাহার সম্পর্কে 'প্রেম' শব্দটাই তো মশাই ন্যাকামি।

স্ত্রীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম যতো, বিধাতা পুরুষকে গালি পাড়িলাম ততো। হায়! ইহাকেই দুইদিন আগে একবার দেখাইলে কী ক্ষতি ছিল! একবার প্রেমে পড়িয়া জীবন

সার্থক করিতাম !…এই—'অষ্টাদশ বসন্তের মালাগাছি'কে বিবাহ করিয়া বসার মতো বর্ব্বরতা আর কী আছে ?

কোথায় জ্যোৎস্নালোকিত নির্জন প্রান্তে উন্মুক্ত আকাশ তলে পাখির কাকলীর মধ্যে সহসা চারিচোখে দেখা, আর কোথায় পাঁচশত কৌতূহলী চক্ষের সম্মুখে মাথার উপর চাদর চাপাইয়া, ইডিয়ট নাপিতটার অশ্রাব্য গালি গালাজের মধ্যে বলিয়া কহিয়া শুভদৃষ্টি !

আরে ছোঃ !

যাক প্রেমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া নির্বিঘ্নে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়া জীবনের বাকি কয়টা দিন কাটাইয়া দেওয়াই স্থির করিলাম। এতোদিনের আশাতরুকে নির্মূল করিতে কষ্ট হইল বৈ কি ! কিন্তু সুখের মূল্যেই শান্তি কিনিতে হয়, সংসার—' এমনই ঠাঁই।

স্ত্রীর কাছে এমন ভাব দেখাইতেছি—যাহাতে তিনি ধারণা করিতে পারেন, জীবনে কখনো 'নারী' শব্দটাকে হৃদয়ের ত্রিসীমানাতেও আসিতে দিই নাই।

এই ভাবেই সংসার সমুদ্রে জীবনতরণী খানি ভাসাইয়াছি, সহসা বিনামেঘে বজ্রাঘাত !

না, বজ্রাঘাত ছাড়া বাংলাভাষায় আর কোনো তুলনা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

ঘটনাটি কিরূপে জানিতে পারিলাম শুনুন।

বন্ধুবর্গ লইয়া জোর আড্ডা বসাইয়াছি, সহসা বাড়তি একজোড়া তাসের আবশ্যক হইল। ভিতরে গিয়া স্ত্রীর নিকট আর্জি করিতেই তিনি আলগোছে ভুরে শাড়ির আঁচল হইতে চাবির গোছা খুলিয়া আমার হাতে দিলেন ! দেখি তাঁহার আশে পাশে স্তূপীকৃত মোচার খোলা, দুটি হাত মোচার আঠায় কলঙ্কিত।

ব্যাপারটা বড়ই দৃষ্টিকটু ঠেকিল।

না হয় স্ত্রী। নেহাৎই স্ত্রী মাত্র !

তবু আঠারো বছর বয়েস তো ?

যাহারা একটি আঠারো বছরের মেয়ের চাঁপার কলির মতো আঙুল দিয়া মোচা কোটায়, তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী ?

ভাবিতে ভাবিতে ঘরে গিয়া স্ত্রীর বাক্স খুলিলাম আর সঙ্গে সঙ্গে খোলা বাক্সটা যেন দাঁত খিঁচাইয়া উঠিল।

হ্যাঁ মহাশয়, জড় পদার্থও খিঁচাইতে পারে, ভেংচাইতে পারে। বাক্স খুলিতেই চোখে পড়িল একটা চ্যাঙড়া ছোঁড়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে।

ছোঁড়া মানে, ছোঁড়ার ফটো।

ইচ্ছা হইল ফটোখানা লইয়া টানিয়া ডাষ্টবীনে ফেলিয়া দিই, কিন্তু না, তদন্ত করা আবশ্যক।

চাকর দিয়া বাহিরে খবর পাঠাইলাম, হঠাৎ কলিক্ পেন ধরিয়াছে, বিছানায় পড়িতে হইয়াছে।

চুলায় যাক তাসের আসর।

বন্ধুদের মনে করা ?

তাহাতেই বা কী আসে যায় ?

ঘরে যাহার আগুন লাগিয়াছে, তাহার আবার সামাজিকতা ?

কিছুক্ষণ পরে স্ত্রী আসিলেন।

আঁচলে ভিজে হাত মুছিতে মুছিতে, দিব্য হাসি হাসি মুখে। মুখের কোথাও অপরাধীর চিহ্নমাত্র নাই। মনে মনে বলিলাম, 'নারি! তোমার অসাধ্য কাজ নাই।'

স্ত্রী প্রফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, 'তাস নিয়ে গেলেন না যে বড়? পাতা বিছানা দেখে লোভ হলো বুঝি ?'

বলাবাহুল্য শয্যাগ্রহণই করিয়াছিলাম, কথাটা কানে যাইতেই লাফাইয়া উঠিলাম।

এ কী!

কাহার বিছানায় অঙ্গ ঢালিয়াছি ?

বাঁচিয়া থাক আমার ইজি চেয়ার। তৎক্ষণাৎ বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম।

বিচারকের স্বরে কহিলাম, 'শুনে যাও এদিকে।'

স্ত্রী কৌতুক হাস্যে কহিলেন, 'আরে ব্যস! আষাঢ়স্য প্রথম দিবস যে! কী ব্যাপার ?'

কৌতুকে কর্ণপাত করিবার সময় নয়, জলদ গম্ভীর স্বরে কহিলাম, 'এটা কী ?'

সঙ্গে সঙ্গে ফটোখানার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশও করিলাম অবশ্য।

'বাতাহত কদলীবৃক্ষবৎ' পড়িয়া যাওয়াটা বড়ই সেকেলে হইয়া গিয়াছে, অতএব—আন্দাজ করিলাম তাঁহার প্রফুল্ল শতদলের মতো মুখখানি 'কাগজের ন্যায় শাদা,' অথবা 'বাসি গোলাপের মতো কালো' হইয়া যাইবে, কারণ ভাল ভাল গল্পে উপন্যাসে সেইরূপই লেখা থাকে।

কিন্তু ?

আশ্চর্য্য হইলাম তাঁহার ব্যবহারে।

হেজলিন মার্জিত মুখ, সৌন্দর্য্যের এতোটুকু পরিবর্ত্তন হইল না, পলকমাত্র সেদিকে তাকাইয়া অনায়াস উত্তর দিলেন, 'ওটা? ফটো।'

দেখুন ধৃষ্টতা!

কিন্তু আমিই কি অল্পে ছাড়িব ?

কহিলাম, 'ফটো তা' জানি। কিন্তু কার ?'

'ওঃ! এক ভদ্রলোকের।'

শুনুন মহাশয়। পরস্ত্রীর বাক্সে যাহার ফটো থাকে, সে ও' 'ভদ্রলোক'!

কটুস্বরে বলি, 'ভদ্রলোকের নামটি জানিতে পারি কি ?'

'একটু কষ্ট করলেই জানা যায়।'

কুঞ্চিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলাম—(যেটা এতোক্ষণ দেখি নাই,) ফটোর গায়েই কোণের দিকে লেখা রহিয়াছে, 'তোমার বিনয়।'

অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কথা শুনিয়াছি, নিজের মধ্যে তাহা স্পষ্ট অনুভব করিলাম!

টেবিলের উপর একটা চাপড় দিয়া কহিলাম—'তোমার কাছে ওর ছবি থাকে কেন?'

'থাকবে না—কেন শুনি।'

এ কী! এযে স্পষ্ট বোহেমিয়ান ভাব! তার মানে রীতিমত সাহসিকা।

যে সাহসিকাকে সেই হাফ্‌প্যাণ্ট পরার বয়স হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হায়রান হইয়াছিলাম, তাহাকে অবশেষে কিনা নিজের ঘরের মধ্যেই পাইলাম?

কিন্তু 'বিবাহের পূর্বে ও পরে'—অনেক তফাৎ। যদুর স্ত্রীকে মধুর হাত ধরিয়া অজানার উদ্দেশে যাত্রা করিতে দেখিলে, সেই মহান প্রেমের চরণে অবশ্যই মাথা নোয়াইব, তাই বলিয়া নিজের স্ত্রীর বাক্সে অপরের ফটো!

সহ্য করিতে হইবে?

অসম্ভব। .

পৌরুষ-গর্ব গর্জ্জন করিয়া উঠিল, 'না, থাকবে না। থাকতে পারে না। নিজের হাতে আমার সামনে দেশলাই জেলে পোড়াও।'

স্ত্রী কোনো কথা না কহিয়া ছবিখানি লইয়া বাক্সের ডালা খুলিয়া নীচের খোপে রাখিলেন, ধীরে সুস্থে চাবি লাগাইলেন। চাবির রিং ডুরে শাড়ির আঁচলে ভালো করিয়া বাঁধিলেন, তাহার পর বিছানার ধারে পা ঝুলাইয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন, 'আর কী হুকুম আছে?'

কী অদ্ভুত নির্লজ্জতা!

সহসা বাসনা জাগিল সেই নীটোল তাজা গালের উপর দিই এক চড় কসাইয়া! (সম্পাদক মহাশয় সাবধান! পত্রিকাখানা আবার বাড়ির ঠিকানায় পাঠাইবেন না।)

কিন্তু এটা অতি আধুনিক সভ্যযুগ তাই কষ্টে বাসনা সংবরণ করিলাম। তবে স্বীকার করুন আর নাই করুন বর্ব্বর যুগের পুরুষরা অনেক সুখী ছিল। সভ্যযুগের দুঃখী পুরুষের হাতে 'বচন' ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নাই।

অতএব সেই অস্ত্রই হানি।

'এই 'বিনয়'টি তোমার কে?'

স্ত্রী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, 'তা'ও বোঝোনি এতোক্ষণে? ধন্য বুদ্ধি তো!'

'তাহলে ও তোমার প্রেমিক?'

'অভদ্র ভাষায় বলতে চাও তো তাই বলো, নচেৎ বন্ধুও বলতে পারো।'

'রেখে দাও তোমার ভদ্রতা। বিয়ের আগেই তাহলে প্রেমে পড়ে এসেছো?'

'কী মুস্কিল! বিয়ের আগে পড়বো না তো কি, বিয়ের পরে পড়বো?'

'ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কথাটা বলতে তোমার লজ্জা করলো না? স্বামী ছাড়া অন্য একটা পুরুষকে—'

'উঃ! হাসালে তুমি! মাথা নেই, তার মাথা ব্যথা। বিয়ের আগে স্বামী কোথায়?'

'কিন্তু—কিন্তু তুমি না হিন্দুর মেয়ে? অনূঢ়া অবস্থায়—'

স্ত্রী একবার নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া, কিছু গম্ভীর ভাবে কহিলেন, 'হিন্দুর মেয়ে' বলতে তোমাদের ধারণাটা কী? 'নীতি রত্নমালার' একটি পরিচ্ছেদ? হিন্দুর মেয়ে তার আইবুড়ো বেলাটাও ভবিষ্যৎ পতি দেবতার নামে উইল করে রাখবে, এই আশা?'

ক্রোধে মুখে উচিত কথা জোগাইল না। উল্টে বলিলাম, 'আমি অন্ততঃ তাই মনে করি। তোমাকে বিয়ে করার আগে আমি কি কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়েছিলাম?'

পাঠক, দেখুন মিথ্যা কথা বলি নাই।

স্ত্রী কিন্তু লজ্জিত মাত্র না হইয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'করোনি, সেটা তোমার বুদ্ধির জন্যে, আমার জন্যে নিশ্চয় নয়। তবে করলে—আমি তোমার টেবিলের ড্রয়ারে দু'খানা পুরণো প্রেমপত্র, কি চুলের কাঁটা অথবা খ্যাঁদামুখী একটা ফটো দেখলে মূর্ছা যেতাম না।'

দেখছেন তো!

এখনকার মেয়েদের সহিত কথায় পারিবার জো কোথায়? উপন্যাস পড়ার কুফল আর কি!

গুম্ হইয়া গিয়াও হঠাৎ দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিলাম, 'বটে। মূর্ছা যেতে না?'

'না।'

উঃ—একটা দস্তুর মতো প্রেমে পড়িয়া যদি দেখাইতে পারিতাম! দেখিতাম ঈর্ষ্যা বস্তুটি কেমন। কিন্তু নাঃ! জমার ঘরে মোটা অঙ্ক থাকিতেই যাহা পারি নাই, আজ এখন খরচের খাতায় নাম লিখাইয়া—

তাছাড়া আর কি!

'বিবাহ' মানেই তো খরচ হইয়া যাওয়া।

স্ত্রী কি মনে করিয়া কোমল কণ্ঠে কহিলেন, 'মিথ্যে মন খারাপ করছো কেন বলতো? যাও বন্ধুরা বসে রয়েছে। খেলো গে।'

আশ্চর্য্য! এই কোমলতার মধ্যে ছলনার আভাস পাইলাম না।

তবু স্বামিত্বের অভিমান!

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিলাম, 'মিথ্যে মিথ্যে মন খারাপ? তার মানে, দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতাও মানো না?'

'ও বাবা! মানি না আবার? বিলক্ষণ মানি। মানি বলেই তো বিয়ের আগের দিন তিনখানা ডাক টিকিট খরচ করে লম্বা লেকচার দিয়ে এলাম, পূর্ব কথায় যবনিকাপাত হোক। এখন আমার পবিত্র দাম্পত্য জীবনের মাঝখানে নাক গলাতে এসো না।'

রূঢ় হইতে গিয়াও কেমন পারিলাম না। খাপছাড়া গলায় কহিলাম, 'তা তাকেই বিয়ে করলে না কেন?'

'বিয়ে!' স্ত্রী হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, 'কী সাংঘাতিক! অমন একখানা খাঁটি প্রেম, বিয়ে করে নষ্ট করতে আছে? বিয়ে মানেই তো প্রেমের জবাই।'

রণক্ষেত্রে নীতি মানিলে চলে না। তাই বলিয়া উঠিলাম, 'কেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা থাকে না?'

'ভালবাসা! থাকতে পারে। থাকেও। তাই বলে প্রেম? নাঃ তুমি হাসিয়ে ছাড়লে দেখছি।'

দেখুন? আমারই অস্ত্রে আমাকেই ঘায়েল। উঃ! অথচ এ যাবৎ ভাবিয়া আসিয়াছি, আমার চিন্তাধারা কী মৌলিক!

বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা আর কাহাকে বলে!...কিন্তু পুরুষের মুখে মানায় বলিয়া, কিছু আর সব কথা স্ত্রীলোকের মুখে মানায় না।

রাগভরে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেলাম।

কিন্তু কতক্ষণের জন্যই বা?

রাস্তায় বাহির হইয়া যাওয়া চলে, রাস্তায় থাকিয়া যাওয়া চলে না।

ফিরিতেও হইল, খাইতেও হইল।

খাইলাম বটে, কিন্তু রাগ যে একটুও পড়ে নাই তাহা জানাইয়া দিতে মুখ ভার করিয়া রহিলাম!

রাত্রি হইল, শুইতে আসিতেও হইল।

হায়! সেই শয্যাতেই, যে শয্যায় ওই অপরাধিনী স্ত্রীও শয়ন করেন। কিন্তু কি করিব, ঘরে যে দ্বিতীয় জায়গা আর নাই।

ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলাম তিনি আসিলেন। চুড়ির রুনুঝুনু বাজিয়া উঠিল।...... একান্ত কাছে কে বসিল। কাহার উষ্ণ স্পর্শ আমার গণ্ডদেশে?

চোখ মেলিয়া চাহিলাম!

সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, সেই ধৃষ্ট অপদার্থ বিনয়টা ঠিক মেয়ের সঙ্গেই প্রেম করিয়াছিল!

গৌর-ললাটে একটি ছোট্ট সিঁদুরের টিপ, ঈষৎস্মিত হাস্যরঞ্জিত অধরপুট উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে চমৎকার মুক্তার মতো দাঁতের আভায়।

'এই নাও—' বলিয়া তিনি আমার হাতে একতাড়া কাগজ তুলিয়া দিলেন।

কী এ? সেই হতভাগার চিঠির তাড়া বুঝি?

ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে যাইতেছিলাম, চোখ আটকাইয়া গেল। ছি ছি কী লজ্জা। এ যে আমারই আজন্ম বিরহী কৌমার-চিত্তের উচ্ছ্বাস।

না চাহিয়াও বুঝিলাম পত্নী হাসিতেছেন।

আবার কণ্ঠস্বর। 'আর এই নাও বিনয়ের ছবি। ইচ্ছে হয় পুড়িয়ে ফেলতে পারো। বিনয় টিনয় কেউ নেই; ছবিখানা হচ্ছে বায়োস্কোপের—'

তাহাকে আর কথা কহিতে দিলাম না। কাছে টানিয়া লইলাম।

তাহার পরে—নাঃ থাক!

পাঠকগণকে অনেক কথা বলিয়াছি, এইবার একটি শেষ কথা বলিয়া বিদায় লই—পত্নীর সহিত প্রেমও অসম্ভব নয়।

—

বিপন্ন সুখ

জম-জমাটি আসরের মধ্যে নিঃশব্দে কখন পিছন দিকের দরজা দিয়ে ঢুকে ফস করে মৃণালের হাতের তাসগুলো তুলে নিয়ে বলে উঠলো, 'উঃ খুব মারকাটারি হাতখানা পেয়েছিস তো?'

নিখিলের জীবনে অনেক সমারোহ এসেছে, অনেক বাড়বাড়ন্ত, নিখিল যেসব কেষ্ট-বিষ্টু মহলে ঘুরে বেড়ায়, যে সব হোটেলে-ফোটোলে গিয়ে ওঠে, তা শুনে এই 'পেয়ারা বাগান তরুণ সঙ্ঘের' সদস্যদের চোখ টেরা হয়ে যায়, তবু নিখিলের কথার ধরনটি বদলায় নি। অন্তত এদের কাছে নয়।

বদলানোই তো স্বাভাবিক ছিল।

তাহলে হয়তো নিখিলের চরিত্রও বদলায় নি, না হলে কবেকার কোন ছেলেমানুষীর ফসল এই একটা 'আড্ডা ঘর', যার দেয়ালে স্যাৎসেঁতে ছাপ, মেঝেটা আটফাটা, কড়িবরগা ঝুলন্তপ্রায়, এবং দরজা জানলারা রান্নাঘরের সমতুল্য সেই ঘরটার জন্যে ওর মন টানে কেন? নিখিলের বম্বের বাড়ির চাকরবাকর যদি দেখে 'সাহেব' এই ঘরে ঢুকে একটা ডজন ডজন চায়ের পেয়ালার দাগে চিত্রিত এবং শত শত আগুনের ফুলকির দাহে জর্জরিত মলিন ফরাসপাতা নড়বড়ে চৌকিতে পরম আনন্দে বসে আছেন, স্রেফ্ অজ্ঞান হয়ে যাবে তারা।

অথচ সত্যিই পরম আনন্দ পায় নিখিল এখানে এসে, বর্তে যায় যেন।

হেড অফিস বোম্বাইতে স্থায়ী হলেও মাঝে মাঝেই কলকাতায় আসতে হয় নিখিলকে কোম্পানির কাজে। কোম্পানির পয়সাতেই উড়ে উড়ে আসে-যায়, কোম্পানির গাড়িতেই কলকাতা চষে বেড়ায়, আর কোম্পানির ঢালাও হুকুমে তার মান্যগণ্য খদ্দেরদের নিয়ে গিয়ে দামী হোটেলে তুলে লপচপানি করে।

'রতনচাঁদ মাণিকচাঁদ এণ্ড কোং'র অনেক রকম বিজনেস, নিখিল তাদের ডান হাত।

তবু নিখিল কলকাতায় এলেই কোনো ফাঁকে একবার এই চটা-ওঠা মেজের ঘরটায় দু' দণ্ড বসে যায়। হয়তো এক হাত তাসও খেলে যায়।

নিখিলের এই ভালবাসার নম্রতায় সঙ্ঘের অন্য সদস্যরা অভিভূত, বিগলিত।

কিন্তু নিখিলও কি এদের কাছে কৃতজ্ঞতায় বিগলিত নয়? এরা যে নিখিলকে 'পয়সাওলা' বলে ঠেলে ফেলে দেয়নি, এখনো 'তুই-তোকারি' করে কথা বলে, নিখিলের কাছে ক্লাবের জন্যে 'ডোনেশান' চায়, পুজোর মোটা চাঁদা আদায় করে—এটাকে নিখিল ওদের কৃপা বলেই মনে করে।

'পেয়ারা বাগান' নামটা এখন শহরের নামের খাতা থেকে লুপ্ত, 'তরুণ সঙ্ঘে'র তরুণরাও এখন আর 'তরুণ' নেই, খুঁজলে অনেকেরই রগের চুলের ফাঁকে 'আলপিনের' আগাদের

উঁকি মারতে দেখা যাবে, তবু তরুণ সঙ্ঘের প্রতি আনুগত্যের অভাব নেই কারো। নেহাৎ যারা কর্মসূত্রে বাইরে চলে গেছে, তারা বাদে।

চলে গিয়েও নিখিলের মতো এতটা যোগসূত্র কেউ রাখতে পারে নি। কেউ কেউ চাঁদা বন্ধ করে দিয়েছে, কেউ হয়তো বার্ষিক চাঁদাটা দু' বছরের জমিয়ে ফেলে যখন কলকাতায় আসে, দিয়ে দেয়, পুজোর সময় কলকাতায় এলে অষ্টমীর অঞ্জলিটা হয়তো 'তরুণ সঙ্ঘের' ঠাকুরকেই দেয়, হয়তো বা এসে উঠতে পারে না, ফিরে গিয়ে একটা পোস্টকার্ডে একত্রে সবাইকে বিজয়ার সম্ভাষণ জানিয়ে লেখে, 'নানা কাজে পড়ে—'ইত্যাদি।

এবারে ক্লাবের রজতজয়ন্তী বছর, তাই এবার পুজোর সময় প্রাক্তন সদস্য সম্মেলনের পরিকল্পনা চলছে, এবং বাজেট সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে, এ হেন কালে হঠাৎ নিখিলের আবির্ভাব যেন বিপদকালে ঈশ্বরের আবির্ভাবতুল্য, বাজেটে যা কিছু সমস্যা দেখা দেবে, নিখিল হাতে তুলে নেবে এটা নিশ্চিত। অতএব হৈচৈ রবে ঘর প্রায় ফাটিয়ে ফেললো ওরা।

'কবে এলি? কখন এসে ঢুকলি? কেউ টের পেলাম না—আশ্চর্য!'

নিখিল সেই মলিন ফরাসের উপর এক ধারে বসে পড়ে বলে, 'সব কথার জবাব হবে, এ 'দান'টা হয়ে যাক্ না! তাসটা দারুণ এসেছে—'

'আরে দূর, রেখে দে তোর দারুণ। কথাগুলো হয়ে যাক। তারপর না হয় নতুন করে খেলা শুরু হবে।'

'নতুন করে খেলা শুরু?'

নিখিল একটু রহস্যময় হাসি হাসে, 'তাই ভালো।'

ওরাও জানে তাই ভালো।

খেলা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না, কাজের কথা হয়ে যাক। হয়তো এক্ষুনি নিখিল বলে বসবে, 'উঠি ভাই, আর ঠিক পঞ্চান্ন মিনিট পরে প্লেন ছাড়বে।'

ওই রকম মিনিট গুণেই কাজের হিসেব রাখতে হয় নিখিলকে। সঙ্ঘের সেক্রেটারি বিভূতি বোস তাই তাড়াতাড়ি নিজেদের কাজের কথা তোলে।

'হবে হবে! তাড়া কী?' নিখিল বলে, 'কথা তো পালাচ্ছে না, এই দানটা হয়ে যাক না।

'থাকবি বুঝি আজ?'

'থাকবো।' নিখিল আবার রহস্যময় হাসি হাসে, 'আজ থাকবো, কাল থাকবো, পরশু থাকবো, তরসু নরসু সব দিন থাকবো।'

'বলিস কী? সত্যি? গুড গড। কলকাতায় বদলী হয়ে এলি বুঝি?'

'দূর! হেড অফিস থেকে কেউ ব্রাঞ্চে ঠেলতে পারে? পারে—শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় পারে, তা আমার ব্যাপারে তো—' একটু হেসে কথাটিকে শেষ না করেই শেষ করে নিখিল।

'ওঃ তাহলে বুঝি ছুটি নিয়েছিস? ভালো করেছিস। মাঝে মাঝে একটু রেস্টের দরকার। যা ছুটোছুটি কাজ তোর। আজ বম্বে, কাল মাদ্রাজ, পরশু দিল্লি, তরশু কানপুর বাপ্‌স্! ...তা কতদিনের জন্যে ছুটি নিয়েছিস? পুজো পর্যন্ত থাকতে পারবি না?'

'পারবো। পুজো পর্যন্ত, পুজোর পর পর্যন্ত। থেকেই যাবো।'

'থেকেই যাবি?'

এতগুলো বুড়োধাড়ি লোক অবোধ চোখে তাকায়।

'তার মানে?'

'উঃ, এই সামান্য কথাটার মানে বুঝতে এতগুলো মাথার এত সময় লাগছে চাঁদু? ছুটিটা বরাবরের জন্যে নিয়ে নিয়েছি, বুঝলে বাপ।'

'তবু ও যে মাথায় ঢুকছে না ভাই।'

'উঃ কী দিয়ে মাথা তৈরি রে! পাথর? চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছি।'

ওঃ ঠাট্টা!

ওরা কলরব করে ওঠে, 'ইয়ার্কি!'...'মাইরী আর কী!'...'যাদুরে, তোর ছাড়া-চাকরিটা কোথায় ফেললি গোপাল, বল্‌না? কুড়িয়ে নিয়ে বুকে জড়াই।'

চল্লিশ পার করে ফেলেও ওরা দিব্যি চব্বিশের ভাষায় কথা কয়।

'রতনচাঁদ মাণিকচাঁদ এণ্ড কোং'-র তুমিই তো যাদু বুকের মাণিক, মাথার রতন, তুমি ছেড়ে দেবে 'চাঁদ ব্রাদারদের?'

'বিশ্বাস না করলে আর কী করবো?' নিখিল নিজস্ব ভঙ্গীতে হাঁটুতে হাঁটুতে ঠুকতে ঠুকতে বলে 'রেজিগ্‌নেশান লেটারের কপিটা তো নিয়ে আসিনি যে, বিশ্বাস করাবো।'

অবোধদের মুখের অবোধ কৌতুকের হাসির ফুলকিগুলিকে হঠাৎ নিভু নিভু দেখালো।

ব্যাপার কী!

সত্যি বলেই মনে হচ্ছে যেন!

একজন নেভা গলায় বললো, 'কথাটা অবিশ্বাস্য, এটা তো অস্বীকার করা যায় না?'

'তা যায় না বটে।' কথাটা বলে সহজ ভঙ্গীতে নিখিল পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করে একটা বার করে নিয়ে কেসটা ওদের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, 'বার কর।'

'রাখ্‌ তোর পানামা। হয়েছে টা কী? খুব তেল হয়েছে বুঝি? তাই মেজাজ দেখিয়ে—'

নিখিল আবার হাঁটু ঠুকতে ঠুকতে বলে, 'আরে দূর! ওদের সঙ্গে আমার কত ভালো রিলেশান! আমার এই ডিসিশানে যা মর্মাহত হয়েছে ওরা, মনে পড়ে সারাক্ষণ মনটা দমে যাচ্ছে।'

'তবু ছেড়ে দিলি?'

'দিলাম তো! নতুন করে খেলা শুরু করবো। নইলে ওরা তো আমার আরো

অফার করছিল। এমনিতেই তো তিন হাজারের মত দিচ্ছিলো, তা ছাড়া ওয়েল ফার্নিশ্‌ড্ ফ্রী ফ্ল্যাট, গাড়ি, টেলিফোন, তার ওপরও সাড়ে তিন দিতে চাইছিল—'

'নিলি না?'

'নাঃ। বড় দুঃখ পেলো ওরা। তবে ধরে নিয়েছে আমার হঠাৎ মাথার অসুখ করে গেছে। আমার মিসেসই সেটা রটিয়েছেন অবশ্য।'

আলোকবিন্দুগুলো আবার উজ্জ্বল হয়।

'ধ্যেৎতারি! কি গুল্ মারছিস বসে বসে?'

'গুল নয় হে, গুল নয়, স্রেফ গোলা, ছুঁড়ে মারলাম একখানা!'

'ছুঁড়ে মারলি? কাকে?'

'মিসেসকে।' নিখিল দিব্য আস্মস্থ গলায় বলে, 'মারা ছাড়া উপায় ছিল না রে ভাই। এত বাড় বাড়িয়েছিল, সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। মারলাম ধাঁই করে একখানি ব্রহ্মাস্ত্র। মারতাম না বলে ভাবত নিরস্ত্র। দেখুক এখন। ফুলো বেলুন একেবারে ফুট! ...সেকালে- বৌ জব্দ করবার একটা পথ অন্তত ছিল, একালের আইন যে আমাদের মতো হতভাগ্যদের একেবারে হাত পা বেঁধে রেখেছে—'

কটকটে বরুণ শীল বলে ওঠে, 'বড়ো আক্ষেপ হচ্ছে, না?'

'দারুণ হতো! এখন আর হচ্ছে না। জব্দ করে দেবার এই অস্ত্রটা আবিষ্কার করে ফেলে বড় আহ্লাদে আছি।'

বরুণ চড়া চড়া গলায় বলে, 'করেছেনটা কী মিসেস? আর কারুর সঙ্গে 'লভ্' করছিলেন?

'আরে বাবা, তাতেও এত অসহ্য হত না। বুঝতাম মানুষের চিত্তে অমন দৌর্বল্য এসেও থাকে।'

'তা হলে হলোটা কী? মিসেসকে জব্দ করবার জন্যে তুমি চাকরি ছাড়লে? তিন হাজারি চাকরি! মশার জন্যে কামান! অথচ—মানে হয়েছিলটা কী?'

বললো বিজয় বোস।

'হয়েছিল অহঙ্কার! ধরাকে সরাজ্ঞান! রাবণ রাজার অবস্থা!'

এযাবৎ নিখিলের সঙ্গে কেউ খিঁচিয়ে কথা বলেনি, অবস্থাও ঘটেনি। নিখিলের বুদ্ধিমত্তাকে বাহবাই দিয়েছে সবাই। নিখিলের সাদাসিধেমিতে মুগ্ধ হয়েছে।

আজ কটকটে বরুণ শীল খিঁচিয়ে উঠলো। নিখিলের মুখ্যুমীর জন্যেই অবশ্য। তবে বলা যায় না ওই 'চাকরীবিহীনতাটা' অলক্ষ্যে কোনো কাজ করলো কিনা। জজসাহেব রিটায়ার করলে নাকি পরদিনই পেশকার মোক্তাররা আর মাথা নোয়ায় না।

যাই হোক বরুণ শীল খিঁচিয়ে উঠলো, 'এর মধ্যে আর নতুনত্বর কী আছে? পয়সা হলেই অমন ধরাকে সরাজ্ঞান হয়ে থাকে।'

'জানি', নিখিল একটা পোড়া দেশলাই কাঠি দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে আমেজি

গলায় বলে, 'গোড়ায় গোড়ায় মেনে নিয়েছিলাম সেটা। আমার পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ওনারও ক্রমোন্নতি হচ্ছিল, দেখছিলাম ড্যাবডেবিয়ে, কিন্তু বম্বে গিয়ে, সেই ওয়েল ফার্নিশ্‌ড্‌ বাড়িঝাড়ি দেখে, আর অন্য সব ধনপতিদের গিন্নীদের সঙ্গে বাৎ চিৎ করতে পেয়ে টেয়ে যেন সাপের পা দেখলো ভাই! শুঁয়ো পোকা পাখনা মেলে প্রজাপতি হয়ে উড়তে শিখলো। কোটিপতি 'চাঁদ ব্রাদার'দের বাড়ির মেয়েদের মতো সাজ করতে ইচ্ছে হয়, নিজেকে তাদের দরে ভাবতে ইচ্ছে হয়, দেখে দেখে লজ্জায় মারা যাই।'

'এটা তোর শুচিবাই! মেয়েরা অমন আন্‌ব্যালেন্সড হয়েই থাকে।' বললো বিজয় বোস।

'জানি। তাও জানি হয়েই থাকে।' নিখিল হাতের কাঠিটা ও কান থেকে এ কানে এনে বলে, 'তাই নীরবেই দেখে যাচ্ছিলাম। মায়ে মেয়েয় একসঙ্গে স্ল্যাকস্‌ পরে বেড়াতে যাচ্ছো? যাও। ছ'-গিয়ে কাপড়ে ব্লাউজ বানাচ্ছ? বানাও। নখে মুখে রং লাগাচ্ছ, লাগাও। ভুরুটাকে আমাদের দাড়ি গোঁফের মত স্রেফ চেঁচে উড়িয়ে দিয়ে তুলি দিয়ে ভুরু আঁকছ, আঁক, স্থানীয় মহিলাদের মত, রাস্তায় দাঁড়িয়ে হি হি করে ফুচকা খাও, ধোঁয়া ছেড়ে ছেড়ে সিগারেট খাও—'

'এই ধ্যেৎ! বড্ড রং চড়ানো হচ্ছে না?'

'হচ্ছে না রে ভাই, হচ্ছে না। যা বলছি সব সত্যি। তবু তো শেষটা বলতেই দিলি না। যাক্‌ বুঝে নে। বারণ করতে গেলে আমাকে স্রেফ নস্যাৎ করে ছাড়ে! ...আমি গাঁইয়া, আমি বুনো, আমি সেকেলে, আমার চালচলন দেখলে না কি তার মাথা কাটা যায়। মিসেস থাপা, মিসেস চেটিনা, আর মিসেস ব্যানার্জি নাকি অবাক হয়ে ওকে প্রশ্ন করেন, 'এতদিনেও আপনি ওকে মানুষ করে তুলতে পারলেন না?...' একা নিজেই নয়, মেয়েও দোসর।...মেয়েরও না কি ওর বন্ধুদের সামনে আমাকে বার করতে লজ্জা করে। আমি হাঁটু দোলাই, আমি মুখে রুমাল চাপা না দিয়েই কাসি, আরো কত সব 'অদ্ভুত কাণ্ড' নাকি করি।...ছেড়েই দিতাম, ভাবতাম মরগে যা মায়ে মেয়েয়, লোকে তোদের দেখেই হাসে।...কিন্তু সব জিনিসই কি উড়িয়ে দেওয়া যায়?'

নিখিলের সেই এলিয়ে বসে কৌতুকের গলায় কথা বলার চেহারাটা হঠাৎ যেন বদলে যায়। নিখিল সোজা হয়ে বসে, বলে ওঠে, 'আমারই মাথার ঘাম পায়ে ফেলা রোজগারের টাকা মায়ে ঝিয়ে চারখানা হাতে মুঠো মুঠো উড়িয়ে ছড়িয়ে, আমার রুচির ওপর হাতুড়ি মেরে মেরে ওঁদের আদর্শ 'সমাজে'র একজন হচ্ছেন,......যখন তখন পার্টি দেওয়া হচ্ছে, পিকনিকে যাওয়া হচ্ছে, এবং যে সব মোদো মাতাল চরিত্রহীন লোক-গুলোকে দেখলে বিষ ওঠে, সেইগুলোকে আদর করে বাড়িতে ডাকা হচ্ছে কেবলমাত্র তারা 'বড় লোক' এই গুণে।...আমার বৌ মেয়ে তাদের সঙ্গে হি হি করবে, এবং আমি পরম আহ্লাদে সেই পার্টিতে যোগ না দিলে, তারা চলে যাবার পর বৌ আমাকে তুলোধোনা ধুনবে। এই সব বরদাস্ত করে চলেছি—।'

'এগুলো তুমি 'চেক্' করতে পারতে'—বললো কটকটে বরুণ শীল।

'পারতাম না!' নিখিল গম্ভীরভাবে বলে, 'ব্রেক্ খারাপ হয়ে যাওয়া গাড়ীকে চেক্ করা যায় না!……কলকাতায় থাকতে দেখেছি মাঝে মাঝে ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডী কী সব করতো টরতো, ওখানে গিয়ে সব ছেড়ে দিল। আমার মা একবার কোথাকার যেন ঠাকুরের ফুল যত্ন করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন চিঠির খামে ভরে, ফেলে দিয়ে হি-হি করে হেসে বললো, 'মহিলাটি যে এখনো কোন যুগে আছেন!'…কেন? কেন? এ-সব হবে কেন? পয়সা হলে যদি এ-সব হতে হয়, পয়সাটাই যাক্, এই আমার সিদ্ধান্ত।… মেয়েটা সুদ্ধু কী ধিঙ্গী হয়ে উঠেছিল জানিস? আমার মাকে আমি চিঠি দিচ্ছি, হি-হি করে বলে কিনা, 'ও মা-মণি দেখে যাও, বাপী বাপীর মাকে চিঠি লিখতে বসে চিঠির ওপর চীনে ভাষায় কী লিখছে। 'ও' আর 'অনুস্বর', কী হয় মা? জানো?'

কথাটা হাসিরই, হেসেও ফেলে সবাই। শুধু নিখিল হাসে না। নিখিল, বলে, 'তোরা বললি মশা মারতে কামান, কিন্তু আমি বুঝেছিলাম কামান ভিন্ন উপায় নেই। আমার হাতে ওই একটি ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নেই।…আমি প্রতি বিষয়েই অন্ধ। আমি লোক-সমাজের কাছে অন্ধ, আমি চাকর-বাকরের সামনে কেলেঙ্কারীর ভয়ে অন্ধ, আমি শান্তিপ্রিয়তার কাছে অন্ধ। আমার স্ত্রী এটি বুঝে ফেলেছিল। আর বুঝে ফেলেছিল সব ঘাটির চাবি নিজের হাতে রাখতে হয়। ওর পৃষ্ঠবল ওর 'সমাজ', ওর পৃষ্ঠবল ওর মেয়ে, ওর পৃষ্ঠবল আমার টাকা। আমার কোন পৃষ্ঠবল নেই। আমি একা। আমার বাড়িতে আমার কোনো অধিকার নেই! আমার বিধবা মা, যিনি কতো দুঃখে আমায় মানুষ করেছেন, আমার সেই মানুষ হয়ে ওঠার আশায় দিন গুনেছেন, তাঁকে আমার বাড়িতে এনে রাখার উপায় নেই। রাখার প্রশ্নই নেই। স্বচ্ছন্দে বলে দিলো, 'মা এসে থাকবেন? এইখানে? তোমার মার সেই গোবর গঙ্গাজলের ব্যাপারটি এখানে কোথায় হবে শুনি? আমার কিচেনে খেতে পারেন তো থাকুন এসে।'

'যাঃ! তুই মামলা জিততে নিজের স্বপক্ষে মিথ্যে সাক্ষী খাড়া করছিস।'

'মিথ্যে হলে আমার চাইতে বেশী খুশি কেউ হতো না বিজয়, কিন্তু দিস ইজ ফ্যাক্ট! অথচ ওর দিকের গুষ্টির কারো বসে বেড়ানো বাকি থাকলো না এই ক'বছরে, যেহেতু তাদের ওর কিচেনে ভর্তি করা যায়।'

'আজকাল ওই রকমই হয়েছে রে ভাই,' বিভূতি বোস বলে, 'দেখছি তো চারদিকে।'

'দেখার চোখ সবাইয়ের সমান নয় বিভূতি', নিখিল বলে, 'বললে বিশ্বাস করবি, মা সেবার কাদের সঙ্গে যেন তীর্থে বেরিয়ে দ্বারকা ফেরৎ আমার ওখানে উঠলেন আমায় দেখতে, পুরো তিনটি দিন মা শুধু ফল খেয়ে কাটিয়ে দিলেন। বললো কী জানিস, 'তুমি এমন করছো যেন জগতে এমন ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। বিধবারা তো ফলটল খেয়ে থাকেই কতো সময়।'…অথচ মা আসবেন বলে একগাদা নতুন বাসন পর্যন্ত কিনে এনেছিলাম। কিন্তু ব্যবস্থাটা তো ওর হাতে!'

'অসুবিধেটা তো ওইখানেই—' মৃণাল বলে, 'আমরা যে ওদের হাতে—'

'আমিও তাই ভাবতাম।' নিখিল বলে, 'হঠাৎ একটা বন্ধ দরজা খুলে গেল। দেখলাম রাজ্য সরকারের ওপর আছে কেন্দ্রীয় সরকার। অবস্থা বুঝলে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায়। ...কিন্তু সাধ্যপক্ষে সে ক্ষমতা কে চায় প্রয়োগ করতে? অবস্থা তাই চরমে পৌঁছয়। আমার মা শুচিবাই বিধবা, আমার বোন তো তা নয়? ওর ছোট মেয়েটা ভুগছে শুনে আমার কাছে আনতে চেয়েছিলাম, সাতশো অসুবিধের ফিরিস্তি শুনিয়ে চিঠির কাগজ কেড়ে নিয়ে বললো, 'আমি লিখে দেব অখন গুছিয়ে গাছিয়ে!'

'বল, বল তোরা এই জন্যেই কী আমি 'অনেক টাকা' রোজগার করতে চেয়েছিলাম? হ্যাঁ, ওইটাই আমার আ-শৈশবের স্বপ্ন ছিল। অনেক টাকা রোজগার করবো।...করেওছি অনেক, বলতে কি আশাতীত। কিন্তু সে কী মাতাল থাপা, কোটলা, আর ব্যানার্জিকে বাড়িতে ডেকে ডেকে নেমন্তন্ন খাওয়ানোর জন্যে? আর সেই নেমন্তন্নর সুবিধের জন্যে আড়াইশো টাকা মাইনের গোয়ানিজ কুক্ রাখবার জন্যে?'

"আড়াইশো!'

'আড়াইশো!'

অনেকগুলো গলা থেকে ওই একটা শব্দই উচ্চারিত হয়। আর কোনো কথা বোধহয় চট করে জোগায় না কারো মুখে।

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা ক্ষুব্ধস্বর আছড়ে পড়ে, 'হ্যাঁ, আড়াইশো টাকা। চাল ফলাচ্ছি না ভাই, সত্যি।...তাও শুনলাম—খুব নাকি সস্তায় পাওয়া গেছে। ওই পুংদ্রৌপদী যা রান্না জানে, তাতে নাকি হোটেলে টোটেলে ওর চারগুণ মাইনে পেতে পারতো ও। হতে পারে, অসম্ভব নয়। কিন্তু বলতে পারিস, সে লোক আমার সংসারে কেন? আমায় বাবা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ছোট ভাইকে মানুষ করে মাত্র আড়াইশো টাকায় সংসার চালিয়ে গেছেন। আমার কাকা—যিনি বাবা মারা যাবার পর আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন, তিনি এখনও তিনশোটি টাকার জন্যে ভাঙা শরীর নিয়ে বদ্যিবাটি থেকে কলকাতা ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে মরছেন, আর আমার রাঁধুনীর মাইনে আড়াইশো। অথচ আমি শালা হাইপ্রেসার আর ডায়বিটিসের রুগী, খাই শুধু দুবেলা দুখানা করে শুকনো' রুটি আর আলুনি-আঝালি একটা স্ট্যু।...এই প্রশ্ন তুলেছিলাম বলে আমায় শুধু রাস্তা থেকে ধুলো কুড়িয়ে গায়ে দিতে বাকি রেখেছিল। বলে, 'বোকার মতো কথা বোলো না, ওরকম একটা কুক্ থাকা বাড়ি গাড়ি থাকার মতোই প্রেসটিজ।'...ওঁর যতো বান্ধবী, মিসেস কোটলা, মিসেস থাপা, মিসেস বাটলী-ওয়ালা, আর মিসেস ব্যানার্জির দল নাকি ওই 'কুক্-গৌরবে গৌরবান্বিতা' আমার মিসেসকে ঈর্ষ্যা করছে। বলছে, 'ভাঙিয়ে নেবো'। আমার মিসেস নাকি কেবলমাত্র তোয়াজের জোরে লোকটাকে টিঁকিয়ে রেখেছেন। হ্যাঁ, তোয়াজ উনি ওদের করেন বৈকি। তোয়াজ, সমীহ। ম্যাড্রাসী আয়াটাকে যা সমীহ করেন ভদ্রমহিলা তার দশ ভাগের একভাগ আমার মা-কাকীমা পেলে ধন্য হয়ে যেতেন।'

সবই সহ্য করে যাচ্ছিলাম, পড়ে মার খাচ্ছিলাম নিজের সংসারে চোর, নিজের বাড়িতে অনধিকারী, নিজের স্ত্রী-কন্যার কাছে অবজ্ঞেয়—'

'অবজ্ঞেয়! থেকে থেকে তুই তো ভারী গোলমেলে এক-একটা কথা বলছিস নিখিল। অবজ্ঞাটা আসছে কোথা থেকে?'

"কেন ওদের কালচার থেকে।'

নিখিল হঠাৎ তক্তপোষ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে খানিকটা হেঁটে গিয়ে বলে, 'ওই উচ্চ কালচার-সম্পন্ন মহিলাটি আর তাঁর চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়েটি অহরহই আমায় বলছেন 'বোকার মতো কথা বোলো না'। আমার গাঁইয়ামি আর বোকামীর জন্যেই না কি সমাজের যে স্তরে ওদের পৌঁছবার কথা, সে স্তরে উঠতে পারেন নি।...সেই আক্ষেপে মরে ছিলেন, আর ভেবেছিলেন হেস্ত-নেস্ত করে ছাড়বেন।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'সেই সমাজটা কাদের?'

উত্তরে হাসির ছুরিতে আমায় ফালাফালা করে বলেছিল 'তা বটে! আমার আসল সমাজ যে তোমার ওই বস্তিবাটির গুষ্টির, তোমার ওই রানাঘাটের মাসীর, শিবপুরের পিসির, সে কথাটা মনে ছিল না। কিন্তু কী করবো বল, আমার ক্ষমতা নেই তোমার ওই বস্তিবাটির গুষ্টির সঙ্গে সমাজবদ্ধ হয়ে সম্পর্ক বজায় রাখবার।'...এই কথাগুলো আমায় শুনে যেতে হবে। দিনের পর দিন। কারণ? কারণ আমি শালা মুখে রক্ত উঠিয়ে রূপোর রথ কিনে চড়িয়ে সেই ওঁর স্বর্গ অর্থ কাম মোক্ষ সমাজটির দরজায় পৌঁছে দিয়েছি।'

নিখিলের কথাগুলো উপভোগ্য, ওর বন্ধুরাও করছিল উপভোগ, কিন্তু যখনি স্মরণে আনছিল বৌকে জব্দ করবার জন্যে নিখিল তিন হাজারি চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে—তখনই উপভোগের রস ফিকে হয়ে আসছিল।

নিখিল ওদের একটা বলভরসা, নিখিল ওদের তরুণ সঙ্ঘের গৌরব। ভেবেছিল, রজত-জয়ন্তীর ছুতোয় নিখিলের হৃদয়ে কিছু প্রেরণা জাগিয়ে দিয়ে ক্লাবের ঘরটাকে সংস্কার করিয়ে নেবে, সে গুড়ে বালি পড়লো।

অথচ দুর্ভাগ্য নয়, স্রেফ দুর্মতি।

বরুণ শীল চড়া গলায় বলে, 'সেই রূপোর রথে তুমি নিজেও চড়েছো।'

'চড়িনি, টেনেছি।' উদাস উদাস স্বরে বললো নিখিল, 'ছপ্‌টি খেয়ে টেনে নিয়ে গেছি। ...এদিক ওদিক তাকাবার সুযোগ পাই নি। আমার মা যখন লিখেছেন, 'অনেকদিন তোমায় দেখি নি', আমি তখন প্লেনে চড়ে সস্ত্রীক কাশ্মীরে বেড়াতে চলে গেছি। যেদিন খবর পেয়েছি আমার বোনের রুগ্ন মেয়েটা মারা গেছে, সেদিন আমার বাড়িতে রাজকীয় পার্টি বসিয়েছি—।'

এই মুহূর্তে নিখিল আর তিন হাজারি নয়, নিখিল এখন বেকারের খাতায় নাম লিখিয়েছে। তাই রেগে যাওয়া বন্ধু বিনা কুণ্ঠায় বলে, 'তা তুমি যদি এত স্ত্রৈণ হও, হবেই তো এসব।'

নিখিল রাগে না, নিখিল গম্ভীর হাসি হেসে বলে 'লোকে তাই বলছে বটে, আমার স্ত্রীও

সেই অহঙ্কারেই বোধহয় রথের দড়ি নাকে পরিয়ে চড়ে বসেছিল। কিন্তু ভাই-রে, যারা একটু শান্তিপ্রিয়, তারাই জানে কতোখানি দাম দিয়ে ওই শান্তিটা কিনতে হয়।'

'কিন্তু এখন? এখন কী হলো?'

নিখিল এতোক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল, আবার বসে পড়ে হাঁটু নাচাতে নাচাতে বলে, 'এখন হঠাৎ টের পেয়ে গেলাম 'শান্তি' ভেবে যেটাকে অনেক দাম দিয়ে কিনেছিলাম, সেটা স্রেফ্ একটা বিষ গাছের চারা। তাকেই বাড়াচ্ছিলাম বসে বসে। টের পেয়ে আর ঠকি? নাক থেকে দড়ি ছাড়িয়ে নিয়ে দিলাম রথখানা সুদ্ধু উল্টে। নে, এখন কিসে চড়ে অহঙ্কার করবি কর। ...তবু শেষ ডিসিশান নিয়েছিলাম কেন জানিস? দেখতে পাচ্ছিলাম চোখের সামনে মেয়েটা সুদ্ধু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। রাতদিন আমায় নিয়ে হি-হি করছে, আমি গাঁইয়া, আমি ভূত, আমি সভ্য সমাজে অচল। অবাক হয়ে ভাবি ভাই, একবার খেয়ালে আনে না—এই আনকালচার্ড লোকটার ক্যাপাসিটির বৃক্ষেই তোদের কালচারের ফুল ফুটছে। তোদের কালচার কি আমাদের মা-ঠাকুরমার কালচারের মতো নিজস্ব? তোদের তো পয়সা দিয়ে কেনা কালচার। আমার যতো রোজগার বাড়বে, তোদের ততো কালচার বাড়বে।... খেয়াল করে না, খুব বুদ্ধিধারী তো? তাই গাছের যে ডালে বসেছে, সেই ডালেরই গোড়ায় কোপ্ দিয়েছে। ...ভোগ এখন তার ফল। যা কতোদিন বাপের বাড়ি থাকতে পারিস থাকগে যা। আমার বাড়িতে আসতে চাইলেই স্রেফ্ বস্তিবাটি দেখিয়ে দেবো। বাপ তো ওই বস্তিবাটি দেখেই বিয়ে দিয়েছিলো।'

কথাগুলো প্রণিধানযোগ্য।

তবু নিখিলের দিকে ভোট পড়ে না।

কটকটে বরুণ শীলই শুধু নয়, সকলেই বলে ওঠে, 'যতোই যা বলো ভাই, আমরা কিন্তু বলবো, এ তোমার হলো সেই নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ।'

'হয়তো তাই—' হঠাৎ আচমকা একটা জোর হাসি হেসে নিখিল বলে ওঠে, 'তবু যাত্রাভঙ্গটা তো হলো? প্রায় দুর্যোধনের উরুভঙ্গের মতোই হলো। একদিনে তেলামুখ একবারে ঝোলা। দেখুক এখন—'নিরুপায়ের পার্ট প্লে করতে কেমন লাগে। সাধের সংসারটি আর সেই ওনার সোনার সমাজটি ত্যাগ করে চলে আসবার সময় যা একখানি চেহারা হয়েছিল! উঃ, ওতেই আমার সব দাম উসুল হয়ে গেছে।'

'দূর! দূর! তোর কোন যুক্তিই কাজের নয়। বৌকে জব্দ করতে তোর জীবনটা তুই ছত্রখান করে ফেললি!'

নিখিল গম্ভীর। একটু হেসে শান্ত গলায় বলে, 'সবাই ওই কথাই বলছে বটে। এমন কি আমার নিজের মা-ও। কিন্তু ভেবে ভেবে তো ঠিক করতে পারছি না তোদের কথাই সত্যি কিনা। ভেবেই মরছি সেই অবধি ঐ জীবনটা কী 'আমার' ছিল?'

জানা ছিলনা

বাইরে থেকে ফিরে বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো অসীমা। অতএব বিরামও।

'কুকুর হইতে সাবধান' মার্কা বাড়ির গেটের সামনে এসে আগন্তুক অতিথি যে মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, অসীমার মুখে সেই ছাপ। অন্ততঃ বিরামের হঠাৎ তাই মনে হলো।

এরকম একটা বিশ্রী তুলনা মনে আসার জন্যে খুব খারাপ লাগলো বিরামের। নিজের উপর রাগ হলো। কিন্তু মনে আসার ওপর তো হাত নেই।

দাঁড়িয়ে পড়ে অসীমা বললো, 'তুমি আগে ঢুকে দেখো—'

বিরামের হাতে কতকগুলো প্যাকেট ছিল, কিছু জামাটামার, কিছু স্টেশনারি; তা ছাড়া বড়ো একটা কি যেন। অসীমা সেগুলো নেবার জন্যে হাত বাড়ালো। যেন বিরামকে একটা শক্ত কাজে পাঠাচ্ছে বলে, তাকে ভারমুক্ত করতে চাইছে।

কিন্তু অসীমার ভঙ্গীতে দরদের চিহ্ন নেই। বরং যেন আক্রোশ-আক্রোশ ভাব।

বিরাম প্যাকেটগুলো অসীমাকে দিলো না, হাতে ধরে রেখেই দোতলার জানলার দিকে তাকালো, তারপর বললো, 'কই জানলায় তো দেখছি না। বোধ হয় বেরিয়ে গেছেন।'

কথাটা বলেই অবশ্য নিজের কানে খুব বেখাপ্পা লাগলো বিরামের। নিজেকে ভীষণ বোকাটে লাগলো। তা অসীমাও এ সুযোগ ছাড়লো না, অসীমা একটু তিক্ত হাসি হাসলো। বিরামের এই বেখাপ্পা কথাটা যে কতো বোকাটে বেখাপ্পা, সেটা প্রমাণিত করবার জন্যেই যেন খুব কেটে কেটে বললো, 'আমরা বাড়ি নেই, আর উনি বেরিয়ে গেছেন? হাসালে!'

বিরামের আর একবার খুব রাগ হলো নিজের ওপর, এবং অসীমার ওপরও। বিরক্ত গলায় বললো, 'জানলায় দেখলাম না তাই বলা হচ্ছে।'

'জানলায় নেই, সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। জানলা থেকে দেখে নিয়েছেন বোধ হয়।'

মন্তব্যটা বিরামের বাবার সম্পর্কে, অতএব বিরামের পক্ষে ততটা শ্রুতি সুখকর নয়। অথচ প্রতিবাদেরও মুখ নেই। কারণ ওই স্বভাব জীবনরামের।

বিরামরা কোথাও বেরোলে আর নড়বেন না বাড়ি থেকে। যেন ওঁকে কেউ এই বাড়ি পাহারা দেবার চাকরীতে বহাল করেছে। যেন উনি যখন আসেননি, এদের সব কিছু চুরি-ডাকাতি হয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু মুখের ওপর তো বলা যায় না সেটা।

অতএব ওরা ফিরলে জীবনরাম যখন 'যেন এতোক্ষণে ছুটি পেলাম' ভাবে বলেন, 'যাক তোমরা তো এসে গেলে, এবার আমি একটু বেরোই? বিকেল থেকে এই চাপার মধ্যে

বসে থেকে দমটা আটকে আসছে।' তখন শুধু বিস্ময় প্রকাশ করে বলতে হয়, 'কী আশ্চর্য! আপনি বেরোননি কেন? আমরা তো এসেই যাবো-এখুনি।"

'এখনি এসে যাবে, কি রাত দশটায় আসবে, তার তো ঠিক নেই।' জীবনরাম ঝিনুকের বোতাম বসানো টুইল শার্টটি গায়ে দিতে দিতে বলেন, 'বাইরে বেরোলে তো তোমাদের সময়ের জ্ঞান থাকে না। অথচ দু'জনের হাতে দু' দুটো ঘড়ি বাঁধা।'

অসীমা কথা বলে না।

অসীমার রাগে হাড় জ্বলে যায়।

অসীমা যখন তখনই বিরামের কাছে বলে, 'একদিন কিন্তু আমি শুনিয়ে দেবো তা বলে দিচ্ছি। আচ্ছা করে শুনিয়ে দেবো।'

শুনিয়ে দেবার ইচ্ছে বিরামেরও যে না হয় তা নয়, মাঝে মাঝেই ইচ্ছে হয় ওর, জোরে জোরে বলে ওঠে, 'এটাই আমাদের পদ্ধতি, বুঝলেন, এইভাবেই এযাবৎ চালিয়ে এসেছি আমরা। আপনি ছিলেন না বলেই যে আমরা অনাথ হয়ে পড়েছিলাম তা নয়। আমাদের সব কিছু চুরি যায়নি, আমাদের বাচ্চাগুলোকেও কেউ ডাকাতি করে নিয়ে যায়নি। আমার কাছেই থাকে ওরা। ভালই থাকে।'

হয় এমন ইচ্ছে।

কিন্তু অসীমা যখন তেমন ইচ্ছে প্রকাশ করে, তখন বিরামের মুখটা কালো কালো আর গম্ভীর গম্ভীর হয়ে যায়।

তখন বিরাম বলে, 'ইচ্ছে হয় শোনাবে। তা সেটা আমায় শোনাতে এসেছ কেন?'

বিরাম জানে অসীমা তাকেই শোনাবে, সত্যি সত্যি জীবনরামকে শোনাতে যাবে না, তবু ওইভাবেই বলে।

কিন্তু শুধু ওইটুকু অপরাধের জন্যেই কি জীবনরাম সম্বন্ধে ওদের মন এতো ভার? ওইটুকুর জন্যে বাইরে থেকে বেড়িয়ে ফিরে দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ে কুকুর হইতে সাবধান থাকা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ার মতো মুখ করে? আর ওইটুকুর জন্যেই ওদের দু'জনেরই ইচ্ছে হয় একজন পূজনীয় গুরুজনকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দেবার? ছেলে-বৌ বেড়িয়ে ফিরতে রাত করলে কর্তা হিসেবে একটু বিরক্তি প্রকাশ করেন বলে?

না, ওকথা বললে জীবনরামের ছেলে-বৌয়ের প্রতি অবিচার করা হয়। তা নয়। ওটুকু জীবনরামের 'অপরাধ গ্রন্থের' মলাট মাত্র। গ্রন্থমধ্যের বিষয়বস্তুটিই অসহ্য। পরম অসহ্য!

জীবনরামের শুধু যে ছেলের সংসারের গৃহরক্ষকের পদটিই স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছেন তা নয়, ছেলে-বৌয়ের অপব্যয়ের হিসাব রক্ষার দায়টিও কাঁধে তুলে নিয়েছেন তিনি স্বেচ্ছায় আনন্দে।

জীবনরাম সেই হিসাবটি মিলোন আর মুহুর্মুহুঃ শিহরিত হন। জীবনরামের ছেলের, যে জীবনরাম জীবনে কখনো শার্টের উপর কোট পরলেন না, তাঁর ছেলের এতো অপব্যয়।

সহ্য হয় না।

অতএব বিরাম আর অসীমাকেও অহরহই একটা অসহ্য অবস্থার মধ্যে থাকতে হচ্ছে। সেটা হচ্ছে অহরহ একটি তীব্র তীক্ষ্ণ সমালোচনার মুখে পড়বার ভয়ে সশঙ্কিত থাকা।

কিছু কেনাকাটা করে বাড়ি ঢোকবার জো নেই বেচারাদের! সুখ নেই প্রয়োজন মতো অথবা শখমতো জিনিসটি কিনে এনে ঘরে তোলার।

জীবনরাম সিঁড়ির মুখের কাছেই মুখিয়ে থাকেন। আর ওদের হাতে বাক্স প্যাকেট দেখলেই বলে ওঠেন, 'কী? আবার আজ সওদা? আজ কী এলো? শাড়ি? জামা? জুতো? পর্দা? বেডকভার? ফ্রক? তোয়ালে? এসব বুঝি তোমাদের রোজই কিনতে লাগে? রোজই ফুরোয় আলু পটলের মতো?'

অবশ্যই জীবনরাম যেগুলোর নাম উচ্চারণ করেন, সেগুলো রোজ ফুরোয় না, এবং রোজ আসেও না, কিন্তু জীবনরামের বলার ভঙ্গীই ওইরকম। যে ভঙ্গী হাড় জ্বলে ওঠার পক্ষে রীতিমত সাহায্য করে।

অসীমা সেই জ্বলা জ্বলা হাড় নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে চায়, কিন্তু বিরামের ভয়ে পারে না। জানে ওভাবে চলে এলে বিরাম ঠিক ভাববে ওর বাবাকে অপমান করা হলো। আর বিরামের মুখটা কালো কালো আর গম্ভীর হয়ে যাবে। অতএব অসীমার স্থান ত্যাগ করা হয় না, বরং হাতের জিনিসগুলোকে দড়ির বাঁধন রবার ব্যাণ্ডের বাঁধন অথবা বো-স্ট্রীচের বাঁধন থেকে মুক্ত করে বিস্তার করে ধরতে হয়। কারণ জীবনরাম তো ওগুলো না দেখে ঘরে তুলতে দেন না। আর ইতিমধ্যে বিরামও খোকার মতো গলায় বলে ওঠে, 'বাঃ ওসব কেন? অন্য জিনিস আনলাম! সর্বদাই তো কতো কী দরকার!'

'তোমাদের দরকারের মাত্রাটা একটু বেশী।' জীবনরাম তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'দেখছি কিনা! তিনটে বাচ্চার তেরো জোড়া জুতো! এক একজনের চার পাঁচ জোড়া করে। জামার ওপর জামা। খাতা পেনসিল, রবার শেলেট তো গড়াগড়ি যাচ্ছে সারা বাড়িতে। ...মালক্ষ্মী ঘরে এলেই তাঁকে দূর দূর করে তাড়াতে হবে! এ দুর্মতি যে তোদের কে দিল, তা জানি না।'

'তা জানি না' বললেও জীবনরাম এমনভাবে একজনের মুখের দিকে তাকান যে, বুঝতে বাকি থাকে না জানেন তিনি।

বিরামও আড়চোখে সেই মুখের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলে, 'তা আপনি তাহলে একটু হাওয়ায় ঘুরেই আসুন।'

কিন্তু জীবনরামের তখন দায় পড়েছে এইসব বাক্স প্যাকেট ছেড়ে মাথায় হাওয়া লাগাতে যাবার। একটি একটি করে তুলে ধরে প্রশ্ন করতে হবে না 'বারোমাস তোদের ছেলেরা এইরকম দামী দামী তোয়ালে ব্যাভার করে? আমরা তো জানি এসব তোয়ালে

বিয়েটিয়েতে তত্ত্ব দেবার! কতো করে নিলো?…সেলাইকল তো রয়েছে দেখছি, ছেলেদের পায়জামা টায়জামাগুলো বাড়িতে বানানো যায় না? বাক্সয় কি? ফ্রক? এই সেদিন চিনুর জন্যে দু' দুটো ভালো ভালো ফ্রক এনেছিলে না? কতো দাম জামাটার?'

প্রশ্ন করে চললেও জিনিসের গায়ে আঁটা দামের টিকিটগুলোই জীবনরামকে উত্তর যোগায়। সেই টিকিট উল্টেই জীবনরাম শিহরিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'ছাব্বিশ টাকা? একটা ছ' বছরের মেয়ের ফ্রকের দাম ছাব্বিশ টাকা? তোমরা কি পাগল হয়ে গেলে বৌমা?'

বৌমা অসৌজন্য করে না। শুধু বলে, 'পাগল তো আমি একা হইনি বাবা, দেশ-সুদ্ধ লোকই হয়েছে। ছাব্বিশ কেন, চিনুর গায়ের মতো ফ্রক ছিয়ানব্বুই টাকাও আছে।'

'আছে?' জীবনরাম ব্যঙ্গের গলায় বলেন, 'তা সেটাই কিনে আনলে না কেন?'

'সাধ্যে কুলোলে কিনতাম।'

বলে হয়তো ঘরে ঢুকে যায় অসীমা।

বিরামকেই আবার জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে তুলতে হয়।

জীবনরাম অবশ্য তখনকার মতো অপমান বোধ করেন, কিন্তু জীবনরাম স্বভাবটা ত্যাগ করতে পারেন না। আবার পরবর্তী দৃশ্যেই দেখা যায়, জীবনরাম সাবানের প্যাকেটটি পর্যন্ত হাতে করে বলছেন, 'কতো করে দাম সাবানগুলোর?' বলছেন, 'ওবাবা কচি কচি ছেলেদের আবার জনে জনে আলাদা টুথপেস্ট, টুথব্রাশ! ব্রাশের আবার বাহার কতো! দামও তেমনি নিশ্চয়! মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পয়সা, এইভাবে হরিরলুঠ দিতে গা করকর করে না বাবা!'

প্রথম প্রথম হাসি পেতো ওঁদের, কিন্তু ক্রমশঃ আর ব্যাপারটা হাসির পর্যায়ে থাকছে না। কার ভালো লাগে, কেনাকাটা করে আনলেই সমালোচনার মুখে পড়তে!

দামের টিকিট দেখে মুহুর্মুহুঃ কম্পিত শিহরিত বিচলিত হয়ে শেষ অবধি তো শুরু হয়ে যাবে তুলনামূলক সমালোচনা। ওটাই আসল। ওটাই জীবনরামের সর্বাপেক্ষা প্রিয় প্রসঙ্গ। নাতি-নাতনীদের পড়ার সময় তাদের টেবিলের ধারে গিয়ে বসে পড়ে জমিয়ে গল্প জুড়ে দেন জীবনরাম, আগে এসব জিনিসের দাম কতো ছিল।

'মোজার দাম দু' টাকা! দু' টাকা জোড়া মোজা পরছিস তোরা! অথচ আগে চার আনা ছ' আনা জোড়া মোজা কিনেছি আমরা বাচ্চাদের জন্যে। তোদের ঠাকমার আবার খুব পরিপাটি ছিল তো? ছেলেদের জুতো চাই, মোজা চাই। জুতো বড়োজোর দেড় টাকা। হাসছিস যে? বিশ্বাস হচ্ছে না? ছিল রে ছিল, ভালো ভালো জুতোই ছিল দেড় টাকা দু' টাকা করে!…আর তোরা? দশ বছরের ছেলে উনিশ টাকা জোড়া জুতো পরছিস! তাই কি এক জোড়া? দু' চার রকমের দু'চার জোড়া গড়াগড়ি যাচ্ছে! এসব হচ্ছে বিলাসিতা। বুঝলে?'

অন্য সময় হলে অবশ্যই জীবনরামের ছয়, আট আর দশ বছরের নাতি নাতনী এ প্রসঙ্গে কর্ণপাত করতো না; কিন্তু এখন হাঁ করে শোনে। কারণ সামনে বই খাতা।

অসীমা নিজের ঘর থেকে বলে, 'ওই দেখো। কতো চেষ্টায় তিনটেকে গুছিয়ে গাছিয়ে পড়তে বসালাম, হয়ে গেল! এখন উনিশশো উনতিরিশ সালে এক আনায় ক'খানা খাতা পাওয়া যেতো সেই জ্ঞান সঞ্চয় হচ্ছে।'

বিরাম বিপন্নের গলায় বলে, 'কী আর করা যাবে! দু' দিনের জন্যে—'

হ্যাঁ শুধু এইটুকু ভেবেই বিরাম যতোটা পারে সমীহ করে চলতে চায় বাবাকে। এইটুকু ভেবেই অসীমাকে সহ্য করতে পারার শিক্ষাটা দিতে যায়।

কিন্তু দু' দিনের জন্যে কেন?

জীবনরাম তবে থাকেন কোথায়?

থাকেন জীবনরাম গ্রামের বাড়িতে। মানে স্ত্রী-বিয়োগ এবং চাকরীতে অবসর একযোগে এই দুটো ভয়ঙ্কর ঘটনার যোগাযোগ ঘটায় জীবনরাম 'কলকাতায় আর মন টেঁকছে না' বলে কিছুদিনের জন্যে গিয়েছিলেন গ্রামের বাড়িতে। কিন্তু গিয়ে যেন একেবারে গুড়ের কলসীতে মাছির মতো আটকে গেলেন। শেকড় গেড়ে ফেললেন ধানচালের মধ্যে। জমিজমা ছিল কিছু আইনে বে-আইনে। জীবনরামের বাপ-কাকা ওর মধ্যেই নিমগ্ন ছিলেন। জীবনরামই ওই ধানচালকে নেহাৎ তুচ্ছজ্ঞান করে সরকারী চাকরীটিকে পরম আশ্রয় বলে আঁকড়ে ধরে কলকাতাতেই জীবন কাটিয়েছেন।

গ্রামে এসেছিলেন নেহাৎই মনটা একটু পরিবর্তনের আশায়, কিন্তু পরিবর্তনটা বেশ ঘোরতরই হয়ে গেল। কারণ, গিয়ে দেখলেন এই দীর্ঘকাল ধরে তিনি নিজের ধন দিয়ে জ্ঞাতিভোজন করিয়েছেন।

কাকার ছেলেরা সব কিছু গ্রাস করে বসে আছেন।

দেখেশুনে নিজেদের গালে মুখে চড়িয়ে মামলা ঠুকলেন জীবনরাম কাকার ছেলেদের নামে, তদবধি রয়েই গেলেন সেখানে। রয়ে গেলেন, কারণ দেখলেন মামলা জিনিসটা স্ত্রীর চাইতে বেশী বৈ কম নেশার নয়। কোন ফাঁকে হৃদয়ের সব শূন্যতা পূর্ণ করে দিয়ে নিরুদ্যম চিত্তকে দিয়েছে উদ্যম। যে জীবনরাম কলকাতায় কখনো দু' মাইল হাঁটেননি, তিনি চার পাঁচ মাইল হেঁটে উকিলবাড়ি যাওয়া-আসা করতে অভ্যস্ত হয়ে গেলেন।

তা চলছিল ভালই।

জীবনরামের এবং বিরামেরও।

ওদিকে জীবনরাম শত্রুপক্ষ খুড়তুতো ভাইদের অপর এক শত্রুপক্ষ জ্যেঠতুতো দিদির নিরামিষ হেঁসেলে পেয়িংগেস্ট হিসেবে ভর্তি হয়ে সুক্ত, মোচার ঘণ্ট, বড়ি চচ্চড়ির আস্বাদনের মধ্য দিয়ে পারিবারিক সুখের আমেজ থেকে ছেলের সংসারের চিন্তা ভুলে থেকেছেন, এদিকে অসীমা সীমাহীন স্বাধীনতার মধ্যে সংসার করতে পাওয়ার সুখে বিরামকে বাপের নাম ভুলিয়ে রেখেছে, অথচ কোনো পক্ষেরই আক্ষেপ নেই।

এহেন সময় পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। বিধবা দিদি কেদার-বদরী গেছেন, তাঁর

হেঁসেলে পড়েছে চাবি, জীবনরাম তাই মাস ছয়েকের জন্যে চলে এসেছেন বড় ছেলের বাড়িতে।

কিন্তু জীবনরাম সেই ছ'মাসকে প্রায় 'ছ' বছর করে তুলছেন ছেলে ছেলের বৌয়ের কাছে।

জীবনরাম ছেলে আর বৌয়ের অপব্যয়ের অভ্যাস কমাবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। —কারণ জীবনরাম এই দীর্ঘকাল পরে এসে দেখছেন সংসারটা যেন আকাশপাতাল বদলে গেছে। অসুখ না করলে যে ফলের রস খেতে আছে, একথা জীবনরামের জানা ছিল না। জানা ছিল না, বিধবাদের দশমীর খাদ্য ছানা নামক বস্তুটা শিশুদের নিত্য খাদ্য। জানা ছিল না, জামা-জুতোর প্রয়োজন না থাকলেও যখন তখন কেনা যায় এবং এও জানা ছিল না জগতে যতো রকম ভোগ্যবস্তু আছে সব কিছুই আহরণ করবার চেষ্টা করতে হয়।

জীবনরাম ছেলের সংসারে এসে সেটা জানছেন এবং জেনে দিশেহারা হচ্ছেন ওদের ওই সর্বনাশা ভুল পথ থেকে টেনে আনবার উপায় কি ভেবে।

অথচ এরাও ভাবছে জিনিসপত্র কেনাকাটা করে তাকে অলক্ষ্যে বাড়ির মধ্যে চালান করবার কোনো উপায় আছে কি না। একতলার ফ্ল্যাট নয় যে, জানলা দিয়ে ঢুকিয়ে টুকিয়ে দিয়ে, খালি হাতে বাড়ি ঢুকবে। ফ্ল্যাটটা দোতলার। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই হবে আর সিঁড়ির মুখে মুখোমুখি হতেই হবে মুখিয়ে থাকা হিতৈষী অভিভাবকের সঙ্গে।

আজ সঙ্গে অনেক জিনিস, কারণ মাসের প্রথম।

অসীমা তাই বলে, 'আমি আগে উঠছি না। তুমি আগে দেখে এসো।'

বিরাম বললো 'বোধ হয় বাড়ি নেই।'

অসীমা ব্যঙ্গ হাসি হাসলো।

বললো 'সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছেন।'

'তবে আর কী করা!'

বলে উঠেই এলো বিরাম প্যাকেট ফ্যাকেট দৃশ্যমান করেই। থলি করে এনেও দেখেছে, ফল হয় না কিছু। জীবনরাম বলবেনই 'থলিতে কি? আবার গুচ্ছির টাকার ঘণ্ট করে আসা হলো বোধ হয়?'

আজ তো আবার সত্যিই টাকার ঘণ্ট।

চিনুর একান্ত আবদারে একটা বড়সড় নাইলনের পুতুল কিনে আনতে হয়েছে, যেটার দাম একুশ টাকা। এইটা নিয়েই বেশী ভাবনা আজ। বিরাম একবার ভেবেছিল, সামনের মাসে তো চলেই যাচ্ছেন বাবা, পরেই না হয়—'

কিন্তু শিশুর আবদারকে কি যুক্তি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায়? না ওই অদ্ভুত কথাটা তার কানে তোলা যায়? এ ভাবনার জন্যে নিজের কাছেই নিজেকে নীচ মনে হয়। স্ত্রীর কাছেও ছোট মনে হয় নিজেকে। তাই 'ঠিক আছে কিনবো তার কি?' এই

মনোভাব নিয়ে কিনেই এনেছে। এবং 'ঠিক আছে সামনেই 'থাকবেন তার কি?' এই মনোভাব নিয়ে সিঁড়িতে উঠে এলো।

কিন্তু আজ বিরামের ভাগ্য ভালো।

আজ স্ত্রীর কাছে মাথা হেঁট হলো না তার।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে নেই জীবনরাম।

তা বলে বেরিয়েও যাননি। দরজা খুলে ভিতরে ঢোকবার আগেই খুব একটা জোরালো হাসি শোনা গেল জীবনরামের গলার।

জীবনরাম এরকম জোর গলায় হাসছেন!

এটা আশ্চর্য!

তার মানে আজ ছেলেমেয়েদের পড়ার দফা গয়া করে ছেড়েছেন। অসীমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে বোধ করি খুব জমকালো হাসির গল্প জুড়েছেন। কে জানে কোনো গাঁইয়া গাঁইয়া ঠাট্টার কথায় অতো হাসি কিনা। এই তো সেদিন শুনেছে অসীমা। গোপাল ভাঁড়ের গল্প বলছেন উনি নাতিদের কাছে।

আজও হয়তো—

কিন্তু না আরো অন্য গলা।

তার মানে কেউ বেড়াতে এসেছে।

এই যে চটি রয়েছে। মহিলা চটি।

চুপি চুপি নিজের ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল বিরাম জিনিসপত্রগুলো নিয়ে, সঙ্কট ঘটালো চিন্থু। দরজার শব্দ পেয়েই সে পর্দা সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, 'বাপী আমার পুতুল এনেছো?'

বলা বাহুল্য উত্তরের অপেক্ষা না করেই সম্ভাব্য প্যাকেটটা ধরে টান মারে চিন্থু, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার আবরণ উন্মোচন করে তীক্ষ্ণ চীৎকার করে ওঠে, দাদু, দাদু, দেখো বাপী পুতুল এনে দিয়েছে। আমি বলেছিলাম—

'দিয়েছে তো?'

জীবনরাম ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা ছেলে বৌয়ের দিকে একটু কটাক্ষ করে, ঘরের মধ্যে বসে থাকা মহিলাটির দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন, দেবে না? কন্যে মুখের কথাটি খসিয়েছেন, আর রক্ষে আছে? ছাখ সাবি, যা বলছিলাম বর্ণে বর্ণে সত্যি কিনা। মেয়ে একটু আবদার করেছে, অমনি দশ টাকার পুতুল এসে গেল!'

সাবি বা সাবিত্রী বলে ওঠে, 'দশ টাকা কি গো মামা, ও পুতুল কুড়ি বাইশের কম নয়। নাইলন যে! কত দাম রে বিরাম?'

বিরাম গম্ভীর কঠিন গলায় বলে 'একুশ।'

'দেখলে তো মামা?' সাবি হালকা গলায় বলে, 'বলিনি? জানি যে। নাইলন টলগুলো ভীষণ দামী।'

একুশ টাকা দাম একটা পুতুলের।

আর সেই পুতুল নিয়ে খেলা করবে জীবনরামের ছেলের মেয়ে!

জীবনরামের মনে হলো জগতে এর থেকে অনিয়ম বোধ করি আর হতে পারে না। জীবনরাম সেই সীমাহীন অনিয়মে দিশেহারা হয়ে লাগাম ছাড়া গলায় বলে উঠলেন, 'ছাখ্ সাবি, ছাখ্ তোর মামার বাড়ির অবস্থা কতো ফিরেছে। ছাখ, তোর মামার নাতনী একুশ টাকার পুতুল নিয়ে খেলে? ছি ছি বিরে, টাকা বুঝি তোর কাছে খোলামকুচি। উচ্ছন্ন যাবি এবার। মাত্রাজ্ঞান বলে কিছু নেই!'

বিরাম বাবার ওই ব্যঙ্গে কুৎসিত মুখটার দিকে তাকালো, আর বিরামেরও মনে হলো সে তার সন্তানকে একটা খেলনা কিনে দিয়েছে বলে আর কেউ তাকে শাসাবে, এর থেকে অনিয়ম আর কিছু হতে পারে না। হলেও তিনি বিরামের বাবা, তবু তাঁরও একটা অধিকারের ক্ষেত্র আছে। তিনি সেই ক্ষেত্রের সীমা লঙ্ঘন করেছেন, বিরাম এটা সহ্য করবে না।

বিরাম আজ এতোদিনের ইচ্ছেটা পূরণ করবে। বিরাম আজ সেই শুনিয়ে দেওয়াটা দেবে।

হয়তো এ প্রতিজ্ঞা করেও আরো অনেকদিনের মতোই ইচ্ছেটা পূরণ করে উঠতে পারতো না বিরাম। হয়তো মনের বিরক্তি মনে চেপে আপোসের গলায় বলতো, নাতনীটিকে তো চেনেন! অর্ডার যখন হয়েছে না আনলে রক্ষে রাখতো? আর তারপরই সেই অনেক-দিনের মতোই অন্য একটা ছুতো করে এ ঘর থেকে সরে পড়তো, যদি পিসতুতো দিদি সাবিত্রী তার মামার মন অথবা মান রাখতে বলে না উঠতো, 'তা' সত্যিই বটে বিরু, অতো বাজে খরচ করিস কেন বাপু? ছেলেপুলে আবদার করেই থাকে, তা বলে চাঁদ চাইলে চাঁদ দিতে হবে? যা শুনলাম মামার মুখে—'

যদি না বলতো।

কিন্তু বললো একথা সাবিত্রী।

অতএব বিরামের সেই ইচ্ছেটা পূরন করবার বাসনা তীব্র হয়ে উঠলো। বিরাম তার স্ত্রীকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠলো, 'অনেক শুনেছো তা'হলে মামার মুখে? শুনবে বৈ কি, অনেকখানি নিশ্চিন্ত সময় পেয়েছো তো! কথা কি জানো সাবিত্রী দি, 'ছেলেবেলায় সব কিছুতে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখ আমার জানা, ছেলেবেলায় কোনো কিছু, না পাওয়ার কষ্ট যে কি সেটা আমি বুঝি, তাই নিজের সন্তানকে সাধ্যপক্ষে সে দুঃখ দিতে ইচ্ছা করে না। সাধ্যের অতিরিক্ত করেও ওদেরকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখ থেকে দূরে রাখতে চাই।

এ আবার কী অভিযোগ!

সাবিত্রী কিছু বলবার আগেই জীবনরাম আড়ষ্ট গলায় বলে ওঠেন, 'ছেলেবেলায় তোমরা কেউ কিছু পাওনি? সবটাতে বঞ্চিত থেকেছ?'

বিরাম বাবার দিকে তাকায়।

বিরাম বাপের প্রতি বিন্দুমাত্র দরদ করে না। বিরামকে কড়া কথা বলার নেশায় পায়। তাই বিরাম বাপের ওই সমাহিতের মতো মুখের দিকে তাকিয়েও জোর জোর গলায় বলে, 'থেকেছি কিনা সেটা আপনার মনে পড়ছে না বাবা?...মনে পড়ছে না দেড় টাকা জোড়ার জুতো তাও সাতবার তালি মেরে আর হাফসোল বদলে পরেছি, ওই একটাই সম্বল ছিল। পুজোর সময় ছাড়া যে দরকারে পড়ে একটা জুতো কেনা যায় এ আপনি জানতেন? চার আনা জোড়া মোজা, তাও একসঙ্গে দু জোড়া মোজার স্বপ্নও দেখিনি কখনো। ভিজে থাকলে উনুনে শুকিয়ে পরেছি। ইস্কুলে এমন টিফিন নিয়ে গেছি যে ক্লাসের ছেলেদের লুকিয়ে একধারে বসে খেতে হয়েছে। কতোদিন অসুবিধেয় পড়ে খাওয়াই হতো না। খিদেয় পেট জলে গেছে তবু কারো সামনে বার করে খেতে পারিনি।'

জীবনরাম যেন আর কোন দেশের ভাষা শুনছেন। জীবনরাম তেমনি অবাক আর অস্ফুট গলায় যেন আচ্ছন্নের মতো বলেন, 'খিদেয় পেট জলতো তবু খাওনি? টিফিন বার করে খেতে লজ্জা করতো?'

'হ্যাঁ করতো।' বিরাম উত্তেজিত গলায় বলে, 'শুধু হাতে গড়া চারটে রুটি আর দু'টুকরো বেগুন ভাজা। বার করতে লজ্জায় মাথা কাটা যেত বৈকি। মোটা খাওয়া-পরার উর্ধ্বে ছেলেমেয়েদের জন্যে যে আর কিছু করা যায়, সে কথা আপনাদের জানা ছিল কি? অথচ এমন কিছু অভাবগ্রস্ত ছিলেন না আপনি। নিয়ম প্রথা পালন করতে বাড়িতে পিঠে পায়েসের ঘটাও দেখেছি, দেখেছি ইলিশের জোড়া আনতে, দেখেছি গুরু-পুরুতকে গরদের ধুতি-চাদর দিতে। অর্থাৎ আমাদের জন্যে ভেবে কিছু করেন নি। ভাবেন নি শিশুরও মন প্রাণ আছে, তাদের মধ্যেও সুখ দুঃখ বোধ আছে, মান-অপমানের বোধ আছে।'

বিরাম যেন মরিয়া হয়েই বলে চলে 'আপনার হয়তো মনে নেই কিন্তু আমার মনে আছে, দিদি একবার একটা সিল্কের রিবনের জন্যে আবদার করে না পেয়ে কেঁদে কেঁদে জ্বর বাধিয়ে ফেলেছিল, আপনারা দিদিকে 'বেয়াড়া জেদী আব্দেরে' বলে বকে ভূত ভাগিয়েছিলেন। অথচ রিবনটার দাম হয়তো আট আনার বেশী ছিল না। তবু আপনি বলেছিলেন, চাঁদ চাইলে চাঁদ পেড়ে এনে দিতে হবে নাকি তোমাদের? এক আনা করে রুল টানা খাতা পাওয়া যেতো, তবু একান্ত ইচ্ছে সত্বেও কখনো একটা রুলটানা খাতায় লিখতে পাইনি। সেই আপনার অফিস থেকে কুড়িয়ে আনা বালির কাগজের হাতে বাঁধানো খাতায় লিখতে লিখতে কলেজে উঠেছি। স্টুডেন্ট লাইফে ফাউন্টেন-পেন কেমন জিনিস হাত দিয়ে দেখিনি। উড-পেনসিলটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে এক ইঞ্চিতে এসে পৌঁছলে সেটা দেখিয়ে তবে নতুন একটা পেয়েছি। অথচ নাকি পয়সায় দুটো করে পেনসিল ছিল তখন। এ রকম কেন হতো জানেন? আপনাদের আমলে জুতো জামা

ছাতা খাতা এসব যতই সস্তা থেকে থাকুক সব থেকে সস্তা ছিল আপনাদের ছেলে-মেয়ে। তাদের সম্পর্কে মায়া মমতা কি ছিল জানি না, মূল্যবোধ ছিল না এক কানা-কড়াও।...হয়তো ওইটা বুঝে ফেলার অপমানেই আপনার ছেলে জগতের সব কিছুর থেকে ওই ছেলেমেয়েগুলোকেই দামী জিনিস বলে গণ্য করতে চেষ্টা করে। স্বীকার করতে চেষ্টা করে, ইহ সংসারে তাদেরও কিছু দাবী আছে।'

স্বভাব বহির্ভূত উত্তেজনায় অনেক কথা একসঙ্গে বলে ফেলে বিরাম সহসাই নিজের ঘরে চলে যায়, যেন কথায় পূর্ণচ্ছেদ না টেনেই।

কিন্তু আর কোথায় কীই বা টানতো ?

অসীমা তো এতেই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। অসীমা বুঝে উঠতে পারে না ওই বিনীত বাধ্যতার নিচে কোথায় ছিল এই গলিত লোহা ?

আর, যেন বিস্ময়ের শেষ সীমায় পৌঁছে কাঠ হয়ে বসে থাকেন জীবনরাম।

যেন তাঁর সারা জীবনের সাজানো খেলার ছকটাকে হঠাৎ কে ভয়ঙ্কর একটা নিষ্ঠুর আঘাতে এলোমেলো করে ছড়িয়ে দিয়েছে, ঘুটিগুলো ছিটকে চলে গেছে এখানে সেখানে।

জীবনরাম তা'হলে এতো নির্মম ছিলেন ?

কিন্তু কোনোদিন তো কই বুঝতে পারেননি। নিজেকে খুব কর্তব্যনিষ্ঠ বলেই ভেবে এসেছেন বরং। জানতেন সংসার চালিয়ে লোক লৌকিকতা, আচার আচরণ সব বজায় রেখে পাঁচ-পাঁচটা ছেলেমেয়েকে ভালোভাবেই মানুষ করেছেন তিনি। ছেলে দুটিকে কৃতবিদ্য করেছেন মেয়ে তিনটির ভাল বিয়ে দিয়েছেন, জামাই আদরের ত্রুটি করেন নি। ছেলেদের বিয়ের ঘটা করতে ত্রুটি করেন নি।

অথচ তলায় তলায় ত্রুটির পাহাড় জমিয়েছেন। খেয়াল করেন নি।

আশ্চর্য! জীবনরাম তা'হলে অন্ধ ?

কিন্তু আরো বেশী আশ্চর্য লাগছে জীবনরামের। স্কুলে থাকতে যে বিরাম কোনোদিন একটা রুলটানা খাতায় লিখতে পায়নি, দু জোড়া মোজা এক সঙ্গে চোখে দেখেনি, তালিমারা জুতো পরেছে, আর টিফিনের দৈন্যে লজ্জায় মাথা কাটা গেছে তার, একথা বিরামের এখনো মনে আছে দেখে।

আচ্ছা জীবনরাম শৈশবে কী কী পেয়েছিলেন আর কী কী পাননি, কিছু মনে পড়ছে না কেন ?

হিসেবের খাতা ছিল না বলে ?

না কি পাবার কোনো কথা ছিল, এই খবরটাই জানা ছিল না বলে ?

নিউ মডেল

প্রথম ডাকটা কানে নেয়নি, গট গট করে এগিয়েই চলেছিল, দ্বিতীয় ডাকটায় চলনে একটা 'কমা' বসিয়েছিল, তৃতীয় ডাকে ঘাড ঘুরিয়ে তাকালো বাধ্য হয়ে তাকানোর ভঙ্গীতে, নাক-মুখ কুঁচকে। চোখটা কোঁচকালো বিরক্তিতে, নাকটা সস্তা সিগারেটের গন্ধে আর ধোঁওয়ায়।

তবে ঘাড়ই ঘোরালো, 'ডাকছ কী জন্যে', অথবা 'কী বলছ?' একথা বলল না। শুধু তাকিয়ে থাকল দৃষ্টিতে যতটা সম্ভব অবজ্ঞা ফুটিয়ে।

কথা বলল বিভুপদই।

জিভে 'টকাস' করে একটা আওয়াজ তুলে বলে উঠল, 'কলেজে উঠে যে লক্কা পায়রাখানি হয়ে উঠেছিস রে ঝুনি, কী সাজ!'

সবে কলেজে ওঠা ঝুমু দুচোখে অগ্নিবর্ষণ করে বলল, 'এই কথাটা বলবার জন্যে তিনবার পিছু ডেকে থামালে?'

ঝুমুর শাস্ত্রগ্রন্থে বোধহয় তিনবার পিছু ডাকটা নিদারুণ অমঙ্গলের বাহক, তাকে বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে। বিভুপদও বোধহয় ঝুমুর এ কুসংস্কারের খবর রাখে (আজ তো দেখছে না ঝুমুকে!), তাই তিন তিনবার ডাক দিয়েছে। ঝুমুর অগ্নিদৃষ্টি বিভুপদরও চামড়া ভেদ করতে পারল বলে মনে হল না। সে অবলীলায় বলল, 'তা কথাটা কি তুচ্ছ হল না কি রে? এ যাবৎ হরিমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়ের পেটেন্ট লালপাড ন্যাকড়া পরতে পরতে প্রাণ যাচ্ছিল, রাস্তার লোককে পেট পিঠ দেখাবার সুযোগ পাচ্ছিলি না—'

'অসভ্যতা করবে না বলছি বিভুদা, ভাল হবে না—'ঝুমু এবার সোজাসুজি বিভুর মুখোমুখি দাঁড়ায় যুদ্ধং দেহি ভঙ্গীতে।

'অসভ্যতাটা আমি করেছি, না তুই কর্‌ছিস?' বিভুপদও এবার রুখে দাঁড়ায়। কড়া গলায় বলে, 'চোখে কাজল লেপে, ঠোঁটে রং মেখে, আর ওই পেট-কাটা বেলাউস পরে কলেজ যাওয়াটা বুঝি খুব সভ্যতা?'

'ফের বিভুদা? আমি যা ইচ্ছে আজ করি না কেন, তোমার কী? ঝুমু তীক্ষ্ণ হয়।'

বিভুপদ একেবারে ওর খুব কাছাকাছি সরে এসে রুক্ষ গলায় বলে, 'আমার কী, সে কৈফিয়ৎ তোকে দিতে যাব না, সোজা কথা তোর ওই রাস্তার লোকের মুণ্ডু ঘোরানো সাজে কলেজ যাওয়া চলবে না।'

কথাটা শুনতে কটু হলেও, ঝুমুকেও একেবারে নিরপরাধের কোঠায় ফেলা চলে না। কলেজের ছাত্রী হয়ে পর্যন্ত ঝুমু সাজ-সজ্জায় অতিমাত্রায় স্বাধীনতা গ্রহণ করেছে। মায়ের অসন্তোষও কানে করে না, মা যদি বলে, 'ইস্কুল-কলেজে আবার এত সাজ কেন?

লেখাপড়া হচ্ছে তপস্যা, সাধাসিধে ভাবে থেকে পড়াটা করে নিবি! ছাত্রী বলে কথা—' ঝুমু ঠোঁট উলটে বলে, 'তোমাদের আমলের ওই পচা উপদেশ রাখো মা! দেখগে যাও কলেজ-টলেজে, কী সাজ-সজ্জার বহর! মনে হবে বিয়ে-বাড়িতে এসেছে। সে জায়গায় আমি কী আমার আছেই বা কী?'

কথাটা অবশ্য সত্যি, ঝুমুর এত কী আছে? মায়ের বাক্স-আলমারি হানা দিয়ে, পুরনো সিল্ক-ভয়েলগুলো টেনে বার করে তাতে নতুন সৌন্দর্য আরোপ করে নিয়ে কাজ চালানো। নিজের বলতে তো পুজোয় পাওয়া দু' চরটে। তা খেলতে জানলে নাকি কানাকড়ি নিয়েও খেলা যায়, ঝুমু সে প্রবাদটা সত্য করেছে। ঝুমু মায়ের পুরনো জরির শাড়ির আঁচলা কেটে এমন ব্লাউজ বানিয়ে নেয় যে, মা হাঁ হয়ে যায়। অবিশ্যি ওই এক বিঘত ব্লাউজগুলোয় কাপড় যৎসামান্যই লাগে।

অতএব ঝুমু লক্কা পায়রাটি সেজে কলেজ যায়।

বাঁধা গরু ছাড়া পেলে বোধহয় এই রকমই হয়। হরিমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী ঝুমুকে ক্লাস এইট পর্যন্ত পরতে হয়েছে একেবারে প্লেন সাদা ফ্রক, আর তার পর থেকে স্রেফ লালপাড় সাদা শাড়ি। তাও আবার একটু চওড়া পাড় হবার জো নেই, নক্সা তো নয়ই। সাজে ঘেন্না ধরে গিয়েছিল।

কলেজে এসে দেখল—'যে যা খুশী সাজো'! ঝুমু সাপের পাঁচ পা দেখল।

তা দেখল তো দেখল, পাড়ার ছেলের তাতে কি? তাও পাড়ার সবথেকে ওঁচা মস্তান ছেলেটা। সে কোন দাবিতে সদ্দারী করতে আসে?

চলবে না! ঢং!

ঝুমুও সমান তেজে বিভূপদ নামের ছেলেটাকে নস্যাৎ করে দেবার ভঙ্গীতে বলে, 'চলবে না? ওঃ ভারী আমার গার্জেন এলেন রে! নিজের চরকায় তেল দাওগে বিভুদা—'

'তাই তো দিচ্ছি'—বিভু আরো কড়া গলায় বলে কথাটা।

ঝুমুর ভয় হয় গোঁয়ার পাজীটা ঝুমুর গালে একটা চড না বসিয়ে দেয়! ওর অসাধ্য কাজ নেই। ও নাকি দ্বিজুবাবুকে একদিন কোথাকার তেলেভাজার দোকান থেকে হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে এনেছিল হাত থেকে বেগুনীর ঠোঙা টান মেরে ফেলে দিয়ে। ধমক মেরে বলেছিল, 'বাড়িতে শিঙিমাছের ঝোল-ভাত খান, আর এখানে বসে এই কুপথ্যি হচ্ছে? নিজে মরুন, গোল্লায় যান, পাড়ার লোকের গলায় পাঁচটা বাচ্চা-কাচ্চা সমেত একটা ট্যাঁক-গড়ের-মাঠ বিধবা ঝুলিয়ে দিয়ে গেলে তো চলবে না!'

ভয় হয়, তবু ঝুমু মুখে হারে না, বলে, 'ছাই দিচ্ছ! বসে বসে বাপের পয়সা উড়িয়ে সিগারেট ওড়াচ্ছ, আর মস্তানি করে বেড়াচ্ছ, এই তো পরিচয়! অন্যকে উপদেশ দিতে আসতে লজ্জা করে না? পাড়ার লোকে তোমায় কি বলে জান? 'পাড়ার বিভীষিকা। বলে, পড়ে লিখে পাস করেছে না হাতী, মাস্টারকে বোমার ভয় দেখিয়ে পাস।'

'বলে বুঝি এইসব ?'

বিভুপদর মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে।

ঝুনু সতেজে বলে, "বলেই তো।'

'বলতে দে।'

'ঠিক আছে। তুমিও এখন আমায় যেতে দাও দিকি। ছোটলোকের মত রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে আছো! অসভ্য!'

ঝুনু সবে কলেজে উঠেছে বটে, তবে নেহাত ন্যায্য বয়সে নয়, এ-রকম পাকা পাকা কথা বলবার মত বয়েস ঝুনুর হয়েছে।

রাগে ঝুনুর প্রায়-ফর্সা মুখটা লাল হয়ে ওঠে, বুকটা ওঠা-পড়া করে, আর—ব্লাউজের নীচে দৃশ্যমান পেটের অংশটুকুতে ভাঁজে ভাঁজে ঢেউ খেলে। রং খুব ফর্সা না হলেও স্বাস্থ্যবতী ঝুনুকে প্রায় সুন্দরীই বলা চলে।

কিন্তু পাড়ার গুণ্ডা ছেলেটাকে এ সৌন্দর্যে মোহিত হতে দেখা গেল না, সে হঠাৎ ফট্ করে প্যান্টের পকেট থেকে একটা ব্লেড বার করে বলে উঠল, 'জিনিসটাকে চিনিস? দাড়ি কামানো ছাড়াও এটা দিয়ে আর কি করা যায় জানিস?'

ঝুনু ভিতরে ভিতরে কেঁপে উঠল, তবু মুখে হারতে রাজী হল না। হাসিতে ব্যঙ্গ আর অবজ্ঞার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বলল, 'ওঃ ব্লেড! ওটা কিন্তু নেহাৎ পচা মার্কা হয়ে গেছে বিভুদা, উনিশশো সত্তর সালের মডেল।'

'ও আচ্ছা! তা হলে 'নিউ মডেল' দেখবার জন্যেই প্রস্তুত থাকিস—'জিনিসটাকে বিভু আবার পকেটে চালান করে শক্ত গলায় বলে 'কলেজ ফেরত রোজ কার সঙ্গে অত আড্ডা দিস? কে ওটা?'

ঝুনুর মুখটা শুকিয়ে যায়, ক'দিন থেকে ক্লাসের স্বাগতার দাদা যে বোনকে নিতে আসার ছুতোয় কলেজ গেট থেকে বেরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ গল্প চালাচ্ছে, একথা বিভুদা জানল কেমন করে? কিন্তু 'অত' আবার কোথায়? স্বাগতা তো তিন-চার মিনেটের বেশী দাঁড়াতেই চায় না, কেবল বলে 'খিদেয় আর দাঁড়াতে পারছি না রে ছোড়দা, চল বাবা শীগগির!'

আর ঝুনুর দিকে চেয়ে হি হি করে বলে, 'তার চেয়ে চল্ না বাবা আমাদের বাড়িতে, পেট ভরে গল্প হবে। আশ্বাস দিচ্ছি, পেট ভরে খাওয়াও হবে।'

ঝুনু লজ্জা পেয়ে চলে আসে।

ওইটুকু তো ব্যাপার, বিভুগুণ্ডা অমনি তার খবর রেখেছে! অবিশ্যি যতই নাকের সামনে ব্লেড দেখাক, বিভুকে সে ভয় করে না, আবাল্য দেখছে তাকে। কিন্তু বিভু যদি মা-বাবাকে বলে দেয়!

ঝুনু তাই মুখের শুষ্কতা ঢাকতে পারে না, চোটপাট না করে ফিকে গলায় বলে, 'ঢং কোরো না বিভুদা! আড্ডা আবার দিতে যাই কার সঙ্গে? দিবা-দুঃস্বপ্ন দেখছ নাকি?'

'চমৎকার! আবার মিথ্যে কথাও ধরেছিস? চোপা সহ্য হয় ঝুনি, মিছে কথা সহ্য হয় না।'

ঝুনু বাসি মুড়ির মত মিইয়ে যায়, বলে, 'মিথ্যে কথা আবার কী? স্বাগতার দাদা ওকে নিতে আসে, দু'একদিন হয়তো দাঁড়িয়ে একটু জিজ্ঞেস করেছে, আমি কোথায় থাকি, দিনকাল ভাল নয়, একেবারে একা আসি কেন, পাড়ার আর কোন মেয়ে আমার সঙ্গে পড়ে কি না, এই সব। তাতেই দোষ হয়ে গেল?'

'দোষ গুণ জানি না, ওসব চলবে না, এই হচ্ছে আমার কথা। নইলে—'

ঝুনু আবার সতেজ হয়, 'তোমার ইচ্ছেয় পৃথিবী চলবে নাকি? ঠিক আছে, বলে দাও গে মাকে সাতখানা করে—'

'বিভুগুণ্ডা কাউকে বলে দেওয়া-দিইয় ধার ধারে না বুঝলি? যা করে নিজের আইনে করে। যা বিদেয় হ'। যা বললাম মনে রাখবি।'

কয়েকটা দিন একটু ভয়ে ভয়েই সাজ-সজ্জায় একটু কম তুলি চালাল ঝুনু এবং স্বাগতার সঙ্গে বেরিয়ে এল না তাড়াতাড়ি। পরে অন্য মেয়েদের সঙ্গে বেরোল।

এই ত্যাগটুকু ঝুনুর কাছে রীতিমত লোকসানই মনে হয়েছে, কিন্তু ভয় বড় জিনিস। যেতে আসতে তো সেই ভয়ের দরজা পার হতে হবে!

ঝুনুদের গলির মধ্যে ঢুকতে ভবেশ বর্ধনের এই রকটা পার হওয়া ভিন্ন গতি নেই, যে রকটি সর্বদা আলোকিত করে থাকে প্রায় গণ্ডা দুই ছেলে। পাড়ার অনেকে চুপি চুপি বলেছে, কোন ছুতোয় রকটা ব্লক করে ফেলুন না ভবেশবাবু, এই বিরক্তি থেকে রেহাই পাওয়া যায়। অনেকেই তো আজকাল রক ঘিরে ঘর করে নিচ্ছে—'

কিন্তু ভবেশ বর্ধনের বুকের পাটা এত সবল নয়। রক রাজ্যের রাজ্যপ্রধান তো তাঁরই গুণধর পুত্র।

ঝুনুকে দু'বেলাই এখান দিয়ে পার হতে হয়। তবে বিভু যখন প্রজা-পরিবৃত হয়ে থাকে, তখন তাকিয়েও দেখে না। বোঝবার উপায় থাকে না ঝুনু নামের মেয়েটাকে সে চেনে। শুধু যেদিন একা থাকে, সেই দিনই ডাক দিয়ে দাঁড় করায়।

তা রোজই প্রজা-পরিবৃত।

ক'দিন পরে আজ ঝুনু ফিরছে কলেজ থেকে—একা বসেছিল। নেমে এল রক থেকে, বলল, 'লক্কামিটা একটু কমিয়েছিস দেখে তোর বুদ্ধির প্রশংসা করছি। কিন্তু ব্যাপার কি বল দিকি? মেসোমশাই হঠাৎ সকালে কানাইয়ের দোকানে বড় সাইজের সিঙাড়া আর ডবল সাইজের রাজভোগের অর্ডার দিতে এলেন কেন?'

আজ ঝুনুর মধ্যে একটি আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাব দেখা গেল, ঝুনুর যেন কোথায় একটি পৃষ্ঠবল লাভ হয়েছে। ঝুনু অবজ্ঞাভরে বলে, 'আমি তার কী জানব?'

'জানিস না তুই?'

'ক করে জানব? এই তো ফিরছি। তবে তোমাকেও বলিহারি দিই বিভুদা, কে কোথায় দোকানে দু'খানা সিঙাড়ার অর্ডার দিচ্ছে, তাতেও চোখ? বাড়িতে কুটুম আসতে পারে।'

বিভু কড়া গলায় বলে, 'কুটুম আসার আহ্লাদে ডগমগ হচ্ছিস, কেমন? রূপের দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না তোর। ভাবছিস দেখবে, আর গলে গিয়ে বিয়ে করে নিয়ে যাবে।'

'না নিয়ে যাবারও কোন কারণ নেই।'

বলে ঝুনু গলা উঁচু করে বেশ ছন্দে হেঁটে চলে যায়।

বিভু তার নিজ আসনে বসে বসে দেখে, গাড়ি করে জনচারেক ভদ্রলোক এবং একটি মহিলা এলেন, গলির মোড়ে নামলেন. গলি পার হয়ে ঝুনুদের দরজার মধ্যে ঢুকলেন, দীর্ঘক্ষণ পরে তাঁরা আবার এসে গাড়িতে উঠলেন, মুখে প্রসন্নতার দ্যুতি, পিছনে পিছনে ঝুনুর বাবা। ভঙ্গীতে কৃতার্থমন্যতা।

বিভু মনে মনে বলল, দাঁত ক'টা যে সবই বাজারে ছেড়ে ফেললেন সার? বড়লোকের বেহাই হবার আহ্লাদে?

তা আহ্লাদ যে মাত্রা ছাপানোই হয়েছে সেটা বোঝা গেল ঝুনুর বাবার পরবর্তী ব্যবহারে। সাধারণতঃ বিভুপদ বা বিভুপদর প্রজা-বাহিনীদের সামনে দিয়ে আসতে হলে তাঁর মুখটা ঝুলে পড়ে এবং চোখ দুটো নিজের জুতোর ডগায় যাকে বলে একেবারে নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু আজ ওই গাড়িখানা গর্জন তুলে চলে যাবার পর কিছুক্ষণ সেই ধুলো-ওড়া রাস্তার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ফিরে আসার মুখে বিভুপদর মুখোমুখি হতেই বলে উঠলেন তিনি, 'এই যে বিভু, তোমার বাবা বাড়ি আছেন নাকি? নেই? তা তোমাকেই বলি, শুনে খুশী হবে—ঝুনুর বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। ওই যে এসেছিলেন বড গাড়িটা চড়ে? কনে দেখতে এসেছিলেন। তা আজই পাকা কথা দিয়ে গেলেন। অতি সজ্জন লোক।'

বিভুপদ অমায়িক হয়, 'তাই বুঝি? ওই প্রকাণ্ড গাড়িটা? তা বেশ ভালই জামাই যোগাড় করেছেন মেশোমশাই।'

'আমি কি আর যোগাড় করেছি বাবা?' ঝুনুর বাবা বলেন, 'ভগবানই করে দিয়েছেন। আমার সাধ্য কি! এত সাহসই বা আসবে কোথা থেকে? আসলে ছেলেটি ঝুনুর এক ক্লাসফ্রেণ্ডের ভাই। ওই ক্লাসফ্রেণ্ডটিরই বুঝি ঝুনুকে খুব পছন্দ, তাই মা বাপকে বলে দাদার সঙ্গে বিয়ের জন্যে—ভগবানই এসব ঘটান বাবা। তবে ওঁরা এই মাসের মধ্যেই বিয়ে দিতে চান, এখন সেই ভাবনা মাথায় চাপল। যাক্, তোমরা সবাই আছ, তোমরাই ভরসা। কাজকর্ম করতে হবে বাবা, ঝুনু তোমাদের নিজের বোনের মত।'

এক ঢিলে অনেকগুলো পাখি মারতে পারার সাফল্যে ডগমগ করতে করতে নিজের বাড়ির মধ্যে ঢুকে যান ভদ্রলোক।

কিন্তু বিভুপদর ঢিলের এলাকায় পাখির সাড়া নেই। বিয়ের 'পাকা কথা' পেয়েই কি ঝুনু

নামের গরবিনী মেয়েটা লেখাপড়া ছাড়ল? কেন? সেই সাধের আড্ডা দেওয়াটা তো চালাতে পারতে হে? বিয়ের তো এখনো কুড়ি-বাইশ দিন বাকি।

বিভুপদর মেজাজ গরম থেকে গরম হতে থাকে। বিভুপদর প্রজারা বলে, 'প্রভুর কী হল মাইরী?'

বিভু তাদের খিঁচিয়ে ভাগায়। কয়েকটা দিন বন্ধের পর কিন্তু দেখা যায় ঝুনুকে। কেবল কেবলই দেখা যায়। মনোহারিণী সাজ সেজে গলির পথ পার হয়ে আসছে যাচ্ছে, কিন্তু কদাচ একা নয়। হয় বাবার সঙ্গে, নয় মা-র সঙ্গে। অথবা দু'জনেরই সঙ্গে।

ফেরার সময় সকলেরই হাতে কাঁধে মাথায় নানাবিধ প্যাকেট।

তার মানে ঝুনুর বিয়ের বাজারপত্র হচ্ছে।

বিভুদের রকের সামনেটা দিয়ে আসার সময় ওঁদের মুখে একটা সন্ত্রস্ত ছবি ফুটে ওঠে। তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, 'এই খানিকটা কেনাকাটা করে এলাম বাবা। বাজার কী আগুন!' প্যাকেটগুলো বুকের সঙ্গে চেপে ধরেন ভাল করে। কিন্তু ঝুনু?

ঝুনু ফিরেও তাকায় না।

ঝুনুর চোখে অবজ্ঞা, মুখে গরব। ঝুনুর ভাবটা যেন 'তেলি, হাত ফসকে গেলি।' যেন হঠাৎ একটা উঁচু গাছের মগডালে উঠে গেছে ঝুনু, নীচের লোকদের কৃপা-দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে। বোকাদের যা হয় আর কি! বোকা ঝুনু এখন থেকেই যেন তার ভাবী শ্বশুরের সেই বড় গাড়িটায় চড়ে বসে আছে।

গলির সবগুলো বাড়ির লোকেরই এখন ঝুনুর বাবার প্রতি ঈর্ষাদৃষ্টি, সবগুলো বাড়ির মেয়েরই ঝুনুর প্রতি। এ গলির একটা মেয়েরও অমন গাড়িবান শ্বশুর জোটেনি, একটা মেয়েরও অমন রাজপুত্র বর জোটার আশা নেই।

ঝুনুর যে মা কাজ না-করার জন্যে উঠতে-বসতে গঞ্জনা দিত ঝুনুকে, সেই মা-ই ঝুনুর হাত থেকে কাজ কেড়ে নিয়ে বলে, 'থাক থাক মা, তুই আবার কেন? আজ বাদে কাল পরের ঘরে চলে যাবি।'

যে বাবা অনায়াসে বলত, 'এই একখানি গন্ধমাদন পর্বত আমার মাথায় বসানো আছে, ভগবান জানে কি করে নামাব।' সেই বাবাই এখন অনায়াসে বলেন, 'আমি জানতাম। জানতাম ঝুনুর জন্যে আমার কখনো চিন্তা করতে হবে না, ঝুনুর আমার লক্ষ্মীর অংশে জন্ম।'

ঝুনুর বান্ধবীরা এসে এসে ঝুনুর নতুন নতুন জামাকাপড় দেখে যায় আর বিগলিত হয়। ঝুনুর শ্বশুরবাড়ি থেকে নাকি বলেছে গহনা-টহনা দিতে হবে না আপনাকে, আমাদের বৌ আমরা সাজিয়ে আনব।' অতএব সাধ্যমত পোশাক-পরিচ্ছদ কিনছে মা-বাপ।

'ঝুনু আমার সাজতে বড় ভালবাসে—'

ঝুনুর মা আহ্লাদে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, 'ভগবান ওর সে সাধ পূর্ণ করেছেন।'

এই ক'দিন আগেই যে মেয়ের সাজ নিয়ে বিরূপ সমালোচনা করে বলেছিল, 'ঘুঁটে কুড়ুনির

মেয়ে তো আর রাজ-সিংহাসনে বসতে যাবে না! ওই ফ্যাশান ঠমকের জন্যে উঠতে-বসতে খোঁটা খাবি ঝুনুী তা বলে রাখছি—' সে কথাটা মনে রাখে না।

ঝুনুও অবশ্য মনে করিয়ে দেয় না।

ভাগ্যের ঔদার্যে ঝুনুও উদার হয়ে উঠেছে। অত দামী মেয়ে হয়েও ঝুনু মাঝে মাঝে মায়ের রান্নাঘরে কাজ করে দিতে আসছে। আর সেই সময় গল্প-প্রসঙ্গে বলছে, 'যা বলছে মা, স্বাগতাদের বাড়িতে সবাই খুব টিপটপ। ওর মাকে দেখে কে বলবে তোমাদের মত বয়েস। যেন স্বাগতার পিঠোপিঠি দিদি।'

যাকে দেখলে তার নিজের মেয়ের পিঠোপিঠি দিদি বলে মনে হয়, সেই মহিলা ঝুনুর শাশুড়ী হবে। ঝুনু তখন আর ঝুনু থাকবে না, 'মঞ্জরী ঘোষ' হয়ে যাবে।

কিন্তু গলির মেয়ের ভাগ্যে কী এত সুখ সয়? তাই যদি সইবে তো এই পচা গলির মধ্যে জন্মাতে আসবে কেন?

বিয়ের তিন দিন মাত্র বাকি, বান্ধবীদের নেমন্তন্ন করতে স্পেশাল নিমন্ত্রণ-পত্র নিয়ে রিক্স করে একটুখানি বেরিয়েছে দুপুরবেলা, মেয়ে আর ফেরে না।

ঘর-বার করছে ঝুনুর মা, মনে মনে নিজের গালে-মুখে চড়াচ্ছে—কেন মরতে আমি মেয়েকে একা ছাড়লাম গো! আর ভাবছে কর্তা বাড়ি ফেরার আগে যেন ফেরে ভগবান!

তা ভগবান সেটুকু শুনলেন, ফিরল তাই, কিন্তু ফিরল একেবারে ভয়াবহ মূর্তিতে।

গালে মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, রগের চুলে একটু একটু রক্তের চাপ।

সঙ্গে পাড়ার গুণ্ডা বিভুপদ।

রিক্স করে নিয়ে এসেছে, ধরে ধরে নামিয়ে দিয়ে বলে, 'সব ঝুনুর মুখে শুনবেন মাসিমা, এখন যাই।'

তার হাতেও একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

ঝুনুর মা কপালে করাঘাত করে বলেন, 'এসব কী কাণ্ড বাবা! কোথায় কী ঘটল? আমি যে চোখে অন্ধকার দেখছি। হল কী?'

'ওই তো বললাম ঝুনুর মুখে শুনবেন পরে, আগে একটু বিশ্রাম করতে দিন, কিছু খেতে দিন। যাচ্ছি আমি, খুব টায়ার্ড ফীল করছি। তবে এইটি বলে রাখছি, ওই সব গয়নাপত্তর পরে রাস্তায় বেরোতে দেবেন না। বড়লোকের বৌ হচ্ছে অনেক গয়না হচ্ছে তো? গলার হারটা তো গেলই, তার জন্যে প্রাণটাও যেতে বসেছিল—।'

ঝুনুর মা কেঁদে ফেলে বলেন, 'গলায় তো একটা ঝুটো নেকলেস ছিল বাবা। এখনো তো গরীব বাপের মেয়ে—'

'ঝুটো! তবু ভাল!'

বিভু বলে, কিন্তু বাইরে থেকে তো বোঝার জো নেই ঝুটো কি খাঁটি।'

'কিন্তু তোমার হাতেও যে ব্যাণ্ডেজ বাবা—তুমি কোথায়—'

'বললাম তো সব পরে শুনবেন।' বিভুপদ চলে গেল।

তারপর সব শুনলেন ঝুনুর মা।

নবীনা বলে সেই মেয়েটাকে নেমন্তন্ন করে বেরোচ্ছে যদু ঘোষ লেন থেকে, চারিদিকে কেউ নেই তেমন। হঠাৎ কোথা থেকে দু' তিনটে ছেলে এসে রিক্সায় বসা ঝুনুর গালে একটা ছুরির ফলা বসিয়ে দিয়ে গলার হারটা ছিঁড়ে কেড়ে নিয়ে পালাচ্ছে ছেলে তিনটে, রক্তাক্ত গালে আঁচল চেপে ঝুনু চেঁচিয়ে উঠেছে, দৈবক্রমে হঠাৎ সেখানে বিভুপদ।

ছেলেগুলোকে ধরতে গিয়ে সে-ও হাতে খোঁচা খেয়েছে। তারপর বিভুপদই ঝুনুকে সঙ্গে করে ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে নিজের আর ঝুনুর ব্যাণ্ডেজ করিয়ে নিয়ে এল।

'বিভুদা হঠাৎ এসে না পড়লে যে কী হত—' ঝুনু কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, 'রক্ত ঝরেই মরে যেতাম।'

'ভগবান প্রেরিত হয়েই এসে পড়েছিল।' বললেন ঝুনুর মা।

তারপর আর কি?

নিমন্ত্রণ-পত্রের তারিখ মত বিয়েটা হল না, গালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মেয়েকে তো আর কনের পীঁড়িতে বসানো যায় না? তারিখটা বদলালো।

তারপর? তারপর বিয়ের বরও বদলালো।

কারণ গালে গর্ত মেয়েকে বড়লোকের বাড়িতে বৌ করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় কি করে? তাছাড়া--গুণ্ডা-ছোঁওয়া মেয়ে! স্বাগতা দেখতে এসেছিল। বলল, 'হুট হুট করে একা বেরনো তোর উচিত হয়নি। কত আশা ছিল তুই আমার বৌদি হবি—'

তা সবাইয়ের সব আশা কি মেটে?

ঝুনুর বাবার বড়লোক বেয়াই করার আশাই কি মিটল? অতএব পাড়ার লোকই! ভবেশ বর্ধনের ছেলে যখন ঝুনুর বাবার মেয়ের প্রাণদাতা, তো তখন তার হাতেই—

'শুধু আমার আশাটাই মিটল—'

বলল বিভুপদ। তারপর দুঃখের গলায় বলল, 'তবে নিউ মডেলটা বড্ড বেশি হয়ে গেছে।'

'সে আপশোসে আর এখন ফল কী? মুখটা তো জন্মের শোধ থুঁতো করে দিলে—।'

'তা হোক!' বিভুর পরিতৃপ্ত গলা, 'চাঁদেরও তো কলঙ্ক আছে। আছে বলেই বেশি বাহার!'

'আহা রে! তা বাহারের জন্যেই বুঝি বাহাদুরী করে নিজের হাতখানাতেও ফালা দেওয়া হল?'

'না:! ওটা বিবেকের দংশন রে ঝুনি!'

'ওঃ ভারী আমার বিবেকানন্দ এলেন রে—'

ঝুনু একটি অপরূপ মুখভঙ্গী করে। যা দেখলে মনে হয় না বড় গাড়িতে চড়তে না পাওয়ায় ঝুনুর খুব আক্ষেপ আছে।

বরফজল

যদিও সেই ডজনখানেক শিশি-কৌটো-স্টিক্-টিউব আরো কত কি যেন চাবি দেওয়া ড্রয়ারে পুরে তবে বেরিয়েছে দীপিকা, তবু ওই বহুবিধ প্রসাধন-দ্রব্যের মিশ্রিত সুরভির রেশটা ঘরের বাতাসে যেন গান-থেমে-যাওয়া ঘরে সুরের রেশের মতো পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। হয়তো আরো অনেকক্ষণই থাকবে এই রেশটা। শব্দের থেকে গন্ধের স্থায়ীত্ব অনেক বেশী।

সুরের থেকে সৌরভের।

দীপিকা বেরিয়ে যাবার অনেক পর পর্যন্ত বুবু-টুটুর ঘ্রাণেন্দ্রিয় এই সৌরভের স্বাদ পায়। কারণ এটাই বুবু-টুটুর পড়ার ঘর। অথচ এই ঘরটা ছাড়া নিজেকে একটু ছড়িয়ে বিছিয়ে শিথিল করে প্রসাধিত করবার জায়গা আর কোথায় দীপিকার?

দীপিকার যেটা নিজের ঘর, শোবার ঘর, সেখানে তো সারাক্ষণই সুরঞ্জন। অন্তত দীপিকার বেরোবার সময়টায়। কলেজ থেকে ফিরেই তো পরীক্ষার খাতার পাহাড় নিয়ে বসবে সে। আর পাশের ওই ছোট্ট ঘরটায়? যেখানে নাকি সবচেয়ে সুবিধে হতে পারতো দীপিকার, সেখানে এক চিরশয্যা পাতা হয়েছে।

সুরঞ্জনের রুগ্ন মা পড়ে আছেন সেখানে অনড় অচল হয়ে। ও ঘরটাতে নেহাত দায়ে পড়ে ছাড়া ঢুকতেই ইচ্ছে করে না দীপিকার, তো সাজ-সজ্জা করবে কি? তাছাড়া—বুড়ির হাত-পা-ই শিথিল হয়ে গেছে, দৃষ্টিটি আদৌ নয়। কটকট করে তাকিয়ে থাকে।

অতএব মেয়েদের পড়ার ঘর ছাড়া গতিরণ্যথা।

ঘরটা পড়ার বললে পড়ার, শোবার বললে শোবার। বুবু-টুটু বড় হয়ে অবধি এই ঘরেই শোয়।

ঘরটা বড়। এঘরে হাত-পা মেলিয়ে সাজ-সজ্জা করা যায়। তাছাড়া মেয়েই তো। নিজেরই মেয়ে। তাদের সামনে আর লজ্জা কি? তারা রাগ করে? বয়েই গেল। তাদের রাগ ধর্তব্য করতে যাবে নাকি দীপিকা?

তা আজকাল আর তারা রাগ করে না, গুম্ হয়ে বসে থাকে বইয়ের পাতায় চোখ রেখে। আগে করতো রাগ, যখন স্কুলের মেয়ে ছিল। বলত, 'বাবাঃ! যেই আমরা পড়তে বসবো সেই শুরু হয়ে যাবে' মা-র সাজ-সজ্জা! উঃ!'

দীপিকা জোরে জোরে ঘাড়ে পাউডার ডলতে ডলতে অথবা মুখে ক্রীম ঘষতে ঘষতে বলতো, 'তাতে তোমাদের কী ব্যাঘাতটা ঘটছে? হরে আমি চেঁচাচ্ছি, না টিন পেটাচ্ছি?'

অথবা বুবু ঠোঁট উল্টে বলতো, 'না করলেই বা কী? তোমার উপস্থিতিটাই আমাদের অনুভূতির উপর টিন পেটানোর সামিল।'

'ওঃ, বড্ড কথা শিখেছিস ! বলগে যা না তোদের সোহাগের বাপীকে একটা সাতমহলা বাড়ির ব্যবস্থা করতে।'

'তার চেয়ে অনেক সোজা তোমার সাজের মাত্রাটা একটু কমানো।'

'বড বড় কথা বলিসনে বুবু—' দীপিকা ধমকে উঠতো, 'বয়সের মতো থাক।'

বুবু তবুও কথা বলতো।

মা-র সাজের উপকরণ নিয়ে নানা মন্তব্য করতো, সাহিত্য-সভায় যোগ দিতে যেতে এতো সাজসজ্জা অবশ্য প্রয়োজনীয় কিনা এমন সব কূট প্রশ্ন তুলতো। অর্থাৎ বুবু বয়সের মতো থাকতো না।

অথচ এখন বয়েস হয়েও চুপ করে থাকে। বইয়ে চোখ ফেলে গুম্ হয়ে বসে থাকে। দীপিকা নামের একটা মানুষ যে ঘরের মধ্যে ওই ডজনখানেক কৌটা-বাটা নিয়ে ছুটোছুটি করে বেডাচ্ছে, তা যেন দেখতেই পায় না।

আগে এতো রকম উপকরণের ব্যবহার জানতো না দীপিকা, এখন শিখেছে, আরো শিখছে। কারণ এখন দীপিকার নিজেব রোজগারের পয়সা হাতে আসছে, আর দীপিক অনেক বেরোচ্ছে।

না, আগে এতো বেশী বেরোতো না দীপিকা, সংসার-সংসার বাতিকই ছিল বরং তার। তার সঙ্গে লেখার শখ একটু ছিল, অবকাশ সময়ে সেটা নিয়ে বসতো। কদাচ সংসার ভাসিয়ে দিয়ে নয়।

কিন্তু এখন দীপিকার পদ্ধতির বদল্ হয়েছে, এখন সংসার ভাসাচ্ছে, নিজেকে ভাসাচ্ছে।

কারণ এখন বাজারে দীপিকার লেখার কদর হয়েছে, দীপিকা লেখার জন্যে দাম পাচ্ছে। অর্থাৎ দীপিকা দরের মানুষ হয়ে উঠেছে। দীপিকাকে অতএব প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন সভায় যোগ দিতে হচ্ছে, যেহেতু দীপিকা মজুমদার নামটা সাহিত্য সমাজের তালিকায় উঠে গেছে।

এখন দীপিকার নামে রাতদিনই আসছে চিঠি-পত্র কার্ড।

গোডায় গোডায় সুরঞ্জন বলতো, 'পোস্টে একটা কার্ড এলেও ছুটতে হবে ? ওতে মান থাকে ?'

দীপিকা তখন বলতো, 'কার্ডটা যে পাঠিয়েছে মনে করে এটাই যথেষ্ট বাবা, তা নয়তো কি দীপিকা মজুমদারকে গাড়ি এনে সাধবে ?'

কিন্তু এখন তো সে ঘটনাও ঘটছে মাঝে মাঝে, গাডি এনে সেধেও নিয়ে যাচ্ছে দীপিকা মজুমদারকে। এখন দীপিকা মজুমদার হচ্ছে প্রগতিশীল লেখক-গোষ্ঠির একজন। তেমন তেমন সভায় প্রধান অতিথির ভূমিকাটিও গ্রহণ করতে হয়। ভূমিকা না জুটলেও গিয়ে জোটে।

সাজবার একটা সুযোগ তো জোটে তাতে।

অবশ্য আড়ালে সবাই হাসাহাসি করে ওর সাজের ঘটা দেখে, কিন্তু তাতে কি এসে গেল, আড়ালে তো লোকে রাজার মাকেও ডাইনি বলে।

নিজের মেয়েরা বিদ্রূপ করে? বুবু টুটু?

বয়েই গেল। দীপিকা ওতে কেয়ার করে না।

আসল কথাটা তো ধরা পড়ে গেছে দীপিকার কাছে। মায়ের এর হঠাৎ 'নাম-ডাকে' মেয়েদের হিংসে জেগেছে।

মা ঘর-সংসার করবে, তোদের সুখ-সুবিধে দেখবে, তোদের ওই কাগজের স্বর্গে আত্ম-গোপনকারী বাপকে তোয়াজ করে করে ডেকে ডেকে খাওয়াবে মা, এই ব্যস। বড়জোর অবকাশকালে একটু খাতা কলম নিয়ে বসবে! আবার কি!

মেয়েরা তো এখন কিছুই বলে না, তবু নিজেই কথা গেঁথে মনে মনে উত্তর দেয় দীপিকা। আর তোমরা? তোমরা সোহাগী মেয়েরা? তোমরা ইস্কুল যাবে, কলেজ যাবে, পাস করবে, নাম করবে, আর ম্যাট্রিক-ফেল মাকে—অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখবে। এই তো? এইটাই ছিল ন্যায্য, কেমন? ত' হচ্ছে না।

চাকা ঘুরে গেছে।

ম্যাট্রিক-ফেলই ডঙ্কা বাজিয়ে পাদপ্রদীপের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই তোমাদের গোঁসা, কেমন? দীপিকা বোঝে, তাই গ্রাহ্য করে না মেয়েদের অপছন্দ। ষোল রকম উপকরণ জুটিয়ে এনে ওদেরই সামনে ঘুরে ফিরে হেঁটে চলে ঘণ্টাখানেক ধরে সৌন্দর্যবৃদ্ধির অনুশীলন করে। তারপর বেরিয়ে যায় বহুবিধ প্রসাধন-দ্রব্যের মিশ্রিত সৌরভে ঘরটাকে স্বপ্নাতুর করে রেখে।

জিনিসগুলো চাবি-বন্ধ ড্রয়ারে রেখে যায়। তার কারণ—মেয়েরা ওগুলো দেখে ফেলে এটা দীপিকার ইচ্ছে নয়। কত রকম কলাকৌশলেই যে চেহারাটিকে রাখতে হয়, তা প্রকাশ না-করাই ভাল।

ওঁরা হচ্ছেন ঠিক বাপটির মত,মনে ভাবে দীপিকা, বুনো, জংলী।

কী ছিরি করেই থাকে!

ওরা শাড়ী ধরা পর্যন্ত দীপিকা কি অনেক চেষ্টা করেনি ওদের সভ্য করে তোলবার জন্যে?

করেছে চেষ্টা।

ওরা নেয়নি সেই পরামর্শ, বুদ্ধি, আদর।

টুটু বলেছে, 'থাক মা, ওসব কমনীয়তা নমনীয়তা পেলবতা চারুতা ঔজ্জ্বল্য অতুল্য' তোমার জন্যেই থাক। তোমাকেই মানায় ওসব, আমাদের নিয়ে আর টানা-হেঁচড়া কোরো না।'

আর বুবু বলেছে, 'মহৎ লক্ষ্য, মহৎ কাজ, ওসব তুচ্ছ ব্যক্তিদের জন্যে নয় মা, এই আমার লক্ষ্যবিহীন জীবনটা নিয়ে বেশ আছি। শরীরটাকে নিয়ে আর বাগানের মালির মত খাটতে পারি না।'

'বাগানের মালি ?'

দীপিকা ভুরু কুঁচকেছে।

বুবু ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভঙ্গীতে হাত উল্টে বলেছে, 'তা ছাড়া আর কি ? এও তো সেই জল দাও, সার দাও, ছাঁটো-কাটো, পর্যবেক্ষণের ওপর রাখো, উঃ! ও তোমারই পোষায়।'

দীপিকা রেগে লাল হয়েছে, দীপিকা অতএব মেয়েদের হিতচেষ্টা থেকে বিরত হয়েছে। তাই ওরা দুটো তরুণী মেয়ে সাদা শাড়ী পরে, খালি হাত করে আর চুলগুলোকে খুড়ো খুড়ো করে বেড়ায়, আর ওদের মধ্যবয়সী মা মুখে-চোখে রঙের তুলি বুলিয়ে দশ রকম মশলা দিয়ে গা মেজে ছ' ইঞ্চি চওড়া ব্লাউজ পরে সমাজে চরে বেড়ায়।

ইদানীং আবার চুলের নীচে বল বসিয়ে টোপরের মতো খোঁপা বাঁধতে শুরু করেছে। শিখেও ফেলেছে কায়দাটা নিখুঁত করে।

আজও সেই কায়দার জাল বিছিয়ে তার মধ্যে ভেজালের গোলা পুরে খোঁপা-টোপা বেঁধেছে ঘণ্টাখানেক ধরে, খেয়াল করেনি দু' দু' জোড়া জ্বলন্ত চোখ তার ওই দেবদেউল খোঁপাকে ভস্ম করতেই শুধু বাকি রাখলে।

কিন্তু শুধু ওই সাজটুকুর জন্যেই কি এত বিদ্বেষ আর ঘৃণা বুবু আর টুটুর? লেখিকা দীপিকা মজুমদারের দুই মেয়ের মায়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতাটুকুকে ক্ষমার চোখে দেখবার মতো সামান্য উদারতাটুকুও নেই ?

ক্ষুদ্র সংকীর্ণ অপরিসর হৃদয়টুকু নিয়ে তাই এই সুরভীভাবাচ্ছন্ন ঘরে বসে আছে তিক্ত বিরক্ত মুখ নিয়ে।

বসেছিল।

হাতের বইটায় চোখ রেখে পড়া-পড়া খেলা করছিল দু'জনে টেবিলের ধারে বসে।

হঠাৎ একসময় বইটা সশব্দে বন্ধ করে রেখে বুবু বলে ওঠে, 'অসহ্য!'

টুটু হয়তো অন্যমনা ছিল, তাই একটু চমকে উঠে বলে, 'কী অসহ্য ?'

'সবটাই।'

টুটু আবার বইতে চোখ রাখে মাথা নামিয়ে।

বুবু আরো কড়া গলায় বলে, 'কর কর, মাথাটাই হেঁট কর ভাল করে। ওটাই তো সম্বল হবে শেষ পর্যন্ত। মাতৃদেবী যে রেটে আধুনিক হচ্ছেন! পড়েছিস ওনার লেটেষ্ট বইখানা ?'

টুটু তেমনি মাথা হেঁট করে বলে, 'না।'

'না ? কেন ? না কেন ?' বুবু উঠে দাঁড়ায়। টুটুর মাথাটা ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'পড়তে হবে। পড়ে দেখতে হবে পাঠক-সমাজ কী চায়। কোন গুণে শ্রীমতী দীপিকা মজুমদার—সাহিত্য-সভার সভানেত্রী হয়ে মঞ্চে ওঠেন।

টুটু আস্তে হেসে বলে, 'তা আমার মাথাটা ভাঙছিস কেন ?'

'ইচ্ছে হচ্ছে।' বুবু চড়া গলায় বলে, 'তোর আমার বাংলাদেশের পাঠক-সমাজের, সকলের মাথা ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করছে।'

'পেরে উঠবি না' বলে টুটু আবার পড়ার বই খোলে।

'বই রাখ।' বুবু ওর হাত থেকে বইটা টেনে ফেলে দিয়ে বলে, 'অথচ আগে মা মন্দ লিখতো না। এক-একটা গল্প বেশ ভালই লিখতো। কিন্তু এখন মা-র সাহিত্যের প্রধান উপকরণ কি হয়েছে জানিস?'

বুবু দম নিচ্ছিল, টুটু আস্তে বললো, 'জানি। ব্রেসিয়ার।'

'ওঃ!'

বুবু আর একবার ওর মাথাটা ধরে নাড়া দিয়ে বলে, 'তবে যে বললি পড়িস নি?'

'না পড়লেও বোঝা যায়।'

'না পড়লেও বোঝা যায়?'

'নিশ্চয়! নাম হয়েছে যখন, লেখার দাম পাচ্ছে যখন। ধরেই নিতে হবে, প্রধান উপকরণটা খুঁজে পেয়ে গেছে।'

বুবু আর একবার ওর মাথাটা ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'তোর রক্তটা কি বরফজল দিদি? তেতে উঠতে জানে না?'

টুটু চোখ তুলে একটু হাসে।

'আবার? আবার হাসছিস? জানিস, কাল ওই বইটা পড়া পর্যন্ত মা-র দিকে তাকাতে পারছি না আমি—'

'আর পড়িস না।' বলে টুটু ফের পড়ার বইটা হাতে নেয়। কিন্তু বুবু ফের কাড়ে, সরিয়ে রাখে। ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'আমি না হয় না পড়লাম, দেশ-সুদ্ধু লোক পড়বে না? আত্মীয়রা? বন্ধুরা? আমাদের কলেজের মেয়েরা? বাবার ছাত্ররা?'

বুবুর মুখটা উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়তে চাইছিল। বুবু হাত দুটো মোচড়াচ্ছিল।

টুটু একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, 'তা পড়েছিস তো কাল, আজ হঠাৎ এতো ক্ষেপে উঠলি কেন?'

'কেন?' বুবু সেই লাল লাল মুখে বলে, 'কেন জানিস? কাল থেকে ভেবেছি, আজ মা যখন এই ঘরে এসে ঘুরে ঘুরে সাজতে শুরু করবে, তখন বলবো—'

'বলবি? কী বলবি?'

'বলবো—হয় তোমার ওই লেখা আর এই সাজ ছাড়ো, নয় আমাদের ছাড়ো। বলবো—তুমি যদি ঘরে বাইরে আমাদের মুখ দেখাবার পথ বন্ধ করো তো আমাদের পথ দেখতে দাও। কিন্তু পারলাম না। মনে হলো, বললেই হয়তো মা বলে উঠবে, "সাহিত্যের তোমরা বোঝো কি? সাহিত্যে সুন্দর নেই, অসুন্দর নেই, রুচি নেই, অরুচি নেই, পাপ নেই, পুণ্য নেই,

আব্রু নেই, বে-আব্রু নেই, সাহিত্য হচ্ছে সাহিত্য।" কবে যেন কোন সভায় বলে এসেছিল এসব মা, কাগজে বেরিয়েছিল, পড়িসনি ?"

'কাগজে বেরিয়েছিল মা-র বক্তৃতা ?'

টুটু হেসে ওঠে, 'তবেই বোঝ ? গেরস্তঘরের ভদ্রমহিলা, রাঁধছিল, বাড়ছিল, সংসার করছিল, হঠাৎ খবরের কাগজ ওর ভাষণ ছাপছে, পাবলিশাররা ওর দরজায় হাঁটাহাঁটি করছে—সে তো 'নেই'-টুকুর জোরে ? যদি বলতো সব আছে—পাবলিশার ঝেড়ে জবাব দিতো, ঠিক আছে। তাহলে তুমিও থাকো।'

বুবু বসে পড়ে।

বুবু হতাশ গলায় বলে, 'সাধে কি বলেছি তোর গায়ে রক্ত নেই, শুধু বরফজল। আমার মাথার মধ্যে রক্ত টগবগিয়ে ফুটছে। মনে হচ্ছে মা হয়তো আমাদেরও মা-র ওই গল্পের নায়িকার মত মনে করে। যারা—'

বুবু আরো কি বলতে যাচ্ছিল, থেমে যেতে হল। সুরঞ্জনের চটিজুতোর শব্দ পাওয়া গেল।

বুবু হঠাৎ টেবিল থেকে একটা বই তুলে নেয়। মনে করা যেতে পারে, এতক্ষণ বুঝি অখণ্ড মনোযোগে বইটিই পড়ছিল।

সুরঞ্জন এসে ঘরে ঢুকলেন।

স্খলিত অসহায় গলায় বলে উঠলেন, 'তোমার ঠাকুমা বিকেলে কিছু খেয়েছেন ?'

ঠাকুমা !

তিনি খেয়েছেন কিনা সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হবে বুবুদের ?

বুবু মাথা নাড়ে, 'জানি না।'

'জানো না ?'

সুরঞ্জন অসহায় গলায় বলেন, 'একটু জানবে তো ? বুড়ো মানুষ, বিছানায় পড়ে আছেন—'

'আচ্ছা যাচ্ছি, দেখছি—' বুবু বলে।

কিন্তু সুরঞ্জন কি শুধু তাঁর মেয়েদের মানবিকতার পাঠ দিতেই এসেছিলেন ?

তাহলে আশ্বাস পেয়ে চলে গেলেন না কেন ? কেন অকারণ একটু দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর কেন খুব একটা লজ্জিত লজ্জিত গলায় প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁরে, তোদের মা যা-সব লেখে-টেখে পড়িস ?'

টুটু তো দূরস্থান, বুবুও বাপের প্রশ্নের সামনে চুপ করে থাকে।

সুরঞ্জন উত্তরের প্রত্যাশায় একটু অপেক্ষা করে আবার বলেন, 'তোরা তো তোদের মা-র সঙ্গে বন্ধুর মতো ঠাট্টা-তামাশা করে কথা বলিস, তা সেই রকম করেই বলিস না একটু, ওই সব ছাই-পাশ লিখে কি হচ্ছে?'

বুবু ওই নম্র মিতবাক মানুষটার অসহায় মুখের দিকে তাকায়, বুবু বোঝে অনেক দুঃখেই বাবা—তাই সে বাবার মুখের দিকে চেয়ে থাকে শুধু। বলে ওঠে না, আহা, বললেই যেন শুনবেন আমাদের মা-জননী! বাঘিনী এখন রক্তের স্বাদ পেয়েছেন তা খেয়াল রাখ? নাম ডাক অর্থ। এর স্বাদ কি সোজা নাকি? এর কাছে 'লোকে কি বলবে?' তাহলে আর লোকে ঘুষের টাকায় বাড়ি হাঁকড়ে অপরকে ডেকে ডেকে দেখাত না, চোরা কারবারের টাকায় গাড়ি কিনে লোকের নাকের ওপর ধুলো উড়িয়ে চলে যেত না।

বুবুর মায়া হল। বুবু বলতে পারল না।

কিন্তু বলল টুটু।

যেটা অপ্রত্যাশিত।

টুটু খুব মোলায়েম গলায় বলে উঠল, 'বারণ করলে মা তাঁর কলমের গতি বদলাবেন বলে মনে হয় তোমার?'

সুরঞ্জন অপ্রতিভ অপ্রতিভ গলায় বলেন, 'না, নিষেধের কথা বলছি না। মানে আর কি একটু বুঝিয়ে বলবি। এই দেখ না সম্প্রতি কি নাকি একটা লিখেছে—সেটা হাতে করে নিয়ে এসেছিল তোদের দেবুকাকা, বলছিল—'

বুবুকে অবাক করে দিয়ে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে টুটু, 'দেবুকাকা শুধু মা-র ওই লেখার কথাই বলে গেলেন? মা-র সাজ-সজ্জার উন্নতির কথা বলে গেলেন না? মা-র আচার-আচরণ, চরে বেড়ানো, এ সব নিয়ে বললেন না?'

সুরঞ্জন লজ্জিত বিপর্যস্ত গলায় বলেন, 'বলছিল তো সে সব—'

টুটু গম্ভীর গলায় বলে 'আচ্ছা বাবা, তুমি পারো না শাসন করতে? তোমারই করা উচিত।'

'আমি?'

সুরঞ্জন ম্লান গলায় বলেন, 'আমি বারণ করলে তো আরো বেশী করে করবে। তোরা মেয়ে, তবু যদি তোদের কথা নেয়। আচ্ছা, ইয়ে, ঠাকুমাকে একবার দেখিস—'

সুরঞ্জন তাড়াতাড়ি চলে যান।

প্রখরা বুবুর বাবার ওটি নিরুপায় মুখচ্ছবির দিকে তাকিয়ে মনটা কেমন করে আসে।

ঘরের মধ্যে যে সৌরভসারের রেশটুকু তখনো খেলা করছিল, বুবু যেন তার ঘ্রাণ নেয়।

আস্তে বলে, 'বেচারা বাবা! আমাদের তো তবু পথ আছে, বাবার জন্যে দুঃখ হয়।'

'দুঃখ হয়? বাবার জন্যে তোর দুঃখ হয়?'

বুবুকে আশ্চর্য করে দিয়ে 'বরফজল' টুটু হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, 'বলতে লজ্জা করলো না তোর একথা? প্রধান আসামী কে জানিস? ওই 'ভদ্র' ব্যক্তিটি। ওই আমাদের ভদ্র সভ্য মার্জিতরুচি বাবাটি। যিনি শুধু নিজের ভদ্রতার খোলশটুকুকে প্রাণপণে সামলে চলা ছাড়া আর কোন করণীয় খুঁজে পাননি।...খেয়াল করেননি বিষের চারাকে চারাতেই নির্মূল করা দরকার। আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকতো, তাহলে কী করতাম জানিস? এই আমাদের বাবার মত দায়িত্বজ্ঞানহীন ভদ্রলোকদের কর্তব্যচ্যুতির অপরাধে ধরে ধরে জেলে পাঠাতাম। বলতাম—কেবলমাত্র নিজেকে সভ্য ভদ্র মার্জিত করে রাখাই তোমাদের একমাত্র কর্তব্য ছিল? আর কিছু কর্তব্য ছিল না? রক্তে তোমাদের বরফ ছাড়া আর কিছু নেই?'

ইস্পাতের পাত

পাখির খাঁচাও খাঁচা, বাঘের খাঁচাও খাঁচা! আশ্চর্য বটে!

বেচুলাল মনে মনে একটা অভব্য শব্দ উচ্চারণ করে বলে উঠলো, শয়তানদের সব ভাষারই এক মানে।

ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছিল মিটমিটিয়ে। সুধীর নরম শরীরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পরা ডুরে শাড়ীর মোটা ডোরাগুলো গরদের ফাঁক থেকে চিড়িয়াখানার বাঘের গায়ের ডোরার মত দেখতে লাগছিল।

অন্ততঃ নিজের বাড়ির অন্ধকার ছাঁচতলায় প্রেতের মত ঘুরে বেড়ানো বেচুলালের তাই মনে হচ্ছিল।

চিড়িয়াখানার খাঁচায় ভরা বাঘ ছাড়া কে আবার কবে বাঘ দেখেছে, বেচুলাল মনে মনে বললো, বাঘগুলো তবু, দু দণ্ড চুপ করে খাঁচার মধ্যে বসে থাকে!' কিন্তু বাঘ-ডুরে শাড়ী পরা সুধীটা অনবরত নড়ছে, পাক খাচ্ছে, শরীরটা নিয়ে মোচড় দিচ্ছে।

তার মনে লীলাখেলা হচ্ছে।

বেচুলাল একবার দাঁতে দাঁত পিষলো, তারপরই কেমন একটা নারকীয় উল্লাসের ভঙ্গীতে একা একাই দাঁত খিঁচিয়ে হাসলো।

তারপর মনে মনে ওই কথাটা উচ্চারণ করলো বেচুলাল, পাখির খাঁচাও খাঁচা, বাঘের খাঁচাও খাঁচা। শয়তানদের সব ভাষারই এক মানে।

এ স্থলে পাখি কে, বাঘ কে এবং শয়তানেরাই বা কে, তা অবশ্য কিছুই বোঝা গেল না। তবে নিজেরই বন্ধ ঘরের কানাচে কানাচে পাক খেয়ে বেড়ানো বেচুলালকেও অনেকটা চিড়িয়াখানার বাঘের মত দেখতে লাগছিল।

বেচুলালের গলায় ঝোলানো চাঁদির চাকাতটা মাঝে মাঝে কোথাকার যেন আলো এসে পড়ে চকচক করে উঠছিল, আর বেচুলালের কপালের শির দুটো দপ দপ করে ফুলে উঠছিল।

হঠাৎ একবার মাটিতে একটা পা ঠুকে বেচুলাল হিসহিসিয়ে বলে উঠলো, 'কাল একটা আস্ত মুরগী কিনে আনবো। সুধীর মতন মোটাসোটা নরম নরম। কসে লঙ্কা দিয়ে রাঁধবো, ফাষ্টো কেলাশ চাট হবে।'

ভাবী সেই মুরগীটার চেহারাটা—ভাবতে ভাবতে বারবার বেচুলাল সুধীর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতে লাগলো।

আগে সুধীকে পাখি পাখি দেখতে লাগলো। গলা সরু রোগা পাখি। বেচুলালের পায়ের কাছে পড়ে ঝট পট করতো আর বলতো, 'আমি পারবো না।'

বেচুলাল তার ডানা ধরে টেনে তুলতো, কড়া গলায় বলতো, 'পারবি না মানে? তোর ঘাড় পারবে।'

'আমি তোমার বে' করা পরিবার না?'

বেচুলাল হলদে হলদে দাঁত বার করে হা হা করে হাসতো, 'তা সেই জন্যেই তো তোর ওপর আমার পুরো দখল। আমি তোর পরম গুরু বুঝলি? আমার সব হুকুম মানতে হয়।'

'তাই বলে এই হুকুম করবে তুমি আমায়?'

বেচুলাল তখন আবার সুখীর গায়ে মাথায় আদরের চাপড়া মেরে মেরে বলতো, তাতে কি? শয়তানদের নাকে ঝামা ঘষে তাদের পকেটের কিছু খসিয়ে আনা বৈ তো নয়। শয়তানেরা তো তোকে 'বস্তির মাগী' ভিন্ন আর কিছু বলে না, রাস্তায় আমাদের দেখলে এমন করে নাক সিঁটকোয়, যেন ঘেয়ো কুকুর দেখলো। আর এখন? আরে ওই যে সামনের তিন তলার বিবি? যিনি রাত ভোর শূন্য ঘরে পড়ে পড়ে ককান, আর সকাল হলেই অহঙ্কারে মট মট করতে করতে মাছি পেছলানো মুখে মটর গাড়ী চেপে বাজারে বেরোন? ...যাস্‌না একদিন তার গা ঘেঁষে বসতে? গুলি করে মারতে আসবে। অথচ তিনি যার জন্যে ককিয়ে মরছেন, সেই লোকের নাকে ঝামা ঘষবি তুই! বলি এটা কম আহ্লাদের কথা না কি?'

বেচুলাল বলতো আর হাঁপাতো।

সুখী কিন্তু এর মধ্যে আহ্লাদের কিছু খুঁজে পেতো না। সুখী বলতো, 'তাই বলে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করবে তুমি? চোরের ওপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খাবে? বড়লোক তোমাদের ঘেন্না করে বলে তুমি বড়লোককে এনে—।'

সুখী ডুকরে উঠতো, 'ও সব তোমার ছলের কথা, রূপসী পরিবারকে দিয়ে রোজগার করাতে ইচ্ছে তাই বল।...আমি পারবো না, আমি পারবো না।'

তখন বেচুলাল ওর সেই দুপুরের রোদের মত চোখ ঝলসানো ঝকঝকে ছোরা খানা বার করে দেখতো।

বলতো, 'না পারবিতো—এই!'

নরম শরীরে ছোরা গিঁথে দেবার হিংস্র একটা ভঙ্গী করতো বেচুলাল।

'তা' তাই করো—সুখী নির্ভয়ে বলতো, 'ওই ছুরিখানা দিয়ে আমায় কুটি কুটি করে কেটে বরং বেগুন বানিয়ে খেয়ে ফেলো।'

বেচুলালের প্রাণে মমতার বালাইমাত্র নেই, বেচুলাল নিষ্ঠুর আর নির্লজ্জ হাসি হেসে বলতো, 'একদিন খেয়ে আর কী হবে? জীইয়ে রাখলে রোজ রোজ ভাঙিয়ে খাওয়া যাবে।'

'তুমি আমার ধর্মসাক্ষী স্বামী, তুমি আমায় দিয়ে এত বড় অধর্ম করাবে?'

'ধর্ম? অধর্ম?' বেচুলাল হা হা করে হেসে উঠতো, 'ধর্ম অধর্ম, পাপ পুণ্যি ও সবই শয়তানদের সাজানো কথা, বুঝলি? দেখবি কিছুর মধ্যেই কিছু নেই। মদকে মদ বলিস

তো মদ, জল বলিস তো জল। সবই কথার খেলা। এই যে আমি? তোর মতন ধর্ম সাক্ষীর পরিবার' ছেড়েও যাই না ইদিক উদিক? পয়সা থাকলে আরো যেতাম। রোজ এক তরকারী ভাল লাগে? রোজ একই মাছ?'

হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল সুখী।

হঠাৎ মাটি থেকে উঠে বসেছিল ধড়মড়িযে। তারপর আঁচলটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলেছিল, বেশ তোমার যা ইচ্ছে।'

'বাঃ। এই তো লক্ষী মেয়ের মতো কথা।'

বেচুলাল নিজের বক্তৃতা মাহাত্ম্যে নিজেই মোহিত হয়ে গিয়েছিল, নিজের যুক্তি সৌন্দর্যে নিজেই মুগ্ধ।

এতো বাক্যচ্ছটা যে বিস্তার করতে পারবে সে ভাবেওনি, আসল ভরসা ছিল সেই রোদ ঝলসানো ছোরা খানার ওপর। এক ভয় দেখিয়ে অন্য ভয় ভাঙবে।

আর—প্রাণের ভয়ের কাছে অন্য কোন ভয়?

ধর্ম ভয়? পাপ পুণ্যের ভয়? লোকলজ্জার ভয়? ফোঃ!

কিন্তু বেচুলালের বচনেই অনেক কাজ হলো।

সুখী নখে নখ খুটে বললো, 'কিন্তু আজ থেকে না।'

আজ থেকে নয়।

তার মানেই কাল থেকে।

তার মানেই সম্ভাবনার দরজা খুলে দেওয়া।

সামনের তিনতলার ওই বাবুটা অবিরতই বেচুলালকে ধরছিল। মোটা বখশিস দিতে চাইছিল।

জানতো না—কলকাতায় জল নিতে আসা অসংখ্য মেয়ের মধ্যে ওই যে চোখে পড়ার মতো মেয়েটা, ওটা বেচুলালেরই বিয়ে করা বৌ।

প্রস্তাবটা শুনে প্রথমটা বেচুলালের চোখেব কোণে ফস্ করে আগুন জ্বলে উঠেছিল। বেচুলালের ঘরের মধ্যে রাখা ছোরাটা যেন মুঠোয় উঠে আসবার জন্যে ঠিকরে উঠেছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে বেচুলালের চোখের সেই আগুনের রং বদলালো। সেটা লোভ হয়ে জ্বলে উঠলো।

বেচুলাল যেন হঠাৎ একটা নতুন দিগন্তের সন্ধান পেলো।

সঙ্গে সঙ্গে বেচুলাল আসল বিলিতি 'মাল' এর স্বপ্ন দেখলো স্বপ্ন দেখলো সাত সকালে উঠেই র্যাঁদা তুরপুন হাতুড়ির থলে ঘাড়ে রাস্তায় বেরোনোর বদলে অনেক বেলা অবধি ঘরের চৌকীতে শুয়ে পা নাচিয়ে বিড়ির ধোঁওয়া ওড়ানোর।

বেচুলালের মনে হোল—কী মুখ্যু, আমি কি মুখ্যু! ঘরে ধানের গোলা থাকতে আমি পেটে খিল মেরে পড়ে আছি। ছি! ছি! সামনের যে তিনতলা বাড়িটাকে

দেখতো, আর লাথি মেরে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে হতো বেচুলালের, সেই বাড়িটাকে হঠাৎ বেশ মজাদার লাগতো তার। ও বাড়ির ওই নাক উঁচু মহারাণীর উঁচু নাকটা অধম বেচুলালের বৌয়ের পায়ের তলায় ঘসটাচ্ছে ভেবে এক পাক নেচে নিতে ইচ্ছে হলো, আর যে বাবুটাকে পায়ের জুতো খুলে মারতে ইচ্ছে হয়েছিল, 'গুরু' বলে তার পায়ে পড়তে ইচ্ছে হলো।

গুরুই বলতে হবে।

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।

তারপর চলেছে একই নাটক।

তিনতলা থেকে, আরো কত ওপরতলা, মাঝতলা, নীচতলা।

বেচুলাল তাদের পথ প্রদর্শক।

বেচুলাল তাদের পাতালের তলাটা দেখাতে জানে।

এই চাকরীটা থেকে তার স্বপ্ন সফল হয়েছে বৈ কি করাতের থলে হাতে নিয়ে বেরোনাট আর দরকারই মনে হচ্ছে না, সেই সময়টা বাজারে গিয়ে দেখে শুনে মাছমাংস কিনে আনছে।

আসল বিলিতি 'মাল' এবং স্বাদও পাচ্ছে মাঝে মাঝে, নানা দিক থেকেই পাচ্ছে।

সারা দিনটাই আরাম।

যন্ত্রণা যা এই রাতের অন্ধকারে নিজের বন্ধ ঘরের আনাচে কানাচে ছোরা লকলকিয়ে ঘুরে বেড়ানোয়।

হ্যাঁ, ছোরাটা বেচুলাল সঙ্গে রাখে। কারণ মাঝে মাঝেই সেটাকে একটা নরম শরীরে সজোরে গিঁথে দেবার ইচ্ছে দুর্দাম হয়ে ওঠে বলে নরম অন্ধকারের গায়েই মাঝে মাঝে গিঁথে গিঁথে বসায়।

তবু প্রথম দিকে বুঝি এতো যন্ত্রণা ছিল না।

যখন শুধু তিনতলা থেকে নেমে আসতো চুপি চুপি চোরের মত। আর টাকাটা গুঁজে দিতো বেচুলালেরই হাতে।

তখন সুখী অমন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে শাড়ী পরতে শেখেনি, তাই বোধকরি পাখির খাঁচা আর বাঘের খাঁচার তুলনাটাও মনে আসতো না বেচুলালের।

তখন বেচুলাল মাছ তরকারি ভর্তি বাজারের থলিটা উপুড় করে দিয়ে হেসে হেসে বলতো, 'রাঁধ দিকি সুখী বেশ মজিয়ে। খাটছিস খুটছিস, ভাল করে খা দা।'

সুখী ভারী ভারী মুখে জিনিসগুলো গুছিয়ে তুলতে তুলতে বলতো, 'তুমিই খাও।'

'রাগ পুষে রেখেছিস তা'হলে এখনো?' বেচুলাল দেঁতো হাসি হেসে বলতো, 'মন থেকে

ঝেড়ে ফেল, মন থেকে ঝেড়ে ফেল। তুই যেমন আমার আছিস তেমনিই থাকবি, মাঝে থেকে সংসারের একটু সুসার হলো, বুঝলি না?'

'বুঝেছি—' ব'লে ঘরে ঢুকে যেতো সুখী।

কিন্তু এখন বাতাস অন্য দিকে ঘুরেছে।

এখন সুখী পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঘ-ডুরে শাড়ী পরতে শিখেছে, চটি পায়ে দিতে শিখেছে, আর এখন সুখী বেচুলালকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে শিখেছে। এখন সুখী আরো অনেক কিছুই শিখেছে।

'পাখি এখন বাঘ হয়ে উঠেছে—'

হিসহিসিয়ে নিজের আগেই নিজে কথা বলে বেচুলাল, 'রক্তের আস্বাদ পেয়েছে এখন বাঘ।'

টাকা লুকিয়ে রাখে। মেপে এমন করে দেয়, যেন ভিক্ষে দিচ্ছে। আবার শুনিয়ে বলে, 'আ-জোয়ান একটা পুরুষ কী করে যে গতর নিয়ে ঘরে বসে থাকে, তা ভগবানই জানে। অমন গতরে ছাতা ধরে না গো!'

বেচুলালকে এখন এসব সয়ে যেতে হচ্ছে। কিন্তু আজ হঠাৎ ক্ষেপে গেছে সে। ক্ষেপে যাবার কারণ এই—আজ সুখী ওই মটর গাড়ী চড়া বাবুটার সামনে কি না হি হি করে বলেছে, 'লোকটা কে জানেন বাবু? আমারই অগ্নি সাক্ষীর স্বামী!'

কেন? কেন? কী দরকার ছিল তোর এ কথা বলবার?

বেচুলালের মুখটা এতে ধুলোয় ঘসটে গেল না?

হঠাৎ কী খেয়াল হয়েছিল বাবুর, বলে উঠেছিল, 'একটু গড়ের মাঠে বেড়িয়ে আসবে তো চল।'

বেশ যাচ্ছিলি যাচ্ছিলি বাহারি শাড়ী পরে চটি পায়ে দিয়ে যেতিস তাই। বেচুলালের সমস্ত শরীরে আগুনের জ্বালা ধরে গেলেও কিছুই তো বলেনি সে। কিনা হঠাৎ আহ্লাদে গড়িয়ে বলা হলো, 'দোরে চাবি লাগিয়ে তুমিও উঠে এসোনা গো! বেড়িয়ে আসবে।'

বাবুটা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। তখন হেসে গড়িয়ে বলা হলো, 'বাবু বুঝি রাগ করছেন? তবে থাক্, তবে থাক্। লোকটা কে জানেন বাবু? আমারই অগ্নিসাক্ষীর স্বামী! গাড়ি ছেড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়ার ভাগ্যি তো কখনো হয়নি, তাই মনটা কেমন করে উঠল।'

তারপর ধপাস করে গাড়ীর দরজা বন্ধ করে নাকের ওপর দিয়ে চলে গেল।

না যাবে তো বেচুলাল কি সত্যি গাড়ীতে উঠে বসতে যাবে?

কিন্তু সেই থেকে যেন ফুঁসে বেড়াচ্ছে বেচুলাল।

আজ একটা হেস্ত নেস্ত করে ছাড়বে সে।

'আমার জিনিস, আমারই থাকলি—' এ সান্ত্বনায় এখন আর ভ্রূক্ষেপও নেই সুখীর, কাজেই অবহেলা দেখিয়ে জব্দ করা যাবে না ওকে। যেটা গোড়ার দিকে যেতো।

'এখন ওষুধ হয়েছে স্রেফ এই—' অন্ধকারেও ঝলসে উঠল ফলাটা, রোদে ঝকমকে দুপুরের মত।

কতক্ষণ পরে যেন 'ধমাস' করে গাড়ীর শব্দ হলো। পাশের ঘরের লতিকা তার 'না বিয়ের বর' নন্দকে ডেকে চুপিচুপি বলে উঠল, 'দেখতে দেখতে সুখীটা কী পাহাড় হয়ে উঠলো দেখেছ ?'

'দেখেছি বৈকি—' বললো নন্দ, 'এই জন্যেই বলে, মেয়েছেলে জাতকে বিশ্বেস নেই।'

'হ্যাঁ, সব মেয়ে মানুষই যেন এক ?' লতিকা বেজার গলায় বলে, 'এই যে আমরা! এমন কিছু ভগবতী নই। তা বলে ওই রকম!'

নন্দ আর উত্তর দিল না।

বোধহয় ঘুমিয়ে পড়লো।

কিন্তু বেচুলাল এসব দেয়ালে কান পাততে যায় না। বেচুলাল এতক্ষণ পরে নিজের ঘরে উঠে কড়া গলায় বলে,—এই ঘুমিয়ে পড়লি না কি ?'

সুখী অন্য দিনের মত স্বামীকে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে না। শুয়ে শুয়ে একটা হাই তুলে বলে, 'ঘুমোবো এইবার।'

'ঘুমোবি কি মরবি, যা খুশী করগে যা। তার আগে টাকাগুলো ফেলে দে আমায়। একটি নয়া পয়সা সরিয়েছিস কি খুন করে ফেলবো।'

সুখী এবার উঠে বসে।

ক্রুদ্ধ ব্যঙ্গের গলায় বলে, 'বটে, তা কেন শুনি ?'

'কৈফিয়ৎ চাইছিস্। বড় বাড় বেড়েছে দেখছি।'

বেচুলাল এতক্ষণ আস্ফালন করে বাড়ানো-জিনিসটাকে ফস করে ফতুয়ার পকেট থেকে বার করে বলে, 'এটাকে ভুলে গেছিস বুঝি ?'

সুখীর গলার স্বর আরো ব্যঙ্গে বেঁকে যায়, 'ভুলব কেন ? ও জিনিস কি ভোলা যায়, স্মরণে আছে। বরং পাছে ভুলে যাই তাই ওর একটা যমজ ভাইকে গড়িয়ে রেখেছি যে—,' হি হি করে হেসে ওঠে সুখী, 'দেখ্‌না ?'

খপ করে বিছানার তলায় হাত ঢুকিয়ে সেখান থেকে সেই 'যমজ ভাই'কে বার করে উঁচিয়ে ধরে সুখী, ঠিক বেচুলালের ভঙ্গীতে।

রাত দুপুরের মিটমিটে আলোয়, যেন খানিকটা রোদ ঝলসানো দিন দুপুর ঝকমকিয়ে ওঠে।

বেচুলালেরটায় তবু বাঁটে মরচে ধরেছে, সুখীরটা বাঁট থেকে ফলা পর্যন্ত একেবারে তাজা নতুন ঝকঝকে।

তিল তিল করে কখন যে সুখী এতখানি ইস্পাত সঞ্চয় করে তুলেছিল কে জানে।

নির্দায়

রুণু বিছানার উপর আসনপিড়ি হয়ে বসেছিল। রুণুর হাতে দুটো প্লাস্টিকের কাঠি ছিল, আর রুণুর কোলের উপর একটা উলের গোলা ছিল।

রুণুর হাত দুটোর কৌশলে ওই কাঠি দুটো খুব দ্রুত চলছিল, এবং নির্ভুলই চলছিল, কিন্তু রুণুর চোখ দুটো আদৌ ওই কাজের উপর ছিল না।

চোখ দুটো রুণুর স্থির হয়ে পড়েছিল সামনের বড় আয়নাটার গায়ে; রুণুদের মায়ের বিয়ের সময়কার আয়না। কাঁচের গায়ে ছোট ছোট কালো কালো দাগ পড়েছে। তবু দেখার বিশেষ অসুবিধে হচ্ছিল না।

কিন্তু কী দেখছিল রুণু?

নিজেকে?

অত তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে, অত স্থির হয়ে?

না, নিজেকে কেউ অমন করে দেখে না। নিজেকে দেখতে দেখতে চোখে অমন বিরক্তির ছায়া পড়ে না। রুণুর চোখে সেই ছায়া। তার সঙ্গে হয়তো বুঝি আতঙ্কেরও ছায়া। যেন রুণু ওই আয়নাটার মধ্যে কোন অবাঞ্ছিত ভয়ঙ্করের আভাস দেখতে পাচ্ছিল।

আয়নার মধ্যে রুণু নিজেকে দেখছিল না, দেখছিল তার ছোটবোন টুনুকে। টুনুর নড়াচড়া, টুনুর চুলের জট ছাড়ানো, টুনুর চাপাহাসি, চটুলভঙ্গী, হাতের ইশারা!

টুনু অবশ্য দিদিকে দেখতে পাচ্ছিল না, এবং দিদি যে তার দিকে ব্যঙ্গ বিরক্তি আর আতঙ্কের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাও আন্দাজ করতে পারছিল না। টুনু নিজের মনেই আন্দোলিত হচ্ছিল, নিজের মধ্যেই বিকশিত হচ্ছিল।

আয়নাটাকে রুণু এমন একটু তেরছা করে রেখেছে, যাতে পাশের ঘরের প্রায় সবটাই দেখা যায়। রুণু অতএব টুনুর গতিবিধি সন্দেহজনক দেখলেই পশমের তাল নিয়ে খাটের এই-খানটায় বসে।

হঠাৎ কেউ ঘরে ঢুকে পড়লে, রুণুর মা বাবা দিদিমা, অথবা টুনু নিজেই, তা'হলে দেখবে রুণুর দৃষ্টি হাতের কাঁটা দুটোর প্রতি গভীর ভাবে নিবদ্ধ। কিন্তু যেই মাত্র ঘর নির্জন হয়ে যাবে, রুণুর হাত আপনিই নির্ভুল চলবে। রুণুর চোখ ওই আয়নার গায়ে স্থির হয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ আগে রুণু দেখছিল, টুনু ঘরের এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করে করে চুলের জট ছাড়াচ্ছে।

তখন টুনুর মুখটা কেমন হিংস্র হিংস্র দেখাচ্ছিল। চোয়ালটা শক্ত, মুখের পেশী কঠিন, যেন চুলগুলো হিঁচড়ে হিঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলতে পারলেই ওর রাগ মেটে। যেন ওই চুলের

জটের মধ্যেই রুণু তার জীবনের জট দেখতে পেয়েছে, কারণ সেই জটটা যত ছাড়াতে চেষ্টা করছিল ততই বেশী পাকিয়ে যাচ্ছিল। অতএব টুনুও অধিকতর হিংস্র হচ্ছিল।

রুণু দেখতে পাচ্ছিল সেই মুখ।

রুণু মনে মনে বলেছিল, বেশ হয়েছে। হবেই তো। জট পাকানোর সময় তো মনে থাকে না। চুলে সাত জন্মে তেল দেবে না তুমি, সিঁথি কাটবে না। পাটি ফেলে আঁচড়ে মাথাটাকে ডাইনির মত করে বেড়াবে। খোঁপা বাঁধলে তো স্রেফ একটা কাকের বাসা। এই হচ্ছে তোমাদের আধুনিকতম ফ্যাশন। বেশ তো—করেছ ফ্যাশন, চুল তার শোধ নিচ্ছে। শোধ নিতে কেউ ছাড়ে নাকি? জড়পদার্থেরাও ছাড়ে না। আমার এই পশমের তালটাকে যদি আমি এলোমেলো করে জট পাকাই, আর একে নিয়ে সহজে এমন সুন্দর প্যাটার্ন তুলতে পারব? প্রতি পদে ছিঁড়বে, আটকে যাবে, গিঁট পড়বে। তার মানে পশমটা শোধ তুলবে। তোমার এই জীবনটাকে নিয়েও যা করছ তুমি, তার ফল ভুগবে পরে।

মনে মনেই বলেছিল, ডেকে চেঁচিয়ে বলেনি।

তারপর দেখতে পেল ওই বেয়াড়া জট সুদ্ধু চুলগুলোকেই কাকের বাসা প্যাটার্নের সেই একটা খোঁপায় পরিণত করে ফেলল টুনু। ঘাড়ে আর গায়ে আচ্ছা করে পাউডার মাখল মুঠো মুঠো পাউডার ঘরের মেঝেয় ছড়িয়ে।

টুনু যখন ঘর থেকে সেজে-গুজে বেরিয়ে যায়, ঘরের মেঝেটা পাউডারে পিছল করে রেখে যায়। রুণুই আবার তারপর ঝেড়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করে রাখে। রুণুকে কেউ বলে না করতে, তবু করে রুণু। রুণুর দায়িত্বজ্ঞানই করায়।

পাউডার মাখার পর টুনু দেহটাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে কটকটে লাল রঙের একটা ব্লাউজ আর ঘোর বেগুনী রঙের একখানা শাড়ি পরল অনেকক্ষণ ধরে। আর তখনই রুণুর সন্দেহ ঘোরালো হয়ে উঠল। এ সাজ নিশ্চয়ই টুনুর কেবলমাত্র বৈকালিক প্রসাধন নয়, এর পিছনে উদ্দেশ্য বর্তমান।

এবার রুণুর চোয়ালটাও শক্ত হয়ে উঠল, মুখের পেশীগুলো কঠিন। দৃষ্টির সঙ্গে কানটাও তীক্ষ্ণ করে তুলল রুণু। অতএব শুনতেও পেল জানলার ধার থেকে একটা তীক্ষ্ণ অথচ ক্ষণস্থায়ী শীস শোনা গেল।

টুনুর এতক্ষণকার হিংস্র মুখটা মুহূর্তে কোমল হয়ে গেল, হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল টুনু। জানালার দিকে এগিয়ে গেল চটুল ভঙ্গীতে, হাত তুলে কী একটা ইশারা করল, তারপর তাড়াতাড়ি প্রসাধনের বাকিটা সারতে লাগল।

প্রসাধনের তো ছিরি চমৎকার।

সেজে-গুজে যখন বেরোয়, মনে হয় অ-পরিপাটির একটা প্রতীক যেন। চুল উস্কো, মুখ তেলতেলে, গায়ে খড়ি-ওঠা, আঁচল ঝুলে পড়া, হাত দু'খানা স্রেফ ন্যাড়া, অথচ কানে দুটো লম্বা লম্বা দোলানো দুল—রুপোর অথবা টিনের। বোনের সাজ দেখলে গা জ্বলে যায় রুণুর।

কিন্তু কোনদিন টুনু দিদির হাতে মাথা সমর্পণ করে না, কোনদিন শাড়িজামার ম্যাচ্ সম্পর্কে দিদির পরামর্শ নেয় না।

রুণু এখন আর বলে না।

কথা রাখে না যখন, বলবে কেন? আগে আগে বলত, তখন টুনু হেসে গড়িয়ে দিদিকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলত, দোহাই দিদি, তোর পছন্দ তোর ওপরই চাপা, আমাকে আমার মতো থাকতে দে! তেল-চুকচুকে চুলে বেণে-খোঁপা বেঁধে মাটির পুতুলটি সেজে বেড়াতে পারব না।

অতএব ঝোড়োকাক সাজবেন।

মরুক, চুলোয় যাক।

চুপ করেই থাকে এখন রুণু, আর কড়া চোখে তাকায় টুনুর গতিবিধির দিকে। তা কিছু-দিন থেকেই দেখছে রুণু টুনু শুধু চুলেই জট পাকাচ্ছে না, জীবনেও পাকাচ্ছে।

জানালার নীচে থেকে শীস্ দিয়ে ডাকে এমন হতচ্ছাড়া ছেলের সঙ্গে মিশেছে টুনু, তার ডাক শুনে উদভ্রান্ত হয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে ব্যাগ দোলাতে দোলাতে।

রুণু ওই ছেলেটাকে দেখেছে।

দেখে স্তম্ভিত হয়েছে।

কলেজের ছেলে নয়, অজানা কেউ নয়, পাড়ারই একটা ওঁচা রকবাজ ছেলে। গুণ্ডা বললেই হয়। বারো-চোদ্দো বছর বয়েস থেকে মারপিট শিখেছে, স্কুলে থাকতে নাকি পেন্‌সিল-কাটা ছুরি দিয়েই কোন ছেলেকে জখম করেছিল, আর এখন পকেটে ছোরা নিয়ে কলেজে যায়। বছর তিনেক আগেই বি, এ, পাস করে বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, ওর দাদারা তাই গিয়েছে, ভালো ভালো হীরের টুকরো ছেলে ওর দাদারা। আর ওই কুলাঙ্গারটি বাপের পয়সা গচ্চা দিয়ে সারা বছর কলেজের মাইনে গোনে, আর গুণ্ডামী করে বেড়ায়। কলেজ ছাড়ে না, কারণ সেটাই হচ্ছে তার প্রকৃত রণক্ষেত্র। ও কলেজ ছাড়লে কলেজে স্ট্রাইকের পাণ্ডা হবে কে? ঘেরাওয়ের নেতা হবে কে? ধর্মের ষাঁড় যারা দেগে ছেড়ে দেয়, সেই বেপরোয়া ষাঁড়টার যথেচ্ছাচার সম্পর্কে আর কোনো দায়িত্ব নিয়ে উঠতে পারে না, এই ছেলেটার অভিভাবকদের অবস্থাও তাই।

রুণু জানে ওর দাদারা ওর সাথে কথা বলে না, বাপ মুখ দেখে না, আর মা দুবেলা খেতে দেবার সময় গঞ্জনা দেয়। নির্লজ্জ ছেলেটা গঞ্জনা আর ভাত দুটোই অম্লানবদনে হজম করে যথেচ্ছ গুণ্ডামী করে বেড়ায়।

এই গুণনিধি ছেলের সঙ্গে ভাব টুনুর।

কিন্তু কী করে হল ভাব?

টুনুর মা-বাপও কি টুনুকে ধর্মের নামে ছেড়ে দিয়েছে? সেটাই রহস্য। টুনুর বাপ তো একজন দুঁদে পুলিস অফিসার, আর টুনুর মা একটি সমাজে প্রতিপত্তি ওয়ালা বিদুষী মহিলা

অথচ টুনু ওই ছেলের সঙ্গে মিশছে, আর টুনুর দিদি তাই দেখে ভয়ানক ভাবে ধড়ফড়িয়ে ফেটে পড়েছে।

এখনো রুণু ঠোঁট কামড়ে কামড়ে প্রায় রক্তপাত করে ফেলে শেষ মুহূর্তে হঠাৎ ফেটে পড়ল।

বলে উঠল 'এই লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, ব্যাগ দোলাতে দোলাতে যাওয়া হচ্ছে কোথায় শুনি ?'

টুনুর অবাধ গতিতে বাধা পড়ে। টুনু যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু হেসে বলে, 'লক্ষ্মীছাড়া যেখানে যায়! চুলোয়।'

রুণু খাট ছেড়ে নেমে আসে।

রুণুর মুখে একটা 'হেস্ত নেস্তর' সংকল্প ফুটে ওঠে। রুণু চাপা তীব্র গলায় বলে, 'ইচ্ছে করে উচ্ছন্নে যেতে চাস তুই ?'

টুনু দিদির ওই উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে একটু কৌতুক কটাক্ষ করে বলে, 'তা' যেতেই যখন হবে, তখন ইচ্ছে করে যাওয়াই ভালো।'

'যেতেই হবে! উচ্ছন্নে যেতেই হবে ?'

রুণুর চোখটা আগুনের মতো দেখায়।

টুনুর থেকে রুণু অনেক বেশী ফরসা, রুণুর জন্যে তাই খুব ভাল 'পাত্র' ঠিক হয়ে আছে সে পাত্র অবশ্য এখন উচ্চশিক্ষার্থে আমেরিকায় গেছে, বছর তিনেক আছে, আরো নাকি একবছর থাকতে হবে। তারপর রুণুর প্রতীক্ষার শেষ হবে। তবে কানাঘুষোয় নাকি শোনা যাচ্ছে—কিন্তু সে কথা যাক, গুজব অনেক কারণেই ঘটে। শত্রুপক্ষ হিংসেতেও রটায়। রুণু ফরসা, রুণুর ভালো পাত্র ঠিক করা আছে, এটা অন্যের গাত্রদাহের কারণ বৈ কি। রুণুর সেই ফরসা মুখটা আগুনের মতো দেখালো।

কিন্তু টুনু সেই উত্তাপে উত্তপ্ত হলো না। টুনু তেমনি 'অতীত' ভাবেই বললো, 'না গিয়ে কী করবো ? তোর মতন বসে বসে উলের ঘর গুনবো, আর নিজের ঘরের স্বপ্নে দীর্ঘশ্বাস ফেলব ?'

রুণুকে আরো লাল দেখায়।

রুণু আরো তীব্র হয়। বলে, 'থামো ইঁচড়ে পাকা মেয়ে। কলেজে পা দিতে না দিতেই একেবারে সাপের পাঁচ পা দেখেছো তুমি! মাকে বলে দিচ্ছি তুই ওই হতভাগা পল্টুদার সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছিস।'

টুনু ভয়ের ভান দেখিয়ে বলে, 'দোহাই দিদিমণি তুচ্ছ কারণে আর অসময়ে ভদ্রমহিলার দিবানিদ্রার খোঁয়াড়িটা ভাঙিয়ে দিস না। দেবী সিংহবাহিনী যতক্ষণ সুপ্ত থাকেন ততক্ষণই মঙ্গল।'

'টুনি!' রুণু তীব্রস্বরে বলে, 'ক্রমশঃ কী কথাবার্তা হচ্ছে তোর, তা টের পাচ্ছিস ? বুঝতে পাচ্ছিস কী ভাবে বদলে যাচ্ছিস তুই! তুই আজকাল মা-বাপকে 'মা-বাবা' বলিস না, এইসব যা তা বলিস।'

'যা তা!'

টুনু যেন আকাশ থেকে পড়ে। 'যা তা' কী রে দিদি 'ভদ্রলোক' 'ভদ্রমহিলা' এসব কী যা তা বিশেষণ? সিংহবাহিনীই কী খারাপ? 'দেবী জগজ্জননী সিংহবাহিনী' এর তুল্য ভক্তির সম্বোধন আর কী আছে?'

'টুনি, বাচালতা থামা, তোর সঙ্গে কথা আছে।'

'কথা! এই এখন? দোহাই দিদি, রাতে যত ইচ্ছে কথা বলিস। এখন বড় তাড়া।'

'বড্ডো তাড়া! ওঃ!' রুণু ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'ওই পন্টু হতভাগার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়াটা বড্ডো দরকারী। পন্টু যে কী ছেলে তুই জানিস না?'

'জানব না কেন?'

টুনু ব্যাগটা জোরে দোলাতে দোলাতে বলে 'পাড়ার মধ্যে নামকরা আউট ছেলে, ভদ্রলোকেরা ওর নামে নাক কোঁচকায়, ওর কেষ্ট-বিষ্টু দাদারা ওর 'ভবলীলা সাঙ্গ'র আশায় হরিরলুঠ মানে, আর পাড়াসুদ্ধু সবাই ওকে দেখলে সভয়ে পথ ছেড়ে দেয়। ওর ব্যাপারে কী না জানি।'

'আরো আছে' রুণু ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলে, 'এইখানেই মহাপুরুষের গুণের তালিম শেষ হয়ে যায়নি।'

'তা বটে,' টুনু হেসে উঠে বলে, 'তালিকা দীর্ঘ! পন্টু সর্বদা পকেটে ছোরা নিয়ে বেড়ায়। পন্টু যে কোনো মুহূর্তে যে কাউকে ছোরা বসিয়ে দিতে পারে, পন্টু হাত খরচের টাকা শর্ট পড়লে, রাহাজানি করে ম্যানেজ করে নেয়, পন্টু পাড়ার মেয়েকে শীস্ দিয়ে ডাকে—'

'টুনি!'

রুণু হঠাৎ ওর একটা কাঁধ প্রায় খামচে ধরে কাঁদো কাঁদো গলায় বলে সর্বজনে—'তবু তুই ওর সঙ্গে হাসতে হাসতে মিশতে যাচ্ছিস?'

'আরে বাবা কী হলো!' টুনু হতাশের ভানে বলে, "হঠাৎ পটপরিবর্তন কেন? গালমন্দ করছিলি সে তো বেশ হচ্ছিল, কান্না-টান্না কেন? কাঁধটা ছাড় বাবা, গেল যে।'

'না ছাড়ব না। আগে বল ওর সঙ্গ ছাড়বি।

'এই দেখো! বললেই হলো? আমি ছাড়লেই ও ছাড়বে? কুমীরে কামড় দিলে ছাড়ে?'

'টুনি, জেনে বুঝে তুই কুমীরের দাঁতে মাথা দিবি? ও তোকে ধ্বংস করবে টুনি, আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি ও তোকে থেঁৎলে শেষ করে ফেলবে।'

টুনু কাঁধটা কৌশলে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'দেখতে আমিও পাচ্ছিনা তা ভাবিস না দিদি। তবে বীরপুরুষরা শুনেছি অনুগত জনকে ক্ষ্যামা ঘেন্না করে। ওর বাধ্য হয়ে চললে, হঠাৎ ক্ষেপে উঠে পাঁজরে ছোরা বসিয়ে না দিতেও পারে।'

'টুমু!'

রুণু সহসা শান্ত হয়ে যায়।

রুণুর দৃষ্টি গভীর হয়ে যায়। রুণু সেই গভীর দৃষ্টিতে টুমুর মুখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে বলে, 'শুধু পাজরে ছুরি বসিয়ে দিলেই কি শেষ করা হয়?'

টুমুও এবার দিদির দিকে তেমনি নির্নিমেষে তাকায়। তারপর একটু ব্যঞ্জনাময় হাসি হেসে বলে, 'তা, অবশ্য নয়! শেষ করার আরো অনেক পদ্ধতি আছে। কিন্তু করা যাবে কি? ধরে নিতে হবে সেটাই—তোমরা যে কী বলো? ওঃ নিয়তি।...অথবা আমার ভাষায় অ্যাকসিডেন্ট।

রুণু যেন অবাক হয়ে যায়।

রুণুর মুখের পেশীগুলো আস্তে আস্তে যেন ছড়িয়ে পড়ে। রুণু গাঢ় গলায় বলে 'তোর ভয় করেনা টুমু?'

'ভয়!' টুমু এবার চঞ্চল হয়। বলে, 'দিদি এসব প্রশ্ন নিয়ে ধীরে সুস্থে বসবো এখন। ছোঁড়াটা ওদিকে ক্রমশঃ মারমুখী হচ্ছে।'

'মারমুখী? ওঃ! আমি যাচ্ছি তোর সঙ্গে, দেখি কি বলে!'

'পাগলামী করিসনে দিদি। এখন ছাড়।'

'আমি তোকে ধরে রাখিনি।'

'ধরে রাখিস নি, কাঁদো কাঁদো হচ্ছিস।'

'হচ্ছি! না হয়ে কী করবো বল!'

'আমার যে বড় ভয় করে টুমু। আমি ভেবে পাইনা, তোর কেন ভয় করে না।' টুমু তেমনি রহস্যের ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে হেসে বলে, 'করেনা কে বললো? মাঝে মাঝে বেশ ভয় করে।'

'করে?' রুণু যেন অকূলে কূল পায়। রুণু যেন এই পথেই তার নির্বোধ ছোট বোনটাকে মাঝ দরিয়া থেকে টেনে তোলবার উপায় পায়। তাই রুণু আশা ভরা গলায় বলে, 'তবে? তবে কেন তুই—'

কিন্তু টুমু তার দিদির আশায় ছাই দেয়।

টুমু অবহেলায় বলে, 'তবে আবার কী! ভয়কে প্রশ্রয় দিই না। রাস্তায় বেরোলেও তো অ্যাকসিডেন্টের ভয় আছে। যে কোনো মুহূর্তেই গাড়ী চাপা পড়ে থেঁৎলে যেতে পারি। মহা মারাত্মক মারাত্মক রোগের বীজ বাতাসে উড়ছে, নিঃশ্বাসে নিয়ে ফুসফুসে ভরছি, যে কোনো সময় ফিনিস হয়ে যেতে পারি। তার জন্যে কী করতে পারি বল?' নন্দলালের মতো ঘরে 'শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়ে থাকিতে বলিস?'

রুণু হতাশ গলায় বলে, 'সেইটা আর এইটা এক হলো?'

'ভাল করে ভেবে দেখলে একই। কিন্তু দিদি আমার তো আসল গার্জেন যুগল রয়েছেন, তুই কেন আমার ভাবনাটা ঘাড়ে নিয়ে জীবন মহানিশা করছিস?'

আসল গার্জেন। তার মানে মা বাপ।

রুণু হতাশ গলায় বলে, 'মা বাবার কথা বলছিস?'

'তা' আইনতো তাদেরই তো গার্জেন বলে।'

রুণুর চোখটা ঝাপ্সা হয়ে আসে। রুণু বলে, 'তাঁরা তোকে এঁটে উঠতে পারেন?'

'পারেন না সেটা তাঁদের অক্ষমতা। আমি নাচার।'

রুণুর চোখ দিয়ে এবার জল গড়িয়ে পড়ে।

রুণু চোখ না মুছেই বলে, 'টুনি, তুই তবু তর্ক চালিয়ে যাচ্ছিস? বুঝতে পাচ্ছিস না নিজের কী সর্বনাশ ডেকে আনছিস! জীবনের সুখ শান্তি ভবিষ্যৎ সব কিছু বাজি ধরে এ কী ফ্যাশানের জুয়াখেলা তোর!'

টুনু বসে পড়ে।

বলে 'নাঃ, আজ দেখছি তুই আমার বারোটা বাজিয়ে দিলি। হতভাগা বোধ হয় এতক্ষণে রেগে চলে গিয়ে ছুরিতে শান দিচ্ছে। মরুক গে!' দিক গে! কিন্তু তুই কী সব হাসির কথা বললি দিদি। 'সুখ শান্তি ভবিষ্যৎ।' জিনিসগুলো কোন স্বর্গে থাকে রে? বলি তোর ভবিষ্যতের জন্যে তো তোর পুলিশ অফিসার বাবা তাঁর ঘুষের টাকা ঘুষ দিয়ে তোর ভাবী বরকে কেষ্ট-বিষ্টু করতে বিদেশে পাঠালেন, কী হচ্ছে তারপর? বল বাবা কী হচ্ছে। তুই বসে বসে অন্যের সর্বনাশের পথে পাহারা দিচ্ছিস, আর সে সেখানে প্রেমসে তোর সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করছে। ওসব সুখ শান্তি ভবিষ্যতের কথা বলিস না দিদি। আমার 'মটো' হচ্ছে—নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকির খাতায় শূন্য থাক।'

রুণু ওই বেপরোয়া দুঃসাহসিক মেয়েটার মুখের দিকে অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ভেবে পায় না কোথা থেকে আসে এই সাহস। শুধু জেদ থেকে? আর কীই বা পাচ্ছে ও। ভালবাসা? ওই গুণ্ডা বদমাইস হতচ্ছাড়া ছেলেটার কাছে পাচ্ছে সে জিনিস?

আস্তে জিজ্ঞেস করে সেই কথা।

'কী পাচ্ছিস হাত পেতে? ভালবাসা?'

'ভালবাসা। মানে ভা—লো—বা—সা। টুনু হি হি করে হেসে ওঠে, 'ওরে সর্বনাশ! ওসব দেবদুর্লভ জিনিসের স্বপ্ন আমরা দেখি না বাবা! তুই বুঝি তাই ভাবিস? ভালো-বাসায় জরজর হয়ে আমি ওই পল্টু কাপ্তেনের শীস্ শুনে ছুটে যাই। হি হি?'

'তবে কী জন্যে যাস?'

'কী জন্যে?'

টুমু মুখটা একটু চিন্তা চিন্তা ভাব করে বলে, 'কেন যাই তা আমিও ঠিক জানি না। বোধ হয় বীরত্বের আকর্ষণে।'

বীরত্ব!

রুণু উদ্দীপ্ত গলায় বলে, 'গুণ্ডামীকে তুই বীরত্ব বলিস?'

'তা কী আর করা! যে যুগের যা! মিল্ক পাউডার গোলাকে যখন 'দুধ' বলে খেতে হচ্ছে, দালদাকে ঘি বলে, তখন ওই গুণ্ডামীকেই বীরত্ব বলে মেনে নিতে হবে।'

'টুনিরে ওই পাজিটা নিশ্চয় তোকে মন্ত্রপূত করেছে।'

'তা' করতেও পারে। টুমু হেসে ওঠে। 'দেখা হলে জিজ্ঞেস করবো। অবশ্য কাল দেখা মাত্রই যদি ছুরিকাবিদ্ধ না হই। যা রেগে চলে গেছে। সেদিন তো বাহাদুরী করে বলছিল ওর কোন প্রাণের দোস্তর প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীকে পথ থেকে সরাবার জন্যে নাকি সেটাকে খোঁড়া করে ছ মাসের মত শুইয়ে দিয়েছে।'

রুণু ছিটকে উঠে।

রুণু বলে, 'আর সেই বাহাদুরীর গল্প করছিস তুই হেসে হেসে? তার মানে তুইও উচ্ছন্নে গেছিস! তোরও আর আশা নেই।'

'এই এতোক্ষণে ঠিক ধরেছিস দিদি—' টুমু তার ঝুলে পড়া আঁচলটা ঠেলে কাঁধে পাঠিয়ে দিয়ে বলে, 'ঠিক তাই! আমার আর আশা নেই। মনে হচ্ছে চুলোর দোরের দিকেই চলেছি।

রুণু অবসন্ন হয়ে বসে পড়ে।

রুণু ক্লান্ত গলায় বলে, 'ইচ্ছে করে নিজেকে ধ্বংস করে কী লাভ টুমু? কতো গুণ ছিল তোর। কতো ভাল গান গাইতিস তুই, কতো সুন্দর ছবি আঁকতিস, লেখাপড়ায় কতো ভালো ছিলি, সব জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল একটা লক্ষ্মীছাড়ার সঙ্গে টো টো করে বেড়াচ্ছিস, অর্ধেক দিন কলেজ কামাই করছিস, একবার ইচ্ছে হয় না তোর আবার ভালো হই। ভাল মেয়ে, সৎ মেয়ে, পবিত্র মেয়ে। বল, ইচ্ছে হয় না?'

রুণু যেন টুমুর চৈতন্যের দরজায় ঘা মেরে জাগাতে চায়। রুণু যেন তার ছোট বোনটার চোখের সামনে জ্ঞানের মশাল ধরতে চায়।

কিন্তু রুণুর এই সদিচ্ছার ফল হয় উল্টো।

হঠাৎ টুমুর মুখের সেই কৌতুকের শিথিলতা টান্ টান্ হয়ে যায়। টুমুর মুখের পেশী কঠিন হয়ে ওঠে, টুমুর চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। টুমু তীব্র গলায় বলে ওঠে, 'ইচ্ছে? কেন সে ইচ্ছেটা হবে বলতে পারিস? ভালো' মেয়ে, সৎ মেয়ে, পবিত্র মেয়ে!' ওঃ খুব একখানা বড় বড় কথা শিখেছিস বটে। অভিধান থেকে মুখস্থ করেছিস বুঝি? কিন্তু উচ্চারণ করতে তোর লজ্জা হওয়া উচিত ছিল।'

লজ্জা!

রুণু থতমত খায়।'

রুণু ভেবে পায়না এর মধ্যে লজ্জা পাবার কি আছে। তাই রুণু অবাক হয়ে বলে, লজ্জা!

'হ্যাঁ লজ্জা!' টুমু কড়াগলায় বলে, 'লজ্জার কথা নয়? যাদের বাপ আইন রক্ষার সুপবিত্র দায়িত্ব নিয়ে উচ্চ পদে বসে, ইহ সংসারের যতরকম বেআইন কাজ আছে তার সাহায্য করে ঘুষ খেয়ে টাকার কুমীর হচ্ছেন, আর মা সেই টাকার সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে আভিজাত্যের বিজ্ঞাপন দিতে 'বার'এ গিয়ে ড্রিঙ্ক করছেন, আর বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকার বাইরের সময়টুকু দিয়ে সোশ্যাল ওয়ার্ক করছেন তাদের মুখে ওসব বড় কথা কেন রে? ভাল হবার কী দায় আমাদের বলতে পারিস? বাবার যখন টাকা আছে, তখন তো আমাদেরও শেষ গতি ওই 'হাই সোসাইটি?' তবে? ছেড়ে দে ওসব ভাল ভাল আইডিয়া। কোনো দিক থেকেই আমাদের সুখ নেই শান্তি নেই আশা নেই ভবিষ্যৎ নেই, হাতের কাছে শুধু খানিকটা থ্রীল, ওইটার উপর ভর দিয়েই চলছি এখন।...আচ্ছা টা টা বাই বাই, বেরিয়ে পড়ি। দেখি ছোড়াটা আছে না ভেগেছে।'

টুমু টকাটক নেমে বেরিয়ে যায়।

রুণু সেই দিকে তাকিয়ে থাকে।

রুণুর চোখে একটা জ্বালা ভরা দৃষ্টি ফুটে ওঠে।

কে জানে সেটা ঘৃণার বিরক্তির না আর কিছুর!

মলাটের মুখ

অবশেষে সেই প্রতীক্ষিত মুহূর্তটি এল।

নিশিবাবু মারা গেলেন। ?

হয়তো 'প্রতীক্ষিত' শব্দটা ব্যবহার করা শোভন হলো না, শুনতে খারাপই লাগলো, কিন্তু ও ছাড়া আর কীই বা বলা যেতো? আর কোন্ শব্দে ঠিক অবস্থাটা বোঝানো যেতো?

'প্রতীক্ষা' ছাড়া আর কী বা করছিল এরা?

নিশিবাবুর আইবুড়ো মেয়ে কাবেরী, নিশিবাবুর বিধবা পুত্রবধূ সন্ধ্যা, আর নিশিবাবুর পাড়ার ডাক্তার প্রভাংশু। নিশিবাবুর এই দীর্ঘ-বিলম্বিত মৃত্যুশয্যাটিকে ঘিরে বসে থেকে যারা গোটা তিন-চার বর্ষা-বসন্তকে হাত নেড়ে বিদায় দিয়েছে।

অবশ্য সন্ধ্যার কাছে এই 'বিদায় দেওয়া' কথাটা অর্থহীন। তার জীবন থেকে তো বর্ষা বসন্তের চিরবিদায় ঘটে গেছে। আসলে ও কথাটা কাবেরী আর প্রভাংশুকে নিয়ে। অলিখিত দলিলে যাদের ভবিষ্যতের চুক্তিপত্র সম্পাদন হয়ে গেছে।

খোলাখুলি প্রেম-নিবেদনের পথে যে একে অপরের কাছে কোনোদিন উদ্ঘাটিত হয়েছে, তা নয়, দীর্ঘকাল ধরে দেখা মানুষটার সঙ্গে তেমন রোমান্টিক পরিস্থিতিও হয়তো আসেনি। নিশিবাবুর এই দীর্ঘস্থায়ী রোগটাও অসতর্ক একটা মধুর মুহূর্ত গড়ে ওঠার পক্ষে বাধা স্বরূপ হয়েছে, তবু প্রভাংশু যে কেন এই দীর্ঘকাল ধরে শুধু বিনা ভিজিটে রোগী দেখাই নয়, বিনামূল্যে ওষুধ-পথ্যও যোগান দিয়ে চলেছে, তার উত্তর তো কাবেরীর কাছে আছে।

কাবেরী আর এখন নতুন করে কৃতজ্ঞও হয় না।

আগে হতো।

প্রথম যখন প্রভাংশু ওষুধের দাম নিত না, বলতো, 'আমার দাম লাগে নি। ডাক্তারদের কাছে ওষুধের স্যাম্পেল আসে জানেন তো? তার থেকেই নিয়ে এলাম।' তখন কথাটা বানানো কথা বুঝেও আর প্রতিবাদ করতো না কাবেরী, শুধু সকরুণ একটু কৃতজ্ঞ দৃষ্টি মেলে ধরতো অনেকটা অর্থভরে। ক্রমশঃ পথ্যেরও যোগানদার হয়েছে প্রভাংশু।

'যাচ্ছি বাজারের দিকে, নিয়ে আসবো এখন', অথবা 'গিয়েছিলাম বাজারের দিকে, নিয়ে এলাম—' এই ছদ্মবেশ পরিয়েই সাহায্যটাকে চালান দিয়েছে। দামের কথা তুললেই তাড়াতাড়ি বলেছে, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান, ব্যস্ত হবেন না, বাড়ির জন্যেও তো কিনেছি কিছু, হিসেব হয়নি এখনো।'

সে হিসেব অবিশ্যি আর হয়ে উঠতো না।

তারপরে আরো অন্য অনেক বস্তু এসে যেত।

যেমন ফিডিং-কাপ, অয়েলক্লথ, মেজার-গ্লাস, এটা ওটা। হিসেব জমতেই থাকে। ওদিকে সম্পর্কটা গভীরে আসতে থাকে।

সন্ধ্যাও বলে, 'ঋণের কথা আর তুলবো না, তার তো পাহাড জমে উঠেছে। পরজন্মের জন্যে শোধ দেওয়াটা তোলা থাক।'

তা, কাবেরী ক্রমশঃই সপ্রতিভ হয়ে উঠছিল প্রায়। 'পরিণীতা'র নায়িকা ললিতার মতই সহজ অধিকারবোধে প্রভাংশুর জিনিসকে 'নিজের জিনিস' বলে গ্রহণ করতে আর বাধা ছিল না তার। তাই বৌদির ওই ঋণশোধের প্রশ্নে ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'তাই বা ভাবছো কেন বৌদি? এটাও তো ধরে নেওয়া যেতে পারে, উনিই পূর্বজন্মের ঋণশোধ করছেন।'

'তা, এটাও মন্দ না,' প্রভাংশু হেসে হেসে বলে, 'দেখছেন তো—বয়সে আপনি বড় হলে কি হবে, সংসারজ্ঞান আপনার থেকে আপনার ননদিনীর অনেক বেশী! পরজন্মের খাতার অঙ্কটাও গুছিয়ে রাখছেন।'

প্রভাংশুর বাড়ির লোকেরা অবশ্য প্রভাংশুর এই 'নিশিভবন'-প্রীতিটা খুব একটা সুচক্ষে দেখত না, কিন্তু বারণই বা করে কোন্ লজ্জায়? দেখছে তো ভদ্রলোকের বাড়ির অবস্থা!

স্ত্রী হারিয়েছেন ভদ্রলোক, সদ্য-বিবাহিত জোয়ান ছেলেকে হারিয়েছেন, তারপর পক্ষাঘাত হয়ে বিছানা নিয়েছেন। বাড়িতে মানুষ বলতে একটা বয়স্থা কুমারী মেয়ে, আর একটা যৌবনবতী বিধবা পুত্রবধূ। তাও ঠিক আধুনিক মেয়েদের মত পাস-টাস করা সর্বকর্মে দক্ষ মেয়ে নয় তারা।

সে দক্ষতা-অর্জনে বাধা থেকেছেন নিশিবাবুই স্বয়ং। সাধ্যপক্ষে নিজের সঙ্গে ছাড়া মেয়ে-বৌকে বাড়ি থেকে বেরোতে দিতেন না তিনি। পাড়ার সকলেই জানে সে-কথা। কাজেই 'পড়শী' হিসেবেও বাইরের বাজার-দোকান, আনা-নেওয়ার কাজটা করে দেওয়া উচিত বৈ অন্যায় নয়। তা'ছাড়া ডাক্তার মাত্রেই 'সামাজিক' দায়িত্বের দায়টা নিজের ঘাড়ে বেশী নিয়ে থাকে, এটা সাধারণ নিয়ম।

বাড়িতেও কারো অসুখ হলে রাত্রে প্রভাংশুর দাদা স্নেহাংশু 'স্নেহ' শব্দটাকে অর্থহীন প্রতিপন্ন করে ঘরে দরজা বন্ধ করে শুতে যায়, আর প্রভাংশু ঠায় বসে রাত জাগে।

আত্মীয়জনেদের স্বাস্থ্য সুস্থতার খবর নেওয়ার দায় অলিখিত নিয়মে প্রভাংশুরই। বড় স্নেহাংশু কোনো-'মুখো' হয় না, আর ছোট শুভ্রাংশু ঝাড়া জবাব দেয়, সে কাউকে চেনে না।

কাজেই চিনতে হয় প্রভাংশুকেই।

পাস করে বেরোনো পর্যন্ত চিনতে হচ্ছে।

অথবা পাঠ্যাবস্থা থেকেই চিনতে হচ্ছে। সে জায়গায় পাড়ার অন্য পড়শীদের ছেলেরা উচিতবোধে তৎপর না হলেও, প্রভাংশু যদি হয়, বারণ করা চলে না।

বারণ করা হয়ও না।

অতএব প্রভাংশু অবারণ গতিতে নিশিবাবুর বাড়িতে যাতায়াত করে। সে বাড়িতে

যে শুধু একটা শয্যাগত রোগী এবং দুটো যুবতী মেয়ে, এ ছুতো ডাক্তারের সামনে তোলা পাগলামী।

আস্তে আস্তে এ সংসারের দায়িত্বটা প্রভাংশুর উপরেই এসে গেছে। প্রভাংশুই চেষ্টা-চরিত্র করে কাবেরীর জন্যে একটা সাবান কোম্পানির ক্যানভাসারের কাজ জুটিয়ে দিয়েছে, এবং সন্ধ্যাকে এমন এমন একটা মহিলা সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করে দিয়েছে, যারা বাড়িতে এসে 'হাতের কাজ' নিয়ে যায়।

দুই ননদ-ভাজে এই যাহোক কিছু উপার্জন করায় একটা সুবিধে হয়েছে 'প্রভাংশু ডাক্তার ওদের সংসার চালায়'—এ রটনাটা কিঞ্চিৎ কমেছে।

বাড়িটা নিশিবাবুর পৈত্রিক এইটাই যা রক্ষে।

এই ভাবেই চলছিল।

নিশিবাবুর বিছানায় শোওয়া চেহারাটা প্রায় একটা নিশ্চল প্রাকৃতিক দৃশ্যের মত হয়ে উঠেছিল।

দুটি মেয়ের দিনলিপি একই ছাঁচে লেখা হচ্ছিল।

এর মধ্যে যে একজনের ভবিষ্যৎ আছে, এবং অন্যজনের সেটা অন্ধকার, তা সহসা বোঝা যাচ্ছিল না।

কিন্তু এখন পরিস্থিতির বদল হলো।

এখন একটা সমস্যা দেখা দিলো।

আর এখন কোন্ উপলক্ষে এ বাড়িতে আসবে প্রভাংশু?

কোন্ আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাবে?

অথচ আবার একা দুটো মেয়েকে একটা বাড়িতে ফেলেই বা রাখবে কি করে? দায়িত্বটা যখন—যে ভাবেই হোক, এসে গেছে তার হাতে।

উপায়টা তাকেই ভাবতে হবে। কিন্তু হবেই বা কি?

প্রভাংশুর দিদি পাড়লো কথাটা।

বললো, 'তুই বা কি চোর-দায়ে ধরা পড়েছিস তাও তো বুঝি না। এতদিন মহত্ব দেখাচ্ছিলি, তবু তার একটা মানে ছিল। কিন্তু এখন কি? এখন তুমি মহত্ব দেখাতে গেলে লোকে গালে চুনকালি দেবে। বলবে 'রক্ষক কি ভক্ষক কে জানে!'

প্রভাংশু হেসে বলে, লোকে না বলুক, তুমি বলবে।'

'বলবোই তো'—দিদি অলজ্জিত গলায় বলে, 'আমিই তো করবো নিন্দে। কেন, ওদের তিনকুলে কেউ নেই? বৌটাও কি ভুঁইফোঁড়?'

'এযাবৎ তো তাই মনে হতো! দেখিনি তো কাউকে উঁকি মারতে!'

'যত কর্তব্য তোর! না না, ওসব খেয়াল ছাড়। বৌটাকে বল, খুঁজেপেতে কোনো গার্জেন যোগাড় করে বাড়ির দিকে চলে যেতে, আর মেয়েটাকে বল একটা বিয়ে-থিয়ে করে ফেলতে।'

'বাঃ!'—প্রভাংশুর বলে, 'সমস্যার এমন সুন্দর সমাধানই থাকতে মেয়ে দুটো কষ্ট পাচ্ছে!...যাই, এখনই বলি গিয়ে।'

'চমৎকার!' দিদি মনে মনে বলে, আমার যেন হলো মাতালকে শুঁড়িরবাড়ির রাস্তা চিনিয়ে দেওয়া।

তা হলই বলা যায়।

ওই ঘটনা হয়ে গেছে। এখন আর ডাক্তারের ও-বাড়িতে ঘন ঘন যাবার কী ছিল? এ তবু একটা কারণ পাওয়া গেল।

সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা হল প্রথমে! কৃশ সন্ধ্যার বৈধব্যের বেশের সঙ্গে যেন আরো রুক্ষতা আর কৃশতা।

তবু সন্ধ্যা হাসলো। হাসিটা বিষণ্ণ দেখালো, তবু সেই হাসি হেসেই বললো, 'কাবেরীকে কিন্তু পাচ্ছেন না এখুনি, এইমাত্র স্নান করতে গেল! আর জানেনই তো ওর স্নানের দেরী!'

প্রভাংশু এ বাড়িতে বাড়ির লোকের মত যেখানে-সেখানে বসে। বসলো জানলার কিনারায়।

সন্ধ্যার রুক্ষচুলে ঘেরা শুকনো মুখটার দিকে তাকালো একবার, তাকালো ওর শুধু একগাছা চুড়ি-পরা হাত দুটোর দিকে। ভাবলো, আচ্ছা কাবেরীও তো ওই রকম একটা মাত্র বালা না চুড়ি কি যেন পরে, তবু তাকে তো কই এমন বিধবা বিধবা লাগে না। কাবেরীর হাত দুটো ফর্সা বলে?

তারপর বললো, 'কাবেরীকে পাবার জন্যেই ছুটে এলাম এমন ধারণাই বা হল কেন আপনার?'

সন্ধ্যা আবারও হাসলো।

'ধারণা বস্তুটা সত্য-নির্ভর বলে।'

'আর আমি যদি বলি সত্য-মিথ্যার জ্ঞান আপনার আদৌ নেই?'

'বললে বুঝবো সত্যগোপনে আপনি ওস্তাদ।'

হ্যাঁ, এই সুরেই কথাবার্তা হয় ওদের। যেন ধরেই নিয়েছে সন্ধ্যা, ডাক্তার তার নন্দাই, অতএব তার সঙ্গে সরস কৌতুকালাপ দোষণীয় নয়!

কাবেরীও তো তেমনি অধিকারের মাটিতে দাঁড়িয়েই যখন তখন বলে, 'ডাক্তারের কথা

শুনিস না বৌদি, এখুনি তোকে রুগী বানিয়ে ছাড়বে। দেখ্ না কাল কখন একটু কেসেছি, আজ ওষুধ গেলাচ্ছে।'·· বলে, 'ওর কথা বিশ্বাস নেই, ও-সব পারে।' বলে, 'তোদেরই বাবা মতে মেলে, কর গল্প, আমি বসলেই তো তর্ক বাধবে!'··

কোনো একটি নব-বিবাহিতা মেয়ে স্বামী-সম্পর্কিত কথায় যতটা আতিশয্য আদিখ্যেতা মেশাতে পারে, তা মেশায় কাবেরী প্রভাংশু ডাক্তারের সম্পর্কে।

অশৌচ চলে গেলেই বিয়ের কথাটা উঠবে এই আর কি!

সন্ধ্যা ভাবে, হয়তো অশৌচ না যেতেই কথাটা ওঠাতে এসেছে। কথাটা কইলে আর দোষ কি। তাই নিজেই তুলবে ভাবে। তাই যখন প্রভাংশু ওর কথার উত্তরে হেসে বলে, 'তা বোধকরি ওস্তাদ। আপনার দেওয়া সার্টিফিকেটটা নিলাম', তখন সন্ধ্যা বলে ওঠে, 'দেখলেন তো? আপনাকে কেমন পড়ে ফেলেছি? এই যে এখন এসেছেন, কেন এসেছেন বলে দিতে পারি।'

'সে তো বলেই দিলেন', প্রভাংশু একটু রহস্যভরা গলায় বলে, 'আপনার ননদিনীকে পাবার জন্যে।'

'সেই তো!' সন্ধ্যা হাসে।

তবু সন্ধ্যার হাসিটা যেন বিষণ্ণই থেকে যায়। হয়তো সন্ধ্যা কাবেরীর ভবিষ্যৎ স্থিরীকৃত হওয়ার পাকা কথার পরই ভাবছে—তারপর কি? অথচ দেখতে পাচ্ছে না 'তারপরটা'। তাই ওই বিষণ্ণতার ছাপটা যাচ্ছে না ওর মুখ থেকে।

নইলে ভুগে ভুগে স্বার্থপর আর দুর্মুখ হয়ে যাওয়া শ্বশুরের মৃত্যুশোক ওর ঠোঁটের কোণায় এমন স্থায়ী বিষণ্ণতার ছাপ এঁকে দেবে, এটা যেন বাড়াবাড়ি কল্পনা।

প্রভাংশুও ভাবে সে-কথা, বাড়াবাড়ি কল্পনা। তারপর বলে, 'আচ্ছা ধরুন, এখন যদি আমি সে-কথা অস্বীকার করি?'

সন্ধ্যা অবাক হয়ে তাকায়।'

বলে 'কোন্ কথা?'

'ওই যে—' প্রভাংশু হঠাৎ তার কৌতুকচঞ্চল দৃষ্টিটা স্থির করে গভীরে নিয়ে যায়, রহস্যঘন কণ্ঠে বলে, 'ওই কথাটাই। যদি বলি কস্মিনকালেও ওই কাবেরী দেবীর জন্যে ছুটে ছুটে এ-বাড়িতে আসে না প্রভাংশু ডাক্তার।'

সন্ধ্যা সহসা কেঁপে ওঠে।

সন্ধ্যা যেন ভয়ঙ্কর একটা অসহায়তা অনুভব করে। সমুদ্রে তৃণখণ্ড ধরার মতই যেন এখান থেকে অদৃশ্য স্নানের ঘরটার দরজার দিকে তাকায়, তারপর চঞ্চল হয়ে উঠে পড়ে কোনমতে সহজ হয়ে বলে, 'দাঁড়ান, একটু চা করে আনি, তারপর তর্ক হবে।'

'তর্ক চাইছি, এমনই ভাবছেন কেন? প্রভাংশু তেমনি দৃষ্টিতেই তাকায়।

সন্ধ্যা ভয় পায়।

খুব ভয় পায়।

কই, এমন তো কোনো দিন দেখায় নি প্রভাংশুকে, এমন দৃষ্টি তো দেখে নি প্রভাংশুর চোখে। নিশিবাবুর দৈহিক উপস্থিতিটুকু কি তবে ওর দুঃসাহসের উপর পাহারা দিচ্ছিল? এখন পাহারা নেই, এখন ভয় গেছে?

কাবেরীর আড়ালে সন্ধ্যার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ হতে চায় ও? কই, এমন তো স্বভাব নয় প্রভাংশুর। বারবারই তো সন্ধ্যার সঙ্গে শ্রদ্ধেয় গুরুজনের মত দূরত্ব আর সমীহ রেখেই কথা বলেছে। কৌতুকের কথাতেও রেখেছে সে সমীহ।

কাবেরীর সম্পর্কেই বরং মাঝে মাঝে চটুলতা করে, কড়া ঠাট্টা করে, রঙ্গরসের মধ্যে দিয়ে তাকে ক্ষ্যাপায়, মজায়।

নিশিবাবুর রোগটা এমন স্থায়িত্ব নিয়েছিল যে, নতুন করে দুর্ভাবনা বা নতুন করে বিষণ্ণতা আসত না আর ইদানীং। রোগীর ঘরের বাইরে রীতিমত গল্প আড্ডা চা চানাচুর চলতই। দুজনে এবং তিনজনেও।

তবে মাত্রা ছাড়াবার সুযোগ পেত না।

মাঝে মাঝেই নিশিবাবুর হুঙ্কার শোনা যেত, 'ফুর্তির যে বান ডেকেছে দেখছি! এ ঘরে একটা রুগী মরছে!'

'এ ঘরের লোক আরো মরছে।' ভ্রূ-ভঙ্গী করে বলতো এমন কথা কাবেরী, 'আমাদের মরণটা কেউ দেখতে পাচ্ছে না এই যা দুঃখ।'

তারপর দুম্ দুম্ করে পা ফেলে চলে যেত ও-ঘরে। বলতো—'কী? কী চাই? জল খাবে?'

ভয় খাওয়া নিশিকান্ত তখন সেটাতেই স্বীকার পেতেন। বলতেন, 'খাবই তো। সেই থেকে তেষ্টা পেয়েছে।'

কিন্তু এখন, প্রতিমুহূর্তে সেই হুঙ্কারটার আওয়াজ মনে ধাক্কা দিলেও কানে কোনোদিনই বাজবে না এটা ঠিক। কে তবে রক্ষা করবে এই মেয়ে-দুটোকে? কার শুভবুদ্ধি?

প্রভাংশুর চোখে যে ছায়া সে কি শুভবুদ্ধির?

প্রভাংশুর কথাগুলোই বা কোন্ বুদ্ধির?

'তর্কও চাই না, চা-ও চাই না, চাই শুধু এইবেলা আপনাকে দুটো কথা বলতে।'

সন্ধ্যা মনে মনে বলে, ভয় কি? ভয় কি? মুখে বলে, 'দুটো কেন, দুশোই বলুন।'

'নাঃ, দুশোয় আমার দরকার নেই। আমি শুধু বলছিলাম—' প্রভাংশুর গলা আগ্রহে আর ব্যাকুলতায় কাঁপে, 'কাবেরীর জন্যে বর খুঁজে দেবার ভারটা যদি আমি নিই?'

সন্ধ্যা নিশ্বাস ফেলে। ফেলে বোধকরি বাঁচে।

ওঃ, কায়দা!

সেই বিবাহ-প্রস্তাবই। শুধু ভাষাটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে।

বেঁচে গিয়ে হেসে ওঠে।

বলে, 'সে ভার তো আপনি প্রমিস্ করবার আগেই আপনার উপর চাপানো হয়ে গেছে।'

'না সন্ধ্যা, না।'

সহসা 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে নেমে যায় প্রভাংশু ডাক্তার। বলে ওঠে, 'বিশ্বাস করো, ওর প্রতি কোনো মোহ আমার নেই। আমার মন অন্য মেয়ের—'

দপ্ করে জ্বলে ওঠে বুঝি সন্ধ্যা।

বলে ওঠে, 'আপনি কি বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন তো।'

'স্পষ্ট করে? খুব স্পষ্ট করে?' প্রভাংশু যেন হতাশ গলায় বলে, 'একেবারে নীরস গদ্যে? তাহলে বলি, 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

সন্ধ্যা ঠিকরে ওঠে।

সন্ধ্যার কালো শীর্ণ মুখটা কঠোর হয়ে ওঠে। সন্ধ্যা তীব্র স্বরে বলে, 'আপনি কি অরক্ষিত পেয়ে আমায় অপমান করতে এসেছেন?'

প্রভাংশু চুপ করে তাকায়।

প্রভাংশু আস্তে বলে, 'এতদিন ধরে দেখে শেষ পর্যন্ত এই বুঝলে আমায়?'

'কিন্তু—' সন্ধ্যা রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'একটা অদ্ভুত অবাস্তব কথা বললেই হলো?'

'আশ্চর্য!' প্রভাংশু আরো হতাশ গলায় বলে, 'অথচ আমার ধারণা ছিল আপনাকে কিছুই বোঝাতে হবে না।'

ধারণা ছিল!

সন্ধ্যা অবাক গলায় বলে, 'এই ধারণা ছিল আপনার?'

সবকিছু ছাপিয়ে বিস্ময়টাই বুঝি বড় হয়ে উঠেছে সন্ধ্যার। তাই প্রতিবাদ করতে ভুলে যাচ্ছে, রাগ করতে ভুলে যাচ্ছে। বলছে, 'এই ধারণা ছিল আপনার?'

'ছিল। ছিলই তো।' প্রভাংশু আবেগের গলায় বলে, 'ভেবেছিলাম যেদিন বলবার দিন আসবে, সেদিন না-বলতেই সব সহজ হয়ে যাবে।'

সন্ধ্যার স্বর তবু রুদ্ধ হয়ে থাকে।

সন্ধ্যা সেই রুদ্ধ গলাতেই বলে, 'আর কাবেরী?'

'কাবেরীর পাত্র খোঁজবার ভার তো আগেই নিয়েছি।'

সন্ধ্যা আস্তে বলে, 'শুধু পাত্র হলেই হলো? এতদিন ধরে ও আপনাকে—'

'এতদিন ধরে ও 'আমাকে' নয় সন্ধ্যা, এতদিন ধরে ও একটি 'পাত্র'কেই ভজনা করেছে। সেটা আমি না হয়ে আর কেউ হলেও ক্ষতি ছিল না। এখন যদি আমার থেকে সুপাত্র একটা জোটাতে পারি, দেখবে তাকেই ও—'

সন্ধ্যা মুখ তুলে তাকায়।

বলে, 'লোভ দেখাবেন না। আমার জীবনে আর নতুন করে কিছু হবার নেই। যা স্বাভাবিক, যা শোভন সেটাই হোক।'

'মানুষ অঙ্কশাস্ত্র নয় সন্ধ্যা।'

'কিন্তু প্রতি পদে তো জেনেছি কাবেরীকেই আপনি—'

প্রভাংশু হাসে।

বলে, 'তোমার ওই জানাটায় একটু ভুল আছে, আমি কাবেরীকে নয়, কাবেরীই আমাকে—'

'তবে? সেটাও কি তার প্রতি ভয়ঙ্কর একটা নিষ্ঠুরতা হবে না? ভয়ঙ্কর একটা অবিচার?'

'হয়তো হবে—' প্রভাংশু মৃদু গভীর গলায় বলে, 'ভয়ঙ্কর না হলেও হয়তো কিছু হবে। কিন্তু সারাজীবন ওর প্রতি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা আর ভয়ঙ্কর অবিচার করার থেকে কি এটুকুই ভাল নয়?'

সন্ধ্যা শুধু চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে।

অথচ সন্ধ্যা প্রথম সুরটাই বজায় রাখতে পারতো। রেগে ওঠার পরে আরো রাগতে পারতো। প্রভাংশুকে যাচ্ছেতাই করতে পারতো। গৃহস্থ-ঘরের বিধবার কাছে এই প্রস্তাবটাকে 'কুপ্রস্তাব' বলে গণ্য করতে পারতো, কিন্তু সন্ধ্যা তা করল না। সন্ধ্যা হতাশ গলায় বললো, 'আমার সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এ আমি কোনোদিন ভাবিনি। এ আমি কোনোদিন ভাবিনি।'

'আমার দুর্ভাগ্য। কি আর করা! এখনই ভাবো।'

'কিন্তু, কিন্তু কেন আপনার এই সৃষ্টিছাড়া নির্বাচন? ও একটা কুমারী মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে—'

প্রভাংশু বলে, 'সৌন্দর্য বস্তুটা তো কেবলমাত্র বাইরের ছাঁচের মধ্যেই আবদ্ধ নয়!'

'কিন্তু আমি ওকে মুখ দেখাবো কি করে?' সন্ধ্যা সেই রুদ্ধ আবেগের গলায় বলে, 'না না, এ হয় না—'

'জগতে একটি মাত্র মানুষই সত্য? ওই আপনার কাবেরী? তার কাছে মুখ দেখানোটাই শেষ কথা?'

'শুধু ওর কাছে কেন, পৃথিবীর কাছেই—'

প্রভাংশু ওর কথায় বাধা দেয়।

প্রভাংশু খুব শান্তগলায় বলে, 'তাহলে কি এটাই ধরবো, আমিই এতদিন ভুল করে এসেছি? ভুল করেছি, ভুল দেখেছি, ভুল বুঝেছি?'

সন্ধ্যা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এই সময় কাবেরী এসে দাঁড়ালো।

যদিও বাপ মরার অশৌচ, যদিও প্রসাধনের সময় নয়, তবু প্রভাংশুর সাড়া পেয়েই বোধকরি সামান্য একটু প্রসাধনের ছোঁয়া লাগিয়ে এসেছে স্নানের পর। আর সেইটুকুতেই জলজলে দেখাচ্ছে তাকে। সেইটুকুতেই বোঝা যাচ্ছে মেয়েটা সুন্দরী।

আর সুন্দরী বলেই তো ওই চাকরিটা পেয়েছিল অত তাড়াতাড়ি। এক কথায় চাকরিটা হয়ে গেলে প্রভাংশু বলেছিল, 'সাধে আর বলেছে 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র!'

কাবেরী কটাক্ষ করেছিল, 'কোথায় আবার সর্বত্র? ওটা আপনার ভুল কথা।'

'ওটা আমার কথা নয়, শাস্ত্রের কথা।'

'সবাই শাস্ত্র-কথা মানে না। যেমন আপনি।'

প্রভাংশু সে কথাটা বুঝতে না-পারার ভান করেছে। প্রভাংশু বলেছে, 'সে যাই বলুন, মাইনেটা খারাপ দেয় না।'

মাইনে!

হ্যাঁ, তখনও 'আপনার' গণ্ডি ভেদ হয়নি।

কাবেরী আছাড় খেয়েছিল।

কাবেরী অবাক হয়ে ভেবেছিল, ঠিক এই মুহূর্তে 'মাইনে' শব্দটা উচ্চারণ করলো লোকটা!

তা লোকটা বোধকরি ভূতই।

অন্ততঃ এখনও একটা ভূতের মত কথাই বললো।

ঠিক এই মুহূর্তে, যখন কাবেরী আগ্রহে আর আহ্লাদে ছলছল করতে করতে সবে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন কি না বলে বসলো, 'এই যে তোমাদের ওই হবিষ্যান্নের যোগাড় সব ঠিক আছে তো? না কি সব নেই? দেখ তো—'

কাবেরী অবশ্য দেখতে গেল না।

কাবেরী বাপের রোগের সেবার সময় যেমন সব সময় গা ভাসিয়ে দিয়ে বলতো, 'আমি ওসব জানি-টানি না। ওসব শ্রীমতী বৌদির ডিপার্টমেন্ট', ঠিক তেমনি ভাবেই এখনো বলে উঠলো, 'আমি ওসব জানি-টানি না, ওটা হচ্ছে বৌদির ডিপার্টমেন্ট!'

'তবে যান, আপনিই যান, দেখে আসুন।'

উদাত্ত গলায় বলে প্রভাংশু।

'কম্পিত তনু' মানুষটাকে লোকলোচনের সামনে থেকে তাড়ায়। আর সন্ধ্যা চলে যেতেই কাবেরী মনে মনে বলে, উঃ কী চালাক! কেমন সহজে ভাগালো! আমি আবার ওকে 'ভূত' ভাবছিলাম!

মনে মনে বললো।

তবে মুখে বললো, 'বেচারা!'

সন্ধ্যার ওই কেমন একরকম করে চলে যাওয়াটা দেখে ওই শব্দটাই মনে এল তার।

প্রভাংশু যেন চমকালো।

বললো, 'কে? কার কথা বলছো?'

'বৌদির কথাই বলছি—' কাবেরী করুণায় বিগলিত হয়। 'ও বেচারীর যে কী হবে!'

প্রভাংশুর ঠোঁটের কোনায় কি একটুকরো হাসি উঁকি দেয়?

হয়তো দেয়, হয়তো দেয় না।

প্রভাংশু বলে, 'ওঁর জন্যে আর নতুন করে ভাববার কি আছে?'

'তা বটে!' কাবেরী আরো বিগলিত হয়, 'ওর তো সব ভাবাভাবি চুকেই গেছে। মুশকিল এই, বৌদিটার বাপের বাড়িতেও তিনকুলে কেউ নেই। এরপর যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! বিদ্যের সম্বল নেই যে, অফিসে চাকরি করবে, রূপ নেই যে আমার মতই কিছু একটা করবে। নইলে আমার চাকরিটাই ওকে দিয়ে দিতাম পরে।'

'সেই তো—' প্রভাংশু গম্ভীর গম্ভীর গলায় বলে, 'আমিও তো সেই কথাই ভেবেছি। আর ভেবে ভেবেই ঠিক করেছি, ও তোমার চাকরী তোমারই থাক, আমিই বরং একটা চাকরি দিই ওঁকে—'

'তুমি? তুমি আবার কী চাকরি দেবে ওকে?' কাবেরী কৌতুকে ঝালসায়। 'কম্পাউণ্ডারের চাকরি নাকি? না কি—'

'উঁহু! ভাবছি আমার হোম ডিপার্টমেন্টের হেড অফিসারের পোস্টটা—'

'কী? কী হল?' কাবেরীর চোখ মুখ ভুরু কপাল সব কুঁচকে ওঠে, 'কি বললে?'

'ওই তো—বলছি, ওর যখন আর কোথাও কিছু জুটবে না, বিদ্যে নেই যে অফিসে চাকরি করবে, রূপ নেই যে সাবান কোম্পানীর ক্যানভাসিংও করবে অন্ততঃ, তাহলে? তাহলে গতি কি? এতদিন যা করে এসেছে, রান্নাবান্না, ঘর গেরস্থালী সে কাজ ছাড়া আর গতি নেই ওর। অতএব ওটাই অফার করেছি ওকে, ঘরণীর পোস্টটা—'

কাবেরী ছিটকে ওঠে।

কাবেরী চড়া গলায় বলে, 'তোমার ঠাট্টা-তামাসাগুলো ক্রমশঃই কেমন কড়া হয়ে যাচ্ছে। জানো ও আমার দাদার বিধবা স্ত্রী! এভাবে ঠাট্টা—'

কী মুশকিল! ঠাট্টা করছি কে বললে? সত্যিই অফার করেছি। তোমার দাদার বিধবা স্ত্রী ছিলেন, তোমার বন্ধুর সধবা স্ত্রী হবেন—'

'ওঃ! তোমার মনে এ পাপ? এতদিন ধরে তাহলে আমায় নিয়ে মজা দেখেছ?'

কাবেরীর চোখ ফেটে জল আসে।

প্রভাংশু সেদিকে তাকায়।

খুব কোমল স্নেহের গলায় বলে, 'তোমার জন্যে সমস্ত পৃথিবীটাই উন্মুক্ত রয়েছে কাবেরী, ওর জন্যে শুধু একফালি জানলা। সে জানলাটাও বন্ধ করে দেব?'

'ওঃ, তার মানে তুমি দয়া করে একটি গরীব বিধবাকে বিয়ে করে উদ্ধার করবে?' ক্ষোভে দুঃখে ব্যঙ্গে বিকৃত দেখায় কাবেরীর সুন্দর মুখটা।

প্রভাংশু বলে ওঠে, 'আরে দূর! বরং সেই গরীব বিধবাটি আমার 'অফার' নিলেই উদ্ধার হয়ে যাই। কিন্তু আশ্চর্য! ধারণা ছিল না এত স্পষ্ট হতে হবে আমায়। ধারণা ছিল মেয়েরা অনুভবেই সব বোঝে।'

'ওঃ! তার মানে তুমি ওকেই—'

'বরাবর! গোড়া থেকে!'

'তার মানে আমাকে নিয়ে শুধু খেলাই করেছ!'

'চট্ করে অপরাধ স্বীকার করে বসবো না। ভেবে দেখতে হবে, খেলাটা তুমিই তোমাকে নিয়ে করে এসেছ কি না!'

কিন্তু প্রভাংশুর সব কথাটাই কি সত্যি? প্রতারণা কি করেনি সে? এ বাড়িতে প্রবেশাধিকার অবারিত রাখতে সে-খেলায় প্রশ্রয় কি দেয় নি প্রভাংশু?

ঘুষ

পাথরকুচি সাপ্লায়ার মদন মাইতি, সরকারী ইঞ্জিনীয়ার মুখার্জিকে ধরে পড়লো সাহেবকে একবার তার চাঁইবাসার নতুন কেনা 'পাথরকুচি বাংলোয়' পদধূলি দিতেই হবে। এবং হবে সস্ত্রীক।

ওই যুগলপদধূলি না পড়লে নাকি মদন মাইতির নতুন বাড়ি কেনাই ব্যর্থ। চাঁইবাসারই আশপাশের পাহাড় থেকে মদন মাইতির অন্নজল। অনেক পাহাড় লীজ নিয়ে রেখেছে সে।. কাজেই ওখানে একখানা বাংলোও কিনে ফেলেছে দাঁও পেয়ে। কিন্তু তার জন্যে সস্ত্রীক মুখার্জি সাহেবের পায়ের ধূলোর দরকারটা পড়ে কেন?

কেন?

কেন, সে-কথা বলতে মদন লজ্জা পাচ্ছে, তবু বলে ফেলে। মদন স্বপ্ন দেখেছে ওনাদের পায়ের ধুলো না পড়লে নাকি ওই বাড়ি তার সইবে না।

'কিন্তু আমরা কে?'

মুখার্জি সাহেব অবাক হয়ে বলেন।

মদন হাত কচলে বলে, 'কী করে বলবো বলুন স্যার। যা ফ্যাক্ট তাই বললাম।'

'স্বপ্ন' আর 'ফ্যাক্ট' এই দুটো যে পরস্পর-বিরোধী শব্দ, সেটা লোকটার মুখের উপর বলতে বাধে, কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে সম্পূর্ণ সেন্টিমেন্টের, অন্ততঃ সেই চেহারাই দিচ্ছে মদন মাইতি। অতএব সেখানে আঘাত দিতে চক্ষুলজ্জায় বাধে।

এই চক্ষুলজ্জার অবকাশে মদন মাইতি সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে শুরু করে মিহি চাল, খাঁটি দুধ, টাটকা ঘি, পুরুষ্টু মুরগী এবং পাখি শিকারের সুবিধের এমন লোভনীয় বর্ণনা দেয় যে, ব্যাপারটাকে 'ঘুষ' বলে চিনতে দেরি হয় না।

কিন্তু এটা হচ্ছে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। এ ঘুষে নগদ টাকার রূঢ়তা নেই, কিন্তু নগদ কারবারের ইশারা আছে।

সম্প্রতি যে মুখার্জির হাত দিয়ে একটা 'নয়া ব্রীজে'র পত্তন হচ্ছে, তার মালমশার জন্যে সরকার থেকে টেণ্ডার ডাকা হয়েছে। মদন মাইতি তার প্রার্থীদের মধ্যে একজন। আর পাথরকুচি পছন্দর দায়িত্ব সরকারী ইঞ্জিনীয়ার মুখার্জি সাহেবের।

অতএব দুইয়ে দুয়ে চার।

মদন মাইতি যদি নিজের পেট্রল পুড়িয়ে সাহেব মেমসাহেবকে কলকাতা থেকে চাঁইবাসায় তার নিজের বাসায় পায়ের ধুলো দেওয়াতে নিয়ে গিয়ে, খাইয়ে দাইয়ে, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়ে, উপরন্তু পাখি শিকার করিয়ে, ফের আবার পেট্রল পুড়িয়ে যথাসময় সাহেবকে স্বস্থানে

ফেরত দিয়ে যায়, এবং ফেরত গাড়িতে কোন্ না মণখানেক সরু চাল, টিন দুই খাঁটি ঘি, আর ডজনখানেক পুরুষ্টু মুরগী তুলিয়ে দেয় (দেবেই অবধারিত!), তা'হলে সাহেব সরকারী অর্ডারটা মদন মাইতিকে পাইয়ে না দিয়ে কি জন্য ফালতু লোককে দেওয়াতে যাবেন? যাবেন না। যাওয়া সম্ভব নয়।

মদনের পাথরকুচিই মুখার্জি সাহেবের পরীক্ষার চশমায় 'প্রথম শ্রেণী'র বলে গণ্য হবে।

মুখার্জি সাহেব জেনে বুঝেই টোপটি গেলেন।

কারণ প্রস্তাবটা বেশ লোভনীয় লাগে।

অনেকদিন এমন একটা প্রমোদ ভ্রমণের সুযোগ আসে'নি। কিন্তু এক কথায় তো রাজী হওয়া যায় না।

তাই যদিও মনে মনে বলেন, 'তুমি মদন মাইতি, তুমি হচ্ছো একটি ঘুঘু নম্বর ওয়ান, তাই তুমি স্বপ্ন দেখবার আর সাবজেক্ট খুঁজে পেলে না, আমাদের পায়ের ধুলোর স্বপ্ন দেখতে বসলে।' তথাপি মুখে ভারী একটা বিপন্ন ভাব দেখান।

'এ কী মুশকিল বল দেখি? তুমি কিনলে বাড়ি, আর তাকে পয়মন্ত করতে যেতে হবে আমাদের! আমরা কে? তুমি বরং তোমার গুরু-টুরুকে নিয়ে যাও।'

ঘুঘু নম্বর ওয়ান মদন মাইতি করজোড়ে বলে, 'আপনারাই আমাদের গুরু গোবিন্দ একাধারে সব সাহেব! তবু অকারণে আপনাকে এ জ্বালাতন করতাম না, যদি না স্বপ্নটা ঠিক ভোরের হতো।'

অর্থাৎ স্বপ্নটা মাঝরাত্তিরের হলে যদি বা ছাড়ান ছিল সাহেবের, ভোরের হওয়ায় ছাড়ান-ছোড়ন নেই।

সাহেব অবশ্য মনস্থই করে ফেলেছেন প্রস্তাবটা গ্রহণ করবেন, তবু কিছুটা খেলান। কথার খেলায় খেলাতে থাকেন।

'রাতে একটু হালকা করে খেও মাইতি, যাতে ভোর পর্যন্ত পেট ভার না থাকে।... ভয় আর কুসংস্কার এরা দুটি হচ্ছে কুকুরের জাত, বুঝলে মাইতি? যত প্রশ্রয় দেবে ততো বাড়বে।...

...ওহে মাইতি, স্বপ্নই যদি দেখলে, তো আর একটু বেশী দেখলে না কেন? এমন একটা স্বপ্ন দেখলে পারতে, মুখার্জি সাহেবকে লাখ দু-তিন টাকার চেক্ লিখে দিচ্ছো!'

কিন্তু খেলা আর কতোক্ষণ চলে?

তা ছাড়া অপরপক্ষ তো খেলছে না। সে তো শুধু হাত কচলাচ্ছে!

তার মানে খেলোয়াড়কে হাতে পুরছে।

অতএব শেষ পর্যন্ত হার মানতেই হয় মুখার্জি সাহেবকে। অর্থাৎ পরাজিতের ভঙ্গীতে বলতেই হয়, 'নাঃ, তোমায় 'পাথরকুচি' না দেখে আর উপায় নেই দেখছি। আচ্ছা বাতিকগ্রস্ত লোক বটে। একটা স্বপ্ন দেখে—আশ্চর্য!'

মদন মাইতি মনে মনে বলে, 'তুমিও আচ্ছা ঘুঘু! সেই যাবেই, শুধু এতোক্ষণ আমায় ল্যাজে খেলালে!' কিন্তু মুখে বলে, 'সাহেব, "হাতে চাঁদ পাওয়া" কথাটা শুনেই এসেছি চিরকাল, মানে বুঝতাম না। আজ সেটার মানে বুঝছি।'

'তুমি তো বলে বসছো চাঁদ পেলে, এখন তোমাদের মিসেস মুখার্জি রাজী হন কিনা দেখি।'

'হবেন স্যার! স্বপ্নদর্শনের কথাটা বুঝিয়ে বলবেন।'

* * *

'ওই র‍্যাবিশ মার্কা লোকটার সঙ্গে কী এতো কথা হচ্ছিল।' মিসেস ঠোঁট বাঁকিয়ে বলেন, 'কথা আর ফুরোয় না।'

'আরে ও হচ্ছে মদন মাইতি। একটা মজার স্বপ্ন দেখেছে সেই কথা বলছিল।'

'চমৎকার! তোমার বুঝি চাকরি গেছে? তাই বসে বসে স্বপ্ন-কথা শুনছিলে?'

'স্বপ্নটা ভেরি ইণ্টারেস্টিং!'

বলে মুখার্জি সাহেব 'টাই' কোট খুলতে থাকেন।

মিসেস নির্লিপ্ত গলায় বলেন, 'কিছু খাবে? না স্বপ্নেই পেট ভরে গেছে?'

'তা সত্যি বলতে, পেট না হোক মনটা বেশ ভরা-ভরা লাগছে—'

মুখার্জি সাহেব স্ত্রীর পাশে বসে পড়ে বলেন, 'শুনলে তুমিও খুশি হবে।'

অতঃপর শোনান, মদন মাইতির প্রস্তাবটা, ধীরে সুস্থে মজার সুরে।

যেন তিনি এটাকে কৌতুক বলেই ধরছেন, তবে মিসেসের যদি ইচ্ছে হয়।

আধুনিকতার অভিশাপ!

নিজের স্ত্রীর কাছেও অকৃত্রিম হতে দেয় না মানুষকে!

এখানেও 'দেখাতে' হয়।

তবে ভেবেছিলেন মিসেস উল্লসিত হয়ে উঠবেন। কারণ মিস্টার সব কথার শেষে একটা কথা বলে নেন, 'আমাদের বিয়ের পর প্রথম যখন তোমায় নিয়ে ট্যুরে বেরোই, মনে আছে তোমার মীরা, আমাদের চক্রধরপুরের বাংলো থেকে চাঁইবাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম? তাই নামটা শুনে মনটা একটু ইয়ে হয়ে উঠেছিল।'

মনে মিসেসেরও ছিল।

'মিস্টার'দের থেকে স্মৃতিশক্তি বেশীই থাকে মিসেসদের। মনটা তাঁরও 'ইয়ে' হয়ে উঠেছে বৈকি নামটা শুনে। তবু সেদিনের মতো উৎসাহে লাফিয়ে উঠতে পারেন কই? তখনকার মতো ভারমুক্ত জীবন কি আছে আর এখন?

এখন অনেক ভার।

তাই ভারীমুখেই বলেন মিসেস, 'ইয়ে হলেই বা কী হচ্ছে! আমি আর কী করে যাবো?'

প্রথমে যে এই প্রশ্নটা আসবে, তা জানতেন সাহেব, কারণ 'বেবি' বড় হয়ে ওঠা পর্যন্ত মিসেসের জীবনের জটিলতা যে অনেক বেড়ে গেছে তা টের পান।

তবে মিসেস মুখার্জি ওই 'বড় হয়ে ওঠা'টাকে যতোটা গুরুত্ব দেন, মিস্টার ততোটা দেন না। ওঁর ধারণা খাটো স্কার্ট পরা, এবং রাতদিন লাফিয়ে বেড়ানো ওই বাচ্চার মতো আহ্লাদী মেয়েটার জন্যে অতোটা কেয়ার না নিলেও চলে। ভাবেন, মীরা একটু বাড়তি করছে। মীরা তিলকে তাল ভাবে, মীরা চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলে।

ভাবেন, দু'ঘণ্টার জন্যে দু'জনে একটু সিনেমা দেখতে গেলেও বেবিকে পাহারা দেবার জন্যে বাড়িতে কাউকে এনে বসিয়ে রাখা, অথবা বেবিকেই মামার বাড়ি কি মাসীর বাড়ি কোথাও বসিয়ে রেখে আসার এই পদ্ধতিটা মীরার বাড়াবাড়ি।

ড্রাইভারের সঙ্গে স্কুলে পাঠানো বন্ধ করে 'স্কুল বাস'-এর ব্যবস্থা করাটা মীরার শুচিবাই। তবু বেবি যে বড় হয়ে উঠেছে সেটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না বয়সের হিসেব শুনে।

মিসেস যখন বলেন, 'সতেরো বছরটা এমন কিছু কম নয়। ও বয়সে আমার বিয়ে হয়েছে তা মনে রেখো।'

তখন চুপ করে যেতেই হয়।

তা'ছাড়া নিজেও তিনি একটা ব্যাপারে বিরক্ত হন।

মুখার্জি সাহেবের বন্ধুর ছেলে সুজিতের সঙ্গে বড্ড বেশী যেন মাখামাখি করে বেবি, বড্ড বেশী হুড়োহুড়ি।

সুজিত অবশ্য ছেলেবেলা থেকে এ বাড়িতে আসে, বলতে গেলে বাড়ির ছেলেরই মতো। কিন্তু বেবির মধ্যে সেই ভ্রাতৃভাবটা যেন আর নেই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা অন্য ভাব দেখা দিচ্ছে।

অথচ খুকী ভাবটি বজায় রেখেছে ঠিক।

নাচবে, লাফাবে, কথায় কথায় 'সুজিত সুজিত' করে বেপরোয়া সব ফরমাশ করবে তাকে, যেন কোনো গলদ নেই দু'জনের মধ্যে।

কিন্তু গলদ যদি না থাকবে, এতো মাখামাখির বাসনা কেন? এতো গায়ে গা ঠেকিয়ে বসা কেন? এতো একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার ঘটা কেন? বন্ধু? বন্ধুত্ব? মেয়েছেলের আবার বন্ধুত্ব!

অত্যন্ত প্রগতিশীলের ভান করলেও, মনের মধ্যে বদ্ধমূল আছে চির সংস্কার। তবু—মীরা যে ওই মেয়ে আগলানো মেয়ে আগলানো করে নিজেদের জীবনের সমস্ত স্বচ্ছন্দ গতির উপর পাথর চাপাচ্ছে, নিজেদের দাম্পত্য জীবনের গোপনতম এবং গভীরতম সম্পর্কটির পরিসর ক্রমশঃই সঙ্কুচিত করে আনছে, জীবনের পরমতম রসটি শুকিয়ে ফেলছে, এটা যেন বরদাস্ত হয় না।...স্বার্থে আঘাত পড়লেই মনে হয়, মীরা একটু বেশী বাড়াবাড়ি করছে।

এখনো সেই কথাই বলেন, 'দু'তিন দিনের জন্যে বৈ তো নয়! বেবিকে যদি তোমার দিদির বাড়ি—'

'সে হলে তো কোনো কথাই ছিল না—', মিসেস মুখার্জি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'মেয়েটি কেমন হয়েছেন আজকাল, জানো তা? এখন কোথাও রেখে আসার কথা বললে কী চোট-পাট করে? বলে, "কেন আমি কি জড়োয়া গহনা যে রাতদিন আগলাতে হবে?" বলে, "আমি কি ঘর ভেঙে পালিয়ে যাচ্ছি যে পাহারাদার রাখতে হবে?" বলে, "তোমাদের ছোট মন, নীচু মন, তাই সব সময় সব কিছুর মধ্যে কালো ছায়া দেখতে পাও। দু'ঘণ্টা একা থাকলে চোরে আমায় চুরি করে নিয়ে যাবে?"...আরো সব কত বলে।'

'হুঁ, কথা শিখেছে খুব।'

বলে পায়চারি করতে করতে বলেন মুখার্জি সাহেব, 'তোমার ওই বয়সে বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু তুমি অতো পাকা ছিলে না। মনে আছে মীরা, চাঁইবাসায় যাবার সময় আমি বলে-ছিলাম, এখানে বাঘ বেরোয়, শুনে তোমার কী ভয়! একেবারে খুকীর মতো—'

'আচ্ছা হয়েছে, থামো!'

বলে ভ্রূভঙ্গী করেন মিসেস মুখার্জি।

কিন্তু ক্রমশঃ মনটা তরলিত হতে থাকে। ক্রমশঃই যেন সেই নবযৌবনের স্মৃতির ঢেউ এই কঠিন হয়ে যাওয়া হৃদয়-বেলায় আছড়ে আছড়ে এসে পড়তে থাকে...ক্রমশঃই মনে হয় যেন ওই উদ্দাম সুখের স্বাদটার জন্যে মনটা তৃষিত হয়েছিল এতোদিন।

'কতোদিন আমরা দু'জনে একলা হই নি বলো তো মীরা? কতোদিন শুধু আমরা দু'জনে কোথাও বেড়াতে যাই নি?'

কতোদিন আর!

যতোদিন বেবি জন্মেছে।

তবু শিশু বেবিকে নিয়ে তেমন কোনো বাধা ছিল না, কিন্তু এখন পরিস্থিতি অন্য।

এখন যখন যেখানেই যান, যেন বেবিই মুখ্য হয়ে ওঠে, নিজেরা গৌণ হয়ে যান। বেবি অত্যন্ত 'মুডি' মেয়ে, কখন যে কী মুড্-এ থাকে! ও আগ্রায় গিয়ে তাজমহল দেখতে যেতে রাজী হয় না।

বছে কি, 'আমার একটা বন্ধু বলেছে, তাজমহল দেখলে তার সব মহিমা মন থেকে মুছে যায়। না দেখাই ভাল!'

'তাই বলে তুই আগ্রায় এসে তাজমহল দেখবি না?'

'নাঃ!'

'তার মানে আমরাও দেখবো না?'

'তোমাদের কে যেতে বারণ করেছে?'

'এই রাত্তিরে তোকে একা হোটেলে রেখে যাবো?'

'তাতে কি? ভূতে খেয়ে ফেলবে?'

শেষ পর্যন্ত দুঁদে ইঞ্জিনীয়ার মিস্টার মুখার্জি, ঠিকেদারদের কাছে যিনি ব্যাঘ্রতুল্য, তিনি তাঁর পনেরো বছরের ধাড়ি মেয়েকে খোশামোদ করতে বসেন ছ-খানা ক্যাডবেরি চকোলেটের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে রাজী করান।

বেবির ইচ্ছে, বেবির পছন্দ, বেবির রুচি, এই তালেই তাঁদের যুগল জীবন নিয়ন্ত্রিত। যেন বেবিই তাঁদের জীবনের প্রভু।

বেবির অশোভনতাকে তাঁরা তীব্র শাসনে সংযত করে তুলতে সাহসী হন না, শুধু সামলে বেড়ান, আগলে বেড়ান। সেই নীরস কঠিন কাজটি মিসেস মুখার্জির।

তাই হঠাৎ আজ যখন মুখার্জি সাহেব বলে উঠলেন, 'কতোদিন আমরা শুধু দু'জনে কোথাও বেড়াতে যাই নি মীরা!'

তখন সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা আলোড়ন এলো মীরা মুখার্জির। নাঃ, 'নিজেদের জীবন' বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই তাঁদের—তাঁরা যেন একটা দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে বসে আছেন। যেন তাঁদের প্রভুকন্যাকে পালন করছেন।

তাই বেবি যখন ভিজে বেড়াল সুজিতটাকে টেনে টেনে 'ল্যা ল্যা' করে বেড়ায়, যখন নিজের স্বাস্থ্যসম্পন্ন ভরাট যুবতী দেহটাকে খুকীর পোশাকে ঢেকে অশোভন ভাবে ধিঙ্গীপনা করে বেড়ায়, তখন মীরা মুখার্জি চোখ রাঙিয়ে 'খবরদার' বলে উঠতে পারেন না। বলে উঠতে পারেন না, 'ফের যদি তুই ওই গোঁফ-গজানে ছেলেটার সঙ্গে অমন হুড়োহুড়ি করে বেড়াবি তো দেখাবো মজা।'

না, এসব সাহস হয় না।

মীরা মুখার্জিকে তখন কেবলমাত্র ললিতমধুর কণ্ঠে বলতে হয়, 'ছিঃ বেবি, সুজিতকে তুমি এতো জ্বালাতন করছো কেন?'…নয়তো বা বলতে হয়, 'সুজিত, সোনা ছেলে, তুমি ওই রাক্ষুসীটার সব জবরদস্তি শোনো কেন? শুনো না তো!'

উপায় কি?

এছাড়া আর উপায় কি?

এই নাকি যুগের হাওয়া।

এই উদ্ধত অবিনয়ী অবাধ্য যুগে ওরাই হচ্ছে যুগের রাজা।

তবু বেবি যে এতোটা রাজাগিরি করবে তা ভাবেন নি মীরা মুখার্জি।

মদন মাইতির প্রস্তাবের বিবরণ শোনা মাত্র প্রথমটাই বলে উঠলো, 'ও মাই গড্! স্বপ্নালু ব্যাপার! ও বাপী, বাপী গো, তোমার ওই লোক এ কথা বলে নি তো, স্বপ্ন দেখেছে আমার মা ওর পূর্বজন্মের মা ছিল?'

মুখার্জি হেসে ওঠেন, 'নাঃ, অতোটা বলে নি।'

'যাক্! বললেও ক্ষতি ছিল না। বেচারী মার একটিও পুত্তুর নেই, থাকার মধ্যে এই এক ধিঙ্গী অবতার গুণবতী কন্যে। তবু একটি পুত্ররত্ন লাভ হতো।...যাক্— ওনার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে তো?'

মিস্টার ও মিসেস অলক্ষ্যে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে অপ্রতিভ গলায় বলেন, 'এতো করে বললো, "না" করা গেল না।'

বেবি একটা গোড়ালির উপর ভর করে বারতিনেক পাক খেয়ে ফ্রকের ঝালর নাচিয়ে বলে ওঠে, 'গুড্! না করবেই বা কেন? এমন একটা চার্মিং ব্যাপার! গাড়িতে যাওয়া আসা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, তদুপরি পক্ষীশিকার! আহ্ হা হা! কী মজা কী মজা!'

বেবি পাঁচ বছরের শিশুর মতো হাততালি দিয়ে বলে, 'উঃ বাপী, আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।' সুজিতটা শুনে একেবারে "থ" বনে যাবে! আচ্ছা বাপী—', যেন হঠাৎ মনে পড়েছে, এইভাবে বলে ওঠে, 'সুজিতটাকেও তো সঙ্গে নিলে হয়। বেশ মজা হবে।'

মজাটা কার হবে, এবং কিসে হবে তা অবশ্য বোঝা গেল না।

কিন্তু কর্তা-গিন্নী প্রমাদ গনেন।

সর্বনাশ! বেবি তাহলে ধরেই নিয়েছে তিনজনেই যাওয়া হবে। সেরেছে!

মুখার্জি সাহেব অসহায়ের মতো মেমসাহেবের মুখের দিকে তাকান, ভাবটা যেন—নাও, এখন তুমি বোঝো!

মেমসাহেব বোঝেন।

তাই মেমসাহেব অপ্রতিভ থেকে সপ্রতিভে আসেন।

'ওমা তুই কী করে যাবি? তোর পরীক্ষা!'

'পরীক্ষা! কিসের আবার পরীক্ষা এখন? না না, পরীক্ষা-টরীক্ষা কিছু নেই আমার। বা-পী তুমি এক্ষুনি আমার স্কুলে চিঠি দিয়ে দাও, চারদিন ছুটি চাই।'

মুখার্জি সাহেব হতাশদৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকান। বোঝেন 'দু'জনে একলা'র সুখস্বাদের আশা খতম।...কিন্তু মেয়েমানুষ সহজে আশা ছাড়ে না। মীরা মুখার্জিও ছাড়েন না। তিনি শক্তহাতে হাল ধরেন, 'না, দেখ, নেহাৎ লোকটার কথায় পড়ে যাওয়া! বাড়িসুদ্ধু গেলে হয়তো হাসবে। আমরা এমন ভাব দেখাবো যেন, আমোদ-আহ্লাদ কিছু নয় বাবা, নেহাৎ তুমি বলেছ তাই—তুই এ-দুদিন তোর বড় মাসীর কাছে—'

বেবি খুকীপনা করে বলে সত্যি কিছু আর খুকী নয় যে, এই কাঁচা যুক্তিতে তাকে ভোলানো যাবে। সে হঠাৎ বন্দুকের গুলির মতো ছিটকে ওঠে, 'আহ্লাদ পেয়েছে! নিজেরা মজা করে নাচতে নাচতে চাঁইবাসায় বেড়াতে যাবেন আর আমি বড় মাসীর বাড়ি—কক্ষনো না। কারো বাড়ি-কাড়ি গিয়ে থাকতে পারবো না আমি।'

'তাহলে আমারও যাওয়া হয় না।'

মীরা মুখার্জি বলেন।

'কেন, তোমায় যেতে কে বারণ করেছে?' বেবি কড়া গলায় বলে, 'তুমি কি বসন্তকেও নিয়ে যাচ্ছো?'

'বাঃ, ওকে কেন?'

মিয়োনো গলায় বলেন মীরা মুখার্জি।

'তবে আবার কি?' বেবির কণ্ঠ উচ্চগ্রামে, 'বসন্ত রাঁধবে, কুসুম বাসন মাজবে, আমি মনের আনন্দে হাত-পা ছড়িয়ে থাকবো।'

'চমৎকার! একা বাড়িতে রেখে যাবো তোকে?'

'তা তোমাদের যখন যাওটা বিশেষ দরকার! তোমাদের পায়ের ধুলো না পড়লে তার বাড়ি ভূমিকম্পে পড়ে যাবে, তখন তাই থাকতে হবে।'

'তবে তুইও চল। দু'জন আর তিনজন!'

সমস্ত বাসনার মূলে কুঠারাঘাত করেন মীরা মুখার্জি।

কিন্তু করলে কী হবে?

বেবির তো তখন মন ঘুরে গেছে। ও একবার যখন 'না' শুনেছে, আর যায়? এমন হ্যাংলা নয় বেবি মুখার্জি।

'ঠিক আছে, আমি যাবো না—', বললেন মীরা মুখার্জি, অন্তরালে গিয়ে, 'তুমি একাই যাও।'

মিস্টার মুখার্জি ঊর্ধ্বনেত্রে বলেন, 'কেউই যাবে না।'

'বাঃ, লোকটা এতো প্রোগ্রাম করলো, কী বলবে?'

'আমিও মনে মনে অনেক প্রোগ্রাম করে ফেলেছিলাম।'

'সে তো আমারও! কিন্তু দেখলে তো মেয়ের মেজাজ! আমি আর কী করে—'

হঠাৎ কী হয়।

মুখার্জি সাহেব চড়া গলায় বলে ওঠেন, 'না তুমিও যাবে। চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেয়ে কোন লাভ নেই। ওই একটা মেয়ের জেদের জন্যে আমাদের সব গেল! থাক্ ও একা।'

'ওর তো তাতে বড় ক্ষতি!' মীরা মুখার্জি বলেন, 'চিন্তা আমাদেরই।'

'চিন্তাটা একটু কমাও। যাবার ঠিক করো। কুসুমকে একটা দিন রাখো।'

মীরা মুখার্জি স্বামীর এ মূর্তি চেনেন।

দৈবাৎই এ রূপ দেখা যায় তাঁর, কিন্তু তখন আর ব্রহ্মা-বিষ্ণু এলেও টলাতে পারে না তাঁকে। অতএব যাত্রার গোছ করতেই হয় তাঁকে।

কিন্তু বেবি যেন সতীন-ঝির মতো ব্যবহার করছে।

এই বলছে, 'খিদে পেয়েছে' তক্ষুনি বলছে, 'খাবো না।' এই বলছে, 'মাথা ধরেছে', তক্ষুনি এমব্রয়ডারি নিয়ে বসছে। মীরা মুখার্জি যা কিছু দেখিয়ে দিয়ে যেতে চাইছেন তাকে, কিছু দেখছে না, এলোমেলো করে বেড়াচ্ছে।

রীতিমত ইচ্ছাকৃত উৎপাত।

ব্যাপার কি রে বাবা! একা বাড়িতে কিছু করে বসবে না তো! কিম্বা বাড়ি থেকে পালিয়ে-টালিয়ে যাবে না তো!

মীরা মুখার্জি চিন্তিত হন।

মীরা মুখার্জি উপায় খোঁজেন।

মীরা মুখার্জি সুজিতকে ডেকে পাঠান। মিনতি করে বলেন, 'সুজিত, বিশেষ কাজে দিন চারেকের জন্যে তোমার কাকাবাবুকে আর আমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে, তোমার এই পাগলা বোনটিকে একটু সামলিও। তোমার ওপরই ভার দিয়ে গেলাম বাপু। তুমি একটু একটু এসে এসে ওকে দেখে যাবে।'

বেবির মুখের চামড়ার নীচে হাসির হিল্লোল খেলে, তবু বেবি চড়া গলায় বলে, 'ও "ভার"! ভারী মানুষ, তাকে আবার ভার! এই সুজিত, খবরদার তুমি এই চারদিন আসবে না।'

এই সময় মদন মাইতির গাড়ি এসে দাঁড়ায়।

মুখার্জি দম্পতি উঠে পড়েন।

গাড়ি ছেড়ে দিলে সুজিত বলে, 'তাজ্জব! হঠাৎ কী হল বল্ দেখি বেবি? শ্রীমতী কাকীমা এমন উদার হয়ে গেলেন যে? বাবা, ইদানীং তো ওঁকে দেখলেই আমার হৃৎকম্প হত। যা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকান, যেন ভস্মীভূত করে ফেলবেন। আর এ একেবারে বেড়ালকে ডেকে মাছ রক্ষার দায়িত্ব স্থাপন!'

'ওঃ, ভারী যে কথা শেখা হয়েছে! বেড়াল, মাছ,—অসভ্য কোথাকার!' বেবির গায়ে একটা গায়ে লেপটে-থাকা হাতকাটা টিউনিক। বেবি হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সেটাকে আরো চোস্ত করতে করতে বলে, 'ব্যাপারটা বুঝতে আটকাচ্ছে কেন তোমার? ব্যাপার তো একেবারে জলের মত সোজা। বাবার ওই মদন মাইতি যেজন্যে মা-বাবাকে নিয়ে গেল, মা-ও সেই জন্যেই তোমার ওপর আমার ভার দিয়ে গেল। স্রেফ্ ঘুষ!'

———

মাথাধরা

সকাল থেকে মাথাটা ধরে আছে। রগের শিরটা এত দপদপ করছে, অসিতের মনে হচ্ছে বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে বোধহয় ওই দপদপানিটা। অথচ ওই নিয়েই চালিয়ে যেতে হচ্ছে, সকাল থেকে রাত অবধি।

কত রাত অবধি?

স্থিরতা নেই তার।

প্রতিদিন যে পরিমাণ অভিযোগ জমা হবে অসিতের বিরুদ্ধে, রাতের পরিমাপটা হবে সেই হিসেবে। কখন ঘুম আসবে ঠিক নেই; ঘুমের ওষুধগুলোও আজকাল পুরনো হয়ে যাওয়া চাকরের মত কাজে শিথিলতা দেখাচ্ছে।

কিন্তু ঘুম ভাঙার টাইমটা ঠিক রাখতেই হয়। কাঁটায় কাঁটায় ন'টার সময় অফিস পৌঁছতে হয়। বাড়ি থেকে সতেরো মাইল দূরে অফিস।

যাওয়া-আসাটা অবশ্য কোম্পানীর গাড়িতেই। দিয়েই রেখেছে কোম্পানী গাড়িটা, তাদের ছোট ডিরেক্টর সরকার সাহেবকে। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যেও দিয়েছে।

শুধু রবিবার দিনটা ড্রাইভারকে ছুটি দিতে হয়, সেদিনই শুধু অসিত নিজে গাড়ি চালায়। তা সেটা কলকাতায় থাকতে যত হত, এখন এই ব্যাঙ্গালোরের অফিসে বদলী হয়ে এসে তত হয় না। এখানে কোথায় বেড়াবে? আত্মীয়-বন্ধুর বালাই তো নেই, সিনেমা-থিয়েটারও এমন আকর্ষণীয় নয় যে তার জন্যে একটা আগ্রহ থাকবে। দ্রষ্টব্য-ট্রষ্টব্য যা কিছু, সে তো এসে পৌঁছবার দু'চার দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে।

কলকাতার মত অপ্রয়োজনে মার্কেটিং করার নেশাটাও কাটাতে বাধ্য হয়েছে করবী, কারণ কোম্পানীর এই নিজস্ব এলাকায় অবস্থিত কোয়ার্টার্স থেকে ওই 'মার্কেট' নামক বস্তুটা অতি সুদূরে। অতএব করবী বাড়িতেই সান্ধ্য আড্ডা বসিয়ে ফেলেছে। আর এই আড্ডাটা বসিয়ে ফেলার পর থেকে যেন কলকাতার শোকটা কিছুটা ভুলতে পেরেছে।

তাসের নেশা বড় নেশা, মদের নেশার থেকেও কিছু কম নয়, যদি খেলার অন্তরলোকে থাকে মধুভাণ্ড। আজকের হালকা পকেট যেমন আগামী কালকের জন্যে তীব্র প্রেরণা দেয়, কালকের ভরা পকেট তেমনি পরশুর জন্যে দুর্নিবার আকর্ষণে টানে।

ফুটপাথের লাইটপোস্টের নীচের চটপাতা আসর থেকে শুরু করে অভিজাতদের উচ্চ-মানের ক্লাবের বাসর পর্যন্ত আড্ডার চরিত্র এক ও অবিনশ্বর।

অতএব করবীর এই সান্ধ্য-আসরে তা-বড় তা-বড় 'সাহেবে'রা এসে জোটেন, এবং একেবারে ঘড়ির কাঁটায়। অবশ্য এই এসে জোটার একটা সুবিধে, সকলেই কোম্পানীর কেষ্ট-বিষ্টু, কাজেই তাঁদের বাসস্থানের এলাকাটা একই। অফিস থেকে ফিরে একটু ফ্রেশ

হয়ে আসতে যেটুকু সময় লাগে ব্যস। কোম্পানী প্রদত্ত গাড়ি আছে সকলেরই, সিকি মাইল পথ বহন করতেও সে চারপায় খাড়া।

এই তাসের আড্ডা বসানোর পর থেকেই যা করবীর কলকাতার শোক কিঞ্চিৎ লাঘব হয়েছে। বেচারী কোথায় মনে মনে বম্বের সমাজের স্বাদ পাবার আশায় স্পন্দিত হচ্ছিল, সে জায়গায় কিনা ব্যাঙ্গালোর! ছবির মত সাজানো শহর, তাতে কী লাভ হল? ছবির কী প্রাণ আছে? যাকে সাদা বাংলায় বলে লাইফ্!

তবু এই সন্ধ্যেবেলাটায় একটু লাইফের স্বাদ মেলে।

আসেন নিয়োগী সাহেব, আসেন মিস্টার ত্রিবিক্রম, আসেন পুরন্দর পট্টনায়ক, আসে জেকব। সে আবার সস্ত্রীক আসে। ম্যাড্রাসী খ্রীষ্টান, স্ত্রী কেরালার মেয়ে। তাসে ঘুঘু।

তাছাড়া রাও তো আসেই, বিকেল থেকেই এসে বসে থাকে। চা খায়, বোর্নভিটা খায়, বাড়ির বানানো ফুচকা খায়, এবং তখনো তাদের 'সাহেব বিবি'রা এসে না পৌঁছলে করবী আর তুতানে'র সঙ্গে দু'হাত চালায়। তেরো বছরের তুতান এখনই এমন ওস্তাদ খেলিয়ে হয়ে উঠেছে যে, মাঝে মাঝে করবীর ঈর্ষার খোরাক জুগিয়ে বসে।

অসিতও প্রথম প্রথম, মানে যখন তুতান বছর দশেকের ছিল, মেয়ের তাস নেওয়ার গুণপনাতে মুগ্ধ হত, বলত, 'আমার তো বাবা ওরকম বয়সে সব ছবিগুলোকেই এক রকম মনে হত, লাল কালো ছাড়া কোন তফাত ধরতে পারতাম না।' আজকাল আর মেয়ের সম্পর্কে বিস্ময় নেই। তাছাড়া কিছুদিন থেকে এই একটা রোগ অসিতকে পেয়ে বসেছে, এই মাথাধরা। প্রতিটি বিষয়ে ক্লান্ত করে তুলেছে অসিতকে এই অদৃশ্য ব্যাধিটি।

আজ খুব বেশী কষ্ট পাচ্ছে অসিত। এক-আধ দিন হয়তো কিছুটা কম থাকে, কিন্তু ধরেই. রোজ। অথবা ধরেই থাকে, ছাড়েই না। শুধু এক একদিন রগের শিরটা বড় বেশী দপ্ দপ করে, মনে হয় বুঝি বাইরে থেকেও দেখা যাচ্ছে। (হয়তো বা যায়ও, কে লক্ষ্য করছে।)

কোম্পানীর আজ কোনমীটিং ছিল না, পট্টনায়ক, ত্রিবিক্রম, জেকব, নিয়োগী সবাই যথাসময়ে এসে গেছেন, অসিতের দেখা নেই। অথচ একই সঙ্গে বেরিয়েছে। করবী বিরক্ত দৃষ্টি মেলে বার বার গেটের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, যখন টেবিলে এসে বসে বলে উঠেছে, 'ওর জন্যে আর অপেক্ষা করবার কোন মানে হয় না, আসুন আমরা খেলা শুরু করি'—তখন অসিতের গাড়ির আভাসটা দেখা গেল, গেটের বাইরে দূরের থেকে।

যাঁরা তাস নিয়ে অধৈর্যচিত্তে বসে বসে 'সাফ্ল্' করছিলেন, এবং গৃহিণীর দু একবারের অনুরোধকে সৌজন্যের খাতিরে গ্রহণযোগ্য মনে করছিলেন না, গৃহকর্তার জন্যে অপেক্ষার প্রস্তাব করছিলেন, তাঁদের অবস্থা প্রায়, 'এইবার ডাকিলেই খাইতে যাইব' হয়ে এসেছিল, কাজেই এইবারের ডাকটায় হাত ধুয়ে 'খেতে' বসতে উদ্যত হচ্ছিলেন, এই সময় কিনা ওই বাগড়াটা।

দেরীই যদি করনি তো খেলা বসে গেলেই এলে পারতিস। ভাবলেন ওরা, অসিত লোকটা যাচ্ছেতাই রকমের বেরসিক। করবী দেবীর মত এমন একখানি উজ্জ্বল উচ্ছল, প্রাণবন্ত মহিলার কিনা ওই স্বামী!

অফিসে অবশ্য খুব কেজো আর দুঁদে, কিন্তু বাড়িতে যেন নিষ্প্রাণ নির্জীব। ওর স্তিমিত নিরুৎসাহ ভাবের মুখটা করবীদেবীর ওই হাসিতে ফেটে পড়া পাকা ডালিমের মত মুখের পাশে এত বেমানান লাগে!

'মিঃ সরকারের বোধহয় কোথাও ঘুরে আসবার ছিল?' বললেন পট্টনায়ক।

করবী ঝলসে উঠল, 'কোথায় আবার ঘুরে আসবে? আমার অজানা কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ওর থাকে নাকি? কিছু ছিল না।'

'তাহলে তো ধরতেই হয়—' মুচকি হেসে বলেন ত্রিবিক্রম, 'মিষ্টার সরকার আপনার অজানিতে কিছু ঘটাতে শুরু করছেন।'

'ইস্!' করবী হাতের রুমালের ঝাপট মারে—ত্রিবিক্রমের গায়ে ঠিক নয়, সোফায় 'এখনো ওর দিকে আর কেউ তাকাতে পারে, এ বিশ্বাস আপনার আছে বুঝি?'

'জগতে কিছুই অসম্ভব নেই।'

'হয়তো কোন বিষয়েই নেই, তবে আপনাদের ওই সরকার সাহেবের 'নতুন' কিছু ঘটাটা স্রেফ অসম্ভব। যা ভারী মুখ! উঃ! নেহাত না কি অগ্রাহ্য করে চলি, তাই টিকে আছি ওর ঘরে।'

হাসির হুল্লোড় পড়ে যায়, ততক্ষণে অসিতের গাড়িটা এসে পোর্টিকোয় ঢোকে। অসিত গাড়ি থেকে নামতে নামতে হুল্লোড়টা শুনতে পায়।

আগে আগে এরকম মোক্ষম মুহূর্তে এসে পড়লে, অসিত হাতের পোর্টফোলিওটা দোলাতে দোলাতে বলত, 'আমার অনুপস্থিতিতে এত হাসি যে? হাসির কারণটা আমি নই তো?'

আজকাল আর তেমন বলছে না।

'এই যে! কতক্ষণ?' এই ধরনের কিছু বলে চলে যাচ্ছে। লন-এর মধ্যে প্যাগোডার ধরনের শেড লাগানো কাচ ঘেরা গোল ঘরটা হচ্ছে খেলার আড্ডা, কাজেই বাড়িতে ঢোকার সময় দেখা হতেই হবে।

তবু আজ অসিত অ্যাভয়েড করল। ওই আলো-ঝলমল কাচের ঘরটার দিকে না তাকিয়ে বারান্দায় উঠে গেল নিজের মনে।

'সরকারের শরীর খারাপ হয়নি তো?' বললেন নিয়োগী। কলকাতার অফিস থেকে একসঙ্গেই আছেন, একসঙ্গেই এসেছেন। সমপর্যায়, এবং সমবয়সীও। নিয়োগীর কণ্ঠে তাই হয়তো একটু উদ্বেগের সুর ফুটল।

সে উদ্বেগ নস্যাৎ করে দিলেন মিসেস সরকার। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বললেন, 'শরীর খারাপ হতে যাবে কেন? যাক্ গে আর পারা যাচ্ছে না। আসুন।' অর্থাৎ, খেলি আসুন।

নিয়োগী তবু বললেন, 'না না, আপনি বরং একবার দেখেই আসুন মিসেস্ সরকার।'

নিয়োগীর এতটা বাড়াবাড়িতে পট্টনায়ক অলক্ষ্যে ঠোঁট বাঁকাল, জেকব হাতের সিগারেটটা শেষ হবার আগেই অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে দিল। ধোঁয়াতে লাগলো সেটা, হয়তো তার মনোভাবের প্রতীক হিসেবে।

করবী বলল, 'আমার দায় পড়েছে। ভিতরে কুট্টি আছে, দীনেশ আছে। তুতানও আছে।'

হ্যাঁ, তুতানও আছে। রাওয়ের সঙ্গে চাইনিজ চেকার খেলছে। আজ আর ওর বুড়োদের আড্ডায় বসতে ইচ্ছে হয়নি। তাই রাওকে ছাড়েনি। রাওই একমাত্র তরুণ।

ত্রিবিক্রম মুচকি হেসে বলল, 'যান যান মিসেস সরকার। মিস্টার নিয়োগী যখন ঘরে ফেরেন; মিসেস নিয়োগী তখন কিচেন থেকে ছুটে ছুটে বেরিয়ে আসেন।......আমার নিজের চোখে দেখা।'

করবী মনে মনে ঠোঁট বাঁকায়।

মিসেস নিয়োগীর সঙ্গে করবীর তুলনা!...মিসেস! নিয়োগীগিন্নী বল না বাবা! সেই হাতে শাঁখা, কপালে টিপ, সোজা করে শাড়ি পরা, সর্বদা রান্নাঘর নিয়ে মসগুল্ স্ত্রীলোকটিকে 'গিন্নী' ছাড়া আর কিছু বলাটা বাড়াবাড়ি বাহুল্য। কর্ত্তা ঘরে ফিরলে ছুটে ছুটে বেরিয়ে আসবে, ওর পক্ষেই এই স্বাভাবিক। তবে এখন করবীরও সেই ইচ্ছেই করছিল, কারণ অসিতকে একবার দেখে নেওয়া দরকার। ভেবেছ কি ও? কী চায়? মান্যগণ্য অতিথিদের সামনে করবীকে অপদস্থ করতে চায়? কিন্তু ইচ্ছেটা কাজে পরিণত করতেও লজ্জা করছিল। 'অনুগামিনী ভার্যা'র ভূমিকাটা লজ্জার বৈ কি!

নিয়োগী সাহেব ইচ্ছেপূরণের সুযোগটা করে দিলেন।...অথবা ত্রিবিক্রম। করবী হি হি করে হেসে উঠে বলল, 'তাই নাকি? আপনার নিজের চোখে দেখা? তাহলে তো আরও একবার তেমন দৃশ্য দেখাতে হয় আপনাকে। তবে এই চললাম ছুটে ছুটে।

ওর কিশোরী মেয়ে তুতানের ভঙ্গিতে ছুটে চলে গেল।

ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য ভঙ্গীটা পাল্টে যায়, অত রংচঙে মুখটাও কালচে তামাটে দেখায়, পর্দা ঠেলে ঘরে ঢোকাটা কঠোর কঠোর দেখতে লাগে।

'তোমার কী হল?'

অসিত আস্তে আস্তে পোশাক বদল করছিল, আস্তেই বলল, 'কী হবে?'

'কী হতে পারে, সেটা আমার জানা নেই। তবে ওই লোকগুলোর সঙ্গে অভদ্রতা করার উদ্দেশ্য কী, সেটাই জানতে চাইছি।'

'অভদ্রতা!'

'হ্যাঁ। আকাশ থেকে পড়ছ যে!' করবীর গলা থেকে তার অনেকদিন শেখা এই গ্রাম্য মন্তব্যটা বেরিয়ে পড়ে।

'ওভাবে না তাকিয়ে চলে আসাটা বুঝি তোমার খুব স্বাভাবিক এবং সভ্যতা মনে হচ্ছে?'

অসিত ছেড়ে-রাখা প্যান্টটা হ্যাঙারে ভরতে ভরতে বলে, 'খুব টায়ার্ড লাগছিল—মাথাটা ধরেছে।'

'ওটা তো তোমার দৈনিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, অথচ ডাক্তারের পরামর্শ নেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছ না।'

অসিত কথা বলল না।

করবী একটু অপেক্ষা করল, দেখল অসিত প্যান্ট সমেত হ্যাঙারটা ওয়ার্ডরোবে ঢোকাতে গেল, বুঝল অসিত উত্তর দিল না।

দেবে কোথা থেকে? উত্তর দেবার কিছু থাকলে তো?

মাথাধরা না হাতি! লোকগুলোকে আর পছন্দ হচ্ছে না। তাই মাথা ধরছে। টায়ার্ড! সবাই সারাদিন যা করেছে, তুমিও তাই করেছ। কেউ টায়ার্ড হল না, তুমিই হলে! এমনই টায়ার্ড হলে যে সাধারণ সৌজন্যজ্ঞানটুকুর ধার পর্যন্ত ধারলে না।

তোমার মাথাধরা আর টায়ার্ড ফীল্ করা বার করছি আমি। কিন্তু এখন সময় নেই, তার জন্যে রাত্তির আছে। ঘুমের ওষুধ খেয়ে আমার হাত এড়াতে পারবে না। এখন অতিথিরা বাড়িতে। ওদের সঙ্গে ভদ্রতার দায় আমাকেই পোহাতে হবে।

অথচ ওই সব লোকগুলোকে আদর করে বাড়ির দরজা চিনিয়েছ তুমিই। আমি ওদের ডেকে আনতে যাইনি।...অজস্র কথা মনের মধ্যে পাক খেয়ে গলায় উঠে আসতে চাইছে, তবু সেই চাওয়াটাকে প্রশ্রয় না দিয়ে করবী ঠোঁট টিপে বলে, 'চা খাবে? না কফি? না কি বোর্ন-ভিটা?'

'যাহোক খেলেই হবে—'অসিত বাথরুমে ঢুকতে যেতে যেতে বলে, 'তার জন্যে তোমায় আটকে থাকতে হবে না। কুট্টি তো রয়েছে।'

'আমি আটকে থাকতে চাইও না'—করবী ঠিকরে ওঠে, 'তোমার ওই কুট্টি থাকলেই যথেষ্ট তা জানি। আমার এই আসাটাই একটা ফার্স, তাও জানি। কী করব, লোকের কাছে তো মুখ রাখতে হবে! দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি যাবে এ প্রত্যাশাটুকু করতে পারি বোধহয়?'

'যাব?'

অসিত ফিরে দাঁড়াল।

অসিত বাথরুমের দরজাটা ঠেলে খুলেছিল বলে, ভিতরটা একটু দেখা যাচ্ছিল, অতি-আধুনিক বিলাসী স্নানের ঘরের পরিপাটি ছবি ওই টবে।

লাফিয়ে পড়ে মাথার উপর সাওয়ার খুলে দিয়ে বসলে, মাথাধরা পালাতে পথ পাবার কথা নয়, অথচ অসিতের প্রতিদিন মাথা ধরছে; রগের শিরা দপদপ করছে, ঘাড়টা ছিঁড়ে পড়বার মত হচ্ছে।

ওই জন্যেই বোধহয় অসিত ভুলে ভুলে ওই বাহুল্য প্রশ্নটা করল, 'কোথায় যাব? ওঃ, ওই ওখানে! আজ আর পারা যাবে না। অসহ্য মাথা ধরেছে। ওঃ, একেবারে অসহ্য!'

'তা, ওদের কী বলা হবে?'

'যা সত্যি, তাই বলবে।'

'আ—চ্ছা! কিন্তু তোমার কোন্‌টা সত্যি?' করবীর মুখটা আরো কালো দেখায়।

অসিত হাসির মত করে বলে, 'আমার সবটাই সত্যি।'

'তার মানে অন্যের সব কিছু মিথ্যে? যাক তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না, স্টকে আরো যদি কিছু থাকে বলে নিতে পারো। তবে এটা খেয়াল থাকা দরকার, রোজ রোজ শরীর খারাপের অজুহাতও হাস্যকর। লোকে অবশ্যই প্রশ্ন করবে, 'শরীর খারাপ তো ডাক্তার দেখাও না কেন? পয়সা নেই চিকিৎসা করাবার?' অসিত বাথরুমে ঢুকে পড়েছে, দরজাটায় হাত দিয়েছে, তবু করবী চাপা তীব্র গলায় প্রশ্ন করে, 'একথার উত্তরটা দিয়ে যাও।'

'উত্তর নেই। যা ইচ্ছে বানিয়ে বলতে পারো। জলের নীচে মাথাটা না পাতা পর্যন্ত দাঁড়াতে পারছি না।'

দরজাটা বন্ধ করে দিল। করবীর মুখের উপর। উল্লাস বোধ করল।

কারো মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিতে পারার একটা প্রচণ্ড উল্লাস আছে। হয়তো বর্বর উল্লাস, তবু সে উল্লাসের স্পৃহা আছে মানুষের রক্তে। কিন্তু দিতে পারাটা দুষ্কর। একমাত্র বাথরুমের দরজাটি ছাড়া। ওটাই বন্ধ করে দেওয়া যায়, যে কারোর মুখের ওপর।

বন্ধ দরজার এপার থেকে শুনতে পেল করবীর তীক্ষ্ণ মন্তব্য, 'রোজ রোজ মাথাই যে কেন ধরে!'

শাওয়ার খুলে দিয়ে মাথা পেতে বসে অসিত অনেকক্ষণ, ভাবতে থাকে, কেন ধরে তার জবাবটা নিজেই জানি না তো তোমায় দেব কী!...তোমাকে না জানালেও ডাক্তার দেখিয়েছি বৈকি। ডাক্তার বলেছে ব্লাড্‌প্রেসার নয়। চশমার বার্ধক্যের জন্যে নয়। বলেছে, 'কারণটা আপনার নিজের মধ্যে।'

সেই কারণটা খুঁজতে থাকে অসিত, খুঁজে পায় না।

জলের নীচে বসে থাকতে থাকতে প্রায় সর্দি ধরে যাচ্ছিল, উঠে পড়ল। দ্রুত প্রস্থ তোয়ালে গায়ে মাথায় ঘসে বেরিয়ে এল, জামা-টামা গায়ে দিয়ে এ বারান্দার ওদিক দিয়ে পিছনের বারান্দায় চলে গেল। যাবার সময় দেখতে পেল ডাইনিং টেবিলের উপর চাইনিজ চেকারের ছকটা পেতে মুখোমুখি খুব ঝুঁকে পড়ে বসে খেলছে ওরা।

তুতান, আর রাও। দুজনের কপালে কপালে প্রায় ঠোকর লাগছে।

অসিতকে ওরা দেখতেই পেল না। দুজনের একজনও না।

খেলায় একেবারে নিমগ্ন।

তবু অসিতের মনে হল, ওরা ইচ্ছে করেই দেখল না। দেখলেই উঠতে হবে কথা বলতে হবে, দেরী হয়ে যাবে, কী দরকার তবে দেখার?

অসিতও তবে দেখতে পেল না।

অতএব এ কথা বলারও দায়িত্ব রইল না অসিতের 'ডাইনিং' টেবিলে খেলতে বসেছ কেন? কত দিন বারণ করেছি। আর জায়গা নেই?'

বলতে হল না বলে বাঁচল যেন।

পিছনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

এদিকটা বাড়ির পিছন, তাই শোভা সৌন্দর্যের ব্যবস্থা নেই। বারান্দার নীচে দুটো পুরনো ড্রাম গড়াগড়ি যাচ্ছে। একটা ভাঙা বেসিন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, এখানে ওখানে আগাছা গজিয়ে জঙ্গল করছে।

অথচ এই দিকটাই দক্ষিণ।

সামনের দৃশ্যটা অপ্রীতিকর হলেও দক্ষিণের হাওয়াটা খুব ভাল লাগল। হঠাৎ মনে হল, মাথাধরাটা নেই। ঘাড়ের উপরটা হালকা হালকা।···সমস্ত শোভা সৌন্দর্যের দৃশ্য ত্যাগ করে এই দিকটাতেই এসে বসে থাকবে নাকি এবার থেকে অসিত একটা আরাম চেয়ার পেতে? মন্দ নয়, দুটো পুরনো ড্রাম কি একটা ভাঙ্গা বেসিনের দৃশ্য কতই আর ফুটবে চোখে?

কোন চেয়ারটা এখানে এনে ফেলে রাখা যায়? যেটা করবী আবার টেনে নিয়ে যাবে না?

হঠাৎ অসিতের দাঁড়ানো পিঠের সঙ্গে একটা ভারী ভারী নরম শরীর একেবারে লেপটে দিয়ে কে পিছন থেকে দু'হাতে চোখ টিপে ধরে মিহি গলায় বলে উঠল, 'কে বল তো?'

অসিতের সারা শরীরটা যেন একটা বিতৃষ্ণার শক্ খেলো, অসিতের পিঠটা যেন কুঁকড়ে গেল।

পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে এসে যে পড়ল, তার শরীরটা রীতিমত পুষ্ট, তাই একেবারে পিঠে লেপটে যেতে পারে নি, তাই আচমকা একটা অস্বস্তির ঝাপট মারল যেন।

ঝট করে ফিরে দাঁড়াল অসিত, চোখ টেপা হাত দুটো চোখ থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে গেল, পারল না, চোখ ছেড়ে যেতেই গলাটা ধরে ঝুলে পড়ল সেই নীটোল নিরাভরণ হাত দুটো।

গড়নটা বেজায় বাড়ন্ত, ঊরুর উপর তোলা, আর কাঁধে শুধু টেপ্ দেওয়া মিনি ফ্রক পরে বেড়ায় তাই বাচ্চা, শাড়ি পরলে ষোলো আঠারো দেখাত!···

অসিতের হঠাৎ ওর পা দুটোর ওপর চোখ পড়ল, অসিতের চোখটা বুজে ফেলতে ইচ্ছে করল, অসিত গলায় ঝোলা হাত দুটো গলা থেকে নামাতে চেষ্টা করল, একবারের চেষ্টায় পারল না।

সারা শরীরের ভারটা দিয়ে ঝুলে পড়েছে আহ্লাদী মেয়েটা।

'বা-পী! তুমি খুব রেগে গেছ বুঝি? কার ওপর? আমার ওপর, না মায়ের ওপর?'

কোথায় যেন চড়াৎ করে একটা শব্দ হল।

কোথায়? ঘাড়ে? মাথায়? মেরুদণ্ডে?

আরো একদিন এই রকম শব্দ হয়েছিল, মনে পড়ছে। কবে তা মনে নেই, শুধু করবীর সরু গলার ধিক্কারটা মনে আছে, 'কোন যুগে আছ'? অষ্টাদশ শতাব্দীতে? বাচ্চারা বাচ্চার মত করবে না তো কি বুড়োর মত বিজ্ঞ হবে? 'আংকেল' বলে ডাকে, আবদার করে একটা জিনিস চেয়েছে বলে, তুমি বাইরের লোকের সামনে ওইভাবে ধমক দিলে? দুটো ক্যাডবেরি চকোলেট, এই তো ব্যাপার, ত্রিবিক্রম মারা যাবে ওটা কিনতে? নিজের নীচতাটা এভাবে প্রকাশ করতে লজ্জা করল না? ত্রিবিক্রম বা কী ভাবল? লজ্জিতও হল কম নয়। ছি, ছি, তুতান একটা আস্ত মানুষ? ওর এক্ষুনি জ্ঞানবুদ্ধি পাকামি সব হয়ে যাবে? যে যুগে আছ, সেই যুগকে দেখতে শেখো। তোমার বাপ-জ্যাঠার চশমা চোখে দিয়ে পৃথিবীকে দেখতে বসলে হাস্যাস্পদই হবে।'

মাথাধরার শুরু কি সেই থেকেই?

হাত দুটো সাবধানে নামিয়ে দিয়ে অসিত সহজ গলায় বলল, 'শুধু শুধু রাগ করব কেন?'

'তবে তুমি এখানে বোকার মত একা একা দাঁড়িয়ে আছ কেন? ও বাপী!' অসিত শান্তগলায় বলল, 'মাথাটা ভীষণ ধরেছে তাই—'

হ্যাঁ, এই মুহূর্তে অনুভব করল অসিত মাথাটা আবার ভীষণ ধরে উঠেছে, ঘাড়ে যেন বিশমণ বোঝা। এবং অনুভব করল এ মাথাধরা জীবনেও আর ছাড়বে না, তার ঘাড়ের উপর ওই ভারটাও থেকেই যাবে। থেকে যাবে না কেন? কলসীর মধ্যে থেকে দৈত্যটাকে তো অসিত নিজেই বার করেছে।

কিন্তু তখন কি অসিত বুঝতে পেরেছিল ওই দৈত্যটাকে ঘাড়ে নিয়ে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ একদিন দম ফুরিয়ে যাবে তার?

তখন পারে নি, এখন বুঝতে পারছে, কোন ফাঁকে হঠাৎ দম হারিয়ে গাছতলায় বসে পড়েছে সে, আর সত্যিই বাবা-জ্যেঠামশাইয়ের ফেলে যাওয়া পুরনো চশমাখানা চোখে 'পরে ফেলেছে।

অতএব সেরে ওঠবার আশা আর নেই অসিতের। কী করে থাকবে? ঘষা পুরনো চশমার মধ্যে দিয়ে পৃথিবী দেখতে বসলে মাথা ধরবে না?

ভয়ের বাসা

এখানটা অন্ধকার, এখানটা স্টেজের পিছন দিক। এখানে বাঁশের খুঁটির গায়ে জড়ানো দড়ির শেষপ্রান্তগুলো কুণ্ডলী পাকানো সাপের মত পড়েছিল।

আলোর মালা পরানো, জনারণ্য সামনের দিকটা দেখলে কে বলবে এত কাছাকাছি এমন একটা ছায়াচ্ছন্ন নির্জন জায়গা রয়েছে।

তবু রয়েছে ওটা।

আর রয়েছে রীতা সেখানে দাঁড়িয়ে, বিমূঢ়ের মত।

কিন্তু কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থেকেছে ?

বড়জোর কয়েক সেকেণ্ড।

তারপরই রীতা তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসতে গেল, আর সেই সময় শুকনো শুকনো ঘাস-জমির উপর পড়ে থাকা ওই চকচকে জিনিসটা চোখে পড়ে গেল রীতার। কী ও ?

রীতা থমকে দাঁড়ালো, একটু ইতস্তত: করলো, তারপর জিনিসটা হাত না ঠেকিয়ে আস্তে চটির আগায় করে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে গেল। এ জায়গাটায় প্যাণ্ডেলের ছাউনীর কোণ থেকে কেমন করে যেন এক ফালি আলো এসে পড়েছে।

সেই আলোর ফালির উপর জিনিসটাকে ঠেলে দিল রীতা।

তারপর আর সন্দেহ থাকল না।

সোনা!

পৃথিবীর পরমতম আকর্ষণীয়, চরমতম পাপ! রীতা বুঝতে পারলো কোন অসাবধানী মেয়ের কাণ্ড!

হয়তো এখুনি ছুটে আসবে খুঁজতে।

আর রীতাকে এমন একা একা প্রায় চোরের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে উঠবে, 'তুমি এখানে কী করছো ?'

তখন রীতার কি বলবার থাকবে ?

বেড়াতে এসেছিলাম এদিকে ?

খুঁজতে এসেছিলাম কাউকে ?

না কি বলবে, হঠাৎ গুণ্ডার হাতে পড়ে গিয়েছিলাম। সে আমাকে এদিকে টেনে এনে—

কিন্তু কাউকে এত কথা বলার কী দরকার ? রীতা তো এখুনি ছুটে পালাতে পারে ? যেমন বসে অভিনয় দেখছিল তেমনি গিয়ে দেখতে পারে, মার পাশে যে চেয়ারটায় বসেছিল এতক্ষণ সেই চেয়ারটায় বসে।

মা অবশ্যই বলবে, 'এত দেরী করলি যে ?'

বলবেই। কারণ রীতা দেখতে পাচ্ছে হঠাৎ কিছুদিন থেকে রীতা সম্পর্কে বড় বেশী সচেতন হয়ে উঠেছে মা।

রীতার গতিবিধিকে যেন নখদর্পণে রাখতে চায়, রীতার মনের ভিতরটা যেন দর্পণ ফেলে ফেলে দেখতে চায়।

তাই যখন তখনই মা অত্যুগ্র প্রশ্নে তীব্র হয়, 'এখন ছাতে গিয়েছিলি যে? এতক্ষণ নীচে কি করছিলি?…স্কুল থেকে ফিরতে দেরী হল কেন? জানলায় দাঁড়িয়ে কথা কইছিস কার সঙ্গে?'

প্রশ্নগুলো সাধারণ, ভঙ্গীটা সাধারণ নয়।

স্থির নিশ্চিন্ত, এখনও মা সেই ভঙ্গীতেই বলে উঠবে, 'এত দেরী করলি যে?'

এমনিতেই তো যখন রীতা নাটক দেখতে দেখতে হঠাৎ উঠে পড়ে বলেছিল, 'আসছি এক্ষুনি।' তখন মা চাপা বিরক্তির গলায় বলেছিল, 'এখন কেন? ইনটারভ্যালের সময় যাস।'

তার মানে তখন মা নিজেও ধাওয়া করবে মেয়ের পিছু পিছু। যেন নিজেরও দরকার বাথরুমে। কিন্তু এখন নাটকের এক মহামুহূর্ত চলছে, তাই মার পক্ষে ওঠা সম্ভব নয়।

মা অতএব শুধু চাপা বিরক্তির গলায় বলেছিল, 'এখন কেন?'

তা সত্ত্বেও চলে এসেছিল রীতা।

কিন্তু এ দিকে কেন চলে এসেছিল রীতা? এখানে ওর কী কাজ?

ও কি দেখতে এসেছিল এদিকটা এত অন্ধকার কেন? না কি আলো খুঁজতেই এসেছিল বিভ্রান্ত হয়ে? আর সেটা খুঁজতে এসেই অকস্মাৎ একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেল রীতার উপর দিয়ে?

আর রীতা তাই হাওয়াটা সরে গেলেও বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে ছিল।

'কিন্তু ও কেন এখানে এসেছিল?' রীতা ভাবলো, 'ওই মেয়েটা? অথবা মহিলাটি? ঝকঝকে জমজমে নেকলেসখানা হারিয়ে যে এখন অস্থির হয়ে উঠেছে। অথবা এখনো টের পায় নি হারিয়েছে। বিশ্বাসঘাতক নেকলেসটা নিঃশব্দে কণ্ঠচ্যুত হয়ে ওই শুকনো ঘাস জমিটার উপর পড়ে আছে অন্য কারো কণ্ঠলগ্ন হবার বাসনায়।'

তার মানে, একা রীতাই নয়, আরো মেয়ে আছে যারা রীতার মত গোলমালের' সুযোগে নির্জনতা খোঁজে।

কি জানি কি জুটেছিল বেচারার ভাগ্যে?

স্তব্ধ প্রতীক্ষা? না আচমকা ঝড়?

অথবা রীতারই মত একটার পর আর একটা।

সেই বিপর্যয়ের ধাক্কায় গলা থেকে মালা খসে যাওয়া বিচিত্র নয়।

রীতার মনে হলো গহনাটা হারিয়েছে রীতার মতোই কোনো একটা মেয়ে। 'মহিলা' কেন হতে যাবে? মহিলার এদিকে কী দরকার?

আহা না জানি আজ বেচারার কপালে কী আছে!

রীতার হাতটা এগিয়ে গিয়েছিল সেই চরমতম আকর্ষণীয়ের দিকে, তবু রীতা কুড়িয়ে নিতে ইতস্ততঃ করছিল। কি জানি যদি একটু পরে ওই গহনা-হারানো মেয়েটা হারানো বস্তু খুঁজতে আসে? রীতা ওটা কুড়িয়ে নিলে, পাবে না সে। 'হয়তো কত বকুনি খাবে। হয়তো তার মা-ও রীতার মার মত প্রশ্নে তীব্র হবে, 'হারালো কী করে? কোথায় গিয়েছিলি?'

আর বেচারী মেয়েটা শূন্যে উত্তর খুঁজবে।

কিন্তু সত্যিই কি শুকনো শুকনো ঘাসের উপর পড়ে থাকা চক্‌চকে ওই জিনিসটা পড়েই থাকবে? রীতা চলে যাবে?

তা রীতা গেলেই কি জিনিসটা পড়ে থাকতে পারে? কেউ আসবে না? খপ করে কুড়িয়ে নেবে না?

রীতা কুড়িয়ে নিয়ে বরং—রীতা আর একবার চারিদিকটা অবলোকন করে নিল, তারপরই খপ্ করে তুলে নিল বস্তুটা।

আর তুলে নেবার পরই মনে এসে গেল রীতার, আরে আমি কী বোকা! এটাকে সোনা ভেবে চিন্তিত হচ্ছি, যার হারিয়েছে তার দুঃখে বিগলিত হচ্ছি, অথচ একথা ভাবছি না, এটা আদৌ সোনা কিনা।

নাঃ সোনা নয়, পিতল!

এরকম অবিকল সোনার গহনার মত দেখতে কেমিকেলের গহনার তো ছড়াছড়ি বাজারে।

ঠিক ঠিক, কেমিকেলই।

তাছাড়া আর কিছু নয়।

যারা সখের থিয়েটারে অভিনয় করতে এসেছে, তাদের দলেরই কারো জিনিস। কীভাবে হঠাৎ সাজঘর থেকে ছিটকে এসে পড়েছে।

আর কিছু নয়, আর কিছু হতে পারে না।

পিতলটাকে সোনার ভেবেছিল বলে, আর ভয়ে ভয়ে চটি দিয়ে এগিয়ে আনবার সময় চিরসংস্কারের বশে মনে মনে একবার নমস্কার করেছিল বলে, নিজের উপর যেন অনুকম্পা এল রীতার

তারপর ভাবল, চকচক করলেই সোনা হয় না। আর আসলের চাইতে অধিক চকচক শাস নকল।

অন্ধকারের দিক থেকে উজ্জ্বল আলোর দিকে চলে এল রীতা সেই নেকলেসটাকে মুঠোয় চেপে! আলোর নীচে একবার মুঠো খুলে মেলে ধরে দেখবার বাসনা দুর্দমনীয় হচ্ছে, তবু বাসনাটা দমন করতে হলো। কি জানি বাবা—যদি কেউ চোর ভাবে রীতাকে!

হয়তো এই সময়টুকুর মধ্যেই জিনিসটার খোঁজ পড়ে গেছে, হয়তো কেউ খুঁজে বেড়াচ্ছে, তার হাতে যদি পড়তে হয় রীতাকে?

তার থেকে নিয়ে গিয়ে মার হাতে তুলে দেবে রীতা, মা অভিনয় ভাঙার পর সাজঘরে গিয়ে খোঁজ করবে, 'কারুর কিছু হারিয়েছে?'

হোক পিতলের, তবু অভিনয়ের দলের ওদের তো দরকারি।

কিন্তু—

আলোর দিকে আসতে আসতে ভাবলো রীতা, মা যদি জিজ্ঞেস করে কোথায় পেলি?'

রীতা অবশ্যই বলবে, 'সেই বাথরুমের দরজার কাছে'—কিন্তু মা কি সন্তুষ্ট হবে তাতে? মা কি বিশ্বাস করবে সে কথা? রীতাকে সন্দেহ করাই তো এখন রোগ হয়েছে মার।

মা অতএব জেরা করবে।

জেরা করে করে বিচলিত করে ফেলবে রীতাকে। আর সেই বিচলিত হয়ে যাওয়া রীতা হয়তো বলে ফেলবে সত্যি কোথায় পেয়েছে।

মার ওই জেরাকে বড় ভয় রীতার।

ওই জেরার সময়, কত সময় অকারণ মিছে কথা বলে বসে।

তবে আজ একটা মস্ত ভরসার জিনিস হাতে রয়েছে। মা এই নকল নেকলেসটাকে নিয়েই ব্যস্ত হবে। জিনিসটাকে প্রকৃত মালিকের হাতে পৌঁছে দেবার জন্যে এদিক-ওদিক করবে। রীতা বাঁচবে।

তবে—

খুব সাবধানে কথা বলতে হবে মার সঙ্গে। মা যেন কিছুতেই না টের পায়, রীতা সেই দিকটায় গিয়েছিল, যেদিকটা অন্ধকার।

অথচ ওই অন্ধকারটার দিকে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না রীতার, যেমন—উপায় থাকে না পোকাদের নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও আলোর দিকে যাওয়া ছাড়া।

পাড়ায় বারোয়ারি পুজো উপলক্ষে পুজোর পর এই অভিনয়ের আয়োজন করেছিল ছেলেরা, আর পাড়াসুদ্ধ 'মাসীমা' আর 'দিদি-বৌদি'দের আমন্ত্রণপত্র দিয়েছিল।

কাজে কাজেই রীতার মাও পেয়েছিল।

একটা থিয়েটারে আসার সুযোগ পেয়ে আসবে না, রীতার মা এমন নির্বোধ নয়। বলবে, 'যা হবে তা বুঝতেই পারছি! ছেলেদের কাণ্ড তো! হবে সাপ ব্যাং একটা কিছু।'

তবু আসতে ছাড়বে না।

অগত্যা রীতাকেও আসতে হবে।

মার ওই 'রীতা বাত্তিক' হওয়া থেকেই ওটাও একটা নীতি হয়ে গেছে। রীতার যতই না কেন পড়ার ক্ষতি হোক।

'না না বাড়িতে একা থাকতে হবে না, চল আমার সঙ্গে।' বলে টেনে নিয়ে যাবে মা যত্রতত্র। মামার বাড়িতে কি মাসীদের বাড়িতে, বাজারে কি দোকানে, এবং থিয়েটারে সিনেমায়। অর্থাৎ মা নিজে যে যে জায়গায় না গিয়ে থাকতে পারে না।

অথচ এই কিছুদিন আগেও উল্টো অবস্থাই চলেছে। মার সঙ্গে কোথাও যেতে চাইলে মা ঝঙ্কার দিয়ে বলেছে, 'পড়তে হবে না? যাব বলে নাচলে চলবে?' বলেছে, 'এই বয়সে সিনেমা থিয়েটার দেখার এত নেশা কেন? যেতে হবে না। জানো—আমরা বিয়ের আগে কখনো সিনেমা থিয়েটার দেখিনি!'

মা-দের—মানে রীতার মা এবং মাসীদের, কোন ব'য়সে বিয়ে হয়েছিল, সে প্রশ্ন করবার সাহস অবশ্য হত না রীতার—

মাকে তার ভারী ভয়।

যমের মত!

বাঘের মত!

উদ্যত খাঁড়ার মত!

কেন, তা জানে না রীতা।

শুধু জানে ভয় করতে হয়।

আসন্ন পরীক্ষার মুখেও তাই মায়ের সঙ্গে দোকান ঘুরতে হয় মাসীর নতুন নাতনীর জন্যে বেবি ফ্রক কিনতে।

যদি রীতা পড়ার ক্ষতির কথা তোলে, নস্যাৎ করে দেয় মা সেই ক্ষীণ প্রতিবাদ।

"পড়ার ক্ষতি? নিজে যখন বসে বসে রাজ্যির বাজে গল্পর বই পড়?"

তা' সিনেমা কি থিয়েটার সম্পর্কে অবশ্য আপত্তি তোলে না রীতা। নিজের আগ্রহেই তোলে না। আজও তোলেনি। কারণ বারোয়ারী পুজোর গোলমালে কোনো এক সময় কোনো একজনের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রীতা আসবেই আজ।

আর ওই অন্ধকারের দিকটার উল্লেখটাও ছিল সেই অলিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে। রীতা অতএব টেরই পায়নি নাটকটা ভাল হচ্ছে কি হচ্ছে না। প্রথম থেকেই অন্যমনস্ক হয়ে থেকেছে আর চিন্তা করেছে কোন ছুতোয় একবার উঠে যেতে পারবে।

তা' ছুতো আবিষ্কার করে ফেলেছিল রীতা, গিয়ে পৌঁছেও ছিল, এবং যখন দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দশ মিনিটকে দশ ঘণ্টা মনে করে চলে আসতে যাচ্ছিল, তখন রীতার উপর একটা ঝড় এসে পড়ে বিস্ময়বিমূঢ় করে তুলেছিল রীতাকে।

এটা রীতার হিসেবের মধ্যে ছিল না। ছিল না আশঙ্কার মধ্যে। রীতা শুধু জানতো কয়েকটা কথা শুনতে হবে তাকে।

রীতা বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল।

তবু রীতা ঘাসের উপর পড়ে থাকা ওই চকচকে জিনিসটার দিকে উদাসীন অবহেলায় তাকিয়ে দেখে চলে আসতে পারেনি।

চকচক করলেই সোনা হয় না জেনেও রীতা থমকে দাঁড়িয়েছিল, ভেবেছিল, আর শেষ অবধি খপ করে তুলেও নিয়েছিল জিনিসটা।

চকচকানিটাই যে পৃথিবীর পরমতম আকর্ষণীয়। ছেলেমানুষ রীতা সে আকর্ষণের হাত এড়াবে কি করে? রীতা তারপর সেই কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুটা মুঠোয় চেপে চলে এসেছিল পরে মাকে দেবে বলে।

জেরা আর বকুনির আশঙ্কা সত্ত্বেও।

তা রীতার আশঙ্কাটা অমূলক নয়।

ইত্যবসরে একবার ইণ্টারভ্যালের সময় এসে গিয়েছিল। আর সেই সাময়িক যবনিকা-পাতের অবকাশে রীতার মা আসন ছেড়ে বেরিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল রীতার জন্যে।

আবার ঢোকবার মুখেই মুখোমুখি।

রীতার মা তীব্র চাপা গলায় বলে উঠলো 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

রীতা ঢোক গিলে বলল, 'বলে গেলাম তো?'

'তার জন্যে এত দেরী?' রীতার মা যেন ফেটে পড়ে, 'বাড়ি গিয়েছিলি নাকি?'

রীতার গলা শুকিয়ে আসছিল, তবু রীতা সাহস সংগ্রহ করে বলে ফেললো, 'একটা ব্যাপার হয়েছে—'

'কী ব্যাপার?' মা আরো তীব্র হলো।

রীতা বললো, 'এসো একটু এদিকে—'

বলে একটা আলোর পোস্টের দিকে সরে গেল, তারপর মৃদু গলায় বললো, 'এটা কুড়িয়ে পেলাম।'

রীতা হাতের মুঠোটা খুললো, আর রীতার হাতের জিনিসটা ঝলসে উঠলো তাঁর শোভা-সৌন্দর্য সুষমা আর মূল্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

বলতে কি রীতাও এই প্রথমই দেখলো এত স্পষ্ট করে। এতক্ষণ তো রীতা ঘাম ঘাম হাতে শুধু অনুভবই করছিল। আর ভাবছিল, আচ্ছা কেমিক্যালই তো? না সত্যি সোনার?

তবে মার কাছে কোনো সন্দেহ ব্যক্ত করল না রীতা। শুধু হাতের মুঠোটা খুলে ধরলো মার সামনে।

দেখলো শুধু তার হাতের জিনিসটাই নয়, মার চোখ দুটোও প্রায় তেমনিই চকচক করে উঠলো।

মা রীতার হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে নিল; খপ করে বটুয়ার মুখটা খুলে পুরে ফেললো তার মধ্যে, ফিসফিস করে বললো, 'কোথায় কুড়িয়ে পেলি?'

রীতা আর একবার ঢোক গিললো, 'বললাম তো!'

'দেখিয়েছিস কাউকে?'

'না!' রীতা আস্তে বলে, 'ভাবলাম তুমি এনকোয়ারি অফিসে জমা দিয়ে দেবে—'

মা ব্যস্ত গলায় বলে, 'থাক সে পরে হবে। এখুনি কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। ও একবার প্রচার হলে শুনবি প্যাণ্ডেল ভর্তি মেয়েমানুষের সকলেরই গলার হার হারিয়েছে।'...

রীতা বললো না, এটা বোধহয় সোনার নয়। কারণ রীতার ভয় হলো এ সন্দেহ ব্যক্ত করলেই হয়তো সাজঘরের পিছনের অন্ধকারটার কথা এসে পড়বে।

রীতার মা-ই তাই আবার কথা বললো, 'যার জিনিস হারিয়েছে, সে নিজেই খোঁজ করবে, গোলমাল উঠবে। তোমার কাউকে কিছু বলার দরকার নেই।'

তারপর রীতার মা আবার নিজের আসনে গিয়ে বসলো মেয়েকে সঙ্গে করে। বটুয়ার মুখটা মুঠোয় চেপে কোলের উপর রাখলো. আবার ফিসফিস করে বললো, 'বলতে হবে না কাউকে। তোর বাবাকেও বলবি না, এই নিয়ে একটা হৈচৈ করবে। জানিস তো মানুষকে!'

মেয়েকে জেরা করতে ভুলে গেল রীতার মা, আবার মঞ্চের দিকে চোখ ফেললো।

আবার পর্দা উঠেছে। পাত্র-পাত্রী ভালো ভালো আর জোরালো জোরালো কথা বলছে।

গহনাটার একটা সূক্ষ্ম কোণ্ হাতের তালুতে বিঁধে গিয়েছিল, তালুটা জ্বালা করেছিল সেদিন রীতার। কিন্তু এখন রীতার সারা মনটাতেই যেন তেমনি একটা অনুভূতি। যেন পুরোপুরি গহনাটাই বিঁধে রয়েছে সেখানে।

রীতা এখন বুঝতে পারছে ওটা নকল নয়। নকল হলে মার চোখটা অমন চকচক করে উঠতো না, আর বটুয়ার ভেতর পুরে ফেলে অমন গেপে ফেলতো না মা।

কারুকার্য করা সেই অলঙ্কারটার সমস্ত খোঁচাগুলো তাই এখন রীতার মনের মধ্যে বিঁধছে। কারণ রীতার সেই ঘাম ঘাম হাতের অনুভূতিটা যে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

রীতা যদি না কুড়োতো!

রীতা যদি চলে আসতো সেই অন্ধকার দিকটা থেকে!

প্যাণ্ডেল থেকে বেরোবার মুখে একবার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিল মাকে, 'জমা দেবে না এনকোয়ারি অফিসে?'

মা প্রায় ধমকে উঠেছিল, 'না! এখন এই গোলমালের মধ্যে দিলে কোথায় লোপাট হয়ে যাবে তার ঠিক আছে? সব ছেলেই তো চেনা, পরে জিজ্ঞেস করবো নেকলেস হারানোর কথা উঠেছে কিনা।'

কিন্তু সব চেনা ছেলেই তো অভিনয়ের পর এলো—একে একে, দুইয়ে দুইয়ে। মাসীমা আর দিদি-বৌদিদের অভিমত সংগ্রহ করে ধন্য হতে অভিযান চালালো কিনা।

কই রীতার মা তো তুললো না সে কথা?

রীতা ভেবেছিল মা ভুলে গেছে, তাই রীতা মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু মা চোখের ইসারায় থামিয়ে দিয়েছে।

তারপর ওরা চলে যাবার পর মা বিরক্ত গলায় বলেছে, 'সব সময় সর্দারী করতে আসো কেন? আমি কি খেয়ে ফেলছি ওটা? হবে, যখন বুঝবো বলবো।'

রীতা মাকে ভয় করে।

যমের মত, বাঘের মত, উদ্যত খাঁড়ার মত! তাই রীতা চুপ করে যায়।

কিন্তু রীতার বুক ফেটে যায় বাবাকে পর্যন্ত বলতে না পেরে। রীতার উপর দিয়ে একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেছে, তাই রীতা যেন গুটিয়ে গেছে, বাবার কাছে মুখ তুলতে পারছে না।

ক্রমশঃ যেন ধূসর হয়ে যাচ্ছে সেই চকচকে বস্তুটা। মার বটুয়ায় ঢুকে পড়ার পর সেটাকে আর কোনোদিন কি দেখেছে রীতা?

তাই ধূসর হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ হঠাৎ মনে হচ্ছে, সত্যিই কি আমি কুড়িয়েছিলাম কিছু?

রীতার উপর দিয়ে যে সেদিন ঝোড়ো হাওয়াটা বয়ে গেল, তার স্মৃতিটাও বুঝি ধূসর হয়ে যাচ্ছে ওই সোনাটার চাপে।

সোনা!

যার মধ্যে নিহিত পৃথিবীর সমস্ত পাপের মূল! রীতার অপরাধবোধটাই মুছে মুছে নিচ্ছে সে।

আর শুধু অপরাধ বোধটাই মুছে নিচ্ছে না, বুঝি সাহসেরও জন্ম দিচ্ছে।

নইলে রীতা কেন এখন মাঝে মাঝেই দেখছে, মাকে আর ভয় না করলেও চলে। দেখছে, এতদিন শুধু অকারণ বোকামি করে এসেছে।

এখন মার প্রশ্নের সেই অত্যুগ্র তীব্রতাকে উপেক্ষা করে যেন বলা যাচ্ছে, 'ছাতে গিয়েছি তো কী হয়েছে? ...নীচে আবার করবো কি, নীচে থাকতে ইচ্ছে হয়েছিল।...জানলায় দাঁড়িয়ে কথা কইবো কার সঙ্গে? স্বপ্ন দেখছো না কি?

মা হঠাৎ মিইয়ে যাচ্ছে, বলছে, 'খুব মুখ হয়েছে বাবা আজকাল তোর!'

মার গলায় কি কোনো অসুখ করেছে? তাই গলার জোরটা এত কমে গেল কেন?

রীতার মাসীর ভাসুরঝির বিয়েতে নেমন্তন্ন খাবার সময় যখন রীতা বললো, 'আমি যাব না, আমার ওই হট্টগোলের মধ্যে যাবার ইচ্ছে নেই—', তখন রীতার মা চেঁচিয়ে বলে উঠলো না, 'যাবি না তো কি একলা থাকবি না কি ?'

মা বললো, 'না গেলে ওরা পাঁচবার জিজ্ঞেস করবে। স্বপ্না, শোভা, কুলু, মন্টি, ওরা সবাই আসবে—'

'আসুক !'

'তোর বাবা তো আবার আমাকে আনতে যাবে—'

'যান না, আমায় কি ভূতে খেয়ে ফেলবে ?'

'জানি না বাবা !'

বলে মা চলে যায়।

আর মা যখন গাড়ীতে ওঠে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা রীতা এতদিন পরে হঠাৎ সেই নেকলেসটাকে দেখতে পায়। বটুয়া থেকে বেরিয়ে মার কণ্ঠলগ্ন হয়েছে সে।

কণ্ঠলগ্ন !

ওই শব্দটাই মনে এল রীতার।

রীতার বাবা ক্লাব থেকে ফিরে মাকে আনতে যাবে। এখন অনেকক্ষণের মত রীতা স্বাধীন মুক্ত ! রীতা এখন ছাতে উঠতে পারে, জানলায় দাঁড়াতে পারে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান গাইতে পারে, পাড়ার ছেলেদের ডেকে গল্প করতে পারে !

কিন্তু রীতা কি সেই অনেকক্ষণের স্বাধীনতাটুকু পেল ?

কই আর ?

রীতার মা কার যেন গাড়ীর সুবিধে পেয়ে বাবা নিতে যাবার আগেই সাত তাড়াতাড়ি চলে এল।

রীতার মা চাকরকে ছুটি দিয়ে গিয়েছিল, তাই দরজার কড়া নাড়তে রীতাকেই দোর খুলে দিতে হল।

আর মা এত তাড়াতাড়ি দোর খোলাতে পেরে যেন থমকে গিয়ে বললো, 'নীচে ছিলি নাকি ?'

রীতা বললো 'হু' !'

মা বসবার ঘরটার দিকে উঁকি দিল, বললো, 'ঘরে আলো জ্বলছে যে ?'

রীতা অগ্রাহ্যের গলায় বললো, 'মানুষ থাকলেই আলো জ্বলে।'

মা ভুরু কোঁচকাল, 'কেউ এসেছে বুঝি ?'

রীতা গম্ভীর গলায় বললো 'হ্যাঁ।'

মা বেজার গলায় বললো, 'কে আবার এল এখন ?'

রীতা মার সেই বেজার মুখের দিকে তাকালো, রীতা মার আঁচল ঢাকা দেওয়া গলার দিকে তাকালো, তারপর স্পষ্ট পরিষ্কার গলায় বললো, 'নীপুদা।'

নীপুদা!

মানে রীতার মার সবচেয়ে বিরক্তির পাত্র।

মা ক্রুদ্ধ গলায় বললো, 'ও আবার কি করছে এখন?'

রীতা আরো স্থির গলায় বললো 'চা খাচ্ছে।'

'চা খাচ্ছে!'

রীতার মা যে ভঙ্গীটা প্রায় হারাতে বসেছিল, সেই পুরনো তীব্র ভঙ্গীতে বলে উঠলো 'এই একলা বাড়ীতে নীপুকে ডেকে চা খাওয়াচ্ছো তুমি?'

রীতা আর এ ভঙ্গীতে ভয় খেল না, রীতা মার দিকে খোলা চোখে তাকালো। রীতার মার সাড়ে পনেরো বছরের মেয়ে সেই খোলা চোখে তাকিয়ে উদ্ধত গলায় বললো, 'কেন, কী হয়েছে তাতে? মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে?'

রীতা বুঝে ফেলেছে মাকে আর ভয় না করলেও চলবে।

রীতা জানে রীতার এই ঔদ্ধত্যের কাহিনী বাবাকে বলে দিতে পারবে না মা। ভয়ের বাসাটা জায়গা বদল করেছে। শাসন করবার ক্ষমতা হারিয়েছে মা।

কে জানে আজকের এই দুঃশাসন যুগের রহস্যও ওই একই কিনা।

পুঁজি

'বাড়িটা তো আমারই বাবার, আমার বুঝি তার একটা ঘরে একটু অধিকার নেই ?'

ন' বছরের মেয়েটা তার ক'টা চুল উড়িয়ে, ফ্রিল ফ্রক দুলিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে আড়চোখে আগুন জেলে এই চরমতম কূট প্রশ্নটি করে বসে, মার ক্রুদ্ধ মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে।

সোমা স্থির হয়ে যায়।

সোমা পাথর হয়ে যায়।

সোমার কথা বলতে দেরী হয়।

ন' বছরের মিণ্টুর মুখ দিয়েই সত্যি এই কথাটা বেরোলো, এটা বুঝতে তার সময় লাগে।

তারপর সোমা রূঢ় কর্কশ গলায় বলে, 'কী বললি ?'

মিণ্টু এমন কিছু নম্র শান্ত ধীর মেয়ে নয়, মিণ্টু অবাধ্য, মিণ্টু উদ্ধত। মিণ্টুর বেড়াতে যাওয়ার সময় জামা পছন্দ না হ'লে ওই ভাবেই ঘাড় বাঁকিয়ে তেড়ে ওঠে, 'আমার ইচ্ছে মতন একটাও জামা তুমি পরতে দেবে না আমায় ?'

কিন্তু সে আলাদা।

চোখে এমন আগুন জ্বলে না তখন, আর সোমা যখন কড়া গলায় বলে, 'না, দেবো না। এক্ষুনি থেকে নিজের ইচ্ছেয় চলতে তোমায় দেবো না আমি। আমার যা ইচ্ছে পরাব—'

তখন জলভরা চোখে, লাল লাল মুখে পরেও নেয় মায়ের নির্দেশিতটি।

তারপর অবশ্য নালিশ চলে আড়ালে অন্তরালে।

সুপ্রিয় হতাশ গলায় স্ত্রীকে বলে, 'আচ্ছা, তুচ্ছ জিনিস নিয়েই বা এতো লাঠালাঠি করো কেন তুমি ? যেটা ইচ্ছে হয়েছে পরুক না। ক্ষতি কি ?'

'ক্ষতিটা যে কি, তোমায় বোঝাতে পারবো না—' সোমা স্বামীর সঙ্গেও রূঢ় গলায় কথা বলে, 'ভবিষ্যৎটা ভাবতে হবে আমাকেই। এখন থেকে এতো স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলে শেষকালে কোথায় পৌঁছবে তোমার ধারণা আছে ?'

সুপ্রিয় প্রসঙ্গটা হালকা করতে চায়। বলে, 'সে তোমার জামাই ব্যাটা বুঝবে।'

মনে মনে বলে 'যেমন আমি বুঝছি।'

কিন্তু সোমা মেয়ের শিক্ষা-দীক্ষায় ও-রকম শিথিলতা পছন্দ করে না। নিজে সোমা বিয়ের আগে পর্যন্ত মায়ের নির্দেশে সেজেছে।

তা' সে যা হয় হোক, আজ মিণ্টু এ কী বলে বসলো।

বাড়িটা আমার বাবার।

আমার তাতে অধিকার আছে। কে শেখাচ্ছে এ-সব মিণ্টুকে?

সোমার ভয়ানক যেন সন্দেহ হয়, আদিখ্যেতায় গড়িয়ে পড়া বাপই সোহাগী মেয়েকে এ কথা বলেছে আহ্লাদ করে।

আশ্চর্য, কথায় যে একটা ওজন থাকা দরকার, তা' যেন জানেই না সুপ্রিয়।

এখন বিষবৃক্ষে ফুল ধরলো।

সোমা কোমরে আঁচল জড়িয়ে মাংস রাঁধছিল, সোমা তাই নিজে হাত দিতে পারে নি। আর তা না হলেই বা কি, সময় থাকলেই কি সোমা ছুঁতো ওটা?

সোমা হাতের চামচখানা দরজার দিকে বাড়িয়ে ধরে স্থির ধাতব গলায় বলেছিল, 'যাও ফেলে দিয়ে এসো। এক মিনিটও দেরী না।'

বান্ধবীর কাছ থেকে ফরমূলা এনে একটি বিশেষ ধরনের মাংস রান্না করছিল সোমা, হঠাৎ বিরক্তিকর একটা আওয়াজ কানে আঘাত করলো—মিউ মিউ মিউ! ক্ষীণ কুৎসিত অরুচিকর।

আগে ভেবেছিল বাড়ির বাইরে কোথাও, কিন্তু ক্রমশ:ই যেন কানের মধ্যে দিয়ে হাড়ে মজ্জায় ঢুকতে শুরু করলো। ছেদ ভেদহীন ওই 'মিউ মিউ মিউ' ধ্বনি মাথা খারাপ করে দিল সোমার।

সোমা চাকরকে ডেকে বললো, 'ঘনশ্যাম ত্থাখ্ তো, কোথায় একটা বেড়াল ছানা বিশ্রীভাবে ডাকছে।'

ঘনশ্যাম তখনই হাফ কিলোটাক পিঁয়াজ বেটে উঠেছে, চোখে এবং মনে দু' জায়গাতেই দাহ, তাই ঘনশ্যাম কিছুমাত্র উদারতা না করে গুপ্তচরের কাজ করে বসলো। বললো, 'ঘরেই ডাকছে। দিদিমণি নর্দমা থেকে তুলে এনেছে।'

শহরতলীর নতুন রাস্তা।

বুদ্ধিমানেরা সময়কালে জলের দরে জমি কিনে রেখে, এখন প্রাসাদোপম বাড়ি বানিয়ে বসেছেন, কিন্তু বাড়ির সামনে এখনো সেই আদি ও অকৃত্রিম কাঁচা নর্দমার ভাগীরথী ধারা।

সেই নর্দমার আশ-পাশ থেকেই নিতান্ত শিশু মার্জারশাবকটিকে মিণ্টু তুলে এনেছে তার মৃতকল্প অবস্থা দেখে।

ঘনশ্যাম তার সাক্ষী।

কিন্তু এতক্ষণ ঘনশ্যাম বলতে সাহস করে নি দিদিমণির কোপে পড়বার ভয়ে। সুযোগ পেয়ে বলে নিল।

শুনে সোমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠলো।

'দিদিমণি নর্দমা থেকে তুলে এনেছে? আর তুই কিছু বলিস নি?'

'বললে শুনবে যে—'

'তা তুই আমায় বলে দিসনি কেন?'

ঘনশ্যাম সুযোগ ছাড়ছে না।

ঘনশ্যাম ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'হ্যাঁ, বলে আমি ফাঁসি খাই আর কি!'

'চমৎকার! তোমার ফাঁসি খাওয়াটাই বড় হলো!'

বলে সোমা আদা-হলুদ দই পেঁয়াজ-বাটা মাখা হাতটা ধুয়ে, মাংসটা একবার নেড়ে দিয়ে চামচটা হাতে করেই ড্রইং-রুমে চলে এলো।

দেখলো মিণ্টু এক টুকরো বিস্কিট নিয়ে নিরুপায় ভঙ্গীতে বসে আছে, তার কোলের কাছে একটা কাদামাখা ক্লেদাক্ত ঘেয়ো বেড়ালছানা।

দেখে মাথা থেকে পা অবধি জ্বলে গেল সোমার।

বললো, 'কী ওটা?'

মিণ্টু সভয়ে মার দিকে তাকিয়ে আশ্রিতকে আর একটু আগলে বসলো।

'ওটাকে এক্ষুনি ফেলে দিয়ে এসে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে জামা বদলে ফেলো।'

কড়া গলায় আদেশ দিল সোমা।

হাতের চামচখানাকে বাড়িয়ে ধরে দরজাটা দেখিয়ে দিয়ে আদেশটাকে আরো প্রাঞ্জল করলো।

মিণ্টু কিন্তু মার এই আদেশের মূল্য রাখলো না। সেই অনর্থের গোড়াটাকে বুকে চেপে ধরে জেদের গলায় বললো, 'না'।

না!

'না বললি আমার মুখের ওপর?'

সোমা মেয়ের এই অবিশ্বাস্য স্পর্ধায় আগুন হয়ে উঠলো।

ওই নোংরা কুৎসিত ঘেয়ো প্রাণীটাকে মেয়ের বুকের ওপর দেখে দিশেহারা হলো। তীব্র গলায় ডাকলো, 'ঘনশ্যাম! ফিনাইলের বোতলটা নিয়ে এসো—'

ঘনশ্যাম কাছাকাছি ছিল।

আজ্ঞা পালন করতে বিলম্ব হল না।

সোমা বললো, 'ওই বেড়ালবাচ্চাটাকে নিয়ে দূর করে ফেলে দিয়ে এসো, আর কার্পেটের ওপর ফিনাইল ছিটিয়ে দাও।'

ঘনশ্যাম এগিয়ে গেল।

মুখের রেখায় রেখায় তার গোপন আনন্দ।

দিদিমণি তার প্রতিপক্ষ।

মিণ্টুর অনেক উৎপাত, অনেক কীল-চড় নিঃশব্দে হজম করতে হয় তাকে।

সেদিকে আবার সোমা অন্য নিয়মে চলে। চাকর এসে মনিবের মেয়ের নামে লাগাবে, এ তার অসহ্য। বলতে এলে—ওকেই ধমক দেবে, 'লজ্জা করে না তোমার বুড়োধাড়ি? ওই বাচ্চাটার নামে লাগাতে এসেছো?'

এখন এই সুবর্ণ সুযোগে ঘনশ্যাম পুষে রাখা আক্রোশ চরিতার্থ করতে মিণ্টুর দিকে হাত বাড়ালো।

মিণ্টু বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠলো, 'খবরদার এর গায়ে হাত দিবি না। মেরে শেষ করে দেব।'

'কী! আমার কথার ওপর কথা।' সোমা সেই তেল-ঝোল মাখা চামচটা দিয়েই মেয়ের মাথায় একটা ঠোকা দিয়ে বলে, 'ভেবেছো কি তুমি? সাপের পা দেখেছ? ওই রাস্তার বেড়ালছানাটাকে কুড়িয়ে এনে বুকে তুলতে ঘেন্না করছে না? বমি আসছে না? হাইজিন পড়নি তুমি? বেড়াল থেকে কত রকম রোগ ছড়ায় জানো না? ছেড়ে দাও, ঘনশ্যাম ফেলে দিয়ে আসুক।'

মিণ্টু মার এই উগ্রমূর্তিতেও ভয় করলো না। মিণ্টু বরং আশ্রিতকে আরো অভয় দিতে বুকে আরো নিবিড় করে বলে উঠলো, 'কেন ফেলে দিয়ে আসবো? ফেলে দিয়ে এলে মরে যাবে না বুঝি? আমি ওকে বাঁচাবো।'

ঘণ্টা দুয়েক ধরে মার দৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে, মিণ্টু ওটাকে বাঁচাবার সাধনাই চালাচ্ছিল, কিন্তু হতভাগাটা নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলো। তার স্বরে আর্তনাদ জুড়ে দিল।

সত্যি, কেনই যে এতবড় বোকামী করে বসলো বাচ্চাটা।

মিণ্টু কি ওকে চুপি চুপি এ বাড়ির গিন্নী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে নি?

বলে নি কি, 'দেখো বাপু, এ বাড়ির গিন্নীটি বেদম রাগী, যদি টের পায় তোমাকে আমি রাস্তার নর্দমা থেকে তুলে এনে সোফার নীচে লুকিয়ে রেখেছি, রক্ষে রাখবে না। চুপচাপ থাকবে তুমি। এখন তোমার শরীর খারাপ, সেরে ওঠো, তখন সাবান মাখিয়ে চান করিয়ে দেব।'

বাচ্চাটা তখন ঘাড় গুঁজে চুপ করেই পড়ে ছিল। মিণ্টু তাকে বিস্কিট খাওয়াবার ব্যর্থ চেষ্টায় হতাশ হচ্ছিল। কিন্তু সহসা যে কি হলো ডাকতে শুরু করলো সে। মিউ মিউ মিউ। অবিরাম একটানা ক্ষীণ কাতর করুণ আর্তনাদ।

যেন সমস্ত বিশ্ব বিধানের অনিয়মের প্রতিবাদে অক্ষমের ক্ষীণ প্রশ্ন। যে প্রশ্নটাকে ভাষা দিলে হয়তো এই দাঁড়ায়, 'আমার মা কোথায়? আমার মাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? যে মা আমাকে ক্ষিধের সময় খেতে দিতো নরম বুকের আড়ালে গরম রাখতো। কে আমায় দূরে সরিয়ে দিল সেই মার কাছ থেকে?'

হয়তো সোমার মতই কেউ বিরক্তিকর আপদটাকে দূর করে টেনে ফেলে দিয়েছিল নর্দমায়।

ওই 'মিউ মিউ'টা যে একটা ভাষা, আর সে ভাষার যে একটা রূপ হওয়া সম্ভব, তা' খেয়াল করে নি।

প্রথমটা একেবারেই মৃতকল্প হয়ে গিয়েছিল, মিণ্টু তুলে এনে ঘরে তোলার পর ডাকবার শক্তি ফিরে এল তার এবং মিণ্টুর ওই বাঁচানোর সাধনাটাই তাকে আরো ভীত করে তুললো। অতএব বিধাতা প্রদত্ত ওই যে একটি মাত্র অস্ত্র তারই সদ্ব্যবহার শুরু করে দিল।

মিউ মিউ মিউ।

মৃতকল্প বিড়ালছানার ওই মিউ মিউ ধ্বনি যে কী অসহনীয় বিরক্তিকর, সেটা আর কে না জানে, কাজেই সোমাকে দোষ দেওয়া যায় না। তাছাড়া মিণ্টুর কোলে ওকে দেখে সোমার সর্বশরীর ঝিম-ঝিম করে আসছিল।

তাব ওপর মিণ্টুর ওই জেদ।

সোমা আগুন ঝরা চোখে বললো, 'তুই ওকে বাঁচাবি? আর তোকে কে বাঁচাবে শুনি? যম?...আমি বলে দিচ্ছি আমার বাড়িতে ওই নোংরা কুৎসিত রোগের ডিপোটাকে রাখা চলবে না। ফেলো ফেলো—'

মাংসের তলা ধরা গন্ধে ছুটে চলে যাচ্ছিল সোমা। কিন্তু যাওয়া হল না।

ন' বছরের মেয়েটা তার কাটা চুল উড়িয়ে, ফ্রিল ফ্রক দুলিয়ে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে, আর চোখে আগুন জ্বেলে পৃথিবীর সেই চরমতম কূট প্রশ্নটি করে বসলো।

অধিকারের প্রশ্ন।

'বাড়িটা তো আমারই বাবার, আমার বুঝি তার একটা ঘরে একটু অধিকার নেই?'

সোমার কথাটা বুঝতে একটু সময় লাগলো।

সোমার উত্তর দিতে সময় লাগলো।

তারপর সোমা রূঢ় কর্কশ গলায় বলে উঠলো 'কী বললি?'

মিণ্টু অবশ্য আর কিছু বললো না।

মিণ্টু তবু দাঁড়িয়ে রইল সেই বুনো ঘোড়ার মত।

ওদিকে নতুন ফরমুলার মাংস ততক্ষণে পাড়াসুদ্ধ সকলকে জানান দিচ্ছে, তার প্রতি অবহেলা করা হচ্ছে, তাকে দেখা হচ্ছে না।

ছুটির সকালে সুপ্রিয় আড্ডায় বেরিয়েছিল।

যখন ফিরলো তখনও বেড়ালছানাটা সেই একটানা সুর চালিয়ে যাচ্ছে।

ও বাড়ি ঢুকতেই সোমা লাল টকটকে মুখে বেরিয়ে এল।

এ লালের কারণ শুধু মেয়ের অপরিসীম ঔদ্ধত্যই নয়, মাংসও।

অনেক যত্নে, অনেক আহ্লাদে বাঁধতে বসেছিল, পুড়ে অখাদ্য হয়ে গেল। ছুটির সকালটা কী দিয়ে খেতে দেবে সুপ্রিয়কে!

মিণ্টুর কথা ভাবতে পারছে না, মিণ্টুর নাম মুখে আনতে পারছে না। সোমার মনে হচ্ছে—তার মনের জগতে 'মিণ্টু' নামের যে ভূখণ্ডটুকু ছিল, সেটা যেন সহস্র সাপে ভরে গেছে। কিলবিল করছে সেই সাপগুলো।

মিণ্টু নষ্ট হয়ে গেছে।

মিণ্টুর আর আদায় নেই।

কিন্তু সুপ্রিয় এ কী বললো?

সোমা বুঝি দুঃস্বপ্নেও এতোটা আশঙ্কা করে নি।

সুপ্রিয় হা হা করে হেসে উঠে বললো, 'বলেছে এই কথা মিণ্টু? বড় হয়ে ও নির্ঘাৎ ল'ইয়ার হবে।'

হ্যাঁ, এই রকম অবিশ্বাস্য বিস্ময়কর কথাটাই বললো সুপ্রিয়। যখন শুনলো মিণ্টু বলেছে, 'বাড়িটা তো আমারই বাবার। সে বাড়িতে আমার একটু অধিকার নেই?'

'হাসছো তুমি?'

রগটা টিপে ধরে বসে পড়ে সোমা।

'তা হাসির কথায় হাসবো না?'

'এটা তা'হলে তোমার কাছে হাসির কথা হলো? ন' বছরের মেয়ে এক্ষুনি তার বাপের বিষয়সম্পত্তি নিয়ে মায়ের সঙ্গে লড়তে এলো, এটা হাস্যকর?'

'মেয়েটা ন' বছরের বলেই হাস্যকর।' সুপ্রিয় বলে, 'ছত্রিশ বছরের হ'লে ভীতিকর হতো।'

'তুমি যদি ওই বেড়ালবাচ্চাকে দূর না করো তো আমি আর এ বাড়িতে জলগ্রহণ করছি না।'

বেলা বারোটা।

ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর।

সুপ্রিয় ওই রোদটা ভেঙ্গে এসেছে, এখনো স্নানাহার হয় নি, সুপ্রিয়রও মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। সুপ্রিয় দুঃসাহসে ভর করে বলে ফেলে, 'চমৎকার। চিরটাদিন তিলকে তাল করে করেই গেলে। মেয়েটা তোমার নিজের না সতীনের?'

সোমা রক্তবর্ণ চোখ মেলে বলে, 'সতীনের থেকেও বেশী! মেয়েটা তোমার! তোমার একার। তাই তুমি তাকে বুঝতে দিয়েছ চিরটাকাল! তাই শিখিয়ে এসেছো। তাই আজ তোমার মেয়ে আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে শিখেছে। আমাকে তার বাপের বিষয়ের ভাগ দেখাতে এসেছে। বেশ তোমরা বাপ মেয়ে থেকো সুখে, আমি আর কিচ্ছুটি বলবো না। তবে এও বলে দিচ্ছি, ওই মেয়ে বেড়ালছানা বুকে ক'রে—তোমার মেয়ের যদি ডিপথিরিয়া হয়, যদি মরে, আমি তাকিয়েও দেখবো না।'

সুপ্রিয় এবার গম্ভীর হয়।

সুপ্রিয়র মুখও লাল হয়ে ওঠে।

সুপ্রিয় সেই মিউ মিউ ধ্বনি অনুসরণ ক'রে ড্রইংরুমে এসে দেখে মিণ্টু নিজের একটা জামা পেতে একটা ঘেয়ো বেড়ালবাচ্চাকে শুইয়ে তার একান্ত প্রতিবাদ সত্ত্বেও একখানা বিস্কিট খাওয়াবার চেষ্টা করছে।

মিণ্টুর হাতে একমাত্র এই আহার্যটুকুই আছে। প্রথমেই এনে ঘনশ্যামকে বলেছিল, 'এই একটু দুধ এনে একে খাইয়ে দে তো—'

কিন্তু ঘনশ্যাম তাচ্ছিল্যের গলায় বলেছিল, 'আমার দ্বারা হবে না। ওটার গায়ে হাত দিলে আমার ব্যামো হবে।'

'ঠিক আছে, যা।' ক্রুদ্ধ মিণ্টু বলেছিল, 'আমি বিস্কিট খাওয়াচ্ছি—'

তদবধি এই দীর্ঘ সময় ধরে ওই একখানা বিস্কিট নিয়ে আপ্রাণ সাধনা চলছে তার।

'একটু খা না রে! দেখবি খুব ভালো লাগবে। কখনো তো খাসনি, জানিস না কেমন খেতে। একটুখানি খা রে! আচ্ছা তুই এতো বোকা কেন রে? না খেলে মানুষ মরে যায় তাও জানিস না? এই দেখ্না আমি কম খাই বলেই তাই এত রোগা। তবু তো আমার মা আছে। জোর করে করে খাওয়ায়। আর ভেবে দেখ্, তোর মাও নেই। কে তোকে খাওয়াবে? একটুকরো খেলেই এক্ষুনি তোর গায়ে জোর আসবে, তখন বুঝবি।'

যে মেয়ে মার সঙ্গে বাবার বাড়ির অধিকার তুলে ঝগড়া করতে পারে, সেই মেয়েই যে এ হেন ছেলেমানুষি করতে পারে, এটা অবিশ্বাস্য, তবু সেই অবিশ্বাস্য কাণ্ডটাই ঘটছে।

আর এটাই হয়তো সত্যকার মিণ্টু।

চোখে আগুন ঝরানো মিণ্টুটা শুধু তার মার কার্বন কপি।

শিশুর মত এমন অনুকরণপ্রিয় আর কে আছে?

সুপ্রিয় ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালো।

সুপ্রিয় তার মেয়ের মৃদু অনুনয় শুনতে পেলো, 'একটুখানি খা না রে বাবা, এতক্ষণ সাধছি। না খেলে বাঁচবি না, সে জ্ঞানও নেই তোর?'

সুপ্রিয় হয়তো মেয়েকে তিরস্কারই করতে এসেছিল। সুপ্রিয় হয়তো বেড়ালছানাটাকে দূর করবে বলেই স্থির করেছিল, কিন্তু সুপ্রিয় ওই করুণ অনুনয়ের ভঙ্গীতে কেমন বিচলিত হয়ে গেল।

বললো, 'তুই কি বোকা রে মিণ্টু, বেড়ালবাচ্চা কখনো বিস্কিট খায়?'

মিণ্টু বাবার গলা পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেলো। বলে উঠলো, 'বাবা, তুমি এসেছ? এত দেরী করলে কেন? আমি তখন থেকে শুধু তোমার কথাই ভাবছি। দেখো না বাবা, এ কিচ্ছু খাবে না—মরে যাবে না?'

'আমি তখন থেকে শুধু তোমার কথাই ভাবছি।'

তার মানে সেখানে বিশ্বাস, সেখানে আশা।

সুপ্রিয় কি তার স্ত্রীর মনোরঞ্জন করতে এই সরল বিশ্বাসের মাথায় হাতুড়ীর ঘা বসাবে?

তা পারলো না সুপ্রিয়।

সুপ্রিয় বললো, 'ওকে একটু দুধ খাওয়ানো দরকার।'

দুধ প্রসঙ্গে হঠাৎ কেঁদে ফেলে মিণ্টু! 'আমি বুঝি জানি না তা? ঘনশ্যামকে তো বলেওছিলাম, কিন্তু ঘনশ্যাম পাজীটা দিলো না। আর মা-তো—' হাতের একটা অসহায় ভঙ্গী করলো মিণ্টু।

এবার সুপ্রিয় আস্তে বলে, 'তোমার মা-তো ঠিকই বলেছেন মিণ্টু। ওই বাচ্চাটা কতো নোংরা, কত কাদা মাখা, ওকে একটু চান পর্যন্ত করানো হয়নি, অথচ তুমি ওকে কোলে করছো, এতে তোমার অসুখ করতে পারে তো?'

'বুঝি তো বাবা সবই'—মিণ্টু গিন্নীর গলায় বলে, 'বেড়াল থেকেই ডিপথিরিয়া ইত্যাদি অসুখ হতে পারে, কিন্তু ওর মরে যাওয়ার থেকে আমার একটু অসুখের ভয়ই বড় হলো?'

সুপ্রিয় মাথা নীচু করলো।

সুপ্রিয় এই পরম সরলতার সামনে পৃথিবীর চরম সত্য কথাটা বলতে পারলো না।'

বলতে পারলো না, একজনের কেশাগ্রভাগের নিরাপত্তার জন্যে অসংখ্য মৃত্যু, কিছুই নয়।

একজনের কণিকামাত্র স্বার্থের বদলে বহুর অসংখ্য স্বার্থ নিষ্পিষ্ট হওয়াই এই পৃথিবীর নিয়ম।

সুপ্রিয় শুধু বললো, 'তা' একটু চান করিয়ে নিলে ভাল হতো।'

'বাঃ, অসুখের ওপর চান করবে কি করে বাবা? আমরা জ্বর হলে চান করি? সেরে গেলে সাবান দিয়ে চান করিয়ে ফর্সা করিয়ে ফিতে-টিতে বেঁধে কি সুন্দর করে দেব দেখো।'

সুপ্রিয় বাইরে বেরিয়ে এসে ঘনশ্যামকে বললো, 'এই—ওই বেড়ালটাকে একটু দুধ দে দিকি।'

সোমা অবশ্য আশা করে নি যে, সুপ্রিয় খুব একটা শাসন করবে মেয়েকে। কিন্তু এতোটাও বুঝি আশা করে নি।

চাকরকে ডেকে হুকুম, "ওকে একটু দুধ খাওয়া।'

সোমাকে এতো অপমান!

ভেবেছে কি ও?

টাকা রোজগার করে বলে মাথায় পা দিয়ে হাঁটবে?

সোমার মুখটা ক্রমশঃ কঠোর হতে থাকলো, আরো কঠোর···আরো কঠোর।

মিণ্টু বলেছিল, 'দেখো বাবা, পরে ফর্সা করে ফিতে-টিতে বেঁধে কী সুন্দর করে দেব ওকে।'

কিন্তু সে দৃশ্য আর দেখানো হল না মিণ্টুর ভাগ্যে।

ধুক ধুক করা প্রাণটুকু বিন্দু কয়েক দুধ খাওয়ার খানিক পরেই স্থির হয়ে গেল।

ঘনশ্যাম একটা প্লেটে করে দুধ এনেছে দেখে হৃষ্টচিত্তে স্নান করতে গিয়েছিল মিণ্ট।

বাবা বললো, 'খেয়ে নিয়ে তবে ওর গায়ে হাত দিও মিণ্টু।'

মিণ্টু বাবর এ আদেশ পালন করেছিল। তাছাড়া খিদেও পেয়ে গিয়েছিল দারুণ। কখন থেকে খাটছে।

পোড়া মাংস দিয়ে যা ভাত খেল মিণ্টু, ষোড়শোপচার দিয়েও কোনোদিন ততো খায় না।

কিন্তু তার পরেই কি হলো মিণ্টুর?

কেন অমন পাগলের মত চীৎকার করে উঠলো, 'ও বাবা, তুমি কেন আমায় খেতে বললে—ও বাবা বাবাগো—'

পোড়া মাংস খেয়ে কি মিণ্টুর পেটব্যাথা করে উঠলো? না কি বেশী খেয়ে?

ছুটে এলো সুপ্রিয়।

ছুটে এলো সোমাও।

ঘনশ্যামও।

বাড়ির চারটি প্রাণী একই সঙ্গে একই দৃশ্য দেখতে পেল।

সেই মৃতকল্প 'প্রাণীটা মরে শেষ হয়ে পড়ে আছে, বীভৎস একটা ভঙ্গীতে। গালটা কাৎ হয়ে গেছে, মুখ দিয়ে খানিকটা ক্লেদাক্ত জল গড়াচ্ছে!

এখন আর মিণ্টুর ওর দিকে তাকাবারও সাহস হচ্ছে না। 'মিউ মিউ' ধ্বনিটা থেমে যাওয়ায় ও ভাবছিল দুধ খেয়ে পেট ভরেছে বলে আর কাঁদছে না। থেমে যাওয়ার মানে তা'হলে এই।

সুপ্রিয় মেয়ের সেই সিটিয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকালো, তারপর তাকালো সোমার কাঠ কাঠ মুখের দিকে। একটু নিষ্ঠুর হাসি হেসে বললো, 'তোমাদের মেয়েদের ভাঁড়ারে বুঝি তেল মশলার মতো বিষের স্টকও সর্বদা মজুত থাকে? যাতে দরকার হলেই হাতের কাছে পাওয়া যায়।'

সোমার কাঠ মুখটা হঠাৎ শিথিল হয়ে যায়, ফ্যাকাসে হয়ে যায় সোমা, ঝাপ্‌সা গলায় বলে, 'কী বলছো?'

'নাঃ, বলছি না কিছু। শুধু দেখছি, সারা জীবনের মতো নিশ্চিন্ততাটা ঘুচে গেল।'

স্নেহ

সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ নেমে গিয়েছিল। পিছনের ওই দাঁতে চাপা প্রশ্নটা শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। অস্পষ্ট একটু হাসির আভাস ফুটে উঠলো বাঁকা গড়নের ঠোঁটের রেখায়। নেমে যাবার ভঙ্গীটা ত্যাগ না করে সেই আধখানা ফেরানো ঘাড়েই দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, 'আমায় কিছু বলছেন?'

এই ভঙ্গীটা আরো অসহ্য।

তীব্র প্রতিবাদের চাইতেও অপমানকর।

জগন্ময় ক্রুদ্ধ গলায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'তোমাকে না তো কি দেয়ালকে? বলি এতো রাত্তিরে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

ইলা সেই একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থেকে বলে, 'প্রতিদিন একই প্রশ্ন করতে আপনার ভাল লাগে বাবা?'

জগন্ময় ঘর থেকে তেড়ে বেরিয়ে আসেন। চেঁচিয়ে বলেন 'থামো, অসভ্য, উদ্ধত দুর্বিনীত মেয়ে! বাপকে রাস্তার কুকুর পেয়েছ, না? তাই ইচ্ছে মতো জুতোর ঠোক্কর মেরে যাবে! আমি বলছি—এই রাত নটার সময় তোমার বেরোনো হবে না। হবে না! হবে না! ব্যস!'

জগন্ময় হাঁপাতে থাকেন।

ইলা সিঁড়ির রেলিঙে হাতটা রেখে আর এক ধাপ নেমে বলে, 'অনর্থক চেঁচামেচি করে প্রেসার বাড়িয়ে লাভ আছে কিছু? অনেক বার তো বুঝিয়েছি আপনাকে, রাত্তিরে ছাড়া পার্টির কারো সঙ্গে দেখা হয় না। বেশীর ভাগ সকলেই শ্রমিক শ্রেণীর লোক। সারাদিন কাজ করে।'

জগন্ময় জানেন একথা।

কারণ জগন্ময়ের যে শুধু মেয়েটিই ওই পার্টিতে আত্মনিবেদিত তা নয়। ছেলেও। ছেলেই আগে। এখন সে এই সব হতচ্ছাড়া কাজের ফলও ভোগ করছে বসে বসে।

সেই জ্বালায় জ্বলছেন জগন্ময়।

স্ত্রী নেই যে জ্বালার ভাগ দেবেন কাউকে। মেয়ে তুই, কোথায় বাপের সেই প্রাণের জ্বালায় একটু ঠাণ্ডা জল দিতে চেষ্টা করবি, তা নয়, তাতে আরো আগুন ধরাচ্ছিস, তাতে আরো কাঠ দিচ্ছিস!

বৌ মরেছে কবে? ওই মেয়ে ছেলে দুটোকে জগন্ময়ই তো মানুষ করে তুলেছেন? তার জন্যে এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই?

সেকথার উল্লেখ করলে হেসে হেসে বলে কিনা, তাহলেই বোঝা যাচ্ছে 'মানুষ' করে তুলতে পারেন নি। স্রেফ বাঁদর করে বসে আছেন, নইলে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ হই না?

এরকম কথা বেশী বলতো সেই হতভাগাটা, কতদিন যেন যার কথা শোনেনি জগন্ময়। তবুও তার কথার মধ্যে যেন কিঞ্চিৎ রস কস ছিল, কিন্তু এই মেয়েটির? মেয়েটির কথা যেন চাবুক। যেন জলে ভেজা বিছুটি!

সেই বিছুটিটা এখন আবার নতুন করে সর্বাঙ্গ জ্বালিয়ে দিল।

সবাই শ্রমিক শ্রেণীর লোক!

আর পঁচিশ বছরের যুবতী মেয়ে তুমি রাত নটার সময় যাবে তাদের সঙ্গে মীটিং করতে। ফিরতে কোন না সাড়ে দশটা এগারোটা বাজবে?

নীরুর তাই হতো।

বারোটাও বাজতো কতদিন।

তাই নিয়ে বকাবকিও করেছেন জগন্ময়ের অবিরতই। এখন সে পাটটা থেমে আছে।

কিন্তু যতই হোক, সে হচ্ছে ছেলে। তাকে নিয়ে রাগের জ্বালা আছে, ভয়ের প্রশ্ন নেই।

কিন্তু এই দুঃসাহসিক মেয়ে, পৃথিবীকে জানে না? জগৎকে চেনে না? জানে না—ওর বয়সের একটা মেয়ের পক্ষে এরকম যথেচ্ছাচারের পরিণাম কতদূর গড়াতে পারে?

অথচ জগন্ময় সেকথা বলতে গেলে যেন উপহাস্যির ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয় বাপকে। যেন 'বোকাবুড়ো' বাপটা একটা অর্বাচীনের মতো কথা বলছে।

আর ডাঁট কী মেয়ের!

যেন পৃথিবী তুচ্ছ।

বাপ যদি জিজ্ঞেস করে, কী তোদের এতো কাজ, যার জন্যে দিনে রাত্তিরে স্বস্তি নেই? যার জন্যে তোদের সমাজ নেই, সংসার নেই, স্নেহ নেই, ভালবাসা নেই, নম্রতা নেই, সৌকুমার্য নেই, আছে শুধু রুক্ষতা আর ঔদ্ধত্য?'

তাহলে বলে কিনা, 'সে আপনাকে বোঝানো যাবে না।'

বাপকে এতো বুদ্ধিহীন ভাবে।

ভাবুক।

কিন্তু জগন্ময় এ ঔদ্ধত্য সহ্য করবেন কেন? বাপের ভাত খাচ্ছে না মেয়ে? বাপের হাতের তলায় মাথা দিয়ে থাকছে না?

তবে?

শাসন করবার অধিকার নেই তার?

জগন্ময় চড়া গলায় বলেন, 'শ্রমিক শ্রেণী? তার মানে কতকগুলো কুলিমজুর? তাদের কাছে গিয়ে হল্লা করবে তুমি এখন এই রাত দুপুরে?'

'বাবা!

ইলা প্রায় শেষ ধাপে পৌঁছে গিয়ে বলে, নিজে নিজেকে খেলো করবেন না। কতকগুলো বাজে কথা বলে শুধু নিজেকেই ছোট করা হয়। আরো নেমে যায়।'

জগন্ময় ওই শান্ত ভঙ্গীর মধ্যে যেন কাঁটা চাবুকের জ্বালা অনুভব করেন।

জগন্ময় দুদ্দাড়িয়ে নেমে আসেন। অত বড় মেয়ের রুক্ষ চুলের শিথিল খোঁপাটা ধরে হঠাৎ টান দেন। বলেন, 'তুমি ভেবেছ কী? যা খুশি তাই করবে? এতো অগ্রাহ্য? দাদা জেলে গিয়ে বসে আছে, তাই তুমি দাদার কাজ করছো? দাদা আর তুমি সমান? রোজ বারণ করছি, রোজ সেই কাজ?'

ইলা বোধ করি এতোটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তবু ইলা বিচলিত হয় না।

ইলা শুধু গম্ভীর হাসির সঙ্গে বলে, 'বাবা, আপনি আমার চুলের মুঠি ধরে রয়েছেন। রাস্তার ধার, লোকে দেখলে নিন্দে করতে পারে।'

চুলের মুঠি!

চুলের মুঠি ধরে রয়েছেন জগন্ময় তার মেয়ের?

জগন্ময় যেন চেতনা ফিরে পান।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর একটা ভয় তাঁকে পেয়ে বসে। বোধ করি সেই ভয়েতেই নার্ভাস হয়ে হাতটা ছেড়ে দিয়ে পড়ে যাবার ভঙ্গীতে টলে গিয়ে মাটিতে ধুলোর ওপর বসে পড়েন।

আর দুই হাত বুকে চেপে ভাঙা ভাঙা গলায় চেঁচাতে থাকেন, 'আমি তোর চুলের মুঠি ধরেছি? অ্যাঁ? এই কথা বলতে পারলি তুই? আমার ব্যবহার দেখলে লোকে নিন্দে করবে? আর তুমি? তুমি আমার পঁচিশ বছরের কুমারী মেয়ে যখন রাত ন'টায় চরতে বেরোও, আর রাত বারেটায় বাড়ি ফেরো? সেটা নিন্দের কাজ হয় না? তা হবে কেন? তোমরা যে মহৎ! তোমাদের সাত খুন মাপ! তুমি মেয়ে, তুমি জানো না এই পৃথিবী কেবল দেবতাদের আস্তানা নয়। এখানে সাপ আছে, বাঘ আছে, ভালুক আছে। সুবিধে পেলেই ঘাড় মটকাবে। ও হো হো বুক গেল বুক গেল, রে বাবা!'

জগন্ময়ের এ ভঙ্গী নতুন নয়।

তিনি যখনই ছেলেমেয়েকে এঁটে উঠতে পারেন না, তখনই বুক গেল, বুক গেল করে বসে পড়েন।

এছাড়া মান সম্মান বজায় রাখবার আর কোন উপায় তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি আজ পর্যন্ত।

ব্লাডপ্রেসারেব রুগী বাপের এই শোচনীয় অবস্থা দেখলে অবশ্যই এরা ভয় পাবে এবং ব্যস্তও হবে। ওরা যে বাপকে থোড়াই কেয়ার করে চলে যাচ্ছিল, সেটা অন্ততঃ বন্ধ হবে।

তা' ছেড়ে জেলে গিয়ে পর্যন্ত বুকটা তাঁর সত্যিই যখন তখন 'কেমন' করে ওঠে। ভয় হয় যদি এই ফাঁকে মরি তো মেয়ের হাতের আগুন মুখে নিয়ে পরলোকের পথে পাড়ি দিতে হবে আমায়।

তার ওপর ওই মেয়ে! বাপের প্রতি স্নেহহীন, শ্রদ্ধাহীন, সম্ভ্রমহীন! ব্যঙ্গ করে ছাড়া তাকায় না।

এই যে—

এই যে জগন্ময় বুক ধরে ছটফট করছেন, মেয়ে তাকিয়ে আছে যেন ব্যঙ্গের ছুরি চোখে উঁচিয়ে।

নীরু এমন চোখে তাকাতো না।

নীরু বাপের ছটফটানি দেখে ভয় খেতো! ভাবতো না, বাবা 'নাটক' করছে। ডাক্তার ওষুধ করে ছুটোছুটি করতো। কিন্তু নাটকই কি করছেন জগন্ময়?

মেয়ের এই ঔদ্ধত্যে কি তাঁর মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে না?

ওই বয়স্থা কুমারী মেয়ে এখন রাতদুপুরে হয়তো কোন এক বস্তির ঘরে গিয়ে হয়তো একপাল 'ছোটলোকের' মধ্যে বসবে, ভেবে বুক ধড়ফড় করছে না?

অথচ পাজী মেয়েটা ভাবছে বাপ নাটক করছে। ভাবুক। তবু চালিয়ে যাবেন জগন্ময়, আজ ওর বেরোনো বন্ধ করবেনই তিনি।

জগন্ময় চরম করলেন।

জগন্ময় ধুলোয় লুটিয়ে শুয়ে পড়লেন।

জগন্ময় মৃত্যু পথযাত্রীর অভিনয় শুরু করলেন।

ইলা নির্ণিমেষে একবার তাকিয়ে দেখলো। তারপর ইলা তার হাতের ঢাউস ব্যাগটা সিঁড়ির তলায় নামিয়ে রেখে চাকরকে ডাকলো। নীচতলাতেই তার ঘর।

চাকরটা বোধকরি তখন খাওয়া-দাওয়ার আগে একপালা ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল, ডাক শুনে বেজার মুখে এসে দাঁড়িয়েই থতমত খেলো।

বাবু ধুলোয় শুয়ে ছটফট করছেন, এমন দৃশ্য অন্ততঃ ইতিপূর্বে দেখেনি সে।

দিদিমণি কিন্তু ছটফট করছে না। দিদিমণি নীচু হয়ে আস্তে বলছে, 'ঘরে ঢুকে শোবেন চলুন! দোতলায় উঠতে না পারেন, নীচে বসার ঘরে—'

চাকরটা এসে দাঁড়াতে দিদিমণি শান্ত গলায় বলে 'ধরে নিয়ে চলতো, ঘরে শোয়াতে হবে।'

জগন্ময় বোঝেন ওষুধ ধরেছে।

জগন্ময় 'মুমূর্ষু' হতে চেষ্টা করেন।

তবু ইলা চাকরের সাহায্যে তাঁকে বসবার ঘরে নিয়ে এসে সে ঘরের এক পাশে পাতা সরু চৌকীটার উপরে শুইয়ে দেয়। সহজেই দিতে পারে। জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ তো অজ্ঞান অচৈতন্যের মতো পাথর ভারী হয় না।

শোওয়ানোর পর ইলা চাকরকে বলে, 'তুই একটু কাছে বোস, আমি ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আসি।'

ডেকে নিয়ে আসি!

জগন্ময়ের ভিতরটা আহ্লাদে ফুলে ফুলে ওঠে।

আসি!

'ডাক্তারকে খবর দিয়ে যাই' নয়। যেমন আর একদিন করেছিল। সেদিন ডাক্তারের ভিজিটটা একেবারে বাজে খরচ মনে হয়েছিল জগন্ময়ের। অবশ্য পাড়ার ডাক্তার, বহুদিনের চেনা, চারটে টাকাতেই কাজ মিটে যায়, তবু সেটা বুঝি কম? তা থেকে যদি অন্য ফসল না ফললো, লাভ কি?

তা' আজ বলেছে, 'নিয়ে আসি।'

তার মানে এতোক্ষণে সত্যি ভয় পেয়েছে। ঠিক হয়েছে!

কেমন ওষুধ আবিষ্কার করেছি? নাও এখন ডাক্তার ওষুধ সেবা যত্ন—এই সব নিয়ে হাবুডুবু খাও। বস্তির মীটিং মাথায় উঠুক।

এইবেলা চোখটা পিট পিট করে পারিপার্শ্বিকটা একবার দেখে নিতে ইচ্ছে করে, তবু সে লোভ সামলান জগন্ময়। চাকরছোঁড়াও কম ধূর্ত নয়। জগন্ময়ের শরীর খারাপকে ওছোঁড়াও যেন সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে।

ইলা চলে যায়।

জগন্ময় অপেক্ষা করে থাকেন কখন আসে। সাড়া পেলে আর একবার যন্ত্রণা বৃদ্ধির চেহারাটা ফোটাতে হবে।

অথবা অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকাটার।

সেটাই বোধহয় সহজ।

একটানা কতক্ষণ মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করা যায়?

কিন্তু প্রতীক্ষার মুহূর্ত কী দীর্ঘ!

মনে হচ্ছে রাত বারোটা বেজে গেল বুঝি।

দেয়ালেই ঘড়ি ঝুলছে। কিন্তু চোখ খুলে দেখে নেবার তো উপায় নেই। ছোড়া আমারই মুখপানে তাকিয়ে বসে আছে কিনা কে জানে। ঘড়ি তো ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাজে। কান খাড়া করে আছেন বাজছে কই? বন্ধ হয়ে পড়ে আছে বুঝি।

অনেকক্ষণ পরে যখন মনে হচ্ছে রাত বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে, তখন ডাক্তারের পরিচিত কণ্ঠ শোনা গেল, 'কী হলো? আবার কী করলেন? চিংড়ি মাছ খেয়েছেন বুঝি?'

গতদিন ওই একটা কারণ আবিষ্কার করে দিয়েছিলেন জগন্ময় নিজেই। আজও ডাক্তার সেইটার উল্লেখ করেন।

অচৈতন্ত তো উত্তর দিতে পারে না, শুধু কান খাড়া করে শুনতে পারে উত্তরটা কে দিচ্ছে, এবং কী দিচ্ছে।

না, চাকরের গলা নয়, ইলারই গলা।

কই, চিংড়ি মাছ তো খাননি। সেই থেকে তো চিংড়ি মাছ বাড়িতে আসেই না আর।

ডাক্তার 'প্রেসার' দেখার যন্ত্রটা খুলে রোগীর হাতে তার দড়িদড়া বাঁধতে বাঁধতে বলেন, 'তবে? হঠাৎই শরীর খারাপ হলো? বেরিয়েছিলেন বুঝি? বেরোন নি? তা হলে এখানে শুয়ে যে?'

ব্যস্ হয়ে গেল জিজ্ঞেস করা।

ডাক্তারটিও তেমনি।

বিশদ জিজ্ঞেস কর কী কী কষ্ট হয়েছিল, কী অবস্থায় নেমে এসেছিলেন, তা নয়। যেন সবই জেনে বসে আছেন।

তারপর?

তারপর জগন্ময়ের পূর্ব জন্মের মহা শত্রুর মতো সব পরীক্ষান্তে বলে ওঠে কি না, 'কই, আপনার কোথাও কিছুতো অসুবিধে দেখছি না। প্রেসার ঠিক আছে। হার্ট, লাংস, পালস্, সব কিছুই খুব ভালো। উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন। এতো নার্ভাস হলে চলে কখনো?'

ডেকে ডেকে জগন্ময়ের চোখ খুলিয়ে ছাড়েন।

অবশ্য পারাও যাচ্ছিল না আর। জগন্ময় চোখ খুললে ডাক্তার মহোৎসাহে বলেন, 'উঠে পড়ুন! ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করুন।'

ইলা খামে মুড়ে টাকাটা এগিয়ে দেয়।

সেটিকে পকেটস্থ করে বলেন, 'দাদার আর কতোদিন মেয়াদ?'

ইলা মৃদু হেসে বলে, 'যতোদিন সরকার বাহাদুরের মর্জি!'

'রাতে কী খান উনি?'

'রুটি-তরকারি, মাংসের স্টু।'

'ঠিক আছে, খেতে দাও। খাওয়া দাওয়া দরকার।'

ব্যস্ ডাক্তারীর পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে চলে যান। ভাবখানা এই—অসুখ জগন্ময়ের কিচ্ছুই না, ছেলের জন্তে ভাবনা করে করে নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। হয়তো খাওয়া-দাওয়া ছেড়েছেন। সেটা করা দরকার।

এইটুকু প্রচার করতে চার চারটে টাকা খসিয়ে নিয়ে চলে গেলেন।

যাক্, এখনো কিছুটা হাতে আছে জগন্ময়ের। কিচ্ছু যে খেতে পারছেন না, সেটা দেখানো যাবে। যদিও খিদেয় পেট জলছে, তা কী আর করা, এতোর পর এক্ষুণি খেতে বসা যায় না। করুক পাজী মেয়েটা খানিকক্ষণ খোসামোদ।

জগন্নাথ আস্তে উঠে বসে জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়েন।

ঘরের দেয়ালে চলন্ত ঘড়ি থাকা সত্ত্বেও ইলা নিজের হাতের ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে বলে, 'ওঃ দশটা বেজে গেছে! আর দেরী করা ঠিক নয়। মধু তুই, চটপট বাবাকে খেতে দে। স্টুটা গরম করে দিস। আর আমার খাবারটা ঢাকা দিয়ে রেখে তুইও খেয়ে নিস। আমার ফিরতে রাত হবে।

'আমার ফিরতে রাত হবে!'

তার মানে এই দশটা রাত্তিরে ওর সেই যাওয়া যেতে হবে। তার মানে জেদটি ঠিক বজায় রাখা চাই। তার মানে বাপের অসুখটাকে নস্যাৎ করে, অবিশ্বাস করে, ডাক্তারকে দিয়ে বাপের নাকে ঝামা ঘসিয়ে, সেই গট গট করে চলে যাওয়াই হবে।

কে জানে ডাক্তারের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করেই এসেছে কি না। হয়তো শিখিয়েই এনেছে বলবেন, 'সব ভাল আছে।'

আশ্চর্যিকি? বুড়ো হোক, হাবড়া হোক, যুবতীর মুখের কাছে সবাই গদ গদ।

মেয়ের সম্পর্কে এই কটু কুৎসিত কথাটা ভাবতে দ্বিধামাত্র করেন না জগন্নাথ।

এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দুর্বলতা ত্যাগ করে পুরো দমে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'এই রাত দুপুরেও সেই ছোটলোকের বস্তিতে যাওয়া চাই-ই চাই?'

এই চেঁচানিতে মধু চমকে ওঠে, কিন্তু ইলা নয়।

ইলা সহজভাবে বলে, 'চাই বৈ কি বাবা, নইলে যাবো কেন? আমারও তো কষ্ট কম হচ্ছে না।'

'ব্যস্ আর কথা বলার সুযোগ দেয় না বাপকে। পিঠের আঁচলটা কাধে টেনে নিয়ে সোজা বেরিয়ে যায়। দৃঢ়পায়ে।

জগন্নাথ সেই চলার পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। জগন্নাথের চোখ দিয়ে আগুন ঝরে। জগন্নাথ তাঁর বয়স্থা মেয়ের এই রাতবিরেতে বেরোনোর জন্যে যে বিপদের ভয়ে দিশেহারা হচ্ছিলেন, হঠাৎ সেই বিপদটাকেই চেয়ে বসেন।

চেয়ে বসেন স্রেফ্ দর্পহারী নারায়ণের কাছে।......হে নারায়ণ, ওর উঁচু নাক ধুলোয় ঘসটে যাক, ওর খাড়ামাথা জন্মের শোধ হেঁট হয়ে যাক, ও সেই হেঁট মাথা নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াক, দেখি আমি একবার।

———

সৌরভ সার

নিত্য অভ্যাসের নৈপুণ্যে সাজটা ত্রুটিহীন হলেও, বিতৃষ্ণায় ভরা মন নিয়েই প্রসাধন-পর্ব সমাপ্ত করছিল অলকা ত্রিপাঠী। কিন্তু সে প্রসাধনে শেষটান দিতে সুর্মাদানীটা হাতে নিয়েই মনটা তার হঠাৎ তীব্র বিরক্তিতে বিদ্রোহী হয়ে বুনো ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়ালো।

সুর্মাদানীটা ঠেলে রাখলো অলকা ত্রিপাঠী, আর্শির সামনে থেকে সরে এসে সোফায় বসে পড়ে প্রায় উচ্চারণের মত করে ভাবতে লাগলো, কেন? কেন? কেন আমি এসব করছি? কেন করি? কেন করবো? কেন আমি ওর ইচ্ছের পুতুল হয়ে পুতুলের মত রূপসজ্জা করে 'হাস্নে পুতুলের মুখ' নিয়ে ওর সেই পেটমোটা বন্ধুদের সঙ্গে (হ্যাঁ, ও ওদের কথা উল্লেখ করতে 'বন্ধু'ই বলে) পার্টিতে পার্টিতে ঘুরবো, তাদেরকে নিজের বাড়িতে ডেকে ডেকে পার্টি দেব? তাদের খানাপিনার 'খানা'গুলো বাড়ির রাঁধুনীকে দিয়ে বানিয়ে আর ভালো হোটেল থেকে আনিয়ে পাতে পরিবেশন করতে করতে আদুরে গলায় বলবো, 'ফেলতে পাবেন না কিছু। সারাদিন কষ্ট করে বানিয়েছি আপনাদের জন্যে। ফেললে বুঝবো নেহাৎ অখাদ্য হয়েছে বলেই—'

তার মানে ভাববো বোকা বানাচ্ছি তাদের।

আর তারা আমাদের বোকা বানিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তারিয়ে তারিয়ে খাবে, আর বলবে 'বাস্তবিক মিস্টার ত্রিপাঠী, আপনি রীতিমত ভাগ্যবান!'

আমি জানি আমার স্বামী বোকা বনেন, তাই ওরা চলে গেলে হেসে হেসে বলেন, 'দেখলে তো, ধরতেই পারলো না! আর বাড়ীর রান্না বলে কী খুশি হয়ে খেলো। পেট আর মাথা দুটোই সমান মোটা তো ওদের! খুব বোকা বানানো গেল!'

আমি আমার স্বামীর আত্মপ্রসাদ আর আত্মবুদ্ধির অহমিকার স্বপ্ন ভেঙে দিতে পারি না তাই সেই হাসির সঙ্গে হাসির যোগ দিই। কিন্তু আমি বুঝতে পারি বোকা আমরা ওদের বানাতে পারি নি, ওরাই আমাদের বানিয়ে গেল। ওরা ওই রন্ধন-রহস্য সম্বন্ধে অনুমানসিদ্ধ হয়েই আমাদের প্রীজ্ করেছে।

মাথামোটা হলে ওরা এই 'তামাম বিজনেসহাট'টাকে মুঠোয় পুরে ফেলতে পারতো না। মাথামোটা হলে, আমার স্বামীর মত মাথাসরু বিদ্বানরা ওদের পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াতো না, ওদের গদিতে চাকর হয়ে থাকতো না। মাথামোটার ভান করে গোটা দুনিয়াটাকে স্টাডি করে ফেলেছে ওরা, আর অবিরত তাকে কুক্ষিগত করে চলেছে।

কিন্তু আমার স্বামী ধূর্জটি ত্রিপাঠী ভাবেন, ওরা মাথামোটা, তাই ওদেরকে ঘিরে ঘিরে সূক্ষ্ম বুদ্ধির জাল রচনা করতে বসেন। সে জালের 'টানা'টা হচ্ছে তাঁর সুন্দরী

বিদুষী আর নৃত্যগীত-পটীয়সী স্ত্রী, আর 'পোড়েন'টা হচ্ছে তাঁর নিজের নির্লজ্জ চাটুকারিতা।

কিন্তু কেন? কেন বরাবর এই নোংরামীটা চলতে থাকবে? ক্ষুব্ধ আক্রোশে ভাবতে থাকে অলকা ত্রিপাঠী, কেন আমি আমার স্বামীর হাতের এই ল্যাটাইরের সুতো হয়েই থাকবো? কেন আমি নিত্য সন্ধ্যায় খারাপ মেয়েমানুষদের মত নিজেকে সাজসজ্জায় চটকদার করে তুলে ওর উদ্দেশ্য সিদ্ধির সাধনে ওই অমার্জিত পুরুষগুলোর লুব্ধ দৃষ্টির সামনে গিয়ে ডানা মেলবো?

আমার স্বামী ধূর্জটি ত্রিপাঠী জানেন সেটা। জানেন আমি তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। তবু ন্যাকামী করে বলেন, 'এটা তোমার বাড়াবাড়ি, এটা তোমার চিন্তার বিকৃতি, আমরা একে মনোরঞ্জন বলি না, বলি আপ্যায়ন।'

আমি এই ন্যাকামীকে ঘৃণা করি।

আমি ওকেও ঘৃণা করি।

শুধু ওর ওই বড়লোক হবার বাসনায় উন্মত্ত দীন চিত্তটাকে করুণা করেই—হ্যাঁ, করুণা করেই—ওর ইচ্ছের পুতুল হয়ে পুতুল সাজি।

তা বড়লোক ও হচ্ছে বৈ কি।

ওর ওই অর্ডার সাপ্লাইয়ের বিজনেস দিনে দিনে কণায় কণায় বাড়ছে। ওর হাভাতে ঘরে লক্ষ্মীর পদপাতের চিহ্ন ঝলমলিয়ে উঠছে বেশি থেকে বেশি!

আরও আবেগে উৎসাহে আমায় জড়িয়ে ধরে বলছে, 'তুমি, তুমিই আমার লক্ষ্মী! তোমার জন্যেই আমার সব।' বলছে 'যা নাচ দেখিয়েছ, ভোঁদড় বাবাজীদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছ একেবারে!...সত্যি, তোমার এই নাচটা আমার এত কাজে লাগছে! নাচিয়ে গাইয়ে মেয়ে বিয়ে করাটা সার্থক হয়েছে বলতে হবে। নইলে বেশির ভাগ মেয়েই তো বিয়ের পরে স্রেফ্ গুবলেট হয়ে যায়। নাচতে জানতো কি গাইতে পারতো ভুলেই মেরে দেয়।...আমাদের নতুকেই দেখো? তোমার চেয়ে ছোট বৈ বড় নয়, কিন্তু স্রেফ্ একখানা বুড়ি বনে বসে আছে। কে বলবে গানে ওর গীতশ্রী উপাধি ছিল, আর নাচের মেডেল আছে বাক্সভর্তি।'

... ...

নতু ধূর্জটির মামাতো বোন।

অলকার সহপাঠিনী।

গানের স্কুলেও একসঙ্গে শিখেছে।

কিন্তু এখন?

এখন একটা সুর তুলতে 'বাই জন্মে' যায় তার, অথচ তার জন্মে দুঃখের বালাই নেই। হেসে হেসে বলে, 'আমার আর ফসল গোলায় উঠবে কি, রাতদিন তো গরুতে মুড়োচ্ছে। দু-দুটো ডাকাত নিয়ে মল্লযুদ্ধ চালাচ্ছি রাতদিন। ওদের সঙ্গে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে গলা একেবারে ভাঙা কাঁসর হয়ে গেছে। অলকা বৌদি আছে ভাল।'

আছে ভাল!

কারণ অলকার ঘরে ডাকাতের উৎপাত নেই। অলকার বর ধূর্জটি ত্রিপাঠী বুদ্ধিমান লোক, ও ওর দেউড়ী শক্ত রেখেছে যাতে না ডাকাত-টাকাত ঢুকে পড়ে। ও আগে ঘর গুছিয়ে নেবে, তারপর দেউড়ী খোলার কথা চিন্তা করবে।

কিন্তু আর কত ঘর গোছাবে ধূর্জটি?

আর কত ভাঙাবে অলকাকে?

অলকা আর পারবে না, পারবে না, পারবে না! পারবে না ধূর্জটির 'ডীলারদের' মনোরঞ্জনার্থে নাচতে, গান গাইতে।

কিন্তু 'পারবো না' কথাটা কি শুধু আজই বলছে অলকা? আজ ওই সুর্মাদানীটা ঠেলে ফেলে রেখে? প্রথম থেকেই কি প্রতিবাদে মুখর হয় নি সে? বলে নি কি—'আমি পারবো না, আমি পারবো না, আমার ভয় করে!'

'ভয় করে!'

হেসেছে ধূর্জটি, 'কত ফ্যাংশানে নেচে এসেছো, কত বাহাবা কুড়িয়েছো—'

'সে তো ভালো জায়গা—'

'এই বা কী এত খারাপ জায়গা? একটা গণ্যমান্য লোকেদের পার্টি! ভদ্র সম্ভ্রান্ত সব লোকেরা আসেন—'

'আমার বিচ্ছিরী লাগে!'

'ভয়' শব্দটা ছেড়ে ক্রমশ 'বিচ্ছিরী' শব্দটা ধরেছিল অলকা।

'আমি পারবো না, আমার বিচ্ছিরী লাগে।'

ধূর্জটি তখন আকাশ থেকে পড়েছে। চোখ কপালে তুলে বলেছে, 'সে কি?' তবে যে শুনেছিলাম নাচগানই তোমার ধ্যানজ্ঞান। লতু বলেছিল তুমি—'

'সে আমি আমার নিজের খুশির কথায় বলেছি। কিন্তু তুমি আমার নাচটা কাজে লাগাচ্ছো! তুমি তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে নাচাচ্ছো। আমি পারবো না।'

ধূর্জটি রেগে ওঠে নি, ধূর্জটি জোর জবরদস্তি করে নি, ধূর্জটি তবু পারিয়ে ছেড়েছে।

ধূর্জটি তুতিয়েছে পাতিয়েছে, যুক্তি দেখিয়েছে।

পিঠে হাত বোলানোর ভঙ্গীতে বলেছে, 'এতবড় একটা বিদ্যে তোমার আয়ত্তে রয়েছে, শিখেছ খেটেখুটে, বাপের পয়সা খরচা করে, সেটা কাজে লাগাবে না? না

লাগানোটা বোকামী, না লাগানোটা জড়তা। আর তুমি তো কিছুই খারাপ কাজ করছো না। তোমার স্বামীর উন্নতিকল্পে নিজের শক্তিটা একটু কাজে লাগাচ্ছো;—'

অলকা তখন লাল লাল মুখ করে বলতো, 'আমার মনে হয় খারাপ। আমি যখন তোমার ওই পার্টি সেরে একা হই, মনে হয় খারাপ কিছু করে এলাম। মনে হয় কতকগুলো নোংরা চোখ যেন আমার গায়ে বিঁধে রয়েছে। আমি আর কোনো-দিন যাব না।'

'সেরেছে!'

ধূর্জটি হা হা করে হেসে উঠতো। বলতো, 'ওটা হচ্ছে তোমার নার্ভাসনেস। শিল্পীদের প্রথম স্টেজে ওটা থাকে। মনে হয় সবাই আমাকেই দেখছে। ওটাকে কাটিয়ে উঠতে না পারলে যথার্থ শিল্পী হওয়া যায় না। কাটিয়ে উঠতে হবে। মনে করতে হবে পৃথিবীতে কোথাও কোনো চোখ নেই, শুধু আমি আছি, আর আমার আনন্দ আছে।'

'মনে করলেই তো হয় না!'

'হয়। চেষ্টা করলেই হয়। সে চেষ্টা করতে হবে।'

অলকা একথায় রেগে উঠতো।

বলতো, 'কেন? কেন তা করতে হবে? আমি কি নাচওয়ালী হতে যাবো?'

ধূর্জটি আবার হাসতো।

বলতো, 'নাচওয়ালী' শব্দটা প্রয়োগবিধির দোষেই খারাপে দাঁড়িয়েছে। ধর যদি বলি—'নৃত্যশিল্পী' দোষ খুঁজে পাবে তার মধ্যে?'

'জানি না। আমার ভাল লাগে না, আমি পারবো না।'

'কিন্তু আগে 'নাচ নাচ' করে পাগল হতে। তোমার বাবার মুখেই শুনেছি, শুধু তোমার দুর্দান্ত ঝোঁকেই তাঁদের সনাতন পরিবারে এই আধুনিকতা ঢুকেছিল।'

'সে আলাদা।'

'আলাদা কিসে আমায় বোঝাও। তবে যদি বল তোমার বিদ্যেটা আমার একটু কাজে লাগছে, সেটাতেই আপত্তি, তবে অবশ্য নাচার। আসলে ওদের একটু খাইয়ে মাখিয়ে, এন্‌টারটেন করে কিছু কাজ বাগিয়ে নেওয়া, এই তো!'

'তা তুমি যদি আমার সঙ্গে সহযোগিতা না করতে চাও—।' ধূর্জটি মুখটা করুণ করে ফেলতো।

'বাঃ, তা কেন?' অলকাকে কিঞ্চিৎ নরম হতে হয় তখন।

'তাই-ই তো! যেটা তোমার সব চেয়ে প্রিয়, যেটা তোমার ধ্যানজ্ঞান, যেটাতে তোমার আনন্দ, সেটাই যেই আমার কাজে লাগবার প্রশ্ন উঠছে—'

'বাঃ এরকম ভাবছো কেন? জিনিসটা অবশ্যই আমার আনন্দের। একটা সুরকে

গলায় না তুলে সর্বাঙ্গ দিয়ে তুলছি, তুলতে পারছি, এ যে কি আনন্দ তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না। মনে হয় সত্যিই যেন আমার 'সকল দেহে আকুল রবে, মন্ত্রহারা কাহার স্তবে' আরতির শিখা জ্বলে ওঠে।…হেসো না, একটু কবিত্ব করলাম। কিন্তু সত্যি বলছি, সেই আনন্দ আর আনন্দ থাকে না যখন ভাবি আমি আমার দেহভঙ্গী দেখিয়ে কোনো উদ্দেশ্য সাধন করছি—'

ধূর্জটি ওর এই আপত্তি নস্যাৎ করে দিয়েছে। বলেছে, 'এ আর কিছুই নয়, এ হচ্ছে তোমার মজ্জাগত কুসংস্কারের প্রতিক্রিয়া। প্রপিতামহীর রক্তের ঋণের জের। নৃত্য একটা উচ্চাঙ্গের কলা, সর্বদেশে, সর্বকালে এ আছে, এবং এর সমাদর আছে। শুধু—'

অলকা তর্ক তুলতো।

বলতো, 'সমাদর আছে, মর্যাদা নেই।'

'তাও আছে।'

ধূর্জটিও তর্ক তুলতো, 'সত্যিকার কলাশাস্ত্রসম্মত লয়ের নিশ্চয়ই মর্যাদা আছে। আমাদের প্রাচীন ভারতেও ছিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আজও আছে। শুধু এই বাংলাদেশেই নানা কারণে নৃত্যকলার পতন ঘটেছিল, ভদ্রসমাজ থেকে স্খলিত হয়ে চলে গিয়েছিল অন্ত্যশ্রেণীর ঘরে। নৃত্যশিল্পীদের ঠাঁই হয়েছিল সম্ভ্রান্ত পাড়ার বাইরে, নাম হয়েছিল, 'নটুয়া'। যেমন পটশিল্পীদের নাম হয়েছিল 'পটুয়া', ঠাঁই হয়েছিল অন্ত্যজ পাড়ায়। কিন্তু এ যুগে তো আর তা নেই।'

অলকা তখন হেসে ফেলতো।

কারণ তখনও অলকা ধূর্জটি ত্রিপাঠীর ভিতরের চক্ষুলজ্জাহীন অর্থপিপাসু মূর্তিটাকে স্পষ্ট দেখতে পায় নি। তখনও তার উপর আশা রাখতো, বিশ্বাস রাখতো, ভালবাসা রাখতো। সেই ভালবাসাটা ঘৃণ্য আর করুণায় পর্যবসিত হয় নি তখনও।

তাই অলকা তখন হেসে ফেলতো।

বলতো, 'ব্যবসা-বাণিজ্যের লাইনে না গিয়ে তুমি জ্ঞানচর্চা করলে না কেন? 'সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে নৃত্যশিল্প ও নৃত্যশিল্পী' টাইটেল দিয়ে 'থিসিস্' লিখে ডক্টরেট পেয়ে যেতে!

ধূর্জটি তখন অন্য কৌশলে তর্কের এবং তার্কিকার মুখ বন্ধ করে দিতো। অলকা বিগলিত হতো।

তারপর ধূর্জটির সঙ্গে গিয়ে ওই তার বিজনেসম্যান বন্ধুদের পার্টিতে নেচেও আসতে হতো অলকাকে, আর সে নাচ ভাল উৎরোলে, ত্রিপাটির বন্ধুরা ত্রিপাঠীর সৌভাগ্যে 'দশানন' হলে, কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদও যে লাভ না করতো তা নয়।

কিন্তু বারে বারে ভাল লাগে না, যখন তখন ভাল লাগে না।

অলকা বেঁকে বসেছে, 'পালিয়ে গিয়ে বসে থাকবো, দেখবে মজা—' বলে ভয় দেখিয়েছে, বলেছে 'পারবো না, পারছি না।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধূর্জটির অধ্যবসায়েরই জয় হয়েছে।

আর এই একটা কৃত্রিম জীবনের মধ্যে আবর্তিত হতে হতেই হচ্ছে তাদের সংসার করা। ধূর্জটি ত্রিপাঠী আর অলকা ত্রিপাঠীর।

এ সংসারের রং হচ্ছে শুধু শিকার সন্ধান, রস হচ্ছে সেই শিকারের সাফল্য, আর রূপ হচ্ছে নিত্য-নতুন ঐশ্বর্যের প্রকাশ, নিত্য-নতুন আসবাবের আগমন।

অলকা ভাবতে থাকে, এই কি জীবনের রূপ? এই কি সংসারের চেহারা?

লতু মাঝে মাঝেই বেড়াতে আসে এবাড়িতে, কারণ সে গৃহকর্তার বোন, গৃহিণীর বান্ধবী। এসে বলে, 'বাবা, তোদের এই ছবির মত বাড়িতে এই নন্দীভৃঙ্গী দুটোকে আনতে ভয় করে! চলে যাবার পর দেখিস্ অনেক কিছু 'আস্ত' করে দিয়ে গেছে।'

তারপর বলে 'দিব্যি আছিস বাবা, সব সময় ফিটফাট্। ছবির মত বাড়ি, ছবির মত গিন্নী! আর আমায়? আমায় যদি বাড়িতে দেখিস্, স্রেফ্ একটি দানব-দলনী রণরঙ্গিণী!'

বলে, 'বেশ আছো জটাদা। কোনো জ্বালা নেই!'

তারপর যতক্ষণ বসে থাকে, তারিয়ে তারিয়ে নিজের 'জ্বালা'র গল্প করে।

অলকা নস্যাৎ হয়ে যায় যেন সেই 'জ্বালা'র মহিমায়।

কিন্তু অলকার?

অলকার যা জ্বালা সে কারো কাছে গল্প করবার নয়। সে জ্বালা শুধু অহরহ অলকাকে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ করে।

অলকার সমস্ত নার্ভগুলো যেন সর্বদা বলে চলে, 'পারছি না, পারবো না।'

আজ অলকা প্রতিজ্ঞা করে, আজ বলবোই। বলবো, 'তোমার বিজনেসের সুবিধের জন্যে আর আমি পুতুল সাজতে পারবো না, আমায় রেহাই দাও।'

বসে রইল সোফায়, প্রসাধনে শেষটান দিল না। বাকি রইলো সমাপ্তিরেখা।

কিন্তু আজ ধূর্জটি আর এক নতুন ঢেউ নিয়ে বাড়ি ঢুকলো। এল যেন লাফাতে লাফাতে, কথা বললো হৈ-চৈ করে।

'এই শুনছো, একটা ব্যাপার হয়েছে। বলিই তাহলে তোমায় সব। মানে আর কি, না বললেও বুঝতে পারবে। ইনকাম্ ট্যাক্সের ব্যাপার! জানোই তো সব টাকাই সাদা টাকা নয়! আমি সৎ থাকবো বললেও আমার 'ডীলার'দের সুবিধের জন্যেই কালোটাকা নিতে হয়। তা সেই এখন মুস্কিল হচ্ছে—ওই কালোগুলো ধরা পড়লে দু' পক্ষেরই ফ্যাসাদ! তা' আমার উকিল বলছে, আমাদের এই কেসটা যে অফিসারের হাতে পড়েছে, তার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারলে সুবিধে হতে পারে। লোকটা নাকি খুব ভদ্র আর সজ্জন, আর—' ধূর্জটি একটু রহস্যের হাসি হাসে, 'লোকটা না কি ব্যাচিলার!'

অলকা ত্রিপাঠী তার স্বামীর ওই ধূর্ত হাসিমাখা মুখটার দিকে তাকায়। তারপর ইস্পাতের গলায় বলে, 'তাতে কি হচ্ছে? ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসার ব্যাচিলার হলে কালোটাকার হিসেব মকুব হয়ে যায়?'

ধূর্জটি মৃদু হেসে বলে, 'ক্ষেত্রবিশেষে যায়। ব্যাচিলারদের 'মহিলা' সম্পর্কে একটু দুর্বলতা থাকে এটা তো জানা কথা? সিভ্যালরি জ্ঞান তাদের একটু বেশিমাত্রায় প্রবল। কাজেই তুমি যদি একবার—মানে আমরা যদি দুজনে তার বাড়িতে গিয়ে দেখা করে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেবার জন্যে অনুরোধ করি—'

অলকা স্থির দৃষ্টিতে তার স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তার বাড়ি গিয়ে? ওঃ! তারপর বোধহয় তোমার হঠাৎ একটা জরুরী দরকার পড়বে? তোমাকে 'আধ ঘণ্টার জন্যে ঘুরে আসতে' বেরিয়ে যেতে হবে?'

ধূর্জটির মুখটা অপমানে কালি হয়ে ওঠে, তবু ধূর্জটির পক্ষে সম্ভব হয় না রাগ করবার, প্রতিবাদ করবার। কারণ ধূর্জটি একাধিকবার এমন ঘটনার নায়ক হয়েছে। তাই ধূর্জটি সেই কালিবর্ণ মুখে বলে, 'তা' কেন?'

অলকা গম্ভীর মুখে বলে, 'নয় কেন? ব্যাচিলার লোকেদের যখন স্ত্রীলোক মাত্রেই দুর্বলতা তখন সুন্দরী এবং তরুণী স্ত্রীলোক দেখলে কি আর রক্ষে আছে? সে সুযোগটা অবশ্যই নেবে তুমি!'

ধূর্জটি বোঝে বাতাস একেবারে উল্টো, তাই ধূর্জটি পাকা অভিনেতার মত অভিনয় করে বলে, 'বুঝতে পারছি অলকা, তুমি আমায় ঘৃণা করছো।...করবেই, সেটাই আমার পাওনা। কিন্তু অলকা, আমি রক্তমাংসের মানুষ! আর আমি মানুষের মত বাঁচতে চাই। দুঃখে দারিদ্র্যে অভাবে অভিযোগে নিপীড়িত জীবনকে আমি ভয় করি, ঘৃণা করি। তাই—সেই আমার তুচ্ছ চাকরিটাকে ফেলে দিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরতে চেয়েছি লক্ষ্মীর ঝাঁপির কোণ! আর সেটা পেয়েছি তোমারই সাহায্যে! বুঝতে পারছি সেটা তোমার পক্ষে কষ্টকর হয়েছে। আর তোমায় জ্বালাতন করবো না, কথা দিচ্ছি, আর তোমাকে আমার এই কাজের জীবনের সঙ্গে জড়াব না, শুধু এবারটার মতো আমায় উদ্ধার করো। কারণ উকিলকে আমি কথা দিয়েছি, যাবো—'

'আমায় নিয়ে যাবে সে কথাও দিয়েছ?'

স্থির প্রশ্ন করে অলকা।

ধূর্জটি গোঁজামিল দেয়।

ধূর্জটি বলে, 'না তা ঠিক নয়, মানে কথা হচ্ছে আমিই বলছিলাম, সন্ধ্যেবেলা তো বেড়াতে বেরোই দু'জনে, যাওয়া যাবে। ঠিকানা-টিকানা নিয়ে নিলাম।'

'ঠিকানাটা কি?'

'ঠিকানা? এই তো—'

ধূর্জটি প্রসঙ্গকে অন্যখাতে আনতে পেরে বর্তে যায়। পকেট থেকে একটা টুকরো কাগজ বার করে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'এই তো কাছেই। মানে খুব একটা দূর নয়।'

অলকা কাগজটায় চোখ বুলোয়। অনেকক্ষণ ধরে বুলোয়। তারপর ধূর্জটির হাতে ফিরিয়ে দেয়। মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে, হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'ঠিক আছে যাচ্ছি চল।'

ধূর্জটি জানতো।

ধূর্জটি জানে।

ধূর্জটি বরাবর দেখে আসছে, রাগে হোক, দুঃখে হোক, ক্ষোভে হোক, শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে যায় অলকা। শেষ অবধি ডোবায় না। তাই ধূর্জটি উৎফুল্ল গলায় বলে, 'চল তবে।' দেখো ভালই লাগবে। এ তো তোমার গিয়ে হোটেলও নয়, পার্টিও নয়, একটা ভদ্রলোকের বাড়ি। গিয়ে ড্রইংরুমে বসবে—'

'শুধু বসবো ?'

বিষের তীরের মত একটু হাসে অলকা, বলে, 'নাচ দেখাতে হবে না তোমার ইনকাম ট্যাক্স অফিসারকে ? তোমার স্ত্রীর ওপর ট্যাক্স বসিয়ে যাতে তোমার ওপর চাপানো-ট্যাক্সের ভার কমিয়ে দিতে পারে ?'

'তুমি আমায় আজকের মত যা ইচ্ছে বলে নাও—' ধূর্জটি হতাশা-করুণ গলায় বলে, 'তবে এই শেষ !'

কিন্তু অলকা কি 'এই শেষ' কথাটায় ভুলবে ? অলকা কি আরো বহুবার এই 'শেষের রাগিণী' শোনে নি ?

'তুমি তো তৈরি হয়েই রয়েছ ? আর কিছু করবে না কি ?'

অলকা গম্ভীর গলায় বলে, 'যদি এই সিল্কের শাড়িটা ছেড়ে বেনারসী পরতে বল তো পরবো।'

ধূর্জটির এখন উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেছে, তাই ধূর্জটি ছ্যাবলা হয়। হ্যা হ্যা করে হেসে বলে, 'পাগল ! তুমি যদি একখানা বল্কল পরেও যাও, তাহলেও অসামান্যা।'

'ঠিক আছে' বলে সুর্মাদানীটা হাতে তুলে নিল অলকা। প্রসাধনে সমাপ্তিরেখা দিল।

সেই 'অসামান্যা' স্ত্রীটিকে নিয়ে ভবানীপুরের একটা পুরনো রাস্তায় একখানা পুরনো বড় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় ধূর্জটি, তারপর অলকার দিকে তাকিয়ে ওর সেই বহুবার উচ্চারিত পচা পুরনো কথাটাই আবার উচ্চারণ করে—'মুখটা বেশ হাসি হাসি রেখো কিন্তু, আর কথাবার্তায় স্মার্টনেস্ দেখিয়ে—তোমায় আর কি শেখাবো ?' একটু তোয়াজের হাসি হেসে গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকে যায় ধূর্জটি স্ত্রীকে পশ্চাতে করে।

অফিসার ভদ্রলোক বাস্তবিকই ভদ্র।

তাই এদের এই অকারণ আবির্ভাবে না করেন বিরক্তি প্রকাশ, না বা বিস্ময় প্রকাশ। শুধু শান্ত নম্র স্থিরভাবে দুজনকে দেখে নিয়ে বলেন, 'বসুন! বলুন আপনাদের জন্যে কী করতে পারি?'

অলকা তার স্বামীর কথা রাখলো।

অলকা স্মার্ট হলো।

অলকা ধূর্জটির আগেই কথা বলে উঠলো, 'কি করতে পারবেন তা জানবার আগে, আমরা কে সেটা তো জানা দরকার আপনার? পরিচয় তো পান নি এখনো।'

বলার সময় অলকা তা'র সুর্মাটানা চোখ দুটো সমানে নিবদ্ধ করে রাখলো ইনকাম ট্যাক্স অফিসার জয়ন্ত মুখার্জির চোখের দিকে।

কিন্তু ধূর্জটি অস্বস্তি বোধ করলো। ধূর্জটি তার স্ত্রীর কথাবার্তায় চট করে ঠিক এ ধরনের স্মার্টনেস্ আশা করে নি। তাই তাড়াতাড়ি বললো 'এটা কি বলছো? আগেই তো আমার ভিজিটিং কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছি।'

অলকা অন্যায় রকমের বাচাল হাসি হেসে বলে, 'বাঃ, সে তো তোমার! অর্ডার সাপ্লায়ার ডি পি ত্রিপাঠীর। আমার পরিচয়টাও তো দরকার!'

জয়ন্ত মুখার্জি তেমনি শান্তভাবে মৃদু হেসে বলেন, 'দরকার হবে না।'

'হবে না! তার মানে আমি গৌণ?'

অলকার কণ্ঠে হতাশা।

ধূর্জটি আবার বাধা দেয়, 'কী আশ্চর্য, উনি কি বুঝতে পারছেন না?'

'পারছেন?' অলকা আবার তার সেই লিপস্টিকে রক্তিম ঠোঁটের ভঙ্গিমা করে হেসে ওঠে, 'তা হলে তো ভালই। তা' হলে মিস্টার মুখার্জি, যে সব কালোটাকাওলারা ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্যে আপনার কাছে ধর্ণা দিতে আসে, তারা তাদের মিসেসকেও নিয়ে আসে? অভ্যাস আছে আপনার এটা দেখা?'

ধূর্জটি শঙ্কিত হয়।

ধূর্জটি স্তম্ভিত হয়।

এ কী!

অলকা কি হঠাৎ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেল? না অলকা ইচ্ছে করে তার স্বামীকে জব্দ করার জন্যে এই অপদস্থটা করে বসলো!

তাই, তাই!

তাই তখন অমন চট করে রাজী হয়ে গিয়েছিল, তাই অমন ব্যঙ্গ করে বলে উঠেছিল, 'বেনারসী শাড়ি পরতে হবে?' আর তাই এখন—

কী লজ্জা, কী লজ্জা!

অলকার মনে আরো কি আছে কে জানে। ধূর্জটির ওই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন স্ত্রীর। ধূর্জটি মুখ তুলতে পারে না, ধূর্জটি ঘামতে থাকে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে নিষ্পর ভদ্রলোকেরও প্রাণে মমতা রয়েছে ধূর্জটির জন্যে। তাই তিনি তাড়াতাড়ি বলেন, 'দাঁড়ান, কথা পরে হবে, আগে আপনাদের জন্যে একটু চা বলে আসি।'

ভেতরের দরজার পর্দা সরিয়ে ঢুকে যান বাড়ির মধ্যে। তার মানে ধূর্জটিকে অবকাশ দিয়ে যান স্ত্রীকে শাসন করবার। নচেৎ ব্যাচিলার মানুষ বাড়ির মধ্যে গিয়ে আবার কাকে চায়ের কথা বলতে যাবেন? চাকরকে ডেকে বলে দিলেই তো কাজ মিটে যেত।

জয়ন্ত মুখার্জি অদৃশ্য হতেই ধূর্জটি চাপা ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'এটা কি হল?'

অলকা অবিচলিত গলায় প্রতিপ্রশ্ন করে, 'কোনটা?'

'কোনটা?' জিজ্ঞেস করছো? এইভাবে আমায় অপদস্থ করে আমার গালে চুণকালি দিয়ে কী লাভ হল তোমার?'

অলকা খোলা গলায় হেসে উঠে বলে, 'কিছু না! লাভও নেই লোকসানও নেই, শুধু একবার টেস্ট করে দেখছি ভূমিকার বদল হলে কেমন লাগে। ও কাজটা' তো তুমিই করে এসেছো এ যাবৎ, একবার না হয় আমি—'

'আমি! আমি তোমার গালে চুণকালি

ক্ষুব্ধ উত্তেজিত স্বরকে গিলে ফেলতে হয় ধূর্জটির। গৃহকর্তা আবার পর্দা উল্টে ঘরে ঢোকেন।

বলেন, 'কফিতে আপত্তি নেই তো আপনাদের?'

অলকা আবার হেসে ওঠে।

কারণ অলকা প্রতিজ্ঞা করেছে আজ ভূমিকার বদল করবে। তাই হেসে বলে ওঠে, 'না না, কিচ্ছু না। কোনো পানীয়তেই আপত্তি থাকে না আমাদের। আপত্তি রাখলে চলে না। বোঝেনই তো বিজনেসের ব্যাপার। সুবিধে আদায় করতে বিশ বাঁও জলেও নামা যায়।'

হঠাৎ জয়ন্ত মুখার্জিও হেসে ওঠেন।

বলেন, 'এগুলো কিন্তু আপনাদের ব্যক্তিগত কথা!'

এতক্ষণে ধূর্জটি কথা বলবার সুযোগ পায়। ধূর্জটি ভদ্রলোকের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। লোকটার সেন্স আছে, দয়ামায়া আছে।

ধূর্জটি এখন দৈত্যো হাসি হেসে বলে, 'আমাকে চটানো আর কি! ভীষণ নাকি মাথা ধরেছিল, আমিই টেনে আনলাম, ভাবলাম, হাওয়ায় বেরোলে মাথা ধরা ছাড়বে। তা' সেই থেকে রেগে আছেন—'

জয়ন্ত মুখার্জি ওই কুপিতার মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, 'রেগে আছেন তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তবে আশা করছি এটা সাময়িক!'

অলকা আর কিছু বলে না।

অলকা হঠাৎ উঠে পড়ে। ঘরটা ঘুরে বেড়ায়, ঘরের দেয়ালের কাছে কাছে ঘুরে ঘুরে দেয়ালে ঝোলানো ফটোগুলো দেখতে শুরু করে।

এও এক অস্বস্তি।

তুমি গিয়েছ একটা ভদ্রমহিলা। তুমি গাঁইয়ার মত লোকের বাড়ি গিয়ে ঘুরে ঘুরে তার ঘর দেখবে, ফুলদানী দেখবে, জানলার পর্দা দেখবে, দেয়ালের ছবি দেখবে?

তবে ধূর্জটি এই সময় কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে, তাই ধূর্জটি হাতের সিগারেট কেসটা বাড়িয়ে ধরে। বলে, 'নিলে ধন্য হবো।'

মুখার্জি হেসে ওঠেন, 'আপনাকে ধন্য করা আমার ভাগ্যে নেই। খেতে পারি না। শখ করে চেষ্টা করে দেখেছি, ভীষণ কাসি আসে।'

বাঃ বেশ সরল সাদাসিধে ছেলেমানুষের মত কথাবার্তা তো!

ধূর্জটি মোহিত হয়।

ধূর্জটি এখন ভাল করে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে। প্রথমটা ঘরে ঢুকেই যে রকম ভারিক্কি আর গম্ভীর লেগেছিল, তেমন আর লাগছে না এখন। বয়েসও নেহাৎ কম, ধূর্জটির থেকে বয়সে ছোট হবে তো বড় হবে না। রং ফর্সা নয়, কিন্তু চমৎকার একটি সুকুমার মার্জিত শ্রী আছে। কথাবার্তাও অতি মার্জিত, সভ্য।

এই লোকের সামনেই অলকার এত বাচালতা করবার ইচ্ছে হলো, আশ্চর্য!

আর কিছু নয়, ধূর্জটির কপাল!

যাক্ ধূর্জটি যতটা যা পারে তা' করুক। ধূর্জটি বলে ওঠে, 'তাই নাকি? আপনি তো তা' হলে দেখছি নেহাৎ ছেলেমানুষ! আমাদের তো ফার্স্ট ইয়ারে কাসি হতো।'

তাড়াতাড়ি আবার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে নিলো। মনে হলো তুলনা করাটা ভাল হয়নি। তাই বললো, 'আপনার বাড়িটি চমৎকার!'

বলাটার মধ্যে অবশ্য তোয়াজী আবেগ ছাড়া আর কিছু প্রকাশ পেল না।

জয়ন্ত মুখার্জি সবিনয়ে বললেন, 'চমৎকার আর কি! সেকেলে বাড়ি! ঠাকুর্দার আমলের ব্যাপার।'

'তা হোক! সেকেলে মানেই বনেদী! বনেদীর আলাদা মূল্য!'

কথাই ধূর্জটির পেশা।

কথা দিয়েই মাল গছায়। কথায় ওস্তাদ। তাই আবারও বলে, 'ওই যে বাইরে মোটা থাম দেওয়া গাড়িবারান্দা, ওই যে ঘরের মধ্যে সিলিঙের নিচে চওড়া কার্নিশ, এ সবের সৌন্দর্যের ধারেকাছেও লাগে না আধুনিক প্যাটার্নের কংক্রীট গাঁথুনি খাড়া দেওয়ালের বাড়ি।'

জয়ন্ত মুখার্জি হাসেন, 'যা বলেন! তবে ঠাকুর্দা একটা মাথা গোঁজার আশ্রয় রেখে গেছেন তাই নির্ভাবনায় আছি। নইলে—'

অলকা দেয়ালের কাছ থেকে ফিরে আসে। অলকা সোফায় বসে পড়ে ব্যঙ্গের গলায় বলে ওঠে, 'নইলে কি? ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াতে হতো? বাঃ, আপনার তো বেশ বিনয়! ...কেন, আপনি যাদের ট্যাক্স মকুব করে দেন, তারা আপনাকে ঘুষ দেয় না? তাতে তো শুনছি মোটা টাকা পাওয়া যায়।'

ধূর্জটির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।

ধূর্জটির এখন সন্দেহ হয়, সত্যিই হয়তো অলকা প্রকৃতিস্থ নেই।

কিছুদিন থেকেই যেন নেই।

হঠাৎ হঠাৎ কেমন যেন হাসে।

আর আজও তখন কেমন করে যেন বসেছিল। আমি এখানে আসার কথা তুলতে কি রকম ঝট্ করে উঠে পড়লো!

ভয়ে হাত-পা এলিয়ে আসে ধূর্জটির।

'পাগলে কী না কয়!'

কে জানে কী বলবে! নিয়ে সরে পড়তে পারলেই ভাল হতো। কিন্তু এমনি চলে যাবে, না ইসারায় মুখার্জিকে জানিয়ে দিয়ে যাবে মিসেসের মাথার গোলমাল। ওটা একবার জানিয়ে ফেলতে পারলে অবশ্য সাত খুন মাপ!

আড়চোখে মুখার্জির দিকে তাকায়।

আশ্চর্য! সেখানে প্রত্যাশিত রাগটা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বরং যেন কৌতুকের ছাপ। ওকি তাহলে বুঝে ফেলেছে?

তাই সম্ভব।

বুদ্ধিমান লোক, কথাবার্তা শুনেই বুঝে ফেলেছে, মহিলাটি অপ্রকৃতিস্থ। যাক্ তাও ভাল। ইসারায় সেটাই আরো পাকা করে দেওয়া যাবে। তবু আলগাভাবে বলে, 'অলকা, তোমার বোধহয় আজ শরীরটা মোটেই ভাল নেই, এবার তাহলে ওঠা যাক্।'

'ওমা!' অলকা যেন বিস্ময়ে হতবাক। 'এক্ষুনি ওঠা যাক্ কি গো? আমাদের আসল কাজটাই তো হয়নি এখনো! তুমি কি শুধুই বেড়াতে এসেছিলে? না কি বলতে লজ্জা করছে? তা আমিই না হয় তোমার হয়ে বলে দিই---'

অলকা এ সোফা থেকে উঠে গিয়ে জয়ন্ত মুখার্জির কাছাকাছি একটা সোফায় বসে। খুব যেন গভীর কথা বলছে এইভাবে বলে, 'ব্যাপারটা তাহলে শুনুন, কেন আমরা এসেছি। আমার স্বামী এই মিস্টার ত্রিপাঠীর কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য আছে—বুঝলেন? তা' জানেনই তো 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী!' অতএব লক্ষ্মী এসেছেন। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে ওই সরকারি খাজনা। জ্বালাতনের ব্যাপার! মানুষ যে খেটেখুটে, মানে হাত-

পা খাটিয়ে, কি বুদ্ধি খাটিয়ে, দুটো পয়সা ঘরে এনে স্বস্তি পাবে তা নয়। বসে বসে পাই পয়সার হিসেব দাও, সে পয়সা কখন পেলে, কেন পেলে, কিসে পেলে, কে দিলো! কত যে বায়নাক্কা! দু' ড্রয়ারে দু'খানা খাতা রেখেও স্বস্তি নেই. নাড়ী-নক্ষত্র টেনে বার করবে। মানে আপনারাই করবেন।'

ওঃ বদমাইসী!

ধূর্জটি ছটফটিয়ে ওঠে।

ধূর্জটির আর সংশয় থাকে না, পাগলামী টাগলামী কিছু নয়, স্রেফ বদমাইসী! ধূর্জটিকে ডোবাবে বলেই আজ পণ করে এসেছে ও।

যে রকম দেখা যাচ্ছে, তাতে ও যে সহজে উঠবে তা'ও মনে হয় না। কে জানে আরো কী কী ফাঁস করবে! কে বলতে পারে তার বড় বড় ডিলারদের কালো টাকার কথা ও বলে দেবে কি না! দেখে মনে হচ্ছে ও সব করতে পারে!

বসেছে দেখো কাছ ঘেঁসে।

যেন সাতজন্মের চেনা!

অথচ আমি যখন কারো সঙ্গে এক সোফায় বসতে বলি? মানের কোণ্ খসে যায় একেবারে।

কিন্তু ধূর্জটি এখন করে কি!

ধূর্জটি কি এখন চেঁচিয়ে বলে উঠবে, 'মিস্টার মুখার্জি, আমার স্ত্রীর মাথাটা খারাপ। মাঝে মাঝে একটু ভাল থাকেন. কিন্তু মাঝে মাঝে—'

ধূর্জটি বসে থাকতে পারে না. দাঁড়িয়ে ওঠে।

ইত্যবসরে তরুণ অফিসার জয়ন্ত মুখার্জি হেসে বলে ওঠেন, তা' আমাদের তো চাকরীই তাই। উপায় কি?'

'আহা বুঝছেন না' অলকা অন্তরঙ্গ সুরে বলে, 'উপায় একটা বাৎলাতে পারলেই তো আপনারও দু' পয়সা উপায় হয়, আর এনারও উপায়ের কড়ি বাঘে খায় না। বুঝতেই পারছেন বোধহয় এতক্ষণে, মিস্টার ত্রিপাঠী বেশ কয়েক হাজার টাকার হিসেব চেপে ফেলতে চান, তার বদলে আপনাকে কিছু নজরানা দেবেন। মানে, সবই তো আপনার হাতে। ওঁর কেসটা আপনার কাছেই পড়েছে কি না! তা' দিন মশাই, দিন, কাতর হয়ে ছুটে এসেছেন ভদ্রলোক, ওঁর ওই কাতরতার একটা বিহিত করুন।'

জয়ন্ত মুখার্জি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান, বলেন, 'মিস্টার ত্রিপাঠী, আপনার স্ত্রী বোধহয় অসুস্থ।'

মিস্টার ত্রিপাঠী কথাটা লুফে নেয়। তাড়াতাড়ি বলে 'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার! তবে সব সময় থাকে না। এখানে এসেই হঠাৎ দেখছি—'

কথা শেষ করতে দেয় না অলকা, হি হি করে হেসে উঠে বলে, 'বাঃ বাঃ, বেশ তো! দুটো পুরুষমানুষ মিলে আমাকে স্রেফ পাগল বানিয়ে দিচ্ছো! চমৎকার! মিস্টার মুখার্জি, আপনার দয়ামায়ার কথা আমার মনে থাকবে। তা সেই দয়ামায়ার কাছেই নিবেদন, এই হতভাগ্য ত্রিপাঠী সাহেবের খাজনা কিছু মাপ করে দিন। নইলে এমন অভিযানটাই নিষ্ফল।'

ধূর্জটি এবার গম্ভীর হয়।

স্বামী হয়।

বলে, 'অলকা ওঠো! এবার তোমার বাড়ি যাওয়া দরকার। তোমার যে আজ শরীর বেশি খারাপ এটা জানলে মিস্টার মুখার্জিকে এভাবে ব্যস্ত করতে হতো না! যা খুশি তাই বলে তুমি ওঁকেও বিরক্ত করলে, আমাকেও—যাক্ এখন চলো—

কিন্তু বেহায়া অলকা তবু ওঠে না।

বলে, 'ওমা, এক্ষুণি উঠে যাবো? মিস্টার মুখার্জিকে তোমার স্ত্রীর একটু নাচ-টাচ দেখাবে না? নিদেনপক্ষে একটা গানও শোনাবে তো? ঘুষের টাকাও দিলে না, এদিক থেকেও ফাঁকি দেবে? বেচারা ব্যাচিলার মানুষকে ভালমানুষ পেয়ে—'

ধূর্জটি এবার করযোড়ে বলে, 'মিস্টার মুখার্জি, আপনি বোধহয় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বুঝে ফেলেছেন। কাজেই আর আমার বলবার কিছু নেই। অনেক বিরক্ত করা গেল আপনাকে, এবার বিদায়। অলকা আমি নামছি—'

ধূর্জটি সত্যিই ঘরের দরজা থেকে তার সামনের সিঁড়িটায় নামে।

অলকা নিশ্চিন্ত গলায় বলে, 'গাড়িটা তো ওই মোড়ে পার্ক করেছ? সেই ছুতোয় খানিকটা দেরি করবে নিশ্চয়?...নয়তো 'হতভাগা গাড়িটা হঠাৎ কিছুতেই স্টার্ট নিচ্ছিল না' বলে আরো খানিকটা?...সিগারেট কিনতেও যেতে পারো! মানে যা যা করে থাকো তুমি! তা আমিও সেটুকুর মধ্যেই ম্যানেজ করে ফেলতে পারবো। মানে যেমন পেরে থাকি।'

ধূর্জটির চোখ দিয়ে জল এসে যায়।

ধূর্জটি বুঝতে পারে না, কেবলমাত্র স্বামীকে জব্দ করতে এতটা নির্লজ্জ কি করে হতে পারলো অলকা। সম্পূর্ণ একটা অপরিচিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সামনে এভাবে—এ তো শুধু ধূর্জটির গালেই চুণকালি দেওয়া নয়, নিজের গালে-মুখেও যে—

কিন্তু ধূর্জটির ভুল ভাঙে।

ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসার জয়ন্ত মুখার্জি সম্পূর্ণ পরিচিতের ভঙ্গীতে অলকাকে প্রায় ধমক দিয়েই বলে ওঠেন, 'সব কিছুরই একটা সীমা আছে অলকা। মিস্টার ত্রিপাঠীকে যেভাবে উৎপাত করছো তুমি, তা সহ্য করার জন্যে বাহাদুরী দিচ্ছি ওঁকে।'

ধূর্জটির চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে যায়।

ধূর্জটি অলকার সমস্ত বাচালতা আর সমস্ত অসভ্যতার অর্থ খুঁজে পায়।

পরিচিত।

পূর্বপরিচিত।

আর 'বিশেষ ধরনে'রই পরিচিত। নচেৎ যার তার সামনে অলকা এভাবে বাচালতা করতে পারতো না।

*   *   *   *

পর্দা আরো সরে যাচ্ছে।…ওঃ তাই অলকা নাম-ঠিকানা দেখেই এককথায় রাজী হয়েছিল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে ওঠে নি, 'আমি পারবো না! আমি পারছি না।'

পুরানো প্রেমিক!

তার সামনে দেখিয়ে মজা পেলো, ছাখো আমি আমার স্বামীটাকে কী রকম বাঁদর নাচ নাচাই।

ধূর্জটি এবার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, 'ওঃ পূর্বপরিচিত! তা' আমাকে সেটা জানালেও কোনো ক্ষতি ছিল না অলকা!'

হ্যাঁ, অলকাকে উদ্দেশ করেই বলে।

মিস্টার মুখার্জিকেও বলে উঠতে পারতো, 'খুব তো ভদ্রতা, খুব তো পালিশ! বলি মশাই, এই সত্য গোপনটা কি খুব পলিশড্ ভদ্রলোকের কাজ হয়েছে?'

বললো না, কারণ এখনো ওই পাজিটার কাছেই ধূর্জটি ত্রিপাঠীর টিকি বাঁধা। ওকে চটালে 'দাঁড়িয়ে মৃত্যু'!

তাই স্ত্রীকেই বলে—ধারালো ব্যাঙ্গের ছুরি বিঁধে বিঁধে! 'না কোনো ক্ষতিই ছিল না। বরং আমার একটু কাজ বাঁচতো, আমাকে আসতেই হতো না। তুমি নিজেই এসে তোমার স্বামীর অসুবিধের ব্যাপারটা ম্যানেজ করে নিতে পারতে।… মিস্টার মুখার্জি, মিথ্যে বলবো না, বাস্তবিকই আমি আপনার কাছে একটু সুবিধের চেষ্টাতেই এসেছিলাম। কিন্তু যদি জানা থাকতো এত সুবিধে রয়েছে, আপনি আমার স্ত্রীর বাল্যবন্ধু, তা' হলে তো নাকে তেল দিয়ে ঘুমোতাম!…আমি ভেবে মরছি অলকার হঠাৎ মাথাটাই বেশি বিগড়ে গেল না কি? স্রেফ ঠাট্টা-তামাসার ব্যাপার চলছিল বুঝতেই পারি নি। খুব ঠকালেন আমাকে দুই বন্ধুতে মিলে। আচ্ছা অলকা, তুমি যদি চাও আরো কিছুক্ষণ গল্পসল্প করতে পারো, আমি বরং—'

জয়ন্ত মুখার্জি তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, 'আমি কিন্তু ওই এসে যাওয়া চা-টার সদ্ব্যবহার চাইছি। পালালে চলবে না।…এই—ওঃ চা নয়, কফি এনেছিস বুঝি? তাই হবে।' কফি-বাহক চাকরটার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বলেন, 'রাখ্ নামিয়ে রাখ্। 'কাজু' এনেছিস? ঠিক আছে। আসুন মিস্টার ত্রিপাঠী—'

তিনজনে মুখোমুখি বসে গেল টেবিল ঘিরে।

অলকা সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ।

হাস্যনে পুতুলের মুখে আদুরে গলায় বলে, 'তুমি কিন্তু ভারি ইয়ে জয়ন্ত, কেমন মজার একটি নাটক ফেঁদেছিলাম, নায়িকাকে পাগলিনী করে দিব্যি জমিয়েও এনেছিলাম, মাঝখান থেকে তুমি স্রেফ 'উইংস'টাই ছিঁড়ে বসলে। ভেতরের সব কিছু দৃশ্যমান হয়ে গেলে কি আর নাটক জমে?'

জয়ন্ত আস্তে বলে, 'তোমার মজাটা একটু বেশি ভারী হয়ে যাচ্ছিল অলকা, পরিপাক করা শক্ত হচ্ছিল।'

'শক্ত হচ্ছিল? ও—' অলকা টানা চোখ তুলে টানা টানা গলায় বলে 'কার পাক-যন্ত্রের পক্ষে? তোমার? না মিস্টার ত্রিপাঠীর?'

জয়ন্ত দৃঢ় গলায় বলে, 'উভয়ের পক্ষেই। কারণ নির্যাতিত পুরুষ হিসেবে আমরা দু'জনেই স্বজাতি।'

অলকা সোফার পিঠে এলিয়ে পড়ে।

অলকা করুণ করুণ গলায় বলে, 'স্ব-জাতি! তবে তো আমার কোথাও কিছু ভরসা রইল না। যাক্ গে মরুক গে, আমার আবার ভরসা! বরং তোমার কথা শুনি, বল এতদিন কী করলে?'

ধূর্জটি চোখ কোঁচকায়।

ধূর্জটি মনে মনে ব্যঙ্গের হাসি হাসে। ওঃ, 'এতদিনে'র মধ্যে একদিনও দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে নি, সেটাই আমার কাছে প্রমাণিত করতে চাইছো?

জয়ন্ত শান্ত গলায় উত্তর দেয়, 'কী করলাম, কী করছি, সে তো দেখতেই পাচ্ছো!'

'আহা এটা তো চাকরীর ব্যাপার! বাড়ির খবর কি? মা বাবা ফুলটুশি—'

'মা কাশীতে, বাবা নেই, ফুলটুশি শ্বশুরবাড়ি।'

'ওরে ব্যস্! কী চটপটে জবাব! যেন মিলিটারী।' অলকা হেসে ওঠে, 'তা আর একটা খবর? ব্যাচিলার কেন?'

'কেন? এটাও যদি একটা প্রশ্ন হয় তো বলতে হয়। বিয়ে করি নি বলে।'

অলকা কৃত্রিম আক্ষেপের গলায় বলে, 'বানিয়ে বানিয়েও তো বলতে পারতে 'ব্যাচিলার রয়ে গেলাম তোমার জন্যে!' তাহলে বরের কাছে আমার মুখটা একটু উজ্জ্বল হতো!'

জয়ন্ত এবার সত্যি গম্ভীর হয়।

বলে, 'অলকা, উনি তোমার স্বামী, ওঁকে তুমি তোমার নিজের এলাকায় মারতে পারো কাটতে পারো। কিন্তু ওঁর কাছে আমি এবং আমার কাছে উনি, একেবারে এই দণ্ডে পরিচিত দুই ভদ্রলোক মাত্র। কিন্তু তুমি কিছুতেই সেটা মনে রাখছো না।'

'মনে রাখছি না? বল কি গো? খুব মনে রাখছি। নইলে হয়তো—'তোমরা দু'জনে মিলে আমায় পাগল বানিয়েছো' বলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে ফেলতাম!…যাক্ তা' হলে উঠি। ত্রিপাঠী চল, কফি কাজু সব তো খাওয়া হলো।'

অলকা উঠে পড়ে, অলকা চৌকাঠের বাইরে নেমে আসে। ত্রিপাঠীকে বলে, 'আরে, তোমার গাড়িটাকে সত্যিই মোড়ের মাথায় রেখে এসেছো? ইচ্ছে করেই বোধহয়? যাতে সেই অবকাশটুকু অন্তত নিতে পারা যেতো, এই তো?…কিন্তু দেখছো তো লোকটা কি চড়া? বাল্যবান্ধবীকে পর্যন্ত দেখে বিচলিত হলো না। তার মানে দুর্বলতাশূন্য, তার মানে আশা নেই। তবু এত তোড়জোড় করে আসাটা তোমার বিফলে যাবে ত্রিপাঠী?…দেখো জয়ন্ত, যদি লোকটার জন্যে কিছু করতে পারো? দেখছো তো—বেচারী কী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কী ম্লান? দেখো বাপু, বলে দিচ্ছি বলে যেন ক্ষেপে যেও না।…অনেক দিন পরে—দেখা হয়ে খুব ভালো লাগলো জয়ন্ত! একদিন এসো না, এক সঙ্গে চা খাওয়া যাবে।'

ধূর্জটি নেমে গেছে। এগিয়ে যাচ্ছে।

জয়ন্ত সেদিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলে, 'শোধ দিতে চাইছো? কফির শোধ?'

'শোধ?' অলকার সুর্মাটা কখন মুছে গেছে কে জানে। অলকা তার সুর্মাহীন শুধু চোখ দুটো উঁচু করে বলে, 'নাঃ, শোধ আর দিতে পারলাম কৈ? কাউকেই পারলাম না।'

নেমে যায়।

এগিয়ে যায় ধূর্জটির ছায়া ধরে।

অনেকক্ষণ গাড়ি চালাবার পর ধূর্জটি বলে ওঠে, 'আমার মত একটা মশা-মাছিকে মারতে এতটা আয়োজন না করলেও চলতো! এ যেন মশা মারতে কামান দাগা হলো।'

আশ্চর্য মুখরা অলকা, বাচাল অলকা, বিদ্রোহী অলকা হঠাৎ একেবারে শান্ত হয়ে গেল কী করে?

অলকা ধূর্জটির কথার উত্তর দিল না, বসে রইল জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে।

অলকা কি ভাবছে, সত্যিই এতটা প্রয়োজন ছিল না।

না কি ভাবছে, ছিল, ছিল প্রয়োজন। কামানটা না দাগলে বোঝা যেত না উই-ঢিবির নিচে বাল্মীকি টিকে থেকে রামনাম জপ করছে কি না।

তা' মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না।

হয়তো অলকা অতীতে হারিয়ে গেছে। হয়তো অলকা সেই অতীতের সিন্দুক থেকে একটির পর একটি ছবি তুলে তুলে দেখছে।

চলন্ত গাড়ি থেকে এমন নির্জনভূমি আর কোথায় আছে?

ধূর্জটি আবার এক সময় বলে ওঠে, দেখালে বটে একখানা! কোনো স্ত্রী যে শুধু

স্বামীকে জব্দ করতে এমন জঘন্যভাবে পাগলামীর ভান করতে পারে, সেটা কেবল আমার কেন, বোধহয় সকলের কাছেই কল্পনার অতীত।'

অলকা এতক্ষণে কথা বলে।

বলে, 'তাই ভাবছি। আবার ভাবছি ভান কি না।'

'থাক্। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টাটা শুধু হাস্যকরই অলকা।'

'হাস্যকর? থাক্ তবে দেখাব না।'

আবার চলতে থাকে গাড়ি।

অলকা ত্রিপাঠীর বহুবিধ প্রসাধনের সৌরভ গাড়ির মধ্যেকার বাতাসকে ভারী করে তোলে। অলকা ত্রিপাঠীর কবরী জড়ানো যূঁইয়ের মালাটা যে গাড়িতে ওঠার সময় রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল, তা বোঝাও যাচ্ছে না, তার শাড়িতে জামাতে সর্বাঙ্গে যূঁইয়ের গন্ধটা এত লেগে আছে।

কে জানে মালাটা সেখানেই পড়ে আছে কি না এখনো, অথবা কেউ অবাক হয়ে কুড়িয়ে নিয়েছে। না কি বহুলোকের পায়ে পায়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সে মালা।

আশ্চর্য, পড়ে গেল কি করে!

অলকা যে কত সময় নৃত্যভঙ্গিমায় নিজেকে রেণু রেণু করে উড়িয়ে দেয়, কই খোঁপার মালা তো খসে পড়ে না?

হয় না বলেই হয়তো এতদিন টের পায় নি অলকা, খসে পড়লেও সৌরভটা থেকে যায়।

কিন্তু ধূর্জটি ত্রিপাঠীর চেতনায় এখন কোনো সৌরভ সার মোহ বিস্তার করছে না। ধূর্জটি ত্রিপাঠীর কাছে সমস্ত ঘটনা সমেত এই সন্ধ্যাটা যেন একটা পাথরের ভার হয়ে চেপে বসছে।

অনেকক্ষণ পরে আবার কথা কয়ে ওঠে ধূর্জটি, বলে, 'নাঃ, সমস্ত জিনিসটাই 'ম্যাসাকার' হয়ে গেল! এ যা দেখছি, খাল কেটে কুমীর আনা হলো! ট্যাক্স অফিসার চায়ের নেমন্তন্ন খেতে এসে, বাড়ির মালমশলা আর আসবাবপত্তরের হিসেব করতে বসবে, আর তারপর আদাজল খেয়ে লাগবে! সম্পর্কটি তো ভালই বেরোলো! তুমিও অবিশ্যি দু'ভ্রুয়ারের দু'টো খাতাই তাকে দেখিয়ে দেবার তালে থাকবে।'

'এই ছাখো—' অলকা হঠাৎ আগের মত হেসে ওঠে। 'আমি তো তবু সাজা পাগল, তুমি যে দেখছি সত্যি পাগলের মত কথা বলছো। মেয়েমানুষ কখন তার বাড়ি গাড়ি, টাকাকড়ি, প্রতিষ্ঠা পরিচয়, স্বামী সংসারের মোহ ত্যাগ করে সব কিছু তছনছ করতে পারে? ওই সামলাতে সামলাতেই তো জীবন গেল তার। দেখো সময় বুঝে ঠিকই খাতা সামলাবো।'

'আর সামলানো!'

ধূর্জটি মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'সে যা করবে তা বুঝতেই পারছি। দেবে সর্বস্বান্ত করে।'

অলকা আবার হেসে ওঠে, 'মাথা খারাপ! দেখো ওদের কবল থেকে জলের মত বেরিয়ে আসবে তুমি। আমার যাওয়াটা কি বানের জলে ভেসে যাবে?...একেই তো ব্যাচিলারদের সুন্দরী তরুণীদের প্রতি দুর্বলতা! তার ওপর আবার বাল্যবান্ধবী!'

'ওঃ তাই নাকি? এত বিশ্বাস?'

ধূর্জটির কণ্ঠে তিক্ত অবিশ্বাস।

কিন্তু অলকার কণ্ঠ মধুর। অলকার কণ্ঠ গভীর আশ্বাসবাহী। 'দেখো!'

হ্যাঁ, অলকা দেখেছে। দেখেছে মালাটা খসে পড়লেও সৌরভটা লেগে থাকে।

তেপান্তরের মাঠ

অনেক বাধা-বিঘ্ন পার করে—

সবে কলমটি খুলে বসেছি, দরজার বাইরে একটুকরো ছায়া পড়ল পর্দার নিচেয়। তার সঙ্গে চাপা গলার একটু শব্দ।

পরিচিত শব্দ।

ঘুরে গেল মাথা, বুঝলাম হয়ে গেল এখনকার মত লেখা। কলমের মাথায় আবার টুপি পরিয়ে নিঃশব্দে একটি হতাশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। নিয়তির বাদ সাধা আর কি!

কিছুদিন ধরেই দেখছি কলমের সঙ্গে ওই নিয়তির বেশ একটি অলক্ষিত লড়াই চলছে। কলম কাগজ এক হয়েছে কি বাধা। অথচ বড় কিছু নয়, ছোট ছোট বাধা। এই কেউ বেড়াতে এল, কেউ লেখার আবেদন করতে এল, পাড়ার ছেলেরা 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে' 'ডোনেশান' চাইতে এল, (আমাদের পাড়ায় ওরা আর চাঁদা বলে না, বলে ডোনেশান।), রাস্তায় কোন হুজুগ উঠল, কেবল কেবল টেলিফোন বাজতে শুরু করল, যেন কে কোথায় বসে আছে ছোট ছুরি- দিয়ে কুচ কুচ করে কেটে কেটে দিনটাকে ছোট করে ফেলবার তালে। ফলে—ছেলেবেলার খেলার মত দেখছি—হঠাৎ কখন সময়টা যেন 'তেলি ফস্‌কে গেলি' বলে ছুয়ো দিয়ে চলে গেল।

অথচ সকালে ঘুম ভেঙে উঠে প্রতিদিনই সামনে শুয়ে পড়ে থাকা সদ্য ভূমিষ্ঠ দিনটাকে কত লম্বা লাগে। আস্ত ওই দিনটা যেন রীতিমত একটা প্রাপ্তি, যেন হাতের মুঠোয় এসে পড়া একখানা বড় নোট, ভাঙিয়ে অনেক কিছু করে নেওয়া যাবে।

পুরো আস্ত একটা দিন, কম নাকি?

নষ্ট না করলে কত কাজ উদ্ধার করে ফেলা যায়। তাই প্রতিদিনই সকালে উঠে সংকল্পে দৃঢ় হই, নাঃ, আজ আর সময় নষ্ট করা নয়। প্রথম ঘণ্টাটি থেকে কাজে লাগাতে হবে।

ঠিক করে ফেলি এক নম্বর কাজ হবে জমিয়ে জমিয়ে রাখা দরকারী চিঠিপত্রগুলোর জবাব দেওয়া, তারপর জমিয়ে রাখা টুকটাক কাজগুলো সেরে নেওয়া। যেমন—ভাগ্নীর এক বান্ধবীর কতদিন যেন আগে রেখে যাওয়া অটোগ্রাফ্‌ খাতাখানায় 'ভাল করে কিছু লিখে' দেওয়া, পাড়ার কুঁচো ছেলেদের হাতে-লেখা পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় একটু 'শুভেচ্ছাবাণী' এঁকে দেওয়া, পাড়ার মাসিমার নাতনীর বিয়েতে তাঁর বকলমে একটি 'প্রীতি-উপহার' খাড়া করে দেওয়া, অথবা এপাড়া ওপাড়া সে-পাড়া যে-কোন পাড়ার যে-কোন অনুষ্ঠান বাবদ প্রকাশিতব্য স্যুভেনিরে যাহোক একটি গল্প লিখে দেওয়া।

এগুলি খুবই তুচ্ছ কাজ, যারা প্রত্যাশা নিয়ে থাকে, তারা ধারণাই করতে পারে না ওর জন্যে সময় লাগে। অতএব ওই তুচ্ছ ব্যাপার থেকেই কত সময় বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটে, আত্মীয়-বিরাগ ঘটে, নাম খারাপ হয়। একখানা চিঠির যথাসময়ে উত্তর না দেওয়ায় আমার সম্পর্কে অপর জনের ধারণা পাল্টে যাওয়ার নজীরও আছে বৈকি কিছু কিছু।

কাজেই ত্রুটিমুক্ত হবার চেষ্টা করার সদিচ্ছায় রোজই ঠিক করে ফেলি—অন্য কোন লেখায় হাত দেবার আগে এগুলো মিটিয়ে ফেলব।

তারপর ?

তারপর কিছুই হয়ে ওঠে না। দেখি হাতের সেই বড নোটখানা হিসেবের খাতায় স্রেফ অপচয়ের অঙ্ক টেনে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে।

বাধা তো ছিলই, আছেই, কিছুদিন থেকে এই আর একটি জুটেছে, ওই দরজায় ছায়া।

পাশের ফ্ল্যাটের ভাড়াটেদের বৌ।

যখন-তখন তার বছর আড়াই তিনেকের বিচ্ছু হেন ছেলেটিকে আমার আছে গছিয়ে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে হাওয়া হয়ে যাবে।

এসে প্রথমে অবশ্য খুবই কুন্ঠিত গলায় বলবে, 'আজ আপনার খুব বেশী কাজ আছে নাকি ?'

কাজ যে রোজই খুব বেশীই থাকে সে কথা তো আর মুখ ফুটে বলা যায় না। কাজেই বলে উঠতে হয়, 'না না, ও এমন কিছু নয়, বল কী খবর ?'

'না, মানে একটু বেরোচ্ছিলাম, ইয়ে রাণা একটু আপনার কাছে থাকত। যদি হঠাৎ বিষ্টি টিষ্টি এসে যায়—'

খুব রোদের দিন হলে বলে, 'বাইরে এত রোদ, ওকে নিয়ে বেরোতে—মানে এত ঘেমে যায়—'

মোটকথা ওদের যা কিছু কাজকর্ম, কেনাকাটা, সিনেমা দেখা ইত্যাদির ব্যাপারে ওই দামাল ছেলেটা বেশ বেপোটে ফেলে ওদের। অথচ 'গুরুজন, আত্মীয়জন, কর্তব্য, সামাজিকতা' ইত্যাদির বেড়াজাল থেকে পালিয়ে এসে ছোট্ট নীড়ের মধ্যেকার যুগল জীবনের ইচ্ছে বাসনা শখ সাধগুলি তো আছেই। তাই রবিবার হলেই দুপুরে তিনটে থেকে ছ'টা ওদের খুব দরকারী কাজ পড়ে যায়, অন্য অন্য দিন সন্ধ্যের দু-এক ঘন্টা।

এছাড়া—বৌটি একা থাকাকালীন অবস্থায় যখন-তখন একটু ছেড়ে দিয়ে যাওয়া এও আছেই। মোটের মাথায় আমার মাথায় যখন-তখন আকাশ ভাঙছেই।

তবু ভদ্রতা বলে কথা—তাই ওই ছায়া আর শব্দকে লক্ষ্য করে বলতেই হয়, 'কে রাণাবাবু নাকি ? আসুন। আসুন।'

রাণার মা সাহস করে ঢুকে পড়ে। যথারীতি কুন্ঠিত গলায় বলে, 'খুব ব্যস্ত আছেন, না ?'

এক্ষেত্রে তো আর বলা যায় না, 'হ্যাঁ ম্যাডাম, খুব ব্যস্ত আছি।' যা বলা যায়, যা বলা সভ্যতা, তাই বলি। বলি—'না না, ও পরে করলেও চলবে—'

রাণার মা বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা ছেলেটাকে হাত ধরে টেনে এনে ঘরে ভরে দিয়ে বলে, 'চুপ করে বসে থাকবে, বুঝলে? জ্বালাতন করবে না। আমি এক্ষুনি আসছি। হঠাৎ একটু কাজ পড়ে গিয়ে—'

বলা বাহুল্য, ওই 'এক্ষুনি' আসার স্তোক-বাক্যটি ও শুধু ছেলেকেই দিল না, আমাকেও দিল। কিন্তু আমি তো আর তিন বছরের শিশু নই, আমার ওই 'এক্ষুনি'র স্বরূপটি বুঝতে দেরী লাগে না। আমি জানি এটা রাণার মা-র গানের ক্লাসের সময়। বুধবারের সন্ধ্যায় আর শনিবারের বিকেলে ও গানের স্কুলে যায়। শ্বশুরবাড়ির গণ্ডী থেকে পালিয়ে এসে নিজের জীবনকে বিকশিত করার একটি জানলা ও খুলেছে, কিন্তু আমার কাছে সেটি চেপে যায়। হয়তো লজ্জাতেই যায়।

আসলে বোকা আছে মেয়েটা, তাই কেবলই 'হঠাৎ কাজ পড়ে যাওয়ার দোহাই দেয়। সপ্তাহে বিশেষ দুটি দিনে, বিশেষ একটি সময়ে ওই 'কাজ পড়ে যাওয়া'টা যে বেশ হাস্যকর সেটা বেচারী খেয়াল করে না।

রাণাকে যে ঘরের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল, সেটা ওর মা-র কৌশলে। মা ওর হাতে বড একখানা চকোলেট ধরিয়ে দিয়েছিল। এখন টেনে আনতে দেখা গেল বহির্বিশ্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত চিত্তে সে ওই বস্তুটি লেহন করে চলেছে।

মা বলল, 'এই দুষ্টু, খবরদার গোলমাল করবি না। করবি না তো? তাহলে কিন্তু জিনিস আনব না।'

প্রতিদিনই ওই 'জিনিসে'র প্রলোভন দেখিয়েই মাকে বেরোতে হয়, কিন্তু, রাণা যে মা-র আনীত জিনিস সম্পর্কে খুব উৎসাহী তা নয়, কারণ 'জিনিসের' দৌড় তার জানা হয়ে গেছে।

তবু নির্লিপ্ত গালাতেই বলল, 'কী আনবে?'

'সে দেখো না, খুব মজার জিনিস—'

আরো কিছু বলত, এই সময় ফোনটা বেজে উঠল, অতএব আমাকে উঠে গিয়ে ধরতেই হল, আর ওর সামনেই বলে চলতে হল, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে বইকি! ভুলে যাব? কী বলছেন? ব্যাপার কি হয়েছে জানেন, সময় মোটে পাচ্ছি না—মানে—ইয়ে—লেখাটা ঠিক যেন আসছেও না। যাই হোক, সামনেয় সোমবার নিশ্চয়ই—'

ফোন রাখতেই রাণার মা কুণ্ঠিত গলায় বলে, 'আপনাকে খুব জ্বালাতন করা হচ্ছে, কত কাজের ক্ষতি হচ্ছে—'

অগত্যাই ব্যস্ত হয়ে বলতে হয়, 'না না, রাণাবাবু আমার কোন অসুবিধে ঘটায় না, ও খেলা করে, আমি লিখি—'

তাহা মিথ্যে কথাই বলি।

ওই রাণা নামের ছেলেটিকে নিয়ে লিখতে পারে এমন লেখক এখনো জন্মেছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু মিথ্যা দিয়েই তো সৌন্দর্যের প্রাসাদ গড়া।

মিথ্যা দিয়েই সভ্যতার বনেদ গাঁথা।

রাণার মা-র দেরী হয়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি চলে গেল।

আমি টেবিলে জমিয়ে রাখা কাজের দিকে একবার করুণ নেত্রে তাকালাম, তারপর খুব মোলায়েম গলায় বললাম, 'তুমি খেলা করবে, আমি লিখব, কেমন ?'

রাণা অমায়িক গলায় বলল, 'আচ্ছা।'

বিমুগ্ধ আমি কয়েক সেকেণ্ড ওই বাধ্য মুখটির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'লক্ষীছেলে। তবে আমি লিখি ?'

ও বলল, 'লক্ষী ছেলে নয়, ভাল ছেলে। মেয়েরা লক্ষীমেয়ে হয়। ছেলেরা লক্ষীছেলে হয় না।'

ওর ব্যাকরণ-জ্ঞান দেখে চমৎকৃত আমি বললাম, 'কে বলেছে একথা ?'

'কেউ বলেনি, আমি নিজেই বলেছি।'

'বাঃ, তুমি তো খুব বুদ্ধিমান ছেলে! আচ্ছা—'

কলমটা তুলে নিয়ে যে পোস্টকার্ডটায় তারিখ মারছিলাম, সেটা টেনে নিই।

যদি ওর ওই ক্ষণিক সুমতির অবকাশে দু'একটা চিঠি অন্ততঃ লিখে ফেলতে পারি।

সম্বোধনটা কী হওয়া উচিত ভাবছি—

মাননীয়েষু ? প্রীতিভাজনেষু ? সবিনয় নিবেদন ?

হঠাৎ একটি সবিনয় নিবেদন কানে এলো—'চকোলেট খাওয়া হয়ে গেছে। হাত ধুইয়ে দাও।'

'ও আচ্ছা! এক্ষুণি খাওয়া হয়ে গেল ? (দূর ছাই 'সবিনয় নিবেদন'ই ভাল।) রাণাবাবু তো খুব তাড়াতাড়ি খেতে—'

'হাত ধুইয়ে দাও শীগগির!'

'এই যে দিচ্ছি—'

'চেয়ার নড়াব বলে দিচ্ছি—' বলে সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা কাজে পরিণত করতে শুরু করে।

তিন বছরের শিশু হলে কি হয়, গায়ের জোরটি কম নয়। চেয়ার নড়াতে না পারুক, কলম নড়িয়ে ছাড়বে।

তাড়াতাড়ি উঠে কাচের গ্লাসে জল এনে ওর হাতের সংস্কার সাধন করি। সঙ্গে সঙ্গে বলে 'মুছিয়ে দাও।…বিচ্ছিরি রুমাল দিয়ে নয়, ফর্সা রুমাল দিয়ে।'

আদেশ পালন করে ওর বরাদ্দ একটি কাগজ-পেনসিল এগিয়ে দিয়ে বলি, 'এইবার আমিও লিখি, তুমিও লেখ, কেমন?'

'জল খাব।'

'এ মা সে কী! চকোলেট খেয়ে কি জল খেতে আছে?'

'খেতে আছে। জল দাও।'

অগত্যাই আবার উঠতে হল।

রাণা গম্ভীরভাবে বলল, 'আমি ছবি আঁকব—'

'খুব ভাল কথা! আঁকো।'

পোস্টকার্ডটা টেনে নিলাম—

'সবিনয় নিবেদন,

কয়েকদিন হল ('কয়েকদিন' শব্দটা বেশ নিরাপদ, 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' ভাবটা থাকে) আপনার পত্র পেয়েছি। আপনি যে গল্পটি হিন্দীতে অনুবাদ করতে ইচ্ছুক—'

'পেনসিলের শীস ভেঙে গেছে, বেড়ে দাও।'

'এই মাটি করেছে। শীস ভেঙে ফেললে? এই দেখো, আমি শীস ভাঙছি না। ...সেই গল্পটি—'

'ভাঙবে কেন? তোমার তো পেন! আমায় তাহলে পেনটা দাও! দাও শীগগির—'

'সর্বনাশ! এ পেন ছোটদের নিতে আছে নাকি? এতো বড়দের।'

'আমি তো বড়ই হয়েছি। পেনটা দাও।'

'বলার সঙ্গে সঙ্গেই করা' এটাই রাণার নীতি, তাই হঠাৎ ফস্ করে কলমটা টেনে নিয়ে মুঠোয় বাগিয়ে ধরে।

কাড়তে গেলেও তো কলমের বারোটা বেজে যাবে, নির্ঘাত ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

অতএব গাম্ভীর্য দেখাই, 'রাণা কলম দিয়ে দাও—'

'আগে ছবিটা এঁকে নিই। আমি একটা বুড়ো আঁকব।'

'রাণা, আমি রেগে যাচ্ছি—'

'কই, তোমার মুখ লাল হচ্ছে না তো? মা রেগে গেলে মুখ লাল হয়ে যায়।'

'সে কী? আমি তো দেখতে পাই না।'

'তুমি কি করে পাবে? মা তো শুধু বাবার সঙ্গে রাগ করে।'

এই সংবাদ-সরবরাহকারীকে আর নাড়াচাড়া করতে সাহস হয় না, প্রসঙ্গকে অন্য খাতে নিয়ে যাই।

'রাণা তুমি কবে ইস্কুলে ভর্তি হবে?'

'কাল।' অবলীলাতেই বলে।

'আরে তাই বুঝি? কে নিয়ে যাবে?'

'কেউ না, আমি নিজেই।'

'ওঃ, তাহলে তো ভালই। আচ্ছা এবার কলমটা দেখি—'

'এই তো দেখতে পাচ্ছ।'

রাণা কলমটা এক ইঞ্চি তুলে ধরে। অর্থাৎ দেখার সুবিধে করে দেয়।

'বাঃ, আমি লিখব না বুঝি?'

'তুমি পেনসিলটা নাও না!'

হতাশ হয়ে পোস্টকার্ডটা সরিয়ে রাখি। এখন কলমটা উদ্ধার করা দরকার।

'রাণা, পেনটায় কালি ভরতে হবে যে—'

'এই তো কালি রয়েছে। দেখছ না আঁকছি।'

'কী আঁকলে দেখি?'

'এই যে বুড়ো।'

'বাঃ বাঃ'! আচ্ছা দাও তো বুড়োর চোখে একটা চশমা এঁকে দিই।'

'আমি আঁকতে পারি।'

'আচ্ছা রাণা, তোমার বাবার পেন আছে?'

'দুটো আছে।'

'আরে তাই নাকি? তাহলে তো তুমি বাবার একটা নিয়ে নিতে পারো।'

'মা বকবে।'

'ও! মাকে তুমি খুব ভয় কর বুঝি?'

'মা চোখ গোল করলে ভয় করি।'

'তাই বুঝি? বেশ আমিও চোখ গোল করি?'

চেষ্টা করতে গেলাম।

রাণা হেসে উঠল, 'তোমায় দেখে আমার হাসি পাচ্ছে।'

'কেন হাসি পাচ্ছে? আমিও তো চোখ গোল করছি।'

'তোমার চোখ গোল হয় না।'

'কই, বুড়োর চোখটা কী রকম আঁকলে দেখি—একি, এই টুকুন চোখ কেন?'

'বুড়োদের ওই রকমই হয়।'

খুব আত্মস্থ হয়েই বলে রাণা, 'তুমি যখন বুড়ো হয়ে যাবে, তোমার চোখও এই এ্যাত্তো-টুকুনই হয়ে যাবে।'

'আর তুমি যখন বুড়ো হয়ে যাবে?'

রাণা একবার তার কাঁচের গুলির মত চকচকে চোখ দুটো তুলে বলল, 'সে তো অনেকদিন পরে।'

এরপর আর কি কথা আছে?

আবার ভোলাতে চেষ্টা করি। 'আমার কলমটা দেবে না বুঝি?'

'বুড়োর চুলটা হয়ে গেলে দেব।'

অতএব অপেক্ষা করা ছাড়া গতি কি?

তা কথা রাখল রাণা, শেষ রেখাটি পর্যন্ত এঁকে নিয়ে ফেরত দিল, তবে সেই সঙ্গে মন্তব্য করল, 'তুমি বড্ড জ্বালাতন কর।'

আমিও শোধ নিতে ছাড়ি না, বলি 'আর তুমি বুঝি আমায় জ্বালাতন কর না?'

'কই? কই জ্বালাতন করি?' রাণা রীতিমত জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে, 'কখন জ্বালাতন করলাম?'

'এই যে কলম নিলে!'

'বারে! বেশ মজার আছ। আমি বুঝি ছবি আঁকব না?'

'আঁকবে! নিশ্চয় আঁকবে, পেনসিল দিয়ে আঁকবে।'

'পেনসিল বিচ্ছিরি!'

বলে রাণা আমার হাঁটু ধরে লম্ফ দিয়ে কোলের উপর উঠে জাঁকিয়ে বসে বলে, 'কলমে কালি ভর তো, দেখি কী করে ভরো।'

'ও পরে ভরব।'

'তুমি যে বললে, এখন ভরবে?'

শিশুর কাছে মিথ্যা-ভাষণে নাকি পাপ নেই—শাস্ত্রের উক্তি। কিন্তু লজ্জাবোধটা? সেটাকে তো ঠিক তাড়ানো যায় না। তবু আবার সেই মিথ্যাই বলা হয়ে যায়, 'ও ভুলে ভুলে বলেছিলাম।'

'তুমি এত ভুল কথা বল কেন?'

'বোকা তো, তাই।'

রাণা হঠাৎ সজোরে হেসে ওঠে। বোঝা যায় কথাটা ওর মনঃপূত হয়েছে।

হাসির পর বলে, 'বাবাও বোকা।'

'তাই নাকি? কে বলল?'

উত্তরটা অবশ্যই প্রত্যাশিত। রাণা গম্ভীর ভাবে বলল, 'মা।'

'আর মা? মা বুঝি বোকা নয়?'

ব্যাপারটা কি একটু আড়ি পাতার মত হয়ে গেল? হয়তো! তবু বলেই ফেললাম।

'এ মা, মা কেন বোকা হতে যাবে?'

তা বটে।

কেনই বা হতে যাবে?

আমি সত্যিই বোকা!

টেবিলের উপরের জিনিসগুলি সবই রাণার মুখস্থ, তবু রাণা নতুন উৎসাহে বলে, 'এটা আলপিন?'

'হ্যাঁ।'

'এটা দিয়ে তুমি সেলাই কর, না শুধু কাগজ ফুটো কর?'

'হুঁ।'

'এটা কিলিপ?'

'হুঁ।'

'তুমি কিলিপ চুলে লাগাও, না শুধু কাগজে লাগাও?'

'হুঁ।'

'মা চুলে কিলিপ লাগায়।'

'সে তো অন্য কিলিপ।'

'হুঁ। লম্বা। সেইটা দিয়ে মা আমায় কান চুলকে ছায়। তুমি কি দিয়ে কান চুলকোও?'

'আমি কান চুলকোই না, শুধু মাথা চুলকোই।'

রাণা আবার হেসে ওঠে, 'শুধু মাথা চুলকোও? কিলিপ দিয়ে?'

'না, আঙুল দিয়ে।'

'ও: !'

রাণা এবার অন্য লক্ষ্যে পৌছয়, 'তুমি চিঠি লিখছ? কাকে চিঠি লিখছ?

'ওই একটা লোককে।'

'একটা লোককে? কী লিখছ?'

'লিখছি? লিখছি তুমি খুব বিচ্ছিরি লোক, তোমাকে দেখলে আমার রাগ হয়—।'

'এ মা!' রাণা সতেজে হাততালি দিয়ে ওঠে, 'ছি ছি, চিঠি লিখতে জানে না।'

'তবে কি লিখতে হয়?'

'লিখতে হয়, আমি ভাল আছি, তুমি কেমন আছ? এই সব।'

'ও আচ্ছা! এবার থেকে শিখে নিলাম।'

'ভুলে যেও না!'

'না, না, আর ভুলি? কিন্তু রাণা, চিঠিটা তাহলে লিখে ফেলি, তুমি কোল থেকে নামো?'

'তুমি এমনিই লেখো না। আমি কি তোমার হাতের ওপর বসেছি?'

এ হেন যুক্তির পর আর কথা চলে না। তবে বৃথা আশা আর করি না।

ওর মা-র আসার আশায় থাকি।

ওর কথার স্রোত অব্যাহত ধারায় বয়ে চলে।

সিঁড়ির পদশব্দে কান খাড়া করে হুঁ হাঁ চালিয়ে যাই।

অনেক আশাভঙ্গের'পর ওর মা আসে না, আসে বাবা।

যথারীতি 'লজ্জায় 'মারা গিয়ে' বলে, 'এই দেখুন, আবার আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে গেছে? রাণা, কুইক্, কুইক্। চল চটপট!'

'আমি এখন যাব না, পরে যাব।'

'না, এখন যাবে।'

'মা এলে যাব।'

'কেন, আমি তো এসেছি।'

'তুমি তো বকো।'

'রাণা! আমি তোমায় বকি?' বাবা খুব ক্ষুব্ধ স্বরের আমদানী করে।

কিন্তু শিশুর মত নিষ্ঠুর আর কে আছে? রাণা অবলীলায় বলে, 'বকোই তো!'

'ঠিক আছে। আমি চলে যাচ্ছি!' বলে বাবা নিজের ফ্ল্যাটে চলে যায়।

অবশেষে মা আসে, আমাকে উদ্ধার করে।

কিন্তু লেখা আর হয় না।

মনের কাছে একটা যুক্তি খাড়া করি, মুডটা চলে গেছে।

তারপর?

সে তো যথারীতি। হয়তো বেশ খানিকক্ষণের জন্য ইলেকট্রিক ফেল হওয়া, সন্ধ্যাবেলা অতিথি-অভ্যাগতের আবির্ভাব, খানিকটা আলস্য, রেডিওয় হঠাৎ ভাল দুটো গান, সন্ধ্যা-বেলার খবরটা প্রায়ই গোলমালে শোনা হয় না, রাত দশটার খবরটায় একটু কান পাততে হয়।

অবশেষে খাতা-কলম নিয়ে একটু নাড়া-চাড়া অন্তে ঘুম।

নাঃ, আগের মত আর রাত জেগে লিখতে পারি না। অতএব বয়েসের দোহাই পেড়ে মনকে বেদনামুক্ত করি।

পরদিনের সংকল্প নিয়ে আলো নিভোই।

কিন্তু দরজার ওপিঠে আর ছায়া পড়ছে না কেন?

ক'দিন পড়েনি?

খুব উঠে-পড়ে লিখছিলাম বটে দিন দু'তিন, ছায়াটা কি ফিরে গেছে? মনটা একটু চঞ্চল হল। সেদিন কি মেয়েটা আমার হতাশ নিশ্বাসের শব্দটা শুনতে পেয়েছিল? না, আমার নিরুপায়ের চরম ভঙ্গী 'ললাটে হস্তার্পণ'টি দেখতে পেয়েছিল? তবে তো খুব খারাপ হয়ে গেছে ইস্!

আরো দুটো দিন উঠে-পড়ে লাগলে উপন্যাসটা শেষ করা যায়, কিন্তু ভদ্রতার দায়কেও তো একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না!

কলম রেখে পর্দাটা সরিয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়ালাম। এইখান দিয়েই তো আনাগোনা ওদের।

বেশ কয়েকবার ঘর আর বার করার পর হঠাৎ দেখি রাণাবাবু।

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে নিচে নামতে যাচ্ছে।

ধরে ফেললাম, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'পুটুসদের বাড়ি।'

'পুটুস কে?'

'বিনুদির ভাই।'

দুটো নামই সমান অপরিচিত। বললাম, 'আমার কাছে আর আসো না কেন?'

'না তোমার কাছে আর যাব না।'

বুকটা ধ্বক্ করে উঠল। এই পৃথিবী!

আর কথা নেই, তাহলে তাই। তবু কষ্টে মুখে হাসি টেনে বলি, 'কেন যাবে না?'

'মা বলেছে, এখন তোমার পুজোর লেখা—'

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। মান-অভিমানের ব্যাপার নয়, সদিচ্ছার ব্যাপার। অতএব হালকা মনে হেসে উঠে বলি, 'এ মা, মা কিছু জানে না! পুজোর লেখা আবার কি? পুজোর তো জামা হয়, জুতো হয়, খেলনা হয়, লেখা হয় নাকি?'

'মা যে বলল!'

'মা জানে না। চলে এস।'

'আমি যে তোমায় জ্বালাতন করব—' দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলে সদ্য জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়া শিশুটি।

আমি তাকে আবার অজ্ঞানের অন্ধকারে নিক্ষেপ করি, 'সে কি? তুমি আবার কখন আমায় জ্বালাতন কর? আমিই তো তোমায় জ্বালাতন করি। এসো এসো, চলে এসো।'

'মা রাগ করবে না?'

'পাগল! মাকে আমি রাগ করতে বারণ করে দেব।'

এরপর আর সৌজন্য করতে বসে না রাণা। বসবেই বা কেন? 'সৌজন্য'টা তো শিশুর পেশা নয়।

কিন্তু আমি ওই কাজ-পণ্ড-করা ছেলেটাকে ডাকলাম কি শুধুই 'সৌজন্য' আমাদের পেশা বলে?

নিজের কাছ থেকে নিজেকে নিয়ে পালিয়ে যাবার একটা তেপান্তরের মাঠ পেয়ে যাই বলে নয়?

অগ্নিপরীক্ষা

আঃ পুঃ রঃ—১-৪৭

ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল অবিশ্বাস্য অদ্ভুত।

হেমপ্রভা নিজেও ঠিক এতটা কল্পনা করেন নাই, কিন্তু ঘটিল। পাড়ার গৃহিণীরা বলিতে লাগিলেন—"ভগবানের খেলা", "ভবিতব্য"! ভট্টাচার্য মহাশয় ভীত চিন্তিত হেমপ্রভাকে আশ্বাস আর অভয় দিয়া বলিলেন—বিধাতার নির্দিষ্ট বিধান! আমরা তো নিমিত্ত মাত্র মা!

কিন্তু এতখানি সারালো তত্ত্বকথার ভরসা সত্ত্বেও কোন ভরসা খুঁজিয়া পান না হেমপ্রভা। ছেলেকে গিয়া মুখ দেখাইবেন কোন মুখে? শুধুই কি ছেলে? তার উপরওয়ালা? মণীন্দ্র যদি বা কোনদিন মাকে ক্ষমা করিতে পারে, চিত্রলেখা কি কখনও শাশুড়ীকে ক্ষমা করিবে?

গোড়ার কথাটা এই—

ছেলে বৌ নাতি-নাতনীদের লইয়া একবার দেশের জমিদারিতে যাইবার শখ হেমপ্রভার অনেকদিনের, কিন্তু সাহেব ছেলের ইচ্ছা যদি বা কখনো হয়—ফুরসৎ আর হয় না, এবং সাহেব স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী চিত্রলেখার ইচ্ছা-ফুরসৎ কোনটাই হইয়া ওঠে না। বছরের পর বছর ঘুরিতে থাকে, মণীন্দ্র পূজার ছুটিতে পশ্চিম আর গ্রীষ্মের বন্ধে উত্তর বেড়াইতে যান, হেমপ্রভার প্রস্তাবটা মুলতুবীই থাকে।

আসল কথা—বিষয়সম্পত্তি বা জমিদারি নামক বস্তুটার উপর কেমন একটা বিদ্বেষ ভাব ছিল মণীন্দ্রর, দেখাশোনা করা তো দূরের কথা, মায়ের খাতিরে একবার বেড়াইতে যাইতেও যেন রুচি হয় না। গুরুজনের সম্বন্ধে—তবু মণীন্দ্রের শৈশবে পিতা যে যথাসর্বস্ব স্ত্রীর নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়া মণীন্দ্রকে মা'র মুখাপেক্ষী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এই অন্যায় ব্যাপারটা আর কিছুতেই বরদাস্ত করিয়া উঠিতে পারেন না মণীন্দ্র, বিষয়ের সমস্ত উপস্বত্বটা নিজের সংসারে ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও নয়।

বাপের জমিদারির টাকা লইতে গেলে মায়ের সই লওয়া ছাড়া উপায় থাকে না—এটা তো শুধু বিরক্তিকরই নয়, অপমানকরও বটে।

অবশ্য বাপের বিষয়ের সুবিধাটুকু না থাকিলে যে দিন চলা ভার হইত এমন নয়, নিজের উপার্জনে যথেষ্ট ভদ্রভাবেই চলিয়া যায়, কিন্তু হেমপ্রভারই বা জগতে আছে কে? 'মা'র টাকা লইব না' বলিলে যে রীতিমত ঝগড়ার কথা হয়। কাজেই জীবনযাত্রার মানদণ্ড শুধু 'ভদ্রভাবে কাটানোর' অনেক উর্ধ্বেই উঠিয়া আছে। বিলাসিতার তো আর সীমারেখা নাই!

তাছাড়া চিত্রলেখা যা বলে সেটাও তো মিথ্যা নয়! জমিদারিটা মণীন্দ্রর 'বাপের জিনিস' তাতে তো আর ভুল নাই! কাজেই টাকাটা খরচ করিতে বিবেকে তেমন বাধে না, কিন্তু তদারক তল্লাস করিতে রুচিতে বাধে।

হেমপ্রভাই বছরে তিনবার ছুটাছুটি করেন।

বরাবরের জন্য যে দেশের বাড়ীতে বাস করিতে পারেন না, সেটা শুধু নাতিপুতির মমতাতেই নয়, ম্যালেরিয়া দেবীর নির্মমতার জন্যও বটে। যাই হোক, এবার গ্রীষ্মের বন্ধে অনেক দিনের সাধটা মিটিল হেমপ্রভার। জেদ ধরিল—চিত্রলেখারই ছেলেমেয়ে।

গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্ব হইতেই জোর গলায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—আমরা এবার দেশে যাবো।

চিত্রলেখা বিরক্ত হইয়া বলে—তা আর নয়? "দেশে যাবো!" এই প্রচণ্ড গরমে দেশে গিয়ে মারা পড়া চাই যে!

যদিও মেয়ে তাপসীই বড়, তবু যুক্তি-তর্কের ধার অমিতাভর বেশী। সে বয়সছাড়া বিজ্ঞভাব দেখাইয়া বলে—দেশে গিয়ে মারা পড়বো মানে কি? 'নানি' যে প্রত্যেক বছর যান, কই মারা পড়েন না তো?

'ঠাকুমা' শব্দটা নেহাৎ সেকেলে বলিয়া চিত্রলেখা 'নানি' শব্দটা আবিষ্কার করিয়াছিল।... ছেলের এই ডেঁপোমিতে জ্বলিয়া উঠিয়া চিত্রলেখা বলে—ওঁর যা সয়, তোমাদের তা সইবে? উনি যে এই গরমে গিয়ে কতকগুলো আম-কাঁটাল খেয়ে দিব্যি হজম করেন, তোমরা পারবে তা?

—পারবোই তো! অমিতাভর ছোট সিদ্ধার্থ সোৎসাহে বলে—আম পেড়ে খাবো যে আমরা। নানি বলেছেন আমাদের নিজেদের বাগান আছে, অনেক অনেক গাছ। 'দাদু'—মানে বাবার বাবা, নিজে হাতে করে কত গাছ পুঁতেছেন—দেখবো না বুঝি? বা!

চিত্রলেখার বুঝিতে বাকি রহিল না হেমপ্রভা এবার চালাকি খেলিয়াছেন। এইসব সরল-মতি বালক-বালিকারা যে 'নানি'র কুমন্ত্রণার প্রভাবেই বিপথগামী হইতে বসিয়াছে, এ বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র থাকে না চিত্রলেখার।

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বালা করে তার, চড়া গলায় ঝাঁজিয়া বলে—আমি বলে দিচ্ছি এ সময় যাওয়া হতে পারে না—কিছুতেই না। ব্যস্—এ বিষয়ে আর কোনো আলোচনা যেন ওঠে না কোনদিন।

এবার সুর ধরে তাপসী, মেয়েলি আবদারের সুরে বলে—বা-রে, আমরা বলে সব ঠিক করে ফেলেছি—

—সব ঠিক করে ফেলেছ? চমৎকার! কিন্তু আমি জানতে চাই এ বাড়ীর কর্ত্রী কে? তোমরা না আমি?

তাপসী ভয় খাইয়া চুপ করিয়া যায়, কিন্তু অমিতাভ তাহার বদলে চটপট উত্তর দেয়—তাই বলে বুঝি আমরা নিজের ইচ্ছেয় কিছু করতে পাবো না? দেশ-টেশ চিনতে হবে না আমাকে?

—কেন, চিনে কি স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী হবে শুনি?

স্বর্গের সিঁড়ি আবার কি, নানি বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন না? আমাকেই এরপর খাজনা-টাজনা আদায় করতে হবে তো? প্রজারা আমাকে 'বাবুমশাই' বলবে দেখো তখন।

চিত্রলেখার রাগে আর বাক্যস্ফূর্তি হয় না। শাশুড়ীর কুটিল চাল দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায় বেচারা। এমনিতেই তো তার বরাবর সন্দেহ, শাশুড়ী ছেলেমেয়েগুলি পর করিয়া লইতেছেন। আধুনিকার রঙিন খোলস খুলিয়া ঈর্ষার চেহারা অনেক ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে, কিন্তু এবার যে হেমপ্রভা চিত্রলেখার কল্পনার উপরে উঠিয়াছেন! ছেলেদের মন ভাঙাইবার জন্য আরো কি কি লোভনীয় দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন তিনি, সেটা আর শুনিবার ধৈর্য থাকে না।

বীরদর্পে স্বামী নামক পোষা প্রাণীটির উদ্দেশে ধাবিত হয়।

যদিও মণীন্দ্র সব বিষয়েই চিত্রলেখার রীতিমত অনুগত, সাদাকে কালো এবং কালোকে সাদা বলিতেও আপত্তি দেখা যায় না তাঁর—যদি চিত্রলেখা সন্তুষ্ট থাকে—কিন্তু এক্ষেত্রে হঠাৎ এমন একটা কথা বলিয়া বসিলেন যেটা সম্পূর্ণ বেসুরো।

বলিলেন—কিন্তু সত্যি এত যখন ইচ্ছে হয়েছে ওদের—না হয় গেলই!

তিন ছেলেমেয়ে যে এইমাত্র অনেক তোষামোদের ঘুষ দিয়া উকিল লাগাইয়া গিয়াছে তাঁকে—সেটা আর প্রকাশ করেন না।

চিত্রলেখা অধীর হইয়া বলে—না হয় গেলই! তোমার মাথার চিকিৎসা করানো বিশেষ দরকার হয়েছে দেখছি। এই গরমে ওরা যাবে সেই পচা পুকুরে চান করতে?

মণীন্দ্র হাসিয়া ফেলিয়া বলেন—পচা পুকুরে চান করতেই বা যাবে কেন? আর মা তাই করতে দেবেন কেন? তবে গরম যদি বলো—বাঙলা দেশের পাড়াগাঁ খুব যে—

—থাক্ হয়েছে, তোমাকে আর পল্লীগ্রামের হয়ে ওকালতি করতে হবে না, কিন্তু হঠাৎ তোমার ছেলেমেয়েদের এত দেশ-প্রেম উথলে উঠলো কেন, সে খোঁজ রেখেছো?

মণীন্দ্র উড়াইয়া দিবার ভঙ্গীতে বলেন—ছেলেমানুষের আবার কারণ-অকারণ, মার মুখে গল্প-টল্প শুনে থাকবে হয়তো—

—থাক্ যথেষ্ট হয়েছে, তুমি আর বালক সেজো না। কিন্তু আমি এই বলে রাখছি, আমার ছেলেমেয়েদের কানের কাছে দিনরাত ওই সব বিষমন্ত্র ঝাড়তে দেব না আমি। ছেলেরা আজকাল ~~আমাদের গ্রাহ্য~~ করে না তা জানো?

—ওটা এ বংশের ধারা, বুঝলে? বলিয়া মণীন্দ্র হাসিতে থাকেন।

এরকম ইঙ্গিতপূর্ণ কথায় কার না গা জ্বালা করে?

চিত্রলেখা বিরক্তভাবে বলে—তোমাদের বংশের ধারা শোনবার মত সময় আমার নেই, কিন্তু জেনো—ছেলেমেয়েদের অসুখ করলে সে দায়িত্ব তোমার আর তোমার অপরিণামদর্শী মা'র।

—ছি ছি, অসুখ করবে কেন?

—না, অসুখ করবে কেন!—চিত্রলেখা বিদ্রূপহাস্তে মুখ বাঁকাইয়া বলে—বাগানের আম খেয়ে মোটা হয়ে আসবে।

—আমের কথা যদি বললে—মণীন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলেন—ছেলেবেলায় আমিও খুব···ও তুমি বুঝি আবার ওসব গেঁয়োমি পছন্দ করো না ?—তবে সত্যি এ সময় মোটা হয়ে যেতাম।

—বেশ তো, তুমিই বা বাকি থাকো কেন ? যাও না অমন দাওয়াই রয়েছে যখন, আমাকে সেজকাকার কাছে মুসৌরী পাঠিয়ে দিয়ে চলে যেও। টনিকের বদলে আম-কাঁটাল—মন্দ কি ?

মণীন্দ্র সন্ধির সুরে বলেন—এটা তোমার রাগের কথা, কিন্তু একবার সকলে মিলে দেশে গেলেই বা মন্দ কি চিত্রা ?

সত্য বলিতে কি, ছেলেমেয়েদের উৎসাহের বাতাসে মনের মধ্যে কোথায় একটু স্নিগ্ধ সুর বাজিতেছিল, মায়ের জন্য একটু সহানুভূতি! কিন্তু চিত্রলেখা কি ধার ধারে এ সুরের ?

—সকলে মিলে মেণ্টাল হস্‌পিটালে গেলেই বা মন্দ কি ? বলিয়া বিদ্রূপ হাস্তে মুখ ঘুরাইয়া উঠিয়া যায় চিত্রলেখা।

মণীন্দ্র নিঃসন্দেহ হন। মুসৌরীই তাহাকে যাইতে হইবে. চিত্রলেখার পূজনীয় সেজকাকার আশ্রয়ে না হোক, কাছাকাছি। স্বর্ণ চিত্রলেখার বাপের বাড়ীতে এই সেজকাকাটির কাছে আর সকলেই নিষ্প্রভ, তাই জ্যোতি যদি বিকীর্ণ করিতেই হয় তবে সেজকাকীমার চোখের উপর করিতে পারাই চিত্রলেখার পক্ষে চরম সুখ।

ছেলেমেয়েদের জন্য একটু মন কেমন করে মণীন্দ্রর! এত উৎসাহে জল ঢালিয়া দিবেন ? তাছাড়া—ছুটিতে বেড়াইতে গিয়া "সেজকাকাদের বাড়ী"র আওতায় থাকা ? সেবারে দার্জিলিং গিয়া কি বিড়ম্বনা! উঠিতে বসিতে মায়ের কাছে সেজকাকার বাড়ীর আদর্শের খোঁটা খাইতে খাইতে আধখানা রোগা হইয়া গেল ছেলেমেয়েগুলো। মায়ের সেই খুড়তুতো ভাইবোনদের মত কায়মনোবাক্যে 'সভ্য' হইবার যোগ্যতা তাদের কই ? উপরের খোলসটা খুলিয়া ফেলিলেই আসল চেহারা বাহির হইয়া পড়ে যে—সেজকাকাদের চাইতে হেমপ্রভার সঙ্গেই যার অধিক মিল।

শাশুড়ীর উপর এত বিষদৃষ্টি চিত্রলেখার কি সাধে ?

ছেলেমেয়েদের মনের মত করিয়া মানুষ করিবার সাধ যে মিটিল না, হেমপ্রভার জন্যই নয় কি ? কুসংস্কার আর কুদৃষ্টান্তের পাহাড় হইয়া বসিয়া আছেন চিত্রলেখার স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার পথ জুড়িয়া। স্বাস্থ্যটা হেমপ্রভার আবার এমনি অটুট যে দূর ভবিষ্যতেও কোন আলোকরেখা খুঁজিয়া পায় না চিত্রলেখা, বরং নিজেরই তার বারো মাসে দুইবেলা টনিক না খাইলে চলে না।

নিতান্ত অর্থনৈতিক কারণেই সহিয়া থাকা, তা নয়তো—বিধবা মানুষের পক্ষে কাশীর মত

উপযুক্ত স্থান আর কোথায়? মনে পড়িলেই স্ত্রৈণ শ্বশুরের উপর মন বিরক্তিতে ভরিয়া যায় চিত্রলেখার।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু ছেলেমেয়েদের জেদই বজায় থাকিল।

অবশ্য চিত্রলেখা মুসৌরী চলিয়া গেল। বাধ্য হইয়া মণীন্দ্রকেও যাইতে হইল। না যাইলে যে কি হইতে পারে সে কথা ভাবিবার সাহস মণীন্দ্রর নাই। শুধু মাকে ও ছেলে মেয়েদের পাঠাইয়া দিবার জন্য কয়েকটা দিন পরে গেলেন।

চিত্রলেখার ছেলেমেয়েরা মাকে কতটা ভয় করে আর কতটা ভালবাসে সে বিচার করা সহজ নয়, তবে আপাততঃ দেখা গেল মায়ের অনুপস্থিতিটা তাদের কাছে প্রায় উৎসবের মত।

নিজেদের ট্রাঙ্ক সুটকেশ গুছাইয়া লওয়ার মধ্যে যে এত আমোদ আছে, একথা কি আগে জানা ছিল? চিত্রলেখা অতটা না চটিলে হয়তো এদিকটার তদারক করিয়া যাইত, কিন্তু রাগ-অভিমানের একটা বাহ্যিক প্রকাশ চাই তো!

তাপসী বড়, অতএব ম্যানেজমেণ্টের দায়টা তার, সে ভাইদের পোশাক-পরিচ্ছদের বহুবিধ ব্যবস্থা এবং অনেক উপদেশ বর্ষণান্তে পিতার কাছে আসিয়া একটা অদ্ভুত আবদার করিয়া বসিল।

মণীন্দ্রর পিতার আমলের একটা পুরনো দেরাজ—যেটা জাতিচ্যুত অবস্থায় ভাঁড়ার ঘরে ঠাঁই পাইয়াছে—তার চাবিটা চাই তাপসীর।

মণীন্দ্র অবাক হইয়া বলেন—কেন বলো তো, ওর চাবি নিয়ে কি করবে তুমি? চাল-ডাল লুকিয়ে রেখে যাবে নাকি? যা গিন্নী হয়ে উঠেছ দেখছি!

তাপসী হাসিয়া বাপের পিঠে মুখ গুঁজিয়া বলে—তাই বই কি? বাঃ! শাড়ী নেবো।

—হ্যাঁ বাবা। ওর মধ্যে মার ছেলেবেলার অনেক সুন্দর সুন্দর শাড়ী আছে। লাল, সবুজ, কতো কি!

—থাকতে পারে, কিন্তু তুমি নিয়ে কি করবে? কাউকে দিতে চাও?

—ইস্ কাউকে দেবো কেন? আমি পরবো।

—তুই শাড়ী পরবি? বিস্ময়ে হতবাক্ মণীন্দ্র শুধু ওইটুকুই বলিতে পারেন।

—পরলে কি হয়? বা রে!—দেশে তো আমার বয়সের মেয়েরা শাড়ী পরে। পরে না? নানি বলেছেন—এত বড় মেয়ে শাড়ী পরলেই মানায়।

বারো বছরের মেয়ের মুখে এ হেন পাকা কথা শুনিয়া মণীন্দ্রর ভারী বিরক্তি লাগে, গম্ভীর স্বরে বলেন—তাপসী!

তাপসী ভয় পাইয়া চুপ করিয়া থাকে।

—শোনো, ওসব পাকামি ছেড়ে দাও, খবরদার যেন এ রকম কথা শুনতে না পাই। জানো, তোমাদের মা তোমাদের ওপর রাগ করে চলে গেছেন, আর তোমরা এমন সব কাজ করতে চাও যা তিনি মোটে পছন্দ করেন না।

ব্যস্, আর কিছু বলিতে হয় না।

বড় বড় দুই চোখের কোল বহিয়া যে জলের ফোঁটাগুলি ঝরিতে থাকে সেগুলি নেহাৎ ছোট নয়। চিরদিনের অভিমানী মেয়ে। চিত্রলেখা এইজন্যই আরো মেয়েকে দেখিতে পারে না। একটিমাত্র মেয়ে হইলেও নয়।

মেয়ে কোথায় চালাক-চতুর স্মার্ট হইবে, শিশুর মত ছুটাছুটি করিবে, খেলা করিতে আসিয়া মা-বাপের গলা ধরিয়া ঝুলিয়া আদর কাড়াইবে—নকল স্বরে কথা কহিবে—তা নয় কেমন যেন জবুথবু সেকেলে সেকেলে ভাব। শিক্ষা দিতে যাও, কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে।

এবার অপ্রস্তুত হইবার পালা মণীন্দ্রর। চোখের জল বরদাস্ত করা তাঁর কর্ম নয়। চিত্রলেখার অঞ্চলপ্রান্তে নিজেকে নিঃস্বত্ব হইয়া সঁপিয়া দিবার মূলকারণও হয়তো ওই।

গম্ভীর ভাবটা পাল্টাইয়া তাড়াতাড়ি হাল্কা সুরে বলেন—এই দেখ, একদম নেহাৎ বোকা! নে বাপু যত পারিস শাড়ী নে, দুটো-চারটে একসঙ্গে পরে জগদম্বা ঠাকরুণ হয়ে বসে থাক্ গে যা। কিন্তু চাবি-টাবি আমি চিনি না তো।

হাতের উল্টোপিঠে চোখ মুছিতে মছিতে তাপসী ভাঙা গলায় বলে—ছোট আলমারির ড্রয়ারে অনেক চাবি আছে।

—থাকে তো বার করে নাও গে, কিন্তু সাবধান, তোমার মার কাছে যেন কোনদিন এই সব শাড়ী-ফাড়ীর কথা ফাঁস করে বলে ফেলো না, বুঝলে? সাংঘাতিক চটে যাবেন।

তাপসী ততক্ষণে ছুটিয়াছে।

কি জানি—বাবা আবার মত বদলাইয়া বসিলে?

কিন্তু দিশাহারা তাপসী কোন্‌টা ফেলিয়া কোন্‌টা রাখিবে? শাড়ীর স্তূপের মাঝখানে বসিয়া থেই পায় না বেচারা। বর্ণ-সমারোহে চোখ যে ধাঁধিয়া যায়, এর কাছে ফ্রক, ছি!

এমন প্রাণ ভরিয়া দেখিবার সুযোগও তো কখনো মেলে নাই।

কালেকস্মিনে চাকর-বাকরে রোদে দিয়া ঝাড়িয়া তুলিয়া রাখে, হাত দিতে গেলে মার কাছে বকুনি খাইতে হয়।...এত শাড়ী চিত্রলেখা পরিল কখন?—কে জানে, হয়তো সবগুলো পরাও হয় নাই, হয়তো কোনখানা একবার মাত্র অঙ্গে উঠিয়াছে। সঞ্চয়ের নেশায় শুধু যথেচ্ছ জমা করিয়াছে বসিয়া বসিয়া।

ছেলে-বৌ আসিল না বলিয়া সাময়িক দুঃখ প্রকাশ করিলেও একপক্ষে হেমপ্রভা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। আসিতে আমন্ত্রণ করিলেও 'মেম সাহেবের' ভয়ে চিন্তারও অন্ত ছিল না, তাছাড়া নাতিনাতনীদের এমন একাধিপত্যে পাওয়ার সুবিধাও তো হয় না কখনো।

আরো একটা কারণ হয়তো লুকানো আছে মনের মধ্যে। কলিকাতার বাড়ীতে—হেমপ্রভার যেন পায়ের তলায় মাটি নাই, চিত্রলেখার সংসারে তিনি প্রায় অবাঞ্ছিত আশ্রিতের মত। অবশ্য সব দোষই চিত্রলেখার বলা চলে না, হেমপ্রভার শান্তিপ্রিয় ভীরু স্বভাবেরও দোষ আছে কতকটা। নিজের অর্থ-সামর্থ্যের জোরে রীতিমত দাপটের সঙ্গেই থাকিতে পারিতেন তিনি। পারেন না। ছেলেকে বঞ্চিত করিয়া স্বামী যে তাঁহাকেই সর্বেসর্বা করিয়া গিয়াছেন, এর জন্য ভিতরে ভিতরে যেন একটা অপরাধ-বোধের পীড়া আছে। হয়তো এতদিনে মণীন্দ্রর নামে দানপত্র লিখিয়া দিতেনও, যদি না চিত্রলেখার স্বভাবের পরিচয় পাইতেন।

যাই হোক—কলকাতার বাড়ীতে হেমপ্রভা অবান্তর গৌণ।

কিন্তু এখানে হেমপ্রভার পায়ের নীচে শক্ত মাটি। শুধু পায়ের নীচে নয়, আশেপাশে অজস্র। এখানে হেমপ্রভাই সর্বেশ্বরী, শিশু হোক তবু ওদের কাছেও দেখাইয়া সুখ আছে—আত্মতৃপ্তি আছে।

ভারি খুশী হইয়াছেন হেমপ্রভা।

নাতি-নাতনীদের কাছে নিজের ঐশ্বর্য দেখাইয়া যেমন একটা তৃপ্তি আছে—তেমনি দেশের লোকের কাছে এমন চাঁদের মত নাতি-নাতনীদের দেখাইতে পাওয়াও কম সুখের নয়। এবেলা-ওবেলা ভালো ভালো জামা-কাপড় পরাইয়া বেড়াইতে পাঠান তাহাদের—যেখানে নিজের যাওয়া চলে সঙ্গে যান। তাপসী যে বুদ্ধি করিয়া মায়ের রঙিন শাড়ীগুলো আনিয়াছে, এর জন্যও আনন্দের অবধি নাই হেমপ্রভার।

শাড়ী না পরিলে মেয়ে মানায়?

এটি তাপসীও বুঝিতে শিখিয়াছে আজকাল। তাই সকালবেলাই চওড়া জরিপাড়ের লাল টুকটুকে একখানা জর্জেট সিল্কের শাড়ী পরিয়া ভাঁড়ার ঘরের দরজায় আসিয়া হাজির।

—নানি, নানি গো, আজকে সেই যে কোথায় মন্দির দেখতে নিয়ে যাবে বলেছিলে, যাবে না?

—ওমা সে তো সন্ধ্যাবেলা, আরতি দেখতে—

বলিয়া মুখ তুলিয়া যেন অবাক হইয়া যান হেমপ্রভা।

সৌন্দর্যের খ্যাতি তাপসীর শৈশবাবধিই আছে বটে, কিন্তু এমন অপূর্ব তো কোনদিন দেখেন নাই। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী কি হেমপ্রভার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন নাকি? বৈশাখের ভোরের সদ্যফোটা মল্লিকা ফুলের লাবণ্য চুরি করিয়া আনিয়া চুপিচুপি কে কখন মাখাইয়া দিয়া গেল তাপসীর মুখে চোখে?

এই মেয়েকে চিত্রলেখা বিবিয়ানা ফ্যাশনে শার্ট পায়জামা আর খট্‌খটে জুতা পরাইয়া রাখে! আসিয়া দেখুক একবার! আর একটা কথা ভাবিয়া মৃদু একটা নিঃশ্বাস পড়ে

হেমপ্রভার, এই মেয়েকে ওর সাহেব বাপ-মা হয়তো পঁচিশ বছর পর্যন্ত আইবুড়ো রাখিয়া দিবে—পর্বতপ্রমাণ শুকনো পুঁথির বোঝা চাপাইয়া।

কিন্তু এমনটি না হইলে 'কনে'?

মনে মনে ইহার পাশে একটি সুকুমার কিশোর মূর্তি কল্পনা করিয়া, আনন্দে বেদনায় হেমপ্রভার দুই চোখ সজল হইয়া আসে।

তাপসী ছেলেমানুষ হইলেও এই মুগ্ধদৃষ্টি চিনিতে ভুল করে না, তার লজ্জা ঢাকিতে আরো ছেলেমানুষি সুরে তাড়াতাড়ি বলে—সন্ধ্যেবেলা আবার যাবো নানি, এখন চলো—আমি এত কষ্ট করে সাজলাম।...এত বড় শাড়ীটা কি করে পরেছি বলো তো নানি? হুঁ বাবা, ভেতরে এত-টা পাট করে নিয়েছি। ঠিক হয়েছে না?

—খুব ঠিক হয়েছে! হেমপ্রভা দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলেন—আমিই হাঁ করে চেয়ে আছি, এরপরে দেখছি নাতজামাই আমার দণ্ডে দণ্ডে মূর্ছা যাবে।

সভ্য বধূমাতার অসাক্ষাতে এরকম দুই-একটা সভ্যতা-বহির্ভূত পরিচিত পরিহাস করিতে পাইয়া বাঁচেন হেমপ্রভা।

তাপসীও অবশ্য বকিতে ছাড়ে না—যাও, ভারি অসভ্য—বলিয়া পিতামহীর আরো কাছে সরিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।

হেমপ্রভা নাতনীর চিবুক তুলিয়া ধরিয়া আদরের সুরে বলেন—তুই তো বললি 'যাও', কিন্তু আমি শুধু তাকিয়ে দেখি আমার এই রাধিকা ঠাকরুণটির জন্যে গোকুলে বসে কোন্ কালাচাঁদ তপস্যা করছে?

—ইস্ 'কালাচাঁদ' বই কি—বলিয়া ছুটিয়া পলায় তাপসী।

হেমপ্রভা স্নেহমুগ্ধ দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া থাকেন।

বৌমা মেয়েটিকে যত খুকী বানাইয়া রাখিতে চান তত খুকী তাই বলিয়া নাই। এই তো—ঠাট্টাটি তো দিব্য বুঝিয়াছে, উত্তর দিতেও পিছু-পা নয়। না বুঝিবেই বা কেন, অমন বয়সে যে হেমপ্রভার দুই বৎসর বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

সুদূর অতীতের বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতির ভাণ্ডার হইতে দুই-একটা কথা স্মরণ করিয়া কৌতুকের আভায় প্রৌঢ়া হেমপ্রভার নীরস মুখও সরস দেখায়।

—নানি নানি, দিদিটার কাণ্ড দেখেছ?

মিলিটারী ধরনের খাকী সুট্ পরিয়া বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গীতে আসিয়া দাঁড়ায় অমিতাভ। অমিতাভর উচিত ছিল তাপসীর দাদা হইয়া জন্মানো! কিন্তু দৈবক্রমে বৎসরখানেক পরে জন্মানোর খেসারৎ-স্বরূপ বাধ্য হইয়া তাপসীকেই 'দিদি' বলিতে হয় বটে, কিন্তু ওই পর্যন্তই—আর সব বিষয়ে এই ছিঁচকাঁদুনে মেয়েটাকে নিতান্ত অপোগণ্ডের সামিলই মনে করে সে।

হেমপ্রভা হাসিয়া বলে—কি কাণ্ড গো মশাই?

—এই দেখ না সক্কালবেলা কনে-বৌয়ের মত সেজে বসে আছে। এঃ লাল শাড়ী আবার মানুষে পরে? মাকে কিন্তু আমি বলে দেবো নানি বুঝলে, দিদিটার খালি মেয়েলিপনা। আর ওই রকম গিন্নীবুড়ীর মত জবড়জং হওয়াই ভালো নাকি? জানো নানি, মালি এত ফুল আর মালা দিয়ে গেছে, সেইগুলো দিদি এখন পরছে বসে বসে। রাম রাম!

—রাম রাম বইকি, আসল কথা দিদিকে স্বর্গের পরীর মতন দেখাচ্ছে বলে তোর হিংসে হচ্ছে, বুঝেছি।

কথাটা একেবারে মিথ্যাও নয়, হিংসা না হোক কিছুটা অস্বস্তি বোধ হয় বৈকি অমিতাভর। খাটো ফ্রক অথবা ঢিলে পায়জামা শার্ট পরা দিদি তার নিতান্ত নাগালের জিনিস। যে দিদি টফি চকোলেটের ভাগ লইয়া খুনসুড়ি করে, শব্দ প্রতিযোগিতার প্রতিশব্দ লইয়া তর্কাতর্কি করে, পড়ার জায়গায় গোলমাল করার ছুতা ধরিয়া ঝগড়া করে—সে দিদির তবু মানে আছে, কিন্তু শাড়ী-গহনা পরা চুলে ফুলের মালা লাগানো দিদিটা যেন নেহাৎ অর্থহীন, ওর মুখে যে নূতন রং সেটা অমিতাভর অচেনা, তাই উঠিতে বসিতে শাড়ী-গহনার খোঁটায় অস্থির করিয়া তোলে তাপসীকে।

গহনাগুলি অবশ্য পিতামহীর, তবে হেমপ্রভা চিরদিনই রোগা পাতলা মানুষ, আর তাপসী লাবণ্যে ঢলঢল বাড়ন্ত মেয়ে, তাই গায়ে মানাইয়া যায়। বাক্স খুলিয়া সব কিছু বাহির করিয়া দিয়াছেন হেমপ্রভা।

দীর্ঘদিনের অবরোধ ভাঙিয়া অলঙ্কারগুলোও যেন মুক্তি পাইয়া বাঁচিয়াছে। এই মুক্তার শেলি আর জড়োয়ার নেকলেস, সোনার বাজুবন্ধ আর হীরার কঙ্কণ, এদের ভিতরে কি লুকানো ছিল প্রাণের সাড়া? হেমপ্রভার সোহাগমঞ্জরিত যৌবনদিনের স্পর্শ মাখানো ছিল ওদের গায়ে? তারই ছোঁয়াচ লাগিয়াছে তাপসীর ঘুমন্ত মনে?

আগেকার দিনে মেয়েদের সম্মান ছিল না—এটা কি যথার্থ?

মানিনী প্রিয়াকে অলঙ্কারের উপঢৌকনে তুষ্ট করিয়া পুরুষ যে ধন্য হইত, সে কি নারীর অসম্মান? পুরুষের প্রেমের নিদর্শন বহিয়া আনিত যে আভরণ, সে কি শৃঙ্খল?

আজকের মেয়েরা অলঙ্কার আভরণ আদায় করে কলহ করিয়া। ছিঃ!

অমিতাভ আর একটু শানানো গলায় বলে—চুপ করে গেলে যে নানি? ভাবছো কি?

—ভাবছি? ভাবছি তোর দিদি যখন কনে 'বৌ' সেজে বসে আছে—তখন দিদির একটা বরের দরকার তো?

—এঃ ছি ছি ছি! শেম্ শেম্! দিদি, এই দিদি শিগগির শুনে যা—

চুলে আটকানো রজনীগন্ধার গোছাটি সাবধানে ঠিক করিতে করিতে তাপসী আসিয়া দাঁড়াইল—যত ইচ্ছে চেঁচাচ্ছিস্ মানে? মা নেই বলে বুঝি?

—তাই তো! আর নিজে যে মা নেই বলে যত ইচ্ছে সাজছিস্! দেখিস্ বলে দেবো মাকে।

ভিতরে ভিতরে সে আতঙ্ক থাকিলেও তাপসী মুখে সাহস প্রকাশ করিয়া বলে—বেশ বলে দিস্। কি বলবি শুনি? মেয়েরা যেন শাড়ী পরে না; গয়না পরে না!

—তোর মত তা বলে কেউ ফুলের গয়না পরে না। এঃ!

অভিমানী তাপসী বেলফুলের মালাগাছটি গলা হইতে খুলিয়া ফেলিতে উদ্যত হইতেই হেমপ্রভা ধরিয়া ফেলেন—দূর পাগলী মেয়ে! ওর কথায় আবার রাগ? বেশ দেখাচ্ছে। চলো—এবেলাই যাই বল্লভজীর মন্দিরে। বোশেখী পূর্ণিমা, আজ সারাদিনই গোবিন্দ দর্শনের দিন। কই, সিধু কই?

—ও তো এখনো প্যাণ্টে বোতাম লাগাচ্ছে। বুঝলে নানি, মোটেই পারে না ও। কি মজা করে জানো? ভুল ভুল ঘরে বোতাম লাগায় আর টানাটানি করে ঘেমে ওঠে।

—তা ওদের সব চাকর-বাকরে পরিয়ে দেওয়া অভ্যেস, তুই পরিয়ে দিলি নি কেন?

—আমি? আমাকে গায়ে হাত দিতে দিলে তো? আবার বলে কি না—'সর্দারি করতে আসিস্ না দিদি।' অভীর শুনে শুনে শিখেছে, বুঝলে? নিজে এদিকে মস্ত সর্দার হয়ে উঠেছেন বাবু—বলিয়া হাসিতে থাকে তাপসী।

হেমপ্রভা ডাক দেন—সিধুবাবু, আপনার হলো? আসুন শিগগির, আর বেলা হলে রোদ উঠে যাবে—গরম হবে।

তিন নাতি-নাতনীকে লইয়া বল্লভজীর মন্দিরের উদ্দেশে রওনা হন হেমপ্রভা। কলিকাতায় ভালো মডেলের দামী গাড়ী থাকিলেও, এখানে হেমপ্রভার বাহন—একটি পক্ষীবাজ সম্বলিত পালকি গাড়ী। কর্তার আমলে জুড়ি-গাড়ী ছিল, এখন প্রয়োজনও হয় না—পোষায়ও না।

বল্লভজীর মন্দির নূতন।

পাশের গ্রামের জমিদার কান্তি মুখুজ্জের প্রতিষ্ঠিত নূতন বিগ্রহ 'রাইবল্লভের' মন্দির। কান্তি মুখুজ্জের পয়সা শুধু জমিদারিতেই নয়—সেটা প্রায় গৌণ ব্যাপার, আসল পয়সা তাঁর কোলিয়ারির।

দেশের লোকে বলে—টাকার গদি পাতিয়া শুইবার মত টাকা নাকি আছে কান্তি মুখুজ্জের। কান্তি মুখুজ্জে নিজে অবশ্য বৈষ্ণবজনোচিত বিনয়ে কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দেন, কিন্তু সদ্ব্যয়ের মাত্রাটা বাড়াইয়া চলেন।

হেমপ্রভাবাহিনী মন্দিরের কাছে আসিয়া দেখেন সমারোহের ব্যাপার।

শুধু বৈশাখী পূর্ণিমা নয়—মন্দির-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক উৎসব হিসাবেও বটে—রীতিমত ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। নাটমন্দিরে নহবৎ বসিয়াছে, কীর্তন মণ্ডপে 'চব্বিশপ্রহর' শুরু হইয়াছে। নৈবেদ্যের ঘরে জনতিনেক বর্ষীয়সী বিধবা রাশীকৃত ফল ও বঁটি লইয়া বাগাইয়া বসিয়াছেন, ফল ফুল ধূপধূনার সম্মিলিত সৌরভে বৈশাখের সকালের স্নিগ্ধ বাতাস যেন থরথর করিতেছে।

এসব অভিজ্ঞতা চিত্রলেখার ছেলেমেয়েদের থাকিবার কথা নয়, মুগ্ধ বিস্ময়ে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে তাপসী উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় চুপি চুপি বলে—কী সুন্দর নানি! রোজ রোজ আসো না কেন এখানে?

—রোজ? কি করে আসবো দিদি, মহাপাপী যে! তা নইলে শেষকালটা তো এইখানেই পড়ে থাকবার কথা আমার। কলকাতায় গিয়ে—

—নানি! নানি! পিছন হইতে সিদ্ধার্থর আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠ বাজিয়া উঠে—ওই ওদিকে—ইয়া বড় একটা কি রয়েছে দেখবে এসো। একটা বুড়ো ভদ্দরলোক বললে—'রথ'। রথ কি হয় নানি?

—রথে চড়ে ঠাকুর মাসীর বাড়ী বেড়াতে যান।...কই তুমি ঠাকুর প্রণাম করলে না?

—ও যাঃ! ভুলে গিয়েছি—

বলিয়া প্রায় মিলিটারী কায়দায় দুই হাত কপালে ঠেকাইয়াই সিদ্ধার্থ চঞ্চল স্বরে বলে—বোকার মত খালি ঠাকুর দেখছিস দাদা? রথটা দেখবি চল্ না! সত্যিকার ঘোড়ার মত ইয়া ইয়া দুটো ঘোড়া রয়েছে আবার।

এর পর আর অমিতাভকে ঠেকানো শক্ত।

অগত্যা হেমপ্রভাকেও যাইতে হয়।

তাপসী অবশ্য এসব শিশুসুলভ উচ্ছ্বাসে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্তে নিবিষ্ট ভাবে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছিল—কিন্তু 'সত্যিকার ঘোড়া'র আকার বিশিষ্ট কাঠের ঘোড়ার সংবাদে হৃদয়-স্পন্দন সুস্থির রাখা কি সহজ কথা?

মন্দিরের পিছনে প্রকাণ্ড চত্বরে নানাবিধ মূর্তিধারিণী "রাসের সখী" ও সু-উচ্চ রথখানা পড়িয়া আছে। প্রয়োজনের সময় নূতন করিয়া চাকচিক্য সম্পাদন করিতেই হইবে বলিয়া বোধ হয় সারা বৎসর আর বিশেষ যত্নের প্রয়োজন অনুভব করে না কেউ।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে এবং 'এত বড় পুতুল গড়িল কে'...'রথের সিঁড়িগুলা কোন্ কাজে লাগে'...'ঠাকুর নিজেই সিঁড়ি উঠিতে পারেন কিনা' প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত হেমপ্রভা যখন ফিরিতেছেন, তখন সামনেই হঠাৎ একটা গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল—'কান্তি মুখুজ্জে'! 'কান্তি মুখুজ্জে'! পূজা-উপচার সঙ্গে লইয়া নিজেই মন্দিরে আসিয়াছেন।

জমিদার তো বটেই, তা ছাড়া মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, কাজেই কীর্তনানন্দে বিভোর বৈষ্ণব ভক্তরা হইতে সুরু করিয়া পূজারী, সেবক-সেবিকা, সাধারণ দর্শকবৃন্দ পর্যন্ত কিছুটা ত্রস্ত হইয়া পড়ে।

বরাবর নাম শুনিয়া আসিয়াছেন—কখনো চাক্ষুষ পরিচয় নাই। হেমপ্রভা গায়ের সিল্কের চাদরটা আরো ভালো ভাবে জড়াইয়া লইয়া নাতি-নাতনীদের পিছন দিকে সরিয়া যান, কিন্তু ব্যাপারটা ঘটে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। উপচার-বাহক ভৃত্যটাকে চোখের

ইঙ্গিতে সরাইয়া দিয়া কান্তি মুখুজ্জে নিজে আগাইয়া আসিয়া বলেন—কি খোকা, চলে যাচ্ছ যে? প্রসাদ নেবে না?

উদ্দিষ্ট ব্যক্তি অবশ্য সিদ্ধার্থ।

দাদার সামনে প্রতিপত্তি দেখাইবার সুযোগ সে ছাড়ে না। রীতিমত পরিচিতের ভঙ্গীতে কাছে সরিয়া আসিয়া গম্ভীরভাবে বলে—প্রসাদ আমাদের বাড়ীতেও অনেক আছে। এদের সব রথটা দেখিয়ে আনলাম, এই যে আমার দাদা দিদি আর নানি।··· আচ্ছা ওই মিস্ত্রীটা কোথায় থাকে?

কান্তি মুখুজ্জে কেমন যেন আত্মহারা ভাবে এদের পানে চাহিয়াছিলেন—হঠাৎ এই অবান্তর প্রশ্নে সচেতন হইয়া বলেন—কোন্ মিস্ত্রীটা বলো তো?

—ওই কাঠের ঘোড়াগুলো যে গড়েছে। আমি একটা ঘোড়া গড়তে দেবো মনে করছি।

সিদ্ধার্থের এ হেন বিজ্ঞজনোচিত সুচিন্তিত মন্তব্যে উপস্থিত সকলেই হাসিয়া ওঠে। কান্তি মুখুজ্জে তাহার গায়ে একটি আদরের থাব্ড়া মারিয়া বলেন—ঘোড়া কেন দাদা, সোজাসুজি একটা হাতিই গড়তে দিও তুমি, কিন্তু এইটি তোমার দিদি?—কী নাম তোমার লক্ষ্মী?

তাপসী অস্ফুট স্বরে নিজের নাম উচ্চারণ করে।

—তাপসী? চমৎকার! কিন্তু এ নাম তো তোমার জন্যে নয় দিদি। তপস্যা করবে সে, যে তোমাকে পেয়ে ধন্য হবে।···সন্দেহ করবার কিছু নেই, ব্রাহ্মণকন্যা তো বটেই, তবু পদবীটা যে জানতে হবে আমার।...তোমার বাবার নাম কি দিদি?

লাজুক দিদি উত্তর দিবার আগেই অমিতাভ গম্ভীর ভাবে বলে—বাবার নাম এম. ব্যানার্জি।

দিদি ও ছোট ভাইয়ের মাঝখানে নিজে কেমন গৌণ হইয়া যাইতেছিল বলিয়াই বোধ করি নিজের সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করিয়া দিতে উত্তরটা দেয় অমিতাভ। কিন্তু সিদ্ধার্থর কাছে তার পরাজয় অনিবার্য।

তীব্র তিরস্কারের ভঙ্গীতে দাদার দিকে চাহিয়া সিদ্ধার্থ বলে—আবার ওই রকম বলছিস্? নানি কি বলে দিয়েছেন? এখানে কি বলতে হয়?···বাবার নাম হচ্ছে—শ্রীমণীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় —বুঝলেন?

—বুঝেছি। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ—

কান্তি মুখুজ্জে সোজাসুজি হেমপ্রভার সামনে আসিয়া বলেন—বাধ্য হয়ে আপনাকে সম্বোধন করতে হলো, লজ্জা করবেন না—আমি আপনার চেয়ে অনেক বড়। এই মেয়েটি আপনার পৌত্রী?

'নানি' শব্দটা সন্দেহজনক বলিয়াই বোধ করি সম্পর্ক যাচাই করিয়া লন ভদ্রলোক।

হেমপ্রভা মাথা হেলাইয়া জানান তাই বটে।

—তা হলে—আপনার কাছে আমার একটি আবেদন—মেয়েটিকে আমায় দিন। আমার একটা নাতি আছে, মা-বাপ-মরা হতভাগ্য, তবে আমার যা খুদকুঁড়ো আছে সবই তার। কিন্তু সে যাক্—ছেলেটাকে একবার দেখে আপনি কথা দিন আমায়।

হেমপ্রভা যেন দিশেহারা হইয়া যান। অকস্মাৎ এ কি বিপদ!

এ অঞ্চলে কান্তি মুখুজ্জে যে-সে লোক নন। এত বড় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির এই বিনীত আবেদনকে হেমপ্রভা উপেক্ষা করিবেন কোন্ মুখে? প্রতিবাদের ভাষা পাইবেন কোথায়? অথচ—চিত্রলেখার মেয়েকে দান করিয়া বসিবার স্পর্ধাই বা কোথায়?

তাই সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে গোছ সুরে বলেন—আপনার ঘরে যাবে সে তো পরম সৌভাগ্যের কথা, তবে নেহাৎ ছেলেমানুষ—

—ছেলেমানুষ তা দেখতে পাচ্ছি বৈকি, আমার নাতিটাও ছেলেমানুষ যে। অপেক্ষা করবো বৈকি, দু-এক বছর অপেক্ষা করবো আমি, কিন্তু ক্ষমা করবেন আমায়—এ মেয়েকে ছাড়বার উপায় আমার নেই। এর মুখে রাধারাণীর ছায়া দেখতে পাচ্ছি আমি। আমায় কথা দিন।

হেমপ্রভা কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন—আপনার ঘরে কাজ করতে পেলে আমি তো ধন্য মনে করবো, কিন্তু ছেলেকে না জানিয়ে—

—নিশ্চয়, জানাবেন তো বটেই,—কিন্তু আপনি ছেলের মা সেটা তো মিথ্যে নয়? আপনার কথা বিলেতের আপীল। তার ওপর আর কথা কি! অবিশ্যি আমার নাতিকেও আগে দেখুন আপনি···ওরে কে আছিস্···বুলুবাবুকে ডেকে দে তো!

একটি ভৃত্য আসিয়া কহিল—দাদাবাবু ঠাকুরের সিংহাসনে নিশেন খাড়া করছে—

—আচ্ছা একবার আসতে বল্, বলবি আমি ডাকছি।

হুকুমটা দিয়া কান্তি মুখুজ্জে বোধ করি একবার মনে মনে হাসেন।···সুন্দরী নাতনীটির জন্য দ্বিধায় পড়িয়াছে···রোসো, তোমাকেও আমার মত ফাঁদে পড়িতে হয় কিনা দেখো।

হ্যাঁ ফাঁদে পড়িতে হয় বৈকি, একেবারে অথৈ জলে পড়িতে হয় যে। স্বপ্নের কল্পনা যদি প্রত্যক্ষ মূর্তি ধরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, দিশাহারা হইয়া পড়া ছাড়া উপায় কি?

ঠিক এমনি একটি তরুণ সুকুমার কিশোর মূর্তির কল্পনাই করিতেছিলেন নাকি হেমপ্রভা? দেবতা ছলনা করিতে আসিলেন না তো? তা নয় তো এ কি অপূর্ব বেশ! চওড়া জরির আঁচলাদার সাদা বেনারসীর জোড় পরা, কপালে শ্বেত চন্দনের টিপ! জুতাবিহীন খালি পা দুইখানির সৌন্দর্যই কি কম! হাতে একটা লাল শালুর নিশান! পিতামহের আহ্বানে আসিয়া হঠাৎ এতগুলি অপরিচিত মুখ দেখিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়াছে...

না, তাপসীর মত অত উজ্জ্বল গৌর রং নয় বটে, কিন্তু প্রথম ফাল্গুনের কচি কিশলয় কি গৌর? সে কি কম উজ্জ্বল? মুখশ্রী গঠনভঙ্গী যে তাপসীর চাইতেও নিখুঁত, একথা অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না হেমপ্রভার।

—এই যে এসেছ। কি হচ্ছিল?

এতগুলি অপরিচিত মূর্তির সামনে নিজের ছেলেমানুষি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা বোধ করি বুলুর ছিল না। পিতামহের এ রকম অহেতুক প্রশ্নে মনে মনে চটিয়া গম্ভীরভাবে বলে—সিংহাসনের ওপর নিশেনটা লাগাবো।

—তা বেশ। কিন্তু দেবতার মাথার ওপর আবার একটা শালুর নিশেন খাড়া করা কেন বলো তো?...বলিয়া সকৌতুকে হাসিতে থাকেন কান্তি মুখুজ্জে।

বুলু আরও গম্ভীরভাবে বলে—তাতে কি? রথের চূড়োয় নিশেন দেন না?

—ঠিক ঠিক, নিশ্চয় তো বটে, আমারই ভুল। আচ্ছা এসো প্রণাম করো এঁকে—মণীন্দ্রবাবুর মা ইনি। মণীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বুঝেচ তো? ঈশানপুর, কুসুমহাট...... ইত্যাদি ওঁদের।

কান্তি মুখুজ্জের প্রকাণ্ড জমিদারীর ঠিক সীমানাতেই এই সব মাঝারি তালুক। তবু বিবাদ বিসম্বাদের প্রয়োজন হয় নাই কোনদিন।

দায়-সারা-গোছ একটা প্রণাম করিয়া বুলু চঞ্চলভাবে বলে—দাদু, যাই?

—আচ্ছা যাও। এখন তো এসেই পালাবার তাড়া? দেখবো এরপর।...কি বলেন বেয়ান? হ্যাঁ, বেয়ানই বলি—সম্বন্ধটা যখন পাকা হয়ে গেল! দেখুন, আপনার আর কিছু বলবার আছে? ছেলে দেখলেন তো? এরা যে পরস্পরের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে এ কী অস্বীকার করতে পারেন?

—না মুখুজ্জে মশাই, প্রত্যক্ষ দেখলাম এ ভগবানের বিধান। বলবার কিছু নেই।... নিজের অজ্ঞাতসারেই কথাটা উচ্চারণ করেন হেমপ্রভা। কে যেন বলাইয়া লয় তাহাকে।

কান্তি মুখুজ্জে প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া ওঠেন—হবেই তো, কান্তি মুখুজ্জের চোখ ভুল করে না, বুঝলেন? জমির ওপর থেকে ধরতে পারি কার নীচে আছে কয়লা, আব কার নীচে হীরে।

বিচক্ষণ কান্তি মুখুজ্জে তো হীরক-খনি নির্ণয় করিয়া নিশ্চিত হইলেন, কিন্তু হেমপ্রভার কোথায় সে নিশ্চিন্ততার সুখ?

বাড়ী ফিরিয়া তিনি ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন।

এ কি করিলাম! এ কি করিয়া বসিলাম!

মন্দির-প্রাঙ্গণে এ কি সত্য করিয়া বসিলেন হেমপ্রভা? এ যে কত বড় অনধিকারচর্চা সে কথা হেমপ্রভার চাইতে কে বেশী জানে? কেন হেমপ্রভা দুই হাত জোড় করিয়া ক্ষমা চাহিলেন না কান্তি মুখুজ্জের কাছে? কেন বলিলেন না—'যে সত্য রাখিতে পারিব না, সে সত্যের মূল্য কি?' নিজের দৈন্য স্বীকার করিয়া লইলেই তো গোল মিটিয়া যাইত।

হেমপ্রভা মণীন্দ্রর মা, তাই তাহার উপরওয়ালা? হেমপ্রভার কথা বিলেতের আপীল?

হায়! হেমপ্রভার জীবনে এ কথা পরিহাস ছাড়া আর কি? কিন্তু স্পষ্ট করিয়া এই সত্যটুকু প্রকাশ করিবার সাহস কেন হইল না তখন? অহঙ্কার? আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগিত?

কিন্তু তাই কি ঠিক? হেমপ্রভার কি তখন অত ভাবিবার ক্ষমতা ছিল? নিয়তি কি এই কথা বলাইয়া লইলেন না হেমপ্রভার বিহ্বলতার সুযোগে?

নিজের মনকে প্রবোধ দিতে যদিও বা নিয়তিকে দায়ী করা যায়, চিত্রলেখার সামনে দাঁড় করাইবেন কাহাকে? নিয়তিকে?

তাপসীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন শুনিলে চিত্রলেখা শাশুড়ীকে পাগলা-গারদের বাহিরে রাখিয়া নিশ্চিত থাকিতে পারিবে? হেমপ্রভার আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া গেল। যে তৃপ্তিটুকু কয়দিন ভোগ করিয়া লইয়াছেন, এ যেন তাহারই খেসারৎ।

নিজের উপর রাগ হয়, কান্তি মুখুজ্জের উপর রাগ হয়, সারা বিশ্বের উপরই যেন বিরক্তি আসে। কোন মন্ত্রের প্রভাবে সেদিনের সকালটা যদি ফিরাইয়া আনা যাইত, মন্দিরের ত্রিসীমানায় যাইতেন না হেমপ্রভা। এত কাণ্ডের কিছুই ঘটিত না।

তবু সেই কিশোর দেবতার মত ছেলেটির মুখ মনে পড়িলেই যেন হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে চায়। মনে হয়, ছেলে-বৌয়ের হাতে ধরিয়া সম্মতি আদায় করিয়া লইতে পারির না? না হয় হেমপ্রভার মানটা কিছু খাটো হইল। না হয়—জীবনে ওরা আর হেমপ্রভার মুখ না দেখুক, দেবমন্দিরে দাঁড়াইয়া যে সত্য করিয়া ফেলিয়াছেন হেমপ্রভা, তার মর্যাদাটুকু শুধু রাখুক ওরা।

মণীন্দ্রর নিজের কোন সত্তা থাকিত যদি, হয়তো এত অকূল পাথারে পড়িতেন না হেমপ্রভা, কিছুটা সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু চিত্রলেখা যে মণীন্দ্রর হৃদয়বৃত্তির সব কিছু আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে একথা জানিতে কি বাকি আছে এখনও?

চিত্রলেখার মুখ মনে পড়িলে কোনদিকে আর কূলকিনারা দেখিতে পান না হেমপ্রভা।

দিন কয়েক কাটে।

হেমপ্রভা ভাবিতে চেষ্টা করেন—ও কিছু নয়, ব্যাপারটা হয়তো ঘটে নাই। সেদিনের সমস্ত কথাগুলি বারবার স্মরণ করিতে চেষ্টা করেন, এমন আর কি গুরুতর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তিনি? মেয়ে-ছেলে থাকিলেই কত জায়গায় সম্বন্ধ হয়···কিন্তু যতই হাল্কা করিবার চেষ্টা করুন, বিগ্রহের সমীপবর্তী মন্দির-প্রাঙ্গণ যেন পাহাড়ের ভার লইয়া বুকে চাপিয়া বসিয়া থাকে।

তা ছাড়া ভুলিয়া থাকিবার জো কই?

কান্তি মুখুজ্জের বাড়ী হইতে প্রায় প্রত্যহই তত্ত্ব আসিতে শুরু করিয়াছে—একলা তাপসীর জন্যই নয় শুধু, তিন ভাইবোনের জন্য অজস্র খেলনা, খাবার, জামাকাপড়।

হেমপ্রভা নাচার হইয়া মনে মনে ভাবেন—'আচ্ছা ঘুঘু বুড়ো! ঝুনো ব্যবসাদার বটে।' মুখের কথা হাওয়ায় ভাসিয়া যাওয়ার আশঙ্কায় বস্তুর পাষাণভার গলায় বাঁধিয়া দিয়া হেমপ্রভাকে ডুবাইয়া মারার কৌশল ছাড়া এ আর কি?

সব কথা খুলিয়া বলিয়া ছেলেকে একখানা চিঠি লিখিবার চেষ্টা করেন হেমপ্রভা, কিন্তু মুসাবিদা ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না। এদিকে বিধাতা-পুরুষ একদা যা মুসাবিদা করিয়া রাখিয়াছিলেন, পাকা খাতায় উঠিতে বিলম্ব হয় না তার। হেমপ্রভা কী কুক্ষণেই দেশে আসিয়াছিলেন এবার!

এদিকে নাতির জন্য 'কনে' দেখিয়া পর্যন্ত নূতন করিয়া যেন প্রেমে পড়িয়া গিয়াছেন কান্তি মুখুজ্জে। চোখে যৌবনের আনন্দদীপ্তি, দেহে যৌবনের স্ফূর্তি।...বিবাহের তারিখের জন্য "দুই এক বছর অপেক্ষা" করার প্রতিশ্রুতিটাও যেন এখন বিড়ম্বনা মনে হয়। মনে হয়—এখনি সারিয়া ফেলিলেই বা ক্ষতি কি ছিল? কবে আছি কবে নাই!

কিন্তু নিতান্ত সাধারণ এই মামুলী কথাটা যে কান্তি মুখুজ্জের জীবনে এত বড় নিদারুণ সত্য হইয়া দেখা দিবে, এ আশঙ্কা কি স্বপ্নেও ছিল তাঁর?

কে বা ভাবিয়াছিল মৃত্যুদূত এমন বিনা নোটিশে কান্তি মুখুজ্জের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইবে! বয়স হইলেও—অমন স্বাস্থ্য-সুগঠিত দেহ! অমন প্রাণবন্ত উজ্জ্বল চরিত্র, অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাভরা হৃদয়, মুহূর্তের মধ্যে সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটিয়া গেল!

শুধু হেমপ্রভার জন্য রহিল অগাধ পরমায়ু আর দুরপনেয় কলঙ্ক।

কলঙ্ক বৈকি!

শুধু তো বিবাহের কথা দিয়া সত্যবদ্ধ হওয়া নয়! প্রতিকারবিহীন শৃঙ্খলের বন্ধনে সমস্ত ভবিষ্যৎ যে বাঁধা পড়িয়া গেল তাপসীর।

বিবেচক কান্তি মুখুজ্জে যে মৃত্যুকালে এত বড় অবিবেচনার কাজ করিয়া যাইবেন, এ কথা যদি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিতেন হেমপ্রভা, হয়ত এমন কাণ্ড ঘটিতে দিতেন না।

অকস্মাৎ মারাত্মক অসুখের সংবাদ বহন করিয়া যে লোকটা আসিল সে শুধু সংবাদ দিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, বিনীত নিবেদন জানাইল—কর্তার শেষ অনুরোধ হেমপ্রভা যেন তাপসীকে লইয়া একবার দেখা করিতে যান। কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হেমপ্রভার সাধ্য কি এ অনুরোধ এড়ান?

কিন্তু সেখানে যে তাঁহার জন্য মৃত্যুবাণ প্রস্তুত হইয়া আছে সে কথা টের পাইলে হয়তো এ অনুরোধও ঠেলিয়া ফেলা অসম্ভব ছিল না। কিছুই আশঙ্কা করেন নাই, গিয়া দেখিলেন বিবাহের সমস্ত ব্যবস্থা প্রস্তুত—নাপিত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

কুশল প্রশ্ন ভুলিয়া হেমপ্রভা সেই অর্ধ-অচৈতন্য রোগীর কাছে গিয়া প্রায় তীব্রস্বরে কহিলেন—এ কী কাণ্ড মুখুজ্জে মশাই?

কান্তি মুখুজ্জে চোখ খুলিয়া মৃদু হাসির আভাস ঠোঁটে আনিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—ঠিকই হলো বেয়ান, দেখছেন না, বিধাতার বিধান।

—কিন্তু ওর বাপ-মা জানতে পর্যন্ত পেল না, এ মুখ আমি দেখাবো কি করে তাদের? কি বলে বোঝাবো?

—অবস্থাটা খুলে বলবেন। বুঝবে বই কি, আপনার ছেলে তো মূর্খ নয়। আর—আর মৃত্যু না হইলে নাকি স্বভাব যায় না মানুষের, তাই পরিহাসরসিক কান্তি মুখুজ্জে মৃদু পরিহাসের ভঙ্গীতে বলেন—সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন, ধরে এনে তো আর জেলে দিতে পারবে না আমাকে! অবিশ্যি বলবেন, তার কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছে কান্তি মুখুজ্জে। অসময়ে ডাক এসে গেল যে—করি কি বলুন?

এ কথার আর কি উত্তর দেবেন হেমপ্রভা?

কিন্তু মুদিতপ্রায় নিষ্প্রভ চোখেও ধরা পড়িল হেমপ্রভার অসহায় হতাশ মুখচ্ছবি, তাই কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন—ভাববেন না—আমি কথা দিচ্ছি সুখী হবে ওরা, আমার বুলু বড় ভাল ছেলে, কিন্তু বড় হতভাগ্য! তাই লক্ষ্মীপ্রতিমার সঙ্গে বেঁধে দিলাম ওকে।...আর অভিভাবক ঠিক করে দিয়ে গেলাম ওর। আমি চোখ বুজলে যে ওর পৃথিবী শূন্য, বেয়ান!

ক্লান্তিতে দুই চোখের পাতা জড়াইয়া আসিল।...ওদিকে তখন বিবাহের অনুষ্ঠান শুরু হইয়াছে।...

ক্রন্দনরতা 'কনে'কে অনেকে অনেক বুঝাইয়া চুপ করাইয়াছে।...

কিন্তু ভিতর হইতে ক্রন্দনোচ্ছ্বাস গলা পর্যন্ত ঠেলিয়া আসিতেছে তাপসীর। সে তো নিজের হিতাহিত ভাবিয়া নয়, চিত্রলেখা জানিতে পারিলে কি হইবে সেই কথা ভাবিয়াই সর্বশরীর হিম হইয়া আসিতেছে তাহার। যেন তাপসী নিজেই কি ভয়ানক অপকর্ম করিয়াছে।

কান্তি মুখুজ্জে মারা গেলেন পরদিন সন্ধ্যায়।

ফুলশয্যা হইল না, কুশণ্ডিকার সিঁদুর পরিয়া ঠাকুমার সঙ্গে ফিরিয়া আসিল তাপসী।

পাড়ার গৃহিণীরা বলিতে লাগিলেন—'ভগবানের খেলা'...'ভবিতব্য'। ভট্টাচার্য টিকি দুলাইয়া আশ্বাস দিলেন—বিধাতার নির্দিষ্ট বিধান, আমরা তো নিমিত্ত মাত্র।

কিন্তু হেমপ্রভা কিছুতেই সান্ত্বনা খুঁজিয়া পান না।

ছেলে-বৌকে মুখ দেখাইবেন কোন্ মুখে—এ উত্তর কে দিবে তাঁহাকে? কঠিন একটা রোগ কেন হয় না হেমপ্রভার? কান্তি মুখুজ্জের মত?...হায়, এত ভাগ্য হেমপ্রভার হইবে?

অথচ এ এমন ব্যাপার যে লুকাইয়া রাখার উপায় নাই, চাপিয়া ফেলার জো নাই।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ছেলের নামে একখানা টেলিগ্রাম পাঠাইলেন, "মা মৃত্যুশয্যায়, শেষ দেখা করতে চাও তো এসো।" পাঠাইয়া দিয়া অবিরত প্রার্থনা করিতে থাকেন কল্পিত রোগ যেন সত্য হইয়া দেখা দেয়...মণীন্দ্র আসিয়া যেন দেখে যথার্থই মা মৃত্যুশয্যায়।

অপরাধিনী মাকে তখন ক্ষমা করা হয়তো অসম্ভব হইবে না মণীন্দ্রের পক্ষে।

এবারে বিদেশে আসিয়া চিত্রলেখার মন বসিতেছিল না।

ছেলেমেয়েদের না আনিয়া যে এত খারাপ লাগিবে এ কথা আগে খেয়াল হয় নাই। তাহারা কাছে না থাকিলে ছটা বিকীর্ণ করিবার উপায় কোথা? শুধু নিজেকে দিয়া কতটাই আর প্রকাশ করা যায়?" কতই বা সাজসজ্জা করা যায় তিন বেলা?

মেয়েকে তালিম দিয়া গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্য কি তবে? যদি উপযুক্ত ক্ষেত্রটাই মাঠে মারা গেল?

এবার তো আবার শুধু প্রতিবেশী হিসাবে নয়, সেজকাকীর সংসারেই আশ্রয় লইতে হইয়াছে যে—অবশ্য 'পেয়িং গেস্ট' হইয়া। আসিবার আগে সেজকাকা একখানা বাড়ীর আশ্বাস দিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আর জুটিল না। সেজকাকীর ভগ্নিপতির চাহিদা ফেলিয়া তো আর চিত্রালেখাকে দেওয়া যায় না। অগত্যা ভাইঝি ও ভাইঝি-জামাইকে নিজের বাড়ীতেই আশ্রয় দিতে হইয়াছে তাঁহাকে, নেহাৎ যখন আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু ভাইঝি তো আর দুঃখী দরিদ্র নয় যে "বিনামূল্যের অন্ন" গলাধঃকরণ করিবে। বরং নিজেদের খরচের উপরিই সে দেয়। কিন্তু তাতেই বা শান্তি কই? সুখ কই?

সেজকাকার 'কালো কুমড়ো'র মত থেঁদি মেয়েটা যখন নাচিয়া গাহিয়া আসর জমকায়, আর পাড়ার লোকের বাহবা কুড়ায়, সেজকাকীর দিদি যখন পাশের বাড়ী হইতে বেড়াইতে আসিয়া বোনঝির রূপগুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া ওঠেন, তখন সর্বাঙ্গ জ্বালা করে চিত্রলেখার।

তাপসীকে একবার দেখাইয়া এদের 'বড় মুখ' হেঁট করা গেল না, এ কি কম আপসোসের কথা? তাপসীর কাছে লিলি? কিসে আর কিসে!...লিলি! কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন আর কাকে বলে!...ওই রূপে আবার সাজের ঘটা কত! এই যে নিত্য নূতন পোশাকের চটক, দেখানে-পনা ছাড়া আর কি! মতলব বোধ করি চিত্রলেখাকে অবাক করিয়া দেওয়া! অবশ্য চিত্রলেখা এত নির্বোধ নয় যে অবাক হইবে। লিলির তুলনায় 'বেবি' অর্থাৎ তাপসীর যে আরো কত অজস্র রকমের পোশাক পরিচ্ছদ আছে সে কথাগুলি নিতান্তই গল্পচ্ছলে উচ্চারণ করিতে হয়। যথা—এত যে রকম রকম জামা জুতো করিয়ে দিচ্ছি বিলাতী দোকানে অর্ডার দিয়ে, তা সৃষ্টিছাড়া মেয়ে যদি কিছু পরবে!...অথচ এই দেখ লিলি, যা দিচ্ছো তাই আনন্দ করে পরছে।

বেবির গানের মেডেলগুলা আনিবার কথা অবশ্য নয়—কিন্তু কি জানি কি ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। সুটকেসের কোণেই পড়িয়াছিল হয়তো। যাই হোক আসিয়া পড়িয়াছে

বলিয়াই পাঁচজনকে দেখানো। নইলে ও আর কি—হরদমই তো পাইতেছে। রেডিও কোম্পানী তো চিত্রলেখার বাড়ীর মাটি লইয়াছে। চিত্রলেখার ইচ্ছা নয় যে তুচ্ছ কারণে মেয়ে গলা নষ্ট করে। ' হ্যাঁ, তবে 'হিজ্ মাস্টার্স্'-এর ওখানে বরং এক-আধবার পাঠানো চলে।...সেজকাকী আর তস্য দিদির দুর্ভাগ্য যে 'বেবী'র গান শুনিয়া জীবনটা ধন্য করিয়া লইবার সুযোগ পাইলেন না!

প্রথম প্রথম কথা কহার সুখটুকুই ছিল—কিন্তু ইদানীং যেন সেটাও যাইতে বসিয়াছে। দেখা যাইতেছে যে এসব গল্পে আর কেউ বিশেষ আমল দিতেছে না। এমন কি মণীন্দ্র পর্যন্ত মাঝে মাঝে চিত্রলেখার কাছে কথার ট্যাক্স চান। চিত্রলেখা নাকি আজকাল বড বেশী বাজে বাজে কথা বলে।

শোনো কথা! এরপর আরো যে কি-না-কি বলিয়া বসিবেন মণীন্দ্র কে জানে! বৃদ্ধ হইতে যে আর বিশেষ বাকি নাই সেটা ধরা পড়ে এমনি বুদ্ধিভ্রংশ কথাবার্তায়। সংসারে কি আছে না আছে মণীন্দ্র জানেন? না বেবির গুণপনার সব হিসাব তিনি রাখেন? তবে? যা-তা একটা বলিয়া চিত্রলেখার মুখ হাসানো কেন?

রাগে রাগে কোন সময়ই তাই আর চিত্রলেখার মুখে হাসিই আসিতে দেয় না। এমনই 'যাই-যাই' গোছের মনের অবস্থায় হঠাৎ হেমপ্রভার 'তার' আসিয়া হাজির হইল।

অন্য সময় হইলে চিত্রলেখা হয়তো শাশুড়ীর এ রকম বেয়াড়া আবদারে রীতিমত জলিয়া উঠিত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে মনে করিল—যাক্, তবু মন্দের ভালো। স্বামীর কাছে মান খোয়াইয়া কলিকাতায় ফেরার কথা তোলা যাইতেছিল না, এ তবু একটা উপলক্ষ্য পাওয়া গেল।

টেলিগ্রামখানা বার দুই-তিন পড়িয়া মণীন্দ্র বোধ করি মায়ের অসুখের গুরুত্বটা নির্ণয় করার চেষ্টা করিতেছিলেন, চিত্রলেখা সাড়া দিয়া কহিল—তা হলে যাবে নাকি?

—যাবো না? মণীন্দ্র অবাক হইয়া তাকান। অবশ্য কিছুটা বিরক্তিও ধরা পড়ে প্রশ্নের সুরে।

—হ্যাঁ, যাবে তো নিশ্চয়ই, প্রশ্ন করাই অন্যায় হয়েছে আমার। যাক্ আমিও মনে করছি চলে যাই এই সঙ্গে, আমায় কলকাতায় নামিয়ে দিয়ে তুমি পরের ট্রেনে চলে যেও।

মণীন্দ্র বোধ করি সামান্য আশা করিয়াছিলেন মায়ের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে সস্ত্রীক উপস্থিত হইতে পারিবেন, কিন্তু চিত্রলেখার প্রস্তাবে হতাশ হন। কর্তব্যবোধ জাগাইবার দুরাশা অবশ্য নাই, তবু ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করেন—তোমার একবার না যাওয়াটা ভাল হবে? ধরো যদি মার—

যতই হোক মা, তাই অকল্যাণকর বাকি কথা বোধ করি উচ্চারণ করিতে বাধে মণীন্দ্রর।

চিত্রলেখার অবশ্য জানিতে বাকি নাই মণীন্দ্রর প্রাণ পড়িয়া থাকে কোথায়। নেহাৎ নাকি চিত্রলেখা বেশী আদিখ্যেতা দেখিতে পারে না, তাই 'মা মা' করিয়া বাড়াবাড়ি করিবার সাহস হয় না। তবে চিত্রলেখার অত শখ নাই। অগ্রাহ্যের ভঙ্গীতে বলে—তুমি যতোটা 'সিরিয়াস্'

ভাবছো, আমার তো তা মনে হচ্ছে না। সেকেলে মানুষ, অল্পে ব্যস্ত হওয়া স্বভাব আর কি। হয়তো সামান্য কিছু হয়েছে, 'তার' ঠুকে দিয়েছেন।

—বেশী যে হয় নি তারই বা প্রমাণ কি পাচ্ছ তুমি?

—প্রমাণ আবার কি, নিজের ধারণার কথাই বলছি। কেবল তর্ক, চিরদিন এক স্বভাব গেল! যাক্, তোমার মার বিষয় তুমিই ভাল বুঝবে, তবে তোমার যদি এতই তাড়া থাকে, বর্ধমানে নেমে পড়ে চলে যেও কুসুমহাটি, হাওড়া স্টেশনে এসে একটা ট্যাক্সি করে নিয়ে বাড়ী পৌছবার ক্ষমতা আমার যথেষ্ট আছে।

—তাহলে তুমি না যাওয়াই ঠিক করলে? কাজটা কি রকম হবে তাই ভাবছি।

চিত্রলেখা এবার ঈষৎ নরমস্বরে উত্তর দেয়—বেশ তো, তুমি গিয়ে অবস্থা দেখে একটা টেলিগ্রাম করেও দিতে পার তো। দরকার বুঝি—যাওয়া এমন কিছু শক্ত নয়। ঘণ্টাকয়েকের মামলা। আমার পক্ষে এখন তৈরি হওয়া বড় সহজ কাজ নয়। উঃ বিরাট জিনিসপত্র ম্যানেজ করা—

মণীন্দ্র দোষারোপের ভঙ্গীতে বলেন—তখনই বলেছিলাম 'লাগেজ' বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে—ছেলেমেয়েরা এলো না, মাত্র দুজনের জন্যে সাতটা সুটকেস, দুটো হোল্ডল—

—সে তুমি বলবে জানি, অথচ সেজকাকার বাড়ীতে থাকা হলো বলেই না এ সব লাগেজ বাড়তি মনে হচ্ছে। একটা সংসার ম্যানেজ করতে হলে কত কি লাগে। তা ছাড়া ছোটলোকের মত একই ব্লাউজ বার বার পরতে আমার প্রবৃত্তি হয় না সে তো তোমার অজানা নয়। কি আর করা যাবে?

স্বামীর সঙ্গে দুই দণ্ড প্রেমালাপ করিবে কি, কথাবার্তা শুনিলেই যে গা জলিয়া যায় চিত্রলেখার। উপরে যতই পালিশ পড়ুক লোকটার, ভিতরে যে কোথায় একটু গ্রাম্যভাব রহিয়া গিয়াছে, যেটা এমন চটকদার পালিশের নীচে হইতেও মাঝে মাঝে উঁকি মারে, অন্ততঃ চিত্রলেখার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়িতে দেরি হয় না।

চিত্রলেখা উঠিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই সেজকাকীমার আবির্ভাব ঘটিল। বয়সে চিত্রলেখার চাইতে কয়েক বৎসর বড় হওয়াই সম্ভব, তবে সাজসজ্জায় চলনে-বলনে ধরা পড়ে না। চশমার কাঁচ মুছিতে মুছিতে ভাটীয়ালী শাড়ীর আঁচল পিঠে ফেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পূজনীয়া খুড়শাশুড়ী—মণীন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইবার ভঙ্গীতে অবহিত হন, অবশ্য দাঁড়ান না। মাজা-ঘষা মিহি গলায় অনুযোগের সুর ঝঙ্কৃত হইয়া ওঠে—এ তোমার অন্যায় মণীন্দ্র। তোমার মার অসুখ, বেশি হোক কম হোক—তুমি যাবে, উচিতও যাওয়া—কিন্তু ও বেচারাকে খামকা সেই জঙ্গলের মাঝখানে টেনে নিয়ে যাওয়া কেন?

মণীন্দ্র গম্ভীর সুরে বলেন—আমি তো বলি নি যেতে।

—ইচ্ছে প্রকাশ করছো তো! সেও একরকম বলাই হলো! আমাদের তো ইচ্ছে নয় যে ও তাড়াতাড়ি চলে যায়। তা ছাড়া এখানে এসে ওর হেলথ্‌টা একটু ইম্প্রুভ করছিল—

অবশ্য তোমার মতামতের ওপর কথা বলতে চাই না, তবে তোমাদের কাকাবাবু বলছিলেন—'পরে আমাদের সঙ্গে গেলেই হতো।'

বোঝা গেল কাকাবাবুর দূত হিসাবেই আসিয়াছেন তিনি, নিতান্তই কর্তব্যের খাতিরে। তা নয়তো—স্বেচ্ছায় ঝঞ্চাটকে আগলানো! একটু আশ্চর্য বৈকি! অবশ্য আগে আগে যখন চিত্রলেখার সেজকাকীমার প্রতি দৃষ্টিটা ছিল বিমুগ্ধ বিচক্ষণ, তখন ভাসুরঝিকে খুব পছন্দই করিতেন ভদ্রমহিলা, কিন্তু ইদানীং যেন চিত্রলেখাই তাঁহাকে 'ভাক' লাগাইয়া দিতে চায়। কাজেই পছন্দটা বজায় রাখা দুষ্কর। হাঁ, তবে বাহিরে সভ্যতার ঠাট বজায় রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্টই আছে। ওটা এখনও কিছুকাল সেজকাকীমার কাছে শিখিতে পারে চিত্রলেখা।

শাশুড়ী-জনোচিত মর্যাদা তিনি রক্ষা করেন জামাতার কাছে—মেয়েকে আরো কিছুদিন রাখিবার অনুরোধ জানাইয়া।

মণীন্দ্র এতক্ষণ 'পাইপ' সরাইয়া রাখিয়া ভিতরে ভিতরে অতিষ্ঠ বোধ করিতেছিলেন। কথার ছেদ টানিয়া দিতে তাড়াতাড়ি বলেন—বেশ তো থাকুক না আপনাদের কাছে, আপত্তির কি আছে! আমি রাত্রের ট্রেনেই স্টার্ট করবো।

সেজকাকীমা একটু ফাঁপরে পড়েন। দূত হিসাবে আসিয়াছেন বটে, কিন্তু নিজস্ব ইচ্ছাটা তো আর বিসর্জন দিয়া আসেন নাই। তাই আরো মিহি আরো অমায়িক সুরে বলেন—অবশ্য জীবন-মরণের কথা কিছুই বলা যায় না, চিত্রার সঙ্গে যে তোমার মার একবার শেষ দেখা হবে না এটাও যেন না হয়, জোর করে আটকাতে আমি চাই না।

—না, আপনার আর দোষ কি, উনি নিজে যা বিবেচনা করবেন—বলিয়া যেন অন্যমনস্কভাবে পাইপটা টেবিলে ঠুকিতে থাকেন মণীন্দ্র। চিত্রলেখা কি আর সাধে বলে ভিতরে ভিতরে গ্রাম্যতা ঘোচে নাই! শ্বশুর-শাশুড়ীর সামনে কে তাঁহাকে পাইপ ধরাইতে নিষেধ করিয়াছে মাথার দিব্য দিয়া?

টেলিগ্রামখানা ছাড়িয়া পর্যন্ত ঘর-বার করিতেছিলেন হেমপ্রভা।

কি বলিবেন? কি করিবেন? আসিবামাত্রই কাঁদিয়া কাটিয়া ছেলে-বৌয়ের হাত ধরিয়া ক্ষমা চাহিবেন? না রোগের ভান করিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিবেন? তাপসীকে না হয় সিঁদুর ঢাকিয়া বাঁকা সিঁথি কাটিয়া রাখিবেন, ছেলেদের, চাকরবাকরদের না হয় শিখাইয়া রাখিবেন কোন কথা প্রকাশ না করিতে। ধীরে ধীরে মেজাজ বুঝিয়া···কিন্তু তারপর? তারপর কি বলিবেন হেমপ্রভা? কি বলিবেন ভাবিতে গেলে যে বুদ্ধিবৃত্তি অসাড় হইয়া যায়।

বর্তমান যুগে দেবতারা যে বধির এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি! হেমপ্রভার এত প্রার্থনা বিফল হইয়া স্বাভাবিক নিয়মে দিনরাত্রি আবর্তিত হইতে থাকিল, হেমপ্রভার হার্টফেল হইল না, দৈব-দুর্ঘটনা ঘটিল না, সামান্য একটু জ্বর পর্যন্ত দেখা দিল না।···সম্ভাব্য সময়ে স্টেশনে

গাড়ী গেল এবং সেই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যথার্থ রোগিণীর মত নির্জীব হইয়া বিছানায় আশ্রয় লইলেন হেমপ্রভা।

কথায় বলে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। এমন নিরেট সাবধানতার মাঝখানে যে এত বড় ছিদ্র ছিল সে কথা কে হুঁশ করিয়াছিল! সব প্রথম যার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা—গাড়ীর সেই কোচম্যানটাকে যে সাবধান করিয়া রাখা হয় নাই, সেটা আর খেয়ালে আসে নাই হেমপ্রভার।

সময় যত নিকটবর্তী হইতে থাকে বুকের স্পন্দন তত দ্রুত হইয়া ওঠে। অবশেষে গাড়ীর চাকার শব্দ—গেট খোলা এবং বন্ধ করার শব্দ—পরিচিত জুতার শব্দ—বুকের উপর যেন হাতুড়ি পিটিতে থাকে—কিন্তু চিত্রলেখা কই? শুধু একটা ভারী জুতার শব্দ কেন?...মা, চিত্রলেখা আসে নাই। 'ঈশ্বর আছেন' শুধু এইটুকু চিন্তা করিতে না করিতে ছেলের মুখ দেখিয়া হেমপ্রভা চোখে অন্ধকার দেখেন।...না, গোপন নাই। সেই ভয়ঙ্কর কথাটা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। মুখ দেখিয়া সন্দেহ থাকে না কিছু। এক মিনিট...দুই মিনিট...প্রত্যেকটি মিনিট এক-একটি বৎসর। জলদগম্ভীর স্বরে শুধু একটি শব্দ উচ্চারণ করেন মণীন্দ্র—'মা!'

একটি শব্দের মধ্যে কত অজস্র ভাব!

হেমপ্রভা আর নিজেকে সামলাইতে পারেন না। 'হাউ হাউ' করিয়া কাঁদিয়া ওঠেন—আমাকে তুই সাজা দে মণি, তোর যা মন চায় সেই শাস্তি দে আমাকে, মেয়েটাকে কিছু বলিস নি।

—বলবার তো আর কিছু রাখোনি মা, বলবার ভাষাও খুঁজে পাচ্ছি না আমি।

মণীন্দ্রর কণ্ঠস্বরে রোষ ক্ষোভ হতাশা নিরুপায়ের বেদনা সব কিছু যেন ভাঙিয়া পড়ে।

—মণি! আমায় তুই মার। মেরে ফেল্ আমায়—

—পাগলামি করো না মা, ঈশ্বর রক্ষা করেছেন যে চিত্রা আসতে চাইল না। কিন্তু এ কি করলে মা? কি করলে? বেবিটাকে মিথ্যে করে দিলে একেবারে? চিরদিনের মত মাটি করে দিলে?

—নিজের অপরাধ কমাতে চাই না মণি। হেমপ্রভা হঠাৎ যেন কোথা হইতে বল সঞ্চয় করিয়া উঠিয়া বসেন, অপেক্ষাকৃত ধীরস্বরে বলেন—জানি আমারই সমস্ত দোষ, তবু একটি কথা তোমায় বলবো আমি—অপাত্রে পড়েনি তাপসী। হয়ত তুমিও সে ছেলেকে দেখলে—

—থাক্ থাক্, ও কথা আমার সামনে আর বলো না মা। একটা বাচ্চা ছেলে—সে আবার অপাত্র-সুপাত্র! কান্তি মুখুজ্জে কোলিয়ারি কিনে অনেক পয়সা করেছে বটে, কিন্তু মা-বাপ মরা নাতিটাকে কি সুশিক্ষা দিয়াছে তার খবর জানো কিছু? ম্যাট্রিক পাস করেছে কি করেনি তাও জানো না বোধ হয়? উঃ, আমার সমস্ত আশা ধ্বংস হয়ে গেল! তোমার বুদ্ধির ওপর একটু আস্থা ছিল, কিন্তু তোমাকে যে লোকে এত বড় ঠকানোটা ঠকাতে পারে এটা কোনদিন ধারণা করতে পারি নি।

হেমপ্রভা সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়া শান্তভাবে বলেন—ঠকা-জেতা তুমি নিজে একবার পরীক্ষা করে দেখো। সে ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত হয়ে মরেছেন যে, মা-বাপ-মরা ছেলেটার একটা অভিভাবক ঠিক করে দিয়ে গেলেন। সেই অভিভাবকের কাজ তুমি করো, ও যাতে মানুষের মত মানুষ হয়ে ওঠে দেখো। পয়সার তো অভাব নেই তার—

—বুঝেছি মা, পয়সার লোভটাই সামলাতে পারো নি তুমি। মণীন্দ্র নীরস স্বরে মন্তব্য করেন—তোমার ওপর ধারণাটা অনেক উঁচু ছিল, যাক্ সে কথা, তবে পরের ছেলের অভিভাবক সাজবার স্পৃহা আমার নেই। বেবি-অতীদের তৈরি হতে বলো, বিকেলের ট্রেনে বেরোবো।

—আজকেই চলে যাবি মণি? তার একবার খোঁজ করবি না? বুড়ো মাকে তুই জীবনেও ক্ষমা না করতে পারিস করিসনে, কিন্তু মেয়েটার আখের ভাব। শুনেছি পাসের খবর বেরোলে কলকাতার হোস্টেলে পড়তে যাবার কথা, এখন ঠাকুর্দা মরে গিয়ে কি অবস্থায় আছে বেচারা, কোন খবরই নিতে পারি নি, তুই একবার খোঁজ করে দেখ্—

—যে অনুরোধ রাখতে পারবো না, সে রকম অসঙ্গত অনুরোধ করো না মা...অতী! অতী! এই যে, তোমরা এখনি তৈরি হয়ে নাও, বিকেলের গাড়ীতে কলকাতায় ফিরতে হবে।

মায়ের যাওয়ার নাম মাত্র উচ্চারণ করেন না মণীন্দ্র। রায় দিয়া গম্ভীরভাবে উঠিয়া যান।

হেমপ্রভা অবাক অনড়ভাবে বসিয়া থাকেন। না, মণীন্দ্র তাঁহাকে তিরস্কার করে নাই, গালি দেয় নাই, কিন্তু চিত্রলেখা এর চাইতে আর কত বেশী অপমান করিতে পারিত!

ভয়! ভয়!

ছোট্ট মনটুকু আচ্ছন্ন করিয়া আছে এই করাল দৈত্য।

অপরাধটা তার দিক হইতে হইল কখন একথা জানে না তাপসী, তবু সেই অজ্ঞাত অপরাধের ভারে বেচারা যেন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। অথচ বাবা তাহাদের কাহাকেও তো কই এতটুকু তিরস্কার পর্যন্ত করিলেন না!

নানির সঙ্গে কি কথাবার্তা হইল কে জানে, তবু নানির ঘর হইতে বাহির হইবার সময় বাবার অস্বাভাবিক থমথমে মুখ দেখিয়া, একলা তাপসী কেন, তিনটি ভাই-বোনই সন্ত্রস্ত হৃদয়ে বিরাট বাড়ীর একটু নির্জন কোণ খুঁজিয়া নীরবে বসিয়াছিল।

ছোট্ট সিদ্ধার্থও যেন অনুভব করিতে পারিতেছে যা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা অন্যায় অসঙ্গত—না ঘটিলেই বাঁচা যাইত। এই অসঙ্গত আচরণের কৈফিয়ৎ বুঝি সকলকেই দিতে হইবে। কখন সেই কদ্রমেঘ ভাঙিয়া পড়িবে সেই আশঙ্কায় স্তব্ধ হইয়া থাকে তিনজন।

কিন্তু ভাঙিয়া পড়িল না। ছেলেমেয়েদের ডাকিয়া শুধু এইটুকু জানাইলেন মণীন্দ্র যে, বিকালের গাড়ীতেই রওনা হইতে হইবে তাহাদের।

কিন্তু ভাঙিয়া যে পড়িল না সেইটাই কি স্বস্তির? বরং কঠিন তিরস্কারের ভিতর কিছুটা সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব ছিল। বাবার মূর্তিটাই যে মর্মান্তিক তিরস্কারের মত উদ্যত হইয়া রহিল।

ভয়! ভয়!

ট্রেনের গতি দ্রুত হইতেছে—আর নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে কলিকাতা—যেখানে চিত্রলেখা আছেন।...হায়, মার সঙ্গে মুসৌরী যাইলে তো এত কাণ্ডের কিছুই ঘটিত না! কেনই যে দেশে যাইবার শখ এত প্রবল হইল!...আচ্ছা সেই ছেলেটিও এই ট্রেনেই কলিকাতা আসিতেছে না তো? কলিকাতায় থাকিয়া পড়িবার কথা ছিল।...বুড়ো ভদ্রলোক তো মারা গেলেন—বাড়ীতে নাকি আর কোন লোক নাই।...কী আশ্চর্য! অতটুকু একটা মানুষ অত বড় একটা বাড়ীতে একলা থাকিতে পারে না কি!...কে যেন বলিতেছিল—বরাবর রাণীগঞ্জে থাকে ওরা। সেখানেই বা আছে কে? মা বাপ ভাই বোন কিছুই নাই, এ আবার কি রকম কথা! একটিমাত্র দাদু, তাও তো মরিয়া গেলেন... আচ্ছা সারাদিন কথা কয় কার সঙ্গে? চাকর? ঠাকুর? দূর!...কলকাতায় কত কলেজ...সব কলেজেই হোস্টেল থাকে?...তাপসীও ম্যাট্রিক পাসের পর কলেজে ভর্তি হইবে—উঃ, কত দেরি তার—তিন-তিনটি বছর পরে তবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা।

—বেবি! জানলার ধার থেকে সরে এস, কয়লার গুঁড়ো লাগছে মুখে। বাপের কণ্ঠস্বরে অত চমকাইবার কারণ কি ছিল?

যেন চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে তাপসী। আবার সেই ভয়টা বুকের উপর চাপিয়া বসিতেছে,—শ্রীরামপুর...উত্তরপাড়া...লিলুয়া—নামগুলো নূতন নাকি? বুকের ভিতর এত শব্দ কেন? চিত্রলেখা নিকটবর্তী হইতেছেন বলিয়া?

ছেলেমেয়েদের ও স্বামীর মুখ দেখিয়া শাশুড়ীর মৃত্যু সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না চিত্রলেখার। তা এত তাড়াহুড়া করিয়া মরিবার কি দরকার ছিল! চিত্রলেখার বদনাম করিতে ছাড়া আর কি? যাক্, তবু ভালো, মনের দুঃখে গেঁয়ো ভূতদের মত জুতা খুলিয়া পা-খালি করিয়া আসিয়া হাজির হন নাই মণীন্দ্র! স্বামীর কাছে অন্ততঃ এটুকু সভ্যতাজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া কিছুটা হৃষ্ট হয় চিত্রলেখা।

স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহসে কুলায় না, বড় মেয়ে-ছেলের কাছেও কেমন যেন একটু লজ্জা করে, তাই চুপি চুপি সিদ্ধার্থকে ডাকিয়া প্রশ্ন করে—তোমাদের নানি কবে মারা গেলেন?

—নানি! দুই চোখ বড় করিয়া সিদ্ধার্থ মায়ের মুখের পানে তাকায়। মা কি হঠাৎ পাগল হইল না কি? তীক্ষ্ণস্বরে কহিল—নানি মারা যাবেন কেন?

—ওঃ! যাননি তাহলে! ধন্যবাদ। তা তোমরা হঠাৎ অসুস্থ মানুষকে ফেলে চলে এলে যে? একটু ভাল আছেন বুঝি?

টেলিগ্রামের কথা' ছেলেমানুষ সিদ্ধার্থ জানে না, জানিবার কথাও নয়, তাই একটু থামিয়া বলিয়া ফেলে—নানির অসুখ করতে যাবে কেন? শুধু তো মন খারাপ!

এক মুহূর্তে কঠিন হইয়া ওঠে চিত্রলেখা। ওঃ অসুখটা তবে ছল! ছলে বৌকে দেশে টানিয়া লইয়া যাইবার ছুতা! মায়ের উপর তবে ক্রুদ্ধ হইয়া ছেলেমেয়েদের লইয়া আসিয়াছেন মণীন্দ্র! প্রলয়গম্ভীর মুখের কারণ এতক্ষণে বোঝা গেল। ভালোই হইয়াছে যে এতদিনে মায়ের স্বরূপ চিনিয়াছেন মণীন্দ্র। ভালো! ভালো! উভয় পক্ষই বেশ জব্দ হইয়াছেন। চাপা হাসি চাপিয়া ছোট্ট ছেলেটাকেই বিদ্রূপব্যঞ্জক ভঙ্গীতে শুধায় চিত্রলেখা—তা হঠাৎ তাঁর মন খারাপের কারণটা কি হলো?

বাবার কাছে বলিয়া ফেলিবার ভয়ে সেখানে একটা নিষেধ ছিল বটে, কিন্তু মার কাছে বলিতে আলাদা করিয়া কোন নিষেধের অর্ডার পাওয়া যায় নাই, তাই সিদ্ধার্থ সোৎসাহে বলে—তা মন খারাপ হবে না? দিদির বিয়ে হয়ে গেল—তোমরা দেখতে পেলে না, কিছু উৎসব হলো না—নেমন্তন্ন হলো না—

ছেলেটা নিতান্ত মেল্ ট্রেনের গতিতে কথা কয় বলিয়াই এতগুলো কথা বলিয়া ফেলিতে পারে, কারণ প্রথমাংশটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ছিলাছেঁড়া ধনুকের মত সোজা হইয়া উঠিয়াছে চিত্রলেখা।

—কী বললি? কী হয়ে গেল? দিদির কী হয়ে গেল?

মায়ের মূর্তি দেখিয়া উৎসাহটা নিতান্তই স্তিমিত হইয়া পড়ে বেচারার। ভয়ে ভয়ে বলে—দিদির হঠাৎ বিয়ে হলো কিনা। সেই বুড়ো ভদ্দরলোক তাড়াতাড়ি মরে গেল যে—আজ বিয়ে হলো—কাল মরে গেল—ব্যস্।

চিত্রলেখা আর সিদ্ধার্থর কাছে দাঁড়াইয়া সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন অনুভব করে না। হার্টের অসুখ ভুলিয়া বিদ্যুৎবেগে মণীন্দ্রর বসিবার ঘরে আসিয়া দাঁড়ায়।

ট্রেনের পোশাক সেইমাত্র ছাড়িয়া বসিয়াছেন তিনি।

পিতাপুত্রী দুজনেই আছেন— চমৎকার!

বিদ্যুতের মত আসিয়া বাজের মত ফাটিয়া পড়াই সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাই প্রশ্নটা বাজের মত শোনায়—ব্যাপারটা কি হয়েছে শুনতে পারি?

মণীন্দ্র গম্ভীরভাবে একবার সেই অগ্নিময় মুখচ্ছবির পানে চাহিয়া ধীরস্বরে বলেন—শোনবার মত নয়।

—বলতে লজ্জা' করছে না? প্রকৃত ঘটনা শিগ্‌গির বলো আমায়, কি, ভেবেছো কি তোমরা?

—প্রকৃত ঘটনা—আমি যতটুকু জানি তা এই—একজনের প্ররোচনায় পড়ে মা বেবির একটা বিয়ে দিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন···বেবি, তুমি ওপরে যাও, অভীর সঙ্গে খেলা করগে।

চিত্রলেখার লিপ্‌স্টিক রঞ্জিত ওষ্ঠাধরের পথ বাহিয়া যে লাভাস্রোত প্রবাহিত হইবে, সেটা কল্পনা করিয়া বোধ করি বালিকা কন্যার জন্য করুণা হইল মণীন্দ্রর। কিন্তু চিত্রলেখা অত ভাবপ্রবণ নয়, তাই চিলের মত তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠে—না উঠে যাবে না ও, সমস্ত পরিষ্কার শুনতে চাই আমি। জেনে রেখো, তোমার মার এসব স্বেচ্ছাচার কিছুতে সহ্য করবো না। তোমার মা বলে রেহাই দেব না।

—কি করবে? মার নামে চার্জসীট আনবে?

—দরকার হলে তাও করতে কুণ্ঠিত হবো না এটা জেনো।···এই বেবি, সরে আয় বলছি—সিঁদুর পরেছিস? লজ্জা করছে না? উঠে আয় বলছি!

সিন্দুররেখা একটু ছিল বৈকি, নবোঢ়ার গৌরবদীপ্ত উজ্জ্বল রেখা নয়, ভীরু কুণ্ঠিত ক্ষীণ একটু আভাস···চিত্রলেখার রুমালের ঘর্ষণে সেটুকু মুছিয়া যায়—শুধু একটু বেদনাময় আভাস রাখিয়া।

তাপসী অমন শুষ্ক চোখে তাকাইয়া থাকে কেমন করিয়া? ঘন পল্লব বেষ্টিত বড় বড় দুই চোখের বড় বড় জলের ফোঁটাগুলি হারাইয়া গেল কোথায়? শুকনো পাংশুমুখে চোখ দুইটা বড় বেমানান দেখিতে লাগে।

—যাও সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলো গে, আর দ্বিতীয় দিন যেন এসব অসভ্যতা দেখতে পাই না।

মায়ের আদেশে অন্ততঃ এইটুকু উপকার হয় তাপসীর, মায়ের সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবার একটা ছুতা পায়।

মণীন্দ্র একটু তিক্ত হাসির সঙ্গে বলেন—চিহ্নটা মুছে ফেলতে পারো—ঘটনাটা তো মুছে ফেলবার নয়।

বিরক্তিটা কেবলমাত্র চিত্রলেখার উপরই নয়, মায়ের উপর, হয়তে বা নিজের ভাগ্যেরও উপর।

চিত্রলেখা মুহূর্তে জলিয়া উঠিয়া উত্তর করে—তুমি কি আশা করছো এই খেলাঘরের রাবিশ বিয়ে আমি সমর্থন করবো?

—খেলাঘরের আর কি করে বলা চলে? অনুষ্ঠানের তো কিছুই ত্রুটি হয়নি শুনলাম—কুশণ্ডিকা সপ্তপদী পর্যন্ত হয়ে গেছে।

—কন্যা সম্প্রদান বলে একটা কথা আছে না? তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার মেয়েকে সম্প্রদান করা হয় কোন্ আইনে? কোন্ অধিকারের বলে অপর কারো পক্ষে এ কাজ সম্ভব হয়?

—হিন্দু আইনের বলেই হয়। আমার পরিবর্তে আমার মা কন্যা সম্প্রদান করলে সেটা আইনের চক্ষে অসিদ্ধ নয় চিত্রা।

—তা হলে তুমি এটাকে বিয়ে বলে মেনে নিতে চাও?

—উপায় কি! ওপরে যতই ময়ূরপুচ্ছ এঁটে বেড়াই, ভেতরে তো হিন্দু ছাড়া আর কিছুই নই আমরা। অগ্নি-শালগ্রাম সাক্ষ্য করা হিন্দু বিবাহ নাকচ করে দেব কিসের জোরে?

—কিসের জোরে নাকচ করা যায় সে তোমাকে শেখাবার রুচি নেই, কিন্তু কি করে করা যায় দেখিয়ে দেবো জেনো। বেবির যদি উপযুক্ত বিয়ে আমি না দিই, তাহলে আমি—, সভ্যতা ভব্যতা এবং আধুনিকতার বহির্ভূত কটু একটা দিব্যি উচ্চারণ করিয়া ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া গেল চিত্রলেখা।

মণীন্দ্রর নিষ্ঠুরের মত চলিয়া যাওয়ার পর হেমপ্রভা প্রথমটা বজ্রাহতের মতই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন, ক্রমশঃ নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইলেন। ভালোই হইল যে মায়ার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিতে ভগবান এমন করিয়া সাহায্য করিলেন। কি মিথ্যার উপরই প্রাসাদ গড়িয়া বাস করা! সে প্রাসাদ যদি ভাঙ্গিয়া পড়ে তো পড়ুক, হয়তো ঈশ্বরের আশীর্বাদ সেটা।

পয়সার খোঁটাটাই বড় কঠিন হইয়া বাজিয়াছে।

পয়সার লোভে হেমপ্রভা একটা অসঙ্গত কাজ করিয়া বসিতে পারেন—এত অনায়াসে বড় কথাটা উচ্চারণ করিল মণীন্দ্র! ছেলের উপর দুরন্ত অভিমানটা বৈরাগ্যের বেশে আসিয়া দেখা দেয়।

নিজের দিকটাই এত বড় হইয়া উঠিল! মায়ের মনের দিকটা একবার তাকাইয়া দেখিল না! কী লজ্জায় কুণ্ঠায় মরমে মরিয়া আছেন তিনি, সেটা অনুভব করিবার চেষ্টা মাত্র করিল না!—যা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার তো চারা নাই, কিন্তু এত অগ্রাহ্য করিয়াই বা লাভ কি?—একেবারে স্থির বিশ্বাস করিয়া বসিলে—অপাত্র! নিজেই একবার দেখাশোনা কর, ম্লেচ্ছ খৃষ্টান নও যে মেয়ের আবার বিবাহ দিবে! অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া অনেকে তো ছেলেকে জামাইকে বিলাতেও পাঠায়। তাই কেন মনে করো না? না হয় পাঁচ-সাত বৎসর ছাড়া-ছাড়িই থাকত?—বারো বছরের মেয়ের যৌবন আসিতে কত যুগ লাগে? পরিপুষ্ট গঠন-ভঙ্গির ভিতর এখনই কি ছোঁয়াচ লাগে নাই তার?

আচ্ছা বেশ, ফ্যাশানের দায় চাপাইয়া নবযৌবনা কন্যাকে শিশু করিয়া রাখো—কিন্তু হেমপ্রভা যদি মনে-প্রাণে নিষ্পাপ থাকিয়া থাকেন, একদিন নিজেদের ভুল বুঝিতে হইবে তোমাদের।

ভগবানের কাছে বার বার প্রার্থনা করিতে থাকেন হেমপ্রভা—অগ্রাহ্য অবহেলায় যার নামটা পর্যন্ত শুনিতে রুচি করিল না মণীন্দ্র, সেই ছেলেই যেন শিক্ষায় দীক্ষায় চরিত্র-গৌরবে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, লোভনীয় হইয়া ওঠে। —নিতান্তই বড় স্নেহের তাপসীর

ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত তাই, তা নয়তো—হয়তো হেমপ্রভা অভিসম্পাত দিয়া বসিতেন—সেই লোভনীয় বস্তুর পানে চাহিয়া চাহিয়া যেন একদিন অনুতাপের নিঃশ্বাস ফেলিতে হয় মণীন্দ্রকে—চিত্রলেখাকে।...না থাক্, হেমপ্রভা কায়মনে আশীর্বাদ করিতেছেন—তাপসীর ভবিষ্যৎ যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন না হয়। তবে হেমপ্রভা এবার সরিয়া যাইতে চান।

নিজস্ব সমস্ত সম্পত্তি তাপসীর নামে দানপত্র করিয়া দিয়া হেমপ্রভা আষাঢ়ের এক বর্ষণ-মুখর রাত্রে সর্বতীর্থসার বারাণসীর উদ্দেশে রওনা হইয়া গেলেন।

কলিকাতার বাড়ীতে আর ফিরিলেন না।

তাপসীর উপর অনিচ্ছাকৃত অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছেন তাহারই খেসারৎ-স্বরূপ বোধ করি এই দানপত্র।

শাশুড়ীর আক্কেল দেখিয়া চিত্রলেখা আর একবার স্তম্ভিত হইল। এ কি ঘোর শত্রুতা! তা ছাড়া—বেবিকে 'লায়েক' হইয়া উঠিবার আবার একটি সুযোগ করিয়া দেওয়া হইল! একেই তো মেয়ে মায়ের তেমন বাধ্য নয়, আবার অতগুলো বিষয়-সম্পত্তির মালিক হইয়া উঠিলে রক্ষা থাকিবে?...চিত্রলেখার বিরুদ্ধে এ যেন যুদ্ধ ঘোষণা হেমপ্রভার! শাশুড়ীর কাশীবাসের সংবাদে যথেষ্ট হৃষ্ট হইবার সুযোগ আর পাইল না বেচারা।

যাক্ তবু নিষ্কণ্টক!

এতদিনে চিত্রলেখা উঠিয়া পড়িয়া লাগে মেয়ে-ছেলেদের সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে। সদ্য দেখিয়া আসা সেজকাকীর ও তস্য ভগিনীর ছেলে-মেয়েদের দৃষ্টান্ত তো আছেই, তা ছাড়া আছে চিরদিনের স্বপ্নসাধ।—শাশুড়ীর জ্বালায় যেটা সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে পায় নাই।

গভীর রাত্রে রাত্রি জাগিয়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে—না প্রেমালাপ নয়—তর্ক হইতেছিল।

চিত্রলেখার স্বর স্বভাব-অনুযায়ী তীক্ষ্ণ অসহিষ্ণু, মণীন্দ্র গম্ভীর কিন্তু কতকটা যেন অসহায়। তর্কের বস্তু তাপসী। মণীন্দ্রর ধারণা—তাপসী ছেলেমানুষ হইলেও বিবাহ ব্যাপারটায় তার মনে হয়তো কিছুটা রেখাপাত করিয়াছে, সে রেখা সিঁথির সিঁদুর-রেখার মত অত সহজে মুছিয়া ফেলা বোধ হয় সম্ভব নয়। চিত্রলেখার হিসাবে হয়তো ভুল আছে, মেয়েকে অতি আধুনিক করিয়া গড়িয়া তুলিয়া যথাসময়ে যথার্থ বিবাহের জন্য প্রস্তুত করিবার ইচ্ছাটা একটু যেন অসঙ্গত জেদের মত। কিন্তু চিত্রলেখার কথার উপর তেমন জোর দিয়া কথা বলার ক্ষমতা মণীন্দ্রর কই?

তাই দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলেন—হয়তো শেষ পর্যন্ত সেই বিবাহটাকেই মেনে নিতে হবে। অবশ্য এখন নয়—যাক্ দু'চার বছর—হয়তো ছেলেটা—

চিত্রলেখা এতক্ষণ নিজের খাটেই ছিল, কিন্তু এখন সঙ্গীন অবস্থায় অতদূর পাল্লা হইতে অস্ত্র নিক্ষেপ কার্যকরী না হওয়ার আশঙ্কায় উঠিয়া আসিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া স্বামীর বদলে বালিশের উপর একটি প্রবল 'চাপড়' বসাইয়া তিক্ত তীক্ষ্ণ স্বরে

বলে—কী, সেই জোচ্চোরদের সঙ্গে আপস করে? তার চেয়ে মনে করব বেবি বিধবা, গোঁড়া হিন্দুঘরের বাল্যবিধবা!

—ছি চিত্রা!

—ছি আবার কিসের? আমার কাছে এই সাফ কথা। তোমাদের সেই পুতুলখেলার বিয়ের বর যদি রাজপুত্তুরও হয়, সে বিয়ে আমি মানবো না, মানবো না, মানবো না। তোমার মার স্বেচ্ছাচারিতার কাছে কিছুতেই হার মানবো না।

—দেখ, মার হয়ে ওকালতি করতে চাইছি না আমি, কিন্তু ভেবে দেখ, বেবির মনের ওপর যদি এর কোন প্রভাব পড়ে থাকে—

—তোমার কথা শুনলে আমার সুইসাইড করতে ইচ্ছে করে। ওইটুকু একটা বাচ্চা—দুধের শিশু বললেও হয়, দুনিয়ার কিছুই যে জানে না—তার বিষয়ে এসব কথা ভাবো কি করে তাই আশ্চর্য! ওর আবার মন, তার ওপর আবার প্রভাব! একটা চকোলেটের ভাগ নিয়ে অভীর সঙ্গে বাবলুর সঙ্গে খুনসুড়ি করে—

—তা করুক। শুনতে পাই—পৃথিবীতে আমার শুভ জন্মদিনে—আমার মা সারাদিন নাকি কেঁদেছিলেন একটি মাটির পুতুলের বিয়োগব্যথায়।

—থাক্ থাক্, প্রত্যেক বিষয়ে তোমার মার উদাহরণ শোনবার শখ আমার নেই। ওঁদের আমলের মত অকালপক্ক ছেলেমেয়ে এখনকার নয়। নিশ্চয়ই জেনো, সেই বাজে ব্যাপারটা বেবি মোটেই মনে করে নেই। এবং যাতে আর কখনো মনে না পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে।—যাক্ সে কথা, বেবির জন্যে যে টিউটরের কথা বলেছিলাম তার কি করছো! ম্যাথামেটিক্সে কি যাচ্ছেতাই কাঁচা ও—তার খেয়াল রাখো?

—খেয়াল? আমি আর কি রাখবো? তুমিই তো—কিন্তু কি যেন নাম ভদ্রলোকের—হিমাংশু বুঝি? তা তিনি কি আর পড়াবেন না?

—আঃ, তোমার সঙ্গে কথা কওয়া একটা বিরক্তিকর ব্যাপার! সেদিন অত কথা বললাম, সব ভুলে গেছো! হিমাংশুবাবু ইংলিশটা ছাড়া আর কিছু ভালো করে দেখেন না। অবশ্য সেইটাই প্রধান তা জানি, কিন্তু কোন কিছুতেই কাঁচ থাকবে, তা চাই না আমি।

—বেশ তো, ওঁকে নয় বলে দেখবো সপ্তাহে চারদিন না এসে যদি ছ'দিন অন্তত আসেন। অবশ্য পে'টা কিছু বাড়াতে হবে—

—না।

—না মানে?

—'না' মানে না। ওর আর কোন মানে নেই। ছোটলোকের মত যে একই টিউটর—ইংলিশ দেখবে, ম্যাথামেটিক্স্ দেখবে—হিস্ট্রী, জিওগ্রাফী, বেঙ্গলী, গ্রামার সবই দেখবে—এটা আমার জঘন্য লাগে। তা হলে বাবলু অভীরই বা আলাদা টিউটরের দরকার কি—সাধারণ

কেরানী বাড়ীর মত একটা টিউটর এসে তিনজনকে ধরে সবগুলো সাবজেক্টের মিক্সচার খানিকটা গিলিয়ে দিয়ে গেলেই চমৎকার হয়।

—সে কথা হচ্ছে না। মণীন্দ্র হতাশ ভঙ্গীতে বলেন—ও বেচারা আর কখন সময় পাবে? সপ্তাহের মধ্যে তিনদিন তো তোমার গান-বাজনা-এস্রাজ আর ডান্সিং মাষ্টারের নিষ্ঠুরতা —বাকি চারদিন তো হিমাংশুবাবুই আছেন। সপ্তাহটা তো রবারের নয় যে টেনেটুনে বাড়িয়ে নেবে!

—কেন সকালে? রুটিন হিসেবে চললে অনায়াসেই এক ঘণ্টা করে সময় বের করা যায়।

—সকালে? আহা!

—এই সব বাজে সেন্টিমেন্টের কোন মানে হয় না। 'আহা' কিসের? এই তো শিক্ষার সময়। জগতে যা কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে সবগুলোই দেখতে হবে চেষ্টা করে। এত সুযোগ থাকতে—

মণীন্দ্রনাথ মনে মনে বলেন—নিজের জীবনের সুযোগের অভাবই বোধ করি তোমাকে এমন জ্ঞানী করিয়া তুলিয়াছে! মুখে বলিতে সাহস পান না, শুধু ভাবিতে চেষ্টা করেন—চিত্রলেখার ভাগ্যে সে সুযোগ ঘটিলে মণীন্দ্রর নিজের ভাগ্যে কি ঘটিত!

মেয়েকে সর্ববিদ্যা-পটিয়সী করিয়া তুলিবার দুরন্ত সাধনায় মেয়ের জীবনটা চিত্রলেখা দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া ভারি একটা ক্ষোভ ছিল মণীন্দ্রর, কিন্তু সহসা একদিন মেয়েরই এক নূতনতর আবদারে 'তাক' লাগিয়া গেল তাঁহার।

সপ্তাহের সব কয়টা দিনকে রবারের মত টানিয়া টুনিয়া বাড়াইবার অপূর্ব কৌশল আয়ত্ত করিলেও, রবিবারের সকালটাকে উদার ঔদাসীন্যে বাদ দিয়া রাখিয়াছিল চিত্রলেখা। সেই দুর্লভ ক্ষণটুকুকেও কাজে লাগাইবার বায়না লইয়া বাবার দরবারে আসিয়া হাজির হইল বেবি।

মায়ের কাছে তাহার সব বিষয়েই কুণ্ঠা, বাবার কাছে নিশ্চিত প্রশ্রয়ের নিশ্চিন্ততা। অতএব জগতের যাবতীয় শিক্ষণীয় বস্তু সম্বন্ধে মায়ের যতই উৎসাহ থাক্, বেবি আসিয়া বাবাকেই ধরিয়া পড়িল—সে গাড়ী চালানো শিখিবে।

মেয়ের অভিনব ইচ্ছায় সস্নেহ হাসি হাসিয়া মণীন্দ্র কহিলেন—কেন বলো তো? অক্ষয় রিটায়ার করতে চায় নাকি?

তাপসী হাসিয়া বাবার চেয়ার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া বলে—বাঃ তা কেন? শিখে রাখা ভালো নয় বুঝি? মোটর ড্রাইভিং শেখে না মানুষ?

বলা বাহুল্য, বাবার দরবারে আবেদন করিবার কালে একটু নির্জন অবসরের জন্য যতই চেষ্টা করুক বেচারা, অমিতাভ তাহার সঙ্গ ছাড়ে নাই। দিদির কথা শেষ হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গেই নিতান্ত অবজ্ঞাভরে বলিয়া উঠে—মানুষরা শেখে নিশ্চয়ই, দরকারও আছে শিখে রাখবার, মেয়েমানুষে শিখতে যাবে কি জন্যে ?

—অভী, আবার ? তীব্র নয়নে অগ্নি হানিয়া দিদি সরোষে বাবার কাছে অভিযোগ করে—বাবা দেখছো ? অভী আবার আমাকে 'মেয়েমানুষ' বলে ঠাট্টা করছে ?

অর্থাৎ বোঝা যায় ঠাট্টাটা পূর্ব-নিষিদ্ধ।

কিন্তু অমিতাভ কিছুমাত্র দমে না। সজোরে বলে—যে যা, তাকে তাই বললে ঠাট্টা হয় বুঝি ? আমাকে 'পুরুষমানুষ' বলো না, কিছুই রাগ করবো না আমি। যা সত্যি, তা বলতে দোষের কি আছে ?

তাপসী নিরুপায় আক্রোশে উত্তেজিত হইয়া বলে—কেন থাকবে না ? কানাকে 'কানা' বললে দোষ হয় না ? খোঁড়াকে 'খোঁড়া' বললে দোষ হয় না ? গরীবকে—

অমিতাভর সহসা সশব্দ হাসিতে সব উদাহরণগুলা আর দাখিল করা সম্ভব হয় না তাপসীর পক্ষে।

মণীন্দ্রও অবশ্য মেয়ের যুক্তির মৌলিকত্বে হাসিয়া ফেলিয়াছেন, তবু দুর্বলের পক্ষগ্রহণ নীতির বশে ছেলের হাসির প্রতিবাদ করেন—বা রে অভী, হাসছো কেন তুমি ? ঠিকই তো বলেছে বেবি। মেয়েদের 'মেয়ে' বললে তোমার মা চটেন না ?

—মা তো সব তাতেই চটেন। মার কথা বাদ দাও।…মা সম্বন্ধে এই নির্ভীক মন্তব্যটি উচ্চারণ করিয়া অমিতাভ নিতান্ত বিচক্ষণের মত বলে—আমি শুধু বলছি, দিদি এই বুদ্ধি নিয়ে গাড়ী চালালে প্রত্যেক দিনই তো অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটাবে।

—কেন রে শুনি ? মেয়েদের গাড়ী চালাতে দেখিস্‌নি কখনো ? রোজ অ্যাক্সিডেণ্ট করে তারা ?…তাপসী এবার নিজেই হাল ধরে।

—তারা তোর মত হাঁদা মেয়ে নয়। তোর পক্ষে ওই পিড়িং পিড়িং সেতার বাজানো, আর 'চিঁচিঁ' করে গান শেখাই ভালো।

মণীন্দ্র সকৌতুক হাস্যে ছেলেমেয়েদের এই বাগ্‌বিতণ্ডা উপভোগ করিতেছিলেন। এবার হাসিয়া বলেন—ও: তাহলে অভীবাবুর মতে গানবাজনা শেখা হাঁদাদের উপযুক্ত কাজ ! আমার তো তা ধারণা ছিল না !

অভী বেকায়দায় পড়িয়া ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বলে—তা কেন ! দিদির মত মেয়ে আর কি করবে—

—সবই করবে।…মণীন্দ্র সস্নেহ গাম্ভীর্যে বলেন—ইচ্ছে করলে চেষ্টা থাকলে সবাই সব করতে পারে, বুঝলে অভী ? মেয়েছেলে বলে তফাৎ করবার কিছু নেই। হয়তো এমন হতে পারে, বেবি তোমার চাইতে ভালো ড্রাইভিং শিখবে।

অমিতাভ একটা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া দিদির দিকে দৃষ্টিপাত করে। অর্থাৎ 'ওই আনন্দেই থাকো'।

মণীন্দ্র মেয়ের দিকে তাকাইয়া বলেন—কিন্তু সপ্তাহে তো ওই এক বেলা মাত্র ছুটি তোমার, সেটুকুও খরচ করে ফেলতে চাইছো?

বেবি সোৎসাহে বলে—ওতে তো ছুটির মতই মজা, ছুটির চেয়েও ভালো। মাকে বলে-টলে ঠিক করে দাও না বাবা!

—হ্যাঁ, ওই একটা দিক আছে বটে। দেখি তিনি কি বলেন!

অমিতাভ নিশ্চিন্ত স্বরে বলে—কি আবার বলবেন, মা তো ওই চান, খালি ফ্যাশন শিখুক মেয়েটি। হ্যাঁ, যদি আমি বলতাম-তাহলে ঠিক বলতেন—'এখন তোমার লেখা-পড়ার সময়, এখন ওসব থাক্।'

নিজের কণ্ঠস্বরে মায়ের কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য নকল করিয়া হাসিয়া ওঠে।

—কিন্তু শেখাচ্ছে কে? অক্ষয়? রাজী হবে তো? মানে সময় হবে তার?

বেবি আগ্রহ-চঞ্চল স্বরে বলিয়া ওঠে—খুব খুব। অক্ষয়কে তো বলে-টলে ঠিক করে রেখেছি। শুধু মার মত হলেই—

মাঝপথে কথা থামিয়া যায় স্বয়ং মাতৃদেবীর আবির্ভাবে।

কথা থামাইয়া বাবার চেয়ারটার সঙ্গে আর একটু ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়ায় তাপসী, ভীত-চঞ্চল দুটি দৃষ্টি মেলিয়া।

—কি? কিসের পরামর্শ হচ্ছে তোমাদের?

—বিশেষ কিছু না।...মণীন্দ্র নিতান্ত লঘুভাবে বলেন—বেবির শখ হয়েছে গাড়ী চালাতে শিখবে, তাই—

চিত্রলেখা শ্লেষ-মিশ্রিত একটু হাসির সঙ্গে বলেন—তবু ভালো! তোমার মেয়ের 'শখ' বলে জিনিসটা আছে তাহলে! আমি তো জানি সবই আমার শখে করতে হয়!...শেখাচ্ছে কে? তুমি নাকি?

—আমি? তবেই হয়েছে! অক্ষয় আমার অভ্যাস খারাপ করে দিয়েছে। ওই অক্ষয়ই শেখাবে। অবশ্য অভীর মতে—

—থাক্ থাক্, বালক-বৃদ্ধ সকলের মতামত শোনবার সময় আমার নেই। আমি বলতে এসেছিলাম—

কথার মাঝখানে একঝলক কাল-বৈশাখী ঝড়ের মত ছুটিয়া আসে সিদ্ধার্থ।

—দাদা, দিদি, তোমরা এখানে? ওদিকে দেখগে যাও কি মজা হচ্ছে! অক্ষয় একটা পাখী ধরেছে—একদম সবুজ! কি সুন্দর লাল লাল পা! একটা ঝুড়ি চাপা দিয়ে রেখে এখন কঞ্চি দিয়ে খাঁচা বানাচ্ছে। আমি ধরছিলাম—তোমরা দেখতে পাবে না বলে একবারটি শুধু—আসবে তো এসো।

অমিতাভ অবশ্য 'একদম সবুজ' পর্যন্তও দাঁড়াইয়া শুনিবার অপেক্ষা রাখে নাই। সংবাদদাতার সংবাদ-দান-কার্য সম্পন্ন হওয়ার আগেই ঘটনাস্থল উদ্দেশে দৌড়াইয়াছে।

বেবিও নিজেকে সামলাইতে পারে নাই। সিদ্ধার্থের সঙ্গে সঙ্গে সেও প্রায় ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়।

অক্ষয় ওদের অনেক দিনের লোক।

অধস্তন ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করা চিত্রলেখার অত্যন্ত অপছন্দকর হইলেও অক্ষয় সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের ঠিক আঁটিয়া উঠিতে পারে না।—"অক্ষয়টি হচ্ছে এদের দুষ্টু বুদ্ধির যোগানদার" এর বেশী আর কিছু বলা হয় না।

স্বামীর ঘরে আসিয়া পর্যন্ত অক্ষয়কে দেখিতেছে সে। স্বামীরও পুরনো লোক বলিয়া কেমন যে একটা সমীহ ভাব, দেখিলে হাসিও পায়, গাও জ্বালা করে। গ্রাম্য মনোভাব আর কি!

চিত্রলেখার ভাগ্যের সবদিকেই যেন কাঁটা ঘেরা। পাগড়ীধারী ছ' ফুট দীর্ঘদেহ পাঞ্জাবী ড্রাইভার-সম্বলিত গাড়ীর চেহারা কেমন আভিজাত্যপূর্ণ!...সে জায়গায় আধময়লা ছিটের শার্ট পরা বেঁটে খাটো অক্ষয়!

ছি!

স্ত্রীর মুখের উপরকার নানা বর্ণের খেলা বোধ করি মণীন্দ্রর চোখে পড়ে না। হালকা সুরে বলেন— বেবি ভাবনায় পড়েছে তোমার পাছে আপত্তি হয়। আপত্তির আর কি আছে, এঁ্যা? ছেলেমানুষের শখ—ক'দিন আর টিঁকবে?

মেয়ের হইয়া ওকালতির প্রয়োজন খুব বেশী ছিল না অবশ্য।

চিত্রলেখার আপত্তি হইবার কথা নয়। তবে প্রস্তাবটা অপর পক্ষ হইতে আসায় বেশী উৎসাহ প্রকাশ করা যায় না এই যা।

নিজে যে বিশেষ কিছুই শিখিতে পায় নাই, এই একটা দারুণ ক্ষোভ, মাঝে মাঝে নিজের সন্তানদের উপরও কেমন যেন ঈর্ষান্বিত করিয়া তোলে।

বেবি ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইবার পর অন্য একটা কথার ছুতা ধরিয়া স্বামীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করিয়া উঠিয়া যায়, এবং মেয়ের এই শখের প্রস্তাবের স্বপক্ষেই বা কতটুকু রায় দেওয়া যায়, এবং বিপক্ষেই বা কি কি যুক্তি দেখানো চলে, মনে মনে তাহার হিসাব করিতে থাকে।

স্বামীর সংসারে আসিয়া পর্যন্ত ক্রমাগত লড়াই করিতে করিতে স্বভাবটাই কেমন যেন 'রণং দেহি' গোছের হইয়া গিয়াছে তাহার।

বুড়ী এক শাশুড়ী, আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বামীর হাতে পড়িয়া জীবনটাই মিথ্যা হইয়া গেল।

বাহির হইতে মণীন্দ্রকে যতই অনুগত আর পত্নীসর্বস্ব দেখাক, আসলে যে সেটা কত ভুয়ো, চিত্রলেখার মত এমন মর্মান্তিক করিয়া আর কে জানে?

অথচ অদৃশ্য বস্তুর সঙ্গে লড়াই করা চলে না।

মণীন্দ্রর বাহিরের ভঙ্গীটা নিতান্তই আত্মসমর্পণের ভঙ্গী।

তাই না এত জ্বালা চিত্রলেখার!

মেয়েকে 'চৌকস' করিয়া তুলিবার সাধটা নিজেরই নিতান্ত প্রবল বলিয়া মেয়ের সাধের স্বপক্ষেই রায় দিতে হয় চিত্রলেখাকে। অবশ্য অনেকগুলি শর্তাধীনে নিমরাজী ভাব দেখাইয়া।

সম্মতি দেওয়ার পর আর চুলের ডগা দেখিতে পাওয়া যায় না মেয়ের।

মনে হয় যেন হাওয়ায় ভাসিতেছে।...যাক মন্দের ভালো। সবটাই তো বুড়ীর মত, একটা বিষয়েও তবু প্রাণ-চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে।

নির্দিষ্ট দিনে বেবি অভী গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই অক্ষয় ভালোমানুষের মত পিছনদিকে উঠিয়া বসে। যেন তাহার আর কোনো কাজ নাই, হাত-পা ছড়াইয়া বসিয়া যাইবে।

—ও কি, তুমি ভেতরে বসলে যে?...তাপসী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

—কেন আজ তো তুমি চালাবে, আমার ছুটি।

—বাঃ, আমি তো সবে আজ থেকে শিখবো। আমি বুঝি চালাতে পারি?

—ওঃ তাই বুঝি! আমি ভাবছি বেবিদিদি আজ আমাকে ছুটি দিয়ে দিলে।

—ইস, ভারি তো কাজ, আমি খুব পারি। অমিতাভ সগর্বে চালকের আসনে উঠিয়া বসে এবং স্টীয়ারিংয়ে হাত দিয়া গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে—লাইসেন্স যে নেই, ওই তো হয়েছে মুস্কিল!

—এই অভী দুষ্টু ছেলে—যা ভেতরে বস্‌গে যা, আজকে আমি শিখবো। অক্ষয় এসো না লক্ষ্মীটি, এখুনি হয়তো মার মত বদলে যাবে।

—বা রে আমি শিখবো না বুঝি? অমিতাভ প্রায় দিদির মতই নাকী সুর তোলে—মেয়েদের তো ভারি দরকার, শুধু শখ। ছেলেদেরই তো—

—আরে তুমি আবার শিখবে কি, তোমার তো সব শেখাই আছে। অক্ষয় হাসিতে হাসিতে স্বস্থানে আসিয়া বসে। বলে—বেবিদিদি এসো।

আগে 'বেবিই' বলিত, আজকাল কি ভাবিয়া কে জানে 'দিদিটা' যোগ দিয়াছে। অমিতাভ অনিচ্ছামন্থর গতিতে পিছনের 'সীটে' এবং তাপসী মহোৎসাহে সামনের 'সীটে' উঠিয়া বসে।

—আজ শুধু দেখে নাও মন দিয়ে, বুঝলে? কোন্‌দিকে যাবো?

—কেন রেস কোর্সে!...অমিতাভ ফোড়ন দিয়া ওঠে—ওখানেই তো চক্কর দেওয়ার সুবিধে।

—তা কেন?...তাপসী ক্ষীণ কণ্ঠে আপত্তি জানায়—তার চাইতে এমনি যেদিকে ইচ্ছে—

—হ্যাঁ যেদিকে ইচ্ছে, অমিতাভ পুরুষোচিত তীব্রকণ্ঠে মন্তব্য করে—দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যেতে হবে নাকি? অক্ষয় তুমি দিদির কথা শুনো না, ওর যদি কোনো বুদ্ধি আছে!

—না কোনোদ্ধি নেই, যত বুদ্ধি তোর মাথায় ভরা আছে। তাপসী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—

কলকাতায় সব কিছুই বুঝি আমরা দেখেছি! এই যে, কলকাতায় ক'টা কলেজ আছে জানিস? দেখেছিস্ সব?

—কলেজ? আহা রে! কী একেবারে দ্রষ্টব্য জায়গা! তার চেয়ে বললি না কেন দিদি, কলকাতায় ক'টা গোয়াল আছে তাই দেখে বেড়াই!

তাপসীর কণ্ঠ আবার স্তিমিত হইয়া আসে—গোয়াল আর কলেজ এক হলো! খুব তো বুদ্ধি। ম্যাট্রিক দেবার পর আমাকে বুঝি পড়তে হবে না?

—তাই এখন থেকে দরজা চিনে রাখবি?

ভাইবোনের বাগ্‌বিতণ্ডার অবসরে গাড়ী অনেক দূর অগ্রসর হইতে থাকে।

—এই তো এসে গেল প্রেসিডেন্সী কলেজ।...অক্ষয় মন্তব্য করে।

তাপসী চ্যালেঞ্জের সুরে বলে—আচ্ছা অভী, বল্ তো প্রেসিডেন্সী কলেজে কত স্টুডেণ্ট আছে?

—কত? ইঃ কে না জানে? পাঁচশো।

বলা বাহুল্য দিদির কাছে খাটো হইবার ভয়ে ভাবনা-চিন্তার অপেক্ষা না রাখিয়াই উত্তর দিয়া বসে অমিতাভ।

সঙ্গে সঙ্গে ফল ফলে, তাপসী যথেচ্ছ হাসিয়া ওঠে।

—খুব বলেছিস্! আমি বলছি এক হাজার কিংবা দু হাজার।—এই, এই অক্ষয়, থামাও তো গাড়িটা, একটু দাঁড়িয়ে থাকলেই তো দেখা যাবে কত ছেলে আসবে। দশটা বাজবে তো এখুনি।

—আজ আর দশটা বাজবে না বেবিদিদি। অক্ষয় ভাইবোনের তর্ক কলহটা উপভোগ করিতে করিতে সহাস্যে বলে—আজ যে রবিবার!

রবিবার! রবিবার! ওঃ তাই তো! এই প্রচণ্ড সত্যটা ভুলিয়া বসিয়াছিল তাপসী! কী আশ্চর্য!

—দিদি এবার পাগল হয়ে যাবে। অমিতাভ গম্ভীর মত ব্যক্ত করে—যা মাথার অবস্থা হচ্ছে দিন দিন। এখন ক্লাস নাইনে পড়েন, এখুনি থেকে 'কলেজ কলেজ'। উনি আবার কলেজে পড়বার সময় হোস্টেলে থাকবেন, জানো অক্ষয়?

—হ্যাঁ থাকবো! বলেছি তোকে?

—বললি না সেদিন? সেই যেদিন তোর গানের মাস্টারমশাই এলেন না, বাগানে চলে গেলাম আমরা। বললি না?

—হ্যাঁ, সে তো শুধু বলেছি হোস্টেলে থাকলে বাড়ীর থেকে পড়া ভালো হয়। হয় না অক্ষয়? বাড়ীর মত তো গোলমাল নেই।

—কি করে জানবো দিদি! সাবধানে মোড় ঘুরিতে ঘুরিতে অক্ষয় উত্তর দেয়—কলেজেও পড়ি নি, হোস্টেলেও থাকি নি।

—পড়লে না কেন ?···অমিতাভ গম্ভীরভাবে বলে—শিক্ষাই জীবনের মূলমন্ত্র বুঝলে ? অনেক অনেক পাস করলেই উন্নতি করতে পারতে।

অক্ষয় ক্ষুণ্ণভাবে বলে—কই আর পড়তে পেলাম ভাই—বাপ-ঠাকুদ্দা-কাকা সবাই মারা গেল—

তাপসী উৎসুক ভাবে বলে—সবাই মারা গেলে বুঝি পড়া যায় না ? খুব মন খারাপ হয়ে যায় ?

অক্ষয় হাসিয়া ফেলে—মন খারাপের জন্যে নয়রে দিদি, টাকা লাগে না ?

—ওঃ টাকা ! ভারি যেন আশ্বস্তভাবে তাপসী বলে···অনেক অনেক টাকা থাকলে পড়া যায় তাহলে ?

—দিদি তুই থাম্।···অমিতাভ বিরক্তস্বরে বলে—এমন বোকার মত কথা বলিস্ আজ-কাল, কোনো যদি মানে থাকে ! অক্ষয়, তার চেয়ে চল বরানগরে। একদিন তোমার বাড়ী দেখিয়ে আনবে বলেছিলে যে—

—আমার বাড়ী ? গরীবের বাড়ীর আর কি দেখবে অভীবাবু, তোমার মা শুনলে রাগ করবেন।

—মা তো সব শুনলেই রাগ করেন, ছেড়ে দাও মায়ের কথা। চলো তুমি।

গাড়ী চলিতে থাকে।

তাপসী ম্লানমুখে চুপচাপ বসিয়া থাকিতে থাকিতে এক সময় বলে—অভী, তুই এদিকে এসে বোস্, আমার ভাল লাগছে না।

ছেলেমানুষের কণ্ঠে এমন শ্রান্তির স্বর কেন ?

অক্ষয় চকিতভাবে বলে—শরীর খারাপ লাগছে বেবিদিদি ? বাড়ী ফিরবে ?

—না-না, বাড়ী বিশ্রী !

'বিশ্রী' হইলেও এক সময়ে ফিরিতেই হয় বাড়ীতে।

মণীন্দ্র সহাস্যমুখে বলেন—কী হলো তোমাদের ? কতটা এগোলো ?

—ছাই এগোলো ! অমিতাভ বলে—দিদির শুধু মুখেই ওস্তাদি, শিখতে পারলে তো ! খোলা জায়গায় গিয়ে তবে তো শিখতে হয়, তা নয়—কি শখ না কলকাতায় কটা কলেজ আছে দেখবো !

মণীন্দ্রনাথ চমকিয়া বলেন—কটা কি আছে ?

কলেজ ! দু' বছর পরে কবে পাস করবেন তাই এখন থেকে কলেজ দেখে বেড়াবেন। মা যেমন শাড়ীর দোকান দেখে বেড়ান—কোনটা পছন্দ হয় না—তাই না বাবা ?

বাবা কিন্তু কথার উত্তর দেন না, তীক্ষ্ণভাবে একবার স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া থাকেন। কন্যার দর্শন মেলে না। কোথায় যে সরিয়া পড়িয়াছে, পাত্তা পাওয়া যায় না।

অমিতাভ বাপের কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া হাসিতে হাসিতে দ্রুতভঙ্গীতে বলিয়া চলে—দিদিটা আজকাল কী বোকাই হয়েছে বাবা! আজ রবিবার তা খেয়াল নেই, কলেজের ছেলে গুণতে বসেছিলেন বাবু।—আচ্ছা বাবা, প্রেসিডেন্সী কলেজে কত স্টুডেণ্ট আছে? দিদি বলছে—এক হাজার! এত ছেলে কোথায় ধরে বাবা?

দিন যায়··

এইভাবেই বারে বারে ছোট ভাইয়ের কাছে অপদস্থ হইতে থাকে তাপসী। ছেলেমানুষ অমিতাভ সত্যই অক্ষয়ের কাছে বসিয়া প্রায় হাত পাকাইয়া ফেলে, আর লাইসেন্স পাইবার বয়স আসিতে আরো কত দিন লাগিবে, সনিঃশ্বাসে তাহার হিসাব কষিতে থাকে।

অথচ তাপসী গাড়ীতে উঠিয়াই অনর্থক শুধু এলোমেলো ঘুরাইয়া মারে অক্ষয়কে। কলিকাতার প্রত্যেকটি রাস্তাঘাট, প্রতিটি স্কুল-কলেজ, পার্ক, সিনেমা দেখিয়া বেড়াইবার কি যে এক বাজে খেয়াল চাপিয়াছে তাহার!

অমিতাভর সঙ্গে তর্কের বেলায় অবশ্য যুক্তি তারও আছে।

কলিকাতায় বাস করিয়া যদি কলিকাতার সব কিছু না দেখা হইল তবে আর গাড়ী থাকিয়া লাভ কি? কিন্তু একই জায়গা বার বার দেখিবার স্বপক্ষে আর যুক্তি জোগায় না তার, ছোট ভাইয়ের জেরার মুখে কাঁদিয়া ভাসায়।

চিত্রলেখা এত খবর রাখেন না, রাখেন মণীন্দ্র এবং কেন জানি না মনে মনে শঙ্কিত হইতে থাকেন।

বৎসর ঘুরিতে দেরি লাগে না। মণীন্দ্র ভাবিয়া চিন্তিয়া একদিন প্রস্তাব তুলিলেন—এবারে গ্রীষ্মের ছুটিতে মায়ের কাছে কাশী যাওয়া যাক। ছেলেরা তো এক পায়ে খাড়া, তাপসী অধীর আগ্রহে চিত্রলেখার মুখপানে চাহিয়া অপেক্ষা করে মা কী রায় দেন, কিন্তু চিত্রলেখা যেন এক ঝটকায় সকলের উন্মুখ চিত্তকে তচনচ করিয়া দিলেন।

—আবার 'সামার ভেকেশনে' মার কাছে? বলতে লজ্জা করলো না তোমার? মুখে আটকালো না? বেশ, যেতে পারো, কিন্তু মনে জেনো, তার আগে পটাসিয়াম সায়ানাইড খাবো আমি। তারপর যা খুশী কোরো তোমরা।

অতএব কথাটা চাপা পড়িয়া যায়।

ঢিলে পায়জামা আর হাফশার্ট পরাইয়া মেয়েকে চিত্রলেখা ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে মানুষ করিতে থাকেন, আর নিজের বুদ্ধিগৌরবে উত্তরোত্তর আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে থাকেন।

কাটিতে থাকে দিনরাত্রি।

সূর্য আর চন্দ্র নিজের নিয়মে আবর্তিত হইতে থাকে। বয়স বাড়িতে থাকে পৃথিবীর—বাড়িতে থাকে মানুষের। রাত্রির যবনিকা দিনের পৃথিবীকে ঢাকিয়া দেয়—মৃত্যুর যবনিকা মানুষকে ঢাকে।

কিন্তু পৃথিবীর জীবনে ঘটে নূতন সূর্যোদয়, ঘটে ঋতুচক্রের আবর্তন। দীর্ঘ অবসরের সুযোগে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখা দেয় ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে রঙের সমারোহ—প্রজাপতির পাখনায় নিত্যনূতন বৈচিত্র্য। ত্রুটিহীন প্রকৃতি দেবীর প্রতিটি কাজ সমাপ্তি-মধুর।

হায়! মানুষ এখানে হার মানিয়াছে। তার জীবনে অবসর নাই, তাই ত্রুটিবহুল জীবনে তার সব কিছুই অসমাপ্ত।

মেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মণীন্দ্রনাথ যত বেশী পীড়িত হইয়াছেন, তার শতাংশের একাংশও যদি কার্যকরী হইত, তবে হয়তো তাপসীর জীবনের ইতিহাস হইত অন্যরূপ!—কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না মণীন্দ্র, অনেক কিছু পরিকল্পনা মাথায় লইয়া হঠাৎ একদিন চির অন্ধকারের পথে পাড়ি দিলেন।

সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়া হেমপ্রভা কাশীবাসিনী হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এখানেও ধীরে ধীরে কেমন করিয়া যেন গড়িয়া উঠিতেছিল নূতন সংসার। সংসার ভিন্ন আর কি? মানুষই সংসার। যাহারা মুখাপেক্ষী, যাহারা আশ্রিত, তাহাদের জন্য নিজের স্বামীপুত্রের সংসারের মতই খাটিতে হয়, চিন্তা করিতে হয়। হেমপ্রভাকে কেন্দ্র করিয়া এমনি একটি আশ্রিতের সংসার গড়িয়া উঠিয়াছিল।

মা-বাপ-মরা যে ছেলে দুটি স্কুলে যায় তাহাদের আহারের তদ্বির সারিয়া হেমপ্রভা সবে গঙ্গার ঘাটে স্নানে গিয়াছেন, রাঁধুনী বামুন-ঠাকরুণ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া কহিল—মা চান হয়েছে? কলকেতা থেকে আপনাকে নিতে এসেছে।

—নিতে এসেছে? সে কি? কে?

—জানি না মা। নাম বললে লালবেহারী—

—হ্যাঁ, কলকাতার বাড়ীর সরকার—কি বলছে সে?...অজানা একটা আশঙ্কায় বুকটা থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে হেমপ্রভার।

—কিছু বলছে না—শুধু বলছে—"ঠাকুমাকে নিতে এসেছি।"

হেমপ্রভা আর প্রশ্ন করিতে সাহস করেন না। ধীরে ধীরে বাড়ী ফেরেন। বাহিরের ঘরে লালবিহারী বসিয়াছিল চুপচাপ। হেমপ্রভা আসিয়া দাঁড়াইতেই পায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ওঠে।

আপাততঃ সত্য খবর গোপন করিয়া মণীন্দ্রের সাংঘাতিক অসুখের ছুতায় হেমপ্রভাকে লইয়া যাইবার সংকল্পে মনে মনে কত কথা সাজাইয়া আসিয়াছিল, কিছুই বজায় রাখিতে পারেন না। মেয়েমানুষের মত বিলাপ করিয়া কাঁদিতে থাকে।

নাঃ, সন্দেহের আর অবকাশ নাই।

হেমপ্রভার জন্য চরম দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করিয়া গেল মণীন্দ্র। অপরাধের ভারে ভারাক্রান্ত হেমপ্রভা নিজেই তো নিজের জন্য নির্বাসন দণ্ড বাছিয়া লইয়াছিলেন, তবুও তৃপ্তি হইল না তাহার? আরো শাস্তির প্রয়োজন হইল?

কাঁদিলেন না, মূর্ছা গেলেন না, কাঠের মত বসিয়া রহিলেন হেমপ্রভা, দেয়ালে পিঠ ঠেসাইয়া।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া লালবিহারী নিজেই স্থির হইল। চোখ মুছিয়া বলিল—আমার সঙ্গে যেতে হবে যে ঠাকুমা!

—যেতে হবে? হেমপ্রভা চমকিয়া উঠেন, কার কাছে লালবিহারী?

—মার কাছে, খোকা খুকীদের কাছে, আমাদের কাছে। আপনি না গেলে আমরা কোথায় দাঁড়াবো ঠাকুমা!

হেমপ্রভা এক মিনিট চুপ থাকিয়া বলেন—বৌমা কি আমাকে নিয়ে যেতে তোমায় পাঠিয়েছে লালবিহারী?

লালবিহারী ঢোঁক গিলিয়া বলে—তাঁর কি আর মাথার ঠিক আছে ঠাকুমা। পাঠিয়েছেন বৈকি, তিনিই তো খবর দেবার জন্যে—

হেমপ্রভা ম্লান হাসির সঙ্গে বলেন—খবর দিতে বলেছে তা জানি। বলবে বৈকি, সকলের আগে আমারই তো এ খবর পাওয়া উচিত। কিন্তু যেতে আমি পারবো না লালবিহারী। বৌমাকে এ মুখ দেখাতে পারবো না আমি।

—কিন্তু ঠাকুমা, খোকা-খুকীদের—

—তাদের আর আমি কি করতে পারবো লালবিহারী? হয়তো অনিষ্টই করে বসবো।

সত্য কথা এই—চিত্রলেখা শুধু টেলিগ্রাম করিয়া দিবার হুকুম দিয়াছিলেন। লালবিহারী নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া সরাসরি চলিয়া আসিয়াছে।—হেমপ্রভার স্থির মুখভাব দেখিয়া আর ভরসা থাকে না তাহার, তবু কাতরভাবে বলে—তাহলে একলা ফিরে যাবো ঠাকুমা?

—একলাই তো সবাইকে ফিরতে হবে লালবিহারী।

হেমপ্রভা আর একবার ম্লান হাসেন।

আবার কিছুক্ষণ কাটে। একসময় বলেন—ওঠো লালবিহারী, স্নানটান করে, জল মুখে দাও।

লালবিহারী আর একবার হাহাকার করিয়া ওঠে—ও অনুরোধ আর করবেন না ঠাকুমা।

হেমপ্রভা স্থিরস্বরে বলেন—করবো বৈকি লালবিহারী, করতে তো হবেই। আমি নিজেই কি এখুনি স্নান-আহার করবো না? আজ না পারি, কাল করবো।—মণি যখন 'মা' বলে অয়োকে এতটুকু দয়ামায়া করলো না, আমি আবার কোন্ লজ্জায় অভিমান করবো, শোক করবো?

যে বিবাহ ব্যাপারটাকে লইয়া এত কাণ্ড, তাপসী ভিন্ন আরও যে একটি অংশীদার আছে তাহার, সেকথা ভুলিয়া থাকিলেই বা চলিবে কেন? বেচারা বুলুর দিকেও তো একবার চাহিতে হয়! অগাধ অর্থের মালিক হইলেও মাতৃপিতৃহীন অসহায় কিশোর যেদিন জীবনের একমাত্র নির্ভরস্থল পিতামহকে অকস্মাৎ হারাইয়া বসিল, সেদিন সেই অগাধ অর্থের পানে চাহিয়া যে সে কিছুমাত্র ভরসা বোধ করিল, এমন মনে করিবার কারণ নাই।

চারিদিকে চাহিয়া—একটা নিঃশ্বাসরোধকারী গুরুভার অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়িল না তাহার।

স্বপ্নের মত কি যে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে সে ছবিও স্পষ্ট মনে পড়ে না।—জানিয়া বুঝিয়া বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিবার মত বয়স তো তাহার নয়ই, তা ছাড়া সময়ও ছিল না। ব্যাপারটা যে সত্যই 'বিবাহ' এ বোধই কি জন্মিয়াছে ছাই!

বিবাহ এবং ঠাকুর্দার মৃত্যু— দুইটা অপ্রত্যাশিত বস্তু যেন তালগোল পাকাইয়া হঠাৎ হুড়মুড় শব্দে ঘাড়ে পড়িয়া গেল। নিঃশঙ্কে পথ চলিতে চলিতে যেন কোথা হইতে একটা পাহাড়ের চূড়া ঝড়ে উড়িয়া আসিয়া ঘাড়ের উপর ভাঙিয়া পড়িয়াছে!

অপ্রত্যাশিত এত বড় আঘাতটায় মূঢ় বিপর্যস্ত দিশাহারা হইলেও তবু কান্তি মুখুজ্জের নাতি সে! দিশাহারা হইলেও কর্তব্যহারা হইল না। শ্রাদ্ধের আয়োজনে ক্রটিমাত্র ঘটিল না, দানধ্যান, ব্রাহ্মণ-বিদায়, কাঙালী ভোজন, উচিত মতই হইল। অর্থবল, লোকবল, অভাব কিছুরই ছিল না, শুধু ইচ্ছা প্রকাশের অপেক্ষা।

নিমন্ত্রণ-পত্র বিলি করিবার সময় পিসি রাজলক্ষ্মী একবার কথাটা পাড়িলেন। বিবাহ যখন হইয়াছেই, উড়াইয়া দিবার তো উপায় নাই, শ্বশুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া বৌ লইয়া আসুক বুলু। স্বামী-স্ত্রী 'একঘাট' করিতে হয় এ কথা আর কোন্ হিন্দুর সন্তান না জানে? কাজেই তাপসীদের দিক হইতে আপত্তি তুলিবার আর পথ কোথায়?

নিজের পিসি নয়—কান্তি মুখুজ্জের দূর সম্পর্কের ভাগিনেয়ী। তবু বুলুর মা মারা যাওয়ার পর বুলুর ভার তিনিই লইয়াছিলেন এবং নিজের পিসির বাড়া হইয়াই চিরদিন এ সংসারে আছেন। কান্তি মুখুজ্জেও কন্যার আদরেই এতদিন আশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন তাঁহাকে। কাজেই বাড়ীর ভিতরকার ব্যবস্থাপনা অথবা লোক-লৌকিকতার বিষয়ে উপদেশ-পরামর্শের অধিকার তাঁহারই।

বুলুকে নীরব থাকিতে দেখিয়া তিনি ঈষৎ জোরের সঙ্গে বক্তব্যের পুনরুক্তি করেন।

—শোন্ বাবা, এখন থেকে সবই যখন তোকে মাথায় নিতে হবে তখন কোনো কিছুই তো এড়িয়ে গেলে চলবে না, শুনতে হবে, বুঝতে হবে। বৌমাকে না আনলে তো চলবেই না, আনতেই হবে যে।

কিন্তু নিজের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে যতই অবহিত হোক বুলু, তবু পিসিমার কথার না দিল উত্তর, না তুলিল মুখ। রাজলক্ষ্মী আর একবার বলেন—ওরা শুনছি কলকাতায় চলে গেছে।

খুবই অভদ্রতা হয়েছে ওদের এটা, তবু আমাদের কর্তব্য আমাদের কাছে। আমি সরকার মশাইকে বলে সব ঠিক করিয়ে দিচ্ছি, কাল সকালের ট্রেনে তুমি চলে যাও সরকার মশাইয়ের সঙ্গে, বুঝলে? একটা দিন কলকাতার বাড়ীতে থেকে একেবারে পরশু বৌমাকে নিয়ে ফিরবে।

এতক্ষণে বুলু কথা বলে, বলে বেশ সজোরে মাথা নাড়িয়া—ও সব আমি পারবো না—চিনি না, কিচ্ছু না।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিয়া বলেন—চিনতে তো হবে! নাকি হবে না? তোকে কিছুই বলতে কইতে হবে না বাপু, শুধু লোক-দেখ্‌তা একবার গিয়ে দাঁড়াবি, যা বলবার সবই সরকার মশাই বলবেন।

—সরকার মশাই নিজেই যান না তবে!

—না রে বাপু তা হয় না। এ সব সমাজ-সামাজিকতার ব্যাপার, যা নিয়ম তা করতেই হয়! তোমার দায় যখন—

—হ্যাঁ দায়! ভারি একেবারে ইয়ে—আমাকে কেউ চেনে বুঝি?

—না:, এ ছেলেটা অচেনার ভয়েই সারা হলো দেখছি! ওরে বাপু, এই সূত্রে চেনা-পরিচয় করে নেওয়াটাও তো হবে। হুট্ করে কাজটা হয়ে গেছে, মেয়ের মা-বাপ জানতে পারে নি, ব্যাপারটা তো একটু জগাখিচুড়ি মতনই হয়ে রয়েছে, পরিষ্কার করা দরকার নয় কি? অবিশ্যি নিন্দে আমি ওদের করবোই—যতই হোক মেয়ের পিতামহী যখন নিজে বসে সম্প্রদান করেছেন, তখন মা-বাপের আর বলবার কি আছে? তাছাড়া হিঁদুর মেয়ের বিয়ে, ফিরিয়ে দিতে পারবি না তো? এদিকে এই এত বড় বিপদ ঘটে গেল, উদ্দিশ নেই, কিছু নেই, মেয়ে নিয়ে গট্ গট্ করে চলে গেলি! মেয়েই নয় তোদেরই মস্ত দামী বুঝলাম, কিন্তু আমাদের ছেলেই বুঝি ফেল্‌না।

বলা বাহুল্য রাজলক্ষ্মী দেবী যে উপযুক্ত শ্রোতা ভাবিয়াই বুলুকে এসব কথা শোনাইতে বসিয়াছেন তা নয়, বুলু উপলক্ষ্য মাত্র, নিজের মনের বিরক্তিটাই প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গীতে প্রকাশ করিতে থাকেন তিনি।

বকিতে বকিতে তিনি সরকার মশাইকে ডাকিতে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেই বুলু মরীয়া হইয়া বলে—পিসিমা, ও সব কিছু করতে টরতে হবে না। সত্যিই নয় কিছু, শুধু শুধু—

পিসিমা সন্দিগ্ধভাবে বলেন—কি সত্যি নয়?

—ওই তো ওই সব—

সুকুমার লাবণ্যময় মুখ লজ্জায় লাল হইয়া ওঠে বুলুর।

তবু পিসিমা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। অথবা না বোঝার ভান করেন হয়তো। বলেন—'কি সব'—তাই খুলে বল্‌না বাপু? না বললে বুঝবো কি করে?

বুলু সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া ওঠে—না:, তুমি কিচ্ছু বুঝতে পারো না! সব বাজে কথা—বোঝ না বই কি!

—পারলাম না, রাজলক্ষী হতাশ ভঙ্গীতে বলেন—না পারলে উপায় কি বল্? 'ওই সব' 'সেই সব' বোঝা আমার কর্ম নয়।

—আঃ বাবারে! সেদিন যা সব কাণ্ড হলো মোটেই কিছু সত্য নয়, দাদু শুধু শুধু কেন যে আমাকে—

সহসা দাদুর নাম মুখে আসিতেই অভিমানে বেদনায় নীল আকাশের মত, উজ্জ্বল চোখ দুটি আসন্নবর্ষণ মেঘের ছায়ায় গভীর কালো হইয়া আসে। এক ঝাপ্‌টা শীতল বাতাসের অপেক্ষা, ঝরিয়া পড়িতে বিলম্ব হইবে না।

'দাদু' 'দাদু'! যে নাম তাহার অস্থিতে মজ্জায় শিরায় শোনিতে একাকার হইয়া মিশিয়া আছে সে নামের অধিকারী যে আজ ত্রিভুবনের কোনখানে নাই একথা বিশ্বাস করা কি সহজ! বিশ্বাস করিবার মত করিয়া তলাইয়া ভাবিতে বসাও তো সম্ভব নয়। 'দাদু নাই' একথা মনে মনে উচ্চারণ করা মাত্রই যে মাথার মধ্যে কেমন একটা প্রবল আলোড়ন হয়, দুই চোখ ঝাপ্‌সা হইয়া আসে।

ছুটিয়া গিয়া ধরিয়া আনা যদি সম্ভব হইত!

শোক কি দুঃখ তা বুঝিতে পারে না বুলু, মনে হয় রাগ। হাঁ, রাগই হয় তার দাদুর ওপর। বুলুকে এমন ভাসাইয়া দিয়া দিব্য কোথায় গিয়া বসিয়া রহিলেন— বুলু এখন করে কি?

শুধু কি বিষয়-সম্পত্তি, কোলিয়ারির হিসাবপত্র, অথবা বুলুর নিজের ভবিষ্যতের ভাবনা? আর একটা কি বিট্‌কেল কাণ্ডই না করিয়া গেলেন! সেটা যে ভালোমত করিয়া ভাবিতেও সাহস হয় না।

তবু যাই হোক ঘটনাকে "কিছু নয়—খেলা" গোছের ভাবিয়া লইয়া এই দিন আষ্টেকের মধ্যে ধাতস্থ হইতেছিল বেচারা, পিসিমা আবার নূতন করিয়া ফ্যাচাং তুলিলেন।

'বুলুর বিবাহ হইয়া গিয়াছে।'

কথাটা শুনিলে বন্ধুরা বলিবে কি?—কিন্তু বিবাহটাই কি সত্য? দাদুর মৃত্যুর মত এটাও যেন একটা নিতান্ত অবিশ্বাস্য ব্যাপার, কিছুতেই মনকে মানাইয়া লওয়া যায় না।

অথচ একেবারে ভুলিয়া থাকাও কঠিন।

রাজলক্ষীও বুলুর কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আঁচলে চোখ মুছিয়া বলেন—সে কথা সত্যি, শেষটায় মামার যে কি জেদ হলো! জানি না ভালো করলেন না মন্দ করলেন। তারাই বা কি রকম মানুষ কে জানে—এই তো যা ব্যবহার দেখালে! তবুও ধর্মসাক্ষী করে বিয়ে যখন হয়ে গেছে বাবা, 'সত্যি নয়' একথা তুই বলতে পারিস না। আর তাও বলি—এখনই হাসির কথা হয়েছে, নইলে এণ্ট্রেন্স পাস করে বিয়ে, আগের আমলে খুবই ছিল।...তুই যা বাবা, অমত করলে হবে না। সরকার মশাইয়ের হাতে একটা চিঠি দিয়ে দিই আমি, পাঠিয়ে দেবার কথা জোর দিয়ে বলে দিই। বলতে গেলে

আধখানা বিয়ে হয়ে রয়েছে, বৌভাত ফুলশয্যা পর্যন্ত হয় নি—শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়ে গেলে ওটাও করে নিতে হবে যে!

—ধ্যেৎ! আমি কক্থনো পারবো না।

বলিয়া উঠিয়া পালায় বুলু।

শেষ পর্যন্ত রাজলক্ষ্মী বেশ কিছু ভণিতা করিয়া একখানি চিঠি লিখিয়া সরকার মশায়ের হাতে পাঠাইয়া দেন এবং বৌ আসার আশা আর আশঙ্কায় ঘণ্টা গুণিতে বসেন।

কিন্তু আশার জয় হইল না, হইল আশঙ্কার।

সরকার মশাই ফিরতি ট্রেনেই ফিরিয়া আসিলেন। বলা বাহুল্য একলা। আসিয়া নূতন কুটুম্ব সম্বন্ধে এমন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, যেটা শ্রুতিমধুরও নয়, খুব বেশী সম্মান-সূচকও নয়।

কেবলমাত্র আশাভঙ্গের মনস্তাপে নয়—অপমানের জ্বালায় রাজলক্ষ্মী যা মুখে আসিল তাই বলিয়া গালি দিলেন এবং শেষ পর্যন্ত একটা কটু দিব্যির সঙ্গে বলিয়া বসিলেন—থাকুক ওরা মেয়ে নিয়ে। দেখবো কান্তি মুখুজ্জের নাতির আর বৌ জুটবে কিনা, বুলুর আমি আবার বিয়ে দেবই দেব।

নিজের পড়ার ঘরে বসিয়া বসিয়া সব কিছুই শুনিল বুলু, কিন্তু তাহাকে আর কেহ কিছু জ্বালাতন করিল না। নিজে হইতে তার আর বলিবার কি আছে? শুধু একবার মনে করিতে চেষ্টা করিল—সরকার মশাইয়ের পিছু পিছু আর একটা মানুষ ঢুকিলে লাগিত কেমন!

মানুষ না ছবি?

দাদুর ঘরে একখানা বীণাবাদিনী সরস্বতীর ছবি আছে, ঠিক সেই ধরনের দেখিতে নয় কি? অবশ্য সেই অদ্ভুত রাত্রের কথা প্রায় কিছুই মনে পড়ে না, মনে করিতে গেলেই দিনের আলোয় দেখা একখানা ঝক্‌ঝকে জরিদার লাল শাড়ীমাত্র চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে। ভাবিতে গেলে বল্লভজীর মন্দিরের ছায়াটাই শুধু চকিতের মত মনে পড়িয়া যায়।

খানিকটা আলো আর খানিকটা অলৌকিকত্ব।

তা ছাড়া আর কি?

শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটিয়া গেলে কলিকাতায় রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল বুলু, কিন্তু রাজলক্ষ্মী দেশের বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে রাজী হইলেন না। কেন কি দরকার তাঁর কলিকাতায়? বুলু নাকি হোস্টেলে থাকিয়া পড়াশোনার ব্যবস্থা করিতেছে—তবে? কিসের দায় রাজলক্ষ্মীর যে গোটাকতক ঝি-চাকর লইয়া সেই বৃহৎ বাড়ীখানা আগলাইয়া

পড়িয়া থাকিবেন? কি ছাই আছে কলিকাতায়? এ তো তবু ভালো—কিছু না হোক্ 'বল্লভজী'র মন্দিরটায় দু'দণ্ড বসিলেও মনটা ভালো থাকিবে। রাণীগঞ্জে ফিরিবার প্রয়োজনও ফুরাইয়াছে। মামার সেবার জন্তই কতকটা, তা ছাড়া কতকটা বুলুর জন্তও বটে, সর্বত্রই মামার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়াছেন, আজ সব দিক দিয়াই মুক্তি।

মাতৃহীন শিশু এখন তো স্বাবলম্বী বীরপুরুষ হইয়া উঠিয়াছে—আর মামা নিজে তো দিব্যি নিজের পথ বাছিয়া সরিয়া পড়িলেন। অতএব রাজলক্ষ্মীরও এবার কর্তব্য ফুরাইয়াছে।

তবে হ্যাঁ, স্বাভাবিক নিয়মে যদি সংসারটা চলিত সে আলাদা কথা। পড়ুক না বুলু হোস্টেলে থাকিয়া, পড়ার যদি অসুবিধাই হয় তাহাতে রাজলক্ষ্মী কি আর বাধা দিবেন? এমন অবুঝ নন তিনি। ছেলে মূর্খ হইয়া কোলজোড়া করিয়া থাকুক এ সাধ তাঁহার নাই, কিন্তু বৌটিকে কাছে আনিয়া রাখিবার সাধ কি খুব বেশী অসঙ্গত?

কত আদরে স্নেহে মমতায় সর্বদা কাছে কাছে রাখিয়া সকল বিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়া মানুষ করিয়া তুলিতেন তাহাকে। তারপর যার সংসার তার হাতে তুলিয়া দিয়া ছুটি লইতেন। বুলুর মার পরিত্যক্ত গৃহস্থালি কুড়াইয়া লইয়া কিসের আশায় আগলাইয়া বসিয়া আছেন এতদিন? বুলুর বৌয়ের হাতেই তুলিয়া দিবার সুদূর আশা লইয়া নয় কি?

বৌটি এখানে থাক—ছুটিছাটা পাইলেই বুলু এক-আধবার বাড়ী আসুক। হইলই বা ছেলেমানুষ, কিন্তু সত্যকার ভালোবাসিবার—বন্ধুত্ব করিবার—নিবিড় সখ্যতায় অন্তরঙ্গ হইবার বয়স তো এই। নব পরিণয়ের মাধুর্য উপভোগ করিবার অবকাশ তো এখনই —লজ্জা সঙ্কোচ কুণ্ঠার আড়ালে।

বঞ্চিত নারীহৃদয়ের ঔৎসুক্য লইয়া—কল্পনায় অনেক মধুময় ছবি আঁকিতে বসেন রাজলক্ষ্মী এই কিশোর দম্পতিকে কেন্দ্র করিয়া, কিন্তু ছবি সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার ভাগ্য রাজলক্ষ্মীর নয়। বারে বারে তাই উজ্জ্বল রঙের তুলি বিবর্ণ হইয়া আসে। আর তাপসীর উপর রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিতে থাকে।

অবশ্য তাপসীর আর দোষ কি, দোষ তার বাপ-মার।

ভারি পয়সা মণীন্দ্র বাঁড়ুয্যের, তাই ধরাকে সরা দেখিতেছে! মুখে উচ্চারণ করিলে শুনিতে খারাপ, তা নয়তো বুলুর পয়সায় বুলু অমন দশটা মণি বাঁড়ুয্যেকে চাকর রাখিতে পারে। ছেলের শীঘ্রই আবার বিবাহ দিবার সংকল্পটা এরকম সময় খুব প্রবল হইয়া ওঠে, কিন্তু তাপসীর মুখখানি মনে পড়িলেই যেন সংকল্প শিথিল হইয়া যায়।

সেকালের রাজপুত্রেরা যেমন বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনিত—তাপসীকে তেমনি উদ্ধার করিয়া আনা যদি সম্ভব হইত বুলুর পক্ষে!

যাক্, মনে মনে মানুষ কত কিই ভাবে, বাস্তবক্ষেত্রে তো দাম নাই সে সব কথার। যে কথার দাম আছে সেই কথাই কহিতে হয়।

বুলুর কলিকাতা যাইবার মুখে তাই রাজলক্ষ্মী তাহাকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দেন—দেখো বাপু, একটি কথা বলে রাখছি—কোনো ছলে কোনো উপলক্ষ্যে ওদের বাড়ীর ছায়া মাড়াবে না।

অন্যমনা বুলু ফস্ করিয়া প্রশ্ন করে, কাদের বাড়ী পিসিমা?

—কাদের আবার তোর ওই গুণধর শ্বশুর মশাইয়ের! এখন তো অগ্রাহ্য করে মেয়ে নিয়ে চলে গেলো, যেন কোন সম্বন্ধই নেই। শেষে পস্তাতে হবে! তখন যে টুপ্ করে ওখান থেকে যাওয়া-আসা করিয়ে জামাইটিকে বশ করে নেবেন তা হতে দিচ্ছি না।

—ধ্যেৎ! পিসিমার যত্তো সব ইয়ে! বশ আবার কি? যাচ্ছে কে? রাজলক্ষ্মী মুচকি হাসিয়া বলেন—তা কি জানি, টুকটুকে বৌ হয়েছে, তোর যদি শ্বশুরবাড়ী যাবার মন হয়, তাই সাবধান করে দিচ্ছি। তোর পড়াশুনো শেষ হওয়াটা পর্যন্ত দেখবো, খোশামোদ করে মেয়ে পৌঁছে দেয় তো ভালো কথা—নচেৎ আবার তোর বিয়ে দেব আমি। কি বলবো—মামা নেই তাই, নইলে এখুনি ওদের নাকের সামনে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে বৌ ঘরে তুলতাম। ওর মেম-ফ্যাশানি মা মেয়ে নিয়ে বসে বসে দেখতো। মামা অসময়ে চলে গিয়ে—

রাজলক্ষ্মী আর একবার চোখ মুছিবার জন্যে কথা থামাইতেই বুলু তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম ঠুকিয়া —'দেরি হয়ে যাচ্ছে পিসীমা'—বলিয়া ব্যস্ত হইয়া ওঠে। ওসব কথার আলোচনা করা তাহার পক্ষে অস্বস্তিকর।

কিন্তু রাজলক্ষ্মীর যেন আর অন্য চিন্তা নাই, অন্য কথা নাই।

নিজে ভুলিতে পারেন না বলিয়াই বোধ করি অপর কাহাকেও ভুলিতে দেন না। অথচ ভুলিয়া যাওয়াই সব চাইতে ভালো ছিল নাকি!

ট্রেন ছুটিতে থাকে। বুলুকে ঘুমাইবার পরামর্শ দিয়া, সরকার মশাই নিজে নাক ডাকাতেই সুরু করেন—আর খোলা জানলার বাহিরে নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলিয়া বিনিদ্র বুলু বসিয়া থাকে। বসিয়া বসিয়া কি ভাবে কে জানে!

কৈশোরকাল—স্বপ্ন দেখিবার কাল। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সোনালী স্বপ্ন, নিজেকে রচনা করিবার দুরন্ত ইচ্ছার উদ্দাম স্বপ্ন—আবহমানকাল হইতে পৃথিবীর সমস্ত কিশোরচিত্ত যে বেদনাময় আনন্দের স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছে তাহার স্বপ্ন।

— আসিবার সময় পিসিমা এমন একটা কথা বলিয়া বসিলেন—অদ্ভুত! এদিকে নিজেই তো 'ধর্মসাক্ষীটাক্ষী' কত কি বলিলেন! 'ফেরৎ দেবার উপায় নাই' 'বদলাইবার উপায় নাই' কত সব কথা! এখন আবরে উল্টোপাল্টা কথা সুরু করিয়াছেন!

ধ্যেৎ! দাদু যা করিয়া দিয়া গিয়াছেন—তাহার উপর বুঝি সর্দারি ফলাইতে আছে!—আর এত ভাবনারই বা কি দরকার? বুলুর বুঝি লেখাপড়া নাই? কলিকাতার পড়া সাঙ্গ করিয়া বলু বিলাত যাইবে না যেন!

কলিকাতায় আসিয়া কলেজে ভর্তি হইল বটে, কিন্তু প্রথমটায় কিছুতেই মন বসাইতে পারিত না বুলু। তার সদ্য শোকাহত উদ্‌ভ্রান্ত মনের অবস্থায় সহপাঠিদের হৈ-হুল্লোড়, অকারণ হাসি, অর্থহীন গল্প নিতান্ত বাজে আর বিশ্রী লাগিত। সকলের সঙ্গে মেলামেশা করার মত সপ্রতিভও নয় সে, কাজেই মনমরাভাবে আপনার লেখাপড়া লইয়া একপাশে কাটাইয়া দিত।

কিন্তু বয়সটা ষোল, আর জায়গাটা ছাত্রাবাস।

নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া একপাশে পড়িয়া থাকা বেশীদিন সম্ভব নয়! প্রবল বন্যার আকর্ষণে কে কতদিন অটল থাকিতে পারে? আসন্ন যৌবনের সোনার কাঠি ঘুমন্ত মনকে নাড়া দিয়া জাগাইয়া তোলে, চিত্ত শতদলের এক-একটি দল বিকশিত হইতে থাকে, উন্মুখ হৃদয় বিরাট বিশ্বকে আপনার ভিতর গ্রহণ করিতে চায়।

সকলকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, সবলকে আপনার মনে হয়— অকপট সরলতায় ধীরে ধীরে ধরা দেয় বুলু।

দলের মধ্যে সুকুমার নামক ছেলেটিই চাঁই। সদা-হাস্যময় কৌতুক-প্রিয় এই ছেলেটিকে প্রত্যেকেই ভালবাসে, বলিতে গেলে বুলু তো তার প্রেমমুগ্ধ ভক্ত। কিন্তু সুকুমারই একদিন তাহার মাথা খাইয়া বসিল।

বুলু তখন ঘরে অনুপস্থিত, কি একটুকরা কাগজ লইয়া হাসির বান ডাকিয়াছে ঘরে।

উপলক্ষ্যটা যে বুলু সেটা একটু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায়।

বেশ কিছুক্ষণ হুল্লোড়ের পর রঙ্গমঞ্চে বুলুর আবির্ভাব ঘটে। সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা প্রচুর হাসির রোল। বুলুও হাসিমুখে প্রশ্ন করে—কি হলো হঠাৎ?

—আর কি হলো!—রমেন চশমার ভিতর হইতে চোখ পাকাইয়া বলে— কি বাবা ভালো ছেলে, ডুবে ডুবে জল খেতে শিখেছো? উঃ আমরা ভাবি কি ইনোসেণ্ট!

—তা হঠাৎ এমন কি প্রমাণ পেলে আমার বিরুদ্ধে?—বুলু প্রশ্ন করে।

সুকুমার বাঁকা হাসির সঙ্গে বলে, আমরা কি জানতে পারি 'তাপসী' নাম্নী ভদ্রমহিলাটি কে?

—তাপসী?

আর কিছুই বলে না বুলু, কিন্তু চম্‌কানিটা সুস্পষ্ট।

নিত্য নূতন ফন্দী আঁটিয়া আশেপাশে সকলকে ক্ষেপানো সুকুমারের একটা বিশেষ শখ। সহপাঠিদের তো বটেই, প্রফেসারদেরও ছাড়িয়া কথা কহে না সে। মাঝে মাঝে তাদের নাকালের এক শেষ করিয়া ছাড়ে। সুকুমার যখন বুলুর খাটের তলা হইতে একখানা লেটার প্যাডের পাতা কুড়াইয়া আনিয়া এত হাসাহাসি জুড়িয়া দিয়াছিল, রমেন, দিলীপ, পরেশ, শিবনাথ প্রভৃতি সকলেই ভাবিয়াছিল এটা সুকুমারের নূতন কীর্তি। পরের হাতের লেখা নকল করিবার একটা বিশেষ ক্ষমতা সুকুমারে আছে কিনা!

কাগজখানার একটা পিঠ ভর্তি শুধু একই নাম লেখা—ইংরাজী, বাংলা, টানা হাতের মুক্তাক্ষর। আবার সবগুলির উপর হিজিবিজি আর বড় বড় করিয়া লেখা একটি নাম—তাপসী—তাপসী—তাপসী!

কিন্তু বুলুর চম্‌কানিটা যে নিতান্তই সন্দেহজনক।

—হ্যাঁ হ্যাঁ তাপসী, যাঁর নামের জপমালা তৈরী হয়েছে। চিনতে পারেন হাতের লেখাটা? রমেন সোৎসাহে প্রশ্ন করে।

চিনতে দেরি হয় না। একটা নূতন ফাউন্টেন পেন কিনিয়া আনিয়া নিবটার গুণাগুণ পরীক্ষার্থে বার বার এই নামটাই লিখিয়াছিল বুলু লেটার প্যাডের পাতা ভর্তি করিয়া—কাল কি পরশু ঠিক স্মরণ নাই!

বুলুর অবশ্য আগের চাইতে উন্নতি হইয়াছে, তাই ধাতস্থ হইতে দেরি লাগে না। লজ্জায় লাল হইয়া পড়িয়া অপ্রতিভও হয় না। কাগজখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই অবহেলাভরে বলিয়া উঠে—ওঃ এই! আমি ভাবলাম না জানি আমার বিরুদ্ধে কি ভয়ানক সব প্রমাণপত্র যোগাড় করেছিস্। নতুন পেনটার নিবটা পরীক্ষা করতে আজেবাজে নাম লিখছিলাম বটে কাল!

সুকুমার সন্দিগ্ধভাবে বলে—বলি হে বাপু, এত নাম থাকতে হঠাৎ এই নামটিই বা নির্বাচিত হলো কেন?

—যা হোক কিছু—যে কোনো একটা নাম লিখলেই তোমরা তা থেকে সূত্র আবিষ্কার করতে বসতে, ওর আর কি! ধরো যদি—ওর বদলে 'ক্ষ্যান্তকালী' লিখতাম।

—তাই বা লিখবে কেন? পরেশ গম্ভীরভাবে বলে—আমাদের আদরের প্রাণকেষ্টর নাম লিখতে পারতে।

প্রাণকেষ্ট হোস্টেলের চাকর।

পরেশের কথায় সকলেই আর একদফা হাসিয়া ওঠে।

—প্রফেসর দিগ্বিজয় রায়ের নামটাই লিখতে বাধা কি ছিল? ওঁকে যখন অত পছন্দ করি আমরা!

বুলু হাসিয়া প্রশ্ন করে।

বলাবাহুল্য উক্ত ভদ্রলোকটি ছাত্রমহলের দু'চক্ষের বিষ।

—ওই দেখ, সুকুমার তীক্ষ্ণস্বরে বলে—নিজের কথাতেই ধরা পড়ে যাচ্ছে ছোক্‌রা। দিগ্বিজয়কে আমরা পছন্দ করি না বলেই ঠাট্টা করতে ওর নামটাই মনে পড়লো বুলুর। তার মানে—ঠাট্টাটা বাদ দিলে এই দাঁড়ায়, যাকে পছন্দ করি খাতার পাতায় তার নাম লিখি।

—চমৎকার! তুই আবার বলিস্ কিনা তুই অঙ্কে কাঁচা!—বলিয়া গায়ের শার্টটা খুলিতে খুলিতে নিজের ঘরে চলিয়া যায় বুলু। কিন্তু এ ঘরে আর তাড়াতাড়ি আসে না, চুপচাপ বিছানায় বসিয়া থাকে।

কি আশ্চর্য। এত নাম থাকিতে ও নামটাই বা লিখতে গেল কেন? নিজের অজ্ঞাতসারেই লিখিয়াছিল কি? স্পষ্ট মনে পড়ে না, খেয়ালের মাথায় একবার লিখিয়া ফেলিয়া বার বার সেইটাই চালাইয়া গিয়াছে মাত্র—ধ্যেৎ! কিঁ মনে করিল ওরা কে জানে! সত্যই কিছু সন্দেহ করিবে না তো? কাগজখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেই ভালো ছিল।

কয়েকটা দিন কাটিয়াছে। সেদিনের কথা বুলুর তো মনে নাই বটেই আর কেহ যে মনে রাখিবে এমন সন্দেহ করিবার হেতু নাই। হঠাৎ সুকুমার একদিন কোথা হইতে যে কি পাকা দলিল যোগাড় করিয়া বসিল কে জানে—বুলু দেখিয়া অবাক হয়, তাহার দিকে যে তাকায় সে-ই হাসিতে সুরু করে।

ব্যাপার কি? বুলু কি রাতারাতি চিড়িয়াখানার নূতন আমদানি চীজ বনিয়া গেল নাকি? যতদূর মনে পড়ে সেদিনের মত বেফাঁস বোকামি তো আর একবারও করিয়া বসে নাই।

তবে?

সংক্রামক ব্যাধির মত এ হাসি যে ক্রমশই ছড়াইয়া পড়িতেছে।

নাঃ, আজ আর নিজে যাচিয়া ব্যাপার জানিতে যাইবে না বুলু। তাহার যেন আর মানমর্যাদা নাই! মনে মনে হঠাৎ ভারি একটা অভিমান হয়, বিশেষ তো সুকুমারের উপর। এত ভালোবাসে বুলু সুকুমারকে, অথচ সুকুমারই তাহাকে অপদস্থ করিবার জন্য নিত্য নূতন ফন্দী আবিষ্কার করিয়া বেড়ায়!

স্বভাবদোষে সুকুমার সকলকেই ক্ষেপাইয়া মারে বটে, কিন্তু আজকে বুলুর প্রতি আক্রমণটা যেন বড় প্রবল। কেন? ক্লাসসুদ্ধ ছেলেকে বলিয়া বেড়াইবার মত কি এমন অপকর্ম করিয়া রাখিয়াছে বেচারা?

যাক্‌গে, কারণ জানিবার প্রয়োজন নাই।

নিজের ঘরে আসিয়া সকালের পড়া খবরের কাগজখানা মুখের সামনে ধরিয়া মনে মনে রাগে ফুলিতে থাকে বুলু।

কিন্তু বুলুকে আজ আর ওরা স্বস্তিতে থাকিতে দিবে না। মিনিট কয়েক পরেই সদলবলে সুকুমারের আবির্ভাব। একটানে কাগজখানা টানিয়া লইয়া হৈ হৈ করিয়া ওঠে—কি বাবা যুধিষ্ঠির, কি হলো? এত বড় কাণ্ডটা বেমালুম চেপে যাচ্ছিলে? এখন যে হাটে হাঁড়ি ভাঙলো তার কি! দুধে-দাঁত না ভাঙতেই বিবাহ-পর্বটা সেরে বসে আছো বাবা!

উঃ! ধৈর্যের বাঁধ আর কতক্ষণ থাকে মানুষের? এত বড় আঘাতেও ভাঙিয়া পড়িবে না? ক্ষোভে অপমানে স্বর্গত দাদুর উপর দুরন্ত অভিমানে আপাদমস্তক আলোড়িত হইয়া এক ঝলক জল আসিয়া পড়ে চোখে।

হায়! এটা বাড়ী নয়, কিংবা পিসিমার স্নেহচ্ছায়া নয় যে চোখের জলের মূল্য থাকিবে। ফল ফলিল বিপরীত। একবাক্যে সকলে স্থির করিল বৌয়ের জন্য মন কেমন করিতেছে বুলুর।

বলাবাহুল্য কোথা হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া সহপাঠিমহলে রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছে সুকুমার—বুলু বিবাহিত।

অতঃপর অনেক প্রশ্ন বর্ষণ হইতে থাকে বুলুর উপর।

বুলুরা সত্যই বাঙালী অথবা খোট্টা? বিবাহ কি তাহার দুগ্ধপোষ্য অবস্থাতেই হইয়া গিয়াছিল? এ হেন শুভকর্মটি একেবারে সারিয়া লইয়া কলেজে ঢোকার কারণ কি বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণে ফাঁকি দেওয়া? বৌ দেখিতে কেমন? বন্ধুদের একদিন দেখাইবে কি না বুলু? এই সব অজস্র প্রশ্ন।

প্রশ্ন এবং পরিহাসের ভঙ্গীতে অবশ্য 'দুগ্ধপোষ্যতা'র আভাস খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত হয়। সহপাঠিদের মধ্যে দু-চার বছরের বড় ছেলের তো অভাব নাই।

বুলু কোন উত্তরই দেয় না, আর কাঁদিয়াও ফেলে না! ভারী মুখে চুপচাপ বসিয়া থাকে। বন্ধুদের উপর রাগ করিতেও যেন পথ থাকে না। সত্যই তো সে একটা খাপছাড়া সৃষ্টিছাড়া অভিশপ্ত জীব। জীবনের প্রারম্ভে যে অভিশাপ বর্ষণ করা হইয়াছে তাহার উপর, তাহার ফল ভুগিতে হইবে না? এই সভ্যজগতে সভ্যসমাজে এমন অসভ্য ব্যাপার কি কাহারও জীবনে ঘটে?

বন্ধুদের উপর অভিমানে কিছুদিন আর ভালোভাবে মেলামেশা করে না বুলু, আপনমনে নিজের পড়াশোনা লইয়াই থাকে। নিজেকে যেন সকলের চাইতে স্বতন্ত্র মনে হয়। ভালোও লাগে না। এই ছোট গণ্ডির মধ্যে সামান্য কয়খানা পাঠ্য-পুস্তক নাড়াচাড়া করিয়া দিন কাটানো, আর পরীক্ষার শেষে গোটাকয়েক নম্বর বেশী পাওয়ার মধ্যেই কি জীবনের সার্থকতা?

দূর-দূরান্তরের দেশ হইতে কে যেন হাতছানি দিয়া ডাকে—কোথায় সেই অগাধ সমুদ্র, তুষারকিরীট পর্বতমালা, বিচিত্র-ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠী, জ্ঞানবিজ্ঞানের জন্মভূমি—সভ্যতা আর সৌন্দর্যের লীলানিকেতন—বিশাল পৃথিবী—বিরাট জগৎ—এতটুকু একটা ঘরের মধ্যে নিজেকে আটকাইয়া রাখিবার জন্যই কি মানুষের সৃষ্টি?

কিন্তু অপেক্ষা করিতে হইবে, আরো কিছুদিন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই, বিশ্বের দরবারে যে এখনও নিতান্তই নাবালক সে।

ধীরে ধীরে আবার কিছুটা সহজ হইয়া আসে, আবার সহপাঠীদের আক্রমণের ফাঁদে ধরা দিতে হয়। সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা, পিকেটিং, কর্তৃপক্ষের অনুশাসনের প্রতিবাদে ধর্মঘট—ছাত্রজীবনের বহুবিধ উত্তেজনার মধ্যে কাটিতে থাকে দিনগুলি। অতীতের দুঃস্বপ্ন আর তেমন অব্যবস্থিত করিয়া তুলিতে পারে না। ভীতিবিহ্বল কিশোর চিত্তে আসে যৌবনের দৃঢ়তা, অগাধ সমুদ্রের রহস্যময় আহ্বানে সাড়া দিবার সাহস খুঁজিয়া পায়, নূতন নূতন জ্ঞান আহরণের সংকল্পে সেই সমুদ্র পাড়ি দেয় বুলু।

অবলম্বনহীন রাজলক্ষ্মী রোষে ক্ষোভে স্বর্গগত মাতুল হইতে সুরু করিয়া বুলুর অর্ধবিবাহিতা বধূ পর্যন্ত সকলকে গালি দেন, নিত্য দুইবেলা কাশীবাসের সংকল্প ঘোষণা করেন আর বাঘিনীর মত আগলাইয়া থাকেন বুলুর ঘর-বাড়ী বিষয়-সম্পত্তি। সাতসমুদ্র পার হইয়া বুলু যেদিন ঘরে ফিরিবে, সেইদিন তাহাকে সব কিছু বুঝাইয়া পড়াইয়া তবে তাঁহার ছুটি।

ইত্যবসরে বার দুই সরকার মহাশয়কে লুকাইয়া মূল্যবান উপহারসহ বুলুর শ্বশুরবাড়ী লোক পাঠাইয়াছিলেন, বলাবাহুল্য ফলাফলটা সুবিধাজনক হয় নাই।

চিত্রলেখা তাহাদের তো উপহার-দ্রব্যসমেত পত্রপাঠ বিদায় করিয়াছে বটেই, কিন্তু না করিলেও যে শেষ পর্যন্ত বিশেষ শোভনীয় ব্যাপার ঘটিত এমন নয়। অসম্ভব কল্পনা হইলেও চিত্রলেখা যদি রাজলক্ষ্মীর স্নেহ-ক্ষুধার তৃপ্তি সাধনার্থে মেয়েকে পাঠাইতেই রাজী হইত, সালোয়ার-পাঞ্জাবি-পরা সাইকেল-চাপা বৌকে লইয়া রাজলক্ষ্মী তৃপ্ত হইতে পারিতেন কি?

আসল কথা, মিলের যেখানে একান্তই অভাব, সেখানে মিশ খাওয়াইবার চেষ্টাটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। বিপজ্জনকও বটে।

তাই না শূন্যমণ্ডলবাহী লক্ষ লক্ষ গ্রহ কেহ কাহারও নিকটবর্তী হইতে পারে না, সুদূর ব্যবধানে আপন আপন কেন্দ্রে পাক খাইয়া মরে!

চিত্রলেখা আর রাজলক্ষ্মী ভিন্ন গ্রহবাসী, ভুলক্রমে পরস্পরের কাছাকাছি আসিবার চেষ্টা করিতে গেলে চূর্ণবিচূর্ণ হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন মধুর পরিণতির সম্ভাবনা কোথায়?

কে জানে সাত সমুদ্র পার হইতে বুলু কোন্ ভিন্নমূর্তি লইয়া ফিরিবে? রাজলক্ষ্মীকে চিনিতে পারিবে তো?

ঢিলে পায়জামা আর হাফ্‌শার্ট পরা তাপসীকে রাখিয়া দীর্ঘদিনের জন্য বিদায় লইয়াছিলাম, যবনিকা উত্তোলন করিতেই দেখা গেল—আকাশ পাতাল পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাপসীর।

কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তাই যে তাহাকে ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন ছাঁদে গড়িয়া রূপের উপর অপরূপত্ব দান করিয়াছেন তাহা নয়, প্রয়োগ-নৈপুণ্যের নিখুঁত কৌশলে সৃষ্টিকর্তার উপরও টেক্কা দিতে শিখিয়াছে সে। বাস্তবিক রূপচর্যাকে যদি শিল্পকলা হিসাবে ধরা যায় তো তাপসীকে ভালো শিল্পী বলা উচিত। সাজসজ্জায় অতিমাত্রায় আধুনিক হওয়াটাই যে সৌন্দর্যের মাপকাটি এ বিশ্বাস তাহার নাই, তাই ফ্যাশন-শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া নিজেকে ইচ্ছামত ফুটাইয়া তুলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না সে।

মেয়ের সঙ্গে তাই আর কোনকালেই বনিল না চিত্রলেখার।

নিজের তো সব পথ বন্ধ—বৈধব্যের বেশের উপর কতটাই আর পালিশ লাগানো যায়? অতএব মেয়ের উপর দিয়া মনের সাধ মিটানোর ইচ্ছাটা কি খুব বেশী অন্যায় চিত্রলেখার?

কিন্তু মেয়ে যেন বুনো ঘোড়া। তা নয়তো দেশী বিলাতী সকল দোকান ঘুরিয়া চিত্রলেখা নিজে যে শাড়ী ব্লাউজ জুতা ম্যাচ করিয়া কিনিয়া আনিয়াছে, মানানসই সেই জুতাটাকে বাতিল করিয়া দিয়া একটা জরির চটি পরিয়া বেড়াইতেছে মেয়ে! তার উপর আবার কপালের উপর পিতামহীর আমলের একটা মুক্তার সিঁথি।

দেখিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিতে ইচ্ছা হয় কি না!

বাছিয়া বাছিয়া আবার কেমন দিনটিতে এহেন কিম্ভুত সাজ করা!

কিনা যেদিন কিরীটীর আসিবার কথা!

কত চেষ্টায় চিত্রলেখা এই ছেলেটিকে যোগাড় করিয়া আনিয়া মেয়ের চোখের সামনে ধরিয়া দিয়াছে—আর মেয়ের মোটে গ্রাহ্যই নাই! অথচ এমন একটি পাত্র গাঁথিয়া তুলিতে পারিলে যে কোনো মেয়ে ধন্য হইয়া যায়।

শুধুই কি বিদ্যায়? বুদ্ধিতে, সৌজন্যে, অর্থে, স্বাস্থ্যে অতুলনীয় বলিলেও অতিরঞ্জন হয় না। তার উপর রূপ—যেটা পুরুষের পক্ষে বাড়তি বলিলেও চলে। সে হিসাবে সৃষ্টিকর্তার একটি বেহিসাবী অপচয়ের নমুনা কিরীটী।

এত রূপ, এত গুণ, এত টাকা কিরীটীর, তবু মেয়ের অন্ত পাওয়া ভার। কখনো মনে হয় বেশ সুরাহা—কিরীটীর আসার কথা থাকিলে মেয়ের যে উন্মুখ চাঞ্চল্য সে তো আর চিনতে ভুল হয় না চিত্রলেখার, কিন্তু পরদিনই আবার সব গোলমাল হইয়া যায়, নিজের হিসাবের উপর আর আস্থা থাকে না। হতাশ চিত্রলেখা হাল ছাড়িয়া দিয়া নিজের মরণ কামনা করিতে বসে।

এই তো সেদিন কিরীটী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে মাত্র, আর নাকের উপর দিয়া গট্‌গট্ করিয়া বাহির হইয়া গেল বেবি! ভদ্রতা রক্ষা হইল কি ভাবে! না—"এই যে মিস্টার মুখার্জি, ভালো তো? বসুন, মা আছেন।" ব্যস্। যেন তোর মার চরণদর্শন-পিপাসাতেই এক গ্যালন পেট্রল পুড়াইয়া তোদের দরজায় আসিয়াছেন মিস্টার মুখার্জি! মূর্খ! মূর্খ! তাছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন নির্বোধের বংশ! শেষ পর্যন্ত স্বর্গবাসী স্বামী, আর কাশীবাসিনী শাশুড়ী ঠাকুরাণীর উপরেই সমস্ত ক্রোধটা গিয়া পড়ে।

আজও যে মেয়ের এই সৃষ্টিছাড়া সাজ, এ আর কিছুই নয়—কিরীটীর উপর অবহেলা দেখানো আর মায়ের সঙ্গে যুদ্ধ-ঘোষণা। ওই যে সকালবেলা ফোন করিয়া জানাইয়া রাখিয়াছে কিরীটী যে, সন্ধ্যার 'শো'র জন্য চারখানা টিকিট কিনিয়া রাখিয়াছে লাইটহাউসের! তাই আগে হইতেই বিদ্রোহের সাজ! কত বুদ্ধিমান আর অমায়িক ছেলে! বেবিকে একলা লইয়া গেলেই কি আপত্তি করিত চিত্রলেখা? তা তো নয়। তবু সব সময় অমিতাভ, সিদ্ধার্থ সকলকে সঙ্গে নেয়। অথচ বাঙালীর ঘরের কূপমণ্ডূক ছেলেও নয়—ইয়োরোপ আমেরিকা জাপান ঘুরিয়া আসিয়াছে।

শিক্ষা সহবৎ বুদ্ধি বিবেচনায় অনিন্দ্য। হাজারেও একটা অমন ছেলে মেলে না। কিন্তু হতভাগা মেয়ে কিছুরই মর্যাদা দেয় না।

'বলিব না' প্রতিজ্ঞা করিয়াও শেষ অবধি থাকিতে পারে না চিত্রলেখা। মেয়েকে ডাকিয়া প্রশ্ন করে—এটা কি হয়েছে বেবি?

কোন্‌টা মা?—সরল সুরে প্রতিপ্রশ্ন করে তাপসী।

—এইটা! তোমার এই বিদঘুটে সাজটা! আবার তুমি ওই বিশ্রী গয়নাটা কপালের ওপর চড়িয়েছো? সিনেমা যাবার কথা রয়েছে না আজ?

—সিনেমা? কই?

—ন্যাকামি করিস্‌নে বেবি, সকালবেলা ফোন করলো না কিরীটী?

—ও হো হো। ভুলেই গেছলাম। যাক্‌গে গেলেই হবে, কিন্তু সিঁথি পরলে ঢুকতে দেবে না, নাকি বলছো?

—বলছি আমার মাথা আর মুণ্ডু। ওই জঘন্য সাজটা সেজে যেতে লজ্জা করবে না তোর?

—কেন লজ্জা করবে? বাঃ! নানির এই সিঁথিটার দাম এখন কত জানো?

—জানি না, জানতে চাইও না। দামী হলেই সেটা বাহার হয় না সব সময়। তাহলে ওই 'গিনি'র মালাটাই বা গলায় ঝুলিয়ে বেড়াও না কেন? ওরও তো অনেক দাম!

—ওটা আমার ভালো লাগে না তাই। ওর তো কোনো সৌন্দর্য নেই।

—আর এইটার খুব আছে, কেমন? আচ্ছা যতই সৌন্দর্য থাক্, ওটা খুলে ফেল আজ, আর ওই জরির চটি।

—পাগল হয়েছো মা! কি একটু সিনেমা যাবো তার জন্যে আবার নতুন করে এত কাণ্ড! যা আছি বেশ আছি।

—আচ্ছা বেবি, তুই কি আমায় পাগল করবি? এ রকম সেকেলেপনা দেখলে কিরীটী কি মনে করবে বল্ তো?

—পাগল তোমায় নতুন করে করতে হবে না মা, নিজেই তুমি যথেষ্ট পাগল আছো। জগতে এত লোক থাকতে মিস্টার মুখার্জি কি মনে করবেন না করবেন ভেবে এত দুশ্চিন্তা কেন?

চিত্রলেখা মেয়ের ইচ্ছাকৃত ন্যাকামি আর বরদাস্ত করতে পারে না, জলিয়া উঠিয়া বলে—দুশ্চিন্তা কেন তা তুমি বোঝ না? তুমি কি মনে করো তুমি ভিন্ন আর পাত্রী জুটবে না ওর? নেহাৎ নাকি অতি অমায়িক, অতি ভদ্র ছেলে, তাই এখনো পর্যন্ত তোমার খামখেয়ালীপনা সহ্য করছে। একবার যদি মন ঘুরে যায়—

তাপসী এইবার কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া পড়ে। ধীরস্বরে বলে—কার কখন মন ঘুরে যাবে সেই ভয়ে কাতর হওয়া আমার পোষায় না মা। বাংলা দেশে পাত্রীর অভাব

নেই, ওঁর যে একটাও জুটবে না এমন বাজে কথা ভাবতেই বা যাবো কেন? কিন্তু আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? শুধু শুধু খানিকটা ভুল ধারণা নিয়ে থেকো না।

ভুল ধারণা!

চিত্রলেখা করিবে ভুল ধারণা? মেয়েকে বরং সে বুঝিয়া উঠিতে অক্ষম হইয়া পড়ে মাঝে মাঝে, কিন্তু কিরীটীর বিষয়ে ভুল করিবার কিছু নাই। তাপসীর কাছাকাছি আসিলেই তাহার চোখে মুখে যে আলো জ্বলিয়া ওঠে সে আলো চিনিতে কি ভুল হয়?

সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া কত নীলনয়না রূপসীর, বিদ্যাবতী তরুণীর মোহ এড়াইয়া সে যে চিত্রলেখার মেয়ের হৃদয়দ্বারে প্রার্থী হইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এইটাই কি সোজা বিস্ময়? হউক না তাহার সুন্দর মেয়ে, তবু বিদেশিনীদের রূপগুণ হাস্যলাস্য আকর্ষণী শক্তির কাছে কি? তাহাদের তুলনায় সত্যই কিছু আর চোখে পড়িবার মত নয় তাপসী। তবু কিরীটী যে বেবির প্রেমে পড়িয়াছে একথা চন্দ্র সূর্যের মতই সত্য। চিত্রলেখার ধারণা ভুল নয়।

হঠাৎ একটা কথা মনে হয়—তাপসীর এই যে অবহেলার ভাব, বোধ করি বা অভিমান, হয়তো কিরীটীর প্রেমে আজও সন্দেহ আছে তার, তাই মাঝে মাঝে নিজেকে সরাইয়া লয়। তাই মাকে বলিল, 'মিথ্যে খানিকটা ভুল ধারণা নিয়ে থেকো না'। অর্থাৎ 'মিথ্যা আশা মনে পোষণ করিও না।'

মেয়ের খামখেয়ালী ব্যবহারের খানিকটা হদিস আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়া চিত্রলেখা বেশ খানিকটা ধাতস্থ হয়। প্রসন্ন কণ্ঠে বলে—ভুল ধারণা কিছুই নয় রে বাপু, কিরীটীর মন জানতে আর বাকী নেই আমার, এখন শুধু অপেক্ষায় আছে বোধ হয়—'দেখি এদিক থেকে কোনো প্রস্তাব ওঠে কিনা।' তা এইবার আমি—

প্রস্তাব তো চিত্রলেখা কবেই করিত, কেবলমাত্র 'মনমর্জি' মেয়ের ভয়েই সাহস করে না। যা থাকে কপালে, এইবার একটা হেস্তনেস্ত করিয়া ছাড়িবে সে নির্ঘাত।

তাপসী আরো বেশী গম্ভীরমুখে বলে দেখ মা, তোমায় বাপু বারণ করে দিচ্ছি, ওসব যা তা করতে যেও না। মানুষ কি পুতুল—যে একটাকে নিয়েই বার বার খেলা যায়?

—কি হলো কথাটা?—চিত্রলেখা তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করে—তোমার এ কথার অর্থ?

—অর্থ-টর্থ জানিনে মা, শুধু তোমায় বলে রাখছি, আমার ওপর থেকে আশা ছাড়ো। আজ মিস্টার মুখার্জি পছন্দ করবেন না বলে আমি শাড়ী ছেড়ে স্কার্ট ধরবো—অথবা কাল মিস্টার লাহিড়ী পছন্দ করছেন না ভেবে চা ছেড়ে কোকো ধরবো—এসব আমাকে দিয়ে হবে না।

দুই চোখে অগ্নিবাণ হানিয়া চিত্রলেখা কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকার পর রুদ্ধস্বরে বলে—তোমার মতলবটা আমাকে খুলে বলবে?

—আমার আবার মতলব কিসের? যেমন আছি তেমনি থাকব—ব্যস্।

—ব্যস্? এ কি ছেলেখেলা পেয়েছো নাকি?

—অকারণ রাগ করছ কেন মা? নানির দেওয়া গয়নাগুলো আমার পরতে ভালো লাগে তাই পরি, তোমার যদি খুব বিরক্তিকর লাগে, আর পরবো না। কপাল হইতে সিঁথিটা খুলিয়া ফেলিতে উদ্যত হয় বেবি।

চিত্রলেখা বোধ করি কিছুটা অপ্রতিভ হয়, ঈষৎ নরম গলায় বলে—থাক্ থাক্ ব্যস্ত হবার দরকার নেই, কিন্তু কথা হচ্ছে, কিরীটীর বিষয়ে একটা কিছু স্থির করে ফেলা উচিত নয় কি? সত্যি কিছু আর এভাবে অনিশ্চিতের আশায় দিন কাটিয়ে বসে থাকবার মত সস্তা ছেলে ও নয়, শুধু তোমাকে একটু বিশেষ পছন্দ করে ফেলেছে বলেই এখনো তোমার এসব খামখেয়াল সহ্য করছে। কিন্তু জেনে রেখো, সুযোগ বার বার আসে না। অবশ্য ওকেও যদি তোমার পছন্দ না হয় আলাদা কথা, কিন্তু তা না হলে বলবো সেটা তোমার পক্ষে রীতিমত দুর্ভাগ্য।

—ভাগ্যটা তো আমার নেহাতই দুর্জন মা, নতুন করে আর কি বদলাবে তুমি?

যদিও তাপসী পরিহাসের ছলেই আপন ভাগ্যের নিন্দা করে, তবু মনে হয় ব্যঙ্গের আড়ালে কোথায় যেন রহিয়াছে হতাশার সুর।

চিত্রলেখার মাতৃহৃদয় কাঁপিয়া ওঠে—মুখরা হউক, রুক্ষ মেজাজী হউক, তবু মা। এই যে আজ দশ-বারো বৎসর যাবৎ লড়িয়া আসিতেছে চিত্রলেখা—মেয়ের সেই পুতুল খেলার বিয়েটা নাকচ করিয়া ফেলিবার চেষ্টায়, সে কার জন্য? মেয়েটা সুখী হোক, সংসার করুক, জীবনকে উপভোগ করিবার পথ খুঁজিয়া পাক, এই না উদ্দেশ্য?

বিগলিত স্বরে বলে—ভাগ্য কেন খারাপ হবে? কখনই না। মানুষের অবিবেচনার ফলে যে দুর্ভাগ্য, সে দুর্ভাগ্যকে কেন স্বীকার করে নেবো আমরা? আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি বেবি, এত লেখাপড়া শিখে তুমি এখনো এত কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছো!

তাপসী হাসিয়া ফেলিয়া বলে, সেটা খুব মিথ্যে নয় মা, তোমার মতন অত সংস্কারমুক্ত হতে পারি নি এখনো, ভবিষ্যতে যদি পারি দেখা যাবে।

পূর্বতন সেই 'বিবাহ' নামক খেলাটার নাম আর স্পষ্ট করিয়া কেহই উল্লেখ করে না, শুধু কথার যুদ্ধ চলে। চিত্রলেখা মেয়ের বিদ্রূপে জ্বলিয়া উঠিয়া বলে—এই যদি তোমার উচ্চ আদর্শ হয়, তা হলে ও ছেলেটাকে টাঙিয়ে রেখে ফ্লার্ট করবার তো কোন মানে দেখি না।

—মা! ছি!

চিত্রলেখা কথাটা বলিয়া ফেলিয়া মনে মনে একটু যে কুণ্ঠিত হয় নাই তা নয়, কিন্তু সেটা প্রকাশ করাও সম্মানজনক নয়, তাই আরো জেদের সঙ্গে বলিয়া বসে—নিশ্চয়ই তো, নিজের ব্যবহার নিজে বোঝবার মত বুদ্ধি তোমার হয়নি এটা বলবে না অবশ্যই? কিসের আশায় সে যখন তখন এসে দোরে ধর্না দেয়—রাশ রাশ টাকা খরচা করে? এত দিনে অনায়াসে জবাব দিতে পারতে তুমি। দেওয়া উচিত ছিল।

তাপসী বিরক্তি-গম্ভীরস্বরে বলে—কে কিসের আশায় কি করছে, তার জন্যে আমি দায়ী হতে যাবো কি দুঃখে? আর জবাবের কথা যদি বলো, মিছিমিছি গায়ে পড়ে জবাব দিতে যাব কেন? প্রশ্ন যদি আসে, জবাব দিতে দেরি হবে না তা দেখো।

মেয়ের এ হেন কথা শুনিয়া চিত্রলেখা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে এটা কিছু বিচিত্র নয়; দীর্ঘকাল যাবৎ যে আশাতরুর মূলে জল-সিঞ্চন করিয়া আসিতেছে—মেয়ে যদি এক কথায় তার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া বসে, মনের অবস্থা কেমন হয়?

তাপসীর সঙ্গে মুখোমুখি কোন কথাই কোনদিন হয় নাই এটা ঠিক, তবু চিত্রলেখার নিশ্চিত ধারণা ছিল—এতদিনে মেয়েটা নিজেকে কুমারী কন্যা বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং মনে মনে ভবিষ্যতের রঙীন ছবি আঁকিতেছে, কিন্তু আজকের কথাবার্তাগুলো তো তেমন সুবিধাজনক নয়। শেষ পর্যন্ত এমনি গণ্ডমূর্খ হইল মেয়েটা? এত বড় জীবনটা কাটাইবার একটা অবলম্বনও কি প্রয়োজন হইবে না? বিধবা তবু স্বামীর স্মৃতি বুকে ধরিয়া—, আচ্ছা বিধবা বিয়েও তো হয়। এক যুগ আগেকার সেই ধূমকেতুর মত সর্বনেশে অপয়া ছেলেটা বাঁচিয়া আছে কিনা সন্দেহ! শোনা গিয়াছিল তিন কুলে নাকি কেহ নাই তাহার—তবে? এখনো কি আর টিঁকিয়া থাকা সম্ভব? টাকাকড়িগুলা পাঁচজনে ভুলাইয়া লইয়াছে, ছেলেটা হয়তো—

সব চিন্তাগুলি মনের মধ্যে ভিড় করিয়া উঠিতেই দিশাহারা চিত্রলেখা ক্রুদ্ধ আর তীব্র প্রশ্ন করে—তুমি তা হলে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী হতে চাও, কেমন? তা হবে নাই বা কেন? তোমার দাদি তো স্বেচ্ছাচারী হবার রাস্তা খুলেই দিয়ে গিয়েছেন। কারুর মুখাপেক্ষী তো নও! জমিদারির মালিক—

নিতান্ত ক্রোধের বশেই এত বড় কটু কথাটা উচ্চারণ করে চিত্রলেখা। বস্তুতঃ হেমপ্রভার দানপত্র অনুসারে তাপসীই সব কিছুর উত্তরাধিকারিণী হইলেও সেটা নিতান্তই অভিনয়ের মত—চিত্রলেখাই সব। তাছাড়া বুদ্ধি-বিবেচনা হইবার পর হইতেই তাপসী ক্রমাগতই এই ব্যাপারটার প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু প্রতিকার এখনো কিছু হইয়া উঠে নাই। কিন্তু সেই কথা লইয়া যে এমন তীক্ষ্ণ খোঁচা মারিবে চিত্রলেখা, এইটাই ধারণা ছিল না তার।

মর্মাহত তাপসী কি একটা বলিতে যাইতেছিল, সেই সময় সিদ্ধার্থ আসিয়া সংবাদ দিল—মা, দিদি, মিস্টার মুখার্জি এসেছেন!

বেপরোয়া কিশোর তরুণ, তবু বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় মিস্টার মুখার্জি সম্বন্ধে মনোভাবটা নেহাতই বিগলিত। দিদি অগ্রাহ্য অবহেলার ভাব দেখাইলে দিদিকে তিরস্কার করিতে ছাড়ে না।

শুধু অমিতাভকেই নিরপেক্ষ মনে হয়।

চিত্রলেখা হতাশভাবে দুই হাত উল্টাইয়া বলে—আর মিস্টার মুখার্জি!

সিদ্ধার্থ বিস্মিতভাবে বলে—কি হলো?

—কিছু নয়, তোমার দিদির সিনেমা যাওয়ার রুচি নেই।

সিদ্ধার্থ মার কথার উত্তরে বিরক্তভাবে বলে—বাঃ, মজা মন্দ নয়! দাদা বললে 'যাবো না', দিদি এখন ওই বলছে, আমিই বুঝি বোকার মত যাবো শুধু?

তাপসী মৃদু হাসিয়া বলে—কেন অভীর কি হলো?

—কি আবার হবে, হয়েছে মান। মেয়েদের মত কারুর সঙ্গে যাবেন না বাবু, নিজের কি হাত-পা নেই? হাত-পা যেন আমারই নেই, তবু ভদ্রতা বলে একটা জিনিস আছে কিনা?

—নিশ্চয়ই আছে। তাপসী হাসিয়া ফেলিয়া বলে—ভদ্রতা রাখতে নিশ্চয়ই যাওয়া দরকার—কি বল সিদ্ধার্থবাবু? তাছাড়া মেয়েদের তো আবার নিজের হাত-পাও নেই, কারুর সঙ্গে যাওয়া ছাড়া উপায় কি?

নিতান্ত স্বচ্ছন্দগতিতে সিদ্ধার্থের সঙ্গে নীচে নামিয়া যায় তাপসী। সন্দেহ নাই মিস্টার মুখার্জির উদ্দেশ্যেই।

চিত্রলেখা মেয়ের গমনপথের পানে যে দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকেন, তাহার সংজ্ঞা পাওয়া ভার। ক্রোধ? ক্ষোভ? ঘৃণা? অবিশ্বাস? না হতাশা?—মেয়েকে বুঝিতে না পারার হতাশা!

বারান্দায় গিয়া উঁকিঝুঁকি মারিবার এনার্জি আর থাকে না চিত্রলেখার। বসিয়া বসিয়া এক সময় শুনিতে পান—মোটর বাহির হইয়া গেল। অমিতাভ যায় নাই, কণ্ঠস্বর পাওয়া যাইতেছে বাড়ীতে।

মিস্টার মুখার্জি বা কিরীটীকে যে অমিতাভ বিশেষ সুচক্ষে দেখে না, তা তাহার এড়াইয়া যাওয়ার ভঙ্গীতেই ধরা পড়ে। নিতান্তই অনুরোধে না পড়িলে কিরীটীর সঙ্গে কোথাও যাইতে চাহে না।

কিন্তু কেন?

ভালো লাগে না—ভালো লাগে না—কিছুই ভালো লাগে না। ভালো লাগিবার সহস্র উপকরণ চারিদিকে থরে থরে সাজানো থাকা সত্ত্বেও—যেন একটা "ভালো না লাগা'র" তীক্ষ্ণ কাঁটা অহরহ বিঁধিয়া থাকে মনের ভিতর। কোনোমতেই দূর করা যায় না সেই অদৃশ্য শত্রুকে। চলিতে, ফিরিতে, খাইতে, শুইতে, এই কাঁটা যেন প্রতিনিয়ত স্মরণ করাইয়া দেয়—"তুমি অস্বাভাবিক, তুমি অদ্ভুত, তুমি সৃষ্টিছাড়া। সব কিছুতেই খুশী হইয়া উঠিবার অধিকারী তুমি নও, জন্মলগ্নের ক্রূর পরিহাসে সে যোগ্যতা তুমি হারাইয়াছ।"

খুশী হইতে গিয়াও তাই খুশী হইতে পারে না তাপসী, ঠিক অন্তরঙ্গ হইতে পারে

না কাহারও কাছে। পারে না ঠিকমত সহজ হইতে। হাসিতে গিয়া থামিয়া পড়ে, ভালোবাসিতে গিয়া ফিরিয়া আসে। অনেক সময় তাই ব্যবহারটা তাহার সামঞ্জস্যহীন উল্টাপাল্টা, অন্যের কাছে দুর্বোধ্য।

অন্যের কথা দূরে থাক, চিত্রলেখা মা হইয়াও আজ পর্যন্ত চিনিতে পারিলেন না তাহাকে, পারিলেন না খুশী করিতে। বাজার উজাড় করিয়া উপহার-সামগ্রী দিয়া নয়, হৃদয় উজাড় করিয়া ভালোবাসা দিয়াও নয়।

তা ছাড়া কিরীটীর কথাই ধরো, তাপসীকে এতটুকু খুশী করিতে পাইলে যে বেচারা ধন্য হইয়া যায়, সে কথা তো আর এখন গোপন নাই। চেষ্টারও ত্রুটি রাখে নাই, কিন্তু পারিল কই! তাপসীর পায়ের কাছে প্রাণটা ঢালিয়া দিলে, বড় জোর আনন্দ-প্রকাশের প্রসাদ বিতরণ করিতে পারে তাপসী, খুশী হইতে পারে না।

কিরীটী হয়তো ভাবে নিজের ত্রুটি, কিন্তু তাপসী তো জানে ত্রুটি কার। ভালোবাসা পাইয়া খুশী হইবার, ধন্য করিয়া ধন্য হইবার সৌভাগ্য তাপসীর নয়। শিশু তাপসীকে ঘুঁটি করিয়া যাহারা ইচ্ছামত খেলা করিয়া গিয়াছে, তাহাদের উপর ক্রোধে ক্ষোভে মাঝে মাঝে যেন হাত-পা ছুড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয় তাপসীর। কিন্তু ইচ্ছাটা তো আর কাযে পরিণত করা চলে না, তাই আগাগোড়া ব্যবহারই তাহার সঙ্গতিহীন দুর্বোধ্য। চিত্রলেখার মত যদি খেলাটাকে খেলার মতই ঝাড়িয়া ফেলিয়া সহজ হইতে পারিত তবে হয়তো বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু পারিল কই? পারে না বলিয়া কিরীটীর সঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া সিনেমা দেখিতে দেখিতে মাথার যন্ত্রণায় এত বেশী কাতর হইতে হয় তাহাকে যে 'হল'-এর ভিতর বসিয়া থাকা অসম্ভব হয়।

অমিতাভ অবশ্য আসে নাই, দিদির এলোমেলো ব্যবহার সে বরদাস্ত করিতে পারে না, কিন্তু আজকের ব্যবহারে সিদ্ধার্থও কম চটে না। সেও আর এত ছেলেমানুষ নাই যে দিদির এসব যে 'ঢং ছাড়া আর কিছু নয়' এটুকু বুঝিতে অক্ষম হইবে? এমন ভাল ছবিখানা দেখিতে দেখিতে মাঝখানে হঠাৎ বাড়ী ফিরিবার বায়না লইলে কেই বা না চটে? তবু বাহিরের লোকের সামনে কিছু আর দিদিকে দু'কথা শুনাইয়া দেওয়া চলে না, তাই মনের রাগ মনে চাপিয়া গম্ভীরভাবে বলে—সে কি মিস্টার মুখার্জি, আপনি কেন যাবেন? বরং আমিই দিদিকে নিয়ে—

কিরীটী ব্যস্ত হইয়া উত্তর দেয়—না-না, আরে। তুমি বোসো না, আমি ওঁকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আবার এসে জুটছি দেখো না। যাবো আর আসবো—

'তা আর নয়'—সিদ্ধার্থ মনে মনে বলে—'গিয়ে আবার আপনি এখুনি আসবেন। তা হলে আর ভাবনা ছিল না।—ড্রইং-রুমে ঘণ্টা খানেক, সিঁড়ির সামনে আধঘণ্টা, গেটের ধারে কোন্ না মিনিট কুড়ি। ততক্ষণে আর একটা শো শুরু হয়ে যাবে।'

যাক্, মনে মনে কি না বলে লোকে! ভদ্রতাটা বজায় রাখিতে বলিতে হয়—দেখুন দিকি

কী অন্যায়! মাঝখান থেকে আপনারও দেখা হলো না। দিদির এই এক রোগ—মাথাধরা! যখন-তখন মাথা ধরলেই হলো!

দিদিটি ততক্ষণে 'গট্‌গট্‌' করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন। ব্যবহারে চক্ষুলজ্জার বালাই মাত্র নাই। অসময়ে মাথা ধরাইয়া অপরের ক্ষতির কারণ হইলে যে লোক-দেখানো কুণ্ঠার ভাবও দেখাইতে হয় এটুকু সভ্যতার রীতিও মানিয়া চলিতে রাজী নয় যেন।

কিরীটী গাড়ীর দরজা খুলিয়া সরিয়া দাঁড়ানো পর্যন্ত একটি কথাও বলে না তাপসী। গাড়ীতে উঠিয়া জুৎ করিয়া বসার পর বলে—আপনি ছবিটা ছেড়ে না এলেও পারতেন, আমি কি আর এটুকু একলা যেতে পারতাম না?

—নিশ্চয়ই পারতেন। কিন্তু আমার একটা কর্তব্য আছে অবশ্যই।

—কর্তব্য? ওঃ!

কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না, মনে হয় যেন উত্তর খুঁজিতেছে, কিন্তু মিনিট কয়েক পর্যন্ত কিছুই বলে না, জনবহুল পথে সাবধানে গাড়ীটি চালাইয়া যায় মাত্র।

কিছুক্ষণ কাটে—তাপসীই হঠাৎ প্রশ্ন করে—অথবা ঠিক প্রশ্নও নয়—কথা। নীরবতাকে এড়াইবার জন্য অর্থহীন কথা একটা।

—বাবলু খুব চটে গেল, কি বলেন?

—কেন, চটে যাবে কেন?

উত্তরটা দিয়া হয়তো একবার মুখ ফিরাইয়া পার্শ্ববর্তিনীর মুখটা দেখিয়া লয়, কিংবা তার মাথা ডিঙাইয়া রাস্তার ওদিকটা। ঠিক বোঝা যায় না।

—কেন? তাপসী অল্প একটু হাসে—অসময়ে এ রকম মাথা ধরালে ও ভারি চটে যায়।

—কেন? ওর তো এ রকম মাথা-ধরা দেখা অভ্যাস আছে।

—তা হলে দেখা যাদের অভ্যাস নেই, তাদেরই চটা উচিত, এই আপনার অভিমত?

—আমার কোন মতামত নেই। অসুখের ওপর তো হাত চলে না।

—আপনি খুব উদার—তীক্ষ্ণ শোনায় তাপসীর কণ্ঠস্বর—আর ধরুন যদি অসুখটা ইচ্ছাকৃত হয়? তা হলেও রাগ হবে না আপনার?

—তাতেও না।—কিরীটীর স্বরে আকস্মিক বিস্ময়ের আভাস নাই, যেন জানা কথা, এইভাবেই বলে—সেটা তো হবে আরও হাতের বাইরের ব্যাপার।

—ওঃ কিছুতেই তাহলে যায় আসে না আপনার?

—এসব কথা এত তাড়াতাড়ি বলা শক্ত।

—থাক্ বলতে হবে না। উঃ, বাড়ী গিয়ে শুতে পেলে বাঁচি!

এবারও কিরীটী নিরুত্তর। উত্তর দেয় বাড়ীর দরজায় নামাইয়া দিয়া—আপনার কষ্টের কারণ হলাম বলে দুঃখিত। কি আর করা যাবে—পৃথিবীতে নির্বোধ লোক তো কিছু কিছু থাকবেই। যাক্, শুয়ে পড়ুনগে তাড়াতাড়ি।

—মা শুতে দিলে তো!

তাপসীর চোখে যেন কৌতুকের আভাস, কিছু আগে যে রীতিমত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছে বোঝা যায় না।

—মা শুতে দেবেন না! তার মানে?

—তার মানে—অসময়ে বাইরে থেকে এসে শুয়েছি দেখলে ডাক্তার না ডেকে ছাড়বে না।

—তা ডাক্তার আপনার জন্যে ডাকাই উচিত।

—কেন? ব্রেনের চিকিৎসা করাতে?

—ধরুন তাই! সত্যি আপনি কেন যে এমন খাপছাড়া তাই ভাবি। বেশ থাকেন, হঠাৎ কি যে হয়!

—একেবারে সাধারণ হওয়াই কি ভালো?

—আমার তো তাই ভালো মনে হয়। আশপাশের লোকেরা একটু নির্ভয়ে পথ চলে।

—ভয় করবারই বা দরকার কি?

—কি জানি, হয়তো বোকামি!

—নিজেকে বোকা ভাবতেও বোধ হয় খুব ভালো লাগে আপনার?

—লাগে না? তবে বোকামি ধরা পড়লে স্বীকার করতে বাধে না। আচ্ছা চলি।

—যাচ্ছেন? ওঃ নমস্কার। অবশ্য ফিরে যেতে যেতে ছবিটা ফুরিয়ে যাবে।

—ছবির জন্যেই মরে যাচ্ছি, এই আপনার মনে হয়?

—বাঃ মনে হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। এত তাড়াতাড়ি পালাবার, আর কি কারণ থাকতে পারে তবে?

—বেশ। করবো না তাড়াতাড়ি, ছোট সাহেবকে ফিরিয়ে আনার টাইমে গেলেই হলো।

হাতের ঘড়িটা একবার হাত উল্টাইয়া দেখিয়া লয় কিরীটী।

'ছোট সাহেব' অর্থে সিদ্ধার্থ।

—বাবলু রাস্তা হারিয়ে ফেলবে না নিশ্চয়!

—রাস্তা হারিয়ে কেউ ফেলে না—তবু ভদ্রতা বলে একটা জিনিস আছো তো?

—আছে বৈকি। আপনার কাছে তো আবার শুধু ওই একটা জিনিসই আছে। -বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ স্বর।

কিরীটী স্পষ্ট সোজাসুজি একবার চাহিয়া দেখে তাপসীর চোখের দিকে। কি চায় তাপসী? কোন উত্তর? কোন প্রশ্ন? কোন ওর স্বভাবে এমন অসঙ্গতি? এক মিনিট চুপ থাকিয়া বলে—এর উত্তর আছে আমার কাছে, কিন্তু আজ হয় না।

—কেন ক্ষতি কি?

কিরীটী আবার কিছু বলিতে গিয়া থামিয়া যায়—অমিতাভও বেড়াইয়া ফিরিতেছে।

বাঁকাচোখে দুইজনের দিকে একবার চাহিয়া টক্‌টক্ করিয়া গাড়ী-বারান্দার সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া যায়। কথা বলে না।

কিরীটীকে সে দেখিতে পারে না এটা অবশ্য এতদিনে ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু এমন স্পষ্ট অবহেলা বড় একটা করে না।

—আচ্ছা ধন্যবাদ, চলি।

তাপসী নিজেও তো সর্বদা ভদ্রতার বিধি মানিয়া চলে না, তবু কি ভাইয়ের ব্যবহারে কুণ্ঠিত হইয়াছে? তা নয়তো অমন দুর্বল আর ফ্যাকাশে শোনায় কেন তার গলা?

—উত্তরটা কিন্তু শোনা হলো না আমার।

—না-হয় না হলো, ক্ষতি কি? সারা দুনিয়াটাই তো প্রশ্নে মুখর, উত্তর কোথায়? —নমস্কার।

এবার সত্যই চলিয়া যায়।

—কি রে কি হলো? চলে এলি যে? মাথা ধরেছে নাকি?

অন্ধকার ঘরে টুক্ করিয়া এতটুকু একটু শব্দ, পরক্ষণেই আলোর বন্যায় ভাসিয়া গেল সব।—চিত্রলেখার উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের বাকিটা যেন মেয়ের বিছানার কাছে আসিয়া আছাড় খাইল—কখন ফিরেছিস? মাথা ধরলো কেন?

—মাথা ধরার আবার কেন কি? এমন কিছু তো নতুন নয় ব্যাপারটা।—তাপসী উঠিয়া বসে।

—নয় তা তো বুঝলাম। কিন্তু আজ হঠাৎ সিনেমা দেখতে গিয়ে—চিত্রলেখা মেয়ের কাছে বেশ একটু ঘনিষ্ঠ হইয়া বসে—থাক্ না, উঠছিস্ কেন? বলছি—হঠাৎ এভাবে মাথা ধরা—ইয়ে—কিরীটী কিছু বলেন-টলেনে নাকি?

এত মৃদু কণ্ঠস্বর চিত্রলেখার, যেন ফিস্‌ফিস্ করার মত শোনায়।

—বলবে আবার কি? আর মাথা ধরার সঙ্গেই বা সম্পর্ক কি তার? বিরক্তি গোপন না করিয়াই উত্তর দেয় তাপসী।

—না, মানে—তাই বলছি! ইয়ে—একটা কিছু না হলে—

—তুমি কি বলতে চাও, বলো তো স্পষ্ট করে! তীব্রস্বরে প্রশ্ন করে তাপসী।

মেয়ের স্বরের তীব্রতায় চিত্রলেখার যেন আত্মমর্যাদা ফিরিয়া আসে। স্বরের তীব্রতায় মেয়েকে কি আর হার মানাইতে পারে না সে? খুব পারে, নেহাৎ মেয়ের উপর সহৃদয়তা দেখাইতে আসিয়াছে বলিয়াই না! কি জানি, কিরীটীর কোন ব্যবহারে মর্মাহত হইয়াই বিছানা লইয়াছে কিনা বেচারা! অবশ্য কিরীটী তেমন ছেলে নয়, কিন্তু মানুষের ধৈর্যেরও তো সীমা আছে একটা। নিজের মেয়ের মেজাজটিও তো জানিতে বাকি নাই তাহার! আর কিছু নয়—ওই যে সিঁথি-টিঁতি পরিয়া একটা কিম্ভূত-কিমাকার বেশে সিনেমায়

যাওয়া, সেই সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকিবে। অথবা—কি জানি হয়তো বা তাও নয়—বিবাহের প্রস্তাব!

কিন্তু যাই হোক, আর নরম হইবে না চিত্রলেখা, তীব্রস্বরের টেক্কা দিয়া সেও বলে—কি বলতে চাই সেটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি অবশ্যই আছে তোমার, এমন কচি খুকী নও। বলতে চাই কিরীটী আজ প্রোপোজ করেছে কি না।

নিজের আমলের ভাষাই ব্যবহার করে সে।

প্রোপোজ!

তাপসী হঠাৎ হাসিয়া ফেলে—ঠিক আন্দাজ করেছ দেখছি।

চিত্রলেখা ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে বলে—সত্যি বলছিস্ তো? কি ভাবে—মানে ঠিক কি বললে বল্ দিকি?

—বাবলুকে জিজ্ঞেস করো না, ছিলই তো কাছে!

যেন বাবলুকে সাক্ষী রাখিয়া মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছে কিরীটী! শোনো কথা!

—বাবল তো এই এলো, তার মুখেই শুনলাম যে তুমি আগে চলে এসেছো। ডিরেক্ট বাড়ীই চলে এসেছিলে, না ময়দানের দিকে একটু ঘুরে-টুরে—

চিত্রলেখার কথার ছাঁদে যেন কেমন একটা স্থূল লোলুপতা—যেন কথার প্যাঁচে ফেলিয়া মেয়ের কাছ হইতে কী একটা গোপন তথ্য জানিয়া লইতে চায়।

—পাগলামি কোরো না বেশী!—বিছানা হইতে নামিয়া পড়িয়া টেবিলের ধারে আসিয়া একটা বই টানিয়া লইয়া বসে তাপসী।

—হোপলেস্! বিরক্ত হইয়া প্রস্থান করে চিত্রলেখা।

হায়! চিত্রলেখার মত নির্লজ্জ কি আর কেউ আছে জগতে? এখনও সে মেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবিতে যায়, ভালো করিতে চেষ্টা করে! বাবলুকে প্রশ্ন করিবার রুচিও থাকে না। যা খুশি করুক সব।

মা চলিয়া যাইতেই ঘরের আলো নিভাইয়া দিয়া আবার শুইয়া পড়ে তাপসী। মাথা ধরাটা মিথ্যাই বা বলা চলে কি করিয়া? মাথার মধ্যে যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে।—সত্যিই বটে, কতদিন আর এভাবে চালানো যাইবে? নিজের মনের চেহারা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে ভয় করে আজকাল। এই দুরন্ত আকর্ষণকে কতদিন আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে তাপসী? কোন্ মন্ত্রের জোরে? কোন্ দেবতার দোহাই দিয়া? সেই প্রচণ্ড আকর্ষণের সংস্রব ত্যাগ করিবার প্রবল সংকল্প প্রতিদিনই কত সহজে ভাঙিয়া পড়ে।

অথচ—না না, কিছুতেই না, সে অসম্ভব। সম্পূর্ণ অসম্ভব।

চিত্রলেখার সহজ হিসাবের সঙ্গে তাপসীর হিসাব মেলানো সম্ভব নয়।

ভাবা গিয়াছিল—কিরীটী আর সহজে আসিবে না। যতই হোক মান-মর্যাদা বলিয়া একটা জিনিস তো আছে মানুষের। কিন্তু দু'জনের ধারণা উল্টাইয়া দিয়া পরদিনই নিতান্ত

নির্লজ্জের মত আসিয়া হাজির হইল লোকটা। কি না, তাপসীর খোঁজ লইতে আসিয়াছে। তাপসীর মাথা-ব্যথার চিন্তায় বোধ করি সারারাত ঘুমই হয় নাই তাহার। দৈবক্রমে আসামাত্রই তাপসীর দেখা পাওয়ায় প্রসন্ন হাসির আলোয় যেন ঝক্‌মক্‌ করিয়া ওঠে কিরীটী, শরতের সোনালী সকালের সঙ্গে ওর মুখের হাসিটা ভারি মানানসই।

—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

পিঠের আঁচলটা টানিয়া হাতের উপর জড়াইয়া লইতে লইতে তাপসীও হাসিমুখে বলে—হঠাৎ ঈশ্বরের উপর এত অনুগ্রহ?

—তাঁর অশেষ করুণার জন্যে। আশা করি নি, এসেই এভাবে আপনার দেখা পাওয়া যাবে, মানে ইয়ে—এমন সুস্থভাবে।

হঠাৎ প্রকাশিত আবেগের ভাষাটাকে মোড় ঘুরাইয়া একটু সরল করিয়া লয় কিরীটী। যেন ধন্যবাদটা যদি ঈশ্বরের পাওনাই হয় তো সে কেবল তাপসীকে শারীরিক সুস্থ রাখার দরুন।

তাপসী মনে মনে হাসিয়া লইয়া বলে—তবে কি আশা করেছিলেন, মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছি, ডাক্তার-বদ্যিতে বাড়ী ভরে গেছে, 'যায় যায়' অবস্থা!

—আঃ কি যে বলেন! আপনাকে এক এক সময় ভারি বকতে ইচ্ছে করে সত্যি!

তাপসী হাসিয়া ফেলিয়া বলে—বকুন!

—বকবো? নাঃ এরকম 'আপনি আজ্ঞে' করে বকে সুখ হয় না!

—তবে নয় 'তুই-তোকারি'ই করুন!

—হঠাৎ একেবারে ডবল প্রমোশন? অতটা কি পেরে উঠবো! মাঝামাঝি একটা রফা করতে আপত্তি কি?

আপত্তি? আপত্তি আবার কোথায়? দূরত্বের সকল ব্যবধান ঘুচাইয়া সমস্ত হৃদয় যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায় ওই উন্মুখ হৃদয়ের দরজায়।—কিন্তু না না, 'তুমি' সম্বোধনের নিকট-আবেষ্টনের মধ্যে তাপসী আপনাকে রক্ষা করিবে কিসের জোরে? আগুন লইয়া এই ভয়াবহ খেলায় হার মানিতে হয় যদি? কিরীটীকে দেখিলে নিজেকে বাঁধিয়া রাখা যে কত কঠিন সে কথা তো নিজের কাছে আর অজানা নাই আজ।—গতরাত্রের কত প্রতিজ্ঞা কত সংকল্প কোথায় ভাসিয়া গেল এই খুশীতে ঝল্‌মল্‌ মুখখানি দেখার সঙ্গে সঙ্গে। তবে? বরং কঠিন ব্যবহারের নিষ্ঠুর আঘাতে দূরে সরাইয়া রাখা সম্ভব, কিন্তু সম্প্রীতির সরসতার মধ্যে নয়।

হায় ঈশ্বর! তাপসী করিবে কি? অতীতের দুঃস্বপ্ন ভুলিয়া, কাল্পনিক অপরাধের বিভীষিকা ভুলিয়া, শরতের এই নরম সোনালী আলোর মত নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিবে? ন্যায়-অন্যায়ের বিচারই যদি করিতে হয়—এই আগ্রহে উন্মুখ হৃদয়টিকে ফিরাইয়া দেওয়াই কি ন্যায়? ওই হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি ম্লান করিয়া দেওয়াই কি সুবিচার? নিজের হৃদয় শতধা হোক, হয়তো সহ্য করা যায়, কিন্তু কিরীটী? কিরীটীকে ফিরাইয়া দিবার জোর যে আজ

আর কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছে না তাপসী—দূর অতীতের একখানি বিস্মৃত মুখ স্মরণ করিবার প্রাণপণ ব্যর্থ চেষ্টায় নয়, নয় নীতিধর্মের খুঁটি আঁকড়াইয়া থাকিবার প্রাণান্ত চেষ্টায়।

সকালের খোলা আলোয় মুখের লেখা পাঠ করা শক্ত নয়।

'তুমি' বলিতে চাওয়ার আবদারে তাপসীর মুখের আলোছায়ার খেলা কিরীটীর চোখে ধরা পড়ে সহজেই।

তবু কি ভাবিয়া 'তুমি'ই বলে সে!

ম্লান গম্ভীর মুখে বলে—আপত্তি আছে বুঝলাম। তবু মানলাম না তোমার আপত্তি। একটা কথা তোমাকে আমার জানাবার আছে তাপসী, শোনবার সময় হবে আজ?

কথা যে কি, সে কথা কি বুঝতে বাকি আছে তাপসীর? চিত্রলেখার বড় আকাঙ্ক্ষার সেই কথা! কিন্তু তাপসীর? তাপসীর সে কথা শুনিবার সময় কোথায়? আজ নয়, কাল নয়, কোনোদিনই নয়।

মনকে সে ঠিক করিয়াছে।

তাই অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলে—না।

—কিন্তু সে কথা যে আমায় বলতেই হবে, না বলে উপায় নেই। না বলতে পেয়ে—

—কি আশ্চর্য! আপনার দরকার আছে বলেই সকলের দরকার হবে তার মানে কি? আপনার কথা হয়তো আমার কাছে অপ্রয়োজনীয়।

তেমনি মুখ ফিরাইয়াই কথা বলে তাপসী।

কিরীটী কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছে কোন অপমানেই টলিবে না? তা নয়তো এত অবহেলার পরেও এমন ব্যগ্রভাবে কথা কয়?

—তুমি বুঝতে পারছো না তাপসী, শোনবার প্রয়োজন হয়তো তোমারও আছে! আরও আগেই বলা উচিত ছিল আমার, শুধু গুছিয়ে বলতে পারার ক্ষমতার অভাবেই পারি নি। সাহস করি নি। কিন্তু এভাবে আর পারছি না আমি।

আর তাপসীই যেন পারিতেছে!

প্রতিনিয়ত নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে কত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে বেচারা, কে তাহার হিসাব রাখিতেছে! কে সন্ধান লইতেছে সে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হৃদয়ের!

কিরীটীকে দেখিবার আগে কী স্নিগ্ধ শান্তি ছিল জীবনে!

সুখ না থাক্—একটা ছায়াচ্ছন্ন শান্তি, নিশ্চিন্ত বিষাদ। অকাল-বৈধব্যের মত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা সকরুণ নির্লিপ্ততা!

তখন এমন রাত্রির ঘুম হরণ করিয়া নিঃশব্দ প্রেতের মত অতীত আসিয়া বর্তমানের উপর ছায়া ফেলিত না, ছদ্মবেশী শয়তানের মত ভবিষ্যৎ আসিয়া লোভ দেখাইত না।

কিরীটীকে দেখিবামাত্র মনের সেই স্থির প্রশান্তি এমন বিপর্যস্ত হইয়া গেল কেন? এই চব্বিশ বৎসর বয়সের মধ্যে কখনো কি কোন পুরুষকেই চোখে দেখে নাই তাপসী?

চিত্রলেখারও তো এইটিই নূতন প্রচেষ্টা নয়। মেয়ের জন্য পাত্রের আমদানি তো অনেকদিন হইতেই করিতেছেন। তা ছাড়া বাইরের জগতে ঘুরিয়া বেড়াইতে গেলে কত মানুষের সংস্পর্শে আসিতে হয়। তবু—

ব্যর্থ যৌবনের কত বসন্তই তো অনায়াসে পার হইয়া গেল।

আর কিরীটীর কণ্ঠস্বর শুনিলেই কেন শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় আসিয়া জমা হয়? মুখ দেখিলে কেন সমস্ত ভুল হইয়া যায়?

বন্ধুর বেশে এ পরম শত্রু!

কিরীটীর আবার না পারিবার আছে কি? নিজের সঙ্গে এমন যুদ্ধ করিতে হয় তাহাকে? বড় জোর, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব। তার বেশী নয়। নিজের হাতে নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার যে যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণার ধারণা কি কিরীটীর আছে?

হঠাৎ কেমন রুক্ষ শোনায় তাপসীর গলার স্বর।

—আমি পারছি না আর। দয়া করে রেহাই দিন আমায়।

—দয়া! রেহাই! আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না তাপসী!

—বুঝতেও হবে না কষ্ট করে। এইটুকু জেনে রাখুন আপনার সংস্রব আমার অসহ্য!

না, কিরীটীও আহত হয় তবে! ছাইয়ের মত সাদা দেখায় কেন তাহার মুখটা?

—জানলাম! এদিকটা সত্যিই ভেবে দেখি নি কোনদিন। নিছক ভদ্রতা রক্ষার দায়ে তবে কী দুর্ভোগই ভুগতে হয়েছে তোমাকে, আর তারই সুযোগে এতদিন অনর্থক বিরক্ত করে এসেছি আমি। যাক্ নির্বোধ লোক তো থাকবেই পৃথিবীতে, কি বলো? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে—যা বলবার ছিল সেটা বলে ফেলি নি। বললে হয়তো শুধু নির্বোধই বলতে না, পাগল বলতে! আচ্ছা চলি।

সত্যই চলিয়া গেল।

তাপসীর মুখের কথাটাই সত্য বলিয়া জানিয়া গেল তবে?

কিন্তু এ কি শুধু কথা? তীক্ষ্ণ তীর নয় কি? তীক্ষ্ণ আর বিষাক্ত?

আহারের টেবিলে গত সন্ধ্যার কথাটা পাড়িল সিদ্ধার্থ।

দিদির 'ঢং' লইয়া দিদিকে দুই ভাইয়ে খানিকটা বাক্যযন্ত্রণা দেওয়ার শুভবুদ্ধির বশেই বোধ করি কথাটা পাড়িয়াছিল বেচারা, কিন্তু অমিতাভ ঘটনাটা শোনামাত্রই জ্বলিয়া উঠিয়া বলে—চলে এসে এমন কিছু বাহাদুরি হয় নি, উচিত ছিল না যাওয়া। কিন্তু সকালবেলাই আবার কি করতে এসেছিল ওটা? মান-অপমানের লেশ নেই?

সিদ্ধার্থ অবাক হইয়া বলে—ওকি রে দাদা, ভদ্রলোকের সম্বন্ধে হঠাৎ এরকম বেপরোয়া কথাবার্তা বলছিস্ যে?

—আরে যা যা, রেখে দে তোদের ভদ্রলোক! ভদ্রলোক হলে ভেতরে একটু আত্মসম্মান-জ্ঞান থাকতো।

সিদ্ধার্থ বরাবরই কিছুটা কিরীটীর দিকে ঘেঁষা, তাই তর্কের সুরে বলে—নেই তারই বা কি প্রমাণ পেলি হঠাৎ?

—চোখ থাকলেই দেখতে পেতিস! নেহাৎ মার আদরের অতিথি বলেই চুপচাপ থাকি, নইলে একদিন আচ্ছা করে এমন শুনিযে দিতাম যে ভদ্রলোককে আর এ বাড়ীর গেট্ পার হতে হতো না।

সিদ্ধার্থর অবশ্য কিরীটীর উপর দাদার অকারণ এই তিক্ত ভাবের খবরটা কিছু কিছু জানা ছিল, কিন্তু এমন প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণায় সত্যই অবাক হইয়া যায় এবং অমিতাভর মন্তব্যটা দিদির মুখচ্ছবির উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিল, আড়নয়নে একবার দেখিয়া লইয়া বলে—কি ব্যাপার বল্ তো দাদা? মিস্টার মুখার্জি তোর কাছে টাকা ধার করে শোধ দিতে ভুলে যান নি তো?

—যা যা, বাজে-মার্কা ইয়ার্কি করতে হবে না। আমি জানতে চাই, ও যখন-তখন এ বাড়াতে আসে কি করতে? কি দরকার ওর?

তাপসী এতক্ষণ নিরপেক্ষভাবেই মাছের কাঁটা বাছিতেছিল, এখন অমিতাভর কথা শেষ হইতেই সহসা আরক্তমুখে বলিয়া ওঠে—বাড়ীটা আশা করি তোমার একলার নয়?

চশমার কোণ হইতে অবহেলাভরে একবার দিদির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অমিতাভ উত্তর দেয়—আজ্ঞে জানা আছে সে কথা, এবং সেই জন্যেই বেশী কিছু বলি না!

—ভদ্রলোক ভদ্রলোকের বাড়ীতে আসবে এতে বলবারই বা কি আছে রে বাপু তাও তো বুঝি না।

সালিসীর সুরে সিদ্ধার্থ আপন মতামত ব্যক্ত করে। কিন্তু অমিতাভ নিবৃত্ত হয় না, আরো তীক্ষ্ণস্বরে বলে—ভদ্রলোক যদি শুধু ভদ্রভাবে লোকের বাড়ী বেড়াতে আসে কিছুই বলার থাকে না, কিন্তু একটা মতলব নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখলে ঘৃণা করবোই। শুধু তাকে নয়—যারা তাকে প্রশ্রয় দেয় তাদেরও।

অর্থাৎ মাকে দিদিকে সে আজকাল ঘৃণা করিতেই আরম্ভ করিয়াছে।

তাপসীকে উত্তেজিত হইতে বড একটা দেখা যায় না, মার সঙ্গে কথা কয় এত ঠাণ্ডা মাথায় যে চিত্রলেখাই জ্বলিয়া যায়। কিন্তু অমিতাভর কথায় বড বেশী উত্তেজিত দেখায় তাহাকে।

উত্তেজনার মুখে তর্কের খাতিরে হয়তো বা নিজের মতবিরুদ্ধ কথাই বলে। কিংবা মতবিরুদ্ধ নয়ও—নিজের মনের আসল চেহারা নিজেরই জানা নাই তাহার, উত্তেজনার মুখে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

বলে—তাই যদি হয়, সেটা কি খুবই সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড হবে তুমি মনে করো অভি? এতই

যখন বুঝতে শিখেছো—এটুকুও বোঝা উচিত ছিল—তোমার ভাষায়—'মতলব নিয়ে ঘোরাঘুরি করাটা' অসম্ভব কিছুই নয়, অস্বাভাবিকও নয়।

—হতো না—যদি বাড়ীর সকলের জীবনটাও ঠিক স্বাভাবিক হতো। বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ায় অমিতাভ।

সন্দেহের অবকাশ আর থাকে না। বোঝা যায় চিত্রলেখার শিক্ষা সকল ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হইয়াছে। অতি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ অমিতাভর চিত্তবৃত্তিও শিকড় গাড়িয়া বসিয়া আছে পিতামহীর আমলের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার বনভূমিতে!

তাপসীর সেই খেলাঘরের বিবাহটাকে 'খেলা' বলিয়া উড়াইয়া দিবার সাহস বা ইচ্ছা তাহারও নাই। তাই তাপসীর প্রণয়লাভেচ্ছু কিরীটীকে দেখিলে আপাদমস্তক জ্বলিয়া যায় তাহার, আর যদিও তাপসী 'বড়ত্বের' দাবি রাখে, তবু 'দাদাগিরি' ভাবটা বরাবর অমিতাভ ফলাইয়া আসিয়াছে বলিয়াই নিজের বিরক্তি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে দ্বিধা করে না।

কিন্তু তাপসীই বা হঠাৎ এত জোর পাইল কোথায়?

নিজের বিষয়ে সাহস করিয়া বলিবার মত জোর! অমিতাভর কাছে তো চিরদিনই কাঁদিয়া পরাজয় মানিয়া আসিয়াছে সে।

অথচ যা বলে চিত্রলেখা শুনিলে অবাক বনিয়া যাইত।

—স্বাভাবিক নয় বলে যে তাকে স্বাভাবিক করে নেবার চেষ্টামাত্র করে ভাসিয়ে দিতে হবে, জীবন জিনিসটা কি এতই সস্তা অভী?

—তা বেশ তো, জীবনটা দামী করে তোলো না! অমিতাভর সুরে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ—বরং মার মনে একটা সান্ত্বনা থাকবে যে একজনও মানুষ হলো। তবে এও জেনো, এ বাড়ীর ভাত বেশী দিন বরদাস্ত করা আমার পক্ষে শক্ত।

—কি বাজে বাজে বকছিস্ দাদা?

সিদ্ধার্থ কথাবার্তার সুর লঘু করিয়া আনিতে চেষ্টা করে।

অমিতাভ কিছু বলিবার আগেই রঙ্গস্থলে আসিয়া হাজির হয় চিত্রলেখা, মনে হয় যেন আগাগোড়া বর্মাবৃত অবস্থায় সাঁজোয়া গাড়ীতে চড়িয়া একেবারেই ফিল্ডে নামিয়াছে সে। 'রণং দেহি'র সুরেই বলে—দেখো বেবি, অভী তুমিও রয়েছো ভালই—আমি আজ সন্ধ্যায় একটা পার্টি দিতে চাই! মিস্টার মুখার্জি হবেন তার প্রধান অতিথি। বেবির এন্‌গেজ্‌মেণ্টটা আজ পাঁচজনের সামনে পাকাপাকি করিয়ে নিয়ে তবে আমার কাজ। এভাবে বেশীদিন সমাজের সকলের আলোচনার বস্তু হয়ে থাকা আমার রুচিবিরুদ্ধ।

চিত্রলেখার কপাল জোর। এইমাত্র অমিতাভর সঙ্গে ঝগড়ায় জিতিতে গিয়া এরকম কথা বলিয়া বসিয়াছে তাপসী, এখন অমিতাভর সামনেই বা মার কথার প্রতিবাদ করে কোন্ মুখে।

আড়চোখে একবার মেয়ের দিকে তাকাইয়া লয় চিত্রলেখা—না, কোনো প্রতিবাদ আসিল

না। ভাগ্যিস! খুব ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারা হইয়াছে। হুঁ বাবা, এইবার ধরা পড়িয়া গিয়াছো। যতই হোক, চিত্রলেখার বুদ্ধির কাছে তোদের বুদ্ধির গুমর!

অবশ্য বিধাতাপুরুষও এবার চিত্রলেখার সহায় হইয়াছেন।

বেবির গতরাত্রের নাহোক্ 'মাথাধরা'র পর ভোরবেলাই কিরীটীর 'হন্তে' হইয়া ছুটিয়া আসা এবং তখন দিব্য সপ্রতিভ বেবির তাহার সঙ্গে সপ্রেম হাস্যপরিহাসের দৃশ্যটা—দোতলার জানালা হইতে যা-ই চোখে পড়িয়াছিল তাহার, তাই না এত সাহস।

যা ভাবিয়াছিল সে তাছাড়া কিছুই নয় বাপু, বুঝিতে বাকি নাই তাহার। কালকের কিছু একটা বেয়াদবির জন্যই অপরাধী ব্যক্তিটি সকাল না হইতেই ছুটিয়া আসিয়াছিল মার্জনা ভিক্ষা করিতে।

আনাড়িই তো—মেয়েদের চিনিতে যে এখনো অনেক দেরি আছে তাহার। শুধু তাহার কেন, গোটা পুরুষ জাতটারই।—কিন্তু চিত্রলেখা তো আর পুরুষ নয় যে জানিতে বাকি থাকিবে তাহার—বেয়াদবিটাই পছন্দ করে মেয়েরা।

বরং প্রার্থিত বেয়াদবির অভাব দেখিলেই অসহিষ্ণু নারীপ্রকৃতি খাপছাড়াভাবে বিগড়াইয়া যায়।—কিন্তু এমন মূল্যবান তথ্যটা তো আর ভাবী জামাতাকে শিখাইয়া দিবার বিষয় নয়! দিবার হইলে এতদিনে কিরীটীর ব্যাপারের সুরাহা হইয়া যাইত।

অমিতাভ মার দিকে ও বোনের দিকে এক সেকেণ্ড তাকাইয়া লইয়া বলে—পার্টি দেবে—সেটা তোমার বিজনেস, তাতে আমাদের অনুমতির দরকার হবে না নিশ্চয়ই?

—অনুমতির দরকার হবে, এখনো এতটা দুর্ভাগ্য হয় নি বলেই বিশ্বাস। তবে কিছুটা সাহায্যের দাবি রাখি। আমি এখন যাদের যাদের বলবার বলতে বেরোচ্ছি—ঘুরে এসে নিমন্ত্রিতদের একটা লিস্ট তোমায় দেবো, তুমি কয়েকটা জিনিস আমায় এনে দেবে, আর নিউমার্কেট থেকে কিছু ফুল। খাবার-টাবার সম্বন্ধে আমি নিজেই সমস্ত ব্যবস্থা করবো, তোমাদের কোনো ভার দিতে চাই না।

—গাড়ী ঘুরিয়ে নিউমার্কেট থেকে ওই সামান্য জিনিস কটা আর ফুলও তুমি অনায়াসেই আনতে পারো মা, ওর জন্যে আর আমাকে ভার দিয়ে খেলো হবে কেন? তা ছাড়া আমি আজ বাড়ী থাকছি না—বলিয়া অমিতাভ ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া যায়।

—চমৎকার ভাগ্যটি আমার বটে! চিত্রলেখা উল্টানো দুই হাতের সাহায্যে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া অমিতাভর পরিত্যক্ত চেয়ারটা টানিয়া বসিয়া পড়িয়া বলে—সতীনের ছেলেমেয়েকে প্রতিপালন করলেও বোধ হয় এর থেকে ভালো ব্যবহার পাওয়া যেতো তাদের কাছ থেকে!

ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে সহযোগিতা না পাইলেও চিত্রলেখা অনুষ্ঠানের ত্রুটিমাত্র রাখিল না। এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন সৌষ্ঠবসম্পন্ন ভাবে কাজ করা যে একমাত্র চিত্রলেখার পক্ষেই সম্ভব সে কথা তাহার পরম শত্রুতেও অস্বীকার করিতে পারিবে না।

সম্ভব হইয়াছে কি আর অমনি ?

সমস্ত জীবনটাই চিত্রলেখা উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে কাহার পায়ে ?

ওই সভ্যতা-সৌষ্ঠবের পায়েই নয় কি ?

প্রতিনিয়ত পারিপার্শ্বিক সমস্ত প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, স্বামী-সন্তান সকলের সহিত বিরোধ করিয়া আসিয়াছে, নিজে মুহূর্তের জন্য বিশ্রামের শান্তি উপভোগ করিতে পায় নাই, তবু হাল ছাড়ে নাই।

তাই না আজ দশের একজন হইয়া সমাজে বিচরণ করিতেছে !

তবু তো ছেলেদের মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য কতই পরিকল্পনা ছিল, কিছুই প্রায় সফল হয় নাই, উপযুক্ত অর্থের অভাবে অনেক উচ্চ আদর্শকে খর্ব করিতে হইয়াছে।

হায়! ছেলেমেয়েরা চিত্রলেখার সে আত্মত্যাগের ধর্ম কোনোদিন বুঝিল না। কাহাদের জন্য চিত্রলেখার এই সংগ্রাম, এই সাধনা ? কি নিরুপায় অবস্থার মাঝখানে ভাসাইয়া দিয়া স্বামী চলিয়া গেলেন, এক দিনের জন্য কি সে অবস্থার আঁচ তাহাদের গায়ে লাগিতে দিয়াছে চিত্রলেখা ?

একা অসহায়া নারী সমস্ত দায়িত্ব বহন করিয়া লগি ঠেলিতে ঠেলিতে মাঝদরিয়া হইতে তীরের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে আজ।

কিন্তু বেচারা চিত্রলেখার ভাগ্যে 'যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর !'

ছেলেমেয়েরা এমন ভাব দেখায় যেন চিত্রলেখা আজীবন তাহাদের অনিষ্ট করিয়াই আসিতেছে। যেন সেই বুড়ী ঠাকুরমার কাছ হইতে গোবর-গঙ্গাজলের দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া জীবন কাটাইতে পারিলেই তাহাদের ছিল ভালো।

কী নিষ্ফল জীবন চিত্রলেখার !

তবু তো কই ওদের হিতচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না ! বেবির কাছ হইতে শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা খাইয়াও বেবির জন্যই অসাধ্য সাধনের সাধনা করিয়া মরিতেছে।

তাহাকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত না দেখা পর্যন্ত মরিয়াও যে শান্তি হইবে না চিত্রলেখার।

এই যে আজকের ব্যাপারটা, এর জন্য কত কাঠখড় পোড়াইতে হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে—কে তাহার হিসাব রাখে ? এর জন্য কতদিন কতদিকে যে তুচ্ছ সাধান করিতে হইবে ! ইচ্ছামত অর্থব্যয় করিবার সামর্থ্যও যদি থাকিত আজ !

মণীন্দ্রর জন্য মন কেমন না করিয়া হিংসাই হয়।

যেন সব কিছু জ্বালা-যন্ত্রণা চিত্রলেখার ঘাড়ে চাপাইয়া টেক্কা মারিয়া চলিয়া গিয়াছেন মণীন্দ্র।

আজকের ব্যাপারে চিত্রলেখার পরিশ্রমের চাইতে উদ্বেগটাই ছিল প্রবল যে, মেয়ে শেষ পর্যন্ত সহজ থাকিলে হয়। নিজের সন্তানকে চিনিতে পারা যায় না, এর চাইতে দুর্দান্ত পরিহাস আর কি আছে জগতে !

নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বিরাট কিছু নয়।

নিতান্ত বন্ধুগোষ্ঠী কয়েকজন, যাঁহাদের কাছে সব কিছু না দেখাইয়া তৃপ্তি নাই। আর চিত্রলেখার সেজকাকীমার পরিবার। অনেক ভাগ্যে এ সময়টা যখন কলিকাতায় রহিয়াছেন তাঁহারা। দেখিবার এবং দেখাইবার এমন সুযোগ ক'বার আসে?

কিরীটীর মত জামাই সংগ্রহ করা যে সেজকাকীমার স্বপ্নেরও বাহিরে, এ কি আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে? তাঁহার মেয়ের তো সেই রূপ! 'কালো হাতী' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তার উপর আবার নাকি বার দুই আই, এ, ফেল করিয়া নামকাটা সেপাই হইয়া বসিয়া আছে।

কন্যার সৌন্দর্য-গর্বে নূতন করিয়া যেন বুকটা দশহাত হইয়া ওঠে।

তাছাড়া—বিদ্যা?

টকাটক করিয়া এম, এ, পর্যন্ত পাস করিয়া ফেলিল, হোঁচট খাইল না, ধাক্কা খাইল না—শুধু একটি জিনিসের নিতান্তই অভাব, যে অভাবটা চিত্রলেখার মনে একটা গহ্বর রাখিয়া দিয়াছে।

মডার্ন কালচারের অভাব।

বেশভূষায় পারিপাট্য যে নাই মেয়ের তা নয়, তবু কেমন যেন সামঞ্জস্যহীন, অসম্পূর্ণ। হয়তো দশদিন খুব বাড়াবাড়ি করিল, আবার দশদিন যেমন তেমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে শুরু করিল। সেই মূর্তি লইয়া বাহিরের লোকের সামনে বাহির হইতেও আপত্তি নাই। এ আর শোধরানো গেল না। তা ছাড়া নাচ-গানের দিকেও আজকাল আর যাইতে চাহে না, অকৃত্রিম সাধারণ গলায় কথা বলে, কথাবার্তা কোন কিছুরই কায়দা জানে না।

অথচ সেজকাকীমার মেয়ে লিলি, সেই পাটের গাঁটের মত দেহটা লইয়া কি নাচ নাচিয়াই বেড়ায়!...কথায়-বার্তায় চাল-চলনে একেবার কায়দা-দুরস্ত।

পাঁচটা বাজিতেই লিলি আসিয়া হাজির হইল।

মা আসিতে পারিবেন না, তাই একাই আসিয়াছে সে। চিত্রলেখার রোষরুদ্ধ প্রশ্নের উত্তরে মিহি মিহি আদুরে গলায় বলে—কি করবো বলুন বড়দি, মার যে ভীষণ মাথা ধরে উঠল, আমারই আসা সম্ভব হচ্ছিল না, নেহাৎ আপনি দুঃখিত হবেন বলেই—

—অসীম দয়া তোমার এবং তোমার মার—কিন্তু সেজকাকা?

বাবার তো কদিন থেকেই প্রেসার বেড়েছে।

—ও:। টম্ জিম্?

—তাদের যে আজ ম্যাচ রয়েছে।

—শুনে খুশী হলাম। এরকম মণিকাঞ্চন-যোগ হওয়াটা একটু আশ্চর্য এই বা!

ভারী মুখে সরিয়া যায় চিত্রলেখা অন্য অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করিতে। যা করিবে সবই

তো একা। আজ বেবি বিয়ের কনে, তাকে কিছু আর এ ভার দেওয়া চলে না।…আর কিছুই নয়, এটি সেজকাকীমার ঈর্ষার ফল। দেখিলে বুক ফাটিয়া যাইবে তো!

লিলি ছুটিয়া আসিয়া বলে—এই বেবি, তোর বর কখন আসবে তাই বল্। সত্যি বলতে, ওই জন্যই এলাম আরো!

তাপসী হাসিয়া বলে—ও কি? বরং বলো 'জামাতা বাবাজী'! মাসী হও না তুমি আমার?

ছেড়ে দে ওকথা। সত্যি বল্ না রে?

—কি করে জানবো? এলেই দেখতে পাবে।

—ইস্, উনি জানেন না আবার! বলবি না তাই বল।…এই শাড়ীখানা কত দিয়ে কিনলি রে? ফাইন শাড়ীখানা!

তাপসী হাসিয়া বলে—আমি কোথায় কিনলাম, মা তো! মায়েরই পছন্দ।

—মা! মাই গড! এখনো তোর শাড়ী-ব্লাউজ বড়দি পছন্দ করে দেন? আছিস কোথায়? বরটিকে পছন্দ করার ভারটা নিজের ভাগে রেখেছিস কিছু, না সেও মা যা করবেন!

—নিশ্চয় তো! আমি ও নিয়ে মাথা ঘামাইনে!

—ইস্! ইনোসেণ্ট গার্ল একেবারে! তবু যদি না সেদিন বড়দির মুখে শুনতাম—, রুমাল-মুখে চাপিয়া 'খুক খুক' করিয়া হাসিতে থাকে লিলি।

তাপসী সহসা গম্ভীর হইয়া বলে—কি শুনলে?

—এই—সে বেচারা প্রেমে সাঁতার-পাথার খাচ্ছে একেবারে, আর তুমি—

হঠাৎ যেন চকিতে শিহরিয়া ওঠে তাপসী—এই এই, রুমালে লেগে যায় নি তো?

হতচকিত লিলি বলে—লেগে যাবে? কি লেগে যাবে?

—রং! তোমার কোটিংটা বোধ হয় কাঁচা রয়েছে এখনো!

কথাটা মিথ্যা নয়, লিলিকে দেখিলে একটা সত্ত রং করা কাঁচামাটির পুতুল বলিয়াই মনে হয়।

লিলি পরিহাসপ্রিয় বটে, কিন্তু নিজে পরিহাস করা এক, আর অপরের পরিহাস পরিপাক করা আর। তাই মুখ ফুলাইয়া উত্তর দেয়—কি করবো বলো, তোমার মতন খাঁটি পাকা রং নিয়ে তো জন্মাই নি ভাই, আমাদের কাঁচা রং মাখা ভিন্ন উপায় কি?

তাপসী তাড়াতাড়ি বলে—আচ্ছা বোসো, কাঁচা-পাকার তর্ক এসে করবো, একবার নীচের তলা থেকে ঘুরে আসি। মা একটা কাজ বলেছিলেন, দারুণ ভুলে গেছি।

মাসীর হাত এড়াইবার এই সহজ কৌশলটা আবিষ্কার করিয়া বাঁচিয়া যায় যেন।

এই ধরনের পচা পুরনো সস্তা রসিকতাগুলো সহ্য করা যে তাপসীর পক্ষে কত বিরক্তিকর সে কথা কে বুঝিবে? নিতান্তই নাকি পরিহাসের উত্তরে হাস্য-পরিহাস না করিলে অভদ্রতা হয়, তাই নিজেও তাহাতে যোগ দেওয়া। যাহা বলিতে হইয়াছে, তাহার জন্যই যেন তিক্ত হইয়া ওঠে মনটা।

দূর ছাই, এদের কবলমুক্ত হইয়া কোথাও সরিয়া পড়াই ভালো। বাগানের মধ্যে প্রিয় পরিচিত সেই জায়গাটিতে বরং বসা যাক খানিক—একদা মণীন্দ্র যে জায়গাটিতে একটা সিমেণ্টের বেদী গাঁথাইয়া রাখিয়াছিলেন, মাঝে মাঝে আসিয়া বসিবার জন্য।

জায়গাটা তাপসীর একান্ত প্রিয়। আসিয়া বসিলেই যেন বাবার উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

তাপসী চলিয়া গেলে লিলি রাগে ফুলিতে থাকে।

বাস্তবিক, কাঁচা রং এর উল্লেখে কোন্ মেয়েই বা অপমানের জ্বালায় ছট্‌ফট্ না করে।

সত্যি বলিতে কি, তাপসীর উপর একটা আকর্ষণ অনুভব করিলেও, ওই যে ওর কেমন একটা স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় আভিজাত্যের ভাব আছে, ওইটাই লিলির হাড়পিত্ত জ্বালাইয়া দেয়।

আর কিছু নয়, রূপের গরব!

তেমনি একচোখো ভগবান! রূপ দিয়াছো—দিয়াছো, স্বাস্থ্যটাও কি এমন অনবদ্য দিতে হয় যে রোগা হইতে জানে না, মোটা হইয়া পড়ে না! বরাবর এক রকম! যেন একটি নিটোল পাকা ফল!

রসের প্রাচুর্য আছে—আধিক্য নাই! শাঁস আছে—ভার নাই!

আর লিলি? লিলির বিধাতা শৈশবাবধি এত শাঁসালো আর রসালো করিয়া গড়িয়াছেন লিলিকে, যে আধুনিক হইবার সমস্ত উপকরণই যেন তাহার দেহে উপহাস হইয়া দাঁড়ায়।

অতএব সুমধ্যমা তন্বী রূপসীদের উপর যদি সে হাড়ে-চটা হয় তো দোষ দেওয়া যায় না। তাহার উপর আবার যদি সে রূপসী একটি কন্দর্পকান্তি বর যোগাড় করিয়া ফেলে!

হায়, শুধু কি লিলিই জ্বলিতে থাকে? তাপসীর ভিতর কি দুর্দমনীয় জ্বালা, সে কথা বুঝিবার সাধ্য লিলির আছে?

নিজেকে সমস্ত কোলাহল আর সমারোহের মাঝখান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া বাগানের একপ্রান্তে গিয়া নিজেকে যেন ছাড়িয়া দেয় তাপসী।

হে ঈশ্বর, এ কি করিতে বসিয়াছে সে?

অমিতাভর উপর প্রতিশোধ লইতে গিয়া নিজেকে কোন্ অধঃপাতের পথে ঠেলিয়া দিবার আয়োজন শুরু করিয়াছে?

অধঃপাত ছাড়া আর কি বলা যায়?

আর ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে এতগুলো লোককে সাক্ষী রাখিয়া কিরীটীর সঙ্গে বিবাহবন্ধন পাকা করিয়া ফেলিবার দলিলে সই করিতে হইবে তাহাকে!

আত্মহত্যা ছাড়া আত্মরক্ষার আর কোন উপায় থাকিবে না তার।

বাবা! বাবা! তুমি কেন তোমার আদরের বেবির জীবনের এই জটিল জটটা না ছাড়াইয়া

দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গেলে! নিঃসঙ্গ তাপসীর আশ্রয় কোথায়? কে তাহাকে সত্যকার উচিত-অনুচিত শিক্ষা দিবে?

যখন নিজের হৃদয়ের সঙ্গে আপস ছিল, তখন তবু সহজ ছিল। সহজ ছিল চিত্রলেখার অসঙ্গত ইচ্ছাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া। আজ যে দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে আপন হৃদয়ে, একে উড়াইয়া দেওয়া আর সহজ কই!

অমিতাভ ছেলেমানুষ হইলেও উচিত কথাই বলিয়াছিল।

সত্যই তো, কি প্রয়োজন ছিল কিরীটীকে এত প্রশ্রয় দিবার?

দিনের পর দিন কিসের আশা দিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া আসিয়াছে তাপসী? নিজের মনের—নিজের অজানিত চাপা লোভের বশেই নয় কি?

সেই লোভই ভদ্রতার ছদ্মবেশে পদে পদে প্রতারিত করিয়াছে আপনাকে। কিরীটীকে প্রত্যাখ্যান করিবার মত সাহস যোগাইতে দেয় নাই।

বিদ্রোহের একটা ভান করিয়া আসিয়াছে বটে বরাবর, কিন্তু আত্মসমর্পণে উন্মুখ চিত্ত লইয়া বিদ্রোহের অভিনয় করার কি সত্যই কোনো মানে আছে? হয়তো বা—হয়তো বা এতদিন যে বিকাইয়া যায় নাই, সে শুধু কিরীটীর ভীরুতার জন্যই—দস্যুর মত লুণ্ঠন করিয়া লইবার শক্তি কিরীটীর নাই, প্রার্থীর মত অপেক্ষা করে!

অসতর্ক কোনো মুহূর্তে ওর এই নিশ্চেষ্ট সম্ভ্রমের ভঙ্গী কি অসহিষ্ণু করিয়া তুলে নাই তাপসীকে?

যদি কিরীটীর দিক হইতে সাহসের প্রাবল্য থাকিত, তাপসী কি খুঁটি আঁকড়াইয়া টিকিয়া থাকিতে পারিত? কে জানে! কোনোদিন তো এমন স্পষ্ট করিয়া মনকে প্রশ্ন করিয়া দেখে নাই। সভয়ে পাশ কাটাইয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছে মাত্র।

অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে হঠাৎ এক সময়ে যেন কঠিন হইয়া ওঠে তাপসী। প্রশ্নে প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তোলে নিজেকেই।

কেন? কেনই বা সে চিরকাল এমন বঞ্চিত হইয়া থাকিবে? পাপের ভয়ে? না সেই খেলাঘরের বরের আশায়?

দুটোই সমান অর্থহীন।

যে কাজের জন্য সে নিজে একবিন্দু দায়ী নয়, তাহার পাপ-পুণ্যের ফল ভুগিয়া মরিবার দায় কেন তাহার?…বোকামি? স্রেফ বোকামি! আশাহীন আনন্দহীন প্রেমস্পর্শহীন নিরর্থক জীবনটা—জনশূন্য ঘরে নিরর্থক জ্বলিয়া যাওয়া মোমবাতির মত কেবলমাত্র জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিঃশেষ হইতে থাকিবে?

প্রতিনিয়ত নিজেকে চাবুক মারিয়া মারিয়া ধর্ম বজায় রাখাই কি নারীধর্ম? চাবুক শুধু নিজেকে মারা নয়—আরো একখানি আগ্রহোন্মুখ প্রসাদ-ভিক্ষু হৃদয়কেও যে চাবুক মারিয়া ফিরাইতে হইতেছে!…বুলু, বুলু! কোথায় সেই অপরিণত বয়স্ক বালক? সে কি আজও বাঁচিয়া

আছে? স্বামিত্বের দাবি লইয়া কোনো দিন কি উপস্থিত হইবে তাপসীর কাছে? স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় এমন যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে কি?

তাপসী কি তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে?

কিন্তু তাপসীর সহায় কে?

মা প্রতিকূল, অভী নিতান্তই বিমুখ। বাবলু তো বালক মাত্র। তবে কে? নানি? নানিই তো তাহার জীবনের শনি।...নয়তো কি? মনে মনে সেই শনিকে উদ্দেশ করিয়াই প্রশ্নে জর্জর করিতে থাকে তাপসী।...কেন? কেন? অমন উদাসীন নিশ্চিন্ততায় কাশীবাস করিবারই বা প্রয়োজন কি ছিল তোমার? যে জট পাকাইয়া রাখিয়াছো, তাহার গ্রন্থি খুলিবার দায়িত্ব কি কিছুই নাই তোমার? একবার কি কুসুমপুরে যাওয়া যায় না? কাশীর মায়া কাটাইয়া দেশে আসিয়া একবার খোঁজখবর লওয়া উচিত ছিল না কি? তাপসীর ইহকাল পরকাল খাইয়া চিত্রলেখার উপর অভিমান করিয়া দিব্য আরামে বসিয়া আছো, বিকার মাত্র নাই!

নানির সঙ্গে একবার নিজেই যদি দেশে যাইতে পাইত তাপসী! খুঁজিয়া দেখিত— দেবমন্দিরের সেই উদার প্রাঙ্গণে সেই স্থলকমলের মত আরক্তিম দুখানি পায়ের ছাপ আজও আছে কিনা?

ধ্যেৎ! এ কি পাগলের মত ভাবনা শুরু করিয়া দিয়াছে তাপসী। বাঁচিয়াই যদি থাকে, সেই অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক এখনো গৃহিণীশূন্য গৃহে নীরস জীবন যাপন করিতেছে নাকি? পাগল! তাও আবার পাড়াগাঁয়ের ছেলে! কলিকাতার হোস্টেলে থাকিয়া পড়ালেখা করিবার কথা ছিল বলিয়াই যে করিয়াছে—তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? অল্প বয়সে অনেক পয়সা হাতে পড়ায় কুসঙ্গে পড়িয়া বিগড়াইয়া বসিয়া আছে কিনা কে বলিতে পারে?

সকলের উপর কথা—বাঁচিয়া আছে কিনা!

বাঁচিয়া থাকিলে—নিজেই কি এতদিনে একটা সন্ধান লইতে পারিত না? কিন্তু প্রয়োজনই বা কি তাহার? প্রয়োজন থাকিলে হয়তো লইত। অবশ্য প্রথম দিকে এখানের ব্যবহারটা ভদ্রজনোচিত হয় নাই, তবু শিক্ষা-দীক্ষা—যদি সব কিছু পাইয়া থাকে—সভ্যতা-ভব্যতার একটা মূল্য আছে তো? বিবাহিতা পত্নীর পত্নীত্বকে উড়াইয়া দিয়া—

বিবাহিতা?

আচ্ছা, বিবাহটা কি সত্যই শাস্ত্রসম্মত হইয়াছিল? 'বিবাহ' বলিয়া গণ্য করা যায় তাহাকে?

বহুদিন বহুবার সেই কথাটাই ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছে তাপসী, আজকে খোলাচোখে স্পষ্ট করিয়া ভাবিতে বসে।

হয়তো যে বাধাটাকে সে দুর্লঙ্ঘ্য মনে করিয়া এতদিন বিরাট একটা মূল্য দিয়া আসিতেছে, আসলে সেটা কিছুই নয়, বিরাট একটা ফাঁকি মাত্র! শখের যাত্রাদলের

রাজরাণী সাজিয়া অভিনয় করার মত। সে অভিনয়ের অন্যতম অভিনেতা কোন্ কালে সেই অভিনয়-সজ্জা খুলিয়া স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতেছে।

সেই খামখেয়ালী খেলার অভিনয়ের রাণীত্ব লইয়া, ভিখারিণীর মত নিজেই তাহার দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইবে তাপসী? বলিবে—'এই দেখ, আমি তোমার জন্য দীর্ঘকাল শবরীর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, আজ আসিয়াছি তোমার চরণে শরণ লইয়া ধন্য হইতে!'

চিনিতে না পারিয়া সে যদি হাসিয়া ওঠে?

যদি পূর্ব অপমানের শোধ লইতে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেয়? নিজের সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রার মাঝখানে আকস্মিক উপদ্রব ভাবিয়া অবজ্ঞা করে?

তবু যাইবে না কি তাপসী?

যাইবে সতীনের ঘরে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করিতে?

ছি ছি!

চিত্রলেখাই বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন সংসার-অভিজ্ঞ মানুষ। তাই উড়াইয়া দিবার বস্তুকে চিরদিন উড়াইয়া দিয়াই আসিতেছে। ঘরে বাহিরে কোথাও কোনোদিন সে কথাটুকু উচ্চারিত মাত্র হইতে দেয় নাই।

তাপসী মিথ্যা স্বপ্নের মোহে, মিথ্যা সংস্কারের দাসত্বে আজীবন নিজেও কষ্ট পাইল, মাকেও কম কষ্ট দিল না। চিত্রলেখার এই যে কাঙালপনা, এই যে রোষ ক্ষোভ অসহিষ্ণুতা, সব কিছুর মূল কারণই তো তাপসীর ভবিষ্যৎ সুখের আশা!

হয়তো চিত্রলেখার ধারণাটা ভুল, কিন্তু সন্তানের সুখ-চিন্তায় তো ভুল নাই। তবে তাপসী সেই মাতৃহৃদয়কে অবহেলা করিবে কোন্ শ্রেয় বস্তুর আশায়?

আর—আর শুধুই কি মাতৃহৃদয়?

আর একখানি উন্মুখ হৃদয়কে চাবুক মারিয়া মারিয়া দূরে সরাইয়া দিবার কঠোর যন্ত্রণা নিজের হৃদয়কেও কি অহরহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিতেছে না?

যাক্। আর নয়। ঘটনার প্রবাহে নিজেকে এবার ছাড়িয়া দিবে সে।

দেখা যাক্ বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের বজ্র ভাঙিয়া আসিয়া তাপসীর মাথায় পড়ে কিনা!

স্থানভ্রষ্ট চুলের গোছা ও শাড়ীর আঁচল গুছাইয়া উঠিয়া দাঁড়ায় তাপসী।

ছাড়িয়া দিবে নিজেকে—আলোর বন্যায়, উৎসবের কলস্রোতে। ছাড়িয়া দিবে নিজেকে মায়ের হাতে। ছাড়াইয়া লইবে নিজেকে বহুদিন-বর্ধিত সংস্কারের কঠিন শিলাতল হইতে।

নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিবে আপনাকে প্রেমাস্পদের উন্মুক্ত বক্ষে, বলিষ্ঠ বাহুবেষ্টনের মধ্যে।

সেই ভালো।

তাই হোক। সেইটাই স্বাভাবিক। আজীবন বালবিধবার উদাসভঙ্গী আর নিস্পৃহ মন লইয়া এই শোভাসম্পদময়ী ধরণীতে টিকিয়া থাকার কোনো অর্থই হয় না!

চূড়ান্ত সিদ্ধান্তর নিশ্চিন্ত মনোভাব লইয়াই যেন এবার সে উৎসব সমারোহের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করিতে যায়। হাস্য-লাস্যময়ী তাপসীকে দেখিয়া অবাক হোক কিরীটী, মুগ্ধ হোক, ধন্য হইয়া যাক।

চোখ জুড়াক চিত্রলেখার। জ্বলিয়া মরুক লিলি।

অমিতাভ বুঝুক তার পছন্দ-অপছন্দকে কেয়ারও করে না তাপসী। তার প্রিয় ব্যক্তিকে অপমান করিয়া বিতাড়িত করার সাধ্য কাহারও নাই—প্রেমের মর্যাদায় তাহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে তাপসী!

চটিটা পায়ে গলাইতেছে—পিছন হইতে ডাক পড়িল।

না, চিত্রলেখার নয়, লিলির নয়, বন্ধু-বান্ধবী কাহারও নয়, নিতান্তই প্রিয় ব্যক্তিটির। যাহার চিন্তায় তাপসীর এত সুখ, এত যন্ত্রণা! যে তাপসীর দিন-রাত্রির শান্তি অপহরণ করিয়া লইয়াও তাপসীর প্রিয়তম!

যে আসিয়াছিল—পিছন হইতে কাঁধের উপর আলগোছে একটু স্পর্শ দিয়া আবেগ-মধুর কণ্ঠে ডাকিল—"তাপসী!"

তাপসী! কিরীটীর এত সাহস বাড়িল কখন?

তাপসীর সিদ্ধান্ত জানিয়া ফেলিল নাকি মনে মনে? অথবা চিত্রলেখার সস্নেহ প্রশ্রয়ের জের? তাপসীর কাঁধে হাত রাখিবার মত দুঃসাহস তো গত সন্ধ্যাতেও ছিল না তাহার!

কম্পিত তাপসী ঘুরিয়া দাঁড়ায়। সহজ হইবার চেষ্টায় আরো ভাঙা গলায় বলে—আপনি কখন এলেন?

—এই তো আসছি। গেটটা পার হতেই চোখে পড়লো এই নির্জন কোণে তোমার ধ্যানমগ্ন মূর্তি।......আজকের তুমি, আমার নিজস্ব আবিষ্কার তাপসী।

হায় হায়। নিজেকে যে এতক্ষণ ধরিয়া প্রস্তুত করিল তাপসী, কোথায় গেল সে সব? কোথায় সেই হাস্যেলাস্যে চপলতায় কিরীটীকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিবার মত নূতন রূপ! আগের মতই অস্বচ্ছন্দ ভাবে বলে—চলুন বাড়ীর ভেতরে যাই।

—না না থাক্—কিরীটী ব্যগ্রস্বরে বলে—বাড়ী তো আছেই, থাকবেও—কতকগুলো ঝঞ্ঝাট, গোলমাল আর চোখ-জ্বালা আলো নিয়ে।...এমন পরিবেশের মধ্যে তোমাকে পাওয়া দুর্লভ নয় কি?...বোসো লক্ষ্মীটি!

সন্ধ্যার আভাসে আকাশে পড়িয়াছে ছায়া, মাটির বুকে গোধূলির সোনার ঢেউটা ম্লান হইয়া আসিতেছে...বাগানের এই নিভৃত কোণটিতে তো আরো তাড়াতাড়ি ঘনাইয়া আসিবে অন্ধকার......এখানে একা একা কিরীটীর সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়া থাকিবে তাপসী?

আশ্চর্য প্রস্তাব তো !

নাঃ, সমর্পণের মন্ত্র বৃথাই এতক্ষণ অভ্যাস করিয়াছে সে। অসঙ্কোচে পাশে আসিয়া বসিতে পারিতেছে কই? বসিতে পারে না, প্রতিবাদও করে না, অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকে।

হয়তো এই অসতর্ক মুহূর্তে—যদি কিরীটীর বলিষ্ঠ বাহুবেষ্টনীর ভিতর ধরা পড়িতে হইত তাপসীকে—সমস্ত সহজ হইয়া যাইত, মোড় ফিরিয়া যাইত তাপসীর বাকি জীবনের, কিন্তু তাহা হইল না। অত সাহস কিরীটীর নাই।

এমনিই হয় মানুষের জীবনে! প্রতিনিয়ত এমনি কত সম্ভাবনাময় মুহূর্ত বৃথা নষ্ট হয়—সমস্যা মীমাংসার প্রান্তসীমায় আসিয়া ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া যায় জটিলতর পথে—হৃদয়াবেগের সহজ প্রকাশ আচ্ছন্ন করিয়া তোলে অকারণ কুণ্ঠার কুয়াশা।

দস্যুর মত লুঠ করিয়া লইবার সাহস সকলের থাকে না।

কিরীটী তাপসীর মতই ভীরু, কুণ্ঠিত, লাজুক। তাই কাঁধের উপরকার আলগোছ স্পর্শটুকুও সরাইয়া লইয়া শুধু কণ্ঠস্বরে সমস্ত আগ্রহ ভরিয়া বলে—তাপসী শোনো—পালিয়ে যেও না। আজ আমাকে কিছু বলতে দাও। যে কথা বলতে না পেরে আমার দিনরাত্রি শান্তিহীন, যে কথা বলবার জন্যে আমার সমস্ত হৃদয় অস্থির হয়ে থাকে, সাহসের অভাবে যা কোনোদিনই বলতে পারি নি, আজকের এই পরম মুহূর্তে বলতে দাও সেই কথাটি।

'বলতে দাও!'—বলিতে দিবার প্রয়োজন আছে নাকি?

তাপসী কি জানে না সেই কথাটি?

সৃষ্টির আদিকাল হইতে নারীর উদ্দেশে যে কথা ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে পুরুষের বিহ্বল কণ্ঠে, সেই কথাটিই আর একবার ধ্বনিত হইবে নূতন ছন্দে, নূতন মহিমায়! কিন্তু নারীর কণ্ঠ ধ্বনিত হয় না বলিয়াই কি তাহার কথা অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়? নারীর শিরায় শিরায় রক্তের উন্মাদ দোলায় ধ্বনিত হয় না সেই চিরন্তন বাণী? তার নির্বাক ভঙ্গিমায় উচ্চারিত হইতে থাকে না প্রেমনিবেদনের বিহ্বল ভাষা? উচ্চারণ করিবার প্রয়োজনই বা তবে কোথায়? স্বেদাক্ত কোমল দুখানি করতল বলিষ্ঠ তপ্ত দুই মুঠিতে চাপিয়া ধরিয়া শুধু পাশাপাশি বসিয়া থাকাই তো যথেষ্ট। বিশেষণ খুঁজিয়া খুঁজিয়া কথা সাজাইবার দুরূহ পরিশ্রম বাঁচিয়া যায়।

কিন্তু পরিশ্রম বাঁচাইবার কৌশল সকলে জানিলে তো!

তাপসী এক নিমেষ চোখ তুলিয়া তাকাইয়া অস্ফুটস্বরে যা বলে—শুনিতে পাওয়া গেলে বোধ করি তার অর্থ এই দাঁড়াইত—ওদিকে হয়তো সকলে তাপসীর অনুপস্থিতিতে ব্যস্ত হইতেছে, খুঁজিতে আসিবে এখুনি, অতএব—

খুঁজুক না ক্ষতি কি? এই মুহূর্তটি নষ্ট হয়ে গেলে হয়তো আমিও খুঁজে পাবো না আমার সাহসকে!

—এত ভয় কিসের ?

—ভয় ? ঠিক ভয় নয়, তবে ভরসার অভাব বলতে পারো। প্রতিদিন প্রস্তুত হয়ে আসি বলবো বলে, কিন্তু ফিরে যাই। তবে আজ নিতান্ত প্রতিজ্ঞা করেই এসেছি···ওকি! তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে ?

—না, কিছু না। কিন্তু আমি বলি কি—এতদিন যদি না বলেই কেটেছে, তবে আজও থাক।

—কিন্তু কেন ? মেনে নাও, না-নাও—শুনতে তো তোমার ক্ষতি নেই তাপসী!

—ক্ষতি ? হঠাৎ তাপসী কেমন অদ্ভুত ভাবে হাসিয়া ওঠে—আমার ক্ষতি করার ভারটা স্বয়ং বিধাতাপুরুষ নিজের ঘাড়েই নিয়ে রেখেছেন—মানুষের জন্যে আর বাকি রাখেন নি কিছু। তবু থাক্।

—তবে থাক্, হয়তো আজও সময় হয় নি। কিন্তু শুনতে পারলে বোধ হয় ভালোই হতো। কিংবা, কি জানি, শোনাতে গেলে এটুকু সৌভাগ্যও আমার বজায় থাকবে কিনা! আচ্ছা থাক্, আজকের গোলমালটা কেটেই যাক, চলো, ভেতরে চলো।

—যাচ্ছি, আপনি যান।

এদিকে সত্যই তখন তাপসীকে ডাকাডাকি পড়িয়া গিয়াছে। অতিথি অভ্যাগত সকলেই যে তাপসীকে দেখিতে উৎসুক। চিত্রলেখা কিরীটীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই সহর্ষে বলিয়া ওঠে—এই যে এসে গেছো তুমি! বেবির সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

—হ্যাঁ, ওই যে বাগানে ওদিকটায় দেখলাম যে—

চিত্রলেখা মনে মনে হাসিয়া ভাবে—আহা মরে যাই, 'ইনোসেণ্ট' একবারে! নিভৃতে দেখা করিবার সুযোগ সৃষ্টি করিতে পূর্বাহ্লেই বাগানে গিয়া বসিয়া আছেন মেয়ে, এটুকু যেন চিত্রলেখা ধরিতে পারিবে না! দেখ দেখি—একটা অর্থহীন কুসংস্কারকে সার সত্য বলিয়া লইয়া এই আগ্রহ-ব্যাকুল হৃদয়কে দাবাইয়া রাখিয়া কী বৃথা কষ্টই পাইয়াছে এতদিন! যাক্, শেষ অবধি যে সুমতি হইল এই ঢের।

স্নেহমধুর কণ্ঠে গদগদ ভঙ্গী আনিয়া চিত্রলেখা কিরীটীকে অনুযোগ করে—দেখে চলে এলে যে বড়! ডেকে আনতে হয় না ?

—এখুনি আসবেন বোধ হয়।

—বোধ হয় ? বাঃ বেশ ছেলে তো বাপু! আজকের দিনে সে বেচারাকে 'বোধ হয়'-এর উপর ছেড়ে দিয়ে চলে আসা কিন্তু উচিত হয় নি তোমার! এদিকে সকলে ওর জন্যে ব্যস্ত হচ্ছে। খাওয়ার আগে গান গাইবার, আর খাওয়ার পর গীটার বাজিয়ে শোনাবার প্রোগ্রাম রয়েছে—এদিকে মেয়ে নিরুদ্দেশ! বদ্ধ পাগল একটা! এবার থেকে বাপু আমি নিশ্চিন্ত, ওর পাগলামি সারাবার ভার তোমার।

কিরীটী মনে মনে হাসিয়া ভাবে—পাগলামি সারানোর ভার যে নেবে, সে বেচারাই যে পাগল হতে বসেছে।

অতঃপর চিত্রলেখা আমন্ত্রিতা মহিলাদের সঙ্গে কিরীটীর পরিচয় করাইয়া দিয়া প্রত্যক্ষে তাপসীর অসীম সৌভাগ্যের জন্য প্রশংসা এবং পরোক্ষে ঈর্ষা অর্জন করিতে থাকে। নিজেও বড় কম আত্মপ্রসাদ অনুভব করে না। রূপে-গুণে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, অর্থে-স্বাস্থ্যে এমন অতুলনীয় জামাতা-রত্ন সংগ্রহ করা কি সোজা ব্যাপার! এই যে এতগুলি ভদ্রমহিলা সভা উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছেন, ইঁহাদের মধ্যে কয়জন এমন রত্নের অধিকারিণী? অথবা অধিকারিণী হইবার আশা রাখেন? তাহার নিজের মেয়েটিও অবশ্য দুর্লভ রত্ন, তবু চিত্রলেখার 'ক্যাপাসিটি'ও কম নয়!...কত কষ্টে, কত চেষ্টায়, কত যত্নে যে এই পরিস্থিতিটির সৃষ্টি করিতে হইয়াছে, সে চিত্রলেখাই জানে।

পরিচয়-পর্ব শেষ হইলে চিত্রলেখা আর একবার স্নেহগদগদ কণ্ঠে বলে—নাঃ, বেবিটা দেখছি পাগল হয়ে গেছে! কি অদ্ভুত ছেলেমানুষ দেখেছো? তুমিই একবার যাও বাপু, ডেকে আনো গে। এত লাজুক মেয়ে—উঃ!

মেয়ের লজ্জার বহরে নিজেই যেন হাঁফাইতে থাকে চিত্রলেখা।

তবে বেশীক্ষণ আর এই কৃত্রিম হাঁফানির প্রয়োজন হয় না, হাঁফাহাঁফি ছুটাছুটি করিবার উপযুক্ত একটা কারণ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে তাপসী।

ডাকিতে গিয়া আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না তাহাকে। বাগানে নয়, ঘরে নয়, সারা বাড়ীর কোথাও নয়। বাড়ীর খোঁজার পালা শেষ করিয়া বন্ধু-বান্ধবী, আত্মীয়-স্বজন প্রত্যেকের বাড়ী এবং ক্লাব লাইব্রেরী সর্বত্র তোলপাড় করিয়া ফেলা হয়—দু'দশখানা মোটর লইয়া। একা চিত্রলেখাই নয়, গৃহস্থ আর নিমন্ত্রিত প্রত্যেকেরই ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকির আর অন্ত থাকে না।

এমন অনাসৃষ্টি ব্যাপারের জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না, কাজেকাজেই ইচ্ছামত জল্পনাকল্পনা করিতেও ত্রুটি রাখে না কেহই। 'পাকা দেখা'র দিন বিয়ের কনে হারাইয়া গেলো, এমন মুখরোচক ব্যাপার কিছু আর সর্বদা ঘটে না, অতএব অনেক মন্তব্যই যে রসালো হইয়া উঠিবে, এ আর বিচিত্র কি!

বেচারী ভাবী জামাতা কনের এমন অপ্রত্যাশিত ভাব-বিপর্যয়ে বিমূঢ়ভাবে গাড়ীখানা লইয়া বারকয়েক এদিক ওদিক করিয়া একসময়ে কোন্ ফাঁকে নিঃশব্দে চলিয়া যায়।

কান্তি মুখুজ্জের প্রতিষ্ঠিত "রাইবল্লভের" বিগ্রহ ও মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার শেষ পর্যন্ত রাজলক্ষ্মী দেবীর ঘাড়েই পড়িয়াছে। উপায় কি? আপনার বলিতে কে আর আছেই বা কান্তি মুখুজ্জের? অবশ্য মন্দির রক্ষার পাকা ব্যবস্থা হিসাবে—নিত্যসেবা ছাড়াও নিয়মসেবা, পালপার্বণ ইত্যাদি বৈষ্ণব শাস্ত্রের তিনশো তেষট্টি রকম অনুষ্ঠানের জন্য সব কিছুই ব্যবস্থা আছে। পূজারী হইতে শুরু করিয়া ফুলতুলসী-যোগানদার মালীটি পর্যন্ত। তবু সবাই তো

মাহিনা করা লোক, তাহাদের উপর তদারকি করিতে একজন বিনা মাহিনার লোক না থাকিলে সত্যকার সুশৃঙ্খলে চলে কই? তাই রাজলক্ষ্মী স্বেচ্ছায় এই ভার মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন। ভার না লইয়াই বা করিতেন কি? তাঁহারও তো জীবনের একটা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে?

বুলুবাবু তো দীর্ঘকাল সাগরের এপারে চলিয়া আসিয়া এতদিনে কলিকাতায় কি যেন ক জে লাগিয়াছে। কিন্তু লাগিলেই বা কি? না বৌ, না ঘর-সংসার। বাউণ্ডুলে লক্ষ্মীছাড়ার মত থাকে ফ্ল্যাটে, খায় হোটেলে, অবসর সময়ে হাওয়া-গাড়ীখানাকে বাহন করিয়া গায়ে হাওয়া লাগাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার কাছে আর রাজলক্ষ্মী যাইবেনই বা কোন্ সুখে?

একেই তো কলিকাতার নামে গা জ্বলিয়া যায় রাজলক্ষ্মীর! ওই নিজেই সে মাঝে মাঝে আসিয়া যে পিসীকে দেখা দিয়া যায় সেই ঢের।

কতকাল হইল মারা গিয়াছেন কান্তি মুখুজ্জে! তবু এখনো মামার কথা উঠিলে অনেক সময়েই রাগিয়া যা তা বলিয়া বসেন রাজলক্ষ্মী। ভীমরতি ধরিয়াছিল মামার, তাই একমাত্র নাতিটা, সৃষ্টিধর—বংশধর, তাহাকে লইয়া পুতুল খেলিয়া গিয়াছেন। ছেলেও তেমনি জেদী একগুঁয়ে, তা নয়তো—সেই 'বেয়াকার' বিবাহটাকে সত্য বলিয়া আঁকড়াইয়া বসিয়া আছে! এতদিনে একটা বিবাহ করিলে দুইটা ছেলেমেয়ে হইয়া ঘর আলো করিত। পাত্রীরই কি অভাব? আর বুলুর মত ছেলের? যে বৌ বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে তার নাই ঠিক, ইচ্ছা করিয়া যে সকল সম্পর্ক ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে, সেই বৌয়ের আশায় চিরজীবনটা কাটাইয়া দিবার মতলব না কি, তাই বা কে জানে? অথচ আশাই বা কিসের? নিজেও তো মুখে আনে না, চেষ্টা করিয়া খোঁজ করা দূরে থাক।

বলিয়া বলিয়া এবং বিবাহের স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করিয়া যখন রাজলক্ষ্মী চুপ করিয়াছেন, তখন হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে বুলু আসিয়া হাজির।

রাজলক্ষ্মী পূজার ঘরের সলিতা পাকাইতেছিলেন এবং উৎকর্ণ হইয়া কি যেন শুনিতেছিলেন। মোটরের হর্ন শুনিতে পাওয়া গেল না? বুলু ভিন্ন আর কে মোটরে চড়িয়া আসিবে এই অজ পাড়াগাঁয়ে? ট্রেনে চড়িতে ভালবাসে না সে, টানা মোটরেই আসে কলিকাতা হইতে।

অনুমান মিথ্যা নয়, বুলুই বটে।

—পিসীমা এলাম!

একমুখ হাসি লইয়া সাড়ম্বরে এক প্রণাম।

—এসো বাবা আমার সোনামণি। তবু ভালো যে বুড়ী পিসীকে মনে পড়লো।

—বাঃ, মনে পড়তো না বুঝি! আসা হয় না এই যা। আজ এলাম তোমাকে নেমন্তন্ন করতে।

—আমাকে নেমন্তন্ন!...রাজলক্ষ্মী অবাক হইয়া তাকান।

—হ্যাঁ গো পিসীবুড়ী! বৌ বরণ করবে না?

রাজলক্ষ্মী কৌতূহল দমন করিয়া নিস্পৃহ স্বরে বলে—এত ভাগ্যি আর আমার হয়েছে! বৌ বরণ! হুঁ!

—'হুঁ' নয় গো পিসীমা, সত্যি। তোমার কষ্ট আর দেখতে পারছি না বাপু।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিয়া বলেন—আমার কষ্টের ভাবনায় তো ঘুম হচ্ছে না তোর। তা যাক্, ব্যাপারটা কি? সোন্দর মেয়ে-টেয়ে দেখেছিস্ বুঝি কোথাও? আহা ভগবান সুমতি দিন।

—থামো পিসীমা, ভগবানের নাম আর কোরো না আমার সামনে। সেই ভদ্রলোকের দুর্মতির ফলে এই এত জ্বালা মানুষের, আবার তিনিই দেবেন সুমতি। তবেই হয়েছে! সত্যি কথা বললে তো বিশ্বাস করবে না তোমরা? বলছি তোমার কষ্ট দেখে একদিন প্রতিজ্ঞা করে বেরোলাম বৌ এনে দেবো তোমায়—তারপর এখন এই। বরণ করার খাটুনি তোমার।

—আহা ওই খাটুনির ভয়েই হাতে পায়ে খিল ধরছে। কিন্তু মেয়ে কেমন তাই বল।

—আগে থেকে বলবো কেন? বাঃ! তুমি দেখে বুঝবে পরে।

—তা বেশ, ঘর-টর কেমন খবর নিয়েছিস? সেই তাদের মতন ছোটলোক চামার না হয়।

—চামার-কামার বুঝি না বাপু, তোমার কাছে ধরে এনে দেব, তার পর দেখো।

রাজলক্ষ্মী আবার হাসিয়া ফেলিয়া বলেন—বাবাঃ ছেলের মন হয়েছে তো, একেবারে মিলিটারী! আমি না হয় একেবারে দুধে-আলতার পাথরেই দেখলাম, কিন্তু ভট্‌চায্যি মশাই, নায়েব মশাই—এঁদের তো একবার পাঠাতে হবে! পাত্রী আশীর্বাদ করা চাই। তাছাড়া —বিয়ের হাঙ্গামা কি সোজা? কথায় বলে, লাখ কথা নইলে বিয়ে হয় না। সেবারে এক কথায় বিয়ে দিয়ে মামা তো যা নয় তাই করে গেছেন। আর আমি না দেখে, না শুনে বিয়ে দিচ্ছি না বাপু।

—তবেই হয়েছে—বুলু হতাশার ভান করিয়া বলে—তুমি আমার পাকা ঘুঁটিটি কাঁচাবে দেখছি। আচ্ছা বাপু, তোমার যা মন হয় সব কোরো, কিন্তু তার আগে যদি হঠাৎ বৌ এনে হাজির করি, তাড়িয়ে দেবে না তো?

রাজলক্ষ্মী রাগিয়া উঠিয়া বলেন—হ্যাঁ তাই তো! আমি তোর পাকা ঘুঁটি কাঁচাবো, বৌ আনলে তাড়িয়ে দেবো—খুব বিশ্বাস রাখিস তো আমার ওপর! আমি বলে সাত দেবতার দোর ধরে, সিন্নি মেনে, হরির লুঠ মেনে বেড়াচ্ছি—কি করে তুই ঘরবাসী হবি! তাহলে নিশ্চয় এক বেটি মেম-ফেম বিয়ে করবি ঠিক করেছিস, তাই অত ভয়।

—নির্ভয় হও পিসীমা, সে সব কিছু নয়। যেখানে যা মানত করেছ সব শোধ কোরো বসে বসে। আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি, তুমি বৌ দেখে অখুশী হবে না। আচ্ছা এবারে

কোলকাতায় গিয়ে তোমাকে সব বিশদ খবর দিয়ে চিঠি দেবো, তারপর পাঠিয়ো তোমার নায়েব আর ভট্‌চায্‌ পাইক আর পেয়াদা।

অতঃপর রাজলক্ষ্মী দেবী তোড়জোড় করিয়া বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন করিয়া দেন। আর মনে মনে হাসেন। হুঁঃ বাবা, পিসীর কষ্টের জন্যে তো বুক ফাটিতেছে তোমার! আরে বাবা, যতোই হোক বেটাছেলে, ভরা বয়েস, কত দিন আর বিধবা মেয়েমানুষের মত হেলায়-ফেলায় জীবনটা কাটাইয়া দিবে! তবু যাই খুব ভালো ছেলে আমার বুলু, তাই অতদিন বিলেত ঘুরিয়া আসিয়াও গঙ্গাজলে ধোয়া মনটি! চাঁদের গায়ে কলঙ্ক আছে তো বুলুর গায়ে নেই! আর কিছু নয়—কলিকাতায় তো মেয়ে-পুরুষের মেশামেশি আছে, কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাব হইয়াছে নিশ্চয়!

এক যুগ আগের দেখা সেই ফুলের মত মুখখানি এক-আধবার মনে পড়িয়া মনটা একটু কেমন করিয়া ওঠে, কিন্তু জোর করিয়া রাগ আনিয়া সে স্মৃতিটুকু চাপা দেন রাজলক্ষ্মী। হুঁঃ, সেই "গ্যাড-ম্যাড" মেয়ে এতদিনে একটা সাহেব-সুবোকে বিবাহ করিয়া বসিয়া আছে কিনা তাহার ঠিক কি? রুচি-ভক্তি থাকলে আর এতকালেও একটা খোঁজ করে না!

বেশ করিবে বুলু আবার বিবাহ করিবে।

জমিদারের বিবাহের উপযুক্ত সমারোহের আয়োজন করিতে থাকেন রাজলক্ষ্মী। দশ-বারোটা ঝিয়ের যোগাড় হয়—যাহারা রাতদিন থাকিয়া খাটিবে। বামুন চাকরের অর্ডার হয় ডজন-দুই। বর্ধমানে বায়না যায় নহবৎ বাজনার। গহনা কাপড়ের ফ্যাশান বুঝিতে সরকার মশাইয়ের কলিকাতা-ঘুর করিতে জুতা ছেঁড়ে। এদিকে বস্তা বস্তা মুড়ি-চিড়া-মুড়কি তৈরির ধুম লাগে, মনখানেক ডালের বড়ি পড়ে, সুপারি কাটানো, সলিতা পাকানো—প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় কাজের সীমাসংখ্যা নাই। গ্রামসুদ্ধ নিমন্ত্রণ হইবে নিঃসন্দেহ, সন্দেশের 'ছাঁদা' দিবেন সরায় করিয়া না হাঁড়ি ভর্তি করিয়া, এই লইয়া নায়েব মশায়ের সঙ্গে রীতিমত বাগ্‌-বিতণ্ডাই হইয়া যায়।

নিত্য নূতন ফর্দ তৈয়ারী করিতে করিতে সরকার মশায় আর নায়েব মশায় নাজেহাল হইয়া ওঠেন।

ক্রমশঃ সবই সারা হইয়া আসে। কেবলমাত্র যখন শুধু সামিয়ানা খাটানো আর ভিয়েনের উনান পাতা বাকি—তখন হঠাৎ বজ্রাঘাতের মত বুলুর একখানি চিঠি আসিয়া রাজলক্ষ্মীর সমস্ত আয়োজন লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়।

বুলু লিখিয়াছে—

পিসীমা মনে হচ্ছে—বৌ জিনিসটা বোধ হয় আমার ধাতে সইবার নয়। কাজে কাজেই তোমারও কপালে নেই।...অফিসের কাজে পাটনায় যাচ্ছি, ঘুরে এসে তোমার কাছে যাবো। প্রণাম নাও।

—বুলু

কাশীবাস করিলে নাকি পরমায়ু বাড়ে।

কাশীর গঙ্গার ঘাটে কাশীবাসিনী বৃদ্ধা বিধবার মরশুম দেখিলে খুব বেশী অবিশ্বাসও করা চলে না কথাটা। এই অসংখ্য বৃদ্ধার দলের মধ্যে আর একটি সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া হেমপ্রভা আজও বাঁচিয়া আছেন। ছোট-খাটো কৃশ দেহটি আরও একটু কৃশ হইয়াছে, চোখের দৃষ্টিটা নিষ্প্রভ হইয়াছে মাত্র, তাছাড়া প্রায় ঠিকই আছেন।

বাড়ীতে আশ্রিত পোষ্যের সংখ্যা বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। এই নতুন পাতানো সংসারের ভার চাপাইয়াছেন একটি পাতানো মেয়েরই ঘাড়ে। যেমন ভালোমানুষ, তেমনি পরিশ্রমী মেয়ে এই কমলা।

নিত্যকার মত আজও হেমপ্রভা সকালবেলা হরিনামের মালাটি হাতে দশাশ্বমেধ ঘাটের নির্দিষ্ট আসরটিতে আসিয়া বসিয়াছেন। একটু পরেই কমলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত।

—কি রে, কি হয়েছে?

কমলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলে—মাসীমা, শিগগির বাড়ী চলুন, একটি মেয়ে এসে আপনাকে খুঁজছে।

হেমপ্রভা অবাক হইয়া বলেন—আমাকে খুঁজছে? কেমনধারা মেয়ে?

—আহা, একেবারে যেন সরস্বতী প্রতিমের মত মেয়ে মাসীমা, দেখলে দু'দণ্ড তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। রেলে এসেছে তাই একটু শুকনো মতন—

'সরস্বতী প্রতিমার মত' শুনিয়াই বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিয়াছে হেমপ্রভার। কিন্তু অসম্ভব কি কখনো সম্ভব হয়?

ঝোলামালা গুছাইবার অবসরে হৃৎস্পন্দনকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে আনিতে হেমপ্রভা প্রায় হাসির আভাস মুখে আনিয়া বলেন—মরালবাহন ছেড়ে রেলে চড়ে আবার কোন্ সরস্বতী এলেন? নাম-টাম বলেছে কিছু?

—না। আমি শুধাতেও সময় পাই নি। আপনার নাম করে বললো—, 'এই বাড়ীতে অমুক দেবী আছেন না?'—আমি শুধু একটু দাঁড়াতে বলেই ছুটে এসেছি আপনাকে খবর দিতে।

অর্থাৎ বোঝা যাইতেছে—মেয়েটিকে দেখিয়া কেন কে জানে, কমলা একটু বিচলিতই হইয়া পড়িয়াছে।...অবশ্য সামান্য কারণে বিচলিত হওয়া তার প্রকৃতিও কতকটা।

কিন্তু হেমপ্রভার মত এমন অবিচলিত ধৈর্যই বা কয়জন মেয়েমানুষের আছে? চলিতে চলিতে শুধু একবার প্রশ্ন করেন—কত বড় মেয়ে?

—বড় মেয়ে। ঠিক ঠাহর করতে পারি নি কত বড়। বে-থা হয় নি এখনো। পাস-টাস করা মেয়ের মতন লাগলো।

—সঙ্গে কে আছে?

—কেউ নয়—একা। মুখটি কেমন শুকনো শুকনো, মনে হচ্ছে যেন কোনো বিপদে পড়ে—তাই তো ছুটে চলে এলাম।

—দেখি চল্। তুই যে হাঁপাচ্ছিস একেবারে!—স্বাভাবিক সুরে কথা কহিবার চেষ্টা করেন হেমপ্রভা। কিন্তু হৃদয় যতই ছুটিয়া যাক্, পা যেন চলিতে চায় না।

আবার কোন্ বিপদে পড়িয়া কে আসিল হেমপ্রভাকে স্মরণ করিতে? এক যুগ আগে আসিয়াছিল কলিকাতার বাড়ীর সরকার লালবিহারী। সেই দিন হইতেই তো গত জীবনের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘকাল যাবৎ কি দুরপনেয় গ্লানি, কি দুর্বহ শোকভার একা একা বহন করিয়া আসিতেছেন তিনি, কে তাহার সন্ধান লইতেছে?

এখানের এরা জানে, কাশীবাসিনী আর পাঁচটা বিধবার মতই নিতান্ত নির্বান্ধব তিনি। অবস্থা খারাপ নয়, এই যা। কাশীর এই বাড়ীখানা নিজস্ব, তাছাড়া বর্ধমান জেলায় কোন্ একটা গ্রাম হইতে যেন নিয়মিত একটা মোটাসোটা মনিঅর্ডার আসে। অবশ্য তার সবটাই প্রায় ব্যয় হয় আশ্রিত প্রতিপালনে। বিধবা বুড়ীর খরচ করিবার পথই বা কি আছে আর? নিজের বিগত জীবনের কোনো গল্পই কখনো করেন নাই কাহারও কাছে।

নিতান্ত প্রয়োজন হিসাবে নিজের জন্য যতটুকু যা রাখিয়াছিলেন, তাহারই উপস্বত্বে চলে হেমপ্রভার। দেশের বাড়ীর চিরদিনের বিশ্বাসী সরকার মশাইয়ের হাতে ভার দেওয়া আছে। তাছাড়া সব কিছু সম্পত্তির দায় তো তাঁহার উপরই চাপানো আছে। তাপসীর নামে দানপত্র-করা বিষয়-সম্পত্তির আয়টা অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিলেও, সে সম্পত্তির দেখা-শোনার কথা চিন্তাও করেন না চিত্রলেখা। সরকার মশাইটি নিতান্ত সাধু ব্যক্তি বলিয়াই আজও সমস্ত যথাযথ বজায় আছে। বুক দিয়া আগ্লাইয়া পড়িয়া আছেন তিনি।

মণীন্দ্রর মৃত্যুর পর ছেলেমেয়েদের উপর এমন একটা কঠিন আদেশ-জারী করিয়া রাখিয়াছিল চিত্রলেখা যে তাহাদের একান্ত প্রিয় 'নানি'কে একখানি চিঠি লেখারও উপায় ছিল না।

স্বামীর মৃত্যুর পর শাশুড়ীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়াই নূতন সাজে সংসারে নামিয়াছিল চিত্রলেখা। কেমন যেন একটা ধারণা হইয়াছিল তাহার, মণীন্দ্রর অমন আকস্মিক মৃত্যুর কারণই হইতেছে হেমপ্রভা।

তাঁহার সেই বিশ্রী বিদঘুটে কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজটার জন্যই না মাকে প্রায় বর্জন করিয়া বসিয়াছিলেন মণীন্দ্র! অবশ্য চিত্রলেখা জানিয়াছিল সেটা সাময়িক, নিতান্তই অস্থায়ী। হেমপ্রভা নিজে হইতে নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ না করিলে পুত্র আবারও 'মা' বলিয়া ভক্তিতে গদ্‌গদ হইতেন।

এই একটিমাত্র উচিত কাজ করিয়াছেন হেমপ্রভা, চিত্রলেখার প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ।

কিন্তু ছেলে মায়ের প্রভাবে অত বেশী প্রভাবান্বিত ছিলেন বলিয়াই না মাতৃবিচ্ছেদ-দুঃখ অতটা বাজিয়াছিল। যেন অহোরাত্র অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হইতেছিলেন। আশ্চর্য! মা বলিয়াই কি সাতখুন মাপ!

তাছাড়া বেবির ভবিষ্যৎ-চিন্তা!

চিত্রলেখার মত মণীন্দ্রও যদি সেই বিশ্রী ঘটনাটাকে চিন্তাজগৎ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতেন তো ল্যাঠা চুকিয়া যাইত। তা নয়, সেইটা লইয়া অবিরত দুশ্চিন্তা। মনোকষ্টে ও চিন্তায় চিন্তায় ভিতরে ভিতরে জীর্ণ না হইলে কখনো অমন স্বাস্থ্যসুন্দর দীর্ঘ দেহখানা মুহূর্তে কর্পূরের মত উবিয়া যায়!

সব কিছুর মূলই তো সেই হেমপ্রভা। দৈবক্রমে স্বামীর জননী বলিয়াই কি তাঁহার প্রতি ভক্তিতে শ্রদ্ধায় বিগলিত হইতে হইবে!

এই তো চিত্রলেখারও নিজের সন্তানরা রহিয়াছে, মায়ের উপর কার কতটা ভক্তিশ্রদ্ধা তা আর জানিতে বাকি নাই। এর উপর যদি আবার তাহাদের, চিত্রলেখার চিরশত্রু সেই বশীকরণ-শক্তিশালিনী 'নানি'র কবলে পড়িতে দেওয়া হয়, তবে আর রক্ষা আছে!

অতএব কড়া শাসনের মাধ্যমে তাহাদের স্মৃতিজগৎ হইতে নানির মূর্তিটা মুছিয়া ফেলাই দরকার।

তাছাড়া যে কথাটা মনে আনিতেও ঘৃণা বোধ হয়, বেবির জীবনের সেই অবাঞ্ছিত ঘটনাটা—যেটাকে চিত্রলেখা বেমালুম অস্বীকার করিয়া ফেলিতে চায়, পিতামহীর সংস্পর্শে আসিতে দিলে সেটাকে জাগাইয়া রাখার সহায়তা করা হইবে কিনা কে জানে! তাঁর নিজের পছন্দের সাধের ঘটকালির অপরূপ বিবাহ, তিনি কি সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা না করিয়া ছাড়িবেন।

একেই তো ওই জবুথবু সেকেলে ধরনের মেয়ে, তাহার কানে যদি 'সীতা-সাবিত্রী'র আখ্যানের ছলে বিষমন্ত্র ঢালা হয়, তাহা হইলে তো চিত্রলেখার পক্ষে বিষ খাইয়া মরা ছাড়া অন্য উপায় থাকিবে না।

বরং সময় থাকিতে বিষবৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়া ফেলাই বুদ্ধির কাজ।

তা বুদ্ধিটা যে একেবারে নিষ্ফল হইয়াছে, তাই বা বলা যায় কেমন করিয়া। যথেষ্টই কার্যকরী হইয়াছে বৈকি।

স্নেহময় পিতার উদার প্রশ্রয়ের আশ্রয় হারাইয়া ভীত-সন্ত্রস্ত ছেলে-মেয়ে তিনটা দুর্দান্ত মায়ের কড়া শাসনে ছেলেবেলায় কোনো যোগসূত্র রাখিতে পায় নাই। হেমপ্রভার দিকটা সত্যই প্রায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। বড় হইয়াও কেহ কখনো নূতন করিয়া যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করে নাই।

স্বাভাবিক অনুমানে হেমপ্রভা অবশ্য প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া লইয়াছিলেন, তবু সত্যিই কি কখনো কোনোদিন একবিন্দু অভিমান হয় নাই? তাপসী না হয় তাহার জীবনের শনিকে চিরদিনের মত বর্জন করিয়া চলুক, কিন্তু অভী? বাবলু? এই বারো বৎসরে অবশ্যই যথেষ্ট সাবালক হইয়া উঠিয়াছে তাহারা!

তবে?

দেখিতে না-আসুক, একখানা চিঠিও কি আসিতে পারে না? ধরো, পরীক্ষা-সাফল্যের সংবাদবাহী? কিংবা বিজয়াদশমীর প্রণাম সম্বলিত?

হেমপ্রভা পাগল, তাই সুন্দর একটা মেয়ের নাম শুনিয়াই অসম্ভবের আশায় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাছাড়া কমলার কথা তো! বেশ কিছু বাদ দিয়া ধরিতে হয়।

কিন্তু কে আসিতে পারে?

হেমপ্রভাকে খোঁজ করে, নাম বলিয়া সন্ধান চায়, এমন কাহাকেও খুঁজিয়া পান না। ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই একজনের কথাই মনে পড়িতে থাকে।

তাপসী ভিন্ন—

বালাই ষাট! তাপসীই বা অমন শুকনো শুকনো মুখ লইয়া একা কলিকাতা হইতে কাশী ছুটিয়া আসিবে কেন? নাঃ, তার কথা উঠিতেই পারে না।

আচ্ছা এমনও তো হইতে পারে, মায়ের সঙ্গে মনান্তর হওয়ায় অভিমান করিয়া নানির কাছে পলাইয়া আসিয়াছে। হায় কপাল! হেমপ্রভার তেমন ভাগ্যই বটে!

হেমপ্রভার স্নেহের, হেমপ্রভার আশ্রয়ের যদি কোনো মূল্য থাকিত, তবে কি সেই ভয়ঙ্কর দিনে অমন করিয়া মণীন্দ্র ছেলে-মেয়ে তিনটাকে—

হঠাৎ সমস্ত চিন্তাস্রোতের উপর পাথর চাপা দিয়া দ্রুত পা চালাইতে থাকেন।

অত ভাবিবার কি আছে?

নিশ্চয় সম্পূর্ণ বাজে কেউ। কুমারী মেয়ে বলিল না? হয়তো কোনো প্রতিষ্ঠানের বা কোনো স্কুলের—

বাড়ী ঢুকিয়াই অবশ্য নিমেষে স্থাণু হইয়া যান।

মিথ্যা কল্পনা নয়, অসম্ভবই সম্ভব হইয়াছে। তাপসীই বটে। বাহিরের দিকের ঘরটায় একটা বড় চৌকি পাতা ছিল, তাহারই উপর চুপচাপ বসিয়া আছে। সঙ্গে মোট-ঘাটের বালাই মাত্র নাই।

তাপসী! হ্যাঁ তাপসী বৈকি।

রোদে ঝকঝকে সকাল। আলো ভরা ঘর। ভুল করিবার কিছু নাই। বারো বছরের বালিকার উপর আরো বারো বছর ধরিয়া সৃষ্টিকর্তা তাঁহার যতই শিল্প-কৌশল প্রয়োগ করিয়া থাকুন, বার্ধক্যের স্তিমিত দৃষ্টি লইয়াও হেমপ্রভার চিনিতে ভুল হয় না।

সত্যই শুকনো শুকনো মুখ, এলোমেলো উস্কো চুল, চোখের নীচে কালির রেখা। বিপদের সংবাদ বহিয়া আনার মতই চেহারাটা বটে।

কিন্তু এমন কি বিপদ ঘটিতে পারে যে তাপসীকে আসিতে হয় সে সংবাদ বহন করিয়া?

তবে কি চিত্রলেখাও মণীন্দ্রর পথ অনুসরণ করিল?

অসম্ভব কি? হেমপ্রভার মত এত বড় দুর্ভাগিনী জগতে আর কে আছে, যে যথাসময়ে মরিয়াও মুখরক্ষা করিতে পারে না?

—তাপস! তুই! চৌকিটার উপরই বসিয়া পড়েন হেমপ্রভা।

তাপসী মৃদু হাসিয়া বলে—আমি নয়, আমার ভূত। সারাদিন বুঝি গঙ্গার ঘাটেই থাকো তুমি?

—থাকি বৈকি। ভাবি রোজ দেখতে দেখতে যদি দৈবাৎ মা-গঙ্গার দয়া হয় কোনোদিন। কিন্তু তুই হঠাৎ এরকম করে চলে এলি কেন তাই বল্ আমায়! এ যে বিশ্বাস হচ্ছে না। বুঝতে পারছি না আমি, আনন্দ করবো, না আতঙ্ক হয়ে বসে থাকবো?

তাপসী স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসির সঙ্গে বলে—সে কি গো নানি, কতদিন পরে দেখলে—কোথায় আনন্দে অধীর হয়ে উঠবে, তা নয় ভেবেচিন্তে অঙ্ক কষে ঠিক করবে, কি কর্তব্য?

যাক, ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ কিছু নাই তবে!

ঈষৎ প্রাতস্থ হইয়া হেমপ্রভা বলেন—'আনন্দ' কথার বানান ভুলে গেছি তাপস। তুই হঠাৎ এরকম একলা একবস্ত্রে এভাবে চলে এলি কেন না শুনে সুস্থির হতে পাচ্ছিনে।

—এমনি! তোমায় দেখতে ইচ্ছা হলো। ভাবলাম কোন্ দিন কাশী লাভ করবে, দেখাই হবে না আর! তা—

—ও কথা আর যাকে বোঝাবি বোঝাগে যা, আমায় বোঝাতে আসিস নি তাপস! আমার মন কেবল 'কু' গাইছে। কি হয়েছে বল্! শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে—

—কি মুস্কিল!—তাপসী যেন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলে—বুড়ী হলেই কি ভীমরতি হতে হয় গো! একটা মানুষ সারারাত ট্রেনে চড়ে, খিদেয় তেষ্টায় কাতর হয়ে এসে পড়লো—তাকে 'কেন এসেছিস' 'কি জন্যে এসেছিস' এই নিয়ে কেবল জেরার ওপর জেরা! থাকতে না দাও তো বলো, চলেই যাই!

—বালাই ষাট্—দুগ্‌গা দুগ্‌গা। আমি যে দিবানিশি এই আশাটুকু বুকে নিয়েই দিন কাটাচ্ছি এখনো। একবার তোদের চাঁদমুখগুলি দেখবো। কিন্তু এমন আচমকা হঠাৎ এলি, ভয়ে বুক কেঁপে উঠলো। বল্ সবাই ভালো আছে তো?

—আছে আছে!

—কিন্তু তোকে তো ভালো দেখছি না।—হেমপ্রভা সন্দিগ্ধভাবে বলেন—তুই আছিস কেমন?

—খুব ভালো। তোমায় যে এখনো প্রণাম করাই হয় নি গো! গাড়ীর কাপড়ে ছোঁবো নাকি?

বাল্যের শিক্ষা আজও বিস্মৃত হয় নাই দেখা গেল। অভিভূত হেমপ্রভা এতক্ষণে দুই বাহু বাড়াইয়া বুকে জড়াইয়া ধরেন তাঁহার চির আদরের আদরিণীকে। অভী বাবলু যতই মূল্যবান হোক, তবু তাপসীর মূল্য আলাদা।

সংসারের প্রথম শিশু।

মণীন্দ্রর প্রথম সন্তান।

কমলার উপস্থিতির কথা আর স্মরণ থাকে না, চির-অবিচলিত হেমপ্রভা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেন।

কে জানে—তাপসীর চোখের খবর কি! পিতামহীর বুকের আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে বলিয়াই হয়তো লোকচক্ষে মান-সম্ভ্রমটা বজায় রহিল।

স্নানাহারের পর হেমপ্রভা আবার তাহাকে লইয়া পড়েন। তাপসীর এই আসাটা যে কেবলমাত্র নানির কাশীপ্রাপ্তি হইবার ভয়ে দর্শনলাভের আশায় ছুটিয়া আসা নয়, সেটুকু বুঝিবার ক্ষমতা বিলক্ষণ আছে তাঁহার।

কিন্তু তাপসী কেবলই হাসিয়া উড়ায়।

বলে—ভালো বিপদ হয়েছে দেখছি, এমন জানলে আসতাম না। নাবালক ছিলাম, একা আসবার সাহস হতো না। এখন সাবালক হয়েছি, তাই এলাম একবার।

হেমপ্রভা হাসিয়া বলেন হঠাৎ সাবালক হয়ে উঠলি কিসের জোরে? তোর মার কবল থেকে কারুর সাবালক হওয়া সোজা ক্ষমতা নয়।

—মাকে তুমি বড্ড চিনে ফেলেছো নানি, তাই না! সত্যিই অনেক ক্ষমতার দরকার। তাই তো পালিয়ে এলাম।

—সেই কথাটাই বল্—'পালিয়ে এলি।'…আচ্ছা এখন আর পীড়াপীড়ি করবো না, সময়ে শুনবো। তোদের আর সব খবর শুনি। অভী, বাবলু কতদূর কি পড়লো-টড়লো এতদিনে? তুই কি করছিস? সরকার মশায়ের চিঠিতে ভাসা-ভাসা একটা খবর কদাচ কখনো পাই মাত্র।

হেমপ্রভার কেমন একটা ধারণা হয়—তাপসী বড় হইয়া বুদ্ধি বিবেচনার অধিকারিণী হইয়া, এতদিনে নিজের জীবনের একটা সুব্যবস্থার চেষ্টায় হেমপ্রভার কাছে আসিয়াছে সেই তাহার বিবাহ-অভিনয়ের নায়কের তত্ত্ব লইতে।

শুরু রক্ষা করিয়াছেন যে চিত্রলেখা আক্রোশের বশে আর একটা বিবাহ দেবার চেষ্টা করে নাই! যতই হোক—হিন্দুর মেয়ে তো! কিন্তু সত্যিই যদি প্রশ্ন করে তাপসী, কি সদুত্তর দিবেন হেমপ্রভা? বুলুর সন্ধান লইবার চেষ্টা কয়েকবারই তো করিয়াছিলেন তিনি, কিন্তু যোগাড় করিতে পারিয়াছেন কই? প্রত্যেকবারই সরকার মশাই লিখিয়াছেন—'শুনিতে পাওয়া যায় ছেলেটি লেখাপড়া শিখিবার জন্য বিলাতে গিয়াছে।'

বিলাতে পড়িতে গেলে কতকাল লাগে? কি সে পড়া? ইদানীং আর চেষ্টা করেন নাই হেমপ্রভা। কি বা প্রয়োজন—তাঁহার দ্বারা আর কাহারও কিছু হইবার আশা যখন নাই! চিত্রলেখার ইচ্ছা হয় খোঁজ-খবর লইয়া মেয়ে পাঠাইবে। ইচ্ছা না হয়—তাপসীর ভাগ্য!

অনেক ভাবিয়া ভাবিয়া নিজেকে 'নিমিত্তের ভাগী' মনে করাটাও ছাড়িয়া দিয়াছিলেন

তিনি। আজ সহসা তাপসীকে দেখিয়া অপরাধ বোধটা নূতন করিয়া মাথা চাড়া দেয়। দোষ যাহারই হোক, এমন মেয়েটা মাটি হইয়া গেল!

কি কুক্ষণেই নাম রেখেছিলেন "তাপসী"! তপস্যা করিয়াই জীবন যাইবে! নিজের সংস্কারের দৃষ্টি দিয়াই বিচার করেন হেমপ্রভা। এছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভব, সে চিন্তাও আসে না।

বহুযুগ সঞ্চিত পুরুষানুক্রমিক সংস্কার।

যে সংস্কারের শাসনে লোকে বালবিধবাকে অনায়াসে মানিয়া লয়। পতিপরিত্যক্তার ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে।

এত কথা ভাবিতে অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড মাত্র সময় লাগিয়াছে।

তাপসী প্রায় কথার পিঠেই উত্তর দেয়—অভী ডাক্তারি পড়ছে, বাবলু ঢুকেছে ইঞ্জিনিয়ারিংএ। ওদের জন্যে অনেক কিছুই তো ইচ্ছে ছিল মার, হলো আর কই? কত খরচ লাগে।

মণীন্দ্রর অভাবটা দুজনেরই মনে বাজে, স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা হয় না। মিনিট খানেক নিঃশব্দ থাকিয়া হেমপ্রভা বলেন—আর তুই—তুই কি করছিস্?

—আমি?—তাপসী হাসিয়া বলে—আমি স্রেফ বেকার। কলেজের কবল থেকে বেরিয়ে পর্যন্ত একটা চাকরি-বাকরিতে ঢুকে পড়বার জন্যে ছট্‌ফট্ করছি, মার শাসনে হচ্ছে না। কাজেই—খাচ্ছি-দাচ্ছি, শাড়ী গয়না পরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

হেমপ্রভা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলেন—চাকরিতে ঢুকবি বলে ছট্‌ফট্ করছিস। চাকরি করবি তুই?

—করবো না কেন, তাই বলো? দোষ কি? জীবনটা তো মাঠেই মারা গেলো; গেরস্থদের এত এত টাকাকড়ি খরচা করে লেখাপড়াগুলো শিখলাম, সেটাও মাঠে মারা যাবে?

নাতনীর কথায় আর একবার ধৈর্যচ্যুত হন হেমপ্রভা।

পরিহাসচ্ছলে নিতান্ত অবহেলায় তাপসীর নিজের জীবনের এই মর্মান্তিক সত্যটা যেন সহসা চাবুক মারিল তাঁহাকে।

সত্যিই তো, জীবনটা মাঠে মারা যাইবার এত প্রচণ্ড দৃষ্টান্ত একালে আর কবে কে দেখিয়াছে।

অবাধ্য চোখের জলকে খানিকটা ঝরিতে দিয়া হেমপ্রভা গভীর আক্ষেপের সুরে বলেন—তা তুই বলতে পারিস্ বটে! কিন্তু হ্যাঁরে, তোর মা কি সেই হতভাগা ছোঁড়াটার খোঁজখবর কিছু করে না?

তাপসী কথাটা বলিয়া ফেলিয়া যেটুকু অপ্রতিভ হইয়াছিল, সেটুকু সামলাইয়া লইবার সুযোগ পাইয়াই যেন সকৌতুকে হাসিয়া ওঠে। হাসিয়া ফেলিয়া বলে—কেন গো, কি দুঃখে? আমার মা অমন হতভাগ্য লোকদের খুঁজে বেড়াবার মেয়ে নয়। খুঁজে খুঁজে

যত রাজ্যের ভাগ্যবন্তদেরই এনে হাজির করছে, যদি কিছু সুরাহা হয়। আমিই একটা রাবিশ।

কথাটা মিথ্যা নয়। মেয়ে থার্ড ইয়ারে পড়ার বছর হইতেই চিত্রলেখা মাঝে মাঝে এক-আধটি সম্ভাবিত পাত্র খুঁজিয়া আনিয়া মেয়ের চোখের নাগালে ধরিয়াছে। তবে তাপসীর মনের নাগাল পাইবার সৌভাগ্য কাহারও ঘটে নাই, এই যা দুঃখ। তাপসীর সহজ প্রসন্নতার কঠিন বর্মের আঘাতে লাগিয়া তাহাদের যত্নসঞ্চিত তৃণের সব রকম অস্ত্রই ফিরিয়া গিয়াছে।

অথচ মায়ের এই চেষ্টার জন্য মায়ের কাছে কোনদিন অনুযোগ করে নাই মেয়ে, সেইটাই তো আরো অসুবিধা চিত্রলেখার। কথা কাটাকাটির পথে তবু যুক্তিতর্কগুলা বলিয়া লওয়া যায়। কিন্তু বেবির অদ্ভুত চাল, যেন বুঝিতেই পারে না এমন ভাব।

শুধু কিরীটীর বেলাতেই ঘটনার স্রোত পাল্‌টাইয়াছে—আগাইয়াছে।

আত্মপ্রসাদ-প্রসন্ন চিত্রলেখা ভাবিয়া সন্তুষ্ট ছিল—যাক্ এতদিনে মনের মতনটি আনিয়া সামনে ধরিয়া দিতে পারিয়াছে। মেয়ের পছন্দটি দিব্য রাজসই বটে। তাই এতদিন কাহাকেও মনে ধরে নাই।

কিন্তু শেষরক্ষা হইল না।

তাপসীর কথা শুনিয়া মিনিটখানেক গুম্ হইয়া যান হেমপ্রভা। বধূ সম্বন্ধে 'যতই হোক হিন্দুর মেয়ে' বলিয়া নিজের মনকে তিনি যতই চোখ ঠারুন, এমনি একটা আশঙ্কা কি মনে মনে ছিল না তাঁহার? তাপসীর সিন্দুরবিহীন সীমন্ত দেখিয়া সম্প্রতি কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছিলেন এই যা। সিন্দুরবিহীনতাটুকু চোখে বাজিলেও, নূতন প্রলেপ যে পড়ে নাই এই ঢের। ও সংস্কারটাকে উড়াইয়া দিয়া অস্বীকার করিতে চায় করুক, বিবাহটা অস্বীকার করে নাই তো!

এই নূতন সংবাদে খানিকটা চুপ করিয়া থাকার পর তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করেন—তা সুরাহা কিছু হলো না কেন?

অর্থাৎ নাতনীর মনটাও জানিতে চান।

তাপসী ভালোমানুষ বলিয়া বোকা নয়। পিতামহীর মনোভাব বুঝিতে দেরি লাগে না তাহার। মুখের হাসি সমান বজায় রাখিয়াই বলে—হলো আর কই? ভাগ্যটাই যে মন্দ। ...আহা বেচারা, কত চেষ্টায় কত যত্নে বাজারের সেরা মানিকটি এনে গলায় ঝুলিয়ে দিচ্ছিলেন, আমারই বরদাস্ত হলো না! পালিয়ে প্রাণ বাঁচালাম।

ওঃ তাই বটে! আহা-হা! এ মেয়েকেও আবার সন্দেহ করিতেছিলেন তিনি!

সতী মেয়ে মায়ের অন্যায় উৎপীড়নে শেষ পর্যন্ত বাড়ী ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে। বাছা রে! বিগলিত স্নেহে হেমপ্রভা তাহাকে প্রায় কোলে টানিয়া লইয়া বলেন—বাছা রে! কত

কষ্ট পেয়েছো, মরে যাই!—জানি তো তোর মাকে, এই ভয়ই ছিল আমার। দেখছি—ভগবান আবার আমাকে সংসারের পাকে জড়াতে চান। মস্ত কর্তব্যের ত্রুটি রেখে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁকে ডাকতে বসলেও তো উচিত কাজ হয় না।···যাক্‌গে, তুই যে পালিয়ে এখানে এসে পড়েছিস্, ভালোই করেছিস্। দেখি আমার দ্বারা কি হয়—

—দোহাই নানি, আর কিছু হওয়াবার চেষ্টা কোরো না তুমি। একটা কাজকর্ম খুঁজে নেওয়া পর্যন্ত তোমার এখানে থাকতে দাও শুধু, তাহলেই হবে।

—আমার ওপর তোর বড় অবিশ্বাস, না?—তা হতে অবিশ্যি পারে। কিন্তু ভুলকে শোধরাবার সুযোগও একবার দিতে হয়। চাকরির কথা মুখে আনিস্ নি আমার সামনে। —এখন দয়া করে তোর মা আমার কাছে দু'দিন থাকতে দেয় তবে তো। থানা-পুলিস করে কেড়ে নিয়ে না যায়।

—বাঃ, মা কি করে জানবেন এখানে আছি!

হেমপ্রভা সচকিতে বলেন—একেবারে কিছুই জানিয়ে আসিস্ নি নাকি?

—না তো।

—ছি ছি! এ কাজটা তো তোমার ভালো হয় নি তাপস। আমি বলি বুঝি মায়ের ওপর রাগ করে চলে এসেছিস। চুপি চুপি পালিয়ে এসেছিস তাহলে? বড় নির্বুদ্ধির কাজ হয়েছে।

তাপসী ম্লান হাসির সঙ্গে বলে—আমার অবস্থায় যদি পড়তে, দেখতাম তোমারই বা কত বুদ্ধি খুলতো!

—বুঝেছি। অনেক যন্ত্রণা না পেলে এমন কাজ করতে না তুমি। শুনবো, সব শুনবো রাত্তিরে। কিন্তু এখুনি তো একখানা 'তার' করে দিতে হয় কলকাতায়।

—বা রে, বেশ তো! আমি বলে কত কষ্ট করে লুকিয়ে পালিয়ে এলাম, এখনই তাড়াতাড়ি বলে পাঠাব—'টু! আমি এখানে লুকিয়েছি!'

হেমপ্রভা হাসিয়া ফেলিয়া বলেন—আচ্ছা তোকে বলতে হবে না। আমিই কাউকে দিয়ে অভীর নামে 'তার' পাঠিয়ে দিচ্ছি। মেয়েমানুষ জাত যে বড় সর্বনেশে পরাধীন জাত! রাগ করে বাড়ী ছেড়ে পালাবার স্বাধীনতাই কি আছে তার? ঘরে পরে সকলে সন্দেহ করবে। কেউ বিশ্বাসই করবে না একলা পালিয়ে এসেছিস্।—আমার কাছে এসে পড়েছিস এই মস্ত রক্ষে, যত তাড়াতাড়ি খবর দেওয়া যায় ততই মঙ্গল।···যাই দেখি রাজেন বাড়ী আছে কিনা।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া দুইজনেরই প্রায় জাগিয়া রাত ভোর হইয়া যায়।

খুঁটিয়া খুঁটিয়া নানা প্রশ্নের সাহায্যে অনেক তথ্যই আবিষ্কার করেন হেমপ্রভা। মনটা যে খুব প্রসন্ন থাকে, এমন বলা যায় না। নিজের অবস্থা এবং ঘটনার বর্ণনা করিতে মিস্টার মুখার্জি নামধারী ব্যক্তিটির সম্বন্ধে যতই অগাধ উদাসীনতা দেখাক তাপসী, যতই মায়ের

"সেই পরম অমূল্য রত্নটি"* বলিয়া উল্লেখ করুক, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী পিতামহীর দৃষ্টির সামনে তাহার প্রকৃত মনের চেহারা ধরা পড়িতে দেরি হয় না।—এই পলায়ন তাহার তবে মায়ের জবরদস্তির কাছে অসহায় হইয়া নয়, আপন হৃদয়ের কাছেই অসহায়তা! মুখোমুখি সত্যের সম্মুখ হইতে আত্মরক্ষায় অক্ষম হৃদয় লইয়া ভীরু পলায়ন!—অপ্রসন্ন হইলেও একেবারে ধিক্কার দিতে পারেন না।

আরো কঠিন আরো দৃঢ় হইলেই অবশ্য ভাল ছিল, কিন্তু এই শোভাসম্পদময়ী ধরণীতে, জগতের যাবতীয় ভোগের উপকরণের মাঝখানে বসিয়া এই অপরূপ রূপ-যৌবনের ডালিখানি অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া 'দেবী' বনিয়া থাকা কি এতই সহজ! বালবিধবার তবু তো কৃচ্ছ্রসাধন বরাদ্দ।

কয়েকটা দিন কাটে।

চিত্রলেখার নিকট হইতে টেলিগ্রামেই সংক্ষিপ্ত জবাব আসিয়াছে—'ধন্যবাদ! নিশ্চিন্ত।' কন্যার প্রচণ্ড দুর্ব্যবহারে চিত্রলেখা কিরূপ পাষাণ বনিয়া গিয়াছেন, ভাষাটা তাহারই নিদর্শন।

তবু পিতামহীর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কাশী শহরটা প্রদক্ষিণ করিয়া এবং অসংখ্য দেবমূর্তি দর্শন করিয়া বেড়াইতে মন্দ লাগে না। অনাস্বাদিত বৈচিত্র্য! কাশীর বাজার হইতে কেনা সাদাসিধে কয়েকটা শাড়ী জামা—চিত্রলেখার কাছে যাহা একান্ত দীনবেশ, তাই পরিয়া অক্লেশে ঘুরিয়া বেড়ায় তাপসী। যে মূল্যবান নূতন রেশমী শাড়ীখানা বিবাহের 'পাকা দেখা' হিসাবে—আসিবার কালে পরনে ছিল, সেখানা নিতান্ত অনাদরে দড়ির আলনায় ঝুলিয়া ধুলা খাইতে থাকে।

এত ঘোরায় অনভ্যস্ত ক্লান্ত হেমপ্রভা রাত্রে বিছানায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মড়ার মত ঘুমাইয়া পড়েন, জানিতেও পারেন না পার্শ্ববর্তিনীর কুসুম-সুকুমার হাল্কা দেহখানির মধ্যে কি উত্তাল সমুদ্র তোলপাড় করিতে থাকে, কি দুরন্ত কালবৈশাখীর ঝড় বয়!

বিনিদ্র রজনীর সাক্ষ্য থাকে শুধু বিনিদ্র নক্ষত্রের দল।

কোটিকল্পকাল ধরিয়া যাহারা বহুকোটি মানবের বিনিদ্র রজনীর হিসাব রাখিয়া আসিতেছে।

দিন কয়েক পরে—

গঙ্গাস্নানে যাইবার আগে হেমপ্রভা সুদৃশ্য একখানি ভারী খাম হাতে করিয়া বেজার মুখে নাতনীকে উদ্দেশ করিয়া বলেন—এই নাও, তোমার চিঠি!

ঠিকানাটা টাইপ করা, হাতের লেখা দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই, তবু কি একটা আশার আশঙ্কায় বুকটা থরথর করিয়া ওঠে তাপসীর; হাত বাড়াইয়া লইবার ক্ষমতা পর্যন্ত থাকে না।

—কই খোল্ তো দেখি কি লিখেছে। কার চিঠি?

—বুঝতে পারছি না—বলিয়া তাপসী বন্ধ খামখানাই নাড়াচাড়া করিতে থাকে। খুলিবার লক্ষণ দেখায় না।

খুলেই দেখ্ না—'হাতে পাঁজি মঙ্গলবারে'র দরকার কি? এ'বোধ করি তোমার মার সেই অমূল্যরত্ন "মিস্টার মুখুজ্জে" না কে যেন, তারই হবে। আস্পদ্দাকে বলিহারি দিই বাবা! বেচারা এই দূরদূরান্তরে এসে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে, তাও নিস্তার নেই! চিঠি লিখে উৎখাত করতে এসেছে গো!...তুই খোল্ তো, দেখি আমি, কি লিখেছে সে। কড়া করে উত্তর দিয়ে দিবি, বুঝলি? লিখবি—'তোমার সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখবার ইচ্ছে আমার নেই।'

তাপসী উত্তর দেয় না, হয়তো দিতে পারেই না—ঘামে ভেজা 'থর থর কম্পিত' মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া খামখানার অবস্থা শোচনীয় করিয়া তোলে।

হেমপ্রভা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার নাতনীব মুখের চেহারাটা দেখিয়া লইয়া বলেন—অবিশ্যি তোমার নিজের মন বুঝে কথা। দেহটা নিয়ে পালিয়ে আসা যায়, মন নিয়ে তো পালানো যায় না। তুমি যদি তোমার ধিঙ্গি মায়ের মতলব মত ওই ছোঁড়াকেই—দুর্গা দুর্গা। থাক্—বলবার আমার কিছু নেই। নিজের বিবেচনায় কাজ করবার সাহসও আর নেই। যা ভাল বুঝবে করবে।

অন্যমনস্ক তাপসী বোধ করি ঠাকুমার শ্লেষটা বুঝিলেও কারণটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, অসহায় অন্যমনস্ক স্বরে বলে—আমার জন্যে কেউ তো কোনোদিন কোনো বিবেচনাই করলে না নানি! তুমি পালিয়ে এলে কাশী, বাবা চিরদিনের মত পালালেন, পড়ে রইলাম মার হাতে। স্বপ্নের বর স্বপ্ন হয়েই রইল, আমি কি করি বলো তো!

হেমপ্রভা আহত অপ্রতিভভাবে বলেন—জানি দিদি, বুঝি—তোর ওপর সবাই অবিচার করেছে। দারুণ অভিমানে পালিয়ে এসেছিলাম, কর্তব্য ঠিক করতে পারি নি।...মণি যখন চলে গেল, তখন আমারই উচিত ছিল যেমন করে হোক তোর আখেরে'র ব্যবস্থা করা।—দেরি হয়ে গেছে, তবু সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবার করবো আমি। একেবারে তোকে নিয়েই যাবো কুসুমপুর।—কেউ না থাক, কান্তি মুখুজ্জের প্রতিষ্ঠিত 'রাইবল্লভের' মন্দির তো আছেই, সেখানে গিয়ে খোঁজ করবো।—দেখি সে ছোঁড়া কি ক'রে অবহেলা করে তোকে। শুনেছিলাম বিলেত-মিলেত গেছে নাকি। ভগবান জানেন মেম বিয়ে করে বসে আছে কিনা। তাহলেও আমি সহজে ছাড়বো না!

তাপসী মৃদু হাসির সঙ্গে বলে—মানুষ তো অমর নয় নানি! তোমার দেওয়া শাস্তি-ভোগ করতে আসামী টিঁকে থাকলে তো।

হেমপ্রভা শিহরিয়া ওঠেন। ঠিক এই ধরনের একটা আশঙ্কা কি তাঁহার নিজেরই নাই? ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিলে—হ তো এত নিস্পৃহ হইয়া থাকিবার কারণও তাহাই। কুমারীর মত আছে থাক্—কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া কি শেষটায় সাপ বাহির করিয়া বসিবেন?

কিন্তু এ অবস্থাও আর সহনীয় নয়।...যা থাকে কপালে, দেশে একবার যাইবেনই তিনি এবার। আর যাই হোক—পিসশাশুড়ী বুড়ীটা নিশ্চয়ই ঠিক খাড়া আছে। বিধবা মেয়ে-মানুষের কাঠপ্রাণ, ও আর যাইবার নয়। কিছু সুরাহা যদি নাই হয়—আচ্ছা করিয়া একবার দশকথা শুনাইয়া দেওয়ার সুখটাই বা হয় হোক্।

কেন? দোষ কি শুধু এ পক্ষেরই? কান্তি মুখুজ্জের অবিমৃষ্যকারিতাই কি তাপসীর জীবনটা মাটি করিয়া দিবার যথার্থ কারণ নয়? সে ভুল শোধরানোর চেষ্টা করা উচিত ছিল তাহাদেরই!

রাজলক্ষ্মী যে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, সেটা না হেমপ্রভা, না তাপসী কাহারও জানা নাই।

যাই হোক—ভিতরে ভিতরে যত আশঙ্কাই থাক, মুখে দমেন না হেমপ্রভা। 'ষাঠ্ ষাঠ' করিয়া ওঠেন—অলুক্ষণে কথা মুখে আনিসনে তাপস। দুর্গা! দুর্গা! মেম মায়ের কাছে এই শিক্ষাটাই হয়েছে বুঝি! যা নয় তাই মুখে আনা! মনে রাখিস্ সাবিত্রীর দেশের মেয়ে তুই। যমের বাবার সাধ্যি হবে না তোর আশার জিনিস কেড়ে নিতে।

তাপসী অবিশ্বাসের হাসি হাসে।

হাতের খামখানা খুলিয়া দেখিবার আগ্রহও যেন শিথিল হইয়া যায়। সাবিত্রীর দেশের মেয়ে সে? তাই তো! এ কথাটা এত স্পষ্ট করিয়া কেউ তো কোনোদিন বলিয়া দেয় নাই।

খামখানা হাতের মধ্যে নিপীড়িত হইতে থাকে।

না পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেবার মত মনের জোর থাকিতে পারে না তাপসীর?—সাবিত্রীর দেশের মেয়ে হইয়াও না?

গঙ্গাস্নানের দেরি হইয়া যায় দেখিয়া হেমপ্রভা তখনকার মত আর চিঠির বিষয়বস্তু দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন না, ঝোলামালা লইয়া বাহির লইয়া যান।

আর তাপসী?

চিঠিখানার বিষয়বস্তু জানিবার প্রয়োজন কি তাহারও নাই আর?

জ্ঞান অবধি যে সংগ্রাম জীবনের সাথী, স্পষ্ট করিয়া আবার একবার তাহার মুখোমুখি দাঁড়াইতে হইতেছে তাপসীকে। লোভের সঙ্গে সততার সংগ্রাম, বাস্তবের সঙ্গে সংস্কারের।

তাপসী কি হার মানিবে?

হৃদয়ের সমস্ত শক্তি এক মুহূর্তের জন্য আঙুলের ডগায় কেন্দ্রীভূত করিয়া খামটা একবার ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিলেই তো সব চুকিয়া যায়।

আচ্ছা এমনও হইতে পারে, সব সন্দেহই অমূলক—নেহাৎ কোনো বাজে লোকের চিঠি! ...লিলির হইতেই বা বাধা কি? বন্ধু বলিতে অবশ্য কেহই নাই তাপসীর, তবু আত্মীয়তার সূত্র ধরিয়া লিলিও তো জিজ্ঞাসা করিতে পারে—তাপসীর অমন সৃষ্টিছাড়া ভাবে পলাইয়া আসার কারণ কি?

অতীও পারে না প্রকাণ্ড এক চিঠি লিখিতে?

তাপসীর পলাইয়া আসার অর্থ জানিতে চাওয়ার অধিকার তাহারও থাকিতে পারে!

কিংবা মা!

তাপসী কিভাবে তাঁহার মুখে চুনকালি লেপিয়াছে, উঁচু মাথাটা হেঁট করিয়া দিয়াছে,

সেইটা শুনাইয়া দিবার মত উপযুক্ত ভাষা হয়তো এতদিনে সংগ্রহ করিয়াছেন তিনি।

টাইপ-মেশিনের নিষ্প্রাণ অক্ষরগুলো নিতান্তই নীরব দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইয়া থাকে, কোনো উত্তর দেয় না।

বোকার মত আগেই ছিঁড়িয়া ফেলার তো মানে হয় না কিছু।

তবু হঠাৎ সমস্ত শক্তি একত্রীভূত করিয়া খাম সমেত চিঠিখানা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া দেয় তাপসী।

না, হেমপ্রভার কাছে খেলো হইতে রাজী নয় সে। বুঝুন তিনি, কাহারও উপর কোনো মোহ নাই তাপসীর। সাবিত্রীর দেশের মেয়ে শুধু যে নিজের 'এয়োতি' রক্ষা করিতেই জানে তা নয়, আপন সম্মান রক্ষা করিতেও জানে।

জগতে অনেক অসম্ভবই সম্ভব হয়। নিতান্ত কল্পিত গল্পের মত ঘটনাও সত্যসত্যই ঘটিতে দেখা যায় মাঝে মাঝে। দৈবাৎ হইলেও হয়। সেই দৈবাতের ব্যাপার আজ ঘটিতে দেখা গেল হেমপ্রভার জীবনে!

স্পষ্ট করিয়াই বলি। নানা চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে দিশাহারা হেমপ্রভা যখন স্নানান্তে 'মালাজপের' ছুতায় বসিয়া ইতিকর্তব্য চিন্তা করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ একটি ভদ্রমহিলা সামনে আসিয়া সোজাসুজি প্রশ্ন করেন—একটা কথা বলবো, শুনবেন? কিছু মনে না করেন তো সাহস করে বলি।

বিস্মিতা হেমপ্রভা তাকাইয়া দেখেন—বার্ধক্যের ক্ষীণদৃষ্টি এবং সোজাসুজি রৌদ্রের ঝলসানি, দুটায় মিলিয়া চোখটা কেমন ধাঁধাঁইয়া দেয়। চিনিতে পারেন না মানুষটা কে?

ভদ্রমহিলা আবার বলেন—মনে হচ্ছে ভুল করি নি, তবু সন্দেহ ভঞ্জন করতে শুধোচ্ছি—কাশীতে আপনি কতদিন আছেন মা!

হেমপ্রভা গম্ভীরভাবে বলেন—তা অনেকদিন! কেন বল তো জানতে চাইছো?

—চাইছি আমার বিশেষ দরকার মা। আচ্ছা আপনার দেশ কোথায়?

কৌতূহলী হেমপ্রভা এবার ঝোলামালা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলেন—ঘাট ছেড়ে ছায়ার দিকে চলো তো বাছা, দেখি তুমি কে?

দুইজনেই ছায়ার দিকে সরিয়া যান।

ভদ্রমহিলা এবারে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলেন—নিজের পরিচয় দেবার মতন না হলেও দেবো বৈকি মা, তবু আমার প্রশ্নের উত্তরটা আগে দিন।

হেমপ্রভা অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অপরিচিতার আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া সংক্ষেপে বলেন—দেশ আমার বর্ধমান জেলায়।

—গ্রামের নাম? —সাগ্রহ স্বর ধ্বনিত হয় ভদ্রমহিলার কণ্ঠে।

—কুসুমপুর। কেন বল তো? চিনতে তো পারছি না কই?

আমি কিন্তু ঠিক চিনেছি মা। বিশ্বনাথ মুখ রেখেছেন মনে হচ্ছে। পরিচয় দিলে চিনবেন নিশ্চয়ই। আমি. স্বর্গীয় কান্তি মুখুজ্জে মশায়ের ভাগ্নী, বুলুর পিসীমা। চেনেন তো কান্তি মুখুজ্জেকে ?

'চিনি না আবার'! একথা বলিতে ইচ্ছা হইলেও রসনায় যেন শব্দ যোগায় না হেমপ্রভার। এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া যান তিনি!

সত্যই কি তবে ভগবান প্রত্যক্ষ আছেন? এই ঘোর কলিতেও? অন্তরের যথার্থ ব্যাকুলতা লইয়া যা কিছু প্রার্থনা করা যায়, হাতে তুলিয়া দেন তিনি?

নাকি হেমপ্রভাকে ছলনা করিতে, ব্যঙ্গ করিতে বুলুর পিসীর ছদ্মবেশ ধরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন? এখনই আবার মিলাইয়া যাইবে এই মায়ামূর্তি!

বাক্‌শক্তিকে ফিরাইয়া আনিয়া হেমপ্রভা যা বলেন, তাতে কিন্তু অন্তরের এই উচ্ছ্বসিত ব্যাকুলতা ধরা পড়ে না, নিস্পৃহ স্বরে বলেন—আমাকে তো চিনেছো, বলো দিকিন্ কি সূত্রে আমার সঙ্গে পরিচয়?

রাজলক্ষ্মীর হেমপ্রভার মত আপন হৃদয়যন্ত্রের উপর এত নিয়ন্ত্রণ নাই, তাই অর্ধরুদ্ধ উচ্ছ্বসিত স্বরে বলেন—সেকথা আর জিজ্ঞেস করে লজ্জা দেবেন না মা। আপনার কাছে মস্ত অপরাধী আমরা। তবু বলি দশচক্রে ভগবান ভূত! অনেকবার অনেক মিনতি করে লোক পাঠিয়ে পাঠিয়ে হতাশ হয়ে তবেই না চুপ করে গিয়েছি মা! ঘরের লক্ষ্মী ঘরে না এলে কি ঘর মানায়! তা আমারই হতভাগ্যির দোষ, কোনো সাধই মিটলো না।

হেমপ্রভা যে কলিকাতার কোন খবরই প্রায় রাখেন না, সেই হইতে নির্বাসিত জীবন যাপন করিতেছেন, সে ধারণা নাই রাজলক্ষ্মীর, থাকিবার কথাও নয়।

—ভাগ্যের দোষ বৈকি বাছা, বিধাতার বিধান রদ করবে কে! তা ভাইপোর আবার বিয়ে দিলে কোথায়?

আপন মান বাঁচাইতে হেমপ্রভা এই রকম বাঁকা পথে প্রশ্নটা করেন।

'আবার বিবাহ দাও নাই তো'—প্রশ্নটা বড় অপমানকর। দিলে কোথায়—এ যেন একটা নিশ্চিত ঘটনা সম্বন্ধে বাহুল্য প্রশ্ন। যেন বিবাহটা অতি সাধারণ একটা সংবাদ মাত্র। যেন ইহার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করিতেছে না হেমপ্রভার। যেন উত্তরের অপেক্ষায় রুদ্ধশ্বাস বক্ষে ইষ্টনাম জপ করিবার দরকার হয় না। যেন রাজলক্ষ্মীর ভাইপোর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু মাথাব্যথা নাই হেমপ্রভার।

এ প্রশ্নটার পরেই দেশের ধানচালের ফলন অথবা মাছ দুধের মূল্য-বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে কিছুমাত্র বিকার দেখা যাইবে না বোধ হয়।

রাজলক্ষ্মী এ চাল জানেন না। এই ভাবে উৎকণ্ঠাকে দাবাইয়া নিস্পৃহতার ভান করার 'চাল'। তাই হেমপ্রভার প্রশ্নে তিনি যেন মনের আনন্দ চাপিয়া রাখিতে পারেন না। নিজেদের মহত্বের পরিচয় দিবার এত বড় সুবর্ণ সুযোগ, একি কম কথা!

যে নিদারুণ ঘটনার জন্যই মনের দুঃখে দেশত্যাগী হইয়াছেন রাজলক্ষ্মী, পোড়ারমুখো বিধাতাকে কমপক্ষে লক্ষবার গালাগাল করিয়াছেন, সেই ঘটনাটাই এখন দেবতার আশীর্বাদ বলিয়া মনে হয়।

অতএব উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া অনায়াসেই বলিতে পারেন তিনি—বিয়ে?—না মা, আমার ভাইপো তেমন ছেলে নয়। মামা যা করে গেছেন তার ওপর কলম চালানো—সে হতে পারে না।

প্রায় পাকিয়া ওঠা 'বিবাহ' ফলটি যে হঠাৎ রাজলক্ষ্মীর অজ্ঞাত কারণে পাকিবার পরিবর্তে খসিয়া গিয়াছে, সেটা আর প্রকাশ করেন না।

হেমপ্রভার হাতের মালা দ্রুত ঘুরিতে থাকে।

গুরুদেব, মুখ রাখিয়াছো তবে!—তাপসীর কাছে নূতন করিয়া অপদস্থ হইবার মত কিছুই ঘটে নাই দেখা যাইতেছে!—এখন শুধু স্বভাব-চরিত্র বিদ্যা-বুদ্ধি সম্বন্ধে সন্ধান নেওয়া!—আছেই বা কোথায় কে জানে! তবু প্রায় অবহেলাভরে বলেন—কি করছে এখন ভাইপো?

—বুলু? তা আপনার আশীর্বাদে মানুষের মতন মানুষ একটা হয়েছে। বড় দুঃখু যে মামা কিছুই দেখতে পেলেন না। কত সাধ ছিল তাঁর, তা সে সাধ মিটতো! বুলু আমার এখানে দুটো পাস করে জলপানি পেয়ে বিলেত চলে গিয়েছিল। সেখানেও কি সব ভাল ভাল পাস-টাস করে একেবারে চাকরি পেয়ে এসেছে। আটশো টাকা মাইনে। পরে আরো অনেক হবে! চাকরির নামটা বলতে পারলাম না বাপু, খুব ভাল চাকরি।

হেমপ্রভা হাসিয়া ফেলিয়া বলেন—আমার চাইতে তো ঢের ছোট তুমি, অমন সেকেলে বুড়ীর মত কথা কেন গা বাছা? তা যাক্—বিলেত ঘুরে এসে মেজাজটি আছে কেমন—মেম চায় না তো?

রাজলক্ষ্মী জিভ কাটেন।

—অমন কথা বলবেন না। বুলু কি সেই ছেলে? এখনো বাড়ী গেলেই আমার রান্নাঘরের দোরে খুরসি পিঁড়িতে বসে নারকোল নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ চেয়ে খায়, রাইবল্লভের আরতির সময়ে গরদের ধুতি পরে চামর পাখা 'ঢোলায়'। বললে হয়তো ভাববেন বাড়িয়ে বলছি—তবু বলবো হাজারে একটা অমন ছেলে মেলে না। আপনার ছেলে ইচ্ছে করে অবহেলা করলেন, এখন দেখলে বলবেন—

হেমপ্রভা বাধা দিয়া উদাসস্বরে বললেন—আমার ছেলে? সে দেখছে বৈকি, সেখানে বসে সবই দেখতে পাচ্ছে। হয়তো এতদিনে তার অপরাধী মাকে ক্ষমাও করেছে।

রাজলক্ষ্মী থতমত খাইয়া বলেন—কেন? তিনি কি—

হেমপ্রভা মাথা নাড়েন—হ্যাঁ, এক যুগ হয়ে গেল। কেউ কারোর কোন খবরই তো রাখি না। আজ বিশ্বনাথ হঠাৎ তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন তাই। দেখি তাঁর কি ইচ্ছে!

মান খোয়াইয়া বলেন না—'এইবার তবে তোমাদের বৌ লইয়া যাও তোমরা।' শুধু কথা ফেলিয়া রাজলক্ষ্মীর মনোভাব বোঝার চেষ্টা করেন।

রাজলক্ষ্মী হাঁ হাঁ করিয়া ওঠেন—আর কি বিশ্বনাথের ইচ্ছে বুঝতে ভুল করি মা? এবার আর কোন বাধা শুনবো না, আমার বুলুর হাতে পড়লে কোনো মেয়ে অসুখী হবে না এই ভরসাতেই জোর করে বলছি।

হেমপ্রভা মালাগাছটি কপালে ঠেকাইয়া মৃদু হাসির সঙ্গে বলেন—আমার নাতনী তো তার যুগ্যি নাও হতে পারে বাছা! কিছুই তো জানো না তুমি!

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ওঠেন, যেন ভারি একটা রহস্য করিয়াছেন হেমপ্রভা।

অতঃপর অনেক জ্ঞাতব্য এবং অজ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা হয়, শুধু তাপসী যে কাশীতেই হেমপ্রভার নিকট রহিয়াছে, সেটুকু সুকৌশলে চাপিয়া যান হেমপ্রভা! কেবল বলেন—চলো না, আমার বাড়ী এই তো কাছে। এবেলা আমার কাছেই দুটো দানাপানির ব্যবস্থা হোক।

রাজলক্ষ্মী সামান্য অনুরোধেই রাজী হইয়া যান। হেমপ্রভার সঙ্গে সম্বন্ধ বজায় রাখার গরজ যেন তাঁহারই বেশী!

'দানাপানি' ব্যতীতও রাজলক্ষ্মীর জন্য যে 'তৃষ্ণার জল' তোলা রহিয়াছে হেমপ্রভার ঘরে, সেকথা কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন রাজলক্ষ্মী?

নানির সঙ্গে একটি বিধবা ভদ্রমহিলাকে আসিতে দেখিয়া তাপসী নিজে হইতে তেমন গ্রাহ্য করে নাই। এমন তো মাঝে মাঝে আসে কেউ কেউ। ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইবার বা অপরের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া কথা কহিবার ইচ্ছাও করে না।—অজানিত ব্যক্তির সেই চিঠিখানায় অজ্ঞাত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আকাশপাতাল কল্পনা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে বেচারা।

স্বাভাবিক দৃষ্টি লইয়া ঘরে ঢুকিলে ছেঁড়া চিঠির কুচিগুলা হেমপ্রভার দৃষ্টি এড়াইত না নিশ্চয়ই, কিন্তু বিশেষ ব্যস্ততা লইয়া ঘরে ঢোকেন তিনি তাই লক্ষ্য করেন না।

—তাপসী শোন্, একজন এখানে খাবে আজ। হ্যাঁ, এ বেলাই। একটু আয় দিকি আমার সঙ্গে, কুটনো-বাটনা করে দিবি।

তাপসী অবাক হইয়া বলে—আমি! আমার হাতে খাবে তোমরা?

—ওমা কথা শোনো মেয়ের! তোর হাতে খাবো না কিরে?—সর্বদা আ-কাচা কাপড়ে থাকিস, তাই ছুঁই ছুঁই করি, হাতে খাবো না কেন? হাড়িদের বৌ নাকি তুই? নে চল্ দিকি, সেই সিল্কের কাপড়টা পরে।

উচ্ছ্বসিত আনন্দের ভাবটা নাতনীর কাছে আর লুকাইতে পারেন না হেমপ্রভা।

তাপসী বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার তাকাইয়া দেখিয়া বলে—কে এসেছে নানি? খুব যে খুশী দেখছি! তোমার কোনো বন্ধু না আত্মীয় কেউ?

—আত্মীয় বন্ধু সবই। ভগবান বুঝি মুখ রাখলেন।—যাক্, তুই আর দেরি করিসনে, আমি যাচ্ছি—ওমা, ঘরভর্তি এত কাগজ ছড়ালে কে? কি এ?

—চিঠি।

—চিঠি! ও সেই চিঠিখানা বুঝি? ছিঁড়েছিস কেন? কার চিঠি ছিল?

—জানি না।

—জানি না কি কথা! দেখিস নি?

—না।

হেমপ্রভা একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া নাতনীর কাছে আগাইয়া আসেন। তাহার মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া আর্দ্রস্বরে বলেন—আমি জানতাম তাপস, ছোট হবার মত কাজ তুই করবি না। আশীর্বাদ করছি তোর দুঃখের দিন এইবার শেষ হোক। আমার সঙ্গে যে এসেছে, বিশ্বনাথ তাকে আজ হাতে তুলে দিয়েছেন। বুলুর পিসী হয় ও; তোর পিস্‌শাশুড়ী। চমকে উঠিস নি, কিচ্ছুটি বলতে হবে না তোকে, শুধু গিয়ে প্রণাম করবি। খাঁটি সোনা বুলু আমার, এখনও তোরই পথ চেয়ে বসে আছে, কোনো ভয় নেই।

তাপসী আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই একবারের জন্য চমকাইয়া উঠিয়াই যেন স্তব্ধ হইয়া যান রাজলক্ষ্মী।

এই তাপসী?

বুলুর বৌ?

স্বপ্নের কল্পনাও হার মানে যে! এই বৌ হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে বুলু! বুলুর মত স্বামীকে লাভ করিয়া ধন্য হইতে পাইল না বলিয়া অপরিচিতা বধূর ভাগ্যেরই নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন এতদিন?

চিন্তার হাওয়াটা এবারে বিপরীতমুখী বহে।

উঃ! নির্দয়তার মধ্যেও কী অনন্ত দয়া ভগবানের! বুলুর সম্প্রতিকার বিবাহটা ফস্কাইয়া না গিয়া যদি সত্যই ঘটিয়া যাইত!

কী সর্বনাশই হইত।

এ বৌকে রাজলক্ষ্মী কোথায় রাখিবেন? বুকে না মাথায়? না, এবারে আর বোকামি করিবেন না বাবা, আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া তবে আর কাজ।

হেমপ্রভার হাতে-পায়ে ধরিতে হয় তাও রাজী। দোষ কি? সম্পর্কে গুরুজন তো! মানের জন্য প্রাণ যাক—অত কুসংস্কার নাই রাজলক্ষ্মীর।

হেমপ্রভাকে অবশ্য হাতে-পায়ে ধরিতে হয় না, নিজেই তো হাত ধুইয়া বসিয়াছিলেন ভদ্রমহিলা।—'কাশীবাস' করিবার সাধুসঙ্কল্প অবলীলাক্রমে বিসর্জন দিয়া রাজলক্ষ্মীও যেমন মহোৎসাহে দেশে ফেরার তোড়জোড় করেন, হেমপ্রভাও তেমনি আগ্রহেই দীর্ঘকালব্যাপী কাশীবাসে অভ্যস্ত জীবনকে আপাতত ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিবার ব্যবস্থা করিতে থাকেন।

মন জিনিসটা এমন, একবার ছুটিলে আর ধরিয়া রাখা শক্ত। চিরদিনের প্রিয় আবাসস্থল স্বামীর ভিটার ছবিখানি মনে ফুটিয়া ওঠা পর্যন্ত হেমপ্রভার আর এক ঘণ্টাও দেরি সহে না।

কেবলমাত্র তাপসীর হিতার্থেই নয়, নিজের প্রীত্যর্থেও যাওয়ার ইচ্ছাটা এত প্রবল হয়।

হায়, কি মিথ্যা অভিমানেই তিনি সেই পুণ্যভূমিকে ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছেন! এ অভিমানের মর্ম বুঝিল কে?

না—শেষ জীবনে একবার গিয়া এতদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আসিবেন হেমপ্রভা।

অতএব 'দশচক্রে ভগবান ভূত'!

তাপসীরও যাওয়া ছাড়া গতি কি?

মান খোয়াইয়া মায়ের কাছে তো সত্যি ফিরিয়া যাওয়া যায় না—বিনা সাধ্য-সাধনায়—এমন কি বিনা আহ্বানে।

অথচ চিত্রলেখার মনোভাব অনমনীয়।

তবে যাইবার গোছ করিতে করিতে এক সময় সে চুপি চুপি বলিয়া নেয়—দেখো নানি, দেশে গিয়ে আমি যে যার-তার বাড়ীতে থাকতে যাবো, তা মনেও কোরো না, বুঝলে? তোমার বরের সেই যে একটা সেকেলে পুরনো 'পেল্লায়' বাড়ী আছে, তারই এককোণে থাকতে দিও।

হেমপ্রভা হাসিয়া ফেলিয়া বলেন— ইস্ তাই বৈকি! কেন, আমার বরের বাড়ী তোকে থাকতে দেব কেন রে? নিজের বরের বাড়ী সামলাগে যা!

—দরকার নেই নানি, বাজে জিনিস সামলে। নিজেকে সামলাতে পারলেই বাঁচি এখন আমি।

পরিহাসচ্ছলে বলিলেও কথাটায় দুঃখময় সত্যের করুণ সুরটুকু ধরা পড়িয়া যায়।

সত্যই তো—নিজেকে সামলানোই কি সোজা?

এই দীর্ঘকাল যাবৎ নিজেকে সামলাইয়া চলিতে চলিতে যে কাহিল হইয়া গেল বেচারা!

ট্রেনে 'ধক্‌ধক্' শব্দের সঙ্গে সুর মিলাইয়া তাপসীর হৃৎপিণ্ডটাও যেন 'ধক্‌ধক্' করিতে থাকে।...কি করিতে যাইতেছে সে? খেলাঘরের সেই বিবাহটাকে ঝালাইয়া লইয়া অপরিচিত বরের ঘর করিতে যাইতেছে! বিনা আমন্ত্রণে, বিনা আহ্বানে!

তাছাড়া কি? ভিতরে ভিতরে তেমনি একটা আকাঙ্ক্ষাই কি লুকাইয়া নাই?

কিন্তু রাজলক্ষ্মীর আমন্ত্রণটাই কি চরম? লুব্ধ ভিক্ষুকের মত সেইটুকু সুযোগ লইয়া

কৃতার্থমুখে দাঁড়াইতে হইবে সেই উদাসীন—হয়তো বা আত্মম্ভরী—লোকটার কাছে ?…শেষ পর্যন্ত তাহার একটু করুণা লাভ করিয়াই ধন্য থাকিতে হইবে হয়তো! কে বলিতে পারে তার কি মতিগতি।…রাজলক্ষ্মীর কথাবার্তায় খুব বেশী আস্থা তাঁহার উপর রাখা চলে না। নেহাতই সাদামাটা বোকাসোকা মানুষ।

তবে ?

তাপসী এখন করিবে কি ?

সেই অজ্ঞাতস্বভাব লোকটার করুণার উপর জুলুম করিয়া, অথবা আইনের দাবী লইয়া নিজের ঠাঁই করিয়া লইতে হইবে তাহাকে ? ফাঁকির সেই সিংহাসনে বসিয়া থাকিবে দশের একজন সাজিয়া ? গহনা কাপড়ের ঝিলিক্ মারিয়া চরিয়া বেড়াইবে সমাজের মাঠে ? অস্বীকৃত সম্বন্ধের জের টানিয়া নির্লজ্জের মত ভিক্ষাপাত্র হাতে ধরিয়া কোন্ মুখে গিয়া দাঁড়াইবে তাপসী ? বলিবে কি সে ?

কি বলিবেন চিত্রলেখা ?

কি বলিবে ভাইয়েরা ? আত্মসম্মান-জ্ঞানটা ভারি টনটনে ছিল না তাপসীর ?

আর—

আর একখানি মুখ ? সেই কি একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে ?

অজন্তার ছাঁদে গঠিত সেই ওষ্ঠাধরের ঈষৎ বাঁকা রেখায় যে বাঁকা হাসির ব্যঞ্জনা দেখা দিবে, তার তিক্ততা কল্পনাতেও সহ্য করিবার ক্ষমতা আছে কি তাপসীর ?

ভাবিতে গেলেই বুকের ভেতরটা কেমন একটা যন্ত্রণায় মোচড় দিয়া ওঠে। কিরীটীর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ঘুচাইয়া ফেলিতে হইবে—এই কথাটা যতবারই মনে মনে উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করে তাপসী, নিজেকে ভারি অসহায় লাগে।…

বুলু কে ? বুলুর সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কি ? স্বামীত্বের দাবীতে বুলু আসিয়া অধিকার করিয়া লইবে তাহাকে ?

'স্বামী' শব্দটার মোহই কি তবে বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাপসীর ? এই শব্দের মোহ আজ যে শক্তি যোগাইতেছে, সে কি চিরদিন যোগাইতে পারিবে ?—মোহ যখন মূর্তি ধরিয়া দেখা দিবে ? মোহকে মনে মনে লালন করা এক, আর মূর্তিকে সহ্য করা আর। প্রায় জীবনব্যাপী সংগ্রাম সত্ত্বেও যে তাপসী হৃদয়ধর্মের কাছে পরাজিত হইয়াছে একথা তো অস্বীকার করিয়া লাভ নাই!

কিরীটীই যে আজ তাহার একান্ত প্রিয়—প্রিয়তম, দূরে সরিয়া আসিয়া বড় স্পষ্ট হইয়াই ধরা পড়িয়া গিয়াছে সেইটা।

দুইটা বুড়ীর প্রভাবে পড়িয়া এ কোন্ পথে পা বাড়াইতে বসিয়াছে সে!

—ট্রেনের ধকলে বৌমার মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে—একটু জল খাও না মা!—রাজলক্ষ্মী কাশী হইতে সংগৃহীত পেঁড়া ও চম্‌চম্ বাহির করিতে বসেন।

ট্রেনে তৃষ্ণা তাঁহারও পায়, কিন্তু বিধবার অত ক্ষুধা-তৃষ্ণার ধার ধারিলে চলে না।

তাপসী প্রতিবাদের ভঙ্গীতে হেমপ্রভার দিকে তাকায়—ভাবটা যেন এত আত্মীয়তা বরদাস্ত হয় না বাপু।

হেমপ্রভা নাতনীকে চোখ টেপেন, অর্থাৎ করুকগে না বাপু, কি আর ফোস্কা পড়িবে তোমার গায়ে?

রাজলক্ষ্মীর চোখে এ সব ভাব বিনিময় ধরা পড়ে না। তিনি সহর্ষ চিত্তে খাবার গুছাইতে গুছাইতে বলেন—বুলু আমার পেঁড়ার ভারি ভক্ত, বলে—চারটি বালি-ধুলো মিশানো হলেও জিনিসটা কিন্তু বেশ পিসীমা। নইলে এই তো বর্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানা—ছোঁয়ও না।

বিরক্তি সত্বেও হঠাৎ ভারি হাসি পায় তাপসীর।

কারণে অকারণে বুলুর প্রসঙ্গের অবতারণা না করিলে যেন চলে না বুড়ীর।—ওঁর বুলুর পছন্দ-অপছন্দ, রুচি-অরুচির সমস্ত তালিকা মুখস্থ করাইয়া একেবারে যেন তৈরী করিয়া ফেলিতে চান তাপসীকে।

বুড়ী, তোমার আশায় ছাই!

আসলে কাহারও ঘর করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই তাপসী। আপন হৃদয় লইয়া এক পাশে পড়িয়া থাকাই তাহার বিধিলিপি।

এতদিন 'স্বামী' নামক যে দুরতিক্রম্য বাধাটাকে স্বীকার করিয়া লইয়া আপনাকে প্রিয়তমের কাছে নিঃশেষে সঁপিয়া দিবার উদগ্র কামনাকে ঠেকাইয়া আসিয়াছে, সেই স্বামীর যখন সন্ধান মিলিল, দেখা যাইতেছে, তাহার হাতে সঁপিয়া দিবার মত কিছুই আর অবশিষ্ট নাই।—হয়তো বা নিজেরই অজ্ঞাতসারে বেনামী ডাকে নিলাম হইয়া গিয়াছে তাপসী!

আগে খবর দেওয়া ছিল।

স্টেশনে গাড়ী আসিয়াছিল—দু'পক্ষেরই।

নিজ নিজ আস্তানায় যাইবার প্রাক্কালে আবার একপালা সম্ভাষণ শেষে রাজলক্ষ্মী তাপসীকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া যে কথাগুলি বলেন—তাহার সারার্থ এই—এই মুহূর্তেই তাপসীকে নিজের গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া পলাইবার দুর্দান্ত ইচ্ছাকে দমন করিয়া নিতান্তই শুকনো মুখে ফিরিতে হইতেছে তাঁহাকে, কারণ ঘরের লক্ষ্মীকে তো আর তেমন করিয়া লইয়া যাওয়া যায় না! শুভদিনে শুভলগ্নে বুলু নিজে যাইয়া মাথায় করিয়া বহিয়া আনিবে। বুলুকে দেখে আসিবার আদেশ করিয়া চিঠি তিনি কাশী হইতেই পোস্ট করিয়া আসিয়াছেন, রহস্য কিছুই প্রকাশ করেন নাই, শুধু জানাইয়াছেন, বিশেষ কারণে কাশীবাসের সংকল্প ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিতে হইতেছে রাজলক্ষ্মীকে, বুলু যেন অবিলম্বে একবার আসে।

এমন ছেলে, চিঠি পাওয়া মাত্র মোটর গাড়ীতেই ছুটিয়া আসিবে ঠিক। আজকালই আসিয়া পড়িবে। অতঃপর সামনেই যে শুভদিন পাওয়া যাইবে—

—আহা, ভদ্রমহিলা ভাবছেন, ওর সেই সোনার চাঁদ ভাইপোটির আশায় পথ চেয়ে আছি আমি!

গাড়ী ছাড়িবার পর মন্তব্যটি ব্যক্ত করে তাপসী।

যুগান্ত পরে দেশের মাটিতে পা দিয়া হেমপ্রভার উৎসুক দৃষ্টি যেন পথের দু'পাশের মাঠঘাট গাছপালাগুলাকেও লেহন করিতেছিল। তাপসীর কথায় অন্যমনস্কভাবে বলেন—তবে কার আশায় আছিস?

—কারুর আশাতেই নয়। দেখো, তোমার বরের সেই বিরাট অট্টালিকার গহ্বর থেকে কেউ টেনে বার করতে পারবে না আমাকে।

হেমপ্রভা সচকিত হইয়া বলেন--এখন থেকে মেজাজ বদলাস্‌নে তাপস, ঠাট্টার কথাই বলতে বলতে সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। কথায় বলে—"হাসতে হাসতে কপাল ব্যথা"।

—তবে কি তুমি বলতে চাও নানি, "সেধো ভাত খাবি" বললেই হ্যাংলার মত "আঁচাবো কোথায়" বলে ছুটে যাবো?

—কথার দশা দেখো! ছুটে তুই যাবি কেন—সে-ই আসবে!

—সে-রকম আসার মূল্য কি নানি? পিসীর অঞ্চলনিধি সুবোধ বালক পিসীর আদেশ পালন করতে আসবে—

—তা গুরুজনের আদেশ পালন করা বুঝি খারাপ?

—খারাপ বলছি না নানি, তবু স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কিছু বদল হওয়া উচিত। কই এতদিনের মধ্যে একবারও কি আমার জন্যে মাথাব্যথা হয়েছে ওর? আমিই না হয় নিরুপায়, ও তো নয় নানি? তবে আমি কেন—

হঠাৎ সমস্ত কৌতুকের ভাষা রুদ্ধ করিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়ে ডাগর কালো দুটি চোখের কোল বাহিয়া।

বাড়ী ঢুকিতেই নানা লোকের ভিড়ে, নানা কথায়, দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে বাড়ীখানার দুর্দশার আলোচনায় হৃদয়সমস্যা চাপা পড়িয়া যায়।

ঠাকুমা-নাতনী মহোৎসাহে গোছগাছে লাগিয়া যান।

সারাদিনের গোলমালে কিছুই মনে থাকে না, মনে পড়ে রাত্রে বিছানায় যাইবার আগে।

হেমপ্রভা তখনও নীচের তলায়, সরকার মশায়ের সঙ্গে অনেক কথা অনেক আলোচনায় বিভোর। যে সব বিষয়-সম্পত্তি তাপসীর নামে দানপত্র করিয়া গিয়াছিলেন, কি তাহার ব্যবস্থা হইতেছে, আদায়পত্রের হিসাব ঠিক রাখা হয় কিনা, নাতিরা কখনও আসে কিনা, ইত্যাদি কত সহস্র প্রশ্ন!

দূরে সরিয়া গেলে মনে হয় যেন খুব ত্যাগ করিলাম, কাছে আসিলেই ধরা পড়ে—যথার্থ ত্যাগ করা কত কঠিন!

চিরবিশ্বস্ত সাধুপ্রকৃতি সরকার মহাশয়কেও মাঝে মাঝে জেরা করিয়া বসিতেছেন।

তাপসীকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকার জন্য সাধ্যসাধনা করা সত্ত্বেও সে—"দায় পড়েছে আমার! তোমার ওই সব কাগজপত্তর দেখলে গা জ্বলে যায় বাবা"—বলিয়া উপরে পলাইয়া আসিয়াছে।

পলাইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বাগানের দিকের এই ছোট ছাদটায়।

সেকেলে বাড়ী। মাপিয়া জুপিয়া, অঙ্ক কষিয়া করা নয়, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে যেখানে সেখানে ছাদ, বারান্দা, চাতাল ইত্যাদি গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন কর্তারা।

বাগানের দিকের এই ছাদটি ভারি চমৎকার।

আসিয়া দাঁড়াতেই এলোমেলো বাতাসের সঙ্গে একটা দূরবিস্মৃত সুগন্ধভার যেন তাপসীর সর্বাঙ্গে আসিয়া আছাড় খায়।

কি এ! কোথায় ছিল এরা—এই চাঁপা মুচকুন্দ মল্লিকার দল!—যাহারা একদা তাপসীর ঘুমন্ত শিশুমনকে জাগাইয়া কৈশোরের সোনার দরজার চাবি দেখাইয়া দিয়াছিল!

সেই বৈশাখী রাত।

আশ্চর্য! তাপসীর বারো বছর বয়সের পর আর কি কোনোদিন বৈশাখ মাস আসে নাই? কত সময় তো কত জায়গায় ঘুরিয়াছে, কোথাও ফোটে নাই চাঁপা মুচকুন্দ মল্লিকা?

মনে পড়িয়া গেল—ফুলের মালা পরার জন্য ছোট ভাইদের কাছে লাঞ্ছনা। আর—আর—সেই দিনই না! সেইদিনই তো বল্লভজীর মন্দিরে গিয়াছিল তাহারা!

এই পরিবেশ আর এই গন্ধসমারোহের দৌত্যে বড় বেশী স্পষ্ট করিয়া সব মনে পড়িয়া যাইতেছে। কই এতদিন তো এমন করিয়া চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে নাই বল্লভজীর রৌদ্রালোকিত প্রাঙ্গণের মাঝখানে সেই ফুটন্ত কমলের মত রক্তাভ দুইখানি পায়ের পাতা, বেনারসীর জোড়ের আলোয় ঝলসানো আঁচলটার ঝকঝকানি, ঈষৎ কোঁকড়ানো রেশমী কালো চুলে ঘেরা উজ্জ্বল একখানি মুখ!

মুখ নয়—মুখের আভাস। মুখটা কিছুতেই মনে পড়ে না, স্মৃতির দরজায় মাথা কুটিয়া ফেলিলেও না!

সেই পায়ের নীচে নিজেকে বিকাইয়া দেওয়া, আজ কি এতই অসম্ভব! কে জানে হয়তো এই আবেষ্টনের মধ্যে নিজেকে আটকাইয়া রাখিলে, খুব অসম্ভব নয়।

কোন্‌টা ধর্ম? কোন্‌টা ন্যায়?

মাথার উপর যে নক্ষত্রের দল নীচের মানুষের প্রতি অনুকম্পার দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া আছে, তাহারা কি বলিয়া দিবে তাপসীর কর্তব্য কি ?

অনেক রাত্রে হেমপ্রভা উপরে আসিয়া তাপসীকে ছাদে আবিষ্কার করিয়া অবাক হইয়া যান—এখনও ঘুমোসনি তুই ? এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিস ?

—ঘুম আসছে না নানি।

—হেমপ্রভা মনে মনে হাসিয়া ওঠেন।

না আসাই তো উচিত। এই কি ঘুমের বয়স না ঘুমের রাত্রি ! তবু তো মরুভূমির মত জীবন তাপসীর !

ছায়াচ্ছন্ন স্নিগ্ধশীতল জীবনেও কি বিরহের রাত্রে ঘুম আসে চোখে ?

এই ছাদে এমনি শিথিল ভঙ্গীতে হেমপ্রভাও কি দাঁড়াইয়া থাকেন নাই কোনোদিন ? পরনে নীলাম্বরী—খোঁপায় ফুলের মালা—চোখে প্রতীক্ষার ক্লান্তি—আর মুখে অভিমানভার। উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন—ঘোড়ার খুরের শব্দের আশায় কান পাতিয়া। ঘোড়ায় চড়া ছিল ব্রজেন্দ্রর একমাত্র শখ।

মাথার উপরকার ওই নক্ষত্রের দল আজকের হেমপ্রভাকে দেখিয়া বিশ্বাস করিবে এ কথা—না একযোগে হাসিয়া উঠিবে ?

কিন্তু থাক্—আজকের সমস্যা হেমপ্রভার নয়—তাপসীর।

যার জীবনের কোন পরিচিত পদধ্বনি নাই।

—ঘুম সহজে আসবে না, নতুন জায়গা কিনা। চল্ শুয়ে শুয়ে গল্প করিগে। তোর মার আশা করি না, অভী সিধু যদি আসতো তো বেশ হতো ! জীবনের পালা চোকাবার আগে একবার শেষ সাধ মিটিয়ে নিতাম !

হেমপ্রভার জীবনের পালা চুকিবার সময় হইয়াছে কিনা ভগবান জানেন, কিন্তু সাধ মিটাইবার দায়টা পোহাইবার ভার ভদ্রলোক স্বয়ং লইয়াছেন দেখা গেল।

পরদিনই দরজার গোড়ায় ছোটখাটো ঝক্‌ঝকে একখানি মোটর গাড়ী আসিয়া হাজির।

সরকার মশাই যে লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিয়াছিলেন, সেকথা হেমপ্রভার জানা ছিল না। তিনি অবাক হইয়া যান।

অভী আসিয়াছে ! সত্য না স্বপ্ন ?

একা নয়—গাড়ীর মালিক এক বন্ধুকে লইয়া। ঠিক সমবয়সী বন্ধু নয়, তবে অসমবয়সী হইলেও মাঝে মাঝে বন্ধু হওয়া যায় বৈকি।

—নানি নানি, দেখছো তো তোমার টানে ছুটে এলাম!

—ওমা আমার ভাগ্যি! গুরুদেব আমার মনের কথা কানে শুনেছেন! কে খবর দিলে? সরকারমশাই নিশ্চয়? একবার চাঁদমুখগুলি দেখবার জন্যে যে কি উতলা হচ্ছিলাম। সিধু আসে নি বুঝি?

—না, মার শরীর ভালো নয়, দুজনে এলাম না। অবশ্য এক হিসেবে দুজনেই এসেছি। সঙ্গে একটি বন্ধুলোক আছেন, বলতে পারি না তিনি আবার কার টানে এসেছেন—বলিয়া অমিতাভ দিদির দিকে একটা বাঁকা দৃষ্টি হানে—স্নেহের নয়, কৌতুকের।

ধক্ করিয়া ওঠে তাপসীর বুকটা। কে আসিয়াছে সঙ্গে?···তাই কি সম্ভব?···নী না, অমিতাভ যে দু'চক্ষের বিষ দেখে তাহাকে! নিজে সঙ্গে করিয়া আনিবে! পাগল নাকি তাপসী! কিন্তু কে?

একেই তো বাড়ী ছাড়িয়া কাশী পালানোর লজ্জায় তাপসী ছোট ভাইটিকে দেখিয়া তেমন উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনায় ছুটিয়া আসিতে পারে নাই, প্রসন্নমুখে শুধু নানির পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন অভীর কথায় একেবারেই মূক হইয়া যায় বেচারা।

বেশীক্ষণ চিন্তা করিতে হয় না, অভী দু'এক কথার পরই ব্যস্তভাবে বলে—আরে, ভদ্রলোককে কি গাড়ীতেই বসিয়ে রাখা হবে? যাই ডেকে আনি! দিদি, মিস্টার মুখার্জি এসেছেন—বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়।

দিদি তো সেইখানেই জমিয়া হিম!

যা আশঙ্কা তাই সত্য! কি সর্বনাশ! অভীটাই বা হঠাৎ এত বদলাইল কেমন করিয়া! কোন্ ধরনের ঘুষের দ্বারা অভীকে হাত করা যায়!

হেমপ্রভা সচকিত হইয়া বলেন—কি বলে গেল অভী? কে এসেছে? সেই হতভাগাটা? আবার এখানেও ধাওয়া করেছে এসে? এ কি বেহায়া লোক গো! খবরদার, তুই সামনে বেরোবি না, বুঝলি?

তাপসীর কি বোধশক্তি আছে এখনও যে বুঝিবে!

তাহার সমস্ত স্নায়ুশিরায় অণুপরমাণুতে যে ধ্বনিত হইতেছে শুধু একটা অবোধ্য হাহাকার!

চিঠিটা না পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলার চাইতেও যে দেখা না করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া আরো কত কঠিন, সে বোধও আর নাই তাপসীর।

'বেহায়া হতভাগা'টাকে সঙ্গে বহিয়া আনার জন্য মনে মনে অমিতাভর বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে দিতে হেমপ্রভা উঁকি মারিয়া দেখিবার জন্য সিঁড়ির কাছ বরাবর যাইতে না যাইতেই অপরাধীযুগল উঠিয়া আসে উপরতলায়।

পর পর দুইটি পদধ্বনি।

প্রথম পদধ্বনি তারুণ্যে উচ্ছল অকুণ্ঠ দাবীর, দ্বিতীয়টি যৌবন-সংযত কুণ্ঠিত সংশয়ের।

—এই যে নানি, আমার বন্ধু—এঁর গাড়ীতেই এলাম আমরা।

অমিতাভর কথার উত্তরে হেমপ্রভা বিরক্তি-তিক্তস্বর কোনো প্রকারে সহজ করিয়া বলেন—বেশ বেশ, নিয়ে গিয়ে বসাওগে ঘরে।

—বা রে! ঘরে বসাবো মানে! তোমার সঙ্গে ভাব করবার ইচ্ছেতেই তো এখানে আসা এঁর। তাই না মিস্টার মুখার্জি?

অজন্তার ছাঁদে গঠিত ওষ্ঠাধরের ঈষৎ বাঁকা রেখায় একটি কৌতুকহাস্যের রেখা ফুটিয়া ওঠে।

হেমপ্রভা অবাক হইয়া ভাবেন, কোথায় যেন দেখিয়াছেন ছেলেটিকে। ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু ভারী সুকুমার মুখখানি। বিদ্বেষ রাখা কঠিন, তবু তাপসীর সঙ্গে যোগসূত্রের কল্পনায় জোর করিয়া স্নেহকে আসিতে দেন না। নীরসকণ্ঠে বলেন—আমার সঙ্গে আবার ভাব-আলাপ! সেকেলে বুড়ী আমরা, ভদ্দর সমাজের অযোগ্য।

হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে অমিতাভ।

এদিকে তাপসীর অবস্থা শোচনীয়। দাঁড়াইয়া থাকাও যত অস্বস্তিকর, হঠাৎ চলিয়া যাওয়াও তার চাইতে কম অস্বস্তির নয়।

হেমপ্রভা নিতান্তই অমিতাভর মান বা মন রাখিতে কথা বলিবার জন্যই বলেন—কি নাম ছেলেটির?

—কিরীটীকুমার মুখার্জি।

—উত্তর দেয় অমিতাভ।

—বাপ-মা আছেন তো? কটি ভাই-বোন তোমরা?

পুনরায় এই একটি মামুলী প্রশ্ন করেন হেমপ্রভা। এবারে সরাসরি কিরীটীকেই করেন।

—না নানি, বাপ-মা ভাই-বোন কেউ নেই আমার।

নানি!

হঠাৎ যেন কোথা হইতে এক ঝলক মমতা আসিয়া হেমপ্রভার হৃদয়ে আছড়াইয়া পড়ে।...কেউ কোথাও নেই! আহা! তাই অমন স্নেহ-কাঙাল মুখ! জোর করিয়াও বিদ্বেষ আনা যায় না। মুখেও সেই 'আহা' শব্দই উচ্চারিত হয়—কেউ নেই! আহা! বাড়ী কোথায় ভাই তোমার?

—এই পাশের গ্রামে।

তাপসী ততক্ষণে সরিতে সরিতে দালানের ওদিকে গিয়া প্রায় দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। তবু কথাটা শুনিয়া চমকিয়া যায়।...পাশের গ্রামে! কই একথা তো কোনোদিন জানা ছিল না। কিন্তু থাকিবেই বা কেন? তাপসী কি কোনোদিন জানিতে চাহিয়াছে, কিরীটীর ঘর-বাড়ী কোথায়? অনাগ্রহ দেখাইতে গিয়া ভদ্রতাবোধও থাকে নাই সব সময়। মা-বাপ যে নাই সেটুকুই শুধু আলাপ-আলোচনার ফাঁকে জানা হইয়া গিয়াছে মাত্র।

হেমপ্রভা চমকান না, বরং প্রসন্নমুখে বলেন—তাই বুঝি? তাই ভাবছি, কোথায় যেন দেখেছি। পাশের গ্রামের তো—ছেলেবেলায় কোনো সূত্রে দেখে থাকবো।

—দেখেছেন অবশ্যই। নেহাত ক্ষীণ হইলেও যোগসূত্র একটা রয়েছে যখন!

বঙ্কিম ওষ্ঠাধরের ভঙ্গিমায় তেমনি বাঁকা হাসি। বিদ্রূপের নয়, কৌতুকের।

হাসিতেছে অমিতাভও। তাহার চাপাহাসির আভায় উজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া দেখিয়া কেমন যেন বোকা বনিয়া যায় তাপসী।

কি ব্যাপার। যোগসূত্র যাহা আছে তাহাতে নানির সঙ্গে সম্বন্ধ কি—আর ঘটা করিয়া বলিয়া বেড়াইবার মতই কথা কি সেটা? তবে? অমিতাভর মুখে যেন কি একটা ষড়যন্ত্রের রহস্য আঁকা। এরা এখানে আসিয়াছে কিসের ফন্দি আঁটিয়া—সেই বিবাহ ব্যাপারটাই আবার কোনোপ্রকারে বাধাইতে চায় নাকি? কিন্তু অভী—

হেমপ্রভা আপন মনেই উত্তর দেন—যোগসূত্র! সে কি? বুঝতে পারছি না তো!—কে ভাই তুমি? বাবার নাম কি তোমার?

—বাবার নাম ছিল কনক মুখোপাধ্যায়। কিন্তু সে বললে কি চিনতে পারবেন আপনি? —দাদুর নামটাই বরং জানতে পারেন।

—দাদু! কে তোমার দাদু বলো তো? এ অঞ্চলের পুরনো কালের সকলের নামই তো চিনতাম—তবে অনেকদিন দেশছাড়া। ভুলেও যাচ্ছি—

তাপসী অমন করিয়া তাকাইয়া আছে কেন? সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়াই উত্তরটা শুনিতে চায় নাকি—কি বলিবে কিরীটী? কি বলিতেছে?

—ভুলে যাবেন না, দোহাই আপনার। আপনি সুদ্ধ ভুলে গেলেই সর্বনাশ! দাদুর নাম ছিল স্বর্গত কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।...আমি বুলু!

কি চমৎকার হাসিমাখা মুখে কথাটা উচ্চারণ করিল।

জিভে বাধিল না! গলায় আটকাইয়া গেল না! অনায়াস-লীলায় কিরীটী উচ্চারণ করিল—আমি বুলু!...এটা কি একটা বিশ্বাস করিবার মত কথা? পরিহাস করিবার আর ভাষা পাইল না?...নাকি অমিতাভর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া নানিকে ঠকাইতে আসিয়াছে? অমিতাভ আবার কবে ওর বন্ধু হইল? তাপসী চলিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীটা উল্টাইয়া গিয়াছিল নাকি? নানিকে ঠকাইয়া ও কি তাপসীকে গ্রাস করিতে চায়? তাপসীকে ও. ভাবিয়াছে কি?

কি বলাবলি করিতেছে ওরা?

এ সব কথার কোনো অর্থ আছে নাকি? কি বলিতেছে?

—আমার পিসীমা রাজলক্ষ্মী দেবীর চিঠি পেয়েই অবশ্য এসেছি আমি। তবে এখানে অমিতাভই জোর করে আগে এনে হাজির করেছে। ‘চিনি না’ বলে তাড়িয়ে-টাড়িয়ে দেবেন না তো।

ও কি মানুষ? ও কি পাষাণ? তাপসী কি এখনও সজ্ঞানে আছে? কিরীটী নামটা তবে ছদ্মনাম—নাকি সত্য? এই দীর্ঘকালের মধ্যে কই স্বামীর নামটা তো জানিয়া রাখে নাই তাপসী! আশ্চর্য! আশ্চর্য! বুলু যে একটা সত্যকার নাম হইতে পারে না, নিতান্তই আদরের ডাক, তাও খেয়াল হয় নাই কোনোদিন!

তাপসী মূর্খ, তাপসী অবোধ—তাপসী বাস্তববুদ্ধিহীন স্বপ্নজগতের জীব।

কিন্তু কিরীটী?

সেও কি তাপসীর মত অবোধ? নাকি জানিয়া শুনিয়া বসিয়া বসিয়া মজা দেখিয়াছে! নিশ্চিন্ত আমোদে এই নিদারুণ যন্ত্রণা দিব্য উপভোগ করিয়াছে। আর তাপসী ওর এই নিষ্ঠুর আনন্দের খোরাক জোগাইয়া আসিতেছে!

কিরীটীর সমস্ত ব্যবহারটাই পূর্ব-পরিকল্পিত, এইটুকু মাথায় খেলিয়া যাইতেই মাথার সমস্ত রক্ত যেন আগুন হইয়া উঠে। তাপসীকে লইয়া অবিরত কেবল খেলাই চলিবে?—আচ্ছা, ওর মতলবটা তবে কি ছিল—ছদ্মবেশের আড়ালে নিজেকে ঢাকিয়া তাপসীকে পরীক্ষা করা নয় তো? তরলচিত্ত তাপসী পুরুষকণ্ঠের আহ্বানমাত্রেই সাড়া দিয়া বসে কিনা তারই পরীক্ষা? হয়তো—হয়তো সে সময় এমনও ভাবিয়াছে—এই-ই স্বভাব তাপসীর, যার-তার ডাকে আপনাকে বিকাইয়া দেওয়া!

ভাবিয়াছে আর মনে মনে কতই না জানি হাসিয়াছে! হয়তো আজও ধিক্কার দিতেই আসিয়াছে!

দুরন্ত অভিমানে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি উগ্র হইয়া উঠে। বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

এই ব্যক্তির সঙ্গে নূতন করিয়া গাঁটছড়া বাঁধিতে হইবে? কৃতার্থচিত্তে ওর চরণচিহ্নের অনুসরণ করিয়া যাইতে হইবে ওর ঘর করিতে?

অসম্ভব!

তাপসীর ধ্যানের দেবতাকে ভাঙিয়া চুরি করিল কিরীটী—'বুলু' বিলুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু তাপসীকে ইচ্ছা করিলেই অধিকার করা যাইবে, একথা মনে করিবার মত ধৃষ্টতা যেন কিছুতেই না হয় ওর!—আত্মপরিচয় গোপনকারী কাপুরুষের সঙ্গে তাপসীর কোনো সম্বন্ধ নাই!

হেমপ্রভার বহু সাধ্যসাধনা, অমিতাভর কাটাছাঁটা তীক্ষ্ণ শ্লেষবাক্য, কিছুই যখন টলাইতে পারিল না তাপসীকে, "শুধু একবার দেখা করার" প্রস্তাবটা পর্যন্ত অগ্রাহ্য হইয়া গেল, অগত্যাই তখন ম্লান হাসি হাসিয়া বিদায় লইতে হইল বুলুকে।

রাগ দেখাইয়া অভুক্ত অমিতাভও ফিরতি ট্রেনে ফিরিয়া গেল।

দিদির ব্যবহার চিরদিনই তাহার কাছে বিরক্তিকর প্রহেলিকা।

আগে অবশ্য নিজেই সে কিরীটীকে দুইচক্ষে দেখিতে পারিত না, কিন্তু সে তো পরিচয়

জানা ছিল না বলিয়াই!—এখন সবদিকেই যখন এত সুব্যবস্থা দেখা গেল, তখনই কিনা বাঁকিয়া বসিল দিদি! খামখেয়ালের কি একটা সীমা থাকা উচিত নয়?

দিব্য তো প্রেমে পড়িয়াছিলে বাবা, এখন সত্যকার স্বামী জানিয়াই সে সব উবিয়া গেল? ঈশ্বর জানেন—সেই বিবাহ-প্রস্তাবের দিন তলে তলে কি মারাত্মক ঝগড়াঝাঁটি হইয়াছিল, তা নয়তো কখনো সেই আসর হইতে নিরুদ্দেশ হয় মানুষ?

তাপসীর নিরুদ্দেশ হওয়ার পর, পাটনা হইতে ঘুরিয়া আসিয়া কিরীটী যেদিন কেবলমাত্র অমিতাভর কাছেই আপন পরিচয় ব্যক্ত করিয়া ক্ষমা চাহিল, সেইদিন হইতে তাহাকে এত বেশী ভালবাসিতে শুরু করিয়াছে অমিতাভ যে ভালবাসাটা প্রায় পূজার পর্যায়ে উঠিয়াছে।

এ হেন ব্যক্তি, অমিতাভ যাহাকে দেবতার কাছাকাছি তুলিয়াছে, তাহাকে কিনা স্রেফ্ অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল দিদি! 'পাকা দেখা'র দিন বাড়ী ছাড়িয়া পালানোর স্বপক্ষে তবু একটা যুক্তি আছে, কিন্তু এ যে নাহোক অপমান!

অপমান ছাড়া আর কি?

কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে আপত্তি জানানোই তো অপমান করা।

প্রকাণ্ড বাড়ীর নিতান্ত নির্জন একটি কোণ বাছিয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াছিল তাপসী।

স্তম্ভিত বৈকি!

নিজের ব্যবহারে, কিরীটীর ব্যবহারে—বোধ করি স্বয়ং বিধাতাপুরুষের ব্যবহারেও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে সে। তাপসীকে গড়িয়া জগতে পাঠানোর পর তাপসী সম্বন্ধে এত সচেতন কেন তিনি? ভুলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না—অবিরত তাহাকে পিটিয়া পিটিয়া আর কোন্-ভাবে গড়িতে চান? আচ্ছা—

সাবিত্রীর দেশের মেয়েদের গঠনকার্যটা কি তিনি ইঁট কাঠ দিয়া করেন? রক্ত মাংস থাকে না? 'হৃদয়' বলিয়া কোনো বস্তু থাকিবার আইন তাহাদের নাই?

সেই অন্যায় আইন অমান্য করে নাই কেন তাপসী? কেন হৃদয়ের অনুশাসন মানিয়া যা খুশী করে নাই এতদিন?

মন ভাসিয়া যায় অন্য স্রোতে।

চিরদিনের স্বপ্নময় 'বুলু'ই কিনা মিস্টার মুখার্জি!—এত কাণ্ডের পরও ঠিক যেন বিশ্বাস হয় না।

আচ্ছা, কোন্ নামটা মানায় তাহাকে? 'কিরীটী' না 'বুলু'? বুলু বুলু বুলু! তাপসীর আবাল্যের ধ্যানের মন্ত্র। কিরীটীর মূর্তিটা কিছুদিনের জন্ত তাহার বুদ্ধিটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু নাম?

নাঃ, নামটাকে কোনোদিন প্রাধান্ত দেয় নাই তাপসী।

"মিস্টার মুখার্জি" ছাড়া আর যে কোন সংজ্ঞা আছে তাহার, সে কথা মনেই পড়ে নাই কোনোদিন। কিরীটী নামটা কবে কখন প্রাণে সাড়া জাগাইয়াছে!

সে নামটা ছিল কেবল পরিচয় মাত্র।

সত্য ছিল মানুষটা।

কিন্তু 'বুলু' শব্দটা তো কেবলমাত্র একটা নাম নয়, ওটা যেন একটা ধ্বনিময় অনুভূতি—যে অনুভূতি মিশাইয়া আছে তাপসীর সমস্ত সত্তায়, সমগ্র চৈতন্যে।

সেই বুলু নাকি হেমপ্রভার কাছে অকপটে স্বীকার করিয়া গিয়াছে, সেও তাপসীকে সেই বিবাহের রাত্রি হইতেই রীতিমত ভালোবাসিতে শুরু করিয়াছিল। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া তাপসীকে পাইবার স্বপ্নই ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান ধারণা।

তবু যে কৃত্তি হইয়া আসিয়া এক কথায় প্রার্থনা করিয়া বসে নাই, সেটা যদিও অনেকটাই চক্ষুলজ্জা, অথবা সাহসের অভাব, তবু গ্রহণ করিবার আগে একবার পরীক্ষা করিবার লোভটুকু সংবরণ করিতে পারে নাই সে।

সেই লোভেই আপন পরিচয় গোপন করিয়া এ পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়াছে।

অর্থাৎ তাপসীর ধারণা ভুল নয়। যাচাই!

হেমপ্রভা বলিতেছেন, অন্যায় কিছুই করে নাই বুলু। সত্যই তো—অতকাল আগের সেই কচি কিশলয়টি এতগুলো বৎসরের রৌদ্রে তাপে হিমে ঝড়ে বিবর্ণ হইয়া যায় নাই, ম্লান হইয়া যায় নাই, ঠিক তেমনই আছে, এ প্রমাণ সে পাইবে কোথায়! পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ইচ্ছাটা স্বাভাবিক বৈকি। সেই ইচ্ছার বশেই চিত্রলেখার পরিবারের কাছাকাছি আসিবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া লইতে হইয়াছে তাহাকে—অনেক চেষ্টায়, অনেক কৌশলে।

অবশ্য চিত্রলেখার চোখে পড়িবার পর আর বেশী পরিশ্রম করিতে হয় নাই তাহাকে। অজস্র সুযোগ তিনিই সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

হয়তো হেমপ্রভার কথাই ঠিক।

কিন্তু সেই নিদারুণ পরীক্ষা দিতে বুক যার ছিঁড়িয়া পড়িয়াছে—তিল তিল করিয়া পিষিয়া মরিতে হইয়াছে—সে কি বলিবে?

বলিবে কাজটা খুব ন্যায্য—খুব ভাল হইয়াছে বুলুর?

অহরহ যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে তাপসী, সে যন্ত্রণা কি চোখে পড়ে নাই তাহার? দিনের পর দিন সেই যন্ত্রণা চোখে দেখিয়াও পরীক্ষা করিবার সাধ মেটে নাই? অবশেষে যখন সেই শ্রান্ত অবসন্ন মানুষটা হাল ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে, তখন আসিলেন হাসিমুখে অভয়-বাণী শোনাইতে! বিজয়ীর মহিমায় স্বচ্ছন্দ অবহেলায় বলিতে বাধিল না—মিথ্যা এতদিন যুদ্ধ করিয়া মরিয়াছ, প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন ছিল না এত কষ্টের! আমিই তোমার ইষ্ট-দেবতা, প্রলোভনের ছদ্মবেশে পরীক্ষা করিতেছিলাম মাত্র।

দীর্ঘ পত্রের মারফৎ সেই কথাই নাকি জানাইয়া দিয়াছিল সে—যে চিঠি কাশীর বাড়ীতে তাপসী অপঠিত অবস্থায় ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। কে জানে খুলিয়া পড়িলে আজকের ইতিহাস অন্যরূপ হইত কিনা।

কিন্তু এখন আর বদলানো যায় না।

কোনো কিছুতেই আর প্রয়োজন নাই তাপসীর—না যুক্তে, না রাজত্বে। তাই বুক ছিঁড়িয়া পড়িলেও মুখের হাসি বজায় রাখিয়া সে হেমপ্রভার কাছে ঘোষণা করিয়া দিয়াছে—কেউ যে আমাকে যাচিয়ে বাজিয়ে অবশেষে গ্রহণ করে কৃতার্থ করবে, ওসব বরদাস্ত করতে পারবো না বাপু।...তোমার আদরের কুটুম্ব এসেছে, সন্দেশ রসগোল্লা খাইয়ে আপ্যায়িত করোগে, আমার আশা ছাড়ো।

হেমপ্রভা আর্তপ্রশ্ন করিয়াছিলেন—আর এই যে তুই ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলি বর খুঁজতে, সেই বরকে পেয়ে ছাড়বি? এমন করে ফিরিয়ে দিলে ওকি আর কখনো সাধতে আসবে?

হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে একত্র করিয়া মুখের হাসি বজায় রাখিয়াছিল তাপসী—তা কি করবো বলো নানি? সকলের কি বর জোটে? আমার অদৃষ্টে বরের বদলে শাপ।

হেমপ্রভা কপালে ঘা মারিয়া বলিয়াছিলেন—এ কি সর্বনাশ। বুদ্ধি তোর মাথায় খেলছে তাপস? ভগবান নিজে হাতে করে এত বড় সৌভাগ্য বয়ে এনে দিচ্ছেন, তুই এতটুকু ছুতোয় অবহেলা করে ফেলে দিবি সে সৌভাগ্য! অভিমানটাই এত বড় হলো!

—অভিমান কিসের? শুধুই মান, নানি। মা বসুমতী যে আজকাল বুড়ো হয়ে কালা হয়ে গেছেন, ডেকে মরে গেলেও তো বেচারা মেয়েদের মান-সম্ভ্রম বাঁচাতে দ্বিধা হয়ে কোল দেবেন না। তা নইলে তো পরীক্ষার জ্বালায় পাতাল প্রবেশ করেই বাঁচতাম।

অগত্যাই রাগ করিয়া উঠিয়া গিয়াছেন হেমপ্রভা। ওদিকে রাগ জানাইতে জলস্পর্শ না করিয়াই চলিয়া গিয়াছে অমিতাভ। আর—আর নাকি ম্লান হাসি হাসিয়া বিদায় লইয়াছে বুলু।

তাপসী রহিয়া গিয়াছে একা।

তাপসীকে যেন একযোগে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে সকলে।

তবে কি তাপসীর ভুল? প্রচণ্ড যে দুইটা সমস্যার জট তাপসীর জীবনকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিল, এত সহজে সে জট খুলিয়া যাওয়ায় ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত ছিল তার? সকল দ্বন্দ্বের অবসানে কাম্য প্রিয়তমকে লাভ করিয়া কৃতার্থচিত্তে দশের একজন হইয়া বেড়াইতে পারিলেই স্বাভাবিক হইত?

না, তা হয় না।

সুখের বদলে সম্মান বিকাইয়া দেওয়া যায় না। সুখ বিদায় হোক—সম্মান থাক জীবনে।

হেমপ্রভা আবার কাশী ফিরিয়া যাইবার গোছ-গাছ করিতেছেন।

মিথ্যা আর এখানে বসিয়া থাকিয়া লাভ কি। উঁচু মাথাটা তো হেঁট হইয়াই ছিল, তবু কি বিধাতার আশা মেটে নাই? মাটির সঙ্গে মিশাইয়া ছাড়িলেন? যাক, আর কেন?… রাজলক্ষীর সঙ্গে অনেক পরামর্শ করিয়া অনেক আশা লইয়া দেশে আসিয়াছিলেন, সব আশায় ছাই দিয়াছে তাপসী নিজে।

এতদিনে হুঁশ হইতেছে হেমপ্রভার, তাপসী চিত্রলেখারই মেয়ে! দেখিতে যতই নিরীহ হোক, জিদে মার চাইতে একবিন্দুও খাটো নয়। যাক—হেমপ্রভার বিধিলিপি এই। তাপসীর 'ভাল' করিবার ভাগ্য তাঁহার নয়।

রাজলক্ষীকে মুখ দেখাইবার মুখ আর নাই। দুই-দুইবার শুভদিন দেখিয়া গাড়ী পাঠাইয়াছিল রাজলক্ষী বৌ লইয়া যাইতে—শূন্য ফিরিয়া গিয়াছে সে গাড়ী।

তাপসীর নাকি স্বামীর ঘরে 'বৌ' হইয়া ঘর করিবার স্পৃহা আর নাই। কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া চাকরি করিবে সে।

আরও থাকিবেন হেমপ্রভা?

গলায় দড়ি দিবার বয়স নাই, তাই বাঁচিয়া থাকা।

যাত্রার আগের দিন একবার…হয়তো শেষবারের মতই বল্লভজীর মন্দিরে যাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন হেমপ্রভা। গাড়ীর কথা বলা আছে, মালী ফুল ও মালা লইয়া আসিলেই হয়।

বেলা হইয়া যাইতেছে বলিয়া ঘরবার করিতেছেন, হঠাৎ চাহিয়া দেখেন তাপসী আসিতেছে ছোট একটা ডালায় একডালা ফুল লইয়া অর্থাৎ ভোর হইতে বাগানেই ছিল সে।

এ কয়দিন আর ঠাকুমা-নাতনীতে খুব বেশী কথাবার্তা ছিল না, দুজনেই চুপচাপ গম্ভীর।— আগে হইলে হয়তো তাপসী কলহাস্যে ছুটিয়া আসিয়া বাগানের ফুলসম্ভারের উচ্ছ্বসিত বর্ণনায় মুখর হইয়া উঠিত, নয়তো হেমপ্রভাই 'ফুলরাণী'র সঙ্গে তুলনা করিয়া মুখর হইয়া উঠিতেন নাতনীর রূপের প্রশংসায়।

আজকের মনের অবস্থা অন্য।

তাই হেমপ্রভা শুধু চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখেন, আর তাপসী ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া ম্লানহাস্যে বলে—চলো নানি, তোমার সঙ্গে গিয়ে একটু পুণ্য অর্জন করে আসি।

—তুমি কোথায় যাবে?

তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করেন হেমপ্রভা।

—সেই যে কোথায় তোমার সেই 'রাইবল্লভ' না 'রাধাবল্লভ' আছেন, দেখেই আসি একবার জন্মের শোধ।

—বালাই ষাঠ্।

নিজের অজ্ঞাতসারেই অতি ব্যবহৃত এই কল্যাণ-মন্ত্রটুকু উচ্চারণ করিয়া হেমপ্রভা বলেন— আর তাঁর ওপর দয়া কেন? তাঁর তল্লাট থেকে চলেই তো যাচ্ছো মুখ ফিরিয়ে।

—কে যে কার দিক থেকে মুখ ফেরায়, কে যে কখন বিমুখ হয় সব কি আমরা বুঝতে পারি নানি? চলো না দেখেই আসি তোমাদের দয়াল প্রভুকে।

হেমপ্রভা ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলেন—ব্যঙ্গ করে দেবদর্শনে যেতে নেই বাছা, তোমার আর গিয়ে কাজ নেই।

—না নানি, ঘুরেই আসি। ব্যঙ্গ তোমার প্রভুকে করছি না, করছি তাঁর নামটাকে। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন আর কাকে বলে।

—নিজের চোখ কানা হলেই তাঁকে কানা দেখে মানুষ!—হেমপ্রভা রাগিয়া ওঠেন—দয়ার সাগর তিনি, যা দয়া করেছিলেন তোমায়, হিতাহিত জ্ঞানের লেশমাত্র থাকলেও এমন করে সে দয়া অবহেলা করতে না। তাই বলছি—ভক্তি-বিশ্বাস যখন নেই তখন আর কেন যাওয়া?

—তা লোকে তো সং-এর পুতুল দেখতেও যায় বাপু, তাই না হয়—, খুব চটছো বুঝি?

—হুঁ:, আমার আবার চটাচটি। তাও তোমাদের কথায়। যাক্‌গে, যাবে বলছো চলো। তা এই মুহূর্তেই যাবে, না একখানা পরিষ্কার কাপড়জামা পরবে ছেদ্দা করে?

—পরিষ্কার কাপড়! রোসো দেখি, স্টক তো তেমন ভারী নয়!

বস্তুত: ঝোঁকের মাথায় একবস্ত্রে কলিকাতা ছাড়ার পর, কাশীর বাজারে কেনা খানকতক সাধারণ শাড়ীই আপাততঃ ভরসা তাপসীর।

হেমপ্রভার প্রাণটা 'হায় হায়' করিয়া ওঠে—এ যেন "লক্ষ্মী হয়ে ভিক্ষে মাগা!" রাজার ঐশ্বর্য পায়ে ঠেলিয়া এখন কিনা—উঃ। আধুনিক মেয়েদের চরণে শতকোটি প্রণাম। সর্বস্ব হারাইয়া স্বচ্ছন্দে হাসিয়া বেড়ানো কেবল আজকালকার এই সব বুনো ঘোড়ার মত মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব!

বুলুর মায়ের দরুন এক বাক্স গহনা আর সোনা-ঝলসানো জমকালো একখানা বেনারসী শাড়ী পাঠাইয়া দিয়া বৌ লইতে পাঠাইয়াছিলেন রাজলক্ষ্মী, গাড়ীর সঙ্গে সেগুলাও ফেরত দিতে হইয়াছে। নূতন করিয়া সেই শোক উথলাইয়া ওঠে হেমপ্রভার।

কিন্তু এ কি!

সব শোক উড়াইয়া চোখ জুড়াইয়া দিলে যে তাপসী। এতকাল আগের শাড়ীখানা কোথায় পাইল সে। টুকটুকে লাল জর্জেটের উপর রূপালি জরির চওড়া ভারী পাড় বসানো সেই শাড়ী! যে শাড়ী পরা লক্ষ্মীরূপ দেখিয়া বুড়ো কান্তি মুখুজ্জের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। কে জানে কোথায় কোন্ দেরাজের কোণে পড়িয়াছিল! মূল্যবান জিনিস, এই দীর্ঘ দিনের অব্যবহারেও ম্লান হয় নাই। প্রায় তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি কোমল আছে।

হেমপ্রভার অনেক ভাবে-ভরা দৃষ্টির সামনে একটু কুণ্ঠিত না হইয়া পারে না তাপসী। ঝোঁকের মাথায় পরিয়া ফেলিয়া বেজায় লজ্জা করিতেছে যে।

কাপড় কোথায় পেলি রে?

কথা কহার উপলক্ষ পাইয়া বাঁচে তাপসী। তাড়াতাড়ি বলে—এইখানেই ছিল গো নানি, তোমার সেই প্রকাণ্ড সিন্দুকটার মধ্যে। কত সব শাল র‍্যাপার রয়েছে পুরনো পুরনো—দেখছিলাম সেদিন। এ শাড়ীখানা কি করে ঢুকে গেছে তার সঙ্গে কে জানে! তবে দুঃখের বিষয়, পোকায় কেটে দিয়েছে অনেক জায়গায়।

—আহা রে! তাও বলি—কাটবে না তো কি করবে! এতদিন যে রেখেছে এই ঢের! কিন্তু এ শাড়ী তোমরা পরলে তো মানায় না বাছা। তোমরা অপিসে যাবে, সাইকেল চড়বে, ট্রামগাড়ীর জন্য ছুটোছুটি করবে, তোমাদের ওই সব খাকির কোট-পাজামা পরাই উচিত। এ তো বিয়ের কনের শাড়ী!

—ধ্যেৎ! শাড়ীতে যেন লেখা থাকে!···চলো বাপু, ফুলগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে।

—ফুল তো সবই শুকোলো তোমার, দেবতার চরণে আর দিলে কই? নারায়ণ! নারায়ণ!

গাড়ী আসিয়া ডাকাডাকি করিতেছে।

আগামী কাল ফুলদোল।

মন্দিরের সাজসজ্জায়, বিগ্রহের কেশবাসে আসন্ন উৎসবের সমারোহ। ধূপধুনা ও অজস্র সুগন্ধিপুষ্পের সম্মিলিত সুরভিতে বৈশাখী প্রভাতের চঞ্চল হাওয়া যেন কম্পিত মন্থর।

নিজেদের হাতের ফুলের ডালা বিগ্রহের সামনে নামাইয়া দিয়া ঠাকুমা-নাতনী সামনের চাতালের একধারে বসিয়া পড়েন। বৈশাখের শুচিস্নিগ্ধ নির্মল সকালের মতই শুভ্র নির্মল মার্বেল পাথরের মেঝে—বসিতে লোভ হয়।

উৎসুক দৃষ্টি মেলিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখে তাপসী—বহুদিন আগে আর একবার যে আসিয়াছিল সেও এমনি বৈশাখী পূর্ণিমার দিন ছিল না? কি অদ্ভুত যোগাযোগ! সেদিনের সেই সুরভিবাহিত এলোমেলো বাতাস কি এতদিন লুকাইয়া ছিল মন্দিরের খিলানে খিলানে, কার্নিশের খাঁজে খাঁজে? তাপসীর সাড়া পাইয়া আজ আবার বাহির হইয়া পড়িয়াছে?

সুগন্ধের মত বিস্মৃত স্মৃতির বাহক এমন আর কে আছে? কালের প্রাচীর অতিক্রম করিয়া মুহূর্তের মধ্যে অতীতকে ফিরাইয়া আনিবার এমন ক্ষমতা আর কার আছে?

তাই বিস্মৃত দিনের সেই সোনালী সকালটি যেন সহসা এই ফুল চন্দন ধূপধুনার সৌরভ-জড়িত উত্তরীয় গায়ে দিয়া একমুখ হাসি লইয়া তাপসীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

—আচ্ছা নানি, সেই ঘোড়াটা আছে এখনো? রথের কাঠের ঘোড়াটা?

অকস্মাৎ এ-হেন অভিনব প্রশ্নে চমকিত হেমপ্রভা হাতের জপের মালাটা স্থগিত রাখিয়া বলেন—কি আছে? রথের ঘোড়া?

—হ্যাঁ গো, সেই যে বাবলুবাবুর যা দেখে বেজায় স্ফূর্তি লেগেছিল!

—আ কপাল! এত দেশ থাকতে সেই কাঠের ঘোড়াটার চিন্তা? আছে অবিশ্যিই, যাবে আর কোথায়?

—তা চল না, ঘুরে ঘুরে সব দেখি।

হেমপ্রভা অসমাপ্ত মালাগাছটি আবার কপালে ঠেকাইয়া বলেন—দেখবার আর কি আছে? এই যা দেখছি জগতের সারবস্তু। তোর ইচ্ছে হয়, একটু ঘুরেফিরে দেখে আয়।… এখুনি হয়তো জয়কেষ্ট গাড়ী এনে ডাকাডাকি করবে।

তাপসী ইতস্তত করিয়া বলে—কেউ কিছু বলবে না তো?

—ওমা বলবে আবার কি। এই তো এত লোক আসছে, যাচ্ছে, বসছে, পূজো দিচ্ছে, মাল্লা দিচ্ছে—কে কাকে কি বলছে?

—আমি একলা যাবো? তুমি যাবে না নানি?

—না ভাই, আর ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছেও নেই, সামর্থ্যও নেই। তুই একপাক দেখে আয় না। পিছন দিকে মস্ত নাকি বাগান করেছে!

তাপসী কুণ্ঠিতভাবে এদিক ওদিক চাহিয়া প্রাঙ্গণে নামে।

কেন কে জানে—রংচটা রথ, কাঠের ঘোড়া ও মাটির সঙা-পুতুল জড়ো করিয়া রাখা মন্দিরের সেই অবহেলিত দিকটা দেখিবার জন্য কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

মন্দিরের পিছনে এদিকটা একেবারে নির্জন।

মন্দিরে আসিয়া ভাঙা পুতুল দেখিবার শখ আবার কার হয় তাপসীর মত!…টানা লম্বা একটা দালানের ভিতর গাদাগাদি করিয়া নূতন পুরনো ভাঙা আস্ত অনেক পুতুল। প্রমাণ মানুষের আকৃতিবিশিষ্ট এই পুতুলগুলি দেখিতে মজা লাগে বেশ। ছেলেমানুষের মত কৌতূহলী দৃষ্টি লইয়া দেখিতে থাকে তাপসী।

এত পুতুল সেবারে ছিল না তো কই! বৎসরে বৎসরে নূতন করিয়া যোগ হইয়াছে বোধ হয়।

দালানের বাহিরে খোলা মাঠে কাত হইয়া পড়িয়া আছে ঘোড়াটা।

কি আশ্চর্য!

এদের কি মায়া মমতা বলিয়া কিছুই নাই?

'এদের' ভাবিতে অকস্মাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া মুহূর্তে লজ্জায় লাল হইয়া ওঠে তাপসী।
…মন্দিরটা কান্তি মুখুজ্জের না? বুলুর দাদুর?…আসিবার আগে অত খেয়াল হয় নাই তো!

হেমপ্রভা আসিতেছেন শুনিয়া মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ওদের কেউ যদি এখানে উপস্থিত থাকে?

কেউ আর কে—রাজলক্ষ্মী!

দেখা হইয়া গেলে লজ্জায় মারা যাইবে কিন্তু তাপসী।

চোখের আড়ালে গাড়ী ফেরত দেওয়া যত সহজ, চোখোচোখি হইয়া প্রত্যাখ্যান তত সহজ কি ?...থাক্ বাবা, আর ভাঙা পুতুল দেখিয়া কাজ নাই। নিজের ভাঙা ভাগ্য লইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়াই ভাল।

কিন্তু এ কী!

ফিরিবার পথ কোথায় ? পথ আগলাইয়া যে দাঁড়াইয়া আছে, মুখ ফিরাইতেই চোখো-চোখি হইয়া গেল তাহার সঙ্গে।

মিস্টার মুখার্জি বলিয়া চিনিবার উপায় নাই।...নিতান্তই বুলু।

চওড়া জরির আঁচলাদার সাদা বেনারসীর জোড় পরা সুগঠিত সুঠাম দেহ—রক্ত কমলের মত নগ্ন দুখানি পা—অবিন্যস্ত চুলের নীচে মসৃণ ললাটে সাদা চন্দনের একটি টিপ।

যুগান্তর পূর্বের—সেই কিশোর দেবতার মূর্তি ধরিয়া তাপসীকে কেউ ছলনা করিতে আসিল নাকি ?

কি এক অজানা আশঙ্কায় বুক থর থর করিতেছে যে।

হায়! হায়! তাপসী কেন আসিয়াছিল এখানে? এখন কেমন করিয়া পালাইবে সে? ওর কাছ ঘেঁষিয়া যাওয়া ছাড়া তো আর উপায় নাই। তবে?

মাটির ওই পুতুলগুলোর মত শুধু নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে নিষ্পলক দৃষ্টিতে?

কিন্তু তাপসী নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেই কি সকল সমস্যাব সমাধান হইয়া যাইবে?

তাপসীর সম্মুখবর্তী এই ছদ্মবেশী দেবমূর্তি তো মন্দিরে অবস্থিত চির-কিশোর মূর্তির মত স্থাণু নয়! সে যে চঞ্চল ব্যাকুল, নিতান্তই অস্থির।

তবে?

তবে কেমন করিয়া নিজেকে সামলাইবে সে?—কেমন করিয়া কঠিন হইয়া থাকিবে মানসম্ভ্রমের দুর্বহ ভার বহিয়া?

হায় ভগবান! সমস্ত মানসম্ভ্রম জলাঞ্জলি দিয়া এ কি করিয়া বসিল তাপসী? নিতান্ত অসহায়ের মত নিজেকে কোথায় সঁপিয়া দিল বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রতিবাদে?

কোথায় লুকানো ছিল তাপসীর পরাজয়ের শৃঙ্খল!

খসিয়া পড়া খস্‌খসে বেনারসী চাদরের আবরণমুক্ত স্পন্দিত বক্ষের স্পর্শের ভিতর? আবেগতপ্ত বলিষ্ঠ বাহুবেষ্টনের মধ্যে?

পরাজয়!

পরাজয়ে এত সুখ? এমন নিশ্চিন্ত শান্তি?—বিজয়ীর নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দেওয়ায় এত তৃপ্তি?

একথা তো আগে কেউ বলিয়া দেয় নাই তাপসীকে!

আবাল্যসঞ্চিত ব্যর্থবেদনার জ্বালা, সদ্য-প্রজ্বলিত অগ্নিপরীক্ষার জ্বালা, নিজেকে বশে রাখিবার অক্ষমতার জ্বালা—সব কিছুই যে জুড়াইয়া গেল।

এই অনাস্বাদিত শান্তি কি অবাস্তব? এই অজানিত অনুভূতি কি স্বপ্ন? এই নির্জন পরিবেশ, এই পুষ্পগন্ধবাহী চঞ্চল বাতাস, এই চির-আকাঙ্ক্ষিত উষ্ণ স্পর্শ—সমস্তই কি কল্পনা?

সত্য হইলে কি এত অনায়াসে হার মানিতে পারিত তাপসী?

না-না, মুহূর্তের বিহ্বলতাকে প্রশ্রয় দিবে না সে।

পরীক্ষকের কাছে হার মানা যায় না।

—ছেড়ে দিন আমায়!

—ছেড়ে? না, না, আর ছেড়ে দেবো না তোমায়। কোনোদিন না, কখনো না।

তবু ছাড়াইয়া লয় তাপসী। মুক্ত করিয়া লয় নিজেকে পরম আকাঙ্ক্ষিত সেই বাহুবন্ধন হইতে। প্রায় কাঁদো-কাঁদো হইয়া বলে—কেন আপনি অপমান করবেন আমায়?

—ছি তাপসী! ও কথা বলতে নেই?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিরদিন আপনি অপমান করেছেন আমায়। এততেও আশ মেটে নি? আবার চান আমি আপনার কাছেই—

আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে তাপসীর।

কিরীটীর কণ্ঠস্বরও গভীর আবেগপূর্ণ—হ্যাঁ তাপসী, 'আবার' নয়- বরাবর চাই, চিরদিনই চাই। দিনেরাত্রে অহরহ চেয়েছি তুমি আমার কাছে এসে ধন্য করবে আমায়।...সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষার বশে—ছেলেবেলায় কলেজ কামাই করে ঘুরে বেড়িয়েছি তোমার স্কুলের কাছে, কলেজের রাস্তায়।...সন্ধ্যার অন্ধকারে তোমাদের বাড়ীর কাছের পার্কের বেঞ্চিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বোকার মত বসে থেকেছি দোতলার ঘরে জানালার আলোর দিকে তাকিয়ে। কোন্ ঘরে তুমি থাকো, কোন্‌খানে তুমি বসো কিছুই জানতাম না—তবু বসে থাকা চাই। সাত বছর ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি কত দেশ-বিদেশে, তবু সর্বদা মনে পড়েছে—কি এক অদৃশ্যসূত্রে বাঁধা আছি তোমার সঙ্গে!...ফিরে এসে তাই লোভ সামলাতে পারলাম না, অথচ পারলাম না নিজের পরিচয় দিয়ে সোজাসুজি তোমাকে প্রার্থনা করতে। সাহস হলো না। যে বন্ধন আমার কাছে সত্য, তা তোমার কাছে হয়তো নিতান্তই মিথ্যে, এই ছিল আশঙ্কা!

—আর—আর কি যন্ত্রণা আমি পেয়েছি, অহরহ কি যুদ্ধ করতে হয়েছে, তা কি বুঝতে পারেন নি?

—হয়তো পেরেছি, হয়তো পারি নি, বুদ্ধির বড়াই করতে চাই না তাপসী। তবু প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা করেছি ছদ্মবেশ মোচন করতে, সহজ হয়ে নিজেকে ধরা দিতে, কিন্তু

পারি নি।...আমার এই অক্ষমতাই তোমার এই যন্ত্রণার মূল।...কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, যেদিন সমস্ত শক্তি একত্রিত করে প্রতিজ্ঞা নিয়ে গেলাম, ঠিক সেদিনই তুমি অভিমানে ঘর ছাড়লে।...চিঠির ভেতর দিয়ে অপরাধ স্বীকার করে চাইলাম তোমার ক্ষমা, নানির কাছে শুনলাম তুমি সে চিঠি পড়লেই না, ছিঁড়ে ফেললে!

—কি লিখেছিলেন তাতে?—হাল্‌কাভাবে প্রশ্ন করে তাপসী। কি লিখিয়াছিল সে সংবাদ তো নানির কাছে পাইয়াছে।

—কি আর, আমার দুষ্কৃতির কাহিনী! অবশেষে পরিচয় দিলাম অভীর কাছে, সে বেচারা অনুতাপানলে দগ্ধ হতে লাগলো।

—আর মা?

—মা?—মৃদু হাসে কিরীটী—মা এত বেশী গুম্ হয়ে গেলেন শুনে, যে সেই অবধি আর কথাই কইলেন না আমার সঙ্গে। বোধ হয় ভাবলেন আমি তাঁকে ঠকিয়েছি।...কিন্তু আশ্চর্য! চিনতে যদিও না পেরেছিলে, আমার নামটাও কি সত্যি জানতে না তুমি? সেই অদ্ভুত রাত্রে মন্ত্র-উচ্চারণের সঙ্গেও কি কানে যায় নি একবার?

তাপসী মাথা নাড়ে। মুহূর্তে ছবির মত ভাসিয়া ওঠে সেই অদ্ভুত রাত্রের দৃশ্য তাপসীর দৃষ্টির সামনে।

হায়! তাপসীর কি জ্ঞান চৈতন্য অনুভূতি কিছুই ছিল সেদিন?

—তাপসী! আজকের এই ঘটনাকে কি দেবতার দান বলে মনে হয় না তোমার? আমার তো আজ এদিকে আসবার কোনো ঠিকই ছিল না, সামান্য আগেও না। নিতান্তই পিসীমার উপরোধে পড়ে দেখতে এলাম পুতুলগুলোর অবস্থা—'পোটো' লাগিয়ে সংস্কার করতে হবে নাকি ওগুলো।...কিন্তু আমি কি ভেবেছিলাম—স্বপ্নেও ভেবেছিলাম—মাটির পুতুলের মধ্যে দেখা মিলবে সোনার পুতুলের! এই বল্লভজীর মন্দিরেই প্রথম দেখেছিলাম তোমায়, উনিই হয়তো বল্লভজীই ষড়যন্ত্র করে দুইজনকেই টেনে আনলেন তাঁর এলাকায়। এ সৌভাগ্যকে অবহেলা কোরো না তাপসী।

কিন্তু তাপসী কেমন করিয়া বলিবে—'না অবহেলা করিব না।'

মানসম্ভ্রম চুলায় যাক, কিন্তু লজ্জা? দুর্নিবার লজ্জায় যে কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে তাহার। বলিতে পারিলে তো অনেক কথাই বলার ছিল। তাপসীর জীবনেই কি নাই ব্যর্থ সন্ধানের হাস্যকর ইতিহাস? পথে পথে, কলেজে, হোস্টেলে, আরো কত সম্ভব-অসম্ভব স্থানে? হায়! তেমন করিয়া গুছাইয়া বলিবার শক্তি তাহার কোথায়?

—উত্তর দেবে না? চুপ করেই থাকবে? বলো কি করবে তুমি?

দ্বিধা কাটাইয়া সহসা মুখ তুলিয়া যে উত্তর দেয় তাপসী, সেটা কেবলমাত্র কিরীটীকেই আহত করে না, যেন তাপসীর কানকেও আঘাত করে। এমন করিয়া তো বলিতে চাহে নাই সে! কিন্তু বলিয়াছে—

— আমাকে আপনারা সকলেই ছেড়ে দিন দয়া করে, যেমন করে হোক একটা কাজ খুঁজে নেবো আমি।

—কাজ! কাজ করবে তুমি? কি কাজ? চাকরি?

—ক্ষতি কি?

—লাভ-ক্ষতির হিসেব সকলের সমান নয় তাপসী, কিন্তু থাক্, অনুরোধ-উপরোধের চাপে আর বিব্রত করবো না তোমাকে। আমার জন্যে তোমার মন প্রস্তুত হয়ে নেই, এই কথাটাই বুঝতে একটু দেরি হয়ে গেলো বলে অনেক জ্বালাতন সইতে হলো তোমায়। যাক, ক্ষমা চাইছি। জানোই তো পৃথিবীতে নির্বোধ লোকের সংখ্যাই বেশী।

অজন্তার ছাঁদে গড়া রেখায়িত অধরে ম্লান একটু হাসি ফুটিয়া ওঠে।

—আচ্ছা চলি। আজকের এই অপ্রত্যাশিত দেখাটা মনে থাকবে, কি বলো? আমি অবশ্য আমার কথাই বলছি।...নানির সঙ্গে এসেছো বোধ হয়? অনেকক্ষণ আছো, খুঁজছেন হয়তো।...কবে ফিরবে কলকাতায়?

—কাল।

অস্ফুট একটা শব্দ হইতে আন্দাজে ধরিয়া লইতে হয় উত্তরটা।

—বেশী লাভ করতে গিয়ে সবই হারাতে হলো, তাই না তাপসী? এর পর হঠাৎ কোনোদিন দেখা করতে গেলেও হয়তো ধৃষ্টতা হবে, কি বলো?

মাটিতে লুটাইয়া পড়া উত্তরীয়ের আঁচলটা কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া যায় কিরীটী।

অবাকনেত্রে চাহিয়া থাকে তাপসী।...চলিয়া গেল? তাপসীর জীবনে আর কোনোদিন দেখা মিলিবে না ওর? ধূ ধূ মরুভূমির মত শুষ্ক শ্রীহীন জীবন লইয়া করিবে কি তাপসী? না না, ছুটিয়া গিয়া ফিরাইয়া আনিবে সে, কিন্তু কেমন করিয়া ফিরাইবে? ছুটিয়া গিয়া পায়ে পড়িবে? নিতান্ত নির্লজ্জের মত দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া আশ্রয় লইবে স্বর্গের দুয়ারে? সকল জ্বালা জুড়াইয়া দেওয়া সেই শান্তির স্বর্গে? ক্ষণপূর্বে মুহূর্তের জন্য যে স্বর্গের আস্বাদ পাইয়া আপনাকে হারাইতে বসিয়াছিল তাপসী!

না—কিছুই পারে না তাপসী, শুধু দাঁড়াইয়া থাকিবার মত ক্ষমতার অভাবেই দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়ে ধূলার উপর।

কতক্ষণ বসিয়াছিল তাপসী?

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল নাকি! চৈতন্য ছিল তো? সময়ের জ্ঞান হারাইয়া গিয়াছে কেন?...পিঠের উপর আলগোছ একটু স্পর্শ কার হাতের!

—তাপসী..চলো, তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

কি মমতা-স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর!

—তোমাকে এখানে একা ফেলে চলে যেতে পারলাম না তাপসী, আবার এলাম নির্লজ্জের মত। চলো, শুধু তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার অনুমতিটুকু চাইছি।

কিন্তু অনুমতি দেবে কে? ভিতরে যাহার ভূমিকম্পের আলোড়ন চলিতেছে?…শুধু কণ্ঠের স্বরে এত মমতা ভরা থাকিতে পারে? যে মেয়ে আবাল্য হাসির আড়ালে সব কিছু গোপন করিয়া আসিয়াছে সে-ই কিনা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল কণ্ঠস্বরের সামান্য একটু স্নেহস্পর্শে!

হায় হায়! লজ্জা রাখিবার স্থান রহিল কই!

লজ্জা-সম্ভ্রম সবই যে গেল!

অশ্রুকণিকাকে গোপন করা চলে, কিন্তু অশ্রুসাগরকে?

—তাপসী ওঠো।…তাপসী চলো লক্ষ্মীটি। কত লোক ঘোরাঘুরি করছে, হঠাৎ কেউ এদিকে এসে পড়লে, হয়তো কি না কি ভাববে!

—কেন ভাববে? কিছু ভাববে না কেউ। যাবো না আমি।

এতক্ষণে কথা বাহির হয় তাপসীর মুখে।

—যাবে না?—কিরীটী মৃদু হাসে—আমার পক্ষে তো শাপে বর! তাহলে এইভাবে বসে থাকা যাক, কি বলো?—বলিয়া নিজেও বেনারসীর জোড়সমেত ধূলার উপর বসিয়া পড়ে, কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখিয়া।

—তাপসী, সত্যই যদি এমনি বসে থাকা যেতো চিরদিন, চিরকাল?

ভাঙা মাটির পুতুলগুলার পানে নির্নিমেষে দৃষ্টি মেলিয়া কি দেখিতেছিল তাপসী কে জানে, বুলুর কথায় মুখ ফিরাইয়া এক নিমেষ চোখ তুলিয়া চায়।

আবার কিছুক্ষণ কাটে।

এক সময় সামান্য একটু হাসিয়া বুলু বলে—সত্যিই আমি বড় নির্লজ্জ তাপসী, তুমি আমাকে সহ্য করতে পারছো না, তবু জবরদস্তি করে বসে আছি কাছে। কিছুতেই যেন উঠে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আচ্ছা মাঝখানের এই বছরগুলো কিছুতেই মুছে ফেলা যায় না? সেই যেদিন—নতুন দৃষ্টি নিয়ে প্রথম তাকিয়েছিলাম পৃথিবীর দিকে—যেদিন জীবনের কোনে জটিলতা ছিল না, কোনো সমস্যা ছিল না—যখন মান-অপমানের প্রশ্ন নিয়ে সব কিছুকে বিচার করতে বসতে হতো না!

হায়! তাপসী কেন কিছুই বলিতে পারে না!

সমস্ত ভাল ভাল কথাগুলা বুলুই বলিয়া লইবে? সে কথা কি তাপসীও ভাবিতেছে না?

তবু নিজেকে ধরা দিবার একান্ত বাসনাকে গলা টিপিয়া মারিয়া, নিজের মনকে যাচাই করিতে হইতেছে তাহাকে—এ ব্যক্তি যদি কিরীটী না হইয়া কেবলমাত্র 'বুলু' হইত, কি করিত সে? 'স্বামী' বলিয়া বিনা দ্বিধায় সহজ সমর্পণের মন্ত্র পড়িতে পারিত?

কিন্তু এ কথাও কি বলা যায় না—কিরীটীকে দেখিবামাত্র সমস্ত প্রাণ যে তাহার কাছে আছড়াইয়া পড়িতে চাহিত, সে 'বুলু' বলিয়াই। কই আর কবে কাহার উপর এ আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে তাপসী?

অথচ এ-হেন অলৌকিক কথা কে বিশ্বাস করিবে? বিশ্বাস করিবার মত কথা কি?

বুলু বোধ করি কোনো একটু উত্তরের আশায় মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলে—আমি তোমাকে বুঝতে পারছি তাপসী, মনকে প্রস্তুত করে নেবার অবসর পাও নি তুমি। অপেক্ষা করে থাকবো সেই আশায়। কিন্তু চলো তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি। নানি হয়তো খুঁজবেন, নাটমন্দিরে বসে রয়েছেন।

নানি!

ও তাই তো! তাপসী তো এখানে হঠাৎ আকাশ হইতে আসিয়া পড়ে নাই। আশ্চর্য! কিছুই মনে ছিল না। বুলু উঠিতে বলিলে কি হইবে, তাপসীর কি উঠিবার ক্ষমতা আছে?

উঠিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে এই স্বর্গসুখ চিরদিনের মত ফুরাইয়া যাইবে।

সত্যই যদি এমনই বসিয়া থাকা যাইত! অনন্ত দিন—অনন্ত রাত্রি!

বুলু আবার হঠাৎ একটু হাসিয়া উঠিয়া বলে—হঠাৎ যদি কেউ দেখে ফেলে কি ভাববে বলো দেখি? পারলে না বলতে? ভাববে—সন্ত বিয়ের বর-কনে। তোমার শাড়ীটা ঠিক নূতন কনের মত—আর আমি—আমি তো বন্ধুভগ্নীর বেগার খাটতে বরসজ্জা করেই বসে আছি! লোকে হয়তো ভাববে দুজনে বাসর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে একটু নির্জন অবসরের আশায়—তাই না? মনে হচ্ছে যেন ঠিক অবিকল এই রকম শাড়ীতেই প্রথম দেখেছিলাম তোমায়। ওই কলকাতার বাড়ীতে তো কোনোদিন এমন অপূর্ব মূর্তি নিয়ে দেখা দাও নি তাপসী! এ যেন এখানকার তুমি!

এত কথায় উত্তরে তাপসী শুধু বলে—সেই শাড়ীটাই।

—সত্যি? আশ্চর্য তো! এখনও রয়েছে? এতদিন পরে আবার হঠাৎ এখানেই আজ তোমার পরতে ইচ্ছা হলো! সবটাই আশ্চর্য!

এবারে তাপসী মুখ তুলিয়া স্পষ্ট করিয়া তাকায়। ম্লান হাসির সঙ্গে বলে—আমার জীবনের তো সবটাই আশ্চর্য! চলুন।·· কবে ফিরবেন কলকাতায়?

—ফেরবার দিনের প্রোগ্রাম যা কিছু ছিল, সবই তো বাতিল হয়ে গেলো। পরে ভেবেছিলাম আজই চলে যাবো, তাও ইচ্ছে হচ্ছে না। এই দেশটায় তুমি আছো ভাবতেও ভালো লাগে। একটু থাকিয়া সামান্য হাসিয়া বলে—ফেরার সময়কার ছবিটা সম্বন্ধে কত কল্পনাই করেছিলাম বোকার মত!

সহসা আবার একটা আকস্মিক ভূমিকম্পের প্রবল আলোড়নে যত্ন-গঠিত অভিমানের প্রাসাদ বিদীর্ণ হইয়া গেলো নাকি? নাকি স্বর্গচ্যুত হইবার আশঙ্কায় এতক্ষণে হুঁশ হইল

তাপসীর ?' তাই পাতাল-প্রবেশের পরিবর্তে স্বর্গকে দুই হাতে আঁকড়াইয়া আগলাইতে চায় ?

—কেন তবে সে ছবি ছিঁড়ে ফেলবে ? কেড়ে নিয়ে যেতে পারো না ? পারো না জোর করতে ? সব দায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে ফিরে যাবে ?

—তাপসী ! তাপসী !

অজন্তার শিল্পছাঁদে গঠিত ওষ্ঠাধরযুগল নামিয়া আসিয়াছে, অর্দ্ধচন্দ্রের ছাঁদে গড়া শুভ্র একখানি ললাটের উপর।

—তাপসী, এ সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারবো তো ? এ আমার কল্পনার ছলনা নয়তো ?

আকাঙ্ক্ষিত, নিতান্ত পীড়নে নিপীড়িত হইয়া অশ্রু-ছলছল চোখে হাসিয়া ফেলে তাপসী। হাসিয়া বলে—উঃ, অত বেশী জোর করতে বলি নি তা বলে।

—ইস্ ! খুব লেগেছে ? আমি একটা বুনো ! হঠাৎ সৌভাগ্যের আশায় দিশেহারা হয়ে ওজন রাখতে পারি নি।...আচ্ছা ছেড়ে দিলাম—দেখি তো—তাকাও না একটু, শুভদৃষ্টির সময় তাকিয়ে দেখো নি বলেই না এত বিপত্তি!...কি হলো আবার ? মুখে মেঘ নামছে কেন ?

—না, ভাবছি—ভাবছি—তুমি যদি 'তুমি' না হয়ে কেবলমাত্র 'বুলু' হতে, কি হতো !

কিরীটী গভীর স্বরে বলে—প্রায় এই রকমই হতো তাপসী ! হয়তো 'কেবলমাত্র বুলু' আমার চাইতে একটু কম বেহায়া হতো। কিন্তু আমার ক্যাপাসিটি তো বারেবারেই প্রমাণ হয়ে গেছে, গৌরব যা কিছু বুলুরই। আমার ভাগ্যে বিয়ের ভয়ে বৌ পালিয়ে প্রাণ বাঁচায় ! —সত্যি তাপসী, যেদিন সেই উৎসব-বাড়ী থেকে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে তুমি, সেদিন যে কি অদ্ভুত অবস্থা আমার ! তবু ভেবে ভেবে মনকে ঠিক দিলাম—আমার প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ রীতিমত প্রবল !—তোমার মানসিক দ্বন্দ্বের ছবি চোখ এড়ায় নি।—সে সময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম যে তবু ভাল, ছদ্মবেশের আড়ালেই আছি। শুধু প্রার্থীর পক্ষে প্রত্যাখ্যান বরং সহনীয়, দাবীদারের পক্ষে বেজায় অপমান নয় কি ?...হায় হায়, তখন কি জানি আমার সেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ নয়—দুগ্ধপোষ্য বুলু ! জানলে এইরকম জোর করে ধরে শুনিয়ে ছাড়তাম 'হতভাগা কিরীটীই সেই ভাগ্যবান বুলু' ! আবার—যেদিন হঠাৎ কলকাতার বাড়ীতে পিসীমার চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ গিয়ে জানালে—দেশের বাড়ীতে নানি এসেছে তোমাকে নিয়ে, কি জানি কেন আনন্দে অধীর হয়ে উঠলাম। মনে হলো—তোমাকে পেয়েই গেলাম বুঝিবা। শেষে আবার—কি যে হলো—

তাপসী মৃদু হাসির মাধ্যমে বলে—দুর্লভ বস্তু অত সহজে পাওয়া যায় না !

—ঠিক বলেছো তাপসী, খুব সত্যি। তাই এত কষ্ট, এত আয়োজনের দরকার ছিল। চলো দুজনে গিয়ে প্রণাম করিগে তাঁকে, যিনি অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে এমন নিখুঁত আয়োজনটি সম্ভব করেছেন।

সম্মোসন্ধ সৌভাগ্যে বিভোর তাপসী সচকিত প্রশ্ন করে—কাকে ? কে ?

—কেন, আমাদের বল্লভজী ! পাকা খেলোয়াড় হয়েও হঠাৎ বেজায় একটা ভুল 'চাল' দিয়ে ফেলে ভারী বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। শোধরাতে এক যুগ লেগে গেল বেচারার। মাৎ হতেই বসেছিলেন প্রায়।

কথার মাঝখানে হঠাৎ সচকিত বুলু কাহাকে যেন দেখিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ হাস্যে খানিকটা সরিয়া দাঁড়ায়।

দালানের সারি সারি খিলানের একটা থামের পাশে হেমপ্রভা দাঁড়াইয়া। কখন যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এটা টেরও পায় নাই।

পাইবার কথাও অবশ্য নয়।

বুলু তো সরিয়া দাঁড়াইয়া আর লাজুক মুখে অপ্রতিভ হাসি মাখাইয়া মুখরক্ষা করিল—কিন্তু তাপসী ?

নানির সামনে ধরা পড়িয়া যাওয়ায়, লজ্জায় আরক্তিম মুখখানা লুকাইবার মত জায়গার অভাবেই বোধ করি সরিয়া আসিয়া নানির কাঁধেই মুখটা চাপিয়া ধরে। তেমনি মুখ চাপিয়া বলিয়া ফেলে—আবেগ বিহ্বল অর্থহীন অস্ফুট একটা কথা—নানি, "নানি, কেন তুমি—

হেমপ্রভারও কি কথা বলিবার অবস্থা আছে ?

কিংবা হেমপ্রভা বলিয়াই আছে। তাই কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া প্রায় হাসির সঙ্গে বলেন—'কি আমি' কেন ? কেন আড়ি পাতছি ?

—ধ্যেৎ, যাও।

—হ্যাঁ যাবো। এইবার যাবো। এতদিনে ছুটি দিলেন বিশ্বনাথ, এইবার বড় শান্তি নয়ে তাঁর রাজ্যে ফিরে যাবো। মুখ তোল দিদি,—বুলু, এসো ভাই, কাছে এসো। চোখ ভরে একবার একসঙ্গে দেখি দুজনকে। বৃথা অভিমানে এতদিন তাঁর নামে কত কলঙ্ক দয়ে এসেছি, আজ বুঝলাম এতটাই দরকার ছিল। যে বস্তু সহজে মেলে তার মূল্য বোঝা যায় না। ধরা যায় না খাঁটি কি অখাঁটি।—কি জ্বালা, এ মেয়েটা মুখ তোলে না কেন গো ? াড ব্যথা হয়ে গেল যে আমার ? ঠাকুর-মন্দিরে বসে থেকে থেকে ভেবে বাঁচি না, নাতনী মার গেলো কোথায় ! কাঠের ঘোড়া পক্ষীরাজ হয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেলো নাকি ? অধৈর্য য়ে উঠে এলাম।...নাও, এখন দুজনে মনে মনে যত খুশি গাল দাও বুড়ীকে !

—শেষ-

গ্রন্থ পরিচয়

'প্রেম ও প্রয়োজন'—'প্রেম ও প্রয়োজন' আশাপূর্ণাদেবীর প্রথম উপন্যাস। এটি ১৩৬১ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন 'কমলা পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা'। উপন্যাসখানির দুইটি সংস্করণ হইয়াছিল—মনে হয় প্রকাশকের উদ্যমের অভাবেই আর সংস্করণ হয় নাই। এই উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে বাহির হইবার পূর্বে কোনো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই।

প্রেম ও প্রয়োজন প্রকাশিত হইবার পূর্বে আশাপূর্ণাদেবী বহুকাল যাবৎ ছোটদের এবং বড়দের অজস্র গল্প লিখিয়াছেন কিন্তু বড়দের উপন্যাসে হাত দেন নাই। সাহিত্যিক বিশু মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুরোধে আশাপূর্ণাদেবী এক প্রকাশকের জন্যে এই উপন্যাসটি লিখিয়া দেন। তদবধি উপন্যাস লেখায় মন দেন। এজন্য তিনি শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞ।

মানুষের জীবনে প্রেম আছে, প্রয়োজনও আছে, কিন্তু কোনটা বড়? অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রেমের চাইতে প্রয়োজনই বড়। এইটাই 'প্রেম ও প্রয়োজনে'র প্রতিপাদ্য। এটি কাহাকেও উৎসর্গ করা হয়নি।

'আর এক ঝড়'—'আর এক ঝড়' উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয় ১৩৬৯ সালে। প্রকাশক—অর্চনা পাবলিশার্স, কলিকাতা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে এই উপন্যাসখানি একটি শারদীয়া সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

এ যুগে মানুষের জীবনে সমস্যার অন্ত নেই -তাহার উপর আধুনিক সমাজের দ্রুত বিবর্তনের ফলে সাধারণ মানুষের ঘরে যে সব সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে তাহা যেমন জটিল তেমনি বেদনাদায়ক। 'আর এক ঝড়'এ আশাপূর্ণা দেবী এই রকম এক সমস্যার চিত্রই তুলে ধরেছেন পাঠকদের সামনে। এক মহিলা তাঁর চিররুগ্ন-স্বামীর মৃত্যুর পরে যখন একটি ৪।৫ বছরের শিশুপুত্র নিয়ে অসহায় অবস্থায় বিধবা হন তখন যে-ডাক্তার তাঁর স্বামীকে চিকিৎসা করেছিলেন সেই উদারচেতা ভদ্রলোক সহানুভূতির বশে সেই মহিলাকে বিবাহ করেন, কিন্তু পরে সেই ছোট ছেলেটি বি-পিতার উপর বিরূপতাবশতঃ কি করে তাঁদের দাম্পত্য জীবন ও সুখের সংসার ধ্বংস করে দিয়েছিল তাহারই কাহিনী বিবৃত করেছেন লেখিকা এই গ্রন্থে। এই গ্রন্থ উৎসর্গিকৃত হয়—শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর নামে।

'অগ্নি-পরীক্ষা'—'অগ্নি পরীক্ষা' উপন্যাসখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৯ সালে। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ। গ্রন্থখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং এর ৭।৮টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 'অগ্রদূত' গোষ্ঠির পরিচালনায় এটি প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে এবং এখনও পর্যন্ত মাঝে মাঝে ছবিটি বিশিষ্ট চিত্রগৃহে দেখান হয়।

এ গ্রন্থ 'মন্ত্রশক্তির শক্তি' প্রচার নয়, হিন্দুমেয়ের চিরন্তন সংস্কারে 'বিবাহ' সংস্কারটি কিভাবে মজ্জাগত থাকে, তা দেখান হয়েছে নিতান্ত বালিকা বয়সে বিবাহিতা তাপসী নামের মেয়েটির জীবনালেখ্যে। আধুনিক সমাজের উত্তাল ঢেউয়ের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে তাপসী কেমনভাবে তার জীবনে সুখ আর সংস্কারের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারলো তারই মধুর কাহিনী। এটিও উৎসর্গ করা হয়নি।